

Cuk-#5076-3-p030264
বসুন্ধরা

পল্লী-অর্থনীতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা

১৩৬৬

[১৮৮১-৮২ শকাব্দ]



সম্পাদক

শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচার-অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মদ্রুপে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মদ্রুদিত এবং পশ্চিমবঙ্গ-
সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত

॥ বার্ষিক দ্বাই টাকা ॥ প্রতি সংখ্যা উনিশ নয়া পয়সা বা তিন আনা ॥

বিস্মরণ

১৩৬৬

বার্ষিক সূচি

	পৃষ্ঠা
আখচাষের জরিগান	২৬৮
আখের চাষে জলসেচ	৪২১
আগমার্ক কী	১৩৭
আমার চাষীজীবনের প্রথম অধ্যায়	১১
আমেরিকার কৃষি-সমবায়	৪৫৮
আলুচাষের জরিগান	৩৪৫
অ্যানোনিয়ম ক্লোরাইড কেন নয়	৪৩১
উন্নত প্রণালীতে পাটের চাষ	৪৫৩
উদ্ভিদের তিনটি প্রধান খাদ্য	৪১৮
কচুরিপানা	৪৭৯
কমলা লেবু সম্বন্ধে	৪৭০
কাঠ সংরক্ষণ	২২৭
কুমড়োর লাল পোকা নিয়ন্ত্রণ	১৬
কৃষি, কুটিরশিল্প, পশুপক্ষী ও শিশুস্বাস্থ্য প্রদর্শনী	৪৬
কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়	৮২
কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের আদেশ	২২৯
কেলেমাই পরিকল্পনার অগ্রগতি	৩৫৫
খরিক খন্ডে তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান	১৭১
খরিক খন্ডে ধানের চাষ	১৩০
খেজুরগাছের রূপান্তর	৩০৩
গবেষণার সাহায্যে মৎস্যচাষের উন্নয়ন	১৫৩
গমক্ষেতের আগাছা বিনাশে '২, ৪ডি'	৪৪৪
গাছ থেকে ঝুনা নারকেল সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময়	৪২
গোবৎসের বড়	৩৫৩
গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার	২২৫
গ্রাস-উন্নয়ন	১৪৭
চাষীর সমস্যা : ন্যায্যমূল্য	৪১৩
চারাবাগান	৪২৪
চীনাবাদামের চাষ	৩০৫
জমির ক্ষয় বন্ধ করুন	৩৫৬
জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাবধান	৪৪১
জগিয়ানার সংকর ভুট্টাবীজ	৩৮৮
টালিগঞ্জে পক্ষিপালনের সরকারী ধামার	২৭৩
টুকিটাকি	৪৮, ৯৮, ১৪২, ১৮৪, ২৩০, ২৭৫, ৩১৯, ৩৬০, ৪০৪, ৪৪৭ ৪৮৮

P30264

	পৃষ্ঠা
ডিমপোনা সংগ্রহে উড়িষ্যার সহযোগিতা	৩৩৬
দুমরদহ পদাঞ্জলা জলনিকাশী পরিকল্পনা	১৫
তাল-খেজুরের পাল্লা	৬৯
তিন ফসলের গান	৩৮২
তৈলবীজ	২১০
তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ব্যয়	৩৯৩
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তামাক চাষের উন্নয়ন	৪১৬
ধানের সাধারণ শত্রুকীট	১৭৭
নববর্ষে	৪
নানা স্থানে বনমহোৎসব	১৪০
নানাস্থানে প্রদর্শনী	৪৮৪
নারীর ভূমিকা	৪৬৫
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪৪
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে কৃষি-উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৫৬
পশুচিকিৎসায় পার্থক্য	৪৩৫
পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্দ্র	৩৯৯
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের আখ	২১৮
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ঋণদান প্রথার পুনর্গঠন	২৯৯
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ	১৯ ৬২, ১০৪
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথায় কষিকাজ	২৪৭
পশ্চিম বাঙলার গোরু ও কুমক	৩৩৮
পশ্চিম বাঙলায় মাছচাষের কথা	২৪৫
পশ্চিম বাঙলায় সিনকোনা চাষ	২৭১
পাক্ষেত বাঁধের উদ্বোধন	৩২৮
পাঞ্জাবী কুম্বকের কৃতিত্ব	১৪
পানচাষের কথা	৮৬
প্রসঙ্গ	১, ৫৩, ১০১, ১৪৫, ১৮৯, ২৩৩, ২৭৭, ৩২১, ৩৬৩, ৪০৭, ৪৫১
ফল ও সবজি সংরক্ষণ	১১১
ফলন বৃদ্ধি	৮০
বনমহোৎসবের উদ্বোধন	১২৮
বনমহোৎসবে লাগানো গাছের হিসাব	৯৫
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	২৩৮
বালকায়ম জমিতে নারকেলচারার রোপণ	২১৬
বিশ্ব কৃষিমেলা উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি	৩২৫
বিশ্ব কৃষিমেলায় অমরা	৩৭৪
বীজস্বপারি নির্বাচন ও স্বপারির চারা উৎপাদন	১৭৯
ভারতে আঙ্গুরের চাষ	১৪৯

	পৃষ্ঠা
ভারতে মাছের চাষ বৃদ্ধির প্রয়াস	৪৩৩
ভারতের খাদ্যশস্যের বাস্তব সমাধান	৪০৯
ভারতের জলসেচের ব্যবস্থা	৩১৭
ভারতের নানিষীতোর অঞ্চলের ফল	২৫০
ভুট্টার চাষ	৪৭৭
মাছের চাষ	৩৮০
মাটির কথা	৪৮১
মানবকল্যাণে খাল ও বাঁধ	১৩৪
‘মালদহ ম্যাংগো প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি’	২১৩
মালদহে আমের ব্যবসা ও আশ্রিতপ	৭
মালদহের আগ্র-উন্নয়ন	৩৩৩
মুরগি পালন	২৮৫
মেস্তা ও রোসেলের দু’টি পোকা	৪৭৪
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়	৩০৯
রাষ্ট্রীয় শস্যগোলা	১৮১
লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার	২৪০
লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা	৯২
শস্যরক্ষা	৩৭০
শস্যের অপচয় নিবারণে গুদামঘর	৩৮৩
শিমুলের কথা	৪৬৭
‘সকলের ভরে সকলে আমরা’	৩০৭
সমবায় চাষ	৫
সমবায় চাষ	৩৪১
সমবার নবজীবন দিয়েছে বুলগেরিয়ার কৃষিকে	৩৯১
সমবায় প্রথম চাষ	৪২৮
সমবায় বাঁচিয়েছে	১৭৩
সমবায় যুক্ত চাষ	২৮০
সমবায়ের প্রশংসনীয় অগ্রগতি	৩৫৮
সমাধানের পথ	২৩৫
সহায়ক সমবায় সমিতি : কী এবং কেন	১৯১
সমাবিনের বিবিধ ব্যবহার	৩৪৯
সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান	১৯৮
সার্থক শ্রমে গড়া কেলেমাই	৩৭৭
সার দিলে গমের চাষে লাভ হয় ভাল	৩৫২
সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন	৫৬
সুপারির চাষ	২৬৫
সুপারির নিবিড় চাষের আদর্শ কার্যক্রম	৩১৩
সুদ্যপায়ী শিকারপ্রাণী	২৮, ৭১
স্বল্প-সঞ্চয় অভিযান	৩৮৬
স্বাভাবিক ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি	১৭
হরিণঘাটা দুখ উপনিবেশ	৮৪
হস্তশিল্প-পর্ষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা	৩৩১
হেতালপাতার প্রচলন	৯০

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার ক্ষমতা হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের পশু-পক্ষীর জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,

৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
এ ..	জয়নগর	২। এ ..	বারাকপুর
এ ..	বজবজ	৩। এ ..	বসিরহাট
এ ..	ভাঙ্গড়	৪। এ ..	ডায়মণ্ডহারবার
এ ..	ক্যানিং	৫। এ ..	বেহালা
এ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
এ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
এ ..	মথুরাপুর	৭। এ ..	হাবড়া,
এ ..	কুলপী	পোঃ তববেড়িয়া	
এ ..	সাগর	৮। এ ..	বনগাঁ
এ ..	বারাকপুর	৯। এ ..	গাইঘাটা
এ ..	দেউলপাড়া,	১০। এ ..	বাগ্‌দা
এ ..	পোঃ নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিক্ষালয়ের পশু-
এ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	
এ ..	হাবড়া	ক্যান্টনমেন্ট।	
এ ..	বসিরহাট		
এ ..	হাসনাবাদ		
এ ..	সন্দেশখালি		
এ ..	হাড়েয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	প্রাথমিক	ঠিকানা
১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ	.. ডোমজুড়
৩।	ঐ	.. আমতা

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	হাওড়া
২।	ঐ	উলুবেড়িয়া
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪।	ঐ	.. বাণী
৫।	ঐ	.. শা
৬।	ঐ	.. ডেন্ডু

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	.. বেথুয়াডহরি
৩।	ঐ	.. রানাঘাট
৪।	ঐ	.. শান্তিপুর

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	.. রানাঘাট
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনী
৪।	ঐ	.. চাকুদা
৫।	ঐ	.. হাঁসখালি
৬।	ঐ	.. রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ	.. হরিহরপাড়া
৩।	ঐ	.. দমকল
৪।	ঐ	.. রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ	.. ভগবানগোলা
৬।	ঐ	.. ধুলিয়ান
৭।	ঐ	.. নবগ্রাম

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ	.. জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ	.. জঙ্গীপুর
৪।	ঐ	.. কান্দি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা
৬।	ঐ	.. বারওয়ান পোঃ পানি
৭।	ঐ	.. কান্দি
৮।	ঐ	.. ভরতপুর

মালদহ এলাকা

পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
স্বাক্ষর	মালদহ	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
ঐ ..	আইহো	২। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	হরিশচন্দ্রপুর
ঐ ..	ওল্ড মালদহ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
		৩। ঐ ..	খড়বা, পোঃ চকল
		৪। ঐ ..	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
		৫। ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

দিনাজপুর

পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
স্বাক্ষর	বালুরঘাট	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
ঐ ..	রায়গঞ্জ	২। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	রায়গঞ্জ
ঐ ..	গঙ্গারামপুর	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
ঐ ..	ইসলামপুর	৩। ঐ ..	হেমতাবাদ
		৪। ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

৭৬

পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিঙ

স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
স্বাক্ষর	দার্জিলিঙ (সদর)	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিঙ
ঐ ..	ঘুম	২। ঐ ..	কাসিয়াঙ
ঐ ..	কাসিয়াঙ	৩। ঐ ..	কালিম্পাঙ
ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	৪। ঐ ..	শিলিগুড়ি
ঐ ..	তিস্তাভ্যালি	৫। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	রংলি-রংলিয়াট,
ঐ ..	শিলিগুড়ি	সম্প্রসারণ সংস্থা।	পোঃ তাকদা
ঐ ..	নক্সালবাড়ি	৬। ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
		৭। ঐ ..	সুকিয়াপকরি, জোড়বাংলো
		৮। ঐ ..	কালিম্পাঙ

বিহার

পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
স্বাক্ষর	কোচবিহার	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
ঐ ..	বেকলিগঞ্জ	২। ঐ ..	তুফানগঞ্জ
ঐ ..	মাথাভাঙ্গা	৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	দিনহাটা
		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
		৪। ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতি	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশ্চিমবঙ্গ
২।	ঐ	বীরপাড়া	২।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়
৩।	ঐ	কালচিনি		সম্প্রসারণ সংস্থা।
৪।	ঐ	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ
			৪।	ঐ

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, বর্ধমান

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতি	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	গুস্করা	১।	স্থিতিবান পশ্চিমবঙ্গ
২।	ঐ	মেমারী	২।	ঐ
৩।	ঐ	সেহরানবাজার	৩।	ঐ
৪।	ঐ	কালনা	৪।	ঐ
৫।	ঐ	কাটোয়া	৫।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়
৬।	ঐ	নতুনহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।
৭।	ঐ	আসানসোল	৬।	ঐ
৮।	ঐ	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ
৯।	ঐ	দুর্গাপুর	৮।	ঐ

বীরভূম

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, বীরভূম

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতি	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	গাঁইথিয়া	১।	স্থিতিবান পশ্চিমবঙ্গ
২।	ঐ	বোলপুর	২।	ঐ
৩।	ঐ	দুবরাজপুর	৩।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়
৪।	ঐ	রামপুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।
৫।	ঐ	নলহাটি	৪।	ঐ
			৫।	ঐ
			৬।	ঐ

হুগলি

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, হুগলি, চুচুড়া

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতি	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	চুচুড়া	১।	স্থিতিবান পশ্চিমবঙ্গ
২।	ঐ	ত্রিবেণী	২।	ঐ
৩।	ঐ	শ্রীরামপুর	৩।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়
৪।	ঐ	তারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।
			৪।	ঐ
			৫।	ঐ
			৬।	ঐ

মেদিনীপুর এলাকা

পুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পো: মেদিনীপুর
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পো: কাঁথি

সামান্য	ঠিকানা
সামান্য পশুচিকিৎসক	দাঁতন
এ	মেদিনীপুর
এ	বালিচক
এ	গড়বেতা
এ	খড়গপুর
এ	তমলুক
এ	মহিষাদল
এ	নরঘাট
এ	ঘাটাল
এ	কাঁথি
এ	এগ্রা
এ	ফীরপাই

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২। এ	তমলুক
৩। এ	কাঁথি
৪। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫। এ	ভগবানপুর
৬। এ	পটেশপুর
৭। এ	খৈজুরি
৮। এ	তমলুক
৯। এ	বিনপুর (১), পো: লালগড়
১০। এ	বিনপুর (২), পো: বেলপাহাড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

সামান্য পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
এ	ওন্দা
এ	বেলিয়াতোড়
এ	বিষ্ণুপুর
এ	সোনামুখী
এ	খাতরা

১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২। এ	বিষ্ণুপুর
৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪। এ	পাত্রসামার
৫। এ	রানীবাঁধ

পুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

সামান্য পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
এ	বলরামপুর
এ	মানবাজার
এ	খালদা
এ	কাশীপুর
এ	রঘুনাথপুর

১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২। এ	রঘুনাথপুর
৩। এ	হুরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৬
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৬
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,১০০	২.৪
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৫
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৬
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

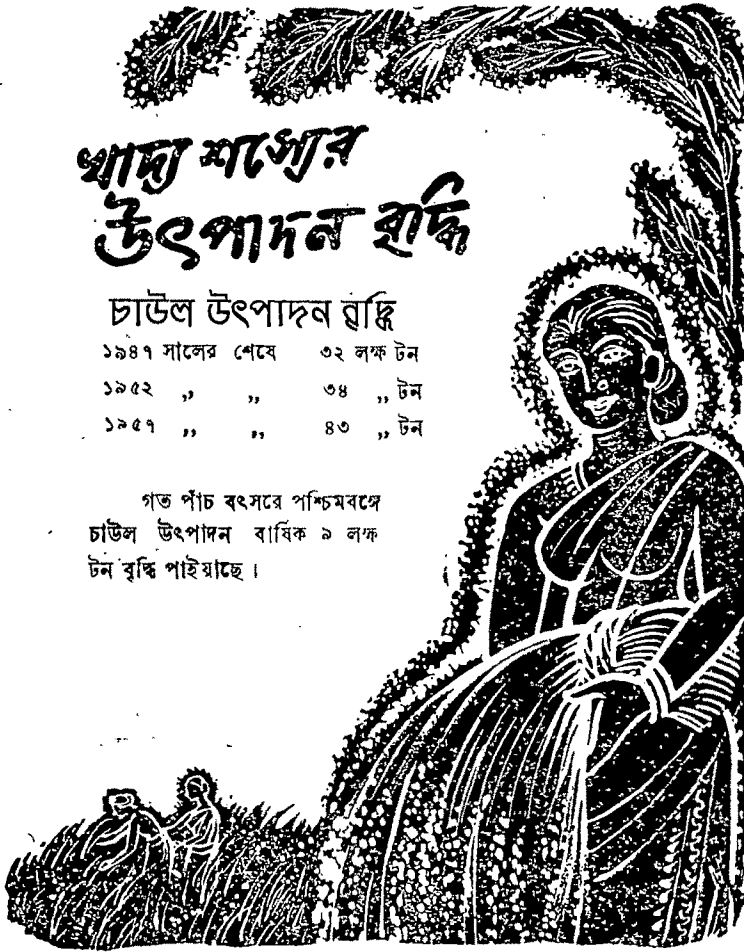
১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭ সালের শেষে	৩২ লক্ষ টন
১৯৫২ „ „	৩৪ „ টন
১৯৫৭ „ „	৪৩ „ টন

গত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে
চাউল উৎপাদন বার্ষিক ৯ লক্ষ
টন বৃদ্ধি পাইয়াছে।



সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	১
নববর্ষে	৪
সমবায় চাষ	৫
মালদহে আমের ব্যবসা ও আত্মশিল্প	৭
আমার চাষীজীবনের প্রথম অধ্যায়	১১
পাঞ্জাবী কৃষকের কৃতিত্ব	১৪
ডুমুরদহ পদ্মজলা জলনিকাশী পরিকল্পনা	১৫
কুমড়োর লাল পোকা নিয়ন্ত্রণ	১৬
স্বাবলম্বনে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি	১৭
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ	১৯
স্তন্যপায়ী শিকারপ্রাণী	২৮
গাছ থেকে বুনা নারিকেল সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট সময়	৪২
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪৪
কৃষি-কুটিরশিল্প-পশুপক্ষী ও শিশুস্বাস্থ্য প্রদর্শনী	৪৫
টুকিটাকি	৪৬

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিষাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বন্ধুত্ব

১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় যুক্তসংখ্যা : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

নতুন বছর এই ১৩৬৬ সালে 'বসুন্ধরা' দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আমরা এই পত্রিকার সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও সকল দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এ বছর একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যথা-সময়েই মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর দ্দ'-এক পশলা বর্ষে ধরণী স্নিগ্ধ হচ্ছে, তার মৃত্তিকা সরস কোমল হয়ে উঠছে। আশা করি আমাদের চাষীভাইরা এই সুযোগের পূর্ণ সম্ব্যবহার করছেন। দৈবের এমনি প্রসন্নতার উপরই তো আমাদের কৃষি প্রধানতঃ নির্ভর করছে। আকাশের দেবতা সদয় হ'লে আমাদের কৃষির মাঠ শস্যশ্যামল আর দেবতা বিরূপ হ'লে কৃষিক্ষেত্র মরুভূমি।

এই অসহায় অবস্থা থেকে দেশকে বাঁচাবার যতদূর ব্যবস্থা সরকার এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন, তারও সুযোগ অনেক চাষীই নিচ্ছেন না দেখে মনে হয়, এই দৈবনির্ভরতাই বুদ্ধি তাঁরা চান এবং খাদ্যশস্যে দেশের স্বনির্ভরতা বুদ্ধি তাঁদের অভি-প্রেত নয়। তারপর, চাষের কাজে জলের ব্যবস্থা করার জন্য শুধু সরকারের উপরই নির্ভর করতে হবে কেন? চাষীদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সক্রিয় হ'তে হবে।

তবে কৃষির ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করা বা চাষের কাজের কোন ব্যাপক আকারের সমস্যার

সমাধান করাই কোন একক চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই চাষীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সেই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টারই অপর নাম সমবায় প্রথায় কাজ করা। মানুষের জীবনের সকল সমস্যারই সমাধানে সমবায় অসাধ্য সাধন করতে পারে। 'পশ্চিম-বঙ্গে সমবায় চাষ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ ধারাবাহিক-ভাবে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে তার প্রতি আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পৃথিবীর প্রগতিশীল অনেক দেশ কৃষি-পশুপালন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করে কী অসামান্য উন্নতি করেছে, তার পরিচয়ও পাই আমরা এই প্রবন্ধটির মধ্যে। আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে কীভাবে সমবায় নীতিকে গ্রহণ করা যেতে পারে, তার নির্দেশ রয়েছে এর মধ্যে।

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানত ভূমিনির্ভর। সৈদিক দিয়ে এ রাজ্যের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ অনেক কম। এই কম জমিরও অনেকখানি পড়ে আছে সাধারণ কৃষির অযোগ্য পতিত হয়ে। এই স্বল্প পরিমাণ ভূমিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন করে আমাদের স্বয়ংপূর্ণতা অর্জন করতে তো হবেই, তা ছাড়া, এ রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় যে বনভূমি অনেক কম রয়েছে, সেই অভাবও আমাদের পূরণ করতে হবে। চাষের জমি অনেক কম এবং

খাদ্যের ভোজ্য অনেক বেশি, এইটাই আমাদের খাদ্যসমস্যার মূল কারণ। কিন্তু এর সমাধানের পথও আমরা খুঁজে পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, ভাল বীজ, প্রচুর সার, যথেষ্ট জল, ফসলের উপযুক্ত পরিচর্যা ও সংরক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়ে ফেলতে হবে, তা না হ'লে খাদ্যাভাব কোনকালেই দূর হবার নয়। এ অবস্থায় চাষের কাজে জলের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। সর্বপ্রথমে সেচব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সর্বদা। তা যদি করতে হয়, তবে সমবায়ের পতাকাতলে অবিলম্বে সমবেত হ'তে হবে আমাদের সকল চাষীভাইকে।

আবাদযোগ্য জমিগুলোতে আধুনিক প্রণালীতে চাষ ক'রে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে হবে। আর, আবাদের অযোগ্য হয়ে যেসব জমি পতিত পড়ে আছে, সেসব কি এমন অকেজো পড়ে থাকবে আমাদের নিরুপায় দৃষ্টির সামনে? তা হ'তে পারে না। সেসব জমিতেও চাষ-আবাদ করতে হবে, তবে, খাদ্য-ফসলের চাষ নয়। কেননা, খাদ্যফসল ওসব জমিতে জন্মাবে না। কোন কোন জমিতে গাছ জন্মালেও শস্য ফলবে না; আর ফললেও তার পরিমাণ দাঁড়াবে শোচনীয় রকমের নগণ্য। তাতে লোকসানই সার হবে।

সমস্যা তো শুধু খাদ্যের নয়, অর্থেরও। বেকারীর সমস্যা এ রাজ্যে, বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে, অত্যন্ত ব্যাপক। সেই সমস্যার কবলে পড়েই গ্রামের চাষীরা গ্রাম ছেড়ে শহরের শিল্পাঞ্চলে এসে বেকারের ভিড় বাড়ায়। এ রাজ্যে বছরে চাষের কাজে চলে মাত্র তিন থেকে বড়জোর পাঁচ মাস, বাকি সাত থেকে নয় মাস চাষীকে বেকার ব'সে থাকতে হয় কাজের অভাবে। চাষের জমিকে ফেলে না রেখে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ ক'রে, যথাযথ শস্যপরিচর্যা ক'রে, তা থেকে বছরে তিনটে-চারটে ফসলও তোলা যায়। নিয়মিত চাষীদের বেকারীর সমস্যা তাতেই অনেকটা দূর হ'তে পারে। এ ছাড়া,

সাধারণ ফসলের চাষ যেখানে হয় না, সেই পতিত জমিতেও নানা জিনিসের চাষ করা যায়। শিশল, রামি প্রভৃতি আঁশী ফসল পতিত জমিতে ভাল জন্মায়। সাবাই ঘাসও পতিত জমিতে ভাল হয়। এই তিনটি জিনিস সম্বন্ধেই 'বসুন্ধরা'র পৃষ্ঠায় আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। শিশল এবং রামির গাছ থেকে যে উচ্চশ্রেণীর আঁশ পাওয়া যায়, শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীর বাজারে তার বিপুল সমাদর। সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ যে কাগজ, তার তৈরিতে সাবাই ঘাসের এখন যথেষ্ট প্রচলন, এ ছাড়া দড়ি তৈরি প্রভৃতি নানা কাজেও এই ঘাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পতিত জমিতে এসবের চাষ করলে, বহু চাষীর বেকারী যেমন ঘুচবে, সেইসঙ্গে উপেক্ষিত পতিত জমি-গুলিও জাতীয় সম্পদ-ভান্ডারে পরিণত হবে। শিশল ও রামির আঁশ নেওয়া, সেই আঁশ দিয়ে নানা রকম শিল্পসৃষ্টি, সাবাইএর দড়ি পাকানো, এসব কাজে পল্লী-অঞ্চলে বহু কুটিরশিল্পের পত্তন হয়ে বহু বেকারের কর্ম-সংস্থান করবে। শিশল-পাতা থেকে আঁশ ছাড়াবার পরে তার যে বাতিল মন্ড পড়ে থাকে, তা থেকে অতি মূল্যবান একটি ঔষধ তৈরি হয়। এ শিল্পেও বহু লোকের কর্ম-সংস্থান হ'তে পারে।

তবে, শিল্পসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে শিশল, রামি, সাবাই প্রভৃতির চাষ করতে হ'লে, ব্যক্তিগত টুকরো টুকরো পতিত জমিতে তা করলে চলবে না। সমবায়ের আশ্রয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় এক এক অঞ্চলের বহু গৃহস্থের পতিত জমিতে চাষ গড়ে তুলতে হবে। আর, শিল্পসৃষ্টি তো একক প্রচেষ্টায় চলবেই না। আবার অনেক জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পড়ে আছে বিশাল বিশাল আয়তনের পতিত জমি—যার অঙ্গে লাঙলের ফলার দাগ বহুকাল বা কোনকালেই পড়ে নি। স্থানীয় চাষীদের সমবায় সমিতি গঠন ক'রে সেসব জমিতে শিশল-রামি-সাবাইএর চাষ গড়ে তুলতে হবে এবং সমবায়েরই অধীনে এসব ফসলের

অবলম্বনে শিল্পসৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই।

এইভাবে সাধারণ কৃষির যোগ্য এবং অযোগ্য সমস্ত জমিতে সমবায়ের অধীনে সমবেত প্রচেষ্টায় খাদ্যফসল আর অর্থকর ফসল চাষের অভিযান চালাতে হবে। রাজ্যজোড়া খাদ্যাভাব অর্থাভাব

আর বেকারসমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম কখনও কারও একক প্রচেষ্টায় হয় না, তার জন্য চাই দলবদ্ধ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সমবায়ের মধ্যে রয়েছে এই সংগ্রামের শক্তি। সমবায়—সমবেতি। এই শক্তির মন্ত্র গ্রহণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আসুন নতুন বছরে আমরা নতুন দৃঢ়তায় সমবায়ের সংকল্প গ্রহণ করি।



নববর্ষ

শ্রীকালিদাস রায়

কবিশেখর

লইয়া নূতন আশা ফিরিল বৈশাখ।

ঘরে ঘরে বাজে শাঁখ দেয় সবে ডাক।

শুদ্ধক পত্র পায় দলি

পুরাতন যায় চলি

সকল ক্ষতির স্মৃতি তারি সাথে থাক।

শুভমাসে কর নববর্ষেরে বরণ,

জন্ম-মাসে করি কবিগুরুদের স্মরণ।

ভুলি সব দৃষ্ট শোক

নব যাত্রা শুরু হোক

ক্ষোভে লোভে ক্ষতে যেন না টলে চরণ।

অশথের ডালে ডালে যত কিশলয়

সমবাসে বসন্তের করে অভিনয়।

রাঙা রাঙা ফলভারে

বটতরু পথধারে

পাখিদের সমবাসে কলরবময়।

ফলেদের সমবাসে বাগান চঞ্চল

ফুলেদের সমবাসে কানন উজল

সমবাসে কুতূহলী

মউচাক গড়ে অলি

ছায়াদের সমবাসে পথটি শীতল।

দেখা গেল একা একা প্রয়াস বিফল,

পৃথক একের আর কতটুকু বল?

বারি বিন্দু বিন্দু করি

সিন্ধুরেও তোলে গড়ি,

এ সত্য ভুলিলে আর হবে না মঙ্গল।

নববর্ষে এস আজ করি সবে পণ,

করিব সকলে মিলি অসাধ্য সাধন।

সমবাস! সমবাস!!

একমাত্র সদুপায়

এসো তায় গড়ি নব জাতীয় জীবন।

সমবায় চাষ

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায়

সমবায়প্রথায় চাষ করবার আলোচনায় সমস্ত দেশ মূখর হয়ে উঠেছে। সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু সম্মানিত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বিতর্কে নেমে গেছেন। সমবায়প্রথার আয়োজনের প্রথম ও প্রধান উপাদান হ'ল বিশ্বাস। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে না পারলে সমবায়প্রথার পত্তন অসম্ভব। অতীতের সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমিতে একান্বতী পরিবারপ্রথা সমবায় আয়োজনের বিজয়স্তম্ভরূপে এদেশে বহুদিন বিরাজিত ছিল। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধনে ২-৩ পুরুষ পর্যন্ত এক অল্পে এক সাথে সুখে দুঃখে ব্যথায় ও আনন্দে চলার ইতিহাস এখনও চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল সমবায়ের ভিত্তিভূমিতে। যে সভ্যতার বনিয়াদের উপর সেদিনের সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কালবিবর্তনে শিল্প-সভ্যতার ব্যয়সাধ্য আয়োজনের ধাক্কায় মানুষের সে সাধের সৌধ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। বিলাসবহুল শিল্প-সভ্যতার ব্যয়সাধ্য আয়োজনের আহরণ সামান্য কৃষি-আয়ের উপর দাঁড়াতে না পেরে একান্বতী পরিবারের মানুষকে দিকে দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আজকের দিনে ব্যয়বহুল দৈনন্দিন জীবনযাপনের পথে কৃষিক্ষেত্রের উপার্জনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না বলেই নানাভাবে আয়ের ব্যবস্থার মানুষ দিগ্ভ্রান্তের মত পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক বিশ্বাসের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের বাঁচার জন্য প্রয়োজন হ'লে অন্যের মৃত্যু-সংগঠন করতেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হওয়ার ফলে সমস্ত সমাজ-জীবনের মূল বেদী বিশ্বাসের ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নিজের সর্বনাশকে ডেকে নিয়ে আসছে। জীবনে চলার পথে পরস্পরের প্রতি স্নেহ-

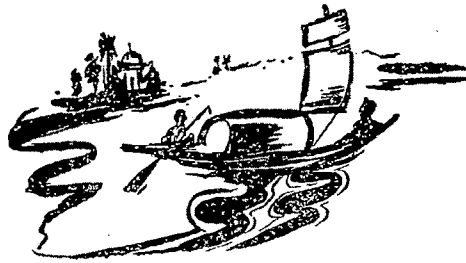
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার বন্ধনেই পরিবার ও সমাজ গড়ে ওঠে। আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বার্থপর জীবনযাপনের প্রয়াসে বিশ্বাসের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমষ্টির সর্বনাশ করতেও মানুষ লজ্জিত নয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সমবায়-শক্তিতে নতুন আর্থনীতিক গঠনের আয়োজনের পথ খুব সহজ ও সুগম হবার কোনও কারণ নেই। নতুন আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্বাসের বেদী রচনার প্রয়াস সেইজন্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'তে বাধ্য।

চীন, রাশিয়া ও অন্যান্য কোনও কোনও রাষ্ট্রে সমবায় কৃষির প্রচলন পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে কিনা সন্দেহ, রাশিয়ায় “কুলখোজ” (সমবায় খামার) আজও বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারতবর্ষের মত বহু দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমানায় খণ্ডীকৃত ছোট ছোট জমির মালিকানার উপর বর্তমান প্রজাস্বত্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সেই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জমিতে ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে উৎপন্ন শস্যের মালিক কৃষক পুরাতন প্রথায় চাষ করে যে শস্য উৎপন্ন করে তাতে তার পারিবারিক জীবনের সকল চাহিদা মেটানো আর মোটেই সম্ভব নয়। কারণ উৎপন্ন সামর্থ্যের মধ্যে আজকের শিল্প-সভ্যতার উৎপাদনের ব্যয় সংকুলান করা অসম্ভব। বিশেষত পুরাতন পৈতৃক সংস্থান সামান্য জমির উপস্বত্বের উপর ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির পারিবারিক ব্যয় চালিয়ে ওঠা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষত পুরাতন প্রথায় মামদুলী চাষের ব্যবস্থার পরিবর্তনে বর্তমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণে ক্ষেত্রের ফলন বাড়ানোর ব্যবস্থা না করলে পরিবার তথা দেশের জনসাধারণের খাদ্যাভাব বিদূরনের কোনও আশা নেই। সেইজন্য

ট্রাক্টর দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের বন্দোবস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করতে হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটের ব্যবস্থা অটুট রেখে সেভাবের চাষ চলতে পারে না। ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করতে হ'লে একসঙ্গে বেশি জমি চাই। ব্যক্তিগত জমির সীমানা ঠিক রেখে সেভাবে চাষ হ'তে পারে না ব'লেই সমবায়প্রথায় বহু লোকের জমিতে একসাথে চাষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সমস্ত চাষের জমিতে একসাথে চাষ করতে হ'লে প্রত্যেকের জমির পরিমাণ অংশ ঠিক ক'রে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সেই সমবেত চাষের উৎপন্ন শস্য থেকে চাষের খরচ ও সমিতি পরিচালনার ব্যয় বাদ দিবে যা থাকবে তা কৃষকদের নিজ নিজ জমির আয়তনের অনুপাতে বিভক্ত ক'রে দিলে কোন গোলযোগ হবার আশঙ্কা নেই। এক বিঘা জমিকে একটি অংশ ধ'রে, যার এক বিঘা সে এক অংশের উপস্বত্ব পাবে—ঐ ব্যবস্থা করতে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। বর্তমানে কৃষক তার জমিতে চাষ করতে গিয়ে তার নিজের পারিশ্রমিকের কোনও হিসাব রাখে না। এখানে সমবায়ের জমিতে যে ব্যক্তি যতখানি কায়িক

মজদুরি দেবে সে সেইভাবে দৈনিক মজদুরি পেতে পারবে। জমির উপস্বত্ব ছাড়াও তার মজদুরির হিসাব ধরলে তার লাভের অঙ্ক বৃদ্ধির দিকেই থাকবে সন্দেহ নেই। একফসলী জমিতে সমবায় প্রথায় অন্যান্য সাময়িক ফসল উৎপাদন ক'রে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। এই সমবায় প্রবর্তনই বর্তমানে কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্য। কিন্তু একাজ করতে গেলে প্রথম ও প্রধান বাধা বর্তমান সামাজিক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। বিশেষভাবে প্রচারের দ্বারা জনমনে বিশ্বাসের আবহাওয়ার সৃষ্টির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আধুনিক আবহাওয়ায় সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে বসবার মনোভাবের একান্ত অভাব। সেই ভাবধারার পরিবর্তন না ক'রে সমবায় প্রথার প্রবর্তন করতে গেলে তার সাফল্যের আশা নিতান্তই দুরাশা। সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের সর্বত্র বিশেষ প্রচারপদ্ধতির মাধ্যমে জনমনে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধনের সৃষ্টি করতে হবে। তার পর সমবায়প্রথা প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হবে—তার পূর্বে নয়।



মালদহে আমের ব্যবসা

ও আম্রাশিল্প

শ্রীকালীপদ লাহিড়ী

মালদহ আমের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার আনুমানিক ৪৪ হাজার একর জমিতে আমের চাষ হয়। অনুকূল আবহাওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভর করে, এই আমের ব্যবসা। কারণ, আমের মুকুলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আমের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

ফাল্গুন মাসে আমের মুকুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম জন্মানোর পর হ'তে শরৎ হয় বাগান বিক্রির পাল। একজন বাগান ক্রয় করে পরে বেশি দাম পেলে অন্যের নিকট বিক্রি করে দেয়। কখন-কখনও আম-বাগান নিলামডাকেও বিক্রি হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আম পাকে, তার পূর্বে হ'তেই আম চালান দেওয়া শরৎ হয়। সাধারণত বড় আকারের আম-গুলি রপ্তানি করা হয় বেশি। আসাম, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পাটনা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আম রপ্তানি করা হয়, তন্মধ্যে বর্তমানে আসামই আম সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র।

এই জেলায় বহু প্রকারের আম জন্মে; যথা— গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি, বন্দাবনী, ল্যাংড়া, ফজলি, আশ্বিনা, ভারতী, মোহনভোগ, বাতাসা, দিলসাজ, ভাদুরিয়া, মিশরী ক্যারা, আড়াজন্মা, লাড়ুয়া, সিদ্ধুরিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া, আরও বহু প্রকারের আম এ জেলায় জন্মে। এগুলিকে গুণ্টি অন্ন বলা হয়। এই আমগুলি আকারে ছোট এবং স্বাদে বিভিন্ন প্রকারের,—কোনটা মিষ্টি, কোনটা টক, আবার কোন আমে ঘোয়ানের গন্ধ। সাধারণত ছোট আকারের পাকা গুণ্টি আমগুলি পণপ্রতি (৮০টা)

২-২½ টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে এবং বাজারে প্রচুর আমদানি হয়। আপেক্ষাকৃত বড় গুণ্টিগুলির দর পণপ্রতি ৫-৬ টাকা পর্যন্ত হয়। গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আম ৪-৫ হতে ৮-১০ টাকা এবং ফজলি আম শতকরা ৬-৭ টাকা থেকে শেষে ১৫-১৬ টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে। যে বৎসর উৎপাদন বেশি, সে বৎসর দরও কিছু কম থাকে। ফজলি, আশ্বিনা প্রভৃতি বড় আকারের আমগুলি ব্যবসার অধিক উপযোগী বলে বিবেচিত হয় এবং এইহেতু বেশি রপ্তানি হয়। গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি মাঝারি আকারের আমগুলিও কিছু কিছু রপ্তানি হয়; কিন্তু ছোট আকারের গুণ্টি আমগুলি রপ্তানি করা হয় না। এগুলি স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য প্রচুর আমদানি হয়ে থাকে এবং সস্তা দরে বিক্রি হয়। বহু লোক এই ব্যবসায়ের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাগানের মালিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যবসাতে লিপ্ত থাকে, কিন্তু এ ছাড়াও গাড়োয়ান, কুলিমজুর, ঝড়ি-প্রস্তুতকারক, দালাল প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপকৃত হয়ে থাকে। এমনকি, অতি দীন দরিদ্রদেরও কিছু কিছু আয়ের সংস্থান হয়ে থাকে এই সময়। কাঁচ থেকে পাকা পর্যন্ত আম এরা বাগান হতে কুড়িয়ে এনে বাজারে বিক্রি করে, দু' পয়সা উপার্জন করে এবং উদরার্নের সংস্থান করে। মোটামুটি এই জেলার ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলে উপকৃত তো হয়ই, উপরন্তু বাইরে থেকে এসেও কতক লোক এই সময়ে দু' পয়সা রোজগার করে। আমের ব্যবসা এই জেলার একটি লাভজনক ব্যবসা।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

হঠাৎ বড় শিলাবর্ষিত হলে এবং আমের গাছটি ধরার সময় দক্ষিণা বাতাস বইলে আমের ক্ষতি হয়। আমের ফসল ভাল হলে এই জেলার প্রায় এক কোটি টাকা আয় হয়ে থাকে। আম রপ্তানির দরুন গত তিন বৎসরে যা আয় হয়েছে, তারই একটা তালিকা দেওয়া হ'লঃ

সাল	টাকা
১৯৫৬	... ৯০,৫০,০০০
১৯৫৭	... ২৩,৫৩,০০০
১৯৫৮	... ৫৩,৩০,০০০

ফসল উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী আয়েরও তারতম্য হয়ে থাকে। কারণ যে বৎসর আম বেশি হয়, সে বৎসর তার রপ্তানিও হয় বেশি পরিমাণে।

এই জেলায় আম ও আম্রজাত দ্রব্যের উন্নতির জন্য “ম্যাংগো মার্চেন্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন” নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫৪ সাল হতে গড়ে উঠেছে। তার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান অন্য নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থেকে প্রশংসনীয় কার্য করে আসছেন। জানা যায় যে, মালদহের এই সমিতির লক্ষ্য অর্থের দ্বারা বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে। এ ছাড়া, এই তহবিল হতে ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়ে গত বৎসর (১৯৫৮) মহানন্দা নদীর তীরবর্তী পুরাতন মালদহে “ম্যাংগো প্রসেসিং ফ্যাক্টরি” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার সুযোগ লাভ করেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহরমায়দন কবীর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সমিতির ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি এই “ম্যাংগো প্রসেসিং সোসাইটির পুরাতন মালদহস্থিত কারখানা স্বয়ং পরিদর্শন করেন এবং ‘ম্যাংগো বিভারিজ’ নামক পানীয়টির আশ্বাদ গ্রহণ করে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যগুলির বিদেশে কার্টিজের প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন। মালদহে এই আম্রশিল্পের উন্নতি হ'লে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। মালদহ “ম্যাংগো

প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি” কর্তৃক উৎপাদিত আম্রজাত দ্রব্যসমূহের মূল্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

দ্রব্যের নাম	ওজন ও দাম টাকা
(১) ম্যাংগো প্লাইসেস্ ইন সিরাপ	২ পাঃ টিন=২০.৩৭
(২) ম্যাংগো পান্ন	২ পাঃ টিন=২০.৪৪
(৩) ম্যাংগো স্কোয়াস্	২৬ আঃ বোতল=২০.৫০
(৪) ম্যাংগো জ্যাম	১ পাঃ টিন=১০.৫৩
(৫) ম্যাংগো চাটনি	১৪ আঃ বোতল=১০.৩১
(৬) ঐ	২ পাঃ বোতল=২০.৫০
(৭) ম্যাংগো বিভারিজ	৮ আঃ (বোতল বাদে)=০০.৩১
(৮) ঐ	৮ আঃ (বোতল সহ)=০০.৫০

এ ছাড়াও “লেমন স্কোয়াস”, পেয়ারার জ্যাম, জেলি এবং টম্যাটো হ'তে কয়েকপ্রকার খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। এসকল খাদ্য ও পানীয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখে মনে হয় যে, এগুলির প্রচার ও বিদেশে বাজার সৃষ্টি করার সুযোগ হলে, এই আম্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'তে পারে এবং প্রচুর অর্থাগমেরও পথ প্রশস্ত হতে পারে। এই বিষয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও “ম্যাংগো মার্চেন্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের” সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। উক্ত “ম্যাংগো প্রসেসিং সমিতি” কর্তৃক উৎপাদিত সর্বপ্রকার পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের “সোল ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী” ভারত ও বিদেশের জন্য “ওয়েডেল্ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি” নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। পূর্বেক্ত “ম্যাংগো মার্চেন্ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন” নিজস্ব তহবিল হ'তে এ পর্যন্ত ১,১৮,০০০ টাকা মালদহ কলেজে দান করেছেন। এ ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে এই সমিতি প্রচুর অর্থ দান করেছেন। পুরাতন মালদহে অবস্থিত “ম্যাংগো প্রসেসিং ফ্যাক্টরি”তেও এই তহবিল হ'তে দেওয়া হয়েছে ৮৫,০০০ টাকা। এই বৎসর সরকার হতে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

কী কী উপায় অবলম্বন করলে এই আমের ব্যবসা ও আত্মশিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার কিছু আভাস নিম্নে প্রদত্ত হল।

সাধারণত আম জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে এবং সেই সময় সর্বত্রই প্রচুর আম আমদানির ফলে আমের দর কম থাকে। কলিকাতায় এই সময় ল্যাংড়া, বোম্বাই প্রভৃতি বহু প্রকার আম বাইরে থেকে আমদানি হয়ে থাকে এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে বিক্রি হয়ে থাকে। অতএব যে আম বৈশাখ মাসে পাকে এবং যে আম বিহারের বাথুয়া, সিঁপিয়া ও সুরুলের মত কিংবা মাদ্রাজের লতানে আমের মত আশ্বিন মাসের পরে পাকে, সেইসব আমের চাষ এখানে বাড়ানো প্রয়োজন। মালদহের মাটি আম উৎপাদনের উপযোগী বলে অনেকের ধারণা। এই বিষয় বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত আম এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণে ট্রেনে বহু বিলম্ব ঘটে এবং এর ফলে অনেক সময় আম পচে নষ্ট হয়। তা ছাড়া আম পাকবার বহু পূর্বেই সেগুলি গাছ হতে পেড়ে নেওয়া হয় এবং পাকা আম পাঠানো সম্ভব হয় না। সুতরাং আমের প্রকৃত স্বাদ হতে ক্রেতাদের বঞ্চিত হতে হয় এবং এই ব্যবস্থার ফলে গাছের ফল উৎপাদনের শক্তি কমে যায় বলে অনেকের ধারণা। অতএব ট্রেনে যে আম রপ্তানি করা হয়, সেই আম যাতে দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত মহানন্দা নদীর অপর পারে রেলস্টেশন থাকায় আমগুলি সেখানে নেওয়ার অসুবিধা হয়ে

থাকে। এইজন্য এপারে একটি আউট এজেন্সি খোলার প্রয়োজন—যাতে সহজেই আম 'বদক' করার অসুবিধা দূর হতে পারে। এ পর্যন্ত মালদহের আম রেপ্পদন ছাড়া ভারতের বাইরে কোথাও পাঠানো সম্ভব হয় নি। ভারতের বাইরে মালদহের আম ও আম্রজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আম ও আম্রজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দৃষ্টিে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এগুলির প্রচার ও প্রেরণের সুব্যবস্থা হলে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে।

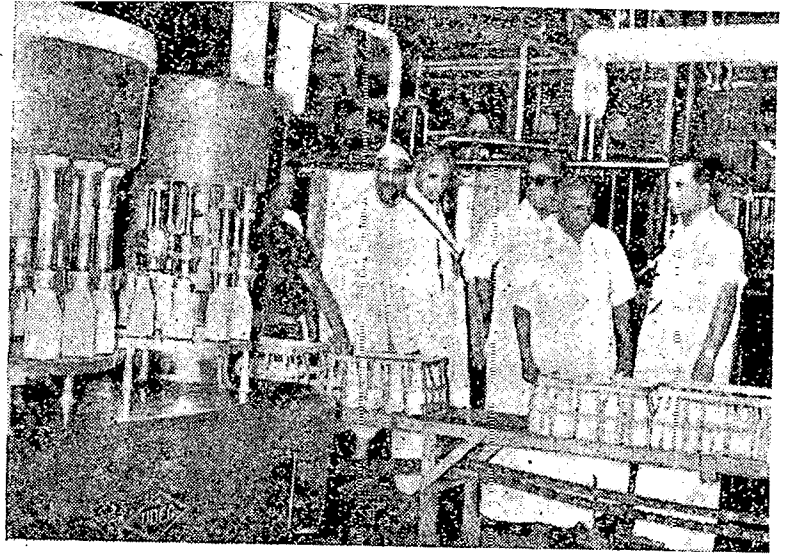
আমের চাষ, আম্রজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম ও আম্রজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চালানোরও প্রয়োজন আছে।

জোত, আড়াপুত্র ও কোতুরালি প্রভৃতি অঞ্চলে অমাস্বদ্য, আমচুর ও আমের কলম প্রস্তুত হয়। এগুলিও লাভজনক ব্যবসা।

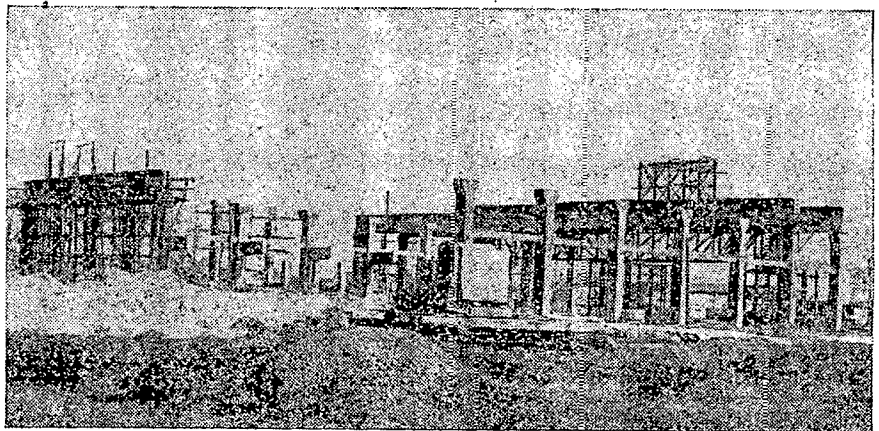
মোটকথা মালদহের আম ও আম্রজাত দ্রব্যের ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে এবং এই দ্রব্যগুলি দেশ-বিদেশে প্রেরণের সুব্যবস্থা হলে এই ব্যবসা হতে প্রচুর অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হতে পারে। একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় আম বিদেশে রপ্তানি করে ১৯৫৭ সালে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার কিছু অধিক মূল্যের বিদেশী মদ্রা অর্জন করা হয়েছে এবং ১৯৫৮ সালে মালয় বাহেরিন, সিংগাপুর, সৌদি আরব, ইংল্যান্ড, এডেন, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ২৭টি দেশে ভারতীয় আম রপ্তানি করে পাওয়া গেছে ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী মদ্রা। এসকল ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ-উন্নয়ন

ভারত-সরকারের 'পাবলিক
অ্যাকাউন্টস কমিটি'র সভাপতি
ও কংগ্রেস সদস্য সম্প্রতি
পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন-পরিকল্পনা-
কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।
তখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের
হরিণঘাটা দুগ্ধ-কেন্দ্রও পরিদর্শন



করেন। [উপরে] তাঁরা হরিণঘাটা কেন্দ্রে
দুধ বস্ত্রসাহায্যে শোধন করা ও বোতলে ভর্তি
করা দেখেছেন। পাশের চিত্রে তাঁদের দেখা
যাচ্ছে হরিণঘাটা দুগ্ধ-উপনিবেশে। বেল-
গাছিয়াম পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে দুগ্ধ-শোধন
সংস্থা নির্মিত হচ্ছে [নিচে] তাও তাঁরা
পরিদর্শন করেন।



আমার চাষীজীবনের

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বনাথ চৌধুরী

ভারত স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট; কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেল দুই ভাগে: ভারত যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তান। আমাদের বাড়ি ছিল উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায়। সেটা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সালের পূর্বপূর্বদশের বাস্তবীভূত ছেড়ে আমাদের পরিবার চলে এল পশ্চিমবঙ্গে।

এখানে এসে খুঁজতে লাগলাম মাথা গুঁজবার জন্য একটু জায়গা এবং সেইসঙ্গে চাষ-আবাদ করবার মত কিছু জমি। আমি চাকরিও করি, কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সংসার শূদ্ধ নির্ধারিত মাসিক বেতনের দ্বারা কোনমতেই চলতে পারে না। চাষ-আবাদ করে ফসল ফলাতে হবে অন্তের জন্য।

আমার মেজদাদা আমাদের পরিবারের কর্তা। তিনি নদিয়া জেলার বাদকুল্লাতে নতুন কলোনির সন্ধান পেয়ে সেখানে গেলেন। নতুন জায়গাটির নাম 'সুদর্ভস্থান'। জায়গাটি তাঁর পছন্দ হওয়ায় আমরা সেখানে প্রথমে দুই বিঘা জমি কিনলাম এবং একটা বাড়িও করলাম। বসতবাড়ির সংলগ্ন বেশ খানিকটা জমি। এখানে তখন জমির দামও বেশ। আমরা আমাদের বাড়ির লাগোয়া আরও বিঘা চারেক জমি কিনলাম এবং এদিকে-ওদিকে ধানী জমির সন্ধান করতে লাগলাম। এক বছরের মধ্যেই আমরা বেশ খানিকটা ধানী জমি সংগ্রহ করে নিজেরাই চাষ-আবাদ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এতদিন পর আমার অন্তরের সুপ্ত কামনা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলল। কিন্তু যখন জনবসতি-বিরল গাছপালাহীন শূন্য বালুমাটির রুদ্ধ চোহারার দিকে আশা নিয়ে তাকাতাম, তখন নিরাশায় মন যেন ভেঙে পড়তে চাইত। স্থানীয়

চাষীদের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাঁরা চাষে সাবেকী রীতিকেই আঁকড়ে ধরে আছেন এবং আধুনিক রীতির প্রতি একেবারেই উদাসীন। তাঁদের চাষের ফল দেখে নিরুৎসাহ বোধ করলাম। তারপর, সেখানে কৃষিকার্যে জলসেচন করবার জন্য কোন বন্দোবস্তই নেই। একমাত্র ভরসা আকাশের জল। তাও সময়মত হয় না।

আমার মেজদাদা ও ছোটভাইএর প্রেরণা আমাকে দমতে দিল না। এই 'সুদর্ভস্থান'এর যিনি পত্তন করেছেন এবং যিনি এই নবপল্লীর প্রধান পরিচালক, সেই খ্যাতনামা অধ্যাপক মহাশয়ের কাছেও কৃষি-বিষয়ে বহু উপদেশ পেলাম। আগে এই জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ঢাকা—হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি। এই অরণ্যে তিনি এবং তাঁর কর্মীরা দিনের পর দিন ধরে গভীর জঙ্গল কেটে এই বিস্তীর্ণ স্থানটি মানুষের বাসের উপযোগী করেছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের এক প্রচুর-পর্যাবনী গাভীর নাম অনুসারেই নাকি এই নতুন কলোনির নাম হয়েছে সুদর্ভস্থান। এখানে এসে দেখলাম, জমি থাকলেই ফসল পাওয়া যায় না। চাষের কাজে জমির মালিককেও পরিশ্রম করতে হবে। তার বাড়িতে বলদ, লাঙল এবং চাষের যাবতীয় সরঞ্জাম রাখতে হবে।

আমি দুইটি লাঙল এবং অতি অল্প মূলধন নিয়ে বৈজ্ঞানিক অতি সাধারণ পদ্ধতিতেই এই চাষ-আবাদ শুরু করলাম। আমাদের বসতবাড়ির চারিদিকের সীমানায় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ও পেয়ারার গাছ লাগিয়ে—কচা, সজনে ও মাদারের বেড়াকে মজবুত করেছি। মাঝখানকার জমিটা সবজিচাষের জন্য তৈরি করেছি। এই জমিটাকে

সরস ও উর্বর করতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এর জন্য বেশ কিছু অর্থও লেগেছে। তার ফলস্বরূপ আমি এখন প্রচুর ফসল তুলতে সমর্থ হচ্ছি প্রতি বছর।

আমি প্রথমে চৈতালী ফসল নিয়ে চাষ শুরু করলাম। সাধারণ পদ্ধতিতে এই চাষ করি। কোনরকম সতেজ সার বা ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত বীজ আমি জমিতে দিতে পারি নি। উপরন্তু জমির মধ্যে যেসমস্ত আগাছা ছিল সেগুলোরও উচ্ছেদ করি নি। তার ফল পেলাম ফসল উঠার পর তাদের পরিমাণে। ডাল শস্যটি এতই নিম্ন-স্তরের হ'ল যে, তাতে আমি ভয়ানক দমে যাই। ছোলা, মটর, মসুরি, মূগ, আড়হর ও কলাইএর চাষে যা মূলধন খাটিয়েছিলাম, তাতে আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় আমার ক্ষতির অঙ্কটা স্পষ্টরূপেই দেখা দিল। তখন অধ্যাপকমশাই আমাকে কৃষি-সম্বন্ধীয় বই পড়তে বললেন। আমি চাষের বই কয়েকখানি কিনি ও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'বসুন্ধরা'র গ্রাহকও হই। নিজেও ভাল ফলনের জন্য চিন্তা শুরু করলাম এবং ফুলিয়া ব্লকের কৃষি-বিশেষজ্ঞের নিকট গিয়ে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ নিতে লাগলাম।

আউশ ধান চাষের সময় এল। জমিকে ভালভাবে তৈরি করে বীজ ছড়ালাম। চারাও বেশ সতেজ হয়ে দেখা দিল। কিন্তু এসমস্ত চারার মধ্যে ঘাসের লক্ষ লক্ষ চারাও গজাল আমাকে প্রতারণা করবার জন্য। এইসব ঘাস উচ্ছেদ করবার জন্য মজদুর লাগলাম। স্থানীয় কৃষকদের কথামত জমিতে বিদাও দিলাম। কিন্তু জমির ঘাস উচ্ছেদ করতে-না-করতেই নতুন ঘাস মাথা তুলতে শুরু করল। ঘাসের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। শেষে যখন আউশ ধান কাটার পর ফসল ওজন করলাম, তখন দেখি বিঘাপ্রতি গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন মণ ধান উঠেছে। আমাকে ভয়ানক লোকসান গড়তে হ'ল। কিন্তু এই লোকসান আমাকে চাষ-আবাদের নতুন পথের সন্ধান দিল।

বুঝতে পারলাম, আমরা চাষ-আবাদের ব্যাপারে অজ্ঞ ব'লেই আমাদের ফসলের মান এত নিচে নেমেছে। আর আমাদের অজ্ঞতাই হ'ল আমাদের অন্নাভাবের মূল কারণ।

এবার আউশ ধান উঠবার পরই উত্তমরূপে জমিটা চাষ করলাম। বিঘাপ্রতি চার গাড়ি গোবরসার বেশ ভালভাবে জমির চষা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। কচুরিপানা পচিয়ে সার আগে তৈরি করে রেখেছিলাম—তাও জমিতে দিলাম এবং বৈশাখ মাসে অজনা নদীর তলদেশ হ'তে পলিপড়া পচা মাটি পূর্বেই তুলে রাখি, তাও বিঘাপ্রতি দুই গাড়ি করে দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করে ফেললাম। তারপর সেই জমিতে ভাগে ভাগে কলাই ও ছোলার বীজ ছিটিয়ে দিলাম। এবার প্রত্যেকটি ডালের বীজ উৎকৃষ্ট। আর সেই জমির একটা অংশ ছিল ফাঁকা অবস্থায়। সেটাও তৈরি করে তাতে শীতের সবজি লাগলাম। মুলো, কপি, পেঁয়াজ, পালঙ, শালগমের একটা সুন্দর সবুজ ক্ষেতের সৃষ্টি হ'ল। এইসমস্ত তো করলাম কিন্তু এই ফসলের চারাগুলোকে বাঁচাবার জন্য চাই জল। সামান্য জলে তো চাষ চলে না। মহা চিন্তার বিষয়। এখানে জলের কষ্ট একটা ভয়ানক কষ্ট। অনেক আলোচনার পর ঠিক করি—একটা নলকূপ বসাব। তাই বসালাম। জমিতে জল সেচনের জন্য অনেকগুলো ছোট-বড় নালা করলাম।

এবার আমার ক্ষেতে এত প্রচুরপরিমাণে তাজা শীত-সবজির ফসল হ'ল যে, দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা অবাক হয়ে গেলেন। অনেকে আমার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে গেলেন। সবচেয়ে তাজব ব্যাপার, ছোলা যখন তার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দানা বেঁধে দেখা দিল, প্রতিটি শব্দটিতে আমার তিনটি করে ছোলা ধরেছে। এখানে ছোলার এত ভাল ফলন কেউ দেখে নি। অধ্যাপক মহাশয় বললেন, জমিতে আমি যে গোবরসার, কচুরিপানার পচাসার ও নদীর পলিপড়া পচামাটি ছিড়িয়েছিলাম, তারই ফলে এমন সুন্দর

ফসলের আবির্ভাব। যখন চৈতালী খন্দ আমার খামারে উঠল, তখন আমি মনে মনে এক অভূত-পূর্ব আনন্দ উপভোগ করলাম। কিন্তু আরও ভাল ফসল ফলাতে হবে আমাকে।

এবার আউশ ধান চাষের সময় গোবরসার এবং আমার গোয়ালঘরের জমা-করা গোমূত্র সহ আবর্জনা ক্ষেতে দিলাম। আমাদের বাড়ির নিচে দিয়ে গেছে নদী অঞ্জনা। নদীটি এককালে ছিল স্রোতস্বিনী। এখন তার মৃত অবস্থা। শুধু তাই নয়, একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া আর সব সময় এর বৃকে জলের চিহ্ন থাকে না। থাকে শুধু দলে দলে কচুরিপানা। আমি এখন এই পানাগুলোকে পচিয়ে সার করছি। আমি নদীর পলিপড়া পচাসারবহুল মাটিও গাড়ি করে এনে এই জমিতে দিলাম মিশিয়ে। তারপর ৬-৭ বার জমিতে উত্তমরূপে লাঙল ও মই দিলাম। আগের বার আমি আউশ ধানের বীজ আলোবাতাস-পূর্ণ গোলার মধ্যে যত্ন করে রেখেছিলাম। এবারে সেই বীজ ছড়ালাম। বীজের চারার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ঘাস। সময় থাকতেই বিদা এবং মজুর লাগিয়ে ঘাসগুলো উচ্ছেদ করি। চারাগুলোকে সতেজ করবার জন্য আলোবাতাস খেলার বন্দোবস্ত করলাম। একটু বর্ষা হ'লেই আমি জমিতে ছিড়িয়ে দিলাম সরকারী মিশ্রসার। এতে গাছগুলো এত

বলিষ্ঠ হয়ে উঠল যে, দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আশ্বিন মাসে ধান কাটা হ'লে দেখলাম আমার ফসল আগের পরিমাণের চতুর্গুণ হয়েছে। এইভাবেই আমি আমার চাষের গোড়াপত্তন করি।

অন্যান্য উন্নত দেশের চাষীরা আমাদের তুলনায় বিঘাপ্রতি আরও বেশি ফসল ফলান। আমিও তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হব—এইরকম মনোবল নিয়ে কৃষি সম্বন্ধে নিজেই নানা বই নিয়ে, কৃষিবিদদের পরামর্শ নিয়ে, বৃন্দ কৃষকদের কাছে মাটি ও জলের গুণাগুণ সম্বন্ধে উপদেশ নিয়ে, গবেষণা শুরু করলাম। এখনও আমার সেই গবেষণা সমান উদ্যমে চলছে। আজ ভারতবর্ষে অনাভাব এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে গেলেই চাই প্রচুর অর্থ। দেশের অর্থ আমাদের দেশেই রাখতে হবে। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংপূর্ণ হ'তে হবে। আমি আমার সামান্য জমিতে যে ফসল ফলাই তাতেই ভগবানের আশীর্বাদে আমার অন্তকণ্ঠ বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। দেশের যাঁরা কৃষিকার্ষে লিপ্ত আছেন এবং যাঁরা কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারেন—সকলে মিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি সাধন করে আমাদের কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়ে তুলুন—খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের পর-নির্ভরতার অবসান করুন।

পাঞ্জাবী কৃষকের কৃতিত্ব

পাঞ্জাবের রোটক জেলার পাঁচি গদুজরান গ্রামের সর্দার কেশর সিং নামে এক কৃষক গম উৎপাদনে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা বিস্ময়কর। সর্দার কেশর সিং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পৈতৃক জমি-জমা ফেলে এসেছেন। তাঁকে পাঁচি গদুজরান গ্রামে এক প্রস্তুত ২৭ একর জমি আবাদ করতে দেওয়া হয়। এই জমিটা বহুদিন অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল। ১৯৫০ সালে সর্দার কেশর সিং অতি কষ্টে মাত্র এক মণ দশ সের গম উৎপাদনে সমর্থ হন। তাতে তাঁর উৎসাহ দমে নি। তিনি সরকারের মৃত্তিকা-সম্পর্কিত রাসায়নবিদকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে বলেন যে, মাটি জোরালো নয়, এতে নিয়মিতভাবে জল, জৈব সার, রাসায়নিক সার ও সবুজসার দেওয়া দরকার।

সর্দার কেশর সিং কৃষি-সম্পর্কিত নানা বইপত্র পড়ে এবং কৃষিবিভাগীয় অফিসার ও কৃষিবেশেষজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করে একটা কর্মসূচি স্থির করেন। তিনি প্রতি একর জমিতে এক মণ করে সুপার-ফসফেট প্রয়োগ করেন। তারপর তাতে গুয়ারা-বীজ বপন করেন। এর গাছ ৩-৪ ফুট বড় হলে তিনি সেগুলা উপড়ে ফেলে ঐ মাটিতেই জাপা দেন। তারপর তাতে তিন-চারবার লাঙল দেন এবং সেচ দেন। তিনি জমিতে প্রতি একরে এক মণ করে সুপারফসফেট ও অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করেন। তারপর তিনি তাতে গম বুনেন। পরে প্রয়োজনমত জল দেন এবং নিড়েন দিয়ে ঘাস তুলে ফেলেন।

এইভাবে আবাদের ফলে সেই জমিতে বৎসরের পর বৎসর ফসল বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাত বৎসর পরে প্রতি একরে ফসলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২ মণ ২২ সের।

কেশর সিং ঐ জমি থেকে ১৩ একর পৃথক করে তাতে ফলের গাছ বসিয়েছেন। ৫০০টি পেয়ারাগাছ বসানো হয়েছে। প্রায় ২০০টি গাছে পেয়ারা ফলেছে।

চাষ-আবাদের মত হাঁস-মুরগি পালনের দিকেও কেশর সিং-এর খুব ঝোঁক। তাঁর একটি মোরগ গত বৎসর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গবাদি প্রদর্শনীতে প্রথম পদস্কার পায়। কেশর সিং তাঁর জমিতে পুকুর কাটিয়ে মাছ-চাষেরও ব্যবস্থা করেছেন।

সর্দার কেশর সিংএর জমিতে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হ'ল তার চারদিকের ২,৬০০ ফুট গোলাপ গাছের বেড়া। বেড়ার ভিতর গোলাপ গাছের সঙ্গে অন্যান্য রকমেরও ফুলের গাছ রয়েছে। দূর থেকে বেড়াটি দেখতে ফুলকাড়ি শালের পাড়ের মত। কেশর সিং-এর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেও গোলাপ গাছের বেড়া করেছেন।

কেশর সিংএর জমিতে গোলাপ গাছের বেড়া যেমন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, তেমনি তা দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মত হয়েছে। কেশর সিং ফুলগুদালি থেকে গন্ধ বের করে নেওয়ার চেষ্টায় আছেন। মনে হয় শীঘ্র পাঁচি গজরান গ্রামটি গোলাপ-নির্ঘাস উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

ডুমুরদহ পদ্মজলা জলনিকাশী পরিকল্পনা

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গোপাল-
পুর মৌজার অনেকটা জুড়ে এক বিরাট পদ্মজলার
সৃষ্টি-হয়েছিল জলনিকাশের অভাবে। এর পরিধি
ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল।

পুরানো দিনের যে দু' মাইল লম্বা নালা ছিল
জলনিকাশের জন্য, সেটা হেজে-ম'জে যায় বছর
পাঁচিশ আগেই এবং ফলে প্রায় হাজার বিঘে জমি
চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

বছর তিনেক আগে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় এর
উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, খরচ
১০,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে কাজটা
স্বর্গিত রয়ে গেল।

১৯৫৮ সালের ৮ই মে কাজ শুরু হ'ল এবং শেষ
হ'ল ৩০এ জুন। মোট খরচ হ'ল নগদ টাকা ইত্যাদি
মিলিয়ে ৩,৩৬০ টাকা। ৪ হাজার লোকের কঠোর
শ্রমে ২,২৪,৭০৫ ঘনফুট মাটি কাটা হ'ল—যার
ফলে ৪০০ ঘর লোকের অন্তর সংস্থান হ'ল
১,০০০ বিঘে জমি পুনরুদ্ধার করতে পারায়।
পদ্মজলার অতিরিক্ত জল এসে পড়ল কুন্তী নদীতে।

প্রায় ৮,০০০ মণ অতিরিক্ত আমন ধান ফলাবার
সুযোগ এসে গেল। যাদের খয়রাতি ছাড়া উপায়
ছিল না, তারা উৎসাহে ধান কেটে ঘরে তুলল।

এইভাবে সবার মিলিত প্রচেষ্টায়ই আমরা আরও
প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারব। নিত্যানন্দপুর
আমাদের পথ দেখিয়েছে।



জলনিকাশী খাল দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে

স্থানীয় উৎসাহী কৃষি-কর্মচারীরা আশা ছাড়লেন
না। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেন স্থানীয় ব্রক
উন্নয়ন আধিকারিক এবং সবার উৎসাহে উৎসাহিত
হয়ে গ্রাম আধিকারিক সাধারণ খয়রাতের খাত থেকে
এই কাজটা করার ব্যবস্থা করলেন ১৯৫৮ সালে।

কালনা-কাটোয়া লাইনে ব্যান্ডেল ছেড়ে ৮ মাইল
গেলে নিত্যানন্দপুর হল্ট স্টেশন; কালনা রোড
দিয়ে মোটরেও যাওয়া যায়। বারাদিকে আধ-মাইল
গিয়ে দক্ষিণ গোপালপুর গ্রাম, সেখান থেকে কুন্তী
নদী পার হয়ে দেড় মাইল গেলে এই পদ্মজলা।

কুমড়োর লাল পোকা নিয়ন্ত্রণ

কুমড়োর লাল পোকা শুধু যে কুমড়োরই ক্ষতি করে তা নয়, কাঁকড়, শশা এবং এই জাতীয় অন্যান্য গাছেরও সমৃদ্ধ ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথমে, কোন কোন সময় তার আগেই, পরিণত বয়সের পোকাগুলি চারাগাছ খেতে আরম্ভ করে। এদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হ'তে এরা ছোট চারাগাছের খুব ক্ষতি করে। বড় পোকাগুলি বেশি সংখ্যায় চারা-গাছে আক্রমণ চালালে গাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

স্ট্রী-পোকারা সাধারণত মিলনের এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। গাছের গোড়ার চারপাশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, ফাটলে অথবা গাছের তলার ছায়াতে ছোট ছোট মাটির ঢেলার নিচে রাত্রিতে ডিম পাড়ে। নতুন-পাড়া ডিমগুলোর রঙ প্রথমে হয় হলদে, কিন্তু ক্রমে তা কমলা রঙে পরিণত হয়। আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে ছয় হ'তে পনের দিনে ডিম ফুটে যায়। সদ্য ডিমফোটা বাচ্চাগুলো অত্যন্ত সক্রিয় হয় এবং সোজাসুজি গাছের শিকড় ফুটো ক'রে ভিতরে চলে যায়। ফলন্ত গাছের যে ফলগুলো মাটিতে লেগে থাকে, ছোট বাচ্চাগুলি সেসব ফল নষ্ট করে। এই ছোট বাচ্চা অবস্থাটা মোটামুটি তেইশ দিন পর্যন্ত থাকে। সম্পূর্ণ পেট ভরে গেলে ছোট বাচ্চাগুলি গাছ ছেড়ে মাটিতে চলে আসে; সময় সময় মাটির মধ্যে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত নিচে চলে যায়। সেখানে পোকাগুলি নিজেদের রক্ষা করার জন্য জল-নিরোধক রেশমের গুটি তৈরি ক'রে, পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে। তারপর আবহাওয়া অনুযায়ী সাত থেকে সতেরো দিন পরে পূর্ণ কীট বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এক মাসের মত বেঁচে থাকে।

মার্চ মাসে এদের প্রাদুর্ভাব হ'লেও, এরা প্রায় ছয় মাস আক্রমণ চালায়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় এরা

গাছের শূকনো ছোট ডালে বা পাতায় অথবা অন্যান্য গাছ-গাছড়ায় জড়ভাবে শীতকালটা কাটায়। মার্চ মাস না আসা পর্যন্ত এভাবে থাকে। মার্চ মাসে পোকাগুলির এই বাইরে বের হয়ে আসাটা মারাত্মক; এ ছাড়া তখন তারা ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধিও করে। তাই তার আগেই এই আপদগুলিকে দমন ও ধ্বংস করার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত শূকনো লতা, ঘাস, আবর্জনা ও অন্যান্য ছোট গুল্ম অথবা ঝোপঝাড়—যেগুলো তাদের আশ্রয়স্থল ছিল, সেগুলো একত্র ক'রে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। শীতের প্রারম্ভে যখন পোকাগুলি বাইরে আসে, তখন সেগুলিকে সংগ্রহ করা যায়। কারণ তারা তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।

কীট ধ্বংসের উপায়

এক পাউন্ড 'প্যারিস গ্রীন' আট পাউন্ড ছাই অথবা মিহি বালির সঙ্গে মিশিয়ে গাছে ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এক ভাগ লেড আর্সেনেট তিরিশ ভাগ ছাই অথবা মিহি বালির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। প্যারিস গ্রীন অথবা লেড আর্সেনেট খুব ভোরে গাছে দেওয়া উচিত। তবুও যদি পোকা-গুলি গাছের ক্ষতি করতে থাকে তবে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ক'রে উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। পোকার ছানাগুলি বা গুটিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার আর অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় নেই—একমাত্র বসন্তকালীন ফসল উঠে গেলে শস্যক্ষেত্র খুব ভাল ক'রে চাষ ক'রে ফেলা ছাড়া। চাষ করার সময় কোমলদেহ ছোট পোকাগুলো সূর্যের তাপে মরে যায় অথবা পাখিতে তাদের খেয়ে ফেলে। শূককীট বা গুটিগুলি ধ্বংস করার জন্য যদি ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি ব্যবহার করতে হয় তবে খুব সামান্য পরিমাণে এবং সাবধানে করা উচিত। নতুবা এই কীটনাশক ওষুধে কুমড়া, শশা, কাঁকড় প্রভৃতির অতি সহজে ক্ষতি হ'তে পারে।

স্বাবলম্বনে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি

শ্রী এম এস শিবরামন

পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা

আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বিরাট। এই লোক-সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় দুই-শতাংশ হারে বাড়ছে। বর্তমানে জমিতে কম শস্য উৎপন্ন হয়। এদেশের লোকের খুব সামান্য পুষ্টির প্রয়োজন মেটাবার জন্যও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। লাভজনক চাষ-আবাদের জমিও বেশি নেই। লাভজনক সকল আবাদী জমিতেই চাষ চলছে। আবাদ সম্প্রসারণের আর সুযোগ নেই বললেই চলে। কৃষি-বিজ্ঞানীরা বলেছেনঃ ভারতের জমি এমন একটা অবস্থায় এসেছে যেখানে শস্যোৎপাদন কম হওয়ার কথা।

পঁচিশ বছরের মধ্যে এদেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ যাতে দ্বিগুণ হয় সেই উদ্দেশ্যে এদেশের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি। এক্ষেত্রে শব্দ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, দ্রুত শিল্পায়নের জন্যও কৃষিকার্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

কৃষিকার্যের কতকগুলি মূল বিষয়ের দিকে উপযুক্ত দৃষ্টিপাত না করার ফলে চাষ-আবাদের অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম উপেক্ষা করা চলে না। প্রকৃতির নিয়মই বলে দিচ্ছে যে, যদি ঠিকমত শস্য উৎপাদন করতে হয় তবে গাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার দিতে হবে এবং এই সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড ও পটাশ। আমাদের দেশের জমিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশ আছে। জমিতে ফসফেটও পাওয়া যায়। কয়েকটা জায়গায় ফসফেটের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কিন্তু দেশের সকল স্থানেই জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। জমিতে জৈব পদার্থের অভাব আছে। গাছপালা পচে জৈব সার উৎপন্ন নয়। মাটিতে জৈব পদার্থ

থাকলে তাতে যথেষ্ট রস থাকার সুবিধা হয় এবং গ্রীষ্মকালে গাছের উপকার হয়। গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন বিক্ষিপ্ত হয় এবং জৈব পদার্থ অক্সিজেনযুক্ত হয়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে নাইট্রোজেন একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান। শস্যোৎপাদন মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

বর্তমানে প্রধান প্রধান শস্য মাটি থেকে বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন টেনে নেয়। আমরা মাটিতে সার ও রাসায়নিক সার দিয়ে যে নাইট্রোজেন সরবরাহ করি তা এর এক-চতুর্থাংশেরও কম। পাহাড়-পর্বত ও পতিত জমি ধোয়া জল, গাছ-গাছড়া ও জীবজন্তু পচা প্রভৃতি দ্বারা বাকি নাইট্রোজেনের পূরণ হয়। এইভাবে একটা নিম্ন পরিমাণ নাইট্রোজেন মাটিতে থাকে। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সরবরাহ না করলে জমি বা চাষের উন্নতি হয় না। যদি আমরা কোন উপায়ে মাটিতে অধিক নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারি তা হ'লে উৎপাদনের হার বাড়বে। যাতে সমস্ত কৃষক নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে পারে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বেশির ভাগ কৃষকের জীবন-ধারণের মান নিম্ন। কাজেই এই উদ্দেশ্যে তাদের অধিক অর্থ নিয়োগ করতে বলা নিরর্থক। যদি কৃষকেরা কোন প্রকারে চাষ ব্যাহত না করে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন উৎপাদন করতে পারেন, তবে আমরা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাব। মাদ্রাজে পরীক্ষাকার্য চালনার ফলে জানা গিয়েছে যে, সেচন-সেবিত বা বৃষ্টির জলে পূর্ণ জমিতে সকলে অবলম্বন করতে পারে এমন উপায়ে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আবাদী অঞ্চলে নাইট্রোজেন পাওয়ার প্রধান উৎস হ'ল খামারের গোবর। জালানি হিসাবে প্রচুর গোবর পুড়িয়ে ফেলা হয়। পচা গাছপালা লতাপাতা থেকেও বেশ কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। বেশির ভাগ শস্য কাটার সময় মূল ছাড়া আর কিছু বাকি রাখা হয় না। কারণ পাতা ও ডাঁটা গোরু-মহিষে খায়। যদি একেজো গাছ-পালা পাওয়া যায় তবে সেগুন্টি থেকে পচাসার তৈরি করা যেতে পারে।

আবাদী জমিতে সেচের জলে বা বৃষ্টির জলে চাষ হয়। সেচন-সেবিত জমিতে সার দেওয়া সহজ। প্রধান শস্য উৎপাদনের পূর্বে শন, ধপে প্রভৃতির গাছ করে এবং সেগুন্টি সেই জমিতে পচিয়ে ভাল সার পাওয়া যেতে পারে। এভাবে ৪ থেকে ৮ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত সবুজসার প্রয়োগ করলে নাইট্রোজেনের পুরোপুরি প্রয়োজন মেটানো যায় এবং শস্যোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ভারতে গড় ধান্যোৎপাদনের পরিমাণ ১,১০০ পাউন্ড। জমিতে সবুজসার প্রয়োগ করে ৩-৫ বৎসরের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ ২ হাজার পাউন্ড করা যায়।

১৯৫২ সালে আমি মাদ্রাজে কৃষি-অধিকর্তা থাকার সময় এক এক আনা মূল্যের ৪ আউন্স ওজনের শেষবানিয়া প্যাকেট বণ্টনের ব্যবস্থা করি। পূর্ববর্তী বছরে এইসব গাছ সরকারী গবেষণাক্ষেত্রে জন্মানো হয় এবং কৃষকগণ যাতে এই গাছের সারবস্তা বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন এলাকায় বিশিষ্ট কৃষকদের জমিতেও এই গাছ জন্মানো হয়। এই গাছের উপকারিতা হাটে-বাজারে, মেলায়

প্রচার করা হয়। স্কুলে, অফিসে, রেলওয়ে লাইনে, সড়কের ধারে গাছ জন্মানো হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে এই গাছের উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ নানাভাবে প্রচারণা চালানো হয়। সবুজসার প্রয়োগের ফলে আদু-থুরাই কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৭ হাজার পাউন্ড থেকে বেড়ে ১৯৫২-৫৩ সালে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড হয়।

মাদ্রাজে যে সফল পাওয়া গেছে, তা অন্যান্য রাজ্যেও পাওয়া যেতে পারে। উড়িষ্যা, পশ্চিম বাঙলা, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৫৭-৫৮ সালে সবুজসার উৎপাদন করা হয় ৫০ হাজার একর জমিতে। কিন্তু ধানী জমির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি একরের বেশি। ১৯৫৭ সালে উড়িষ্যা সবুজসার উৎপাদন করা হয় ১০ হাজার একরে। এখানে ১৯৫৭ সালে ২ আউন্স ওজনের ৬ লক্ষ প্যাকেট ধপেবীজ বিতরণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে ধপে আবাদের পরিমাণ বেড়ে এক লক্ষ একর হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৫৯ সালে ২০ লক্ষ একর জমিতে সবুজসার দেওয়া যাবে। কেউ সবুজসার উৎপাদন করতে চাইলে বীজ সরবরাহ করার অসুবিধা হবে না।

প্রত্যেক কৃষক সচেত হ'লে জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। এতে বিশেষ অর্থ-ব্যয় হয় না। দেশের এক অঞ্চলে যদি সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে অন্য অঞ্চলেও সেই সমস্যার সমাধান করা যাবে না কেন?



পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ

আবাসনগণ গোশ্বামী

সমবায় কৃষি-সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক

[দুই]

বিদেশের সমবায় চাষ

বিদেশের অনেক জায়গায় যেমন সোভিয়েট রাশিয়া, ইজরায়েল, মেক্সিকো, ইটালি, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, চীনে সমবায় চাষের বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলন হয়েছে ও হচ্ছে। প্রত্যেক দেশ নিজের অবস্থা অনুযায়ী ও পরিবেশের উপযোগী করে সমবায় চাষ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি দেশের সমবায় চাষের আলোচনা করা গেল।

সোভিয়েট রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়ায় জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা সমূলে লোপ করা হয়েছে। সমস্ত জমির মালিক জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ দেশের সরকার। ফলে সারা দেশ জুড়ে আগেকার সনাতন ধারার একক চাষের বদলে সমবায় চাষের প্রবর্তন হয়েছে। গোটা দেশের সারা প্রান্তে বিরাট আকারের সব সমবায় খামার তৈরি করা হয়েছে যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্‌খোজ' (Kolkhoz)। কৃষি-আইনের বিধান অনুযায়ী কল্‌খোজকে রেজিস্ট্রি করে আইন-সিদ্ধি দেওয়া হয়। কল্‌খোজকে পর্যাপ্ত জমি বরাদ্দ করে দেয় সরকার আর এই জমি শুধু চাষের কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বরাদ্দের দরুন জমির মূল্য হিসাবে সরকারকে কোনও টাকা দিতে হয় না। তারপরে পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্তসংখ্যক চাষী-পরিবারের বসতির ব্যবস্থা করা হয় এই কল্‌খোজের মধ্যে। প্রত্যেক পরিবারের বসতবাড়ির সংলগ্ন পাঁচ-সাত বিঘা আন্দাজ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় এবং এই জমিতে সেই পরিবার নিজেদের

ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সেই জমির উৎপন্ন ফসলের অধিকারী হতে পারে। কল্‌খোজের সভ্য হবার অধিকার আছে প্রত্যেক চাষী, তার স্ত্রী এবং তাদের সাবালক ছেলেমেয়েদের।

সমস্ত সভ্য সম্মিলিতভাবে কল্‌খোজের যৌথ সম্পত্তির মালিক, মালিকানার কথা তুললে এ কথাই বলা যায়। জমি ছাড়া সম্পত্তির মধ্যে আছে অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি, সভ্যদের প্রবেশ-ফি বা ভাতি হবার সময়ে সভ্যদের কল্‌খোজে জমা-করা পুঁজি। যৌথ খামারে চাষ হয় কল্‌খোজের কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। গোটা খামার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে কোনটায় গম, কোনটায় আলু, কোনটায় পশু-খাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। সমস্ত পরিবারের কৃষি-শ্রমিকদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দলের কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি যথা, ট্রাক্টর ইত্যাদি যোগায় সরকার-প্রতিষ্ঠিত 'মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন'। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য যেমন বীজ বোনা বা নিড়ানো বা ফসল কাটা, আলাদা আলাদা মূল্যমান নির্ধারিত থাকে এবং কোনও সভ্য সারা বছরে কতটা কাজ করল—এই মূল্যমানের কণ্টপাথরে তা যাচাই করা হয়। এই মূল্যমানের একটি একককে বলা হয় 'লেবার ডে' বা কর্ম-দিবস। কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী এমন হতে পারে যে, পাঁচ ঘণ্টা ফসল কাটার কাজ করলে তা একটি পুরো কর্ম-দিবসের সমান হবে, আবার তিন ঘণ্টা নিড়ানোর কাজ করলেও সেই পুরো একটি কর্ম-দিবস অর্জন করা যাবে। তা হ'লে যে লোকটা পনের ঘণ্টা (একদিনে না হ'লেও হতে পারে) নিড়ানোর কাজ

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

করল, সে পেল পাঁচটি শ্রম-দিবস আর যে-লোকটা পনের ঘণ্টা ফসল কাটার কাজ করল সে পেল তিনটি শ্রম-দিবস। অতি সতর্কভাবে এইসব মূল্যমান নির্ধারিত হয় এবং প্রত্যেক সভ্যের কাজের নিষ্পত্তি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সারা বছরে প্রত্যেকেই গড়পড়তায় প্রায় সমান সমান শ্রম-দিবস অর্জন করতে পারে এবং যাতে শ্রমের অপচয় না হয় আর ব্যক্তিগতভাবে কোনও সভ্যের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না হয়। গড়পড়তায় একজন পুরুষ-কর্মী বছরে রোজগার করে ২৫০ থেকে ৩০০ শ্রম-দিবস, নারী-কর্মী ১৫০ থেকে ১৮০ আর নাবালক ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ৬০। সাকুল্যে বছরে একটি চাষী-পরিবার অর্জন করে প্রায় ৫০০ শ্রম-দিবস।

ফসল ওঠার পরে প্রথমেই সরকারের খাজনা ও 'মেসিন ট্রাক্টর স্টেশনের' প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে হয় আর সরকার-নির্ধারিত মূল্যে ফসলের একাংশ সরকারকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তারপরে পুরণ করা হয়-বীজ-ভান্ডার আর পশু-খাদ্যের ভান্ডার, শোধ করা হয় বীমার টাকা। উল্লেখ্য যা থাকে বাৎসরিক সাধারণ সভার বিধান অনুযায়ী তা বণ্টন করা হয় সভ্যদের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের অর্জিত শ্রম-দিবসের সংখ্যার ভিত্তিতে। হয়তো একটি শ্রম-দিবসের বদলে পাওয়া যায় ৩ কিলোগ্রাম গম বা ২ কিলোগ্রাম আলু বা ৪ কিলোগ্রাম ভুট্টা। এখন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবার তার অর্জিত শ্রম-দিবস ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে কল্‌থোজের ভান্ডার থেকে সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সংসার চালায়ে যায়। তা ছাড়া কিছু নগদ টাকাও তারা পায়। গোটা বছরে অর্জিত শ্রম-দিবসের বিনিময়ে বরাদ্দ জিনিস সব যদি কোনও পরিবার না আনতে চায়, তা হলে পুর্নজ হিসাবে এই উল্লেখ্য শ্রম-দিবস তাদের নামে জমা থাকে, ইচ্ছে করলে পরের বছরে তারা তার বিনিময়ে জিনিস নিতে পারে।

কল্‌থোজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সাধারণ সভার হাতে। বাৎসরিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত হন

কল্‌থোজের চেয়ারম্যান, ম্যানেজার-বোর্ডের সভ্যগণ এবং পরিদর্শক কর্মিটির সদস্যগণ। এই পরিদর্শক কর্মিটির কাজ হচ্ছে হিসাবপত্রের তত্ত্বাবধান করা। বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে আছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, খামারের সুপারভাইজারগণ, গুদামরক্ষক প্রভৃতি। চাষবাসের কাজের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন ম্যানেজার-বোর্ড। কল্‌থোজের চেয়ারম্যান পদাধিকার-বলে ম্যানেজার-বোর্ডেরও সভাপতি।

সমবায় খামারের প্রবর্তন হয়ে রাশিয়ায় কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রচুর পতিত জমি চাষের কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়েছে।

মেক্সিকো

মেক্সিকো দেশে সমবায় চাষের জন্য যে সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে তাকে ওরা বলে 'এহিদো' (ejido—উচ্চারণ 'এহিদো')। জমিদার ও জোতদারের অত্যাচার ও উৎপাতের হাত থেকে ভূমিহীন ও স্বল্পপবিত্র চাষীদের রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সাল থেকে এইসব এহিদোর সৃষ্টি। এহিদো-যুগের আগে মেক্সিকোর চাষ ও চাষীর অবস্থা এশিয়ার অন্যান্য অনগ্রসর দেশের মতই শোচনীয় ছিল। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন ছিল কৃষির উপরে নির্ভরশীল আর তার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল ভূমিহীন বা স্বল্পপবিত্র প্রজা-চাষী। ১৯৩৬ সনে আইন করে সাকুল্যে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্ডে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং ৩২,০০০ চাষীর মধ্যে বিতরণ করা হয় এই শর্তে যে, জমিপ্রাপক চাষীরা এহিদোর মাধ্যমে এইসব জমিতে সমবায় চাষের প্রবর্তন করবে।

এহিদো গঠনচ্ছেদ ন্যূনতম ২০ জন বয়স্ক পুরুষ-চাষী সম্মিলিতভাবে জমির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে। সরকার যে জমি যোগাড় করে এই দলকে বরাদ্দ করে দেয়, তাতে সকলের সমান অধিকার বর্তায় এবং সকলেই সমানভাবে এই জমি ব্যবহারের ও ফলের অধিকারী

হয়। এই জমিতে সভ্যেরা ইচ্ছা করলে যৌথ চাষের প্রবর্তন করতে পারে অথবা 'টেন্যান্ট ফার্মিং সোসাইটি'র মত প্রত্যেকে এক এক টুকরো জমি বরাদ্দ করে নিয়ে আলাদাভাবে চাষাবাস করতে পারে। পরিচালন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, তবে পরিচালন-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য সরকারী পরিদর্শন ও নিরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যেসব এহিদোর চাষ যৌথভাবে চলে, তারা সাহায্য পায় দুইটি প্রতিষ্ঠানের কাছে। প্রথমটি, 'ন্যাশনাল অ্যাগ্রিয়ারিয়ান কমিশন', এর কাজ হচ্ছে এহিদো-কলোনি স্থাপনে সহায়তা করা ; দ্বিতীয়, 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব এহিদো ক্রেডিট', এর কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। শব্দ তাই নয়, এই ব্যাংক অভিজ্ঞ কৃষি-কুশলীদের সাহায্যে যৌথচাষ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেয় এবং উৎপন্ন ফসল বিপণনের ভারও এর উপরে।

সভ্যের সভ্যপদ বজায় রাখার একমাত্র নিরিখ হচ্ছে তার শ্রম-দক্ষতা। যৌথ খামারে কাজের বিনিময়ে প্রত্যেককে ঘণ্টা-পিছদ মজুরি বা উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি এবং লাভের অংশ দেওয়া হয়। দক্ষতা অনুযায়ী মজুরির হারে তারতম্য আছে, কিন্তু লাভের অংশ বণ্টন করা হয় কে কত ঘণ্টা খেটেছে সরাসরি তার ভিত্তিতে, পারস্পরিক দক্ষতার চুলচেরা হিসাবের ভিত্তিতে নয়।

এহিদোর সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সাধারণ বা 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি'র হাতে। এই 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি' নির্বাচন করে কার্যনির্বাহক কমিটি আর পরিদর্শন কমিটির সদস্যদের। অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদাধিকারী, যেমন প্রধান কর্ম-সচিব প্রভৃতি, এরাও এই অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত হয়। সচিবের কাজ দায়িত্বপূর্ণ। প্রত্যেককে যথোপযুক্ত কাজ বরাদ্দ করা, যন্ত্রপাতি বা গবাদি পশুর তদারক করা এবং হিসাবপত্রের উপরে নজর রাখা এই সচিবের কাজ। দৈনন্দিন কাজের নিষ্পত্তি তাকেই রচনা করতে হয় এবং সপ্তাহান্তিক সভায় যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হয়।

এহিদোর মাধ্যমে সমবায় চাষের প্রবর্তনের ফলে এহিদোর সভ্যদের গড়পড়তা আয় প্রায় চারগুণ বেড়েছে। এদেরও বাড়ির সংলগ্ন জমির ফসলের অংশ ভোগ করার ও ব্যক্তিগতভাবে পশুপালনের সুযোগ আছে।

পরিচালন ব্যবস্থা দৃঢ় থাকায় দেশের সর্বত্র এহিদোগুলির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অনেক এহিদো ব্যাংকের দ্বারা শোধ করে দিয়েছে।

ইজরায়েল

১৯৪৮ সনে ইহুদী-রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হবার আগে সে-দেশের নাম ছিল প্যাเลสটাইন। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিক হ'তে ইউরোপ থেকে দলে দলে নির্যাতীত ইহুদীরা এসে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এদেশে সমবায় চাষের প্রবর্তন করে। পরিবেশ যে-রকম প্রচণ্ড প্রতিকূল ছিল তাতে সমবায় চাষ ভিন্ন উপায়ও ছিল না ; একক চাষের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ফলে, কিছুটা ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু অনেকটাই ঘটনার সংঘাতে সমবায় চাষ অভাবনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে ইজরায়েলে আর দিনে দিনে তা দৃঢ়মূল হয়ে ঘটিয়েছে চাষের অবিশ্বাস্য উন্নতি। ইজরায়েল শব্দ যে একটি নতুন রাষ্ট্র তা নয়, অতি ক্ষুদ্র তার আয়তন, বাঙলার গোটা দুই জেলার সমান মাত্র। প্রাকৃতিক সম্পদ তার পরিমিত আর দীর্ঘদিনের অবহেলায় চাষের জমির ফসল-ধারণ-ক্ষমতা অনেকটাই গেছে ক্ষয়ে। তার উপর দেশের দক্ষিণাংশে রয়েছে বালুকাস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের সুদীর্ঘ বিস্তার। তবুও দৃঢ় চেষ্টায় আর সংগঠন-শক্তি দিয়ে ইহুদীরা পদ্বিষয়ে নিয়েছে প্রকৃতির এই অকরুণ কার্পণ্য। যে জমিতে মানুষ দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন অবহেলার চিহ্ন রেখে গেছে, প্রভূত মমতা নিয়ে আবার সেই জমিতেই সমবায় চাষের প্রবর্তন করে জমির লালনপালনের ভার নিয়ে ইহুদীরা মাতা ধরিত্রীর ঋণ শোধের ব্যবস্থা করছে।

বিভিন্ন পরিবেশ ও মানুষের ভিন্নরুচি ও মনো-
বৃত্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য ইজরায়েলে
তিন ধরনের সমবায় চাষ প্রবর্তিত হয়েছে। নিচে
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

প্রথম পর্যায়ে পুরোপুরি যৌথ খামার। ওরা
এই খামারকে বলে কৃষিবৃত্ত (kibbutz)
বিদেশাগত ইহুদী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্য থেকে
অতিসতর্ক নির্বাচনে দলের পর দল গঠন করে
তাদের কৃষির প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে
তোলা হয়। সমবায় আইনে যৌথ খামার রেজিস্ট্রি
করে নিয়ে, জ্যুইশ ন্যাশনাল ফান্ড (একটি জাতীয়
প্রতিষ্ঠান) এই কৃষিবৃত্তকে ৪৯ বছরের মেয়াদে
নির্ধারিত পরিমাণ জমি ইজারা দিয়ে দেয়।
খামারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা যৌথ,
একক কোনও সভ্যের নয়, কিন্তু সম্মিলিতভাবে
সকল সভ্যের। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সমিতির
সভ্যশ্রেণীভুক্ত এবং প্রত্যেককেই দৈনিক ৮ কিংবা ৯
ঘণ্টা খাটতে হয় সমিতির কাজে। সমিতির কাজ
নানাভাবে বিভক্ত, চাষ-আবাদ ক্ষেত্রে খামারের কাজ,
ফলের বাগানের কাজ, গো-শালায়, মোরগ-শালায়,
পুকুরে মৎস্যচাষের, মক্ষিকাপালনের, সংলগ্ন শিল্প-
প্রতিষ্ঠানের, সম্মিলিত ভোজনশালায়, স্টোরের,
ক্লাবের, অফিসের, ধোবাখানার, ছোট ছেলেমেয়েদের
ক্রেসেতে (বাসভবন) ইত্যাদি সমিতির বিভিন্ন
বিভাগের কাজে পালা-অনুষারী এবং দক্ষতা ও
মনোবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ সভ্যকে
কাজে লাগানো হয়। প্রত্যেক বিভাগের ৮ কি ৯
ঘণ্টা কাজের মানমূল্য সমান। যে ফলের বাগানে
৮ ঘণ্টা পরিচর্যা কাজ করল তার দাম অপর
সভ্যের ভোজনশালায় ৮ ঘণ্টা পরিবেশন বা বাসন-
ধোয়ার কাজের সমতুল্য। কাজের বিনিময়ে কোনও
সভ্যকে মাসান্তে বা সপ্তাহান্তে নগদ মজুরি দেওয়া
হয় না।

কৃষিবৃত্তসের অভ্যন্তরে ছোট ছোট বাঙলো
ধরনের যে বাড়ির সারি তার প্রত্যেকটিতে থাকে
স্বামী ও স্ত্রী। তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

থাকে আলাদা ক্রেসেতে, বাপ-মার সঙ্গে নয়।
বৃন্দ পিতামাতা থাকেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট
আলাদা বাড়িতে। কারও বাড়িতে রান্নার পাট
নেই, শিশুপালনের কামেলা নেই। খাওয়াদাওয়া,
দুবেলার জলখাবার, সব সারা হয় সেই সাধারণ
ভোজনশালায়। প্রত্যেক কৃষিবৃত্তসে কিছু শিক্ষা-
নবিস ভবিষ্যৎ-সভ্য থাকে, কখনও বাইরের অতিথি-
দের ভিড় হয় আর থাকে সেনাদল থেকে আগত
কৃষি-শিক্ষানবিস কিছুসংখ্যক যুবক-যুবতী। কিন্তু
সকলেই যেন একটি বিরাট যৌথপরিবারের
অন্তর্ভুক্ত, সকলের খাওয়াদাওয়া চলছে সেই
ভোজনশালায়।

সরকার, কৃষি-ব্যাঙ্ক, জ্যুইশ এজেন্সি প্রভৃতি
মানা রকম প্রতিষ্ঠানের কাছে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী
ঋণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক খামারে বিদ্যুৎ ও
কলের জলের ব্যবস্থা আছে। কৃষির কাজ সবই
পরিচালিত হয় যন্ত্রের সাহায্যে। দৈনন্দিন
প্রয়োজনের ও চাষের আবশ্যক জিনিসপত্র যোগাড়
করে দেয় পাইকারি সমবায় সমিতি, আবার উৎপন্ন
ফসল বিপণনের ভার নিয়েছে অপর একটি
পাইকারি সমিতি। বছরের শেষে হিসাবনিকাশ
করে যা উদ্ভূত থাকে, তা ভাগ করে দেওয়া হয়
সভ্যদের মধ্যে, আর এই উৎপন্ন ফসলের আয় থেকে
কৃষিবৃত্তসের সাংবৎসরিক যাবতীয় ব্যয়নির্বাহ করা
হয়।

সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সাধারণ সভার হাতে।
সেখানে নির্বাচিত হন সভাপতি আর কার্যনির্বাহক
সমিতির সদস্যরা। একজন বেতনভুক্ত সচিব
আছেন দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্য। নানা
বিভাগের কাজের তদারকের জন্য নানা সময়ে
একাধিক সাব-কমিটি গঠন করে কাজ চালান হয়।

এখানে স্ত্রীপুরুষ কর্মীর সমান অধিকার ও
মর্যাদা। তবে সাধারণত লম্বা ধরনের কাজেই,
যেমন ভোজনশালা, ডাক্তারখানা, অফিস, স্কুল,
পাঠাগার, ক্লাব, শিশুদের ক্রেসে, স্টোর, ধোবাখানা
ইত্যাদির কাজে, মেয়েদের নিয়োগ করা হয়।

দেশের কৃষিব্যবস্থায় কৃষিবৃৎস একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। পুরাতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক বছর দেশে নতুন নতুন কৃষিবৃৎসের পত্তন হচ্ছে। সমবায় চাষের সর্বাঙ্গীণ রূপ প্রকটিত হয়েছে এক-একটি কৃষিবৃৎসে।

দ্বিতীয় পর্বায়ে 'মোশাভ শিট্‌ফি'। এমন অসংখ্য কৃষিকর্মী আছেন যাঁরা কৃষিবৃৎসের যৌথ মালিকানা ও কর্মপ্রণালী পছন্দ করেন কিন্তু ঘরে ছেলেমেয়ের সংগসুখবর্জিত হয়ে সাধারণ ভোজনালয়ে আহারবিহারে তাঁদের প্রবল আপত্তি। তাঁরা বলেন, পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা থাকবে না, তার সম্পূর্ণতা থাকবে না, এ আবার কেমন জীবন? বাইরে কাজকর্ম না হয় সবাই মিলে যৌথভাবে করা গেল, কিন্তু অখণ্ড পারিবারিক জীবন বজায় রাখতে হবে তো। এঁরা তাই মোশাভ শিট্‌ফি নামে অন্য ধরনের সমবায় কৃষি সমিতির সভ্যপ্রেরণীভূক্ত। সমিতির রেজিস্ট্রেশন, জমিপ্রাপ্তি, অর্থসংস্থান, যৌথ চাষ-আবাদ, খামার পরিচালনা, শেষে উৎপন্ন ফসলের বণ্টন ইত্যাদি বাবতীয় ব্যাপারে এই সমিতির সাদৃশ্য রয়েছে কৃষিবৃৎসের সঙ্গে। তফাত শুধু সভ্যদের পারিবারিক জীবনযাপন প্রণালীতে। ছেলেমেয়ে রা বড়ো বাপ-মা এখানে থাকেন একই বাড়িতে সমিতির সদস্য স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আর রান্নার ব্যবস্থাও বাড়িতেই। পারিবারিক জীবনে সভ্যরা আলাদা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গভাবে যুক্ত।

কিন্তু এর পরেও কোনও কোনও কৃষিকর্মীর মন উঠে না। তারা বলে, পারিবারিক জীবন আলাদা হোক খুব ভাল কথা, কিন্তু সমিতির সদস্য হয়ে যৌথ খামারে বা অন্যান্য বিভাগে মাত্র ৮ ঘণ্টা বা ৯ ঘণ্টা খেটেই খালাশ সেটা ভাল লাগছে না। অতএব সমিতির সদস্য ঠিকই থাকব, কিন্তু খামারটি আমার নিজের হোক, আমি এখানে ৮ এর জায়গায় ১৬ ঘণ্টা খেটে ফলন বাড়াব জমির। শ্রমকুশলতার চিহ্ন রাখব মাটির গায়ে। তাদের

জন্য আছে 'মোশাভ অভ্‌ডিম'—এও একটি রেজিস্ট্রি করা সমবায় কৃষি সমিতি। প্রত্যেক সভ্যের বাড়ির সংলগ্ন রয়েছে তার জমি, সেখানে সে চাষ করে গমের, আলুর, পশুখাদ্যের, ফলের, তরকারির। তার গোহালে ভাল জাতের গোরু আছে, মোরগশালায় ভাল জাতের মুরগি। যা কিছু কেনা দরকার, সব সে কেনে সমিতির ভান্ডার থেকে, আর তার উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের ভারও সমিতির হাতে। জমি পাওয়া গেছে ইজরায় জম্মাইশ ন্যাশনাল ফান্ডের কাছে, সমিতির সভ্য বলেই সে পেয়েছে জমি। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ডাক্তারখানা, পোস্ট অফিস, স্কুল, ক্লাব, স্টোর, কৃষিসম্পদের গুদামঘর, গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননশালা, ডেয়ারী, ইন-কুবেটর, যাবতীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমিতির হাতে। এখানেও আছে সাধারণ সভা, সাব-কমিটি, বেতনভুক কর্মচারী। বিজলী বাতি আর কলের জলের সুবিধা তো আছেই।

ইজরায়েলের কৃষির উন্নতিকল্পে এইসব মোশাভের অবদান যথেষ্ট। আর-একটি কথা উল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয়। ইজরায়েল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, শ্রম নিত্যপ্রচারিত বচনে বা গঠনতন্ত্রের অক্ষরে নয়, সত্যিকারের ব্যবহারিক জীবনে। ইহুদীরা তাই শ্রমের ক্ষেত্রে শোষণ ব্যাপারকে বরদাস্ত করে না। তাই মোশাভের সভ্যকে এমন পরিমাণ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় যতটুকু সে নিজের পরিবারের সহায়তায় সম্যকভাবে চাষ করতে পারে। কোনও ভাড়াটে মজদুরকে সে নিয়োগ করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক সভ্যকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় উদয়ান্ত আর খরচের সাশ্রয় সে করে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে। এমন অক্লান্ত পরিচর্যায় কৃষিলক্ষ্মী প্রসন্ন হবেন না তো কী?

চীন

আধুনিক চীনে সমবায় প্রথায় চাষের প্রবর্তন হয় সেখানে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনের পরে। কম্যুনিষ্ট

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

তন্ত্র স্থাপনকে ওরা বলে প্রথম বিপ্লব আর পুরানো ধারায় জমিদারদের অধীনে ভূমিহীন চাষীদের চাষ-ব্যবস্থার সমূল উচ্ছেদ করে তার জায়গায় সমবায় চাষের উপস্থাপনকে ওরা বলে দ্বিতীয় বিপ্লব।

এই দ্বিতীয় বিপ্লবের কাজটি কিন্তু সহজ নয় মোটেই। চীনে ১৯৫০-৫২ সনের ভূমিসংস্কারের ফলে যে হিসাব পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল, দেশে প্রায় ১১ কোটি ক্ষুদ্র জোত আছে আর তার উপরে নির্ভরশীল যে চাষী-সম্প্রদায় তাদের সংখ্যা ৫০ কোটির উপরে। সোভিয়েট রাশিয়ার যখন সমবায় চাষের পত্তন হয় তখন চাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ কোটি। সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় লাভ হয়েছে চীনাদের। একই সময়ে দেশের সর্বত্র তাই তারা সমবায় চাষের প্রবর্তনের ঝুঁকি নেয় নি। বিভিন্ন পর্যায়-ক্রমে যা স্থিরীকৃত হয়েছিল তাতে ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি ১ কোটি ৭০ লক্ষ জোত এবং সাড়ে সাত কোটি চাষী সাড়ে ছয় লক্ষ কৃষি সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫৬ সনে আর ১ কোটি ৭০ লক্ষ জোত সমবায়ের আওতায় আনার কথা। ১৯৫৮ সনে দেশের অর্ধেক চাষী ও জোত সমবায়ভুক্ত করা হয়েছে, আর সমগ্র দেশে সমবায় চাষের প্রবর্তন হবে ১৯৬০ সন নাগাদ।

যেখানে যেখানে কৃষি সমিতি স্থাপিত হয়েছে সেখানে পুরোমাত্রায় যৌথ ধরনে সমবায় চাষের প্রবর্তন না হ'লেও ক্ষতি নেই। এখানেও পর্যায়-ক্রমে করা হয়েছে। সমিতির আয়তন ছোট রাখা হয়েছে; অন্তত ২৫টি টুকরো জোত পেলেই কাজ আরম্ভ করা যায় আর এতে সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ক্ষুদ্র হবার আশঙ্কা নেই। প্রথম পর্যায়ে সমিতির সভ্যরা ছোট ছোট দল গঠন করে পরস্পরকে চাষের কাজে সাহায্য করে, জোতজমি বা অন্যান্য পশুজি সবকিছুর উপরেই ব্যক্তিগত মালিকানা অটুট থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে,

সভ্যেরা যার যার জমি হস্তান্তরিত করে দেয় সমিতির নামে সম্মিলিত চাষের জন্য, কিন্তু যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু ইত্যাদি যার যার মালিকানা বজায় থাকে। এই পর্যায়ের সমিতিতে বলা হয় অর্ধ-সমাজতান্ত্রিক সমবায়। তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে এইসব সমিতি রূপান্তরিত হবে পূর্ণ-সমাজতান্ত্রিক সমবয়ে। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি এবং গবাদি পশুও সভ্যেরা হস্তান্তরিত করে দেয় সমিতির নামে। তবে কল্‌খোজের সভ্যদের মত প্রত্যেক সভ্যকে নিজের ইচ্ছামত চাষের জন্য আলাদা করে এক টুকরো জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয়।

সমবায় চাষের প্রবর্তনের ফলে চীনে চাষের বা চাষীর অবস্থার কী কী পরিবর্তন হয়েছে সে সম্বন্ধে কথা বলার সময় এখনও আসে নি। তবে একথা অতি স্পষ্ট যে, যে-দেশে জমির উপরে ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ মারাত্মক, যেখানে মাথা-পিছ চাষের জমির পরিমাণ মাত্র দেড় বিঘা, সে-দেশে সমবায় চাষের প্রবর্তন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চীনে সমবায় কৃষি সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে তিনটি; প্রথমত অধিক ফলন, দ্বিতীয়ত উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য বণ্টন, তৃতীয়ত সৎ ও সুপরিচালনা এবং কৃষিসম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব গড়ে তোলবার জন্য সমবায় আন্দোলনের সংগঠক-দের বিশেষ ক্লাসে ভর্তি করে নিয়ে এবং বিশেষ কোর্সের প্রবর্তন করে শিক্ষিত করে নেওয়া হয়। চাষীসভ্যের পরিশ্রমের বিনিময়ে যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য অংশ সে পায় সেজন্য বণ্টনের একটি বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা হয়। চলতি কথায় চীনারা এই প্রণালীকে বলে 'সু-দু-পিং' মানে চতুঃস্তম্ভ নিরিখ। শ্রম, যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু ও জমি এই চার খাতে অবদানের জন্য প্রত্যেক খাতে আলাদা হিসাব করে সভ্যকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া হয়।

[তিন]

একটি আধুনিক মতবাদ—অটো শীলারের পরিকল্পনা

সমবায় চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক একটি মতবাদের প্রচার করছেন ডক্টর অটো শীলার। ডক্টর শীলার পশ্চিম জার্মানীতে স্টুটগার্ট-হোহেনহাইম ইউনি-ভার্সিটির কৃষি-অর্থনীতির কৃতিবিদ্য অধ্যাপক। তিনি যে শব্দ একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত তাই নয়, হাতে-কলমে চাষ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি এবং দেশে তাঁর খামার আছে। ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সনে পাকিস্তান-সরকারের আমন্ত্রণে ইউনাইটেড নেশন্সের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন সমবায় চাষের বিশেষজ্ঞ হিসাবে। সেই উপলক্ষে শব্দ পাকিস্তানেই নয় ভারতেরও কয়েকটি রাজ্যে পরিভ্রমণ করে তথ্যানুসন্ধানের ফলে যে সুপারিশ তিনি করে যান তা দুই দেশেরই অবস্থা ও পরি-বেশের উপযোগী বলে সবিশেষ মূল্যবান ও চিন্তাকর্ষক।

তাঁর মতবাদকে এক কথায় বলা যায় একক অথচ সমবায় চাষ, অথবা সমবায়ের মাধ্যমে একক ব্যক্তি-মূলক চাষ। তিনি বলেন, আসল লক্ষ্য যখন একরপ্তানি ফলন বাড়ানো আর দেশের চাষী-সম্প্রদায় যখন শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর এবং সমবায় চাষের জন্য কৃষিসমিতিতে যার যার জোতের স্বত্ব-স্বামিত্ব হস্তান্তরের ঘোর বিরোধী তখন সমবায় চাষের যৌথপ্রচেষ্টার আর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার নীতিকথায় তারা আকৃষ্ট হবে না। অতএব ও-পথ পরিহার্য। জমির স্বত্ব হস্তান্তরের কথা তুলে চাষীকে ভয় দেখাবার দরকার নেই, থাকুক সে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টামূলক চাষ-পদ্ধতি নিয়ে। এমন কৃষি সমিতি গড়ে তোলা হোক যাতে চাষীর ব্যক্তিগত চাষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ চাষের ব্যবসায়ী সমস্যার সমাধান সমিতির মাধ্যমে হয়। অনেকটা আমাদের উন্নত কৃষি সমিতির (বেটার

ফার্মিং সোসাইটির) মত। কিন্তু শীলারের পরি-কল্পিত সমিতি আরও কিছুটা অগ্রসর, কোনও কোনও বিষয়ে অভিনব।

এই পরিকল্পিত সমিতির প্রথম সোপান হচ্ছে খণ্ডিত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চাষের জমির সমী-করণ যাতে সারা গ্রাম জুড়ে কতকগুলো পর্যাপ্ত আকারের জোতের সৃষ্টি হয়। এদেশের কোনও গ্রামের চাষী ও জমি-মালিকের সংখ্যা ও অবস্থার যদি আলোচনা করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে, চাষের সঙ্গে যারা জড়িত তারা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। প্রথমে সেইসব জমির মালিক যারা নিজেরাই নিজেদের জমির চাষ করে। দ্বিতীয়ত, এক শ্রেণীর জমির মালিক যারা নিজের জমি ছাড়াও বর্গাতে বা ভাগচাষে অপরের খানিকটা জমি চাষ করে। তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেইসব মালিক, যারা নিজেদের সমস্ত জমি চাষ করে উঠতে পারে না, কিছু জমি ভাগচাষের জন্য অপরকে দেয়। চতুর্থ পর্যায়ে আছে বৃদ্ধ, রত্ন, নাবালক বা বিধবা জমি-মালিকের দল। এরা বাধ্য হয়ে অপরকে দিয়ে জমি চাষ করায়। শেষ পর্যায়ে আছে ভূমি-হীন চাষী-সম্প্রদায়। প্রত্যেক গ্রামেই এই জমির বন্দোবস্ত বা ভাগচাষের ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে হয়ে থাকে। কাজেই প্রথমেই পরিকল্পিত সমিতি এই জমির বণ্টন ও চাষব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নেবে। আইনের জোরজুলুমের মধ্য দিয়ে নয়, পরস্পর বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে সকল পর্যায়ের চাষী ও জমির মালিকদের রাজি করাতে হবে যাতে তারা তাদের জমির, স্বত্ব নয়, শব্দ চাষের অধিকারটুকু সমিতির হাতে হস্তান্তর করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা আবেদন করবে সমিতির কাছে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি চাষের অধিকার সমিতির কাছ থেকে তারা পায়। তা হ'লে একই সঙ্গে সমিতি হ'ল জমি চাষের অধিকারের ইজারা-গ্রহীতা ও ইজারা-দাতা। জমির স্বত্বস্বামিত্ব সবই অক্ষুণ্ণ রইল মালিকদের হাতে। এই ইজারা-গ্রহণের পরে সমিতির কাজ হবে জমির সমীকরণ।

বিক্ষিপ্ত আকারের খণ্ড জমিগুলোকে জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হবে কতকগুলো কৃষি-একক তার পরিমাণ অবস্থা-অনুসারে ১০ একর হ'তে পারে, ৮ একর হ'তে পারে কি ১২ একরও হ'তে পারে। এই বড় একককে ভাগ করে উপ-একক করা যেতে পারে এবং এই উপ-এককগুলোর বা এককগুলোর চাষের অধিকারের ইজারা দেওয়া হবে প্রত্যেক কর্মীচাষী-পরিবারকে, তারা এই জমিতে ব্যক্তিগত চাষ চালাবে। জমিগুলোর আকার হবে লম্বালম্বি। তাতে আড়াআড়ি করে প্রত্যেক জমি থেকেই যদি একটা খণ্ড বের করা যায় তা হ'লে একই ধরনের ফসল যেমন পাট বা ধান বা আলুর বড় ধরনের চাষব্যবস্থা করতে পারে সেই খণ্ডের একাধিক চাষীরা। তাতে শস্য-আবর্তনের এবং ফসল-পরিচালনার সুযোগ পাওয়া যাবে। ভূমি-হীন চাষীকে জমির ইজারা দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তা হ'লে সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী তারা ইজারা-গ্রহীতা চাষীদের খামারে কাজ পাবে। বিক্ষিপ্ত জমিতে চাষের ঝামেলা ও সময় এবং অর্থের অপব্যয়ের হাত থেকে চাষীরা শ্রদ্ধা রেহাই পাবে তাই নয়, পর্যাপ্ত আকারের এবং সুসম আকারের জমিতে তারা উন্নত ধরনের চাষের প্রবর্তন করতে পারবে। যাতে একজোড়া হাল-বলদেই কাজ চলতে পারে কৃষি-এককগুলো এমন আকারের হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, আর-একটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার এই সমীকরণের কাজ পাকাপাকি হয়ে গিয়ে চাষ আরম্ভ হবার পরে ওয়ারিশ আইনের কবলে পড়ে আবার যাতে এই এককগুলো উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি না হয়ে যায় সে চেষ্টা করা দরকার। এককের চাষের কাজে যদি প্রয়োজন না হয় তা হ'লে একজন বা দুইজন উত্তরাধিকারীকে সেখানে রেখে অন্যান্যদের নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার জন্য আবশ্যিক মূলধন থাকা প্রয়োজন।

চাষ-আবাদের কাজ যদি এককভাবে চাষীর হাতেই থাকে তা হ'লে সমিতির করণীয় আর কী কী কাজ

থাকতে পারে? সমিতির হাতে অনেক কাজ। প্রথমত, বছরের পর বছর এই কৃষি-এককগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ, চাষ-অধিকারের পুনর্নির্ধারণ ও অবস্থানানুসারে পুনর্বিন্যাস, তারপরে শস্যপর্যায় ও আবর্তনের পরিকল্পনা রচনা, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, হালের বলদ, কৃষিখণ্ড ও সেচের জল যোগানো, রাস্তাঘাট তৈরি, সভ্যদের শস্যবিপণনের ব্যবস্থা, উন্নত কৃষির শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা এবং এ ধরনের আরও কত কী।

সমিতির পক্ষে এসব গুরুদায়িত্বের কাজ চালাতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। ডক্টর শীলার তাই কৃষি-উন্নয়ন তহবিল নামে আইন করে একটি তহবিল গঠনের সুপারিশ করেছেন। তাতে নিম্নলিখিত খাত থেকে অর্থ আদায় হয়ে তহবিল পূর্ণ হবেঃ

- (১) রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ।
- (২) সরকারী ঋণ ও খয়রাতি।
- (৩) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে এককালীন দান বা ঋণ।
- (৪) কোনও সংস্থা থেকে অর্থের আকারে বা দ্রব্যের আকারে দান।
- (৫) তহবিলের স্বকীয় উপার্জনলব্ধ অর্থ।

এই তহবিল থেকে এর সভ্যগণীভুক্ত সমবায় কৃষি-সমিতিগুলোকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হবে।

ডক্টর শীলারের পরিকল্পনা ও মতবাদের বৈশিষ্ট্য দুইটি। প্রথমত, চাষীর জমির স্বত্ব সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করেও এবং নিজের হাতে চাষের ব্যবস্থা বজায় রেখেও শ্রদ্ধা চাষের অধিকারটুকু হস্তান্তর করে সমবায় সমিতিতে ভোগ দিয়ে খণ্ড জমির সমীকরণের মাধ্যমে উন্নত ধরনের চাষ প্রবর্তনে সক্ষম হ'তে পারা যায় এই তথ্যটির উপরেই ডক্টর শীলার জোর দিয়েছেন বেশি। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমাদের দেশে এই ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত

ও খণ্ডিত জমিগুলো যে চাষের পক্ষে একেবারেই অকেজো এবং তাতে চিরাচরিত প্রথায় একক চাষ যে চাষী বা দেশ কারও পক্ষেই আর বাঞ্ছনীয় নয়, বরং মারাত্মক, এ-কথাটাই তাঁর মতবাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। কাজেই ডক্টর শীলার যতদূর নিয়ে যেতে চান ততদূর না গিয়েও, যার যার জমির

স্বত্ব বজায় রেখে একক চাষের প্রণালী অব্যাহত রেখেও যদি আমাদের দেশের স্বল্পবিস্তৃত চাষীরা অন্যান্য সুবিধার জন্য সমবায়ায়ত্নে যে-কোনও ধরনের চাষের কাজে অগ্রসর হ'তে অনুপ্রাণিত হয়, তা হ'লেও বলা যাবে এই অনুপ্রেরণার বীজ ডক্টর শীলারের মতবাদের মধ্যে নিহিত আছে।



স্তন্যপায়ী শিকার-প্রাণী

শ্রীশচীক্লবাথ মিত্র

(পূর্বানুক্রেম)

(৩৫) ব্যাঘ্র [(‘টাইগার’ বা ‘রয়াল বেঙ্গল টাইগার’)
Panthera tigris tigris (Linn.)]

চব্বিশপারগনা ও খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনে এবং উত্তরবঙ্গে তেরাই ও ডুয়ার্স জংগলে এখন পর্যন্ত ব্যাঘ্র পর্যাপ্ত সংখ্যায় আছে। পশ্চিম-বঙ্গের দিনাজপুর ও মালদহের কোন কোন স্থানে কদাচিৎ দৃশ্য-একটা বাঘ দেখা যায়। মনুষ্যের বসতি ও কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ হইতে এই সর্দিবখ্যাত পশুটি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নানা ফসিল (fossil) হইতে যেসকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে ব্যাঘ্র মধ্য এশিয়া হইতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমা অতিক্রম করিয়া এদেশে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছাইবার পূর্বে ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যবর্তী সংযোজক স্থল সমুদ্রগর্ভে লীন হয়, সেইজন্য সিংহল দেশে ব্যাঘ্রের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, ব্যাঘ্র প্রথমে শীতলদেশের প্রাণী ছিল বলিয়া এখনও ইহার পক্ষে অধিক উদ্ভাপ অসহ্য এবং তজ্জন্য ইহাকে সুন্দর-বনের ন্যায় আর্দ্র গভীর অরণ্যেই বেশি দেখা যায়। ইহার প্রধান খাদ্য বন্য বরাহ ও মৃগ, সুতরাং এইরূপ শিকার যথেষ্ট পাওয়া যায় এমন শীতল ও ঘন বনই ইহার উপযুক্ত বসতি-স্থল। এইরূপ বাসস্থানের অভাব যতদিন পর্যন্ত না ঘটবে ততদিন ইহার লোপ পাইবার আশঙ্কা নাই। তবে সম্প্রতি রাস্তাঘাট, মোটরগাড়ি, বিজলীবাতি, বন্দুক ইত্যাদির উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের ফলে ব্যাঘ্রের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, ইহার যুক্তিসংগত প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত ব্যাঘ্র নয় হইতে দশ ফুট এবং ব্যাঘ্রী আট হইতে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়; তবে বারো ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ব্যাঘ্রও পাওয়া গিয়াছে। এই মাপ পৃষ্ঠরেখা ধরিয়া নাসিকাগ্র হইতে পৃষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত লওয়া হয়। পৃষ্ঠটি সাধারণত ৩ ফুট লম্বা। পদতল হইতে স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা তিন হইতে সাড়ে তিন ফুট। ইহার উচ্চতম ওজন গড়ে প্রায় ৫ই মণ।

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল পিঙ্গলাভ, তৎসঙ্গে অল্পবিস্তর কপিশ আভাষুক্ত; সমগ্র দেহের উপর আড়াআড়িভাবে কালো ডোরা বর্তমান; তলদেশ শ্বেত; পৃষ্ঠের উপর অনেকগুলি চক্রাকার কালো দাগ; কর্ণের বহির্ভাগ কৃষ্ণ, ভিতরে একটি প্রশস্ত শ্বেত ছাপ।

সাধারণভাবে চলিবার সময় ভূমির উপর ব্যাঘ্রের পিছনের পদতলের যে ছাপ পড়ে তাহা অপেক্ষা সম্মুখস্থ পদতলের ছাপ অধিকতর বৃহৎ, বিস্তৃত এবং বৃত্তাকার; এই প্রভেদের মাত্রা ব্যাঘ্রীর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প। দুই পার্শ্বের পায়ের যে দুই সারি দাগ পড়ে, তাহাতে দেখা যায় যে, পিছনের পায়ের ছাপ সামনের পায়ের ছাপের সামান্য অগ্রগামী।

ব্যাঘ্রের প্রধান খাদ্য বন্যবরাহ, বিভিন্নজাতীয় হরিণ, সজারু, ময়াল প্রভৃতি। সুযোগ পাইলে ইহারা গৃহপালিত পশু মারিয়া খায়। ইহারা সর্দিবধা এবং আবশ্যক অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রকম প্রাণী শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে ইহারা ব্যাঙ পর্যন্ত খায়। ব্যাঘ্র সাধারণত নিজের শিকার ছাড়া অন্য কিছু আহার করে না। কদাচিৎ ইহারা মৃত গৃহপালিত পশুর শব কিংবা শিকারী-কর্তৃক নিহত ও পরিত্যক্ত কোন

পশু বা অন্য ব্যাঘ্রের মৃতদেহও ভক্ষণ করে। তরুণ ব্যাঘ্রেরা যখন প্রথম শিকার করিতে শিক্ষা করে, তখন তাহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত দৃষ্ট হয় এবং তাহারা সময় সময় খাদ্যের লোভে যত না হউক কেবলমাত্র শিকারের আনন্দলাভের জন্যই একসঙ্গে দু-তিনটি বা ততোধিক পশু হত্যা করে।

ব্যাঘ্র সাধারণত একাকী শিকার করে; অতি সন্তপণে আত্মগোপন করিয়া, কোনরূপ সাড়াশব্দ না করিয়া, শিকারের পিছনে পিছনে যাইয়া, হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে, অথবা কোন ঝোপের মধ্যে (সাধারণত জলের ধারে) লুকাইয়া থাকে এবং শিকার নিকটে আসিলে তাহাকে কবলস্থ করে। আবার কখন কখন এক-একটি পরিবার দলবদ্ধ হইয়াও শিকার করে। দলের একটি কোনও একস্থানে লুকাইয়া থাকে এবং অন্যগুণিল শিকার তাড়াইয়া তাহার সম্মুখে আনে। কোন পশু শিকার করিলে ব্যাঘ্র ২-৩ দিন যাবৎ নিহত পশুটির কাছাকাছি থাকে, পরে আবার অন্যত্র চলিয়া যায়।

অন্যান্য বন্য পশুর মত ব্যাঘ্রও বনমধ্যে নিজ বিচরণভূমি স্থির করিয়া লয়। নিজ এলাকা ছাড়িয়া সহজে অন্যস্থানে যায় না। একটি ব্যাঘ্র নিহত হইলে, অল্পদিনের মধ্যে তাহার স্থান অন্য ব্যাঘ্র আসিয়া দখল করে। ব্যাঘ্র সচরাচর একাকী বিচরণ করে, কখন কখন একজোড়া ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী (অথবা ২-৩টি শাবকসহ একটি ব্যাঘ্রীকে) একসঙ্গে দেখা যায়।

সাধারণত ব্যাঘ্র মনুষ্যের কোন অনিষ্ট করে না, বরং মনুষ্য দেখিলে কিংবা মনুষ্যের দ্বারা বিভাঙিত হইলে, ভয় পাইয়া পলায়ন করে, কিন্তু কোনরূপে উত্তম বা আহত হইলে ইহা ভীষণ হিংস্র ও ভয়াবহ হয়। সঙ্গে শাবক থাকিলে ব্যাঘ্রী সর্বদা বিপজ্জনক, কারণ তখন কোন বিরক্তির কারণ না জন্মিলেও সহসা আক্রমণ করাই উহার স্বভাব। যদি কোন ব্যাঘ্র একবার কোনরূপে মনুষ্যরক্তের আশ্বাদ পায়, তাহা হইলে খাদ্যের জন্য মনুষ্য হত্যা করিতে সে সন্দিগ্ধ করে না, বরং ইহাই তখন উহার স্বভাবে পরিণত

হয়। নরখাদক ব্যাঘ্র অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও চতুর হয় এবং উহাকে সহজে হত্যা করা যায় না।

এক সুন্দরবন ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্য সকল স্থানে নরখাদক ব্যাঘ্র অত্যন্ত বিরল। সুন্দরবনে ভূমির অধিকাংশ কদম্বাল বুলিয়া ব্যাঘ্রের পক্ষে মৃগ বরাহাদি অপেক্ষা মনুষ্য শিকার করা সহজ, বোধহয় সেইজন্য ঐস্থানে নরখাদক ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাব অধিক। অনেকের মতে, সুন্দরবনে মনুষ্য প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্রের আহার মৃগ বরাহ প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় শিকার করে, সেইজন্য ব্যাঘ্রের খাদ্যাভাব ঘটে বুলিয়া, মনুষ্য হত্যা করিয়াই ব্যাঘ্র সেই অভাব পূরণ করে। যাহা হউক, ব্যাঘ্র হইতে মনুষ্যের ক্ষতি মোটের উপর বেশি হয় না; কারণ ১৯৩১ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ২৩ জন মনুষ্য এবং ৩০টি গৃহপালিত পশু ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৩,১৩৫জন মনুষ্য সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে; ইহার তুলনায় ব্যাঘ্রের দ্বারা মনুষ্যসমাজের অনিষ্টের পরিমাণ যে অত্যল্প, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। যতদিন এই দেশের অরণ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বন্যবরাহ ও মৃগাদি থাকিবে, ততদিন এই ক্ষতির পরিমাণ যে এইরূপ সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহাই আশা করা যায়।

ব্যাঘ্রী একপতিপরায়ণ, সাধারণত সে বর্ষার শেষে ব্যাঘ্রের সহিত মিলিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের মধ্যে এককালীন ২ হইতে ৪টি শাবক প্রসব করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রজননকাল কোন স্থিরতা নাই; বৎসরের যে-কোন সময়ে শাবক ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। গর্ভধারণের কাল প্রায় ১৫ সপ্তাহ। গর্ভার অরণ্যের মধ্যে, সাধারণত ঘন নল বা অন্য কোন জাতীয় তৃণভূমিতে অথবা কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে ইহারা সন্তান প্রসব করে। শাবকদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা সামান্য বেশি হয়। শাবকেরা যতদিন পর্যন্ত নিজেরা শিকার করিতে সক্ষম না হয়, ততদিন মাতার সহিত থাকে। তিন

বঙ্গবন্ধু : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

বৎসর বয়স হইলে উহাদের দৃশ্য-শব্দন্ত পড়িয়া যায় এবং তাহার স্থানে নতুন ও স্থায়ী শব্দন্ত জন্মায়; এই সময় উহারা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

(৩৬) শ্বেত-চিতা বাঘ [*Panthera uncia* (Schreber)]

ইহার বসতি হিমালয় পর্বতে, সাধারণত ১৫,০০০ ফুটের উপরিস্থ স্থানে। শীতকালে ৭,০০০ ফুট পর্যন্ত নিম্নভূমিতেও ইহাকে দেখা যায়। দার্জিলিং জেলায় সিংগালিলা পাহাড়ে কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়।

মস্তক ও পৃষ্ঠসমেত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুট, তন্মধ্যে পৃষ্ঠ প্রায় তিন ফুট; সম্মুখের পদতল হইতে স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা দুই ফুট। লোম ঘন ও লম্বা। পৃষ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ ঈষৎ পীতভস্মস্তলান শ্বেতাভ ধূসর; তলদেশ শ্বেত। সর্বত্র কৃষ্ণ-বর্ণের দাগ, দাগগুলি অসমান; পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের দাগ অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাহাদের মধ্যভাগ স্তলান; মস্তক ও প্রত্যঙ্গের দাগ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ; উদর দেশের দাগ সংখ্যায় কম ও অস্পষ্ট। কর্ণ কৃষ্ণ এবং প্রত্যেক কর্ণে একটি বড় পীতভ দাগ বর্তমান।

ইহাদের খাদ্য বন্যছাগল, পক্ষী, ইত্যাদি। চিতা-বাঘের ন্যায় ইহারাও গ্রাম্য ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি শিকার করিয়া আহার করে, কদাচিৎ অশ্বকেও আক্রমণ করে। ইহারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া কখনও শুন্য যায় নাই। দার্জিলিং লোম-ব্যবসায়ীদের দোকানে ইহার ছাল প্রায়ই দেখা যায়। অত্যন্ত বিরল বলিয়া ইহার সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

(৩৭) হস্তী [*Elephas maximus indicus* G. cuvier]

উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশস্থ জঙ্গলসমূহে ইহাকে দেখা যায়, ইদানিং তিস্তানদীর পশ্চিমে কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ও তাহার পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে অদ্যাপি প্রচুর। মৈদীনী-পুন্ড্র ও মৈমনসিং জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়। বঙ্গদেশের অন্য কোথাও বন্যহস্তী নাই।

অধুনা জগতে যতপ্রকার ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে হস্তীই আয়তনে বৃহত্তম। গৃহপালিত পশু হিসাবে ইহা এত সুপরিচিত যে, ইহার বিস্তারিত দৈহিক বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন।

পুরুষ হস্তীর স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা সাধারণত নয় ফুট এবং হস্তিনীর আট ফুট হয়; তবে, ইহা অপেক্ষা বৃহদাকার হস্তীও দেখা গিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হস্তীর উচ্চতা তাহার সম্মুখস্থ পদতলের পরিধির ঠিক স্বেগুণ। একটি পূর্ণ-বয়স্ক হস্তীর উচ্চতম ওজন প্রায় চার টন, আর একটি হস্তিনীর ওজন গড়পড়তা প্রায় ২ই টন।

পুরুষ হস্তীর সচরাচর দুইটি, কদাচিৎ একটি গজদন্ত থাকে, একটি থাকিলে তাহাকে 'গণেশ' বলে; কোন কোন হস্তীর গজদন্ত অঙ্কুরাবস্থায় থাকে—কখনও বিধিত হয় না; এইরূপ হস্তীর সাধারণ নাম 'মাক্না'। বৃদ্ধা হস্তিনীদের 'টোই' আর যুবতীদের 'সারিন' বলা হয়। হস্তিনীরও দন্ত মাক্নার দন্তের ন্যায় অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। গজদন্ত আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। এদেশের হস্তীর একজোড়া গজদন্তের ওজন সাধারণত ৩০ সের, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ সের পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

সাধারণত সকল পুরুষ ও স্ত্রী হস্তীর সম্মুখের পদে পাঁচটি এবং পশ্চাতের পদে চারটি নখর থাকে। প্রত্যেক পদের দুই পার্শ্বের বহিঃস্থ নখর দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং কতকটা কুণ্ডিত; এই নখরগুলির চিহ্ন কেবল সিস্ত ভূমিতে অঙ্কিত হয়; সচরাচর ইহার গমনপথে কেবল তিনটির চিহ্ন পড়ে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ ধূসরাভ কৃষ্ণ, কর্ণ, কপাল ও বক্ষদেশে প্রায়ই কতকগুলি মাংস বর্ণের দাগ থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত এক এক দলে ৫০-৬০টা বা ততোধিক হস্তী দেখা যাইত। আজকাল উত্তরবঙ্গে এক দলে সচরাচর তিন হইতে সাতটি

এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাত হইতে ২০টি পর্যন্ত দেখা যায়। প্রত্যেক দলে সর্বদা একটি বৃন্দা হস্তিনীকে নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়; ইহার কখনও অন্যথা হইয়া না। সাধারণত একই গোষ্ঠীর দুই-তিন বা চার পুরুষের বংশধরদের লইয়া এক-একটি দল গঠিত হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তীরা সচরাচর দল হইতে কতকটা দূরে দূরে থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দলের সহিত মিলিত হয়।

উচ্চ বৃক্ষের বন অথবা উচ্চ তৃণবন হস্তীর সাধারণ বিচরণক্ষেত্র। বাঁশ, পুরুন্ডি এবং বন্য-কদলীতে সমাকীর্ণ জঙ্গল ইহাদের বিশেষ প্রিয়। আহাৰ করিবার সময় ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভয়ের কিণ্ঠে মাত্র কারণ উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ একস্থানে জমা হয়। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, মাত্র মধ্যাহ্নে এবং মধ্যরাত্রে অল্পক্ষণের জন্যে স্থির হইয়া থাকে। ইহারা ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে তৃণ, বিভিন্ন লতা ও অন্যান্য উদ্ভিদের পাতা ও ডালপালা, কলা, ডুমুর, চালুতা ও অন্যান্য ফল অহোরাত্র আহাৰ করে। একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তী দিনে প্রায় আট মণ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভক্ষণ করে। সময়ে সময়ে ইহারা গ্রামস্থ ধানক্ষেত্রে এবং বনমধ্যস্থ চারাগাছের বাগানে প্রবেশ করিয়া প্রভূত ক্ষতি করে।

ইহারা স্নান ও জলকেলী করিতে ভালবাসে; কদম্ব জলাতে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে, গড়াগড়ি দেয়; শব্দস্বারা শব্দ মাটি তুলিয়া নিজদেহে ছড়ায়; আবার এইরূপে নিজগাত্রে জলও ছিটায়; জল না পাইলে মৃদুখন্ডে শব্দ প্রবেশ করাইয়া নিষ্ঠীবন সংগ্রহ করিয়া তাহা গাত্রোপরি ছিটায়। বন্য হস্তী সাধারণত দিনে দুইবার জল পান করে, পিচকারি ভর্তি করিবার মত শব্দমধ্যে ১ হইতে ২ ফুট পর্যন্ত জল টানিয়া লয় এবং পরে মৃদুগহ্বরে শব্দ প্রবেশ করাইয়া সেই জল সজোরে নিগত করে।

ইহারা রাত্রিকালে গ্রাম্য প্রান্তর, কৃষিক্ষেত্রাদি পার হইয়া এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলেও যায়। উপযুক্ত বিচরণভূমির সন্ধানে ইহারা ঋতুভেদে

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে, এমনকি একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। এইরূপে জলপাইগুড়ি জেলার জঙ্গল হইতে কতক কতক হস্তী সময়বিশেষে উত্তরে ভুটান এবং পূর্বে আসাম অঞ্চলে চলিয়া যায় আবার তথা হইতে প্রত্যাগমন করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও হস্তীকে ঋতুভেদে উত্তরে আসাম ও পূর্বে বর্মাদেশে গমনাগমন করিতে দেখা যায়। শত সহস্র শতাব্দী যাবৎ এইরূপ গমনাগমন নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতেছে বলিয়া ঐসকল পথ সুচিহ্নিত। ভ্রমণের সময় ইহারা একটির পশ্চাতে একটি করিয়া সারি বাঁধিয়া ঐসকল সুচিহ্নিত গমনপথ অনুসরণ করিয়া চলে; সারির প্রথমে দলনেত্রী 'ঢোই' আর সর্ব পশ্চাতে দলতীরা থাকে। হস্তী সাধারণত মৃদুগতিতে চলে, কিন্তু ভয় পাইলে বা উত্তেজিত হইলে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগেও দৌড়াইতে পারে। গুরুভার দেহ সত্ত্বেও, ইহারা উচ্চ পাহাড় আরোহণ এবং সন্তরণ করিতে বিশেষ দক্ষ।

প্রধানত গ্রীষ্মকালই ইহার সঙ্গমের ঋতু। গর্ভধারণের কাল প্রায় ২০ মাস। হস্তিনী সাধারণত সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে এককালীন একটি শাবক প্রসব করে। সদ্যোজাত শিশুর স্কন্ধদেশের উচ্চতা প্রায় ২ ফুট ১০ ইঞ্চি; জন্মের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহা হাঁটিতে পারে এবং ছয় মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান করে, তৎপরে তৃণ আহাৰ করিতে আরম্ভ করে। ২৫ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ১৫০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে বলিয়া কথিত আছে। গৃহপালিত হস্তীকে ১০০ বৎসরের উপর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তী নির্দিষ্ট কাল অন্তর মত্ত বা 'পাগুলা' হয়, এই সময় উহার কপালের রন্ধ্রসমূহ হইতে একপ্রকার রস নিষ্কান্ত হইতে দেখা যায় এবং তখন উহার নিকটে যাওয়া বিপজ্জনক।

হস্তী সাধারণত, বিশেষত দলবদ্ধ থাকিলে, অতি নিরীহ এবং মনুষ্যের সাড়া পাইলে দূর হইতে

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

সরিয়া যায়। কিন্তু যেসকল হস্তী দল ছাড়িয়া একাকী বিচরণ করে, তাহারা মনুষ্য দেখিলে প্রায়ই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় এবং কখন কখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করে; সচরাচর এইরূপ 'গন্ডা' হস্তীরই কবলে পড়িয়া কখনও কখনও মনুষ্য প্রাণ হারায়। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ১৩ জন লোক হস্তী দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

হস্তী মূল্যবান প্রাণী বলিয়া একটি বিশেষ নিখিল ভারতীয় আইন [১৮৭৯ সালের (৬ষ্ঠ) হস্তী-সংরক্ষণ আইন] দ্বারা ইহার পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মধ্যে মধ্যে 'খেদা' করিয়া বা অন্য উপায়ে অনেক হস্তী ধরা হয় এবং কোন গন্ডা হস্তী যদি কখন মনুষ্য বা সম্পত্তিনাশের কারণ হয়, তখন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য পদ্রস্কার ঘোষণা করা হয়, কিম্বা কোন কোন স্থানে বেতনভোগী শিকারী নিযুক্ত করা হয়। এইসকল কারণে হস্তীর সংখ্যা কোনস্থানে অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

মোটর গাড়ির প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তীর চাহিদা ও মূল্য সম্প্রতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তথাপি ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত দশ বৎসরে মোট ৫৪৬টি বন্যহস্তী ধৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বৃদ্ধা যায় যে, গৃহপালিত পশু হিসাবে হস্তীর উপকারিতা এখনও যথেষ্ট আছে।

(৩৮) এক-শৃঙ্গ গন্ডার [*Rhinoceros unicornis* Linn.]

ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলায় সঙ্কোষ, বালা, জেসাঁ এবং মূর্তি, এই চারটি নদীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। বর্তমানে মোটের উপর ৪০-৫০টি আছে। কোচবিহারে তেসাঁ নদীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলেও গন্ডাটিকে আজও তিষ্ঠিয়া আছে। সম্ভবত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলস্থ সাংপদ জঙ্গলেও গন্ডাটিকতক আছে, কিন্তু তাহার সঠিক

প্রমাণ নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অন্যত্র কোথাও ইহার আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু নেপালে ও আসাম রাজ্যে এখনও ইহা অধিকতর সংখ্যায় বর্তমান বলিয়া কথিত।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ই ফুট, পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ই ফুট, শ্ৰবণশীর্ষের উচ্চতা ৫ই ফুট, ও শ্ৰবণের অব্যবহিত পশ্চাদস্থ দেহের উচ্চতম পরিধি ৯ই ফুট।

ইহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর, কপাল স্পর্শত নতোদর। পদ্রুশ ও স্ত্রী উভয়েরই একটি স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান শৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গ এক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ও ওজনে প্রায় তিন সের হয়। শৃঙ্গ জন্মাবধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কোনরূপে নষ্ট হইলে পুনরায় নতুন শৃঙ্গ অঙ্কুরিত হয়। স্ত্রীর শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ; পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ফলে পদ্রুশের শৃঙ্গ সচরাচর ক্ষুদ্র ও ভেঁতা হয়; এই প্রভেদ দেখিয়া পদ্রুশ ও স্ত্রী-গন্ডারের পার্থক্য বৃদ্ধা যায়।

কেবলমাত্র কর্ণ ও পৃষ্ঠে অল্পবিস্তর লোম থাকে। গাত্রচর্মে কতকগুলি গভীর ও সুস্পর্শ ভাঁজ থাকে, (বিশেষত উরুর সম্মুখে, শ্ৰবণের পশ্চাতে এবং গ্রীবার চতুর্দিকে); পার্শ্বদেশস্থ চর্মে বড় বড় গন্ডিকা থাকে। বৃহৎ ও গদ্রুভার দেহ, ক্ষুদ্র গ্রীবা, নৌকার আকৃতি মস্তক, তিন অঙ্গুলিবিশিষ্ট খর্ব ও স্থূল পদ এবং বড় বড় পাটে বিভক্ত ঢালের ন্যায় কঠিন ও স্থূল চর্ম দেখিয়া অন্য সকল জাতীয় জন্তু হইতে গন্ডারের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র হস্তী ব্যতীত এত বৃহৎ প্রাণী আর জগতে নাই।

গন্ডার নদীনালা ও জলাবিশিষ্ট নলবন বা তদ্রূপ উচ্চ (২০ ফুট পর্যন্ত) তৃণ-জঙ্গলে বাস করে। জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে ইহারা ভালবাসে এবং দিনের অনেকটা সময় এইভাবে কাটায়। একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ একই সময়ে মলত্যাগ করি ইহার স্বভাব। মলের স্তূপ যতদিন পর্যন্ত সমাধিক

উচ্চ না হয়, ততদিন একই স্থানে মলত্যাগ করে। ঐ স্থানে গমন করিবার সময় পিছন দিকে হাঁটিয়া যায়। এই স্বভাবের সন্যোগ লইয়া গদুপ্তশিকারীরা গন্ডার হত্যা করে। হস্তীর ন্যায় ইহারাও সাধারণত নির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত পথ দিয়া গমনাগমন করে।

গন্ডার সাধারণত অতি নিরীহ প্রাণী এবং কৃষিক্ষেত্রের বা কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু কোন কারণে বিরক্ত হইলে ইহা প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে; তবে নিজ গমনপথ ত্যাগ করে না। ইহার দৃষ্টিশক্তি কম। এই দুই কারণেই মনুষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে গন্ডারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, একান্ত সম্মুখে পড়িলে কিংবা হতবুদ্ধি হইয়া উহার গমনপথের উপর থাকিলে, মৃত্যু অনিবার্য। আমি একবার গন্ডার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার পথ ছাড়িয়া তাহার পার্শ্ব মাত্র ৩-৪ হাত দূরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম, গন্ডারটি তীরবেগে আমার সম্মুখ দিয়া অল্পদূর গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার আমার সম্মুখ দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিল; সময় থাকিতে উহার পথ ছাড়িয়াছিলাম বলিয়াই সে-যাত্রা আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। গন্ডারের দেহ দুর্বল হইলেও, ইহা প্লুত বা অর্ধপ্লুত ভিগ্নগতে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে বঙ্গদেশে মোট তিনজন মনুষ্য গন্ডার কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

গন্ডারের প্রধান খাদ্য তৃণ। ইহারা প্রাতে, সন্ধ্যায় ও প্রায় সমস্ত রাত্রিকালে আহার করে এবং দিনমানে অধিকাংশ সময় কদম্বাক্ত জলায় পড়িয়া থাকে ও নিদ্রা যায়। ইহাদের সাধারণত একাকী বিচরণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু স্বল্পস্থানের মধ্যে সচরাচর অনেকগুলি থাকে।

গন্ডারের কোন নির্দিষ্ট প্রজননঋতু নাই। ইহার গর্ভধারণের কাল কমবেশি ১৮ মাস। এককালীন একটিমাত্র শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। ইহারা শতাব্দী বৎসর জীবিত থাকে বলিয়া শুন্য যায়।

গন্ডারের মাংস নাকি অতি সুস্বাদু। নেপালী ও রাজবংশীদের বিশ্বাস যে, গন্ডারের মাংস দেবতাদের প্রিয় এবং ইহা আহার করিলে চৌদ্দপদ্রুঘ উন্মাদ হয়। ইহার প্রস্রাব ক্ষতের পচন নিবারক বলিয়া গণ্য। ব্যাধি ও ভূতপ্রেতের প্রতিরোধকল্পে পাহাড়ীরা গন্ডারের প্রস্রাবে পূর্ণ একটি পাত্র তাহাদের গৃহের প্রবেশপথে ঝুলাইয়া রাখে। হিন্দু শাস্ত্রগণ গন্ডারের চর্ম নির্মিত কোশা-কুশি পুজার জন্য প্রশস্ত মনে করেন। চীনদেশীয় লোকদের বিশ্বাস, ইহার শৃঙ্গ পদ্রুঘহীনতার মহৌষধ; ইহার এইরূপ গুণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও, অনেকে ইহার জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত। এক-একটি গন্ডার শৃঙ্গ কলিকাতার বাজারে দুই হাজার টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অত্যধিক মূল্যের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২৭-২৮ সাল হইতে) কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশে গদুপ্ত শিকারীদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহারা জলপাইগুড়ি জেলাস্থ সরকারী জঙ্গলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি গন্ডার হত্যা করিয়া ইহাকে প্রায় নিবংশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সেইজন্য উহার রক্ষাকল্পে ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় গন্ডার-সংরক্ষণ (৮ম) আইন নামে একটি বিশেষ আইন প্রচলিত হয় এবং ঐ বৎসর প্রথম জলপাইগুড়ি জেলার টোর্সা অরণ্যের কতকাংশ ('জলদাপাড়া' নামে পরিচিত) গন্ডার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত আশ্রয়স্থলে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং গন্ডারের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত আইন অনুসারে শব্দ গন্ডার হত্যা করা নয়, বিশেষ অনুমতি ব্যতীত গন্ডারের কোন অংশ স্বাধিকারে রাখা, বিক্রয় করা বা চালান দেওয়াও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সম্প্রতি নিলপাড়া একটি ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ৮-৯ জন ছাত্র এক-সঙ্গে থাকিয়া অনায়াসে জলদাপাড়া অভয়বনে গন্ডার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করার বা উহাদের ফোটো তোলায় আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

(৩৯) ম্ৰি-শৃঙ্গ গন্ডার [*Didermocerus Sumatrensis lasiotis* (Buckland)]

পূর্বে এই জাতীয় গন্ডার জলপাইগুড়ি জেলার পূর্বপ্রান্তে সত্কেষ নদীর ধারে পাওয়া যাইত ; এখন আর তথায় ইহার কথা শুনা যায় না। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে কোন কোন জংগলে যে গন্ডারের অবস্থিতির কথা শুনায়, তাহা এই জাতীয়। এ বিষয়ে সঠিক প্রমাণ সংগ্রহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইহার দৈহিক গঠন, আচরণ ইত্যাদি সমস্তই প্রায় পূর্ববর্তী এক-শৃঙ্গ গন্ডারের মত। প্রভেদ এই যে, (১) ম্ৰি-শৃঙ্গ-গন্ডারের আয়তন ক্ষুদ্রতর—ইহার স্কন্ধদেশের উচ্চতা সাধারণত চার ফুটের বেশি হয় না ; (২) একটির পরিবর্তে দুইটি শৃঙ্গ, আর সম্প্রদায়ের শৃঙ্গটি অধিকতর লম্বা—এক শৃঙ্গ গন্ডারের শিং ১২ ইঞ্চির বেশি লম্বা প্রায় হয় না, কিন্তু ইহার শিং ৩২ ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে ; (৩) কেবল কর্ণ ও পৃষ্ঠ নয়, ইহার গায়ে অধিকাংশ স্থানে অল্পবিস্তর লোম থাকে ; (৪) একশৃঙ্গ গন্ডারকে কেবল সমতলভূমিতে দেখা যায়, ম্ৰি-শৃঙ্গ গন্ডারকে ৪,০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়েও দেখা গিয়াছে।

(৪০) বন্যবরাহ [*Sus serofa cristatus* Wagn.]

উচ্চ পার্বত্যস্থান ব্যতীত বঙ্গদেশের বহু ও ক্ষুদ্র প্রায় সকল অরণ্যেই ইহাকে পাওয়া যায় ; গ্রামের বহির্ভাগে যেসকল গুল্মপূর্ণ খন্ডজংগল থাকে, অনেকক্ষেত্রে তন্মধ্যেও ইহা সন্নিবিষ্ট। ঐম্নসিং, দিনাজপুর ও বাঁকুড়া জেলায় বিরল।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট ; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা আড়াই হইতে তিন ফুট ; পৃষ্ঠ প্রায় এক ফুট লম্বা, উচ্চতম ওজন প্রায় ৩৫ মণ।

শাবকদের সাধারণ গায়বর্ণ শ্বেত পীতভ, তদুপরি কতকগুলি গাঢ় পিঙ্গল বা প্রায় কৃষ্ণবর্ণের প্রশস্ত ডোরা লম্বালম্বি বিস্তৃত। পূর্ণবয়স্কদের বর্ণ সর্বত্র কৃষ্ণ।

ইহার লোম কতকটা বিরল ও ককশ ; দেহের তলদেশের লোমের নিন্মার্ধ কৃষ্ণ এবং প্রান্তার্ধ শ্বেত ; পৃষ্ঠের লোম ক্ষুদ্র এবং পাখির পালকের জালির ন্যায় পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে আড়া-আড়িভাবে বিন্যস্ত ; মেরুদেশের উপরিস্থ লোম-গুলি অধিকতর লম্বা ; কর্ণ ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মগ্র, বদন মাংসাশী জন্তুদের মত গভীরভাবে খণ্ডিত। পূর্ণবয়স্ক বরাহের উভয় চোয়ালের শব্দন্ত উর্ধ্বমুখে প্রলম্বিত ও মূখমণ্ডলের বাহিরে গজদন্তের ন্যায় প্রসারিত ; নিন্মস্থ চোয়ালের শব্দন্ত লম্বায় নয় ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে।

বন্যবরাহের খাদ্য অনেকটা ভল্লুকদের মত। ভল্লুকেরা তাহাদের নখরের সাহায্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু বরাহ তাহার শক্তিশালী তুণ্ড দ্বারা গর্ত করিয়া উদ্ভিদমূল্যাদি সংগ্রহ ও ভক্ষণ করে। আহার করিবার সময় সম্প্রদায়ের পদব্রজে দ্বারা আহাৰ্য্য বস্তু ভূমির উপর শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে। বরাহের প্রধান খাদ্য তৃণমূল এবং বিভিন্ন গাছের মূল। চারা শালগাছের (বিশেষত ২ বৎসর বয়সের) মূল ইহার একটি প্রিয় খাদ্য। কদম্বাভূমি তুণ্ডদ্বারা কর্ষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ মৎস্য সংগ্রহ করিয়া ইহারা ভক্ষণ করে, আর কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরীসৃপ, পতঙ্গ, বিষ্টা এবং শড়া পচা মাংসও আহাৰ্য্য করে। সাধারণত সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে প্রত্যুষ পর্যন্ত ইহার বিচরণ ও আহারের সময়। অপেক্ষাকৃত নির্জনস্থানে অনেকটা বেলা পর্যন্তও ইহারা বিচরণ করে। যেসকল স্থানে মনুষ্যসমাগম বেশি, তথায় বরাহ সম্পূর্ণ নিশাচর। ইহারা কৃষির এবং বনমধ্যস্থ চারাগাছের প্রভূত ক্ষতি করে। বাস্তবিক এই বিষয়ে বন্যবরাহের ন্যায় অনিষ্টকারী পশু আর নাই। এই কারণে আইনে ইহার জন্য শিকার নিষিদ্ধ কালের কোন নির্দেশ নাই। অর্থাৎ বন্যবরাহ বৎসরের সকল সময়ে সকল অবস্থায় শিকার করা চলে। কিন্তু মনুষ্যসংলগ্ন ইহাকে শিকার করিতেও ঘৃণা বোধ করেন এবং শিকারপ্রিয় ব্যক্তির সচরাচর কোন জন্তুরই স্ত্রী এবং শাবক

হত্যা করেন না। কতকটা এই কারণে এবং প্রধানত ইহার অত্যধিক প্রজননহারের জন্য বন্যবরাহ সমানে তিষ্ঠিয়া আছে।

শুকরী সাধারণত বৎসরে দুইবার এককালীন চাব হইতে ছয়টি শাবক প্রসব করে। ইহার কোন নির্দিষ্ট প্রজননকাল নাই, বৎসরের যে-কোন সময়ে শাবক ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর। ইহারা প্রায়ই বড় বড় ঘাস কাটিয়া একস্থানে স্তূপাকার করে এবং তাহার মধ্যে শাবক প্রসব ও পালন করে।

বন্যবরাহ অত্যন্ত সাহসী, উৎপীড়িত কিংবা আহত হইলে অতি ভয়াবহ, এমনকি ব্যাঘ্র ও হস্তীকে পর্যন্ত প্রবলভাবে আক্রমণ করে। আক্রমণের প্রথম বেগ অতি দ্রুত ও দুর্বিষহ। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে জানা যায় যে, বাঙলাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ২ জন মনুষ্য বন্যবরাহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ইহার ঘাণশক্তি প্রবল। ইহারা জলে, বিশেষত কদম্বাস্থানে, গড়াগড়ি দিতে ভালবাসে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বল্লম দ্বারা বরাহ শিকার একটি বেশ কৌতুকপ্রদ এবং উত্তেজক ক্রীড়া। অনেকে এইরূপে বরাহ শিকার করা পছন্দ করেন। এইরূপ শিকার কিন্তু ঘন-জঙ্গলে সম্ভব নয়। বন্যবরাহের মাংস সুস্বাদ।

(৪১) বামন বরাহ [*Sus salvanius* (Hodgson)]

ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলায় ভুটান-সীমানার সংলগ্ন জঙ্গলে কদাচিৎ দেখা যায়; অতি বিরল।

ইহার স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা এক ফুট; দেহ দুই ফুট এবং পৃচ্ছ প্রায় ১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ।

ইহার পৃচ্ছ ও কর্ণ প্রায় লোমবিহীন, দৈহিক গঠন বন্যবরাহের মত; প্রধান প্রভেদ এই যে, ইহার চুচুক ছয় জোড়ার পরিবর্তে মাত্র তিন জোড়া, আর দেহের তুলনায় পৃচ্ছ, তুণ্ড এবং উপরিস্থ চোয়ালের শব্দন্ত অতি ক্ষুদ্র।

ইহার লোম বিরল ও ককর্শ। শাবকদের গাত্রবর্ণ গাঢ় পিঙ্গল, তদুপরি কতকগুলি পাণ্ডুবর্ণের

প্রশস্ত ডোরা লম্বালম্বি বিস্তৃত; তলদেশ শ্বেত। পূর্ণবয়স্করা কৃষ্ণাভ পিঙ্গল।

বামন-বরাহ সম্পূর্ণ নিশাচর, ঘন তৃণজঙ্গলে ৪-৫টি একসঙ্গে বিচরণ করে। ইহার খাদ্য ও আচরণ অনেকটা বন্যবরাহের সমতুল্য, কিন্তু ইহারা নিরীহ এবং কোন ক্ষতি করে না। অত্যন্ত বিরল বলিয়া বাঙলাদেশে ইহার শিকার আইনত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

(৪২) জিহ্র হরিণ [*Tragulus meminna* Erxleben]

অনেকে বলেন, জলপাইগুড়ি জেলায় ইহাকে দেখা যায় কিন্তু তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মধ্যভারতের জঙ্গলে সুলভ।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চি; স্কন্ধদেশের উচ্চতা প্রায় এক ফুট; পৃচ্ছ অতি ক্ষুদ্র; ওজন তিন সের।

ইহা শৃংগবিহীন; উপরিস্থ চোয়ালের শব্দন্ত মৃদুধ্বনি বাহিরে প্রসারিত।

ইহার পৃচ্ছদেশ পীত-তিলকাঙ্কিত পিঙ্গল; উভয়পার্শ্বে লম্বালম্বি কয়েক সারি শ্বেত কিংবা পাণ্ডুবর্ণের লম্বাটে ফোঁটা বর্তমান; স্থানে স্থানে ফোঁটাগুলি প্রলম্বিত হইয়া খড় ডোরায় পরিণত হয়। তলদেশ শ্বেতাভ। কণ্ঠে তিনটি শ্বেত দাগ বর্তমান।

জিহ্র হরিণ অতি শান্ত এবং ভীরু, কখনও বনের বাহিরে আসিতে সাহস করে না। ইহার চলনভঙ্গি অদ্ভুত; খুরের সর্বপ্রান্তে দেহভার রক্ষা করিয়া শীর্ণ পাগুলা প্রায় ঋজু রাখিয়া চলে, মনে হয় ইহার জানুতে কোন সন্ধি নাই। ইহারা বিবর মধ্যে একাকী থাকে এবং গোখলিচর; উৎপীড়িত হইলে বিবরে পলাইয়া যায়।

জুন ও জুলাই মাস ইহাদের শৃংগারকাল। বর্ষার শেষে কোন গর্তে স্থায়ীজিহ্র এককালীন সাধারণত দুইটি শাবক প্রসব করে।

(৪৩) কস্তুরী [*Moschus moschiferus moschiferus* Linn]

হিমালয় পর্বতে গিল্‌গিট হইতে সিকিম পর্যন্ত সকল স্থানে সাধারণত ৮-১০ হাজার ফুট উচ্চভূমিতে, ইহার বাস। দার্জিলিঙ জেলায় সিংগালিলা পাহাড়ে ইহাকে পূর্বে পাওয়া যাইত, এখন যার কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য কমবেশি তিন ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা ২০ ইঞ্চি; স্কন্ধ হইতে প্রোণদেশ দুই ইঞ্চি বেশি উন্নত; পৃষ্ঠ প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা; ওজন আন্দাজ ১০ সের।

কস্তুরী মৃগ শৃঙ্গবিহীন। পুরুষ কস্তুরীর উপরিস্থ চোয়ালের শব্দন্ত মূখের বাহিরে ২-৩ ইঞ্চি প্রলম্বিত। পশ্চাতের পদ সম্মুখের পদ অপেক্ষা দীর্ঘতর। পুরুষের পৃষ্ঠাগ্র চামরের ন্যায়; স্ত্রীর পৃষ্ঠ খর্বলোমযুক্ত। কর্ণ লম্বাটে। পুরুষ কস্তুরীমৃগের নাভীর অব্যবহিত সম্মুখে ঘ্রকের অভ্যন্তরে একটি থলি থাকে, ইহাতে শৃঙ্গারস্তুতে একপ্রকার মূল্যবান গন্ধদ্রব্য সঞ্চিত হয়, ইহাই বিখ্যাত কস্তুরী বা 'মাস্ক'। এই মৃগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার লোম ভগ্নদ্র।

ইহাদের সাধারণ গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ও ঘন পিঙ্গল, ইহার সহিত অম্পবিস্তর ধূসর মিশ্রিত থাকতে তিলকাঙ্কিত রূপ ধারণ করে। তলদেশের বর্ণ অপেক্ষাকৃত পাতলা, স্থানে স্থানে অস্বচ্ছ শ্বেত।

খরগেশের ন্যায় ইহারা এক-একটি বিশেষ শিলা বা গুহ্ম নির্বাচন করিয়া তাহার নিম্নে একাকী বাস করে। প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় বিচরণ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ এবং শৈবাল; পত্র-ফল-ফলও কিছু কিছু আহার করে।

(৪৪) কাকর [*Muntiacus muntjak vaginalis* (Boddaert)]

ইহাকে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জঙ্গলেই অম্পবিস্তর দেখা যায়। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের জঙ্গলে সুলভ।

ত্রিপুরা, ঢাকা, বাথরগঞ্জ, খুলনা, চম্বিশপারগনা, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় বিরল, অন্যান্য জেলায় ইদানীং লুপ্ত।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য তিন ফুট, স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা ২০ ইঞ্চি; পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য সাত ইঞ্চি, প্রায় মস্তকের সমান। ওজন আন্দাজ ২৫ সের।

শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, সাধারণত ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়, একটি ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা বৃন্তের উপর অবস্থিত। উপরদিকে দুইভাগে বিভক্ত; শাখাটি ক্ষুদ্র, নিম্নাভিমুখী ও পশ্চাদিকে প্রসারিত। মে কিংবা জুন মাসে ইহার পুরাতন শৃঙ্গ খসিয়া যায় এবং নূতন শৃঙ্গ জন্মায়। স্ত্রী কাকর শৃঙ্গবিহীন; ইহার শৃঙ্গের স্থান ঈষৎ উন্নত এবং তদুপরি একগুচ্ছ লোম থাকে।

পুরুষ কাকরের উপরিস্থ চোয়ালের শব্দন্ত প্রলম্বিত ও মূখমণ্ডলের বাহিরে প্রসারিত; স্ত্রীর শব্দন্ত ক্ষুদ্রাকার। মূখমণ্ডলের উপর প্রত্যেক পার্শ্বে একটি অস্থিময় উন্নত আল থাকে, ইহা শৃঙ্গবৃন্তের মূলদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত। এই চিহ্নটি এই জাতীয় মৃগের একটি বিশেষত্ব।

ইহার পৃষ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ উজ্জ্বল পিঙ্গল, দেহ ও পৃষ্ঠের তলদেশ শ্বেত; পুরুষ কাকরের প্রত্যেক শৃঙ্গবৃন্তের অন্তর্পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ রেখা বর্তমান এবং ইহা মূখমণ্ডলের উপর দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত।

ইহারা সাধারণত নিবিড় জঙ্গলে একাকী অথবা যুগলে বাস করে, কেবল আহারের জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী স্থানে অথবা বন-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্মুক্ত স্থানে বহির্গত হয় এবং চলিবার বা দৌড়াইবার সময়ে মস্তক অবনমিত করিয়া রাখে। দুর্গম ঝোপ এবং ভূপতিত ডাল-পালার মধ্য দিয়া বোঁজির মত ইহারা অনায়াসে দ্রুতগমন করিতে পারে। ইহার ডাক কতকটা কুকুরের মত, সেইজন্য ইংরেজেরা ইহাকে 'বাকিং ডিয়ার'

অথবা কুকুরের ন্যায় শব্দকারী হরিণ বলে। ভয় পাইলে ইহারা একপ্রকার বিশেষ শব্দ করে। শীতকাল ইহাদের শৃঙ্গারের সময় এবং সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভে এককালীন ১ কি ২টি শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভধারণের কাল প্রায় ছয় মাস। ইহার মাংস সুস্বাদ। স্ত্রী এবং চামশিং-যুক্ত পুরুষ কাকর হত্যা করা আইননিষিদ্ধ। পাকা শিং-যুক্ত পুরুষ কাকরকে অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত শিকার করা চলে।

(৪৫) চিতল [*Axis axis axis* Erxl.]

ইহা সুন্দরবনে প্রচুর। উত্তরবঙ্গে তেরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে ইদানীং চিতলের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে, উপস্থিত মাত্র গুল্টিকতক পাল জীবিত আছে; চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ও বাঁকুড়া জেলায় অধিকতর বিরল। বঙ্গদেশের অন্যত্র আজকাল আর ইহাকে দেখা যায় না। ভারতবর্ষ ও সিংহল ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই জাতীয় মৃগ নাই।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ৪৫ হইতে ৫ ফুট, স্কন্ধ-শীর্ষের উচ্চতা ২৫ হইতে ৩ ফুট; পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য প্রায় মস্তকের সমান (প্রায় এক ফুট); ওজন প্রায় দুই মণ ১০-১৫ সের। সুন্দরবনের চিতল আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

সম্বরের ন্যায় চিতলের শৃঙ্গের প্রত্যেক পার্শ্বে তিনটি শীষ থাকে, কিন্তু উহা মসৃণ ও কুশ; উপরের শাখা দুইটির বহির্মুখী শাখাটি সর্বদা অন্তর্মুখী শাখা অপেক্ষা বৃহত্তর; দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩০ ইঞ্চির উপর হয় না।

ইহার লোম মসৃণ, পৃষ্ঠদেশের বর্ণ উজ্জ্বল কপিশাভ মৃদু পিঙ্গল, তদুপরি সর্বাবস্থায় এবং সকল ঋতুতে বহু শ্বেত চিহ্ন বর্তমান; মেরু-দণ্ডদেশস্থ বর্ণ অধিকতর গাঢ়; পৃষ্ঠ ও দেহের তলদেশ সর্বত্র শ্বেত।

ইহার সুঠাম গঠন, প্রশস্ত ও বিশ্বস্ততাব্যঞ্জক নয়ন এবং সুন্দর গাত্রবর্ণ ও চলনভঙ্গির জন্য

ইহাকে দেখিতে মনোহর। বাস্তবিক অন্যান্য জাতীয় হরিণের তুলনায় চিতল অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং ইহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অরণ্যের একটি প্রধান অলংকার। ইহারা মনুষ্যের সান্নিধ্য ভালবাসে এবং এত বিশ্বাসপরায়ণ যে, জঙ্গলে উপবিষ্ট মনুষ্যের কিংবা বনপার্শ্বস্থ মনুষ্যবাসের নিকট আসিতে স্বেচ্ছা বোধ করে না। এইজন্য চিতল সহজলভ্য এবং ইহার সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহারা অন্য কোন কোন জন্তুর, বিশেষত বানরের, সাহচর্য পছন্দ করে।

ঝোপড়া গাছের ও বাঁশের বন চিতলের প্রিয়। সাধারণত নদীনালায় ধারে ঘন ঝোপ ইহার আশ্রয়-স্থান। জলপান করিবার স্থান হইতে চিতল কখনও বেশি দূরে যায় না। ইহারা সকল সময়েই দলবদ্ধ হইয়া থাকে; এক এক দলে ১০-১২টা হইতে শতাধিকও দেখা যায়। সম্বরের মত ইহারাও প্রধানত তৃণ ও ফল খাইয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু উহার মত অতটা নিশাচর নয়, ইহারা প্রাতে অনেকটা বেলা পর্যন্ত এবং বৈকালেও বিচরণ করে, মধ্যাহ্নে ছায়াতলে শুইয়া বিশ্রাম করে।

সাধারণত শীতকাল ইহার শৃঙ্গারের সময়, কিন্তু বৎসরের যে-কোন সময়ে শাবক ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। এককালীন এক হইতে তিনটা, সাধারণত দুইটা, শাবক প্রসূত হয়।

চিতলের মাংস সুস্বাদ এবং উহার চর্ম আসন, গাত্রাবরণ ইত্যাদি রূপে ব্যবহারযোগ্য।

স্ত্রী এবং চামশিং-যুক্ত পুরুষ চিতল হত্যা করা আইন-নিষিদ্ধ। পাকা-শৃঙ্গযুক্ত পুরুষ চিতল শিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলায় প্রজননঋতুভেদে বিভিন্ন শিকার-নিষিদ্ধকাল প্রচলিত আছে।

(৪৬) পারা বা (নেপালী) লগুনা [*Axis porcinus porcinus* Zimm.]

ইহাকে উত্তরবঙ্গে তেরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে অপেক্ষাকৃত বড় বড় নদীগুলির অববাহিত

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে দেখা যায়। পূর্বে এই-সকল স্থানে এই জাতীয় মৃগ প্রচুর ছিল; সংরক্ষণ-নীতি সত্ত্বেও ইদানীং ইহার সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা দুই ফুট; লোমসহ পুচ্ছের দৈর্ঘ্য প্রায় মস্তকের সমান (আট ইঞ্চি)।

শৃঙ্গ সচরাচর ১২ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না; ইহার শাখা ৩টি; প্রথম শাখা সহসা বাঁকিয়া উর্ধ্বমুখী; উপরের শাখা দুইটির অন্তর্দিকের শাখাটি ক্ষুদ্রতর; শৃঙ্গপতন সাধারণত এপ্রিল মাসে ঘটে।

ইহার সাধারণ গাত্রবর্ণ কপিশাভ পিঙ্গল; লোমের প্রান্তভাগ অস্বচ্ছ শ্বেত, এইজন্য গাত্র তিলকাঙ্কিত বলিয়া মনে হয়; তলদেশ হালকা রঙের; কর্ণের অভ্যন্তর এবং পুচ্ছের তলদেশ শ্বেত। গ্রীষ্মকালে শৃঙ্গীদের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা হয় এবং মেরুদেশের প্রত্যেক পার্শ্বে ২-১ সারি শ্বেত বিন্দুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই-গুলি অল্পদিনের মধ্যে লুপ্ত হয়। শীতকালে পূর্ণবয়স্ক শৃঙ্গীদের গাত্র কতকটা স্লেটের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করে। ছয় মাস বয়সকাল অবধি শাবকদের দেহের উপর সর্বত্র শ্বেত ফোঁটা থাকে।

ইহারা নদীপার্শ্বে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই-চারটি-বৃক্ষসম্বিত তৃণ-জঙ্গলে বাস করে। গভীর জঙ্গলে ইহাদের কদাচিৎ দেখা যায়। এমনকি উচ্চ তৃণবনও ইহারা সাধারণত বর্জন করে। নদীপার্শ্বে বা নদী-মধ্যস্থ চরে যেসকল স্থানে নাতি-উচ্চ তৃণ থাকে তথায় ইহাদের বেশি দেখা যায়। এক এক খণ্ড দলে সাধারণত ৩-৪টার বেশি দেখা যায় না, কিন্তু স্বল্প স্থানের মধ্যে সচরাচর অনেকগুলিকে থাকিতে দেখা যায়। ইহারা কদাচিৎ জঙ্গলের বাহিরে আসে, সুতরাং কৃষির কোন ক্ষতি করে না।

মস্তক অবনত করিয়া ইহার দোড়াইবার ভঙ্গি, অনেকটা শূকরের মত, বোধ হয়, এইজন্য ইহার

সাধারণ ইংরেজী নাম 'হগ ডিয়ার' অর্থাৎ 'শূকর-হারিণ'।

শীতকাল ইহাদের শৃঙ্গারের সময় এবং সাধারণত এপ্রিল কিংবা মে মাসে শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভ-ধারণের কাল আট মাস।

স্ত্রী এবং চার্মশিং-বিশিষ্ট পারামৃগ হত্যা করা আইন-নিষিদ্ধ; পাকা-শৃঙ্গযুক্ত পুরুষ পারা শিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন জেলায় প্রজননধাতু ভেদে বিভিন্ন শিকার-নিষিদ্ধ কাল প্রচলিত আছে।

(৪৭) সম্বর [*Cervus unicolor niger* Blainville]

ইহাকে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম ও তাহার পার্শ্বত অঞ্চলের জঙ্গলে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মৈমনসিং, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় ইহাকে কদাচিৎ দেখা যায়। বঙ্গদেশের অন্যত্র কোথাও নাই।

ইহার দেহ দৈর্ঘ্য ৬-৭ ফুট; স্কন্ধদেশের উচ্চতা ৪ হইতে ৪৫ ফুট; পুচ্ছের দৈর্ঘ্য মস্তকের তিন-চতুর্থাংশ (প্রায় এক ফুট); কর্ণ ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা। ওজন আন্দাজ ৭৫ মণ। বঙ্গদেশে যে ছয় প্রকার মৃগ আছে তাহাদের মধ্যে সম্বরই আয়তনে বৃহত্তম।

ইহার প্রত্যেক পার্শ্বের শৃঙ্গে সাধারণত শাখা-প্রশাখা লইয়া ৩টা শীষ থাকে। ইদানীং ২৪ ইঞ্চির উপর দীর্ঘ শৃঙ্গ পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু পূর্বে ৪৮ ইঞ্চি পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সাধারণত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে ইহার শৃঙ্গ বর্জিত হয়; নতুন শৃঙ্গ মে মাসে জন্মায় এবং সমগ্র বর্ষাকাল চর্মাবৃত থাকে। কোন কোন সম্বরের শৃঙ্গ একাদিক্রমে কয়েক বৎসর থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ইহাদের লোম রুক্ষ এবং ঝাঁকড়া। পুরুষ সম্বরের গাত্রবর্ণ গাঢ় ধূসর; ইহার গ্রীবাদেশস্থ লোম কতকটা লম্বিত অর্থাৎ ইহার অল্প কেশর থাকে। স্ত্রী ও শাবকদের রঙ অল্পবিস্তর পিঙ্গল। গ্রীষ্মকালে ইহাদের লোম বহুলাংশে ঝরিয়া পড়ে।

পুরুষ সম্বর সাধারণত একাকী বিচরণ করে আর স্ত্রী সম্বরকে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দেখা যায়।

সচরাচর এই দল মাতা ও তাহার ২-১টি শাবক লইয়া গঠিত। কিন্তু প্রজননঋতুতে ইহারা অনেক-গুলি একস্থানে জমা হয়। সাধারণত নভেম্বর মাস শৃঙ্গারের সময় এবং স্ত্রী সম্বর আট মাস গর্ভ-ধারণের পর মে কিংবা জুন মাসে এককালীন সাধারণত একটি শাবক প্রসব করে। শৃঙ্গার-ঋতুর পর পুরুষ সম্বর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং পরবর্তী শৃঙ্গার-ঋতু পর্যন্ত একাকী থাকে। পুরুষ-সম্বরের ডাক ও গাঢ়গন্ধ অনুসরণ করিয়া স্ত্রী সম্বরেরা নিকটে আসে।

সম্বর উচ্চবৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্য, শৃঙ্খলভূমি এবং পাহাড় কিংবা পাহাড়ের সান্নিধ্য বেশি পছন্দ করে, এইজন্য বোধ হয় সুন্দরবন সম্বরশূন্য। শৃঙ্গারীরা জঙ্গলের মধ্যে কোন বিশেষ অংশের উপর নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে, অনেক সময় এইরূপ কলহ অপেক্ষাকৃত অল্পবলশালীর প্রাণহানির কারণ হয়। অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে ইহাদের বিচরণ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহারা প্রকৃত নিশাচর। রাত্রিকালে জঙ্গলের নিকটবর্তী কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অল্পবিস্তর শস্যাহানি করে। সরকারী বনমধ্যে সারবান বৃক্ষের যেসকল চাষ আছে, ৮-৯ ফুট উচ্চ তারের বেড়া অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া ইহারা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে; বিভিন্ন গাছের পত্র, মৃদুকুল, বকল ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া, ডালপালা ভাঙিয়া ও ছোট ছোট গাছ দলিত করিয়া প্রভূত ক্ষতি করে। কিন্তু প্রধানত নদীনালায় ধারে ধারে বিচরণ করিয়া তৃণ এবং বিভিন্ন ফল খাইয়াই ইহারা প্রাণধারণ করে; হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী ফল ইহার প্রিয় খাদ্য। দিনমানে ইহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং কোনও ছায়াশীতল স্থান পছন্দ করিয়া তথায় বিশ্রাম করে।

সম্বরের মাংস শক্ত কিন্তু স্বাদু। স্ত্রী এবং চামশিং-বিশিষ্ট পুরুষ সম্বর হত্যা করা আইন-নিষিদ্ধ, পাকা-শিংযুক্ত পুং-সম্বরকে অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত শিকার করা চলে।

(৪৮) বারসিঙ্গা [*Cervus duvauceli duvauceli* Cuv.]

পূর্বে ইহা শালবৃক্ষ ও বন্যলাল কুসুমের সহিত সমভাবে বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক শালবনেই ইহার দর্শন পাওয়া যাইত। কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহাকে মৈমনসিং এবং অন্যান্য কোন কোন জেলাতেও দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় (তাও কেবল বজ্রা ও টোসাঁ অরণ্যসম্বয়ের স্থানবিশেষে) দেখা যায়।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট, স্কন্ধদেশের উচ্চতা পোনে চার ফুট; লোমসহিত পৃচ্ছ নয় ইঞ্চি ও কর্ণ সাত ইঞ্চি লম্বা; ওজন প্রায় পাঁচ মণ।

প্রত্যেক পাম্বের শৃঙ্গে সাধারণত ছয়টি শাখা-প্রশাখা থাকে। বক্রতা অনুসরণ করিয়া মাপ লইলে শৃঙ্গের দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চ মাসে ইহার পুরাতন শৃঙ্গ বিচ্যুত হয়; নতুন শৃঙ্গ এপ্রিল বা মে মাসে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, জুলাইএর শেষ পর্যন্ত চর্মাবৃত থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষার্শ্বে চর্মমুক্ত হইয়া সাধারণ আকার ধারণ করে।

ইহার পৃষ্ঠদেশের বর্ণ শীতকালে পীতভা পিঙ্গল; গ্রীষ্মকালে কর্ণিশাভ পিঙ্গল এবং এই সময়ে পৃষ্ঠদেশে, বিশেষত মেরুদেশের উপর, শ্বেত বিন্দুর আবির্ভাব হয়; কণ্ঠ অস্বচ্ছ শ্বেত; দেহ ও পৃচ্ছের তলদেশ সর্বদা শ্বেত। স্ত্রীর গাঢ়বর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। শাবকদিগের গাঢ় শ্বেত বিন্দু থাকে।

বারসিঙ্গা সচরাচর উচ্চবৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্যের মধ্যে উন্মুক্ত তৃণময় জলাভূমির পাম্বের দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা সম্বর হরিণের ন্যায় অতটা নিশাচর নয়। ইহাদের প্রাতঃকালে অনেকবেলা পর্যন্ত আবার সন্ধ্যার কতকটা পূর্ব হইতে আহার করিতে দেখা যায়। আহারের সময় ব্যতীত প্রায় সকল সময়েই ইহারা জলে পড়িয়া থাকে। এপ্রিল ও মে মাস ইহার শৃঙ্গারের কাল এবং জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাসে শাবক ভূমিষ্ট হয়। বারসিঙ্গা শিকার করা সম্পূর্ণ আইন-নিষিদ্ধ।

(৪৯) নীলগাই [*Boselaphus tragocamelus* (Pallas)]

উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলায় ইহাকে কদাচিৎ দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাজ্রাব, মধ্য-প্রদেশ এবং গুজরাটে যথেষ্ট পাওয়া যায়; দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত উহার বিস্তৃতিসীমা।

নীলগাই দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার মত, কিন্তু কদাকার। ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুট, স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা সাড়ে চার ফুট; পৃষ্ঠে জানু পর্যন্ত লম্বিত।

ইহার পৃষ্ঠদেশ নীলাভ গাঢ় ধূসর; কেশর, কর্ণের উপরার্ধ এবং পৃষ্ঠশীর্ষ কৃষ্ণ; দেহ ও পৃষ্ঠের তলদেশ শ্বেত।

কৃষ্ণস্বরের ন্যায় নীলগাইও কতকটা উন্মুক্ত-প্রান্তরবাসী। ইহারা নিবিড় বন বর্জন করে; সমতল ও তরঙ্গায়িত ভূমিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম ও তৃণ-সম্মিলিত অগভীর জঙ্গলই বেশি পছন্দ করে। সাধারণত ৪-৫টা, কদাচিৎ ১৫-২০টা, একসঙ্গে বিচরণ করিতে দেখা যায়। পুরুষ নীলগাই প্রায় একাকী থাকে। ইহারা তৃণ, লতাপাতা ও বিভিন্ন ফল (বিশেষত কুল ও আমলকী) আহার করে এবং সময়ে সময়ে কৃষিক্ষেত্রের অল্পসল্প ক্ষতি করে। স্ত্রী নীলগাই ৮-৯ মাস গর্ভধারণের পর সাধারণত দুইটি কিংবা একটি শাবক প্রসব করে। ইহার মাংস বিশেষ সন্ম্বাদ নয়। হিন্দুরা ইহাকে গো-বিশেষ মনে করে এবং নীলগাই হত্যা তাহাদের দৃষ্টিতে মহাপাপ।

(৫০) গৌর [*Bos gaurus gaurus* H. Smith]

ইহাকে বঙ্গদেশে উপস্থিত কেবল তেরাই ও ডুয়ার্সের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জঙ্গলগুলিতে (তাও মাত্র পর্বতের সান্নিধ্যে), আর চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানগুলিতে দেখা যায়।

পূর্ণবয়স্ক বৃষের দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় ফুট, স্কন্ধ-শীর্ষের উচ্চতা ছয় ফুট আর স্কন্ধের অব্যবহিত

পশ্চাতে দেহের পরিধি আট ফুট অধিক হয়; পৃষ্ঠে জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত। গাভীগুলি বৃষের তুলনায় আরও অনেক দূরতর, ইহাদের স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়।

বৃষ এবং গাভী উভয়েরই দুইটি করিয়া শৃঙ্গ থাকে; এক-একটি শৃঙ্গ ২০ হইতে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা—এই মাপ শৃঙ্গের বহির্দেশের বক্রতা অনুসরণ করিয়া লওয়া হয়। শৃঙ্গ অর্ধচন্দ্রাকার, মসৃণ, স্ফুটন ও শূন্যগর্ভ; ইহার মূলদেশ কতকটা চ্যাপ্টা, শীর্ষ অত্যন্ত মূর্খী এবং ঈষৎ পশ্চাদ্ধিক পরিচালিত। শৃঙ্গের শীর্ষদেশ কৃষ্ণ এবং অন্যত্র হরিতাভ বা পীতাভ। শৃঙ্গবয়সের মধ্যস্থলে করোটি বেশ স্পষ্টত উন্নত; কপাল নতোদর। দেহের তুলনায় পা ও ক্ষুরগুলি ক্ষুদ্র; কর্ণ নাতিক্ষুদ্র। স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশের প্রথমার্ধ বেশ উন্নত। বৃষগুলির বলিষ্ঠ, স্ফুটন ও স্ফুটনাল শরীর দেখিতে বাস্তবিক মনোহর।

পূর্ণবয়স্ক বৃষ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; অল্পবয়স্ক বৃষ ও গাভীর ক্ষুর হইতে জানু পর্যন্ত শ্বেত, অন্যান্য অংশ কফি বা চকোলেট রঙের অর্থাৎ গাঢ় রক্তাভ পিঙ্গল। সদ্যোজাত বৎসর সাধারণত রঙ ফিকা স্বর্ণাভ পীত এবং ইহাদের মেরুদেশের উপর একটি কৃষ্ণবর্ণের ডোরা থাকে; অল্পদিনের মধ্যে বৎসর বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া মৃদু পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। ইহার গায়েলোম ক্ষুদ্র ও অমসৃণ।

গৌরের প্রধান খাদ্য তৃণ এবং বংশাঙ্কুর। ইহারা সাধারণত প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে আহারার্থে বনমধ্যে বিচরণ করে, এবং সাধারণত কৃষিক্ষেত্র বর্জন করিয়া চলে, বনের বাহিরে আসে না। সমতল ভূমিতে আসিলেও, ইহারা পর্বতময় স্থান বেশি পছন্দ করে এবং পর্বতারোহণ করিতে বেশ পটু। কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের ৫-৬টি একসঙ্গে বিচরণ করিতে দেখা যাইত, আজকাল একত্রে তিনটির বেশি দেখা যায় না। বৃষদিগকে প্রায় একাকী থাকিতে দেখা যায়। ইহাও কোন বৃষের সম্মুখে পড়া বিপজ্জনক, তবে ইহারা সাধারণত অদ্রোহী এবং

ভীরু। ইহাদের ঘ্রাণ ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, দূর হইতে মনুষ্যের সাড়া পাইয়া ইহারা সরিয়া যায়।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা গয়াল বা মিথুন নামে যে একপ্রকার গোরু পালন করে, তাহা এই গোৱেরই একটি অপভ্রংশ 'আকার। পূর্বে গয়াল একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু আকৃতিতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও ইহা গোৱের সমজাতীয় এবং গোৱ ও গৃহপালিত গাভীর সংযোগে উৎপন্ন একটি বর্ণসংকর জাতিবিশেষ। গয়াল সাধারণত দিনমানে নিজ ইচ্ছামত বনে পাহাড়ে বিচরণ করে এবং রাত্রিকালে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা পাহাড়ীদের একটি প্রধান সম্পত্তি।

মধ্যে মধ্যে গোবসন্ত ('রিন্ডারপেস্ট') রোগম্বারা আক্রান্ত হইয়া বহু গোর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগ গ্রাম্য গাভী বনে বিচরণ করিতে গিয়া গোর ও মৃগাদি পশুর মধ্যে সংক্রামিত করে। এই রোগের ফলে এবং অন্যান্য কারণে গোৱের সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে। সেইজন্য দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রাম জেলায় গোর শিকার করা সম্পূর্ণভাবে আইন-নিষিদ্ধ।

(৫১) বন্যমহিষ [Bubalus bubalis bubalis (Linn.)]

উপস্থিত উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় সঙ্কোষ, রায়ডাক ও তোৰা নদীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলে কয়েক পাল ঘাস আছে। বঙ্গদেশের অন্যত্র কোন স্থানে আজকাল আর ইহাকে দেখা যায় না।

গ্রাম্য মহিষের সহিত বন্য মহিষের সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে দশ ফুট; স্কন্ধ-শীর্ষের উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট; স্কন্ধের অব্যবহিত পশ্চাতে দেহের পরিধি আট ফুট; পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য

প্রায় চার ফুট, সাধারণত জানু পর্যন্ত লম্বিত। ওজন পঁচিশ মণ কিংবা ততোধিক।

পুরুষ ও স্ত্রী মহিষ উভয়েরই বৃহদাকার শৃঙ্গ থাকে; বহির্দেশের বক্রতা অনুসরণ করিয়া এক শৃঙ্গের শীর্ষ হইতে অন্য শৃঙ্গের শীর্ষ পর্যন্ত মাপ প্রায় আট ফুট পর্যন্ত হয়। শৃঙ্গ অন্তর্মুখী, কিন্তু ইহার শীর্ষ সম্মুখ দিকে ঈষৎ প্রসারিত; কতকটা নিষ্পষ্ট, মধ্যচ্ছেদ প্রায় ত্রিকোণাকার; অমসৃণ, আড়াআড়িভাবে কুণ্ডিত। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর শৃঙ্গ সাধারণত বৃহত্তর।

ইহার গাত্রলোম ককর্শ এবং এরূপ পাতলা যে, ছক দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রী বন্যমহিষ উভয়েই কৃষ্ণ কিংবা ঈষৎ ধূসরাভ কৃষ্ণ; পাগড়ি অস্বচ্ছ শ্বেত। নবজাত বৎসের বর্ণ পীতভা।

বন্যমহিষের প্রধান খাদ্য তৃণ। ইহারা সাধারণত প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে নদীনালায় ধারে ধারে বিচরণ করে এবং মধ্যাহ্নে নল বা এরূপ কোন তৃণজঙ্গল বেষ্টিত জলাভূমিতে জলকাদার মধ্যে শূন্য হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও দূরদ্রুত। উৎপীড়িত না হইলেও ইহারা মনুষ্যকে দর্শনমাত্র আক্রমণ করিতে পারে এবং আহত হইলে ব্যাস্ত্র অপেক্ষা ভয়াবহ। বন্যহস্তীও ইহাদের দেখিলে ভয়ে দূরে সরিয়া যায়।

প্রজননঋতুতে দলপতি দলের অপরাপর যুবা মহিষগুলিকে তাড়াইয়া দেয় এবং নিজে সকল স্ত্রীর সংগসুখ ভোগ করে। সাধারণত বর্ষার শেষে শৃঙ্গার হয় এবং মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে বৎস ভূমিষ্ঠ হয়। এককালীন সচরাচর একটি, কদাচিৎ দুইটি, শাবক জন্মগ্রহণ করে। গর্ভধারণের কাল প্রায় দশ মাস। বঙ্গদেশে বন্যমহিষ হত্যা করা আইন-নিষিদ্ধ।

[ক্রমশ]

গাছ থেকে বুনো নারিকেল সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট সময়

যদিও নারিকেলগাছের প্রত্যেক অংশ মানুষের কাজে লাগে, কিন্তু প্রধানত ফলের জন্যই নারিকেল-গাছ রোপণ করা হয়। নানা অবস্থার অপেক্ষাকৃত কাঁচা ফলকে বাঙলায় 'ডাব' বলা হয়। বাঙলাদেশে সকল রকম ক্রিয়াকর্মে ডাবের প্রয়োজন হয় এবং ডাবের জল অত্যন্ত তৃপ্তিকর ও উপকারী পানীয়। পরিপক্ব নারিকেল ফলকে বাঙলায় 'বুনো' নারিকেল বলা হয়। বুনো নারিকেলের শাঁস একটি মৃদুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য। অধিকন্তু বুনো নারিকেল একটি অর্থকরী ফসল। বুনো নারিকেলের শুষ্ক শাঁসকে 'কোপ্রা' বলে। ঘানিতে কোপ্রা পিষে তেল বার করা হয়। নারিকেলতেল আমাদের রান্না এবং আরও বহুদুরকম কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলতেলের খইলও আমাদের নানা কাজে লাগে। বস্তুত নারিকেলতেল ও তার খইল বেশ গুরুত্ববিশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্য। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ভারতে যে পরিমাণ বুনো নারিকেল জন্মায় তার শতকরা ৫৪ ভাগ খাদ্য হিসাবে এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজে খরচ করা হয় এবং বাকি ৪৬ ভাগ কোপ্রায় রূপান্তরিত করা হয়।

বুনো নারিকেলের খোসা থেকে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বাণিজ্যদ্রব্য তৈরি হয়। খোসা পিটে নারিকেলছোবড়ায় পরিণত করা হয় এবং তা থেকে দাড়ি, পাপোশ, গদী প্রভৃতি তৈরি হয়। কেরালা-রাজ্যের দ্বিবাঙ্কুর-কোচিনে বহুকাল থেকে বিরাট আকারে নারিকেল-ছোবড়াশিল্প প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২৭ কোটি নারিকেলের খোসা ছোবড়াশিল্পে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোপ্রা, নারিকেলতেল ও নারিকেলের ছোবড়া এই তিনটি মূল্যবান জিনিস আমরা বুনো নারিকেল থেকে পেয়ে থাকি।

নারিকেল-চাষীদের নারিকেলগাছ থেকে সর্বাধিক আয় করতে হ'লে বুনো বা পরিপক্ব নারিকেল এমন সময়ে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যাতে ক'রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কোপ্রা ও ছোবড়া পাওয়া যায়। কোপ্রা ও ছোবড়া শুদ্ধ পরিমাণে বেশি হ'লেই চ'লবে না, সেগুদলিকে এমন গুণ-সম্পন্ন হ'তে হবে যাতে চাষীদের আয় বেশি হয়। যেমন কোপ্রা থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া দরকার তেমনি ছোবড়াগুদলিও সঙ্কোচন-প্রসারণশীল বা স্থিতিস্থাপক (Elastic) হওয়া চাই। আমরা ভারতবাসীরা, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ গুণসম্পন্ন কোপ্রা ও ছোবড়া উৎপাদন করি না ব'লে এই জিনিসগুদলির বাজারে সর্বাধিক মূল্য পাই না। এর কারণ কি? নারিকেল ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই সেগুদলি সংগ্রহ করি—কোপ্রা ও ছোবড়ার নিকৃষ্ট হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু ভারতীয় কৃষক কেন নারিকেল পরিপক্ব হবার পূর্বেই আহরণ করেন? তারও কতকগুদলি কারণ আছে। নারিকেলচাষীরা হয়ত জানেন না যে, গাছ থেকে অপরিপক্ব নারিকেল সংগ্রহ ক'রলে তাদের কতটা লোকসান হয়। অনেকে মনে করেন যে, সব চেয়ে ভাল ছোবড়া পেতে হ'লে পরিপক্ব হওয়ার আগে সবুজ খোসাবদ্ধ নারিকেল গাছ থেকে পাড়া দরকার। পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখলে বহু পাকা নারিকেল গাছ থেকে মাটিতে প'ড়বে এবং চুরি হবে—এই ভয়ে বহু চাষী অপরিপক্ব নারিকেল গাছ থেকে পেড়ে ফেলেন। গাছে সব নারিকেলের থোকা এক সঙ্গে পাকে না কিন্তু চাষী খরচ বাঁচাবার জন্য একসময়ে সব ক'টি থোকা নামিয়ে নেন ফলে বহু অপরিপক্ব নারিকেলও সেই সংগ্রহে থেকে যায়। আবার অর্থাভাবগ্রস্ত ছোট ছোট চাষীকে সংসার খরচ চালাবার জন্য অপরিপক্ব

নারিকেল পাড়তে হয়। বিস্তারিতভাবে গবেষণা ক'রে দেখা গেছে যে, নারিকেল থেকে বেশি গুণযুক্ত কোপ্রা পেতে হ'লে নারিকেলটিকে এক বছর গাছে রেখে পরিপক্ব হ'তে দিতে হবে। কিন্তু ভারতে অতি অল্পসংখ্যক নারিকেলই ১২ মাস গাছে রাখা হয়।

কোপ্রা, ছোবড়া এবং তেল নারিকেলজাত জিনিস-গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। সুতরাং কত মাস পর্যন্ত গাছে ফল রাখলে এই তিনটি জিনিস কি পরিমাণে পাওয়া যায় সে বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এবং ক'মাস বয়স হ'লে নারিকেল পাড়া সবচাইতে অর্থকরী হবে তাও মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে সেটি বোঝা যায়:

নানা বয়সের ১,০০০ নারিকেল থেকে পাউন্ড হিসাবে কি পরিমাণে ছোবড়া, কোপ্রা ও তেল পাওয়া যায় তার হিসাব—

নারিকেলের বয়স	১২ মাস	১১ মাস	১০ মাস	৯ মাস
কোপ্রা	৩৫৬	৩৩৫	২৯৮	২৩৭
-তেল	২৪৫	২৩৩	২০৮	১৬৪
ছোবড়া	১৭৫	১৭৩	১৬৫	১৭৪

উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ১২ মাস বয়সের পরিপক্ব নারিকেলের তুলনায় ১১ মাস বয়সের নারিকেল শতকরা ৬ ভাগ, ১০ মাস বয়সের নারিকেল শতকরা ১৬ ভাগ এবং ৯ মাস

বয়সের নারিকেল শতকরা ৩৩ ভাগ কোপ্রা কম পাওয়া যায়। তেলও প্রায় এই হিসাবে অপরিপক্ব নারিকেল কম পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোপ্রা ও তেলের প্রকৃতি বা গুণও কাঁচা নারিকেল নিষ্কৃষ্ট হ'তে দেখা যায়। এগারো বা বারো মাস বয়সের নারিকেলজাত কোপ্রার রঙ হয় সাদাটে এবং তা বেশ মচমচে থাকে। নয় বা দশ মাস বয়সের নারিকেল কোকড়ান ও নমনীয় হয়। বিভিন্ন বয়সের নারিকেল ছোবড়া প্রায় সমান ওজনের পাওয়া যায় কিন্তু তাদের প্রকৃতি ভিন্নরকমের হয়। বারো মাস বয়সের নারিকেলের ছোবড়া ভগ্নদূর ও বাদামী রঙের হয় এবং দশ বা এগারো মাস বয়সের নারিকেলের ছোবড়া সোনালী রঙের ও সঙ্কোচন-প্রসারণশীল হয়।

উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, কোপ্রার জন্য নারিকেল দরকার হ'লে বারো মাস বয়সের নারিকেল সংগ্রহ ক'রতে হবে। আর ছোবড়ার উপর ঝোঁক থাকলে দশ বা এগারো মাস বয়সের নারিকেল প্রয়োজন। দশ বা এগারো মাস বয়সের নারিকেল থেকে কোপ্রা কম পাওয়ার দরুন চাষীর কিছু লোকসান হবে বটে কিন্তু ছোবড়ার অতিরিক্ত দাম পাওয়াতে সে লোকসান সুদৃশ্যে উঠে আসবে।

চাষীরা যেন এইসব গবেষণার ফল মনে রেখে নারিকেল সংগ্রহ করেন। তাতে তাঁদের আয় বাড়বে এবং দেশেরও কল্যাণ হবে।*

*প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যাদির ভণ্ড এম এম কুমারারের কাছে কৃতজ্ঞ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৬০-৬১ সালের শেষে ভারতে নারিকেলের উৎপাদন প্রায় ৩৫ কোটি বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্যসরকারসমূহ যেসব কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন তার ফলেই এটা সম্ভব হ'তে চলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতে বার্ষিক ৪৩৭ কোটি নারিকেল ফলত।

ভারতে পর্যাপ্ত নারিকেল উৎপন্ন হ'লে সাবান, প্রসাধন দ্রব্য, মার্গারিন প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় নারিকেলের তৈলের জন্য আর বিদেশের মদ্যাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। তা ছাড়া, তখন দেশে শুল্ক নারিকেল শিল্প স্থাপন করা চলবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শুল্ক নারিকেলের যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং ঐ চাহিদা ভারত মিটাতে পারলে নারিকেল রপ্তানি ক'রে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

যদিও ভারত নারিকেল উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়, তথাপি দেশের প্রত্যক্ষ চাহিদা মেটাবার মত যথেষ্ট নারিকেল ভারতে উৎপন্ন হয় না। সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ ৮৭ একর জমিতে নারিকেলের চাষ হয়। তা সত্ত্বেও বর্তমানে বিদেশ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদি আমদানি করতে হয়। নারিকেল উৎপাদনে স্বাবলম্বী হ'তে পারলে বিপুল-পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নত জাতের নারিকেলের চাষ বৃদ্ধি এবং পোকামাকড়ের হাত হ'তে নারিকেল রক্ষাবিষয়ে প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যসূচি অনুযায়ী দেশের পতিত জমি-গুলিতে ক্রমে ক্রমে নারিকেল-কুঞ্জ রচনা করা হবে। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, নিয়মিত চাষ, সার

প্রয়োগ ও কীট-পতঙ্গ নাশের দ্বারা নারিকেলের উৎপাদন শতকরা ৫৫ ভাগ বাড়ান চলে। বর্তমানে ভারতে প্রতিটি গাছে গড়ে বার্ষিক ৩৫টি নারিকেল ফলে।

উৎপাদন বৃদ্ধি

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শুরুর হতেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে প্রদর্শনকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। কেরালা রাজ্যে ইতোমধ্যেই ঐরূপ ২৩৪টি প্রদর্শনকেন্দ্র রচিত হয়েছে। মাদ্রাজ, অম্ব ও উড়িষ্যায় যথাক্রমে ১৫০, ৫০০ ও ২৪টি প্রদর্শন-কেন্দ্র হবে। বোম্বাই রাজ্যের কচ্ছ এলাকায় প্রস্তাবিত দু'টির মধ্যে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রদর্শনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্য কেরালা-রাজ্যসরকার সব নারিকেল গাছে কীটঘ্ন ঔষধ ছড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। দেখা গেছে যে, কীট-পতঙ্গের আক্রমণে একমাত্র ঐ রাজ্যেই প্রায় ২ কোটি টাকা ফল নষ্ট হয়। এইসব কীট-পতঙ্গ বিনাশ সম্পর্কে গবেষণা চালাবার জন্য কোজিকোদে একটি গবেষণাগারও স্থাপিত হয়েছে। মাদ্রাজ রাজ্যের নাগেরকোয়েল ও গুডিয়াট্টমে ঐরূপ দু'টি কেন্দ্র আছে। অম্বপ্রদেশেও সম্প্রতি কাজোল ও অম্বজিপেটা নামক স্থানে ঐরূপ দু'টি গবেষণালয় খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বোম্বাইয়ের রত্নগিরি ও আলীবাগে অনুরূপ দু'টি গবেষণাগার খোলা হবে।

দেখা যায় যে, সাধারণত আট থেকে দশ বৎসর বয়স হ'লে নারিকেল গাছে ফলন শুরুর হয়। এই কারণে এর ফলন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যসূচি গ্রহণ আবশ্যিক। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে স্বল্প-মেয়াদী কার্যসূচি গৃহীত

হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও ঐগুলি চালান হবে। যেসব স্থানে জমিতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব রয়েছে সেসব স্থানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উপযুক্ত সার সরবরাহ করা হচ্ছে। পরেও সার সরবরাহ কার্য অব্যাহত রাখা হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক একর নারিকেলের জমিতে ৫৬০ পাউন্ড রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। তার মূল্য ৯৩ টাকা। অপর দিকে, তার ফলে একরপ্রতি বাৎসরিক আয় বাড়ে ১৪৭ টাকা। এই কারণে সার প্রয়োগ অবশ্যই লাভজনক।

বালুয় জমিতে গ্রীষ্মকালে জলস্তর বহু নিচে নেমে যাওয়ার নারিকেলগাছ ম'রে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই আশঙ্কা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতি ১০ একর জমিতে একটি ফিল্টার পয়েন্ট পাম্প বসান। ঐরূপ পাম্প বসিয়ে একরপ্রতি আরও প্রায় ১৩০ টাকা আয় বাড়ান চলে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

দেশে নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধির দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যসূচি অনুযায়ী অতিরিক্ত জমিতে নারিকেলের চারা বসান হবে, খারাপ জাতের গাছের স্থলে ভাল জাতের চারা সরবরাহ করা হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির

উদ্দেশ্যে নতুন নতুন গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের খালের ধার, কেরালার নিচু পতিত জমি, লাক্ষা দ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারিকেলের চাষ বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশেব অতিরিক্ত ২০ হাজার একর জমিতে নারিকেলের চাষ শুরুর হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ভারতে বার্ষিক অতিরিক্ত ৮৭ কোটি নারিকেলের প্রয়োজন হবে। ঐ সময়ে দেশে উৎপাদন ৩৫ কোটি বাড়লেও সমগ্র চাহিদা মেটাবার জন্য বিদেশ হতে প্রায় ৫০ কোটি নারিকেল আমদানি করতে হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে নারিকেলের উৎপাদন বাড়ার জন্য মোট ২৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা গবেষণার জন্য ব্যয় করা হবে। আশা করা যায় যে, তার মধ্যে প্রায় ২০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পরে ফেরত পাওয়া যাবে। কারণ সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাষীদের ধারে সরবরাহ করা হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ খাতে নীট ব্যয় হবে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।



কৃষি-কুটিরশিল্প-পশুপক্ষী ও শিশুস্বাস্থ্য প্রদর্শনী

হুগলি জেলার চন্দ্রহাটি গ্রিফসলী খাল জল-সরবরাহ ও কৃষি সমবায় সমিতির উদ্যোগে গত ২১এ মার্চ থেকে ২৫এ মার্চ পর্যন্ত এক বিরাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজাত ও কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্যাদি, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, আলোকচিত্র, সূচিশিল্প-দ্রব্যাদি, শিশুস্বাস্থ্য-প্রদর্শন ইত্যাদি ছিল প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য, দ্রাণ ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি-উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ উপলক্ষে সমাগত এক বিরাট জনসমাবেশে মাননীয় উদ্ভোধক ও সভাপতি খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের কর্তব্য বুদ্ধি দিয়ে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সমিতির কার্যদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উদ্ভোধন-অনুষ্ঠানের পর পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি-বিভাগের প্রচারশাখা কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাত্রি ৯১১টায় চন্দ্রহাটি দিলীপ স্মৃতি সংঘ কর্তৃক 'দাসীপুত্র' যাত্রাভিনয় হয়।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিবসে, ২২এ মার্চ অপরাহ্ন ৩টায় সমিতির ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় যৌথপ্রথায চাষ, সরকারী উদ্ভৃত্ত ও পতিত জমি সমবায় কৃষি সমিতিতে প্রদান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনায় সরকার কর্তৃক ব্যয়ের ই অংশের পরিবর্তে ঙ্গ অংশ বহন, শ্রমবিনিময়ী সাহায্যের দ্বারা সমিতির সেচের খাল খনন, পুনর্খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ তারিখ রাতে গ্রিবেণী রবীন্দ্র স্মৃতি সংসদ কর্তৃক 'পল্লীসমাজ' নাটক অভিনীত হয়।

প্রদর্শনীর তৃতীয় দিবসে, ২৩এ মার্চ অপরাহ্ন ৪টায় কৃষি, সমবায় ও সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাতে অংশগ্রহণ করেন কৃষিবিভাগের প্রচার-আধিকারিক ডক্টর তারেশচরণ রায়, কৃষি-সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, হুগলি জেলা সামাজিক শিক্ষা আধিকারিক শ্রীতাপস সেনগুপ্ত ও গ্রিবেণী টিসু মিলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন। সন্ধ্যা ৭টায় প্রচারবিভাগ কর্তৃক দুই হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে "কাজী নজরুল জীবনী", "লোকমান্য তিলক জীবনী" ও "জাগিয়া উঠেছে প্রাণ" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। রাত ১০টায় বেণীপুত্র মিতালী সংঘ কর্তৃক 'রক্ততিলক' যাত্রাভিনয় হয়।

২৪এ মার্চ বৈকাল ৫১১টায় গ্রিবেণী যন্ত্রী-সংঘের পরিচালনায় গানের আসর, ৭১১টায় হুগলি উদয়ন শিল্পী সংঘ কর্তৃক শিশু নাট্য 'তালবেতাল' এবং রাত ১০টায় বিশপাড়া পঞ্চানন্দ নাট্যসমাজ কর্তৃক 'বিচারক' যাত্রাভিনয় হয়।

২৫এ মার্চ প্রদর্শনীর সমাপ্তি-দিবসে শিশু-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সমাপ্তি-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হুগলির জেলাশাসক শ্রী এস কে ঘোষ, আই এ এস। বিভিন্ন বিভাগে শীর্ষ-স্থানাধিকারী প্রতিযোগীদের তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যা ৬১১টায় বাঁশবেড়িয়া দেশ-গৌরব সংগীত-বিতানের সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক নৃত্যানুষ্ঠান সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন দিলীপ স্মৃতি সংঘ কর্তৃক "কালাপাহাড়" যাত্রাভিনয় সেই রাতে না হয়ে পরদিন রাতে অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রিবেণী টিসু মিলের ম্যানেজার শ্রী এফ এ রেন-উইক (সভাপতি), সমিতির সম্পাদক শ্রীবিম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, টিসু মিলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন (সহঃ সভাপতি), হুগলি জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত, শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, মগরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীভজহারি বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি জেলা বোর্ডের সদস্য শ্রীকানাইলাল দাস, মহকুমা কৃষি-আধিকারিক প্রমুখ ৩৩ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কৃষি প্রদর্শনী সমিতির উদ্যোগে দ্বিবেণী টিসু মিল, স্থানীয় জনসাধারণ, কৃষিবিভাগ এবং

মগরা ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় ও দিলীপ স্মৃতি সংঘের সভ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাঁচ দিন-ব্যাপী এই প্রদর্শনী সদ্ভূতভাবে সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়। এই প্রদর্শনী দেখবার ও বিভিন্ন অনুরোধে যোগদান করবার জন্য অন্যান্য দশ সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এতদঙ্গে বিরাট চাঞ্চল্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।



টুকিটাকি

খারিফ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টা

কৃষিবিভাগের এক পরিকল্পনা অনুসারে খারিফ শস্যের বিশেষ করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের ৫ই মে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এক বৈঠকে আলোচনা হয়। কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সেকমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মদুখোপাধ্যায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য পরিকল্পনা অনুসারে, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের বীজের উৎপাদন ও বণ্টনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহারের ফলে একর-প্রতি অতিরিক্ত প্রায় তিন মণ ধান বা দুই মণের কিছু অধিক চাল উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি একর এলাকায় ধানের আবাদ হয় এবং রাজ্যের সমগ্র ধানের এলাকায় উন্নত ধরনের বীজ বোনা হ'লে সর্বসমেত আরও অতিরিক্ত ২০০ লক্ষ মণের কিংবা ৭ লক্ষ টনেরও অধিক চাল উৎপন্ন হ'তে পারে। উন্নত ধরনের বীজের জন্য ত্রিবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এদিকে ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে। গত বছর গ্রামগড়ালির ৫০,০০০ একর জমিতে প্রায় ১৮,০০০ মণ উন্নত ধরনের ধানের বীজ বণ্টন করা হয়। মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, একর-প্রতি ২০ মণ হারে ঐ উন্নত ধরনের বীজ পরিবর্ধনের ফলে ১০,০০,০০০ মণ বীজ পাবার আশা করা যেতে পারে। অগ্রগামী কৃষকদের নিজস্ব খামারে যে বীজের একটা বৃহদংশ উৎপন্ন হবে তার সমস্তটাই বণ্টন করা হবে না। এ বছর এই ধরনের প্রায় ৪,০০,০০০ মণ বীজ বণ্টন করা হবে। এই ৪ লক্ষ মণ বীজ ১২,০০,০০০ একর জমির জন্য দেওয়া হবে। তার ফলে তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে একরপ্রতি ২০ মণ হারে প্রায় ২.৪০ কোটি

মণ ধান উৎপন্ন হবে। আবার, এই উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ বা প্রায় ১.২ কোটি মণ উন্নত ধরনের বীজ প্রয়োগের জন্য পাওয়া যাবে—এই ভিত্তিতে হিসাব করলে তৃতীয় বছর এ রাজ্যের সমগ্র ধানচাষের এলাকা অর্থাৎ প্রায় এক কোটি একর জমি উন্নত ধরনের বীজের আওতায় আনা যাবে। সাধারণত, মোট এক কোটি একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপনের ফলে একরপিছ দুই মণ অতিরিক্ত ধানের ফলন ধরে নিলে এই উন্নত বীজ বপন পরিকল্পনার তৃতীয় বছরের শেষে সাত লক্ষ টনেরও অধিক অতিরিক্ত উৎপাদন দাঁড়াবে।

বিদেশী পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা এবং তার সঙ্গে জড়িত রাসায়নিক সারের অভাবের ফলে বীজ-পরিবর্ধন পরিকল্পনা এবং সবুজসার ও কম্পোস্ট তৈরির জন্য স্থানীয় সম্পদের সম্যকব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধণ্ডে প্রভৃতি সবুজসারের উৎপাদন ও প্রচলনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা হচ্ছে। কম্পোস্ট তৈরি, চারা সংরক্ষণ, শস্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শুরুর হয়েছে। এ বছর দু' আউন্সের ৬,০০,০০০ প্যাকেট ধণ্ডেবীজ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রারম্ভে কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্‌বোধন-প্রসঙ্গে দেশে খাদ্যাভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং এই নির্দারণ সমস্যার সমাধানে সমবেত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্ত্রিমহাশয় জানান যে, উন্নত বীজ ও উন্নত কৃষি-প্রক্রিয়া প্রয়োগের ফলে বিস্ময়-সৃষ্টি সম্ভব এবং তিনি আশা করেন যে, সাধারণভাবে জনগণের সহযোগিতার ফলে অদূর-ভবিষ্যতে এই রাজ্য খাদ্য-বিষয়ে স্বয়ংনির্ভর হ'তে পারবে। মন্ত্রিমহাশয়ের বক্তৃতার পর একটি আলোচনা শুরুর হয়—এতে অংশগ্রহণ করেন সেক ও জলপথ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মদুখোপাধ্যায়, কৃষি-উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ

শ্রীহরিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি, পশুপালন ও বন-বিভাগের সচিব শ্রী সি কে রায়, কৃষি-অধিকর্তা ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

উম্বাস্তু হস্তশিল্প বিক্রয়কেন্দ্রের শাখা

লোকসভার সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায় ১৫ই এপ্রিল রাসবিহারী এভিনিউর গ্রিকোণ পার্কে উম্বাস্তু হস্তশিল্প বিক্রয়কেন্দ্রের একটি নতুন শাখার স্বারোচ্চাটন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী সীতা চৌধুরী। শ্রীমতী রেণুকা রায় যখন পশ্চিমবঙ্গের উম্বাস্তু গ্রাণ ও পদনবাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় তাঁর উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৭ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের শিল্পদ্রব্য বিক্রি হয় এবং কর্মীদের (এঁরা সকলেই উম্বাস্তু) বেতন বাবদ ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠান ভারত-সরকারের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেছে।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণপ্রসঙ্গে শ্রীমতী রায় বর্তমানে একটি বেসরকারী সমিতি কর্তৃক পরিচালিত এই সংস্থার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি উম্বাস্তুদের হস্তশিল্পগুলির সঙ্গে সাধারণ ক্রেতাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত করতে এবং সরকারের কাছে প্রচুর পরিমাণ জিনিস বিক্রির উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে বলেন।

তার আগে প্রতিষ্ঠানের সচিব শ্রীমতী নীহার গুপ্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির বিবরণ পাঠ করেন।

বাঁকুড়ায় বোরো ধানের আবাদে উৎসাহ

আসন্ন খারিফ ফসল অভিযানের বন্দোবস্তগুলি পরিদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি বাঁকুড়া সফর করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোতস্বিনীগুলিতে ছেদক (ক্রস) বাঁধ তৈরি করে বোরো ধান আবাদের জন্য বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের সহিত মিলিত হন। এই উপায়ে বাঁকুড়া জেলায় বোরো ধানের আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের দুইশ' ছেদক বাঁধ নির্মিত হয়েছে। মন্ত্রিমহাশয় প্রায় ৬,০০০ একর এলাকায় জলসেচনের জন্য টেস্ট রিলিফের অধীনে সমাপ্ত রাজবাঁধ নামক একটি পরিকল্পনা, হেমচা ক্রস বাঁধ, পাথা অস্থায়ী ক্রস বাঁধ এবং বাঁকাদহ ক্রস বাঁধ পরিদর্শন করেন। হেমচা ক্রস বাঁধে প্রায় ৫০ একর নতুন জমি বোরো আবাদের অধীনে আনা হয়েছে। পাথা অস্থায়ী ক্রস বাঁধে ৩৫০ একর জমি বোরো চাষের অধীনে আনা হয়েছে এবং বাঁকাদহ ক্রস বাঁধে মোদিনীপুর্ পর্বত ৫ মাইল পথ বরাবর নয়নাভিরাম বোরো ধানের আবাদ চলছে। এসকল ক্ষেত্রে কৃষিমন্ত্রী বিশিষ্ট কৃষিজীবীদের সহিত মিলিত হন এবং পূর্বে যেসব এলাকায় কখনও শস্যের আবাদ হয় নি সেসব এলাকায় বোরো ধানের আবাদে তাঁদের যে সাড়া মিলেছে সেজন্য তাঁদের অভিনন্দিত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৮ সালে বাঁকুড়া জেলায় মাত্র ১,৬০০ একর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়। এ বছর সেখানে ২,৩০০ একরেরও বেশি এলাকায় এই চাষ করা হচ্ছে। অস্থায়ী ক্রস বাঁধ নির্মাণকালে টেস্ট রিলিফ তহবিল বিনিয়োগের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের গভীর আগ্রহ দেখা গিয়েছে। ফলাফল দৃষ্টে স্থানীয় কৃষিজীবীরা এরূপ প্রভাবিত হয়েছেন যে, তাঁরা ঐসব ক্রস বাঁধগুলিকে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সেগুলির ব্যয়ের একাংশ প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন দেখে কৃষিমন্ত্রী সন্তোষলাভ করেন। উক্ত জেলার এসকল উন্নয়ন-কার্য হাতে দেখা যায় যে, অন্য যে-কোন প্রকার টেস্ট রিলিফ কার্য অপেক্ষা এ ধরনের ক্ষুদ্র সেচন-কার্য অধিকতর উপকার সাধন করে থাকে। এ বছর

বাঁকুড়ায় প্রচুর পরিমাণ বোরো ধান জন্মাবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে বাঁকুড়ার স্থান একমাত্র মালদহের পরেই। মালদহে বহুদিন থেকে বোরো ধান উৎপাদন করা হচ্ছে।

সফরকালে কৃষিমন্ত্রী বাঁকুড়া শহরে জেলা হাঁস-মুরগি পরিবর্ধনকেন্দ্র, কোটালপুত্র সমবায় দপ্তর-প্রতিষ্ঠান, পিয়ারডোবায় আদিবাসীদের মেঘ, ছাগ ও শূকর প্রদর্শনী, শিশল ও সাবুই ঘাস থেকে নানা জিনিস তৈরির শিক্ষণকেন্দ্র ও পরিশেষে বাঁকুড়ায় কৃষি ও পশু প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

পল্লী অঞ্চলে প্রদর্শনী

গত ২৪এ এপ্রিল উন্নয়ন বিভাগের মহিলা কর্ম-সূচির প্রাধিকারিক শ্রীমতী এ মদুখোপাধ্যায় সন্নিহিত-পোখরিতে তিনদিনব্যাপী এক কৃষি-স্বাস্থ্য-শিল্প ও পশুপক্ষী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্নিহিত-পোখরি জোড়বাংলো সমিতি উন্নয়ন ব্লক-এর আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে দার্জিলিং সদরের মহকুমা-শাসক শ্রী ভি মিশ্র, আই এ এস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য সভায় শ্রী এম লামা, শ্রীমতী এ মদুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ঐ ধরনের প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রচার, পশুচিকিৎসা, বন প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

অপর একটি পশুপক্ষী প্রদর্শনী পশ্চিম দিনাজপুরের মহিমাগড়ে গত ১৯এ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসক শ্রী বি বি মন্ডল, আই এ এস। প্রদর্শনী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত লোক-নৃত্য ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে বহুসংখ্যক আদিবাসী অংশগ্রহণ করেন। জেলাশাসক পুরস্কার বিতরণ করেন এবং তাঁর ভাষণে যত্নসহকারে পশুপক্ষী পালনের জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দেন। এ উপলক্ষে পশুপক্ষী সম্বন্ধে একটি চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়।

কার্সিংগে প্রদর্শনী

দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রী পি সি বন্দ্যোপাধ্যায়, আই এ এস, সম্প্রতি কার্সিংগে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও বেসরকারী বহু সংস্থা কর্তৃক কৃষি, পশুপরিজ্ঞান, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, সূচিশিল্প, চিত্রাঙ্কন এবং বিদ্যালয়ের শিশুদের অঙ্কিত চিত্রের স্টল খোলা হয়। কার্সিংগের মহকুমা-শাসক শ্রী জে কে কোহলি, আই এ এস, পুরস্কার বিতরণ করেন।

কালিম্পঙে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-উপমন্ত্রী শ্রী নরবাহাদুর গুরুঙ্গ-এর সভাপতিত্বে গত ৫ই মে কালিম্পঙ আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভবনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রী পি কে বাগচি উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ প্রদান করেন। শ্রী নরবাহাদুর গুরুঙ্গ তাঁর ভাষণে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন এবং তার সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের সেবারতীর মনোভাব নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করেন।

উপমন্ত্রী মহাশয় সফলকাম শিক্ষার্থীদের 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' প্রদান করেন।

হুগলি জেলা শস্য প্রতিযোগিতা

হুগলি জেলা শস্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি চুঁচুড়ার রাজ্য কৃষিক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে হুগলির জেলাশাসক শ্রী এস কে ঘোষ, আই এ এস এবং অতিরিক্ত জেলা-শাসক শ্রী এস এন বিশ্বাস। জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা-শাসক।

এক ভাষণে জেলাশাসক শস্য উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনে কৃষকদের

উদ্ভুদ্ধ করার জন্য পুস্তক প্রত্যাগীদের আহ্বান জানান। তিনি সমবায় চাষ ও খাদ্যসমস্যা সমাধানে তার উপযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।

শিল্প সমবায়ের উন্নয়নে সমন্বয় সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার শিল্প সমবায় সমিতির উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বয় সমিতি স্থাপন করেছেন। সমিতির কার্য হবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (ক) রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প সমবায় সমিতিগুলির জন্য ক্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন; (খ) শিল্প সমবায় সমিতির সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ একীভূত করা এবং রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প সমবায় সমিতিগুলির কার্যের একটি বাৎসরিক পরিমাপ নির্ধারণ করা।

পশুপদুষ্টি বিষয়ে গবেষণা

হরিণঘাটায় আঞ্চলিক পশুপদুষ্টি গবেষণা কেন্দ্রের একটি পরিকল্পনা হরিণঘাটায় কার্যকরী করা হচ্ছে। উক্ত পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের পশুখাদ্য শস্য ও তুণের সমীক্ষা এবং পশুদের উপর এসবের পদুষ্টিগত মূল্যের সমীক্ষা। সরকার ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আরও দু' বছরের জন্য উক্ত পরিকল্পনা চালু রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন।

আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা

গত ২৩এ এপ্রিল মেদিনীপুরের সমবায় সমিতি-সমূহের সহ-নিবন্ধক শ্রী ডি এন চ্যাটার্জি গিদনী আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলায় উদ্বেধান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ উক্ত সমিতির জন্য ১০,০০০ টাকা অনাবর্তক অনুদান এবং ১০০ টাকা আবর্তক অনুদান মঞ্জুর করেছেন। সমিতির সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ১৪৪ এবং ধানবীজ সহ ৫৬০ মণ ধান এই ধর্মগোলায় মজুত করা হয়েছে। সমবায় দফতর ধর্মগোলায়

পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানেই এটি পরিচালিত হবে।

এই সমিতি স্থাপনের ফলে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের কর্মহীন থাকার সময়ে ধান মজুত রাখার উদ্দেশ্যে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণের জন্য আর মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হবে না। এই সময়ে তাঁরা জীবনধারণের জন্য উক্ত সমিতি থেকে ন্যায়সংগত সুদে ধান ঋণ পাবেন। এর ফলে চাষের সময়ে ভাল বীজ সরবরাহের সমস্যারও কিছু সুরাহা হবে।

এই জেলায় আদিবাসীদের জন্য ইতোমধ্যেই আটটি সমবায় ধর্মগোলা স্থাপিত হয়েছে এবং আরও তিনটি শীঘ্রই স্থাপিত হবে। বর্তমান শস্যগোলাগুলি ঝাড়গ্রাম (চারটি), বিনপদুর (একটি), নয়াগ্রাম (একটি), গড়বেতা (একটি) ও গোপীবল্লভপদুর থানা এলাকায় (একটি) স্থাপিত হয়েছে।

গিদনী শস্যগোলায় সভাপতি শ্রীবাণেশ্বর সরেন এবং সম্পাদক ত্রিলোচন মুরমু। এই উদ্বেধান উপলক্ষে স্থানীয় আদিবাসীদের খুবই উৎসাহী দেখা যায়। সরকারী সাহায্যে তাঁরা ধান মজুত করার জন্য এবং সমিতির অফিস স্থাপনের জন্য একটি পাকাবাড়ি নির্মাণ করেছেন।

নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ

এই রাজ্যে নারকেলের আবাদ এবং নারকেল ও তার ছোবড়া ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। কৃষি-উপায়ন্ত্রী উক্ত পর্ষদের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। বহুসংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তি এবং কৃষি-অধিকর্তা প্রমুখ সরকারী কর্মচারী পর্ষদের সদস্য হয়েছেন।

কেশিয়ারীতে শস্যগোলা

গত ২৮এ এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারী থানার কুকাই আঞ্চলিক আদিবাসী সমবায় শস্য

ভান্ডারের উদ্যোগে একটি সমবায় শস্যগোলায় উন্মোচন হয়। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের কল্যাণার্থে শস্যগোলায় ব্যয় বাবত ১০,১৬৬ টাকা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া, গোলায় রক্ষণাবেক্ষণ বাবত সংস্থাকে পৌনঃপুনিক ৯৬৬ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শস্যগোলায় ২৬৮ জন সদস্য নিম্ন-লিখিত শর্তে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করেছেন যে, প্রত্যেকে নিজ অংশ স্বরূপ ১ মণ ও প্রবেশমূল্য স্বরূপ ১০ সের ধান দিবেন। তার পরিবর্তে তাঁদের দুর্গতির সময়ে তাঁরা এক মণ ধান ঋণ পাবেন।

কলিকাতা পশুশালায় ব্যবস্থাপনা

আলিপদুর চিড়িয়াখানার পশুদের মৃত্যু সম্পর্কে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে সংবাদপত্রে কয়েকটি বিবৃতি এবং চিড়িয়াখানার কার্যনির্বাহক সমিতির প্রশাসনিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোন কোন সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার নিজস্ব আধিকারিকবর্গ এবং কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান।

উক্ত অনুসন্ধানের বিবরণী থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সন্তোষজনকরূপে মনে করেন যে, ১৯৫৮

সালে আলিপদুর চিড়িয়াখানার পশুদের মৃত্যু শব্দ স্বাভাবিকই ছিল না, বস্তুত তাদের মৃত্যুসংখ্যার গত ২০ বছরের গড় হিসাবের তুলনায় এ বছরের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম ছিল। চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনায় তথাকার কর্মীদের তত্ত্বাবধানের অভাব বা অযোগ্যতাও ছিল না। ইতোমধ্যেই কার্য-নির্বাহক সমিতি কর্তৃক চিড়িয়াখানার বিবিধ উন্নয়নকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং মাংসাশী জন্তুদের জন্য উন্মুক্ত আবাস, শিশুদের জন্য চিড়িয়াখানা ইত্যাদি আরও অনেক উন্নয়নকার্য এর মধ্যেই রূপায়িত হচ্ছে।

বাইরের কিছু লোক বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করছিলেন এবং কার্য-নির্বাহক সমিতি সংগতভাবেই এসকল বহিরাগতের কার্যকলাপে বাধা দানের সঙ্কল্প করায় পশুমৃত্যুর হার গত বিশ বছরের গড় অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে কম হওয়া সত্ত্বেও পশুমৃত্যু সম্পর্কে সংবাদপত্রে এত প্রচার করা হয়েছে বলে মনে হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক যে যথাযথ দক্ষতার সহিত পশুশালা পরিচালিত হচ্ছে এবং তথায় পশুমৃত্যুর হারও যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মদ্রণে অধীক্ষক
শ্রীশুভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মদ্রিত।

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ণাত চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬।১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইবাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগুদা
	পোঃ নৈহাটা	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	
১৪। ঐ ..	হাবড়া	ক্যান্টনমেন্ট।	
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সন্দেখখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়েয়া		

বহুভাষা

হাওড়া

জেলা পশ্চাচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারভলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ	.. ডোমজুড়
৩।	ঐ	.. আমতা

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	হাওড়া
২।	ঐ	.. উলুবেড়িয়া
৩।	পশ্চাচিকিৎসক, জাতীয়	উলুবেড়িয়া
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	ঐ	.. বাগনান
৫।	ঐ	.. শ্যামপুর
৬।	ঐ	.. ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চাচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	স্বাক্ষর	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	.. বেথুয়াডহরি
৩।	ঐ	.. রানাঘাট
৪।	ঐ	.. শান্তিপুর

১।	স্বাক্ষর	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	.. রানাঘাট
৩।	পশ্চাচিকিৎসক, জাতীয়	ফুলিয়া,
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	পোঃ ফুলিয়া
		কলোনী
৪।	ঐ	.. চাক্দা
৫।	ঐ	.. হাঁসখালি
৬।	ঐ	.. রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চাচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	স্বাক্ষর	বহরমপুর
২।	ঐ	.. হরিহরপাড়া
৩।	ঐ	.. দমকল
৪।	ঐ	.. রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ	.. ভগবানগোলা
৬।	ঐ	.. ধুলিয়ান
৭।	ঐ	.. নবগ্রাম

১।	স্বাক্ষর	বহরমপুর
২।	ঐ	.. জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ	.. অঙ্গীপুর
৪।	ঐ	.. কান্দি
৫।	পশ্চাচিকিৎসক, জাতীয়	বেলডাঙ্গা
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৬।	ঐ	.. বারওয়ান,
		পোঃ পাঁচখুপী
৭।	ঐ	.. কান্দি
৮।	ঐ	.. ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ	আইহো
৩।	ঐ	ওল্ড মালদহ

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশ্চন্দ্রপুর
৩।	ঐ	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪।	ঐ	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫।	ঐ	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ	গঙ্গারামপুর
৪।	ঐ	ইসলামপুর

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ	হেমতাবাদ
৪।	ঐ	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ	ধুম
৩।	ঐ	কাসিয়াঙ
৪।	ঐ	মিরিক (কাসিয়াঙ)
৫।	ঐ	তিস্তাভ্যালি
৬।	ঐ	শিলিগুড়ি
৭।	ঐ	নক্সালবাড়ি

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ	কালিম্পাঙ
৪।	ঐ	শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়াট, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ	সুকিয়াপকরি, জোড়বাংলো
৮।	ঐ	কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ	মেকলিগঞ্জ
৩।	ঐ	মাখাডাঙ্গা

ক্রমিক	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ	তুফানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪।	ঐ	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা	
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	কালিচিনি	সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
			৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	গুস্করা	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..	মোমারী	২।	ঐ ..	কাটোয়া
৩।	ঐ ..	সেহারা বাজার	৩।	ঐ ..	কালনা
৪।	ঐ ..	কালনা	৪।	ঐ ..	আসানসোল
৫।	ঐ ..	কাটোয়া	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	ভাতার
৬।	ঐ ..	নতুনহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৭।	ঐ ..	আসানসোল	৬।	ঐ ..	মঙ্গলকোট
৮।	ঐ ..	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ ..	শক্তিগড়
৯।	ঐ ..	দুর্গাপুর	৮।	ঐ ..	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	সাঁইথিয়া	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..	বোলপুর	২।	ঐ ..	রামপুরহাট
৩।	ঐ ..	দুবরাজপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	নলহাটি
৪।	ঐ ..	রামপুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৫।	ঐ ..	নলহাটি	৪।	ঐ ..	মহম্মদবাজার
			৫।	ঐ ..	আমেদপুর
			৬।	ঐ ..	বোলপুর,
					শ্রীনিকেতন

জুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জুগলি, চুঁচুড়া

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	ত্রিবেণী	২।	ঐ ..	শ্রীরামপুর
৩।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	আরামবাগ
৪।	ঐ ..	তারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
			৪।	ঐ ..	খানাকুল
			৫।	ঐ ..	পুরসুয়া,
					পো: চাঁপাডালা
			৬।	ঐ ..	পোলবা,
					পো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক	ব্রাহ্মাণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক্
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুঁরা
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটেশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুঁরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাং

জলপাইগুড়ি

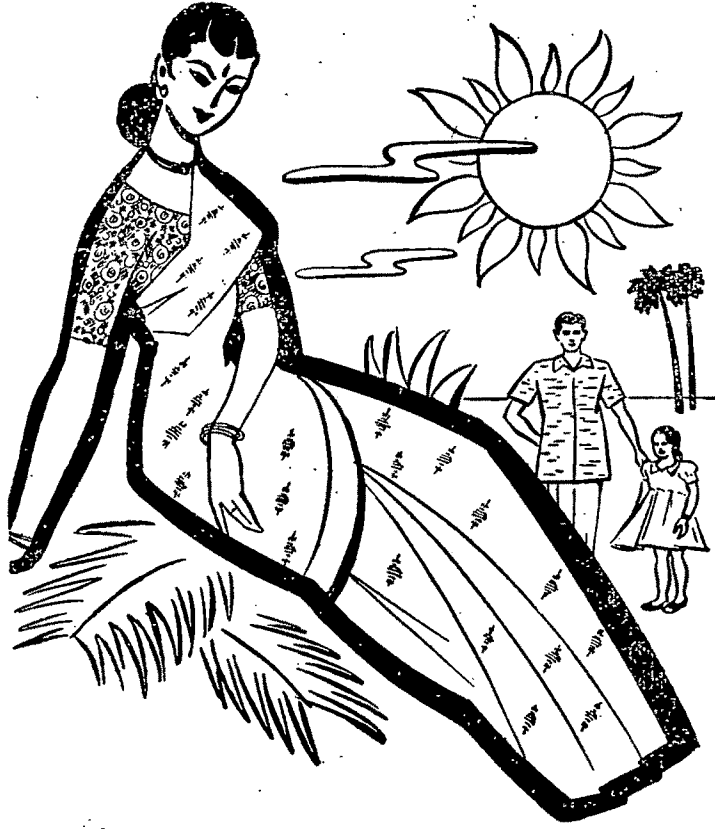
- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

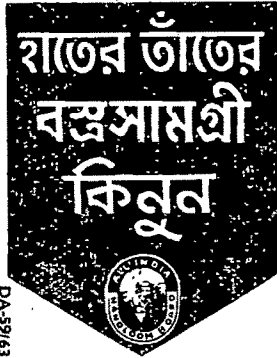
ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর



শীতল ও আরামদায়ক গ্রীষ্মকালীন পরিধেয়



বহু শতাব্দী যাবৎ ঠাণ্ডা ও আরাম-
দায়ক গ্রীষ্মকালীন পরিধেয় হিসেবে
ভারতের হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী
অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করে
আসছে। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের
জন্ত আপনি চান্দেরী শাড়ী, কোমল
মসলীন ডোরিয়া ও বিভিন্ন রঙের
ও নক্সার নানারকম সূতীবস্ত্রের যে
কোনটা বেছে নিতে পারেন।

দামে যুক্তিসঙ্গত—উপযোগিতায় পছন্দসই

বিদেশে রপ্তানীর জন্ত, হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী শিগ্গীরই গুণালুসারী
চিহ্নিত করা হবে। বিশদ বিবরণের জন্ত অমুগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় লিখুন।

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড

শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই - ১

সচিপত্র

				পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	...	...	...	৫৩
সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন	...	...	...	৫৬
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ	...	...	...	৬২
তাল-খেজুরের পাল্লা	...	...	...	৬৯
স্বল্পপায়ী শিকার-প্রাণী	...	...	...	৭১
ফলন বৃদ্ধি	...	...	...	৮০
কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়	...	...	...	৮২
হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশ	...	...	...	৮৪
পানচাষের কথা	...	...	...	৮৬
হেতালপাতার প্রচলন	...	...	...	৯০
লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা	...	...	...	৯২
বনমহোৎসবে লাগানো গাছের হিসাব	...	...	...	৯৫
টুকিটাকি	...	...	...	৯৮

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিঘাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বসুন্ধরা

১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

বুদ্ধ সম্বন্ধি পথনির্দেশক—কথাটি জ্ঞানগর্ভ।
লোহা, কয়লা আর তেলের বিষয় যখন এ যুগের
সভ্য মানুষের চিত্তকে একান্তভাবে আকৃষ্ট করে
রেখেছে, সেই সময়ে বুদ্ধের সম্বন্ধে এই অনুশাসন
বারংবার উচ্চারণের যোগ্য।

মাটি, জল আর জীব হচ্ছে প্রকৃতির আদি
ত্রয়ী। উদ্ভিদ আর প্রাণী এই উভয়কে নিয়েই
জীবজগৎ। তাই মানুষ হচ্ছে আদি ত্রয়ীর
অপরিহার্য অঙ্গ। যত সে প্রাকৃতিক বিধানের
বিরুদ্ধাচরণ করে তত সে নিজেরই ক্ষতি করে।
প্রকৃতির ধারাকে উপলব্ধি করে তারই সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই
নিহিত রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। প্রকৃতিকে
মানাতে হ'লে তাকে মানতে হবেই।

পৃথিবীর সকল জীবের মূলে রয়েছে মাটি আর
জল। যেখানে মাটি আর জলের সমন্বয়,
সেখানেই তরলতা-গুণাত্বের প্রাচুর্য। এই
পৃথিবীর জীবকুলের প্রধান খাদ্য-উৎপাদক
উদ্ভিদ। উদ্ভিদ যেভাবে জল বায়ু সূর্যালোক
এবং মাটির মধ্যকার জব্বীয় লবণ থেকে খাদ্যের
সংশ্লেষণ করে, তা মর্তলোকের এক বিষ্ময়কর
ঘটনা। উদ্ভিদ শুধু নিজের জন্যই খাদ্য প্রস্তুত
করে না, সচল প্রাণীদের জন্যও খাদ্যের সংস্থান
করে। মানুষের খাদ্য আসে উদ্ভিজ্জ আর
প্রাণিজ—দুই সূত্র থেকেই। সুতরাং, মাটি
জল আর উদ্ভিদরাজ্যের মধ্যে যাতে সুস্থ সামঞ্জস্য
রক্ষিত হয়, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সেদিকে
লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যিক।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, প্রাকৃতিক
তিনটি মূল সম্পদের মধ্যে উদ্ভিদের ভূমিকা
প্রধান। ভূমি যেখানে অরণ্যে সমাচ্ছাদিত,
সেখানেই বিশুদ্ধ জলের প্রাচুর্য। শ্রোতস্বতীর
জল সেখানে নির্মল এবং চিরবহমান। সেখানে
মৃত্তিকাতে জল শুষোষিত। এইভাবে মাটির
তলায় যে জল সঞ্চিত হয়, তা থেকেই উৎসারিত
হয় প্রস্রবণ। সেই জলই কূপের মধ্যে পূর্ণ হয়ে
থাকে গৃহস্থালির প্রয়োজনে আর শস্যক্ষেত্রে সিঞ্চনে
নিয়োজিত হওয়ার জন্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠান-
গুলিতেও বিশুদ্ধ নির্মল জলের চাহিদা বিরাট।

নদীর অববাহিকা থেকে যেখানে বনোচ্ছেদ
করা হয়েছে, সেখানে জমির উপর-স্তরের মাটি
গেচে ক্ষয়ে এবং নিচের স্তরের পাথর-নুড়ি সব
জলে ধুয়ে এসে শ্রোতের টানে বহুদূর পর্যন্ত চলে
গিয়ে নদীর তলায় জমা হয়েছে। এইভাবে
নদীর তলা ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে।
পাহাড়ের ঢালুতে গাছগাছড়ার অবরোধ না
থাকলে জল মাটিতে শুযতে পায় না; প্রবল বর্ষণ
হ'লে উপর থেকে জল বিপুল বেগে ঢাল বেয়ে
নিচে নেমে যায় এবং বিশ্বাসী প্লাবন ভরাট
নদীতলার উপর দিয়ে বয়ে চলে যায় নিকটের
আবাদী এলাকায়। বর্ষাকালের অন্তে নদীগুলি
সূক্ষ্ম জলধারায় পরিণত হয়, ঝরনা কূপ সব
শুকিয়ে যায়।

যেখানে বাতাসের গতি প্রবল, বৃষ্টিপাত কম
এবং গরম বেশি সে রকম অঞ্চলে যদি হালকা
মাটির জমি থেকে বন-উচ্ছেদ করা হয় তবে মাটি

শুকিয়ে ধুলো হয়ে বাতাসের বাহনে বহুদূর পর্যন্ত উড়ে গিয়ে এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বহু মরুভূমিরই সৃষ্টিলাভের মূলে রয়েছে অজ্ঞতাবশে এই রকম বনের দ্রুত উচ্ছেদ এবং কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ধাতু-তাপনে জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার। প্রতিকূল জলবায়ুর অঞ্চলে একবার যদি বনের বিনাশ করা হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে গাছ লাগিয়ে তার স্থলে আবার বনগঠন করা নিতান্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বৃক্ষ তার পরিবেশে যে আর্দ্রতার সঞ্চার করে, মৃত্তিকার নিম্নস্তরে যে জল সঞ্চিত করে, তার অভাবে তা আর হ'তে পারে না; সুতরাং কোন জায়গা থেকে ব্যাপকভাবে বৃক্ষের উচ্ছেদ করলে, সেই ভূমি মানুষের এবং পশুর উপকারসাধনে সমভাবে অযোগ্য হয়ে পড়ে। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর গায়ের চামড়া জীবন্তে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তার এক-চতুর্থাংশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিক, অতীতে মহতী সভ্যতার লীলাঞ্চল ছিল এমন বহুস্থান মরু-কবলিত হয়ে মানবজগতের সমক্ষে এই সত্যেরই পরিচয় রেখেছে। ফরাসীদেশের বড় একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যথার্থই বলেছেন যে, “অরণ্য মানবের পুরোগামী আর মরু পশ্চাদগামী”।

এইভাবে আমাদের পরিবেশে বৃক্ষের প্রাধান্য। বৃক্ষের সমষ্টিকে বলা হয় অরণ্যক—যা নদীর অববাহ-ভূমিকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের গৃহের, আমাদের পৌরজীবনের, আমাদের কৃষিকর্মের, আমাদের শিল্পশালার প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে সকল সময়ে নির্মল জল পাওয়ার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে। বন কৃষিভূমির উর্বর মাটি ধুয়ে নদীতে বয়ে যাওয়া বন্ধ করে। আবাদী জমির উপরস্তরের মাটি শুকিয়ে ধুলো হয়ে বোড়ো হাওয়ায় দূরে উড়ে যাওয়া রোধ করতে পারে বন আর বৃক্ষ-বলয়। পৃথিবীতে আমাদের সহবাসী যে অজস্র প্রকারের বিচিত্র পশুপক্ষী, অরণ্যই তাদের বাস-

ভূমি। আমাদের কৃষির ক্ষতিকারী বহু রকমের কীটপতঙ্গকে যেসব পাখি সার্থকভাবে দমন করে, তাদের আশ্রয় আমাদের আশপাশের আর বনের গাছগুলি। অরণ্য এবং বৃক্ষরাজি আমাদের পরিবেশকে, সমতল আর পার্বত্যভূমিকে নিরাপদ রাখে এবং সেইসঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। বৃক্ষহীন প্রান্তর হাহাকারের এবং রৌদ্র-রষ্টি-ঝঞ্ঝার অদমিত রোবের প্রতিচ্ছবি।

গাছ এবং বন যে কত রকমে আমাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে আসে, সে কথা এখনও বলা হয় নি।

রেলগাড়িতে যিনিই ভ্রমণ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, লক্ষ লক্ষ কাঠখণ্ডের অবলম্বনে পাতা রয়েছে হৃদীয় লৌহপথ। আমাদের অসংখ্য রেলগাড়িই তো কাঠ দিয়ে তৈরি। আমাদের সর্বব্যাপী কাঁচ-পাকা সড়ক-গুলির উপর দিয়ে যে ছুটে চলে অসংখ্য বাস আর লরি, চলে অগণিত গোরুর গাড়ি আর মোবের গাড়ি, তার কোনটাই কাঠ ছাড়া তৈরি হ'তে পারে নি। আমাদের ঘরে ঘরে দরজায়, জানালায়, আসবাবে, দোলনায়, খেলার পুতুলে, যন্ত্রপাতির হাতলে—সর্বত্র কাঠ আর কাঠ! দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় অনেক সময় অনেকের গোটা বাড়িটাই তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। আমাদের অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, সভা-গৃহে, রঙ্গালয়ে, খামারে, কারখানায়—সর্বত্র কাঠ অপরিহার্য। সবার উপরে, জগদ্ব্যাপী সভ্যতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে যে লক্ষ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই কাগজ প্রস্তুত হয় বনজ সম্পদ দিয়ে। কাগজ ছাড়া শিক্ষা, শাসন, ইতিহাস, উন্নয়ন—সবই অচল। সভ্যতার এই উপাদানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য শুধু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক : নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের একটি রবিবারের সংখ্যা ছাপতে যে কাগজ লাগে, সেই পরিমাণ কাগজ তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পুরোপুরি

চবিশ একর বনভূমি উজাড় করার দরকার হয়। এ ছাড়া, গাছ থেকে নানা রকমের আঁশ, রেশমী আঁশ, কষায়জব্য, আঠা, রজন, তেল, রঞ্জনজব্য, ঔষধ প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং এসব জিনিস শহরে গ্রামে সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এসব কথা আলোচনা করলে বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের অর্থটি সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা পালনের চেষ্টা করি তা হচ্ছে বৃক্ষের উৎসব বা তরুমহোৎসব, কিন্তু গাছও তরু বন অবশিষ্ট রয়েছে, এ উপলক্ষে তার প্রতি ঋণের কথাটা আমাদের স্মরণ করা উচিত এবং আমাদের সংকল্প করা প্রয়োজন যে, আজও যতটা বনভূমি আছে, আমাদের সর্বসামর্থ্যে তাকে রক্ষা করতে তো হবেই—তা ছাড়া, গাছের যে অভাব এখন রয়েছে, আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সেই অভাব দূর করার জন্য আরও নতুন বন সৃষ্টি করতে হবে।

বৃক্ষ জীবনধারার অবিচ্ছিন্নতার প্রতীক। মানুষের চেয়ে গাছ বেশি দিন বাঁচে। কথায় বলে, এক পুরুষে চারা লাগায়, আর-পুরুষে ফল খায়। হেলেবেলাতে আমরা হিতোপদেশে উত্তরপুরুষের জন্য বৃক্ষরোপণের কাহিনী পড়েছি। তার মানে, বৃক্ষোৎসবের মূল ধারণাটি অন্তত হিতোপদেশের মত প্রাচীন এবং আমাদের দেশের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। এ হচ্ছে আমাদের দেশের এক মহতী প্রথা। আমাদের জাতীয় জীবনের পরাধীনতার চুঃখের মধ্যে যে-কালট' কেটেছে, সেই সময়ে আরও কয়েকটি সং প্রথার সঙ্গে এটিকেও আমরা ভুলেছি।

ভূসৌন্দর্যের মুখ্য উপাদান তরুরাজি। তরুনয়নরঞ্জন এবং মানবের অশেষ কল্যাণকারী।

পথের পাশে থেকে তার সৌন্দর্যের সাথে পথের উপর ছায়ার বিস্তার করে। বৃক্ষ আমাদের গৃহপরিবেশকে মনোরম করে, সেইসঙ্গে ফলদান করে আর জালানি যোগায়। এমনকি কৃষির মাঠের ধারেও সারি দিয়ে 'বাবুল' প্রভৃতি গাছ লাগানো যায়। এসব গাছ বিশেষ ছায়াকর নয় বলে ফসলের ক্ষতি করে না। বাবুলগাছ থেকে পশু-খাত্ত আর ভাল জালানি পাওয়া যায়, চাষীদের নানা কাজের উপযোগী ভাল কাঠও পাওয়া যায়। পতিত জমিতে শিমুলগাছ লাগানো চলে। এ গাছ তার উজ্জ্বল রক্তবর্ণের ফুলের রাশিতে অপূর্ব শোভা ধারণ করে। পাখিরা এ গাছে আশ্রয় নেয় এবং পরম আগ্রহে এর ফুলের মধু পান করে। পাকিং বাল্লের তক্তার জন্তু এবং দিয়াশলাই-এর বাল্ল আর কাঠি তৈরির জন্তু শিমুলকাঠ বিশেষ উপযোগী। এমনি আরও নানা রকমের গাছ পল্লী-অঞ্চলের পতিত জমিতে লাগানো যেতে পারে—যারা শুধু ছায়াই দান করে না, জালানি, কাঠ আর পশুখাত্তও যোগায়।

কথিত আছে যে, কোন দেশের জাতীয় কৃষ্টির মান তার বৃক্ষসম্পদে প্রতিফলিত। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা খোটেই আমাদের প্রশংসা করতে পারি না। রাস্তার ধারের আর সাধারণ জায়গার গাছগুলিকে আমরা যে নির্মম হস্তে অবিরতই ছেদন করে চলেছি, তার মধ্যে আমাদের উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায় না। আত্মন, আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও বহু গাছ লাগিয়ে আমাদের দেশে মনোরম শ্যামলী ফুটিয়ে তুলি এবং যে গাছগুলি এখন আমাদের ফল ফুল ছায়া সৌন্দর্য বিতরণ করছে, আন্তরিক মমতায় তাদের জালন করি।

সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন

সুইডেনে যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এত বেশি হয় তার একাধিক কারণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এসব কারণের মধ্যে সার ব্যবহারই প্রধান।

এক শতাব্দী আগেও যে দেশটি একেবারে কৃষি-নির্ভর ও অনন্নত ছিল, এখন শিল্প ও কৃষি উভয়-ক্ষেত্রেই পৃথিবীর অত্যন্ত উন্নত কয়েকটি দেশের সঙ্গে সেই দেশটির তুলনা করা চলে। গত দশ বছরের মধ্যে সুইডেনে শস্যের ফলনের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়েছে—কয়েকটি স্থানে শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ বেড়েছে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত সুইডেনে বহু রকমের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যায়। দেশটির দক্ষিণাংশে যেমন প্রায় দু'মাস প্রচণ্ড শীত পড়ে, উত্তরভাগেও প্রায় বারোমাস আবহাওয়ার তাপমাত্রা হিমাক্ষের নিচে নেমে যায়।

সুইডেনে বছরে ১৬.৩ ইঞ্চি থেকে ২৪.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। যদিও নানা প্রকৃতির মৃত্তিকা সেখানে দেখা যায়, উপযুক্ত সার দিয়ে মাটির উন্নতিসাধন করা যায়।

সুইডেনে প্রায় দশ কোটি একর জমি আছে—তার মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ জমি জংগলে আবৃত এবং শতকরা মাত্র নয় ভাগ জমিতে চাষ হয়। আবাদ-গুলির মধ্যে শতকরা আশিটিতে পাঁচ একরের বেশি চাষোপযোগী জমি আছে এবং

মালিকেরা নিজে সেইসব জমি চাষ করেন। মোট চাষের জমির শতকরা ২৬.৫ অংশে প্রজারা চাষ করে এবং এইসব আবাদের আয়তন বেশ বড়।

ফসল উৎপাদনের ধারা

যাই, গম এবং মিশ্রিত উচ্চশ্রেণীর ধান্যবর্গীয় শস্য প্রভৃতিই সুইডেনে প্রধানত উৎপাদন করা হয়। দেশটির মোট চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশের চাইতেও বেশি জায়গায় উচ্চশ্রেণীর ধান্যবর্গীয় শস্য ও ডালের চাষ করা হয়। গত ১৮৬৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত গমচাষের জমি যেমন ১.৩ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ৮.১ লক্ষ একর হয়েছিল অর্থাৎ ছ'গুণেরও বেশি বেড়েছিল, রাই ও যব চাষের জমি ১৪.১ লক্ষ একর থেকে ক'মে ৪.১ লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছিল অর্থাৎ শতকরা ৭১ ভাগ কমেছিল। মোট চাষের জমির খুব কম অংশে ডালের চাষ করা হ'ত। কিন্তু ১৯২১ সালের পর থেকে তাও শতকরা ৫০ ভাগ ক'মে গিয়েছে। সম্প্রতি তৈলবীজ ও আঁশ উৎপাদনের উপযোগী গাছ চাষের জমি বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়।

রুটি তৈরি করবার উপযুক্ত শস্যের মোট উৎপাদন এবং আলুর উৎপাদন মোট উৎপন্ন ফসলের গড়-পড়তা যথাক্রমে শতকরা ১১—১২ এবং ৫—৬ ভাগ। মূলজাতীয় ফসল, পশুখাদ্য, মূল ও চিনি-বিটের ফলনে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে—১৮৭০ সালে শতকরা মাত্র ১ অংশ থেকে ১৯৩৯ সালে শতকরা ১০ অংশে দাঁড়ায়।

১নং সারণী

সুইডেনে প্রতি একরে প্রধান ফসলগুলির ফলন (পাউন্ড হিসাবে)

ফসল	১৮৬৬-৭০	১৮৯৬-০০	১৯২৬-৩০	১৯৪৬-৫০	১৮৬৬-৭০ সালের ফলন অপেক্ষা ১৯৪৬-৫০ সালের ফলনের শতকরা বৃদ্ধি
শীতকালীন গম ...	১,২০০	১,৬৫০	২,০০০	২,৩০০	৯১.৭

ফসল	১৮৬৬-৭০	১৮৯৬-০০	১৯২৬-৩০	১৯৪৬-৫০	১৮৬৬-৭০ সালের ফলন অপেক্ষা ১৯৪৬-৫০ সালের ফলনের শতকরা বৃদ্ধি
বসন্তকালীন গম ...	১,০৫০	১,৩০০	১,৫০০	১,৭৫০	৬৬.৭
শীতকালীন রাই ...	১,২০০	১,৩০০	১,৪৫০	১,৮৫০	৫৪.২
যাই ...	১,১০০	১,২০০	১,৫০০	১,৫০০	৩৬.৪
যব ...	১,১০০	১,৩০০	১,৬৫০	২,০০০	৮১.৮
মটর ..	৯৫০	১,৩৫০	১,৩০০	১,৫০০	৫৭.৯
শিমজাতীয় কলাই	৮৫০	৯০০	১,৭০০	১,৩০০	৫২.৯
শুষ্ক ঘাস ..	২,৪০০	২,৬০০	৩,৪০০	৩,৪০০	৪১.৭
আলু ...	৩.৫	৩.৫	৪.৫	৬.০	১৭.১
চিনি বীট ...	৪.০	১১.০	১১.৫	১৫.৫	৩৮৭.৫

[হিউগো অসওয়াল্ড প্রণীত “সুইডিশ এগ্রিকালচার” গ্রন্থ থেকে গৃহীত]

দেশটির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শস্যের প্রতি একর ফলনে বিশাল তারতম্য লক্ষিত হয়—সমতাব্যঞ্জক অঞ্চল পরিণত করলে দেখা যায় যে, উর্বর জমিতে ফসলের পরিমাণ ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত হয়, অথচ নিকৃষ্ট জমিতে মাত্র ১,৩০০ পাউন্ড থেকে ১,৮০০ পাউন্ড পাওয়া যায়। সমস্ত দেশটিতে ফসলের গড়পড়তা ফলন একরপ্রতি ২,২০০ পাউন্ড ধরা যেতে পারে।

শস্যের সমতাব্যঞ্জক অঞ্চল—গম, রাই, যব ও মটর ইত্যাদির পরিমাণ ২.২ পাউন্ড, যাই—২.৬৪ পাউন্ড, মিশ্র শস্য ২.৪২ পাউন্ড, আলু ও চিনি-বীট ৮.৮ পাউন্ড, পশুখাদ্য বীট ২২ পাউন্ড, শুষ্ক ঘাস ৪.৮৪ থেকে ৫.৫ পাউন্ড এবং খড় ৭.৭ থেকে ১১ পাউন্ড।

বিভিন্ন শস্যের একরপ্রতি ফলনের দিক দিয়ে পৃথিবীর উন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় সুইডেনের স্থান বেশ উচ্চে।

২নং সারণী

বিভিন্ন দেশে প্রতি একর ফলনের তুলনামূলক বিবৃতি

(পাউন্ড হিসাবে)

দেশ	গম	যব	যাই	রাই	আলু	চিনি-বীট
অস্ট্রেলিয়া ...	৯৪৬	৮৭৪	৫০৯	৩৩৯	৭,৮৫১	—
কানাডা ...	৭৬৭	১,০৭১	১,০২৬	৯৩৭	১০,১৭১	২,২২২
ডেনমার্ক ...	৩,০৬৯	২,৯৯৮	২,৮৮২	২,২০৪	১৭,৮৪৪	২,৭৫৭
ফ্রান্স ..	২,০৯৭	১,৮২৯	১,৪৮১	১,১৩৩	১৪,৮১০	২,৫৮৭
জার্মানী ...	২,০৫২	১,৯৫৪	১,৮৪৭	১,৫৯৭	১৯,১৮২	২,৭৩০

দেশ	গম	যব	যই	রাই	আলু	চিনি-বীট
ভারত ...	৬৬৯	৭৪৯	—	—	৫,৬২১	—
ইটালী ...	১,৩৫৬	৯৯৯	১,০৮০	১,১৮৭	৭,১৩৮	২,৫৬১
সুইডেন ...	২,১০৬	১,৯৩৬	১,৬২৪	১,৮০২	১০,৬১৭	২,৭৭৫
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ১,০৮৮		১,৩৪৭	১,১৩৩	৭৭৬	১৫,১৬৭	৩,২০৩
যুক্তরাজ্য ..	২,৫৪৩	২,৪৩৬	২,১১৫	১,৯৯০	১৭,৪৯৮	২,৩২৯

[১৯৫৫ সালের খাদ্য ও কৃষিজাত ফলন পরিসংখ্যানের বাৎসরিক বিবরণ (এফ এ ও) নবম গ্রন্থ প্রথমভাগ থেকে সংকলিত]

২নং সারণী থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কেবল ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যে শস্যের ফলনের পরিমাণ (এবং কয়েকটি বিষয়ে জার্মানীতেও বটে) সুইডেনের ফলনের চাইতে বেশি। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার ফলনের সঙ্গে তুলনা করলে সুইডেনে শস্যের ফলন ম্বিগুণের চেয়েও বেশি হয় দেখা যায়।

শস্যের ফলন বেশি হয় কেন

জলনিকাশের ব্যবস্থা, যন্ত্রসাহায্যে চাষ, রাসায়নিক ও পচাসার প্রয়োগ এবং উন্মিত-প্রজননে গবেষণা— এই কয়টি সুইডেনে এই অসামান্য ফসলবৃদ্ধির কারণ। এই কারণগুলি সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

জলনিকাশ: সুইডেনে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। এক শতাব্দী আগে সমস্ত চাষের জমির জলনিকাশ খোলা নালা দ্বারা হ'ত। তারপর থেকে মাটির নিচে নর্দমা দ্বারা জলনিকাশের ব্যবস্থাস্বত্ব জমির পরিমাণ খুবই বেড়ে যায় এবং ১৯৪৪ সালে এইরকম জমি মোট চাষের জমির শতকরা ২৬.২ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। সুইডেন-সরকার এইরকম জলনিকাশপ্রথা জনপ্রিয় করবার জন্য ঋণস্বরূপ ও এককালীন দানস্বরূপ অর্থব্যয় করেন। এই প্রথা বড় আবাদগুলিতে ছোট আবাদের চেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। পাঁচ একরের কম আবাদগুলিতে মাটির নিচে নর্দমাস্বত্ব চাষের ক্ষেত্রের সংখ্যা শতকরা ৫.৯ কিন্তু ২৫০ বা তার

বেশি একরযুক্ত আবাদগুলির মধ্যে মাটির নিচে নর্দমাস্বত্ব ক্ষেত্রের সংখ্যা শতকরা ১৫.৩।

যন্ত্রসাহায্য: গত দ্বিশ বছরে সুইডেনের আবাদ-গুলি উত্তরোত্তর যন্ত্রচালিত হয়ে পড়েছে। ১৯৩০ সালে সুইডেনে মাত্র ৭,০০০ কলের লাঙল ছিল, এই সংখ্যা বেড়ে ১৯৩৯ সালে ১৫,০০০, ১৯৪৫ সালে ২২,০০০, ১৯৫২ সালে ৮৫,০০০ এবং ১৯৫৭ সালে ১,২৫,৪০০ হয়। (সমস্ত বিষয়ের জন্য, মালগাড়ি, লাঙল প্রভৃতি টানবার উদ্দেশ্যে চাকাস্বত্ব ইঞ্জিনের মোট সংখ্যা সুইডেনে ১৯৫৭ সালে দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮১৫।) যদিও যন্ত্রসাহায্য দ্বারা মধ্যভাবে উৎপাদনবৃদ্ধি হয় নি, তার দ্বারা দেশান্তরে যাওয়ার জন্য শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেলেও যথাসময়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে কৃষিকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন রকমের জমির উপযোগী নতুন ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য অবিরাম গবেষণা, “এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি” প্রদত্ত (পরে “ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচার” নামে খ্যাত) ব্যবহারিক উপদেশ, প্রচুর জলবিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগ এবং কাঠ বা কয়লা থেকে জাত “প্রোডিউসার গ্যাস”এর প্রচলন সুইডেনে কলের লাঙলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে।

রাসায়নিক সার: রাসায়নিক সার ব্যবহার উৎপাদনবৃদ্ধির সবচাইতে সুস্পষ্ট কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে খুব সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে

যাচ্ছে, দেখা যায়। যবক্ষারজান, ফসফরাস এবং পটাশ একসঙ্গে ধরলে দেখা যায় যে, একর-প্রতি উল্ভিদ-খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ১৯০১—১০ সালে ৭.৩৯ পাউন্ড থেকে ১৯৪১—৪৫ সালে ১৯.৫৯ হয় এবং ১৯৫৫—৫৬ সালে ৫৪.১০ পাউন্ড হয় অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে শতকরা ৭০০ ভাগ বাড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালে

ব্যবহৃত রাসায়নিক সারগুলির মধ্যে যবক্ষারজান শতকরা ২৯.৪ ছিল এবং ফসফরাস ও পটাশিয়াম যথাক্রমে শতকরা ৩৮.৪ ও ৩২.২ ছিল। (৩নং সারণী)। ১৯৪৫—৫২ সালের সারপ্রয়োগ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, রাসায়নিক সারপ্রয়োগ দ্বারা মোট শস্য-উৎপাদন শতকরা অন্তত ২২ ভাগ বেড়েছে।

৩নং সারণী

সুইডেনে প্রতি একরে রাসায়নিক সার প্রয়োগ

(পাউন্ড হিসাবে)

ব্যবহারকাল	যবক্ষারজান	ফসফরাস	পটাশিয়াম	মোট	সার প্রয়োগের মাত্রা (শতকরা)
১৯০১-১৯১০	০.৯৭	৩.৬৭	২.৭৫	৭.৩৯	১০০.০
১৯১১-১৯২০	১.৫৭	২.৮৭	৪.৬১	৯.০৫	১২২.৫
১৯২১-১৯৩০	৩.০২	৩.৯৫	৫.২৩	১২.২০	১৬৫.১
১৯৩১-১৯৪০	৫.৭৫	৫.২১	৫.৭৮	১৬.৭৪	২২৬.৫
১৯৪১-১৯৫০	৮.৪৮	৩.৯২	৭.১৯	১৯.৫৯	২৬৫.১
১৯৫০-১৯৫১	১৩.৭০	১০.৩০	১০.৪০	৩৪.৪০	৪৬৫.৫
১৯৫৫-১৯৫৬	১৫.৯০	২০.৮০	১৭.৪০	৫৪.১০	৭৩২.১

যদিও গত ৫৫ বছরে সুইডেনে রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের রাসায়নিক সার-খরচার তুলনায় সুইডেনের খরচা খুব বেশি, তথাপি এখনও সুইডেনের সার-খরচা হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং যুক্তরাজ্যের রাসায়নিক সার-খরচার অর্ধেকেরও কম। ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাসায়নিক সার-খরচার চেয়ে সুইডেনের রাসায়নিক সার-খরচা অনেক কম—যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সুইডেনে আরও বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে।

যদিও বিভিন্ন সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহার ও ফসলবৃদ্ধির মধ্যে কোনরকম মূখ্য পারস্পরিক সম্পর্ক আছে বলে সাব্যস্ত করা যায় না, তা হ'লেও রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যে ফলনবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ

প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুইডেনে মোট চাষের জমির শতকরা ৭ ভাগেরও কম জমি অর্থাৎ মাত্র ৬.৪ লক্ষ একর জমি ছাড়া অন্য জমিতে সেচের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও যে সার ব্যবহারের মাত্র বেড়ে যাচ্ছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। মৃত্তিকা পরীক্ষার দ্বারা জমিতে উল্ভিদ-খাদ্যের পরিমাণের জ্ঞান ঐ দেশে রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধি করাতে সাহায্য করেছে।

পচাসারঃ সুইডেনে রাসায়নিক সার ছাড়া পচাসারও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আজকাল শতকরা ২৫টিরও বেশি আবাদে পচাসারের জন্য কংক্রিটের চৌবাচ্চা আছে। ১৯৪৯-৫০ সালের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি একরে যে ৯৬.৪ পাউন্ড সার ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে ৫৫.৩ পাউন্ড অর্থাৎ শতকরা ৫৮ ভাগ ছিল

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

পচাসার। বেশ বিস্তারিত হারে যন্ত্রসাহায্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্দুইডেনের কৃষকদের বিভিন্ন প্রথায় চাষ করার জন্য এত বেশি পচাসার ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। গড়পড়তা প্রতি আবাদে এখন

৫টি ক'রে গোরু থাকে। স্দুইডেনে পচাসার ব্যবহারের পরিমাণ এখনও ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় অনেক কম।

৪নং সারণী

কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে কতটা পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্য পাওয়া যায় তার আনুমানিক হিসাব

(প্রতি একরে পাউণ্ড হিসাবে)

দেশ	পচাসার	উদ্ভিদ-পুষ্টিকর খাদ্য			পচাসারের আনুমানিক শতকরা হার
		রাসায়নিক সার	মোট		
জার্মানী ..	৭৬.৭৩	৮১.১৯	১৫৭.৯২		৪৯
ডেনমার্ক ..	৯৯.০৩	৬৩.৩৫	১৬২.৩১		৬১
যুক্তরাজ্য ..	৮০.৩০	৬৬.৯১	১৪৭.২১		৫৫
অস্ট্রিয়া ..	৭৪.০৫	২৩.২০	৯৭.২৪		৫৬
ফ্রান্স ..	৫৩.৫৩	৩১.২৩	৮৪.৭৬		৭৩
গ্রীস ..	৫২.৬৪	৯.৮১	৬২.৪৫		৮৪
ইতালী ..	৪১.৯৩	১৬.৯৫	৫৮.৮৯		৭১
সুইডেন ..	৫৬.২১	৪০.১৫	৯৬.৩৬		৫৮

[“ও ই ই সি ফারটিলাইজার ইন এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম” (পৃষ্ঠা ১৮) থেকে সংকলিত]

উদ্ভিদ প্রজননঃ নতুন ধরনের অধিক শস্যপ্রসূ ও রোগ-প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে অহরহ গবেষণা স্দুইডেনে কৃষিকলনবৃদ্ধির অত্যন্ত সহায়তা করেছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রধান শস্যগুলি প্রাচীন ধরনের ছিল, কিন্তু এখন দেশটির বহু অঞ্চলে উন্নত ধরনের শস্যের চাষ করা হয়। স্দুইডেনের কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রতিক উন্নতপ্রণীর গমবীজের দ্বারা স্থানীয় গমবীজের চেয়ে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বেশি ফসল পাওয়া যায় এবং কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ১৫—২৫ অংশ বেশি ফসল উৎপন্ন হয়। যাই, যব, রাই, পশুখাদ্য প্রভৃতি ফসলের উৎপাদনেও

একথা বলা চলে। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, উদ্ভিদ-উন্নতির গবেষণা দ্বারা আবাদগুলির আয় বছরে ১৪ কোটি টাকা বাড়ে।

অন্যান্য কারণঃ স্দুইডেনে গত কুড়ি বছরব্যাপী কৃষিকার্য সুব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থাপন করার ফলে ফসলবৃদ্ধি হয়েছে। স্দুইডেনের প্রায় সমস্ত কৃষক কৃষিসমবায় সমিতির সদস্য। স্দুইডেনে কৃষক-সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষিজাত ফসলের শতকরা নব্বুইভাগ বিক্রি করা হয়। সমস্ত দুধ ও মাখন, শতকরা ৭০ ভাগ ডিম, শতকরা ৯৪ ভাগ পনির, শতকরা ৭৫—৮০ ভাগ মাংস এবং শতকরা ৬৫

ভাগ খাদ্যশস্য এইসকল সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। কৃষকদের নিজেদের এই সমিতিগুলি বহু বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে দেয় এবং এমনকি কলের লাঙল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে আনে।

পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও কৃষিগবেষণার ফলগুলির ব্যবহারিক নিয়োগও ফসলবৃদ্ধির কারণ। বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাদান ও গবেষণাকারী ১৭টি প্রতিষ্ঠানযুক্ত একটি কৃষিমহাবিদ্যালয়, কতকগুলি পরীক্ষাকেন্দ্র, কতকগুলি কৃষি-পরীক্ষণক্ষেত্র এবং বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যালয় এইসকল পরীক্ষা ও গবেষণা করে থাকে। বিদ্যালয়গুলি পন্থযোগে বা ৫ থেকে ৯ মাসের বহুতা প্রভৃতি দ্বারা কৃষিশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করে। কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলোচনা করা হয়। “রয়েল বোর্ড অব এগ্রিকালচার্যাল কলেজ” ও “ন্যাশনাল এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট”—প্রধানত এই দু’টি প্রতিষ্ঠানের উপর কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির উন্নতির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

অন্যান্য ব্যক্তিদের আয়ের সঙ্গে কৃষকদের আয়ের সমতারক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা সরকার-নির্দিষ্ট কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্যনির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মূল্য এইরকম স্তরে রাখা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যাতে অন্যান্য শিল্প-শ্রমিকদের অধিকাংশের তুলনায় বৃদ্ধিমান আবাদগুলি (৩৭ একর) যুক্তিসংগত আয় করতে পারে। ১৯৩০ সাল থেকে ধাপে ধাপে এখন যে প্রথা উদ্ভূত হয়েছে তার দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্যগুলির মূল্যের যে হ্রাসবৃদ্ধি করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রায় সকলেরই একমত।

যদিও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সুইডেন কৃষিফসল উৎপাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, তবুও তার নিকটস্থ ইউরোপের দেশগুলিতে উদ্ভিদখাদ্য-খরচার পরিমাণ দেখে মনে হয় যে, সুইডেনে প্রতি একর জমিতে আরও ফলনবৃদ্ধি করা যেতে পারে। যন্ত্রসাহায্যে চাষ করা সম্ভব করবার জন্য সুইডেনে ইতোমধ্যে ট্রাকরো ট্রাকরো জমিগুলিকে একত্র করবার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র দেশটির কাছে ভারত অনেক কিছুই শিখতে পারে।*

*১৯৫৯, এপ্রিল সংখ্যা ‘ফার্টাইজার নিউজ’এ প্রকাশিত ‘ভিসা’র প্রবন্ধ থেকে



পশ্চিমবঙ্গ সমবায় চাষ

আরোহণ গোষ্ঠী

সমবায় কৃষিসমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক

[চার]

ভারতে সমবায় চাষের পরিচয়

স্বাধীনতা অর্জনের আগে, ১৯৪৫ সনে ভারত-সরকার কর্তৃক কৃষি, বন ও মৎস্য সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ সমিতি গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম সদুপারিশ ছিল এই যে, প্রত্যেক রাজ্যসরকার জমির নমুনা, স্বত্ব ও জলবায়ুর প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নত ধরনের কৃষিপ্রণালীর পথদর্শক পরিকল্পনা (পাইলট স্কীম) গ্রহণ করবেন। মামদুলী ধরনের একক চাষের পরিবর্তে অন্য ধরনের বড় আকারের কৃষি-প্রণালী গ্রহণের সরকারী সদুপারিশের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। পরের বছর 'কো-অপারেটিভ প্ল্যানিং কমিটি' সদুপারিশ করলেন যে, অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক জেলার দুইটি নির্বাচিত গ্রামে সমবায় চাষের প্রবর্তন করা উচিত। এই সদুপারিশ সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রারগণের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন ভারতে সমবায় চাষের প্রয়োজনীয়তা ও ঐক্যবদ্ধতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমগ্র দেশে সমবায় চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং উপযুক্ত পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন, স্বল্পবিস্তৃত ও মধ্যবর্তী মালিক-চাষীরা যাতে কৃষি-সমিতি গড়ে পরস্পরের সহায়তায় কৃষিকর্ম পরিচালনা করেন, সরকার উদ্যোগী হয়ে এ বিষয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের সংস্থান করবেন। নতুন উদ্ভাবন-করা পতিত জমি আলাদা করে রেখে সেখানে ভূমিহীন চাষীদের বা শরণার্থীদের বসিয়ে সমবায় প্রণালী চাষের প্রবর্তন করতে সরকার যেন বন্ধপরিকর হন। ১৯৫৩ সালে ইজরায়েল-সরকারের আমন্ত্রণে ভারত-সরকার

বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে চারজন আধিকারিককে (লেখক তাঁদের একজন) সমবায় চাষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁরাও ফিরে এসে এই ধরনের সদুপারিশ পেশ করেছিলেন। প্রথম পরিকল্পনায় সমবায় চাষের প্রসার-কল্পে টাকার বরাদ্দ ছিল নেহাত কম, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা, তাও সাকুল্যে খরচ হয় নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ অবশ্য অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের নানা রাজ্যে সমবায় চাষের পরীক্ষা ও অনুশীলন চলছে। কোথাও কোথাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা গেছে, কোথাও সমবায় কৃষি-সমিতিতে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সংক্ষেপে কয়েকটি রাজ্যের কথা আলোচনা করা যাক।

বোম্বাই

১৯৪৯ সালে বোম্বাই-সরকার সমবায় চাষের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাতে পাঁচ বছরে ১১২টি সমিতি গঠন করার কথা ছিল। সমিতিতে সরকার থেকে ঋণের, সারের, বীজের, কীটনাশক হারে খাজনার, আর প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমিতি সমবায় চাষের যে-কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে যেমন, 'টেন্যান্ট ফার্মিং', 'জয়েন্ট ফার্মিং', 'কালেক্টিভ ফার্মিং' ইত্যাদি। চাষীদের এতে ক'রে বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনার কোনও কথা নেই, সমিতিতে যোগদান করা বা সমিতি থেকে চলে-যাওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। সমবায় আইনে অবশ্য বিধান রাখা হয়েছে যে, কোনও গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ চাষী যাঁরা সাকুল্যে জমির তিন-চতুর্থাংশের মালিক তাঁরা যদি

সমিতি গড়ে নিয়ে নিজেদের জমি হস্তান্তরিত করে সমবায় চাষের প্রবর্তন করতে চান তা হ'লে বাকি এক-তৃতীয়াংশ চাষীকেও বাধ্যতামূলকভাবে সেই সমিতিতে যোগ দিতে হবে। গণস্বার্থের উদ্দেশ্যেই এই বিধান রাখা হয়েছে।

১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল বোম্বাই রাজ্যে ২৫৬টি সমিতি ছিল, সেগুলোর আয়তন এবং সভ্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৬,৮১৭ একর এবং ৮,৭১৪ জন। সরকার থেকে সমিতিগুলি সাহায্য পেয়েছিল ঋণ বাবত প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ও খয়রাতি বাবত পৌনে সাত লক্ষ টাকা। সকল সমিতিই যে সাফল্য লাভ করেছে তা নয়।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজের 'ল্যান্ড কলোনিজেশন' সমিতিগুলো সমবায় কৃষির উদাহরণ। সাধারণত অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভূমিহীন চাষীর সুবিধার জন্য এই সমিতি-গুলি গঠিত হয়েছে। সরকার জমি যোগাড় করে দেন সমিতিতে, সভ্যরা পরে ব্যক্তিগত চাষের জন্য টুকরো টুকরো করে জমি ভাগ করে নেন। সমিতির কাজ হ'ল ঋণদান, দৈনন্দিন ও চাষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ ও বিতরণ, উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, কুটিরশিল্পের প্রবর্তন, পতিত জমি উদ্ধার করা প্রভৃতি। সমিতি সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগসুবিধা পায়, যেমন শেয়ারের মূলধনে অংশগ্রহণ, সার, বীজ ও হালের বলদ কেনার জন্য খয়রাতি সাহায্য, কুটিরশিল্পের প্রবর্তন, কর্মতি হারে খাজনা-গ্রহণ ও সেচ-কর থেকে মুক্তিদান। তা ছাড়া চাষের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং পতিত জমি উদ্ধারের জন্য বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রত সৈন্যদেরও কিছু কলোনিজেশন সমিতি আছে।

ইদানীংকালে মাদুরা, চিৎতালপুট ও কোয়েম্বাটোর জেলায় তিনটি 'জয়েন্ট ফার্মিং সোসাইটি'র পত্তন করা হয়েছে। সরকার এদের খয়রাতি,

শেয়ারের মূলধনে অংশগ্রহণ এবং স্বল্পমম্বাদী কৃষি-ঋণের জন্য জামিনদার হয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। উত্তর আর্কট জেলার মেচেরিতে যে 'জয়েন্ট ফার্মিং' সমিতির পত্তন করা হয়েছে তার পরিকল্পনা হচ্ছে ছোটখাট মালিকদের প্রায় তিনশ' বিঘা জমিতে একযোগে সমবায় চাষের পত্তন করার। সরকার এজন্য ঋণ ও খয়রাতি মিলিয়ে ৪৬,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। তাঞ্জোর জেলার পশুপতেস্বর স্বামীর মন্দিরের জমিতে সমবায় চাষের প্রবর্তন করার জন্য তিনটি 'টেন্যান্ট ফার্মিং' সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং এদের সাহায্যের জন্য ঋণ ও খয়রাতি খাতে ২৩,৫২৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ

ঝাঁসি জেলার দুটো ফার্ম নিয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালে সমবায় চাষের পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। পরে উদ্ধার-করা পতিত জমিতে, রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে এবং তরাই ও খাদার অঞ্চলে সমবায় খামার গঠন করা হয়। খাদারে ৪৭,০০০ একর এবং তরাই অঞ্চলে ৮০,০০০ একর জমিকে সমবায় চাষের গন্ডীর মধ্যে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জমি-উদ্ধারের কাজে প্রভূত সাহায্য পাওয়া গেছে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার কাছে। যাঁরা সমবায় চাষের কাজ নিয়ে বসতি করেছেন, তাঁদের বেশির ভাগ শরণার্থী। সরকার থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া গেছে। ঝাঁসি জেলার নানবারা ও দারুমা গ্রামে সমবায় চাষ চলছে যথাক্রমে ৪৮৫ একর ও ৪১২ একর জমিতে। উত্তরপ্রদেশে একক ব্যক্তিগত চাষের পরিবর্তে অন্য একটি প্রথার অনুশীলন চালানো হচ্ছে যাকে বলা হয় সুসংহত চাষ। এতে গ্রামের চাষীকে রাজী করানো হয় বিচ্ছিন্নভাবে যার যার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ না করে লম্বা-লম্বা বা আড়াআড়িভাবে ষতটা সম্ভব হয় পরস্পরের জমি জোড়া লাগিয়ে তাতে একই ধরনের ফসল ফলাবার জন্য। এতে সমবায় চাষের

অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়, অনেক অপচয় বন্ধ হয়।

সারা রাজ্যে আজ অনেক সমবায় কৃষি সমিতির গঠিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে বিভিন্ন রকমের বহু সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবে কালেক্টিভ ফার্মিং সমিতিগুলো মোটামুটিভাবে অন্যান্য ধরনের সমিতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে কাজ চালাচ্ছে। এ রাজ্যের কৃষি-সমিতির কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা বেশি পরিমাণে ভারি যন্ত্রপাতির উপরে নির্ভরশীল। ট্রাক্টর, সৈচয়ন্ত্র বা অন্যান্য ধরনের জলের পাম্পের পেছনে এইসব সমিতি প্রচুর অর্থব্যয় করেছে। ভাল জাতের বীজ, প্রচুর সার ও উন্নত জাতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে ফসলের ফলন বেড়েছে প্রচুর।

অন্যান্য রাজ্য

আজ ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই সমবায় চাষের প্রবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। অন্ধ্র রাজ্যে কৃষ্ণা ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় সরকারের ৪৮,০০০ একর জমিতে সমবায় চাষের প্রবর্তন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য ২০ থেকে ৩০টি কৃষি-সমিতি গড়ে তোলা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার সমবায় চাষের মাধ্যমে নন্দপুর্ ফার্মের সংলগ্ন ১,০০০ একর জমিতে বসুন্ধর সৈনিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। তা ছাড়া যেখানে যেখানে সমবায় চাষ লাভজনক বলে প্রতীয়মান হবে সেসব অঞ্চলে সমবায় চাষের প্রবর্তনের জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। উড়িষ্যা ভূমিহীন চাষীদের সমবায় চাষের গণ্ডীতে আনার জন্য সম্বলপুর্ জেলায় ৪টি ও টেনকানল জেলায় ২টি কৃষি-সমিতি স্থাপিত হয়েছে। বিহারে সমবায় চাষের মাধ্যমে আখের চাষ করে ফলন

বাড়ানো হয়েছে অনেক। অনেকগুলি সমিতির সভোরা নিজেদের জমি এইজন্য সমিতিতে হস্তান্তরিত করে দিয়ে বড় বড় খামার তৈরি করেছেন। এই খামারে ইচ্ছা করলে সমিতির সভ্য না হয়েও কোনও চাষী নিজের জমিটুকু নিয়ে ষোগ দিতে পারেন। তাঁর ভোটের অধিকার নেই, পরিচালন ব্যবস্থায়ও তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন না : শুধু ফসলের নির্ধারিত অংশটা তাঁর প্রাপ্য। খামারে যেসব সভ্য কাজ করেন তাঁদের মজুরি দেওয়া হয় মাসান্তে। শুধু বাইরের মজুরেরা দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি পায়।

আসামের 'মিশনারী কো-অপারেটিভ কলোনি' সমবায় চাষের দৃষ্টান্ত।

[পাঠ]

সমবায় চাষ সম্পর্কে ভারতে জনমত ও অভিমত

যদিও বেশ কিছুদিন ধরে ভারতের নানা রাজ্যে সমবায় চাষের অল্পবিস্তর অনুশীলন শুরু হয়েছে তবুও একথা না বলে উপায় নেই যে, দেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমবায় চাষের প্রচলন ও প্রসার নিয়ে অধুনা যে তীব্র বাকবিতণ্ডা চলছে তাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ নিঃসন্দেহে বিলম্বিত হচ্ছে এবং বলা বাহুল্য, দেশের কৃষককুল সমাজের উপরের স্তরে এই মতবৈষম্যের আলোড়নে বিভ্রান্ত হচ্ছে। মজা এই, এই বিতণ্ডার যারা নায়ক তাঁরা প্রায় সকলেই পুস্তকবিলাসী মস্তিষ্কজীবী এবং হাতেকলমে চাষের অভিজ্ঞতার বালাই তাঁদের অনেকেরই নেই ; দ্বিতীয়ত, এই আলোড়নের নিচে একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, এই বিতণ্ডা সমবায় চাষের প্রচলন—গোড়াকার এই প্রশ্ন নিয়ে নয়, সমবায় চাষের ধরনটি কী হবে তাই নিয়ে।

বছর দুই আগে গ্রী আর কে পাতিলের নেতৃত্বে চীনদেশের কৃষিব্যবস্থা পরীক্ষা করতে যে প্রতিনিধিদলকে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ফিরে এসে জোর সুপারিশ করলেন সারা দেশে সমবায় চাষের ব্যাপক

প্রচলনের জন্য। তাঁরা বললেন, চীনে ও ভারতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক সাদৃশ্য আছে। দুই দেশেই গ্রামে গ্রামে কাজের অভাবে, উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাবে কৃষকসম্প্রদায়ের একটা মোটা অংশ বেকার বসে থাকে; তাতে শ্রমশক্তির এই অংশটার নিরর্থক অপচয় হয়। চীনে ব্যাপকভাবে সমবায় চাষের প্রবর্তন করে, গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে তুলে বাড়তি কাজকর্মের সৃষ্টি করে এই বাড়তি শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে আর তাতে গোটা গ্রামের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বললেন, ধরুন ফুয়েন গ্রামের কথা। আমাদের দেশের মত এই ফুয়েন গ্রামের চাষীরা ছিল জমির অনুপাতে সংখ্যায় ভারি, স্বল্পপািত্র, শিক্ষায় অনগ্রসর আর দরিদ্র ও মহাজনের কবলিত। গ্রামে সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে ওঠার পরে একটি নতুন শিল্পের জন্ম হ'ল সেখানে—ইটের ভাটা। কৃষি-সমিতি সাহায্য করল অর্থ দিয়ে, গাড়ি দিয়ে, মাটির যোগান দিয়ে আর গ্রামের কর্মহীন বাড়তি শ্রমশক্তির একটা অংশ কাজের সন্ধান পেল সেখানে। যারা সেখানে কাজে লাগল, তাদের কারও কারও খুবই ছোটখাট জোত ছিল, একা একা তাতে চাষবাস একেবারেই লোকমানের ব্যাপার। তারা ইটের ভাটার কাজে গিয়ে বৃদ্ধি করে জোতগুলো গছিয়ে দিল কৃষি-সমিতিতে এবং সমিতিই নিয়ে নিল চাষের ভার। এতে শ্রমশক্তির সর্বম বণ্টনের কাজটাও সহজ হ'ল। দ্বিতীয়ত এই সমিতি সরকারের কাছ থেকে উত্তরোত্তর বিভিন্ন কাজের ভার নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির পথটা প্রশস্ততর করে নিল—যেমন রাস্তা তৈরি, বাঁধ মেরামত, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার পরিচালনা, সরকারী বাড়িঘর নির্মাণ ইত্যাদি। উন্নত ধরনের চাষের সঙ্গে মিলিয়ে এই যে নতুন নতুন কর্মধারার সৃষ্টি হ'ল ফুয়েন গ্রামে এবং পরিবর্তন সূচিত হ'ল গ্রামীণ অর্থনীতিতে, তা সম্ভব হ'ল সমবায় সমিতি গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ-ব্যবস্থা

প্রবর্তনের ফলেই। পাতিল-প্রতিনিধিদল তাই বললেন, সমবায় চাষের প্রবর্তনের ব্যাপারে চীনের মত এদেশের সরকারকেও কার্যকরী এবং সক্রিয় অংশ নিতে হবে।

সক্রিয় অংশ? সর্বনাশ। গেল গেল রব উঠল এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে। তাঁদের মতুখপাত্ররা বললেন, চীন-সরকার যা করেছেন তা জোরজুলুম করে করেছেন। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমাদের গঠনতন্ত্রে জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় কোন্ অধিকারে সরকার কৃষককুলের স্বাধীনতা হরণ করে এক বিশেষ ধরনের চাষ-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে যাবে? তাতে তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না? অতএব কম্যুনিষ্ট দেশের সমবায় খামার গড়ে তোলবার জন্য এদেশের সরকার যেন কখনও সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেন। বরং সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতির দিকে নজর দিলেই এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে বীজ, সার, সেচ, কৃষিঋণ, বিপণন, পরিবহণ ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'লেই ভারতের কৃষি ও কৃষকের প্রভূত উপকার হবে।

এই যুক্তিধারা অসার। প্রথমত, সমবায় চাষের প্রবর্তন করতে গেলে কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর মত বিরাট বিরাট খামার বানিয়ে কৃষককুলকে শৃঙ্খল মজুদে পরিণত করার কথা এদেশে সরকারীভাবে কোনদিনই বলা হয় নি, জোরজুলুমের সংকল্পও সরকারের নেই। কৃষকের স্বাধীনতা হরণের কোন প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের সমস্যা খণ্ডিত, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত ছোটখাট জোতের, কৃষকের মূলধনের স্বল্পতা এবং গ্রামের বাড়তি শ্রমশক্তির। বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে, আপসমীমাংসার পথে গ্রামের চাষীরা যদি উন্নত ধরনের চাষের প্রয়োজনে সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন করে, তা হ'লে জোতের সমীকরণ, মূলধনের ব্যবস্থা ও বাড়তি শ্রমশক্তির নিয়োগ—এই তিনটি সমস্যা সমাধানের পথ হয়। তার জন্য বড় বড় খামার করে কৃষি-মজুদে পরিণত

হবার তো প্রয়োজন নেই। যে চার রকমের সমবায় কৃষি-সমিতির ব্যবস্থা এদেশে রয়েছে তাতে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী চাষীরা। যে-কোনও উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আসল লক্ষ্য হচ্ছে বাড়তি ফসল ফলানো, কাজেই সমিতি দরকার। সমিতির গঠনের রকম নিয়ে কোলাহল একেবারেই নিরর্থক। সনাতন পদ্ধতিকে বজায় রেখে কৃষকের শোচনীয় ও যুগসংগত দারিদ্র্যকে দীর্ঘান্বিত করার নাম যদি স্বাধীনতা হয় তবে সে স্বাধীনতা মূল্যহীন। যে-কোনও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা। দেশের উন্নত ধরনের কৃষি-পরিকল্পনার মধ্যেও সেই নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান রয়েছে। মৌলিক অধিকার সংকোচনের ধূয়া তুলে এই নিয়মানুবর্তিতার কথা ভুললে চলবে কেন? কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতি দেশের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমন দেশের ভবিষ্যতের প্রতি, যে জমি তাদের হেফাজতে রয়েছে তার প্রতি কৃষকের কি কোনও দায়িত্ব নেই? কৃষকসম্প্রদায়কে আজ ভাল করে বুঝতে হবে যে, নিয়মানুবর্তিতার পথে তার যথাযোগ্য কাজের স্বাধীনতা বজায় রেখে সমবায় কৃষিব্যবস্থা যদি তার নিদারুণ দারিদ্র্যমোচন করতে সক্ষম হয়, দেশের প্রতি তার দায়িত্ব পালনের সহায় হয়, দেশের অনাকর্ষ্য দূর হয়, তা হ'লে বহুবিঘোষিত তার মৌলিক অধিকারের চাইতে এই নিয়মানুবর্তিতার দাম অনেক।

দ্বিতীয়ত, সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার কথা। এদেশ আমেরিকার মত ধনাঢ্য নয় যে, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, সেচ, কৃষিক্ষণ প্রভৃতি চাষীর হাতে তুলে দেওয়া যাবে। কাজেই সব ভার নিতে হয়েছে সরকারকে। আলাদাভাবে প্রত্যেক চাষীর ঘরে যাওয়া কি কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব? কাজেই দরকার সমিতির। আর এই অনগ্রসর দেশে স্বল্প পুঁজি নিয়ে যেখানে শুধু একটি সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন করলে গোটা গ্রামের কাজ চলে যায় সেখানে বীজের জন্য একটি, সেচের জন্য একটি,

বিপণনের জন্য একটি—এই গৃহস্থানেক সমিতি গঠনের বিলাসিতা পোষায় কি? না, তার কোনও প্রয়োজন আছে?

সমবায় চাষের সমালোচনায় আর-একটি কথার উল্লেখ করা হয়। সেটা হ'ল এই যে, সমবায় চাষে নামলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন 'জয়েন্ট ফার্মিং' বা 'কালেকটিভ ফার্মিং' সমিতিতে, কৃষককে তার কাজের মান ও মূল্যের জন্য সমিতির মূল্যাপেক্ষী হ'তে হবে। তাতে এই উৎপাত হ'তে পারে যে, এক-দক্ষ চাষীকে কম-পটু আর-একজন চাষীর সঙ্গে এক পর্যায়েভুক্ত করা হ'ল, তাতে দক্ষ কৃষক কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এর জবাবে এই বলা যায় যে, চাষীদের নিজেদেরই হাতে থাকবে সমিতির পরিচালনভার, সরকার বা বাইরের কেউ তো হস্ত-ক্ষেপ করতে আসছে না। কাজেই সমিতির পরিচালক-সভা যদি ধীরস্থিরভাবে দলগত স্বার্থের উপরে উঠে সর্ববিবেচনার সঙ্গে প্রত্যেকটি কর্মী-সভ্যের কাজ যাচাই করেন, তা হ'লে এই উৎপাতের সম্যক নিরসন হ'তে পারে। আর এখানেই তো সমিতির স্থায়িত্বের আসল পরীক্ষা।

আর-একটা কথা শোনা যায়। সমবায় চাষে নামলে অনেক ক্ষেত্রেই খণ্ডিত ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জমির সমীকরণ প্রয়োজন হবে। এই সমীকরণে যদি কোনও চাষীর জমি অপরের জমির সঙ্গে জোড়া লাগে তা হ'লে প্রয়োজন হওয়ামাত্র সেই জমি বিক্রির পথ তো বন্ধ হবে, জমির মালিক সেই চাষী তো তা হ'লে একেবারেই নিরুপায় হবে। এই প্রশ্নের জবাব অতি সোজা। চাষী তার জমি বিক্রি করতে চায় কেন? হয় সে চাষ-আবাদের কাজ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাচ্ছে, নয়তো আকস্মিক বিপদোন্মুখ, যেমন অসুখের চিকিৎসার খরচ বা মেয়ের বিয়ের খরচ যোগানোর জন্য তার টাকার প্রয়োজন। এসব প্রয়োজন মেটাবার ভার যদি সমিতি নিজের হাতে গ্রহণ করে তা হ'লে তো সমস্যা সহজেই মিটে যায়। সহজে এবং বড়

রকমের দায়ে না পড়লে কেউ কি সহজে জমি বিক্রি করতে চায়?

কেউ কেউ বলছেন, চাষীর শক্তি ও পুঁজি যখন অল্প, সেক্ষেত্রে ধনিক সম্প্রদায় এই অসংখ্য টুকরো জমি জোড়া দিয়ে বিপুলায়তন খামার বানিয়ে উন্নত চাষের ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের অর্থবল আছে, কাজেই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে-কোনও পরিকল্পনা তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতি হ'লেও কৃষকের হবে না। কারণ ধনিক সম্প্রদায় চাষীদের দিয়েই জমি চাষ করাবে সত্য, কিন্তু বিনিময়ে তাদের দেবে শুধু মজুরি। চাষীরা লাভের অংশ পাবে না এবং লাভের সবটাই যাবে ধনিক সম্প্রদায়ের পকেটে। দ্বিতীয়ত, তাদের দৃষ্টি থাকবে এই লাভের দিকেই আর তার ফলে খাদ্যশস্য ও অর্থকর শস্য উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্য এসে যেতে পারে। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তারা চেষ্টা করবে তাদের মূলধন জমির ফসল থেকে ত্যাগাতাড়ি তুলে নিতে। জমির উপরে অত্যধিক চাপ পড়ে উর্বরশক্তি ক্ষয় হ'ল কিনা বা জমির স্থায়ী ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেদিকে তারা তেমন তৎপর হবে ব'লে আশা করা যায় না।

পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে আবার কেউ কেউ বলছেন, তা হ'লে সরকার সমস্ত জমি খাসদখলে রেখে নিজেই চাষ করুক। কিন্তু তাতে অসুবিধা দূর হবে কি? চাষী তো সেই মজুর হয়েই থাকল; জমির প্রতি তার মমতা কেমন করে বজায় থাকবে যদি পরিচালনায় তার কোনও হাত না থাকে? গভর্নমেন্ট তো চাষ করবে বেতনভোগী কর্মচারীর মারফত। জমি তার নয়, মাইনে তার বাঁধা, উৎপাদনের বাড়তি-কর্মতির সঙ্গে তার নির্দিষ্ট মাইনে ওঠানামা করে না। কাজেই উৎপাদনের উৎকর্ষের দিকে তার তেমন লক্ষ্য না থাকলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা কম। উৎপাদনের সঙ্গে কি-চাষী কি-বেতনভোগী কর্মচারী কারও ব্যক্তিগত স্বার্থের

যোগাযোগ থাকবে না, সেক্ষেত্রে কৃষির কতটা উন্নতি হবে, কে বলবে? আরও একটা মস্তু অসুবিধা আছে। সরকারী পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব সাধারণত কেন্দ্রীভূত থাকে। কেন্দ্রে যদি অব্যবস্থা ঘটে তা হ'লে শস্যোৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর পরিবর্তে দায়িত্ব যদি সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় তা হ'লে এক জায়গায় ভুল হ'লেও তার ফল মারাত্মক ও ব্যাপক হ'তে পারবে না।

গত বছরের মাঝামাঝি ভারতীয় পার্লামেন্টে এদেশে সমবায়ায়ক চাষ সম্বন্ধে যখন বিতর্কের অবতারণা করা হয় তখন অন্যতম সদস্য শ্রীমিন্দু মাসানি সমবায় চাষের বিরুদ্ধে জোর বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন সমবায় চাষ মানে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মত বিরাট বিরাট যৌথ খামার বানিয়ে কৃষককুলকে শুধুমাত্র মজুরে পরিণত করে তথাকথিত উন্নত চাষের প্রবর্তন। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছিলেন, বড় বড় খামার বানিয়ে চাষের প্রবর্তন করলেই ফসল বাড়বে না, তার উদাহরণ রাশিয়া এবং আমেরিকার বিরাটায়তন খামারগুলো। সেখানকার একরপ্রতি গড়পড়তা ফলন কম। পক্ষান্তরে যেসব দেশে ছোট ছোট খামারে, সমবায়ায়ক নয়, ব্যক্তিগত চাষবাস চলছে, যেমন ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, ইংলন্ড, জাপান, সেখানে তুলনামূলক বিচারে একরপ্রতি ফলন অনেক বেশি। অতএব সমবায় চাষের প্রবর্তন করে বিরাট বিরাট খামার বানানো কাজের কথা নয়। একটু তালিয়ে দেখলে এই যুক্তির অসারত্ব চোখে পড়বে এবং যে যুক্তি শ্রী মাসানি দিয়েছেন তা যে এদেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয় তা বোঝা যাবে। রাশিয়া ও আমেরিকায় যে চাষ তা ব্যাপক চাষ ('এক্সটেনসিভ ফার্মিং'), তার লক্ষ্য হচ্ছে চাষীপ্রতি ফলন বাড়ানো, একরপ্রতি নয়, কারণ দুই দেশেই জনসংখ্যার অনুপাতে প্রচুর অকর্ষিত জমি আছে। কিন্তু আমাদের দেশের চাষ হচ্ছে নিবিড় চাষ ('ইন্টেনসিভ ফার্মিং'), লক্ষ্য একরপ্রতি ফলন বাড়ানো। যেখানে যেখানে

বড় বড় খামার তা স্বভাবতই 'ক্যাপিটাল ইনটেন-সিভ'; এবং শ্রী মাসানি বক্তৃতার কোথাও বলেন নি রাশিয়া এবং আমেরিকায় সেসব বড় খামারে যথোপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়েছে কিনা এবং নিয়োজিত হবার পরেও ফলনের পরিমাণ অন্যান্য দেশের ছোট ছোট খামারের ফলনের চাইতে কম কিনা। দ্বিতীয়ত, যেসব দেশের ছোট ছোট খামারের কথা শ্রী মাসানি উল্লেখ করেছেন, আমাদের দেশের খামারের তুলনায় সত্যি কি তা ছোট? ডেনমার্ক গড়পড়তায় জমির পরিমাণ ৩৭.৭ একর, পশ্চিম জার্মানিতে ২৭ একর, ইংলন্ডে ৬৬.৩ একর, সুইডেনে ২২.১ একর। আর ভারতে? এখানে গড়পড়তায় জমির পরিমাণ মাত্র ৭.৫ একর। পশ্চিম বাঙলায় আরও কম, মাত্র ৪.৭ একর। কাজেই শ্রী মাসানির উল্লেখিত দেশগুলোর মত ছোট ছোট খামার বানাতেই তো আমাদের সমবায় কৃষি-সমিতির দরকার। খণ্ডিত জমির সমীকরণ সাধন করে সেখানে থামলেই তো চলবে না, সেসব সমীকৃত জমিতে নিবিড় চাষের ব্যবস্থাও তো করতে হবে আর এ ভার তো বিত্তহীন অনগ্রসর একক চাষীর উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না, প্রয়োজন হয় কৃষি-সমিতির। সমবায় চাষ মানেই বিরাট বিরাট যৌথ খামার—এ কথাটার উপর জোর দিতে গিয়েই ভুল করেছেন শ্রী মাসানি।

অতএব এদেশের একমাত্র সহজসাধ্য পথ হচ্ছে সমবায়স্বাক্ষর প্রথায় চাষের উন্নতিসাধন। সমবায় কৃষি-সমিতিতে কোনও একটা পূর্বনির্ধারিত ধরন নিতে হবে এমন কথা কেউ বলছে না। চাষীরা প্রয়োজন, অভিরুচি ও শিক্ষা-অনুযায়ী তাঁদের সমিতির ধরন নির্ধারণ করুন, কোনও আপত্তি নেই। যৌথ খামার যদি লাভজনক হয় তবে তা

গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার সমিতির সভ্য হয়েও ব্যক্তিগত চাষই যদি কল্যাণপ্রসূ হয় তাতেও আপত্তি নেই। আসল কথা হচ্ছে চাষীদের সকল প্রচেষ্টা সমবায়স্বাক্ষর হওয়া চাই।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেছিলেন, দ্বিতীয় পাঁচসাল্য পরিকল্পনায় ৩,০০০ সমবায় কৃষি-সমিতির পত্তন করা হবে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৬০০ সমিতি গঠিত হবে। এ বছর পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং কৃষি ও কৃষকের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। চলতি বছরে সমবায় কৃষি সমিতি পত্তনের সংখ্যা ৬০০ থেকে কমিয়ে ৫১৩ করা হয়েছে। আর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে দেশের চারদিকে সত্যিকার চাষীদের নিয়ে বেশ বলিষ্ঠ সমিতির উদ্ভব হয়। শৃঙ্খল-পূরণ নয়, সত্যিকার সম্ভাবনাসংযুক্ত সমিতি। এই পরীক্ষামূলক সমিতিগুলোই হবে ভারতে কৃষি-ব্যবস্থায় এক নতুন অভিযানের অগ্রদূত। এই সমিতিগুলোর সাফল্যের উপরে নির্ভর করছে দেশের কৃষিব্যবস্থার ভবিষ্যৎ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সফলকাম হলে দেশের অগণিত চাষীর মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ হবে, সমবায়স্বাক্ষর চাষের প্রতি আস্থা ও আগ্রহ বাড়বে তাঁদের।

এই সমিতিগুলোকে কী ধরনের এবং কী পরিমাণ সরকারী সাহায্য করা হবে এ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি, তবে জানা গেছে যে, অন্যান্য ৫০ একর বা দেড়শ বিঘা জমি একলপ্তে পাওয়া গেলেই সমিতির পত্তন করা সম্ভব হবে এবং তাতে বার্ষিক সরকারী সাহায্যের পরিমাণ হবে প্রায় ৬,০০০ টাকার কাছাকাছি।

তাল-খেজুরের পাল্লা

মহম্মদ গোলাম আকবর

[কথা]

বাঙলাদেশ শুধু ধানে-চা'লে ধন্য নয়, চিনি-গুড়োও চির গণ্য। তাই এর অন্য নাম ছিল গৌড়-বঙ্গ। খেজুরগুড়, তালগুড় আর আখের গুড়—তিন রকম গুড়ই এদেশে ভাল জন্মে; তবে তালগুড়ের কথা আমরা বিদেশী শাসনের আমলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় তালগুড়ের শিল্প আবার বেঁচে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী বন্ধুরাও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের আর ভাইবোনেদের কল্যাণে সকলেরই এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

তালগাছ ও খেজুরগাছের গুণাবলী বর্ণনা ক'রে নিচের যে গানটি আমি রচনা করেছি, গত পাঁচ-ছ' বছর ধ'রে আমার কবিগানের দল নিয়ে বহু গ্রাম্য আসরে এ গান শুনিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছি। তাই 'বসুন্ধরা'র পাঠক-সমাজের সামনেও আমি এ গানটি উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

[গান]

তাল-খেজুরের পাল্লা আজ
বাধ'ল সোনার বাঙলায়।
পূর্ণ স্বাধীনতার দিনে
কার কাছে কে শিব নোয়ায়॥
তাল বলে, ও খেজুর ব্যাটা
আখানা তোর গলা কাটা
শিরে যে তোর বিষের কাঁটা
ফুটলে ঘটে বিষম দায়।
তাইতে যে তোর চোরের সাজা
সিউলি গলে ভাঁড় ঝোলায়॥

গুণ কিছ' থাকেও যদি
সর্ব অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি

অষ্ট-অষ্টাবক্র, ম'লে

পড়ি'ব রে ঢেঁকির তলায়।

ভাগ্য হলে, সাঁকো ক'রে

লোক পারাপার হয়ে যায়॥

(আমি) পাতায় ধরি বেদের বাণী

কাঠে কোঠার কড়ি দানি

গ্রীষ্মে আমার পাখা টানি'

হাঁফ ছেড়ে লোক শ্বাস ফেলায়।

(আমার) কচি ফলের শাঁসেজলে

নিদাঘদাহ দূর পালায়॥

(মোর) পাতায় চাষীর মাথার টোকা

মম'রে স্বর ঝরনা-ডাকা

কেউ বা দেয় মাথা ঢাকা,

কেউ বা ঘরের চালটি ছায়।

অগুনতি মোর গুণ গুনিতে

আঁক-গণিতের পাত ফুরায়॥

মিছরিতে মোর বিদ্রী কাতে

মোয়ের মায়ের মৃদু ঘটে

পাঁচ মাস তোর গলা কেটে

যায় না লোক আর তোর তলায়।

গলাকাটার দেমাক কত,

কিছুতে না শির নোয়ায়॥

দেখেই তোরে শরীর জ্বলে

পেট ভরে না শতেক ফলে

আমার সঙ্গে পাল্লা জুড়িস,

সাহস দেখে হাসি পায়।

একলা আমার সোনা-গুড়ে

সোনার ভারত ভেসে যায়॥

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

(আমার) পাকা ফলের গুণ বা কত
(তার) রস দেখিতে সোনার মত
ভাদর মাসে আদর তাহার
এদেশবাসীর রসনায়।
ফল করে মোর দেশের সেবা
কত না বড়ায় পিঠায়॥

খেজুর বলে, শোন রে তালা
কথায় যে দিস বিষের জ্বালা
তাইতে বসে শকুনগুলা
নোংরা করে তোর পাতায়।
অহংকারীর বিধান—বিধি
বাজ হানে যে তোর মাথায়॥

(আমি) আরবদেশের গরব জানি
খোরমা খেজুর মিষ্টি পানি
সেই গরব আজ বঙ্গে আনি'
দেশের মানুষ বাঁচন পায়।
কর্মগুণে গুণী আমি,
জন্ম আমার সব জা'গায়॥

সিউলি আমার ক্ষৌরী বানায়
গোষ্ঠী আমার মিষ্টি বিলায়
(আমি) রসে ফলে সেবা করি
এই যে সোনার বাঙলায়।
রস দিলে তোর ফলে থাকে না
ফলে দিলে যে রস শুকায়॥

তাল বলে, ভাই, কাজ কী দ্বন্দ্ব
এসো মিলি মনানন্দে
গুড় চিনি আর রসে গন্ধে
মাতাই মোরা বঙ্গমায়।
কথার গুঁমোর মিছ রে ভাই,
গুণের আদর সব জা'গায়॥



স্তন্যপায়ী শিকার-প্রাণী

শ্রীশ্রীজ্ঞানাপ্ত মিত্র

[পূর্বামুদ্রিত]

(৫২) কৃষ্ণসার [*Antelope cervicapra rupicapra* Muller]

ইহা পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ছিল, কয়েক বৎসর পূর্বেও মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে ইহাকে পাওয়া যাইত। আজকাল বঙ্গদেশে কুদ্রাপি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু উড়িষ্যা ও অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে, পাঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, অল্পবিস্তর দেখা যায়।

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা ৩২ ইঞ্চি; পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য সাত ইঞ্চি; ওজন প্রায় একমণ। লোম খর্ব এবং ঘন।

সাধারণত কেবল পুরুষের শৃঙ্গ থাকে। কদাচিৎ স্ত্রীরও শৃঙ্গ দেখা যায়,—থাকিলে ক্ষুদ্রাকার ও মসৃণ। পুরুষ-কৃষ্ণসারের শৃঙ্গ সাধারণত ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চি লম্বা, সর্বত্র চক্রাঙ্কিত, ৩-৪ পাকযুক্ত, মূলদেশে পরস্পরের সহিত প্রায় সংলগ্ন এবং প্রান্তভাগে কিঞ্চিৎ বিকীর্ণ।

ইহার পৃষ্ঠদেশ শাবক অবস্থায় ঈষৎ পীতভ পিঙ্গল, তিন বৎসর বয়সের সময়ে গাঢ় পিঙ্গল এবং পরে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তলদেশ শ্বেত। স্ত্রী-কৃষ্ণসারের রঙ সর্বদা পীতভ পিঙ্গল।

কৃষ্ণসার সমতলভূমিতে ঘোপ ও গুল্মাদি বিশিষ্ট প্রান্তরে বাস করে; ইহারা পাহাড় পর্বত ও জঙ্গল পছন্দ করে না। সাধারণত এক এক দলে ২০ কিংবা তাহারও বেশি দেখা যায়। ইহার প্রজননক্রিয়া সকল সময়েই চলে, কিন্তু প্রধানত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এককালীন একটি অথবা দুইটি শাবক প্রসূত হয়। ইহার মাংস অতি সুস্বাদ। ইহার

পাকানো চক্রাঙ্কিত শৃঙ্গ, সুন্দর গাত্রবর্ণ এবং বিশিষ্ট চলনভঙ্গির জন্য ইহাকে দেখিতে বাস্তবিক মনোরম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সুন্দর প্রাণীটি বঙ্গদেশে ইদানীং লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইহার পূর্ণ সংরক্ষণ এবং আবশ্যিক মত পুনঃপ্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।

(৫৩) সিরু [*Capricornis Sumatraensis jam-rachi* Pocock]

দার্জিলিং জেলায় ঘূম সীমানা, দন্দুকপো, টংল, গেলনবার্ন ও লপচুর নিকটস্থ জঙ্গলে ইহাকে বেশি দেখা যায়; অন্যত্র কোন কোন স্থানে কদাচিৎ দেখা যায়। সাধারণত ছয় হইতে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চ পাহাড় ইহার বাসভূমি। কাশ্মীর হইতে আসামের মিসমি পাহাড় পর্যন্ত সকল অনুকূল স্থানে ইহাকে পাওয়া যায়।

পূর্ণবয়স্ক সিরুর দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা তিন ফুট; লোম সহ পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চি; ওজন প্রায় আড়াই মণ।

পুরুষ ও স্ত্রী সিরুর শৃঙ্গ প্রায় সমান। শৃঙ্গ কৃষ্ণ, ক্ষুদ্রাকার, দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চির বেশি দেখা যায় না। পশ্চান্দিকে ঈষৎ হেলানো, নিম্নের তিন-চতুর্থাংশ কুণ্ডিত, প্রান্তদেশ মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র।

ইহার বহুৎ মস্তক, দীর্ঘ কর্ণ, শুল গ্রীবা, খর্ব প্রত্যঙ্গ এবং মস্তক অবনমিত করিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গির জন্য ইহাকে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ দেখায়।

ইহার মৃদুমন্ডলে প্রত্যেক চক্ষুর নিম্নে একটি রন্ধ্র বর্তমান। লোম রন্ধ্র, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে ঈষৎ লম্বা কেশরে পরিণত।

ইহার পৃষ্ঠদেশ কপিশ বা বাদামী রঙের আর তলদেশ অস্বচ্ছ শ্বেত।

ভয় পাইলে ইহারা বেশ দ্রুতবেগে এবং এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করে। ইহারা সাধারণত নির্বিড় জঙ্গলে শিলাকীর্ণ পর্বত-গাত্রে একাকী বিচরণ করে এবং কোন নির্দিষ্ট গৃহা কিংবা গহবরে বাস করে। ইহাদের বীরত্ব অদ্ভুত। বন্য কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইলে মৃত্যুর পূর্ব-মুহুর্ত পর্যন্ত ইহারা রণে ক্ষান্ত হয় না।

সাধারণত অক্টোবর মাস ইহাদের শৃঙ্গারের সময়, এবং মে কিংবা জুন মাসে এককালীন একটি মাত্র শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভধারণের কাল প্রায় আট মাস।

(৫৪) গোরাল [*Naemorhaedus goral hodgsoni* Pocock]

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় তিন হইতে নয় হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চভূমিস্থ জঙ্গলে ইহাকে সাধারণত সরলোন্নত শিলাকীর্ণ পর্বতগাত্রে দেখা যায়। হিমালয় পর্বতে কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্যন্ত ইহাকে অনূকূল স্থানে পাওয়া যায়।

গোরাল সিরু অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি; পৃষ্ঠ চার ইঞ্চি লম্বা।

পুরুষ ও স্ত্রী গোরাল উভয়েরই শৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গ কৃষ্ণ, ছয় হইতে আট ইঞ্চি লম্বা, প্রায় সমান্তরাল মোচার মত, পশ্চাদ্ধিকে ঈষৎ হেলানো, শীর্ষের সামান্য নিম্ন পর্যন্ত ঘন ঘন চক্র আঁকিত।

সিরুর ন্যায় ইহার মুখমণ্ডলে চক্ষুর নিম্নে কোন রন্ধ্র নাই, কিন্তু মেঘের মত খুরের সন্ধিকটে এক প্রকার গ্ল্যান্ড থাকে।

ইহার গাত্রবর্ণ ধূসরানু পিঙ্গল, তলদেশ হালকা রঙের। মুখমণ্ডলের, বিশেষত শৃঙ্গের সন্ধিকটস্থ অংশের রং গাঢ়তর। কণ্ঠ শ্বেত। পৃষ্ঠ ও পৃষ্ঠের

মধ্যরেখার উপর একটি এবং প্রত্যেক প্রত্যঙ্গের সম্মুখে একটি করিয়া ডোরা দাগ।

ইহাদের সাধারণত জঙ্গল মধ্যে দুর্গম ও শিলাকীর্ণ স্থানে এবং তৃণভূমিতে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ৪-৬টি একত্রে বিচরণ করিতে দেখা যায়। মেঘাচ্ছন্ন দিন হইলে সকল সময়েই ইহারা আহার করিয়া বেড়ায়। সিরু অপেক্ষা ইহাদের মনুষ্যভীতি কম; ইহারা প্রায়ই গ্রামের সন্ধিকটে আসে।

শীতকাল ইহার শৃঙ্গারের সময় এবং সাধারণত ছয় মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-গোরাল এপ্রিল কিংবা মে মাসে এককালীন একটি শাবক প্রসব করে।

(৫৫) থার [*Hemitragus jemlahicus Schaeferi* Pohle]

ইহা একপ্রকার বন্য ছাগল। ইহার নেপালী নাম ঝারল। হিমালয় পর্বতে কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্যন্ত সূ-উচ্চ পাহাড় গুলির দক্ষিণগাত্রে, সাধারণত বৃক্ষসীমার উপরিস্থ স্থানে ইহাকে দেখা যায়। দার্জিলিং জেলার উত্তরপ্রান্তে ছোট ছোট গাছের ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ সরলোন্নত কোন কোন স্থানে কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়।

মস্তক সহ ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট; স্কন্ধ-শীর্ষের উচ্চতা তিন ফুট; পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য সাত ইঞ্চি; ওজন প্রায় ২৫ মণ; শৃঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ইঞ্চি, স্ত্রীর ১০ ইঞ্চি।

ইহার শৃঙ্গবয়স মূলদেশে স্থূল ও সংলগ্ন, প্রান্তভাগে কতকটা বিকীর্ণ, পশ্চাদ্ধিকে হেলানো, নির্লিপ্ট, সম্মুখের কিনারা উন্নত ও সূক্ষ্ম, শীর্ষ-ভাগ ব্যতীত সর্বত্র কুণ্ডিত।

ইহার গাত্রবর্ণ গাঢ় রঙানু পিঙ্গল, মেরুদেশের উপর একটি মসীবর্ণের রেখা বর্তমান। শাবকদের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা এবং অধিক বয়স্কদের অধিকতর ঘন।

ইহার দেহ গুরুভার; প্রত্যঙ্গগুলি লম্বা, পৃষ্ঠ ও বলিষ্ঠ; কর্ণ সরু ও উন্নত। মস্তক ও মূখ-মণ্ডলের লোম খর্ব, দেহের লোম বেশ লম্বা ও ঝাঁকড়া, শ্ৰদ্ধ ও গ্রীবাদেশের কেশর জন্ম পর্যন্ত প্রলম্বিত। স্ত্রীর গাত্রাবরণ অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁকড়া এবং চুচুক চারিটি (সাধারণ ছাগলের চুচুক দুইটি)।

ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ। ভয় পাইলে ইহারা দ্রুতবেগে, উচ্চ খট্ খট্ শব্দ করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু অল্পদূর যাইয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায় এবং আততায়ীর দিকে সবিষ্ময়ে দৃষ্টিপাত করে। স্ত্রী-থার সাধারণত জুন কিংবা জুলাই মাসে এককালীন একটিমাত্র শাবক প্রসব করে; গর্ভধারণের কাল প্রায় ছয় মাস।

(৫৬) সাধারণ ভারতীয় খরগোশ [*Lepus nigricollis ruficaudatus* Geoffroy]

ইহাকে বঙ্গদেশে সর্বত্র, বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে, দেখা যায়। এই জাতীয় খরগোশ দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে, পাজাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মস্তক সহ ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি; লোম সহ পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য চার ইঞ্চি; কর্ণ বেশ লম্বা, দৈর্ঘ্য পাঁচ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২ ১/৪ ইঞ্চি। পুং-খরগোশের আয়তন স্ত্রী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

প্রত্যঙ্গগুলি বেশ লম্বা; পশ্চাতের প্রত্যঙ্গ সম্মুখের প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা স্পষ্টত দীর্ঘতর, এইজন্য ইহারা অতি দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে। চক্ষু বৃহৎ, পাতাবিহীন এবং এরূপভাবে সম্মিবেশিত যে, ইহারা সহজে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। ইহার সম্মুখের পদাঙ্গুলি পাঁচটি এবং পশ্চাতের চারটি; সকল পদতল লোমশ; নখর লম্বা ও নিষ্পিণ্ড; লোম ককর্শ।

ইহার পৃষ্ঠদেশ কপিশাভ পিঙ্গল; স্থানে স্থানে কৃষ্ণামিশ্রিত, বিশেষত মস্তকে ও পৃষ্ঠের মধ্য-রেখায়। প্রত্যঙ্গগুলি ও বক্ষোদেশ কপিশ বর্ণের;

তলদেশের অন্যত্র শ্বেত; কণ্ঠ, গণ্ডদেশ ও পৃষ্ঠের তলদেশ শ্বেত।

খরগোশ পতিত ভূমিতে শিলামধ্যে কিংবা তৃণ-গুল্মাদির ঘোপে বাস করে। ইহারা এক একটি বিশেষ শিলা অথবা গুল্ম পছন্দ করিয়া তন্মিনে বহুদিন যাবৎ একাকী থাকে; কখন কখন একটি পুর্ণ ঋতু বা ততোধিক কালও একই আশ্রয়স্থান ব্যবহার করে। সন্ধ্যা, রাত্রি ও প্রাতঃকালে ইহারা বিচরণ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ ও অন্যান্য উদ্ভিদ; গ্রামের নিকটে থাকিলে কিছু কিছু আবর্জনাও খায়, বোধহয় এই জন্য ইহুদিদিগের শাস্ত্রে খরগোশের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। খরগোশের মাংস বিশেষ সুস্বাদু নয়। উৎপাদিত হইলে ইহারা খেঁকিশিয়াল কিংবা অন্য কোন প্রাণীর গর্তে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে; নিজেরা কোন গর্ত করে না।

ইহার প্রজননক্রিয়া ৬-৭ মাস বয়স হইতে আরম্ভ হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই সম্পন্ন হয়। গর্ভ-ধারণের কাল মাত্র এক মাস। স্ত্রী-খরগোশ বৎসরে বহুবার সন্তান প্রসব করে এবং প্রত্যেক বারে ইহার এককালীন দুইটি কিংবা একটি শাবক জন্মগ্রহণ করে। শাবকদের জন্মাইবার সময়েই চক্ষু উন্মীলিত থাকে।

(৫৭) অমসৃণ খরগোশ [*Caprolagus hispidus* (Pearson)]

ইহাকে উত্তরবঙ্গের সমতলভূমিতে এবং ঢাকা ও ত্রিপুরায় দেখা যায়; কিন্তু বিরল।

মস্তক সহ ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ ইঞ্চি; লোম সহ পৃষ্ঠ দুই ইঞ্চি এবং কর্ণ দুই ইঞ্চি লম্বা। ইহার কর্ণ ও পৃষ্ঠ সাধারণ খরগোশের তুলনায় বিশেষ খর্ব।

ইহার চক্ষু ক্ষুদ্রাকার, গুল্মলোম খর্ব; প্রত্যঙ্গ-গুলি ক্ষুদ্র হইলেও পৃষ্ঠ ও বলিষ্ঠ; লোম রক্ষ্ম। আচরণ সাধারণ খরগোশের ন্যায়;—প্রভেদ এই যে,

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

ইহারা রাসের জন্য গর্ত খনন করে। বিরল বলিয়া ইহার পূর্ণ সংরক্ষণ আবশ্যিক।

(৫৮) বৃহৎ ভারতীয় কাঠবিড়াল [Ratufa indica centralis Ryley]

মস্তক সহ ইহার দেহ প্রায় দেড় ফুট এবং লোম বাদ দিয়া লেজ ১৪-১৫ ইঞ্চি লম্বা; ওজন আন্দাজ দুই সের।

ইহার পৃষ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ কপিশাভ রক্ত; তলদেশ পাণ্ডু অথবা পীতাব পিঙ্গল। মস্তকের উপর কর্ণের অব্যাহিত অগ্রে একটি প্রশস্ত দাগ আড়াআড়িভাবে বর্তমান। কর্ণের লোম বেশ লম্বা ও ঘন ঘন গুচ্ছে আবদ্ধ, এই বিশেষ লক্ষণের দ্বারা ইহাকে সহজে চেনা যায়।

এই বৃহৎ কাঠবিড়াল সম্পূর্ণ অরণ্যবাসী এবং প্রধানত বৃক্ষচর; কদাচিৎ ভূমিতে অবতরণ করে। দিবাকালে, সম্ভবত প্ৰহরব্যতীত, প্রায় সকল সময়ে ইহারা বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিয়া আহার অন্বেষণ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য ফল, বীজ, ফুল ও মৃদুল; কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা পতঙ্গ ও পাখির ডিমও আহার করে, কিন্তু এই সম্বন্ধে কোনও সঠিক প্রমাণ নাই। খাদ্যদ্রব্য সম্মুখস্থ পদ দ্বারা ধারণ করিয়া আহার করা ইহাদের স্বভাব। ইহারা ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত অনায়াসে লক্ষ্যপ্রদান করিতে সক্ষম। সু-উচ্চ বৃক্ষের উপর ইহারা তৃণ-পত্রাদি দিয়া বৃহদাকার নীড় রচনা করে এবং তন্মধ্যে এককালীন ৩-৪টি শাবক প্রসব করে। শৈশবাবস্থা হইতে পালন করিলে ইহারা মন্দ পোষ মানে না। বিশেষ কোন কাজে না লাগিলেও অনেক শিকারী লোমের জন্য এই সুন্দর পশুটিকে অথবা হত্যা করেন।

(৫৯) বৃহৎ মালয়দেশীয় কাঠবিড়াল [Ratufa bicolor gigantea (Mc Clelland)]

ইহাকে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের সান্নিধ্যস্থ সকল জংগলে দেখা যায়।

বৃহৎ ভারতীয় কাঠবিড়ালের তুলনায় ইহার দেহ কিছু ক্ষুদ্র, কিন্তু পৃষ্ঠ অধিকতর লম্বা। মস্তক সহ ইহার দেহ প্রায় ১৬ ইঞ্চি এবং লোম বাদ দিয়া লেজ ১৭ হইতে ২২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।

ইহার পৃষ্ঠদেশ খাঁটি কৃষ্ণ কিম্বা পিঙ্গলাভ কৃষ্ণ বর্ণের আর তলদেশ পাণ্ডু বর্ণের; এই বিশিষ্ট রঙ ও ইহার বৃহৎ আকার দেখিয়া ইহাকে সহজেই চেনা যায়।

বৃহৎ ভারতীয় কাঠবিড়ালের আচরণাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু মন্তব্য করা হইয়াছে, সেসমস্ত ইহার পক্ষে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্যঃ এই দুই প্রকার বৃহদাকার কাঠবিড়াল ব্যতীত আরও ৫-৬ জাতীয় কাঠবিড়াল বাংলাদেশে দেখা যায়; কিন্তু এইগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়া কেহই তাহাদের শিকারের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

(৬০) চড়াবিহীন পাহাড়ী সজারু [Hystrix hodgsoni hodgsoni (Gray)]

ইহাকে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের উপর ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চস্থানে দেখা যায়। নিম্নে বর্ণিত সজারু হইতে ইহার প্রধান প্রভেদ এই যে, ইহার কোন স্পষ্ট চুড়া নাই আর আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তক ও পৃষ্ঠ সহ ইহার সমগ্র দেহের দৈর্ঘ্য ২৪ ফুটের বেশি হয় না। ইহার আচরণ সাধারণ ভারতীয় সজারুর সমতুল্য।

(৬১) সাধারণ ভারতীয় সজারু [Hystrix indica Kerr]

ইহাকে বঙ্গদেশে সমুদ্রকূল হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়।

মস্তক সহ ইহার দেহ প্রায় ২২ ফুট এবং পৃষ্ঠ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা; ওজন প্রায় ১৫ সের।

ইহার শরীর বেশ পৃষ্ঠ; সম্মুখ ও পশ্চাদস্থ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য বিশেষ ন্যূনাধিক্য নাই। দেহের

মধ্যরেখার উপর কপাল হইতে পৃষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা কাঁটার একটি চুড়া থাকে। দেহের অন্যান্য স্থানে অপেক্ষাকৃত ছোট কাঁটা যথেষ্ট আছে। পৃষ্ঠের নিম্নাংশের কাঁটাগুলি শূন্যগর্ভ। স্তনের চুচুক ছয়টি।

ইহার গায়ের সাধারণ বর্ণ কৃষ্ণাভ পিঙ্গল; চুড়ার কতকগুলি কাঁটার প্রান্তভাগ শ্বেত, এবং দেহের অন্যান্য কোন কোন অংশের কণ্টকে অল্পবিস্তর শ্বেতবর্ণ বিদ্যমান।

ইহারা প্রধানত নিশাচর এবং কদাচিৎ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিংবা অতি প্রত্যুষে ইহাদের বিচরণ করিতে দেখা যায়। সমস্ত দিন ইহারা কোন স্বাভাবিক গৃহায় কিংবা স্বখাত বিবরে যাপন করে। শৃঙ্গ নদীগর্ভ বা নদীর স্নিকটস্থ শিলাময় স্থান ইহারা বেশি পছন্দ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য বিভিন্ন উদ্ভিদের মূল। জঙ্গলে ইহারা শিশু, শিমূল প্রভৃতি গাছের চারার মূল এবং সবজিবাগানে প্রবেশ করিয়া আলু, মূলা, পিঁপাজ ইত্যাদি ভক্ষণ করে; এইরূপে ইহারা চাষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। আক্রান্ত হইলে ইহারা পিছন ফিরিয়া আততায়ীকে প্রত্যাक्रमণ করে এবং ইহাদের তীক্ষ্ণ কণ্টকের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে জন্ম করিবার চেষ্টা করে। স্ত্রী-সজারদর এককালীন দুই হইতে চারিটি শাবক প্রসূত হয়।

সজারদর মাংস খাইতে ভাল এবং সেইজন্য ইহারা শিকারীর কবল হইতে রক্ষা পায় না; ক্ষতিকারী প্রাণী বলিয়া ইহার পূর্ণ সংরক্ষণের আবশ্যিকতাও নাই।

পরিশিষ্ট—ক

বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিস্তার

ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় যে-সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায় তাহারা কখন, কোথায় এবং কীভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্যক ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দৃষ্কর,

কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিহাস না হউক, মোটামুটি একটি ইতিহাসের ধারা সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নয়। আহাৰ ও প্রাণধারণের নিমিত্ত সকল প্রাণীকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে দেশস্থ উদ্ভিদরাঞ্জির উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং দেশের প্রাণিকুলের প্রকৃতি যে দেশজাত উদ্ভিদের দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অন্যদিকে উদ্ভিদবর্গের প্রকৃতি দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। আবার জলবায়ু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থিতি ও গঠন, যেমন অক্ষাংশ দ্রাঘিমান্তর, পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালায় অবস্থিতি, সমুদ্র ও বৃহৎ হ্রদাদি জলাশয়ের সান্নিধ্য, সমুদ্র হইতে উচ্চতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা তদ্রূপ প্রাণিকুল মূলত প্রভাবিত হয়। কাজেকাজেই পৃথিবীর কোথায় কী রকম প্রাণী পাওয়া যায় তাহা তদ্রূপ প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে অনেকটা বুঝা যায়।

কোন কোন ভূতত্ত্ববিদের বিশ্বাস যে, অতি প্রাচীন-কালে ভারত-উপমহীপ আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। পরে যখন ইহা একটি মহীপে পরিণত হয়, তখন ভারতবর্ষ ও এশিয়াখণ্ডের মধ্যে একটি নাতি-গভীর সাগরের যোগ ছিল। বর্তমানে উত্তর ভারতে যে সমতলভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায় তাহা (সমগ্র কাস্মীর প্রদেশ এবং তিব্বতের অধিকাংশ) তখন সেই সাগরগর্ভে নিমজ্জিত (বা বিলীন) ছিল। বহু কোটি বৎসর পূর্বে কোন বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পূর্ব হিমালয় প্রদেশের অভ্যুত্থান হয়। তখনই মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ প্রথম সংযুক্ত হয়। এই সংযোগস্থল দিয়া মধ্য এশিয়ার প্রাণিসমূহ ভারত-উপমহীপে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারত-বর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে। পূর্ব হিমালয়ের উত্থানের বহুকাল পরে আবার একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে উত্তর ভারতের সমতলভূমি ও মূল

হিমালয় প্রদেশ গঠিত হয়। ইহারও বহু লক্ষ বৎসর পরে একটি তৃতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সিওয়ালিক পর্বতশ্রেণী গঠিত হয়। সিওয়ালিক পর্বতে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল জীবশ্ম (ফসিল) অর্থাৎ জীবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কালে এই দেশ প্রাণিসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। অতিকায় মাস্তডন, একাদশ প্রকার হস্তী, জলহস্তী, জিরাফ, বৃহদাকার ও বারান অশ্ব, উট, বন্য গোরু, মহিষ, বহুজাতের হরিণ ও কৃষ্ণসার পর্যায়ের প্রাণী, বন্যবরাহ ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রাণী, শিম্পাঞ্জি ও ওরাংওটাং সহ নানাপ্রকার বানর ও হনুমান, একপ্রকার শিকারী চিতাবাঘ, প্রলম্বিত শ্ব-দন্তবিশিষ্ট ব্যাঘ্র ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিড়াল জাতীয় জন্তু, নেকড়ে, শিয়াল, থেংকশিয়াল ইত্যাদি বহুবিশেষ পশু তখনকার দিনে এই দেশে ছিল। ছেদনদন্তী প্রাণীদের মধ্যে ইন্দুর, ছুঁচো, সজারু ও খরগোশ ছিল। আর ভল্লুকের মধ্যে আধুনিক মন্থর ভল্লুকের মত একপ্রকার ভল্লুকও ছিল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপরি-উক্ত প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, জলহস্তী, জিরাফ ও কোন কোন কৃষ্ণসার পর্যায়ের প্রাণী আজকাল ভারতবর্ষে পাওয়া না গেলেও আফ্রিকাতে এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং এই দেশে উপস্থিত যে-সকল বানর ও বিড়াল জাতীয় পশু, শিয়াল, থেংকশিয়াল, মন্থর ভল্লুক, সজারু, খরগোশ, গন্ডার, বন্য গোরু ও হস্তী দেখা যায়, তাহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐসকল পশুরই বংশধর বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

হিমযুগের পূর্বে ইউরোপের অধিকাংশ স্থান ও মধ্য এশিয়ার জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলের জলবায়ুর প্রায় সমতুল্য ছিল। এইজন্য এই দুই দেশের মধ্যে প্রাপ্ত জীবশ্ম হইতে দেখা যায় যে, ঐ স্থানেও পূর্বকালে হস্তী, গন্ডার, জলহস্তী, টোপার, কৃষ্ণসার, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বাস করিত। সুতরাং সিওয়ালিক অঞ্চলে যে-সকল জন্তুর প্রস্তরীভূত

দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অনুদ্রুপ যে-সকল জন্তু এখন ভারতবর্ষে ও আফ্রিকাতে দেখা যায়, তাহাদের পূর্বপুরুষদের অধিকাংশ যে এককালে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়াতে বাস করিত এবং তথা হইতে এদেশে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে। বিশাল হিমালয় পর্বতের অভ্যুত্থানের ফলে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ ও তাহার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির জল-বায়ুর অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে পুরাকালে এই সকল দেশে যেসকল বিভিন্ন জাতীয় জন্তু বাস করিত তাহাদের কতকগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে, কতকগুলিকে বাধ্য হইয়া আপনাদিগকে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইয়াছে, আর কতকগুলি দক্ষিণ দিকে অধিকতর উষ্ণপ্রদেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। পৃথিবীর উত্তর গোলাধারের বহু প্রাচীন বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বিলোপ এবং তাহাদের বংশ-ধরদের ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় বর্তমান উপস্থিতি এইভাবে সম্ভবপর হইয়াছে।

কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে অধুনা যেসকল স্তন্যপায়ী জন্তু দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশ আসাম, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ চীনেও পাওয়া যায়; মালয় দেশের কয়েক জাতীয় প্রাণীকেও পূর্ব হিমালয় এবং মালাবার উপকূলের মৌসুমী দেশে যথেষ্ট দেখা যায়; ইহা হইতেই অনুমান করা হইয়াছে যে, ঐসকল জন্তু মধ্য-এশিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছিল। আবার অন্যদিকে ইউরোপ হইতে কোন কোন জাতীয় জন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমা অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়াছিল; কাশ্মীর ও হিমালয় অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বত-গুলিতে যেসকল বন্যপ্রাণী দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় প্রাণীদের সমতুল্য। আবার সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের মরুভূমিতে যেসকল প্রাণী বাস করে তাহারা ভারতের পশ্চিম হইতে আফ্রিকা পর্যন্ত যে বিশাল মরু অঞ্চল বিস্তৃত, তদ্রূপ

প্রাণীদের সদৃশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের প্রাণিকুল মালয়, আফ্রিকা ও ইউরোপের জন্তুনিচয়ের জ্ঞাতিসূত্রে বন্ধ এবং যেগুলি বিদেশী জন্তুদের সদৃশ তাহারা তাহাদের পূর্ব বাসভূমির সন্নিহিত স্থানে বা জলবায়ু সম্পর্কে তাহার সমতুল্য স্থানগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কারণে বঙ্গদেশের প্রাণিকুল অনেকাংশে দক্ষিণ চীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও আসামের প্রাণীদের সমতুল্য।

পরিশিষ্ট—খ

অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার প্রধান প্রধান শিকার-প্রাণী

(১) চম্বিশপগনা—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, চিতল হরিণ, গোসাপ, কুমির, বিভিন্ন জাতীয় হাঁস, বক, বাটান ও কাদাখোঁচা।

ব্যাঘ্র, চিতল হরিণ এবং বন্যশূকর সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ও নদীর মোহনাগুলিতে বহু কুমির দেখা যায়। সুন্দর-বনের বাহিরে, জেলার উত্তর প্রান্তে চিতাবাঘ ও বন্যবরাহ মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়।

কলিকাতার নিকটস্থ এবং সুন্দরবনের রায়মঙ্গল ও মাতলা নদীর নিকটবর্তী লবণাক্ত হ্রদসমূহে এবং অন্যত্র যেসকল অসংখ্য বিল আছে তাহাতে ঋতুভেদে বিভিন্ন জাতীয় হাঁস এবং অন্যান্য বহু জলচারী পক্ষী দেখা যায়।

(২) নদিয়া—চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, গোসাপ, হাঁস এবং কাদাখোঁচা।

এখানে আজকাল চিতাবাঘ খুব অল্প আর বন্য-বরাহ অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় কাদাখোঁচা ও হাঁস পদ্মা নদীর নিকটবর্তী বিলগুলিতে সময়বিশেষে পাওয়া যায়।

সাপ প্রচুর। বিষাক্ত সর্পের দংশনে বৎসরে গড়ে চারিশত লোক মারা যাওয়ার নজির দেখা যায়।

(৩) মর্শিদাবাদ—চিতাবাঘ এবং বন্য-বরাহ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

(৪) যশোহর—চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, গোসাপ, হরিয়াল, বিভিন্ন জাতীয় হাঁস, বক ও কাদাখোঁচা।

চিতাবাঘ ক্রমশ লোপ পাইতেছে কিন্তু বন্য-বরাহ জেলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ইক্ষু এবং অন্যান্য বর্ষিষ্ক ফসলের ক্ষতি করিয়া থাকে।

নড়াইল, বনগাঁ এবং মাগুরার বিলে ঋতুভেদে বিভিন্ন জাতীয় হাঁস, বক ও কাদাখোঁচা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়; তাহাদের অধিকাংশই যাবাবর।

(৫) খুলনা—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, চিতল হরিণ, সজার, উদ, গোসাপ, কুমির, ভাম বা ভেঁদড়, বন্য কুক্কট, হরিয়াল এবং অন্যান্য পক্ষী।

এইসমস্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত সুন্দরবনে প্রচুর; অধিকন্তু সেখানকার অধিকাংশ নদীই কুমিরে পূর্ণ। ব্যাঘ্রের উপদ্রবে চাষ-আবাদ ও জঙ্গলের কার্য মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সর্বত্র নানা জাতীয় বহু সাপ আছে। গোসাপ ও হরিয়াল সংরক্ষিত বনের বাহিরেও দেখা যায়।

(৬) বর্ধমান—চিতাবাঘ এবং গোসাপ।

ভাগীরথীর নিকটস্থ খন্ড জঙ্গলগুলিতে অল্প-সংখ্যক চিতাবাঘ আছে। কালনা এবং কাটোয়া মহকুমায় গোসাপ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে।

(৭) বীরভূম—চিতাবাঘ।

এখানে অল্পসংখ্যক চিতাবাঘ ছাড়া অন্য কোন বড় শিকার-প্রাণী নাই।

(৮) বাঁকুড়া—চিতাবাঘ, নেকড়ে, ডোরাকাটা হায়না, মন্থর ভল্লুক, বন্য-বরাহ, হরিণ, ময়ূর ও ময়াল সাপ।

চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না এবং বন্য-শূকর বিরল, কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের জঙ্গলে মন্থর ভল্লুক প্রায়ই দেখা যায়। ময়াল সাপ পাহাড়ের উপর জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা যায়। গোখরো, কেউটে ও অন্যান্য বিষধর সর্পও অপ্রচুর নয়।

হরিণ এবং ময়ূরের বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার—বিশেষত সোনামুখী থানায়, কেননা তাহারা ক্রমশ লোপ পাইতেছে।

এই জেলার স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের লৌকিক আচার অনুসারে উৎসব করিয়া বৎসরে দুইবার শিকার করে। জানুয়ারিতে যেটি হয় তাহার নাম 'এখন শিকার' এবং যেটি এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম 'সাঁওতাল শিকার'। বাঘদী, চামার, খয়রা, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর লোকে প্রথম অনুষ্ঠানটি পালন করে। ইহারা সাধারণত কেবল খরগোশ শিকার করে। দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র সাঁওতালরা তাহাদের একটি ধর্মনিষ্ঠান-রূপে পালন করে। তাহারা লাঠি, বর্শা, তীরধনুক ও শত শত কুকুর লইয়া পূর্ণ একমাস ধরিয়া শিকার করে এবং যে-কোন জীবন্ত প্রাণী দেখিতে পায় তাহাই মারিয়া খায়। যেহেতু এই ধ্বংসমূলক শিকারানুষ্ঠানটি পশুপক্ষীদের প্রজননস্বত্বের অর্থাৎ শিকার-নিষিদ্ধ কালে করা হয় সেইজন্য এই জেলার বন্য প্রাণিসমূহের দ্রুত উচ্ছেদ হইতেছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে তাহারা যে, অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ লোপ পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৯) মেদিনীপুর—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়ে, মথুর ভল্লুক, হায়না, হস্তী, হরিণ, খরগোশ, হাঁস, কাদাখোঁচা ও অন্যান্য পাখি।

বাঘ ও নেকড়ে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল হইতে ২-১টি হস্তীকে কদাচিৎ এই জেলায় আসিতে দেখা যায়। ভল্লুক ও হরিণ এখনও পশ্চিমে বেশ পাওয়া যায়। চিতাবাঘ ও হায়নাও অপ্রচুর নয়। খরগোশ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র শিকার ও পাখি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাপ অজস্র আছে। যাযাবর পাখি ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণী কমিয়া যাইতেছে।

(১০) হুগলি—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ ও গোসাপ।

বাঘ অধুনা লুপ্তপ্রায়, কিন্তু উত্তরে চিতাবাঘ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য-বরাহ হুগলি ও পাণ্ডুরা থানায় এখনও প্রচুর আছে এবং তাহারা শস্যের খুব ক্ষতি করে।

(১১) হাওড়া—চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, সজার, বজ্রকীট বা বনরুই, খেঁকশিয়াল, খরগোশ, ভোঁদড়

ও ভাম জাতীয় বিড়ালসমূহ, কুমির, গোসাপ, পায়রা, জলমোরগ, কাদাখোঁচা, সরাল হাঁস ও বক।

ডোমজুর, জগৎবল্লভপুর এবং সাঁকরাইল থানায় চিতা ও বন্য-বরাহ এবং জেলার দক্ষিণে বন্য-বরাহ দেখা যায়।

(১২) ঢাকা—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, সম্বর, চিতল হরিণ, কাকর হরিণ, ময়ূর ও বন্যকুকুট।

ভাওয়াল বনে অতি অল্পসংখ্যক কাকর হরিণ এবং দুই-একটি বাঘ ছাড়া অন্য কোন বড় প্রাণী আজকাল আর প্রায় নাই বলিলেই চলে।

(১৩) মৈমনসিং—ব্যাঘ্র, চিতল হরিণ, সম্বর এবং কাকর হরিণ।

এখন হরিণ প্রায় লুপ্ত, কিন্তু গারো পাহাড়ের পাদদেশের বনে এবং আটুয়া ও মধুপুর জঙ্গলে ব্যাঘ্র মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

(১৪) ফরিদপুর—গোসাপ। ইহাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

(১৫) বাখরগঞ্জ—ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, চিতল ও বন্য-বরাহ।

পূর্বে এখানে অনেক শিকার পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন যে কয়টি জঙ্গল অবশিষ্ট আছে সেখানে দুই-একটি বাঘ ও হরিণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

লোকের নির্বিচার শিকার, দ্রুত লোকালয়ের বিস্তার ও তাহার ফলে বনের উচ্ছেদ-সাধন—এইসমস্ত কারণে শিকারযোগ্য প্রাণী দ্রুত লোপ পাইতেছে।

(১৬) চট্টগ্রাম—হস্তী, গোর, সম্বর, কাকর হরিণ, বন্য-বরাহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্য কুকুট, মথুরা ও বিভিন্ন জাতীয় জলচর পক্ষী।

গোর ও সম্বর কমিয়া আসিতেছে।

(১৭) নোয়াখালি—এখানে আজকাল আর কোন বড় শিকার-প্রাণী নাই।

(১৮) হুগলি—চট্টগ্রামের তুল্য।

(১৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম—গঁড়ার, হস্তী, গৌর, সম্বর, চিতল হরিণ, কাকর হরিণ, বন্য কুক্কট, শ্বেতপক্ষ বন্য হংস এবং অন্যান্য শিকারযোগ্য ও আহারোপযোগী পক্ষী।

গৌর আজকাল দুষ্প্রাপ্য এবং গঁড়ার এখনও আছে কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না। দাঁতাল হস্তী খুব বেশি নাই কিন্তু মাক্না ও হস্তিনী এখনও প্রচুর।

দশ বৎসর পূর্বে যত বন্য কুক্কট ও অন্যান্য পশুপক্ষী দেখা যাইত এখন তদপেক্ষা অনেক কম দেখা যায়।

(২০) রাজসাহী—গোসাপ, রাজহাঁস এবং হাঁস।

গোসাপ সংখ্যায় কমিয়া আসিতেছে। নাটোরের কতকগুলি বিল যদি রক্ষা করা না হয় তাহা হইলে যেসকল হংস ও অন্যান্য জলচারী পক্ষী এই জেলার স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের বংশলোপ হওয়ার সম্ভাবনা।

(২১) দিনাজপুর—কদাচিৎ দুই-একটি বন্য-বরাহ ও চিতাবাঘ ছাড়া এই জেলায় এখন আর কোন বড় শিকার-প্রাণী দেখা যায় না।

(২২) জলপাইগুড়ি—গঁড়ার, হস্তী, বন্য মহিষ, গৌর, বজ্রকীট, সম্বর, বারসিঙ্গা হরিণ, চিতল হরিণ, পারা হরিণ, কাকর হরিণ, মন্থর ভল্লুক, বন্য-বরাহ, বামন বরাহ, সজার, খরগোশ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, লামাচিতা ও অন্যান্য জাতীয় বন্য বিড়াল, গন্ধগোকুল, ভোঁদড়; ময়ূর, বন্য কুক্কট, কালিজ, ডাহর, কালো তিতির ও অন্যান্য পক্ষী।

গঁড়ার, গৌর, বজ্রকীট বা বনরুই, বামন বরাহ, এবং বারসিঙ্গা হরিণ আজকাল কম দেখা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য জন্তু সরকারী সংরক্ষিত বনে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

সংরক্ষিত বনের বাহিরে ডাহর ও কালো তিতির কমিয়া আসিতেছে।

(২৩) রংপুর—কয়েকটি চিতাবাঘ, খরগোশ এবং জলচারী পক্ষী ব্যতীত এই জেলায় এখন অন্য কোন শিকার-প্রাণী নাই বলিলেই চলে।

(২৪) বগুড়া—এই জেলায় কতকগুলি বড় বিল আছে। তাহাতে যেসকল পক্ষী দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ষাষাবর।

(২৫) পাবনা—চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ ও বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী।

নদী-নালা শুকাইয়া যাওয়ার গ্রামগুলি লোকশূন্য হইয়া যাইতেছে। সেই কারণে চিতাবাঘ ও বন্য-বরাহের সংখ্যা কিছু বাড়িতেছে।

কিছু কিছু শিকারযোগ্য পক্ষী বিল এবং জলাভূমিতে দেখা যায়।

(২৬) মালদহ—কুমির, হাঁস, রাজহাঁস এবং তিতির।

কুমির এবং লালশির হাঁস কমিয়া যাইতেছে। এই জেলায় প্রায় ১২টি জলচারী পক্ষীর অন্তর্কুল বিল ও ছয়টি তিতিরের উপযোগী বাসভূমি আছে। এইসমস্ত স্থানে শিকার সংযত করা এবং জাল ও ফাঁদ দিয়া পাখি মারা নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্থানীয় বন্দুকের মালিকগণ, বেদেরা ও আগন্তুকেরা নির্বিচারে বহু হাঁস এবং অন্যান্য পক্ষী হত্যা ও আহত করে। যত পক্ষী নিহত হয় তাহার অনেক বেশি আহত হয়।

(২৭) দার্জিলিং—পাহাড়ের পাদদেশে হস্তী, গৌর, সম্বর, চিতল, পারা ও কাকর হরিণ, বন্য-বরাহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল, সজার, খরগোশ, বন্য কুক্কট, ময়ূর, কালিজ, কালো তিতির, মন্থর ভল্লুক।

পাহাড়ে সম্বর, কাকর হরিণ, গোরাল, সির, মনাল ও অন্যান্য কুক্কট জাতীয় পক্ষী, পাহাড়ী কালো ভল্লুক, শ্বেত চিতাবাঘ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

হস্তী, গৌর এবং হরিণ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

—সমাপ্ত—

জমির ফলন বৃদ্ধি

ডক্টর সুবলকুমার মুখোপাধ্যায়

যে-কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে তার শিল্প ও কৃষির উপর। এই দুই বিষয়ের যথাযথ সমন্বয়ই এই উন্নতির পরিপোষক। যে দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত সেখানে কৃষিকর্মে অনেক কম-সংখ্যক লোক নিয়োজিত হয় এবং বেশির ভাগ লোক শিল্প-সংক্রান্ত কাজ করে। যেমন আমেরিকায় শতকরা ১২ থেকে ১৩ ভাগ লোক কৃষিকাজ করে। কিন্তু ৫০-৬০ বছর আগে সেখানে এ অবস্থা ছিল না। আমাদের দেশের মত সেদেশেও অধিকাংশ লোক তখন চাষ-আবাদেই নিয়োজিত হ'ত। দেখা যায় যে, ১৯০০ সালে আমেরিকাতে একজন চাষী তার নিজের ছাড়াও আরও ৬ জনের খাদ্য উৎপাদন করতেন। এখন তাঁরা প্রত্যেকে আরও ১৬ জনের খাদ্য উৎপাদন করছেন। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে তাঁদের কৃষির উন্নতি এবং জমির গড় ফলন বৃদ্ধি। এ সবই গত ৬০-৭০ বছরের কৃষিবিষয়ক গবেষণার ফলে উন্নত কৃষিপদ্ধতির ব্যবস্থা অবলম্বন করার সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক চাষ-আবাদ করে। পশ্চিম বাঙলায় এর পরিমাণ কিছু কম হ'লেও, কৃষিই আমাদের কর্মসংস্থানের প্রধান উপায়। এই কারণে আমাদের দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পব্যবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর সাথে কৃষির উন্নতির জন্যও যথাযোগ্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের এখনও খাদ্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। প্রতি বছর বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে যদি আমাদের ঘাটতি মেটাতে হয় তবে অন্যান্য খাতে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হবে; তাই কৃষির উন্নতির জন্য সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। জমির ফলন

বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রধানত (১) উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, (২) সেচের জলের ব্যবস্থা, (৩) জমিতে সার প্রয়োগ, (৪) ফসলকে রোগ এবং পোকাকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, (৫) ফসল কাটার পর ভালভাবে গুদামজাত করা—যাতে গুদামে থাকার সময় পোকা বা রোগের আক্রমণে ফসল নষ্ট না হয়, (৬) জমিকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এই সমস্ত বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কৃষিবিভাগ ব্যবস্থা করছে।

উপরি-উক্ত উপায়ে ফলন বৃদ্ধি করতে হ'লে প্রয়োজন জ্ঞানের এবং সেই জ্ঞান ব্যাপক কৃষি-গবেষণার ফলেই পাওয়া সম্ভব। তাই কৃষি-গবেষণার বিষয়ে আমাদের বিশেষ সচেতন হ'তে হবে। উন্নত জাতের বীজ আবিষ্কার, বিভিন্ন প্রকার জমিতে বিভিন্ন ফসলের সার প্রয়োগের পরিমাণ, সময় এবং রীতি নির্ধারণ, ফসলের বিভিন্ন প্রকার কীটশত্রু ও রোগ নির্ধারণ এবং সেসবের প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন, গুদামজাত করার উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কার, বিভিন্ন ফসলের জন্য সেচের জলের পরিমাণ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির নির্ধারণ, জমির উর্বরতা রক্ষার পদ্ধতি এবং ক্ষয় নিবারণের যথাযথ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপায় উদ্ভাবন করা একান্তভাবে নির্ভর করে কৃষিগবেষণার ফলাফলের উপর। যেসমস্ত দেশ কৃষিবিষয়ে উন্নত তার সকল দেশেই গবেষণার উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে।

এইসব গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে, পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ জমিতেই একরপতি সওয়া তিন মণ মিশ্র সার প্রয়োগ করলে প্রায় ৪-৫ মণ চাল বেশি পাওয়া যায় এবং আড়াই মণ মিশ্র সার দিলে ৩-৪ মণ অতিরিক্ত পাটের আঁশ পাওয়া সম্ভব। এই দুটোই আমাদের দেশের প্রধান ফসল এবং

এ দুটোর ফলন বাড়াতে পারলে আমাদের কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলেও প্রায় চার আনা ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এখন আমি পশ্চিম বাঙলায় কৃষিগবেষণার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলছি। দেশ-বিভাগের ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, কারণ আমাদের প্রধান কৃষি গবেষণাকেন্দ্র পূর্বে পাকিস্তানের ঢাকাতে অবস্থিত থাকায় সেটা আমরা হারিয়েছি। ১৯৫০-৫১ সালে নতুন কৃষিগবেষণা কেন্দ্র সাময়িকভাবে কলিকাতায় স্থাপন করে কাজ শুরু করা হয়। হরিণঘাটায় নতুন বাড়িতে স্থায়ীভাবে গবেষণাগারকে স্থানান্তরিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে, শীর্গগিরই আমরা সেখানে আরও ভালভাবে কাজ করবার সুযোগ পাব। গত কয়েক বছরের গবেষণায় পশ্চিম বাঙলায় কয়েক প্রকার উন্নত জাতের আউশ, আমন এবং বোরো ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই বিষয়ে আরও গবেষণা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জমির জন্য উপযুক্ত ধানের বীজ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা চলছে। সাধারণ জমি ছাড়াও লোনা, জল ভোবা এবং পাহাড়ী জমিতেও ধানের ফলন বৃদ্ধি করা যায়। এ ছাড়া গম, সজ্বর জাতীয় ভুট্টা এবং জোয়ারের উন্নত বীজ আবিষ্কারের কাজ চলছে। দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ইত্যাদি জলাধার পরিকল্পনা এবং বড় বড় নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে যখন অধিক পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে, তখন এইসব জমিতে গম চাষের সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। এখন পশ্চিম বাঙলায় প্রায় সওয়া লক্ষ একর জমিতে গমের চাষ হয়। রবি ঋতুর ফসল হিসাবে গমের চাষ বাড়িয়ে আমরা সহজেই খাদ্যাভাবের অনেকটা মেটাতে পারব। গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে, উন্নত জাতের গম (যেমন এন পি ৭১০), আমাদের দেশের মাটিতে ও আবহাওয়াতে ভাল হয় এবং আমাদের সাধারণ গমের প্রায় দ্বিগুণ ফলন দেয়। শুধু তাই নয়,

এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকায় চাষে লোকসান হবার সম্ভাবনা নেই।

ধান ও গম ছাড়া অন্যান্য ফসলের বিষয়েও গবেষণা করা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগের গবেষণাকেন্দ্র থেকে উন্নত জাতের চার রকমের চীনাবাদাম, দু' রকমের তিল, তিন রকমের সরষে, তিন রকমের অড়হর, দু' রকমের ছোলা, তিন রকমের মসুর ডাল, দু' রকমের মৃগ, ছয় রকমের আলু, বিভিন্ন প্রকার আম, কলা, লিচু, লেবু, ফুল-কপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, মটরশুঁটি, মুলো, পালঙ-শাক ইত্যাদি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এসমস্ত বিষয়ে গবেষণার কাজ বিশেষ সময়সাপেক্ষ এবং এখন চলছে। ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলে এবং নিয়মিত সার ও জল প্রয়োগ করলে এর ফলন একরপ্রতি ৫৪০ মণ থেকে প্রায় এক হাজার-বারোশ মণ করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকার ফসলে কী পরিমাণ জলের প্রয়োজন এই বিষয়ে গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমরা সাধারণত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দিয়ে শুধু যে জলের অপচয় করি তা নয়, ফলনও ভাল পাই না।

যে-কোন ফসলের প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নির্ভর করে জমির নিজস্ব সঞ্চিত সারের পরিমাণের উপর এবং ফসলের জমি থেকে সার গ্রহণের ক্ষমতার উপর। ফসল যে-পরিমাণ খাদ্য মাটি থেকে নেয় তা সার হিসাবে মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন; তা না হলে জমি অনুর্বর হয় এবং ফলন ক্রমশ কমে যায়। যথেষ্ট ব্যবহারে ঢালু জমি থেকে উপরের উর্বর মাটি ক্ষয়ে যায় এবং জমি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলার অনেক জায়গাতেই এমন হয়েছে।

উপরি-উক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট গবেষণা করে সেই গবেষণার ফল ফসল-উৎপাদনে প্রয়োগ করলে আমাদের দেশে জমির ফলন নিশ্চয়ই বাড়বে।*

*আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের গোপন্য

কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়

আপনারা কি জানেন যে, প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য—যা দিয়ে সারা দেশের লোকের প্রায় ১৫ দিনের খাদ্যের সংস্থান হ'তে পারে—শ্রেফ নর্দমায চ'লে যায় শুধু এই কারণে যে, শস্য সংরক্ষণ করার যথোপযোগী ব্যবস্থা আপনাদের নেই? বাড়িতে যে গোলা তৈরি করা হয় বা শস্য রাখবার জন্য নানা রকমের যেসব পাত্র ব্যবহার করা হয়, সেসব দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং আপনাদের সকল রকম সতর্কতা সত্ত্বেও আপনাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন-করা ফসলের একটা অংশ হয় ই'ন্দুর-ছ'ড়চো প্রভৃতিতে নিয়ে যায়, নয়তো পোকা-মাকড় আর বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায়।

এই বিপদল ক্ষতি বন্ধ করতে এবং আপনাদের মূল্যবান ফসল রক্ষা করতে আপনারা যাতে রক্ষণাগারের সাহায্য পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে দেশের বড় বড় বাজারে ভারত-সরকারের সহায়তায় গুদাম তৈরি করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বোম্বাই রাজ্যের অমরাবতী, সাংলি ও গোণ্ডিয়াতে, মহাশূরের গাডাগ ও দেবাগেরেতে, উড়িষ্যার বরগড়ে, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাংগলে, উত্তর-প্রদেশের চন্দৌসিতে এবং পাজাবের মোগাতে, প্রত্যেক জায়গায় একটি-হিসাবে, মোট নয়টি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণশালা স্থাপিত হয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গাতেও আরও সংরক্ষণাগার নির্মাণ করার কথা হচ্ছে।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সংগঠিত 'কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠান' দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলিতে বহু সংরক্ষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন—যার প্রত্যেকটিতে ১০ হাজার টন মাল রাখা চলবে। তা ছাড়া, উক্ত প্রতিষ্ঠান রাজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন কতকগুলি সংরক্ষণাগার

স্থাপনে সাহায্য করছেন যার প্রতিটিতে ৫ হাজার টন মাল রাখা যায়।

সংরক্ষণের উপকারিতা

যেসব সংরক্ষণশালা স্থাপিত হয়েছে তার যে-কোনটিতে গেলেই দেখা যায়—সেখানে যাঁরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল রাখছেন, তাঁরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন। রক্ষিত শস্য যাতে নষ্ট বা খারাপ হ'তে না পারে, সহজে ও কম সুদে যাতে টাকা ধার পাওয়া যায়, লাভ যাতে বেশি হয় এবং বাড়তি কোন খরচ না ক'রেও আর্থনীতিক দিক দিয়ে অধিকতর স্বাবলম্বী হওয়া যায়, সেসব বিষয়ে সংরক্ষণশালা থেকে সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়। সংরক্ষণাগারগুলির কাজ চলে না-লাভ ও না-লোকসানের ভিত্তিতে, এবং আপনাদের কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণে ও ব্যবসাতে সাহায্য করার জন্যই এগুলির অস্তিত্ব।

রসিদ

আপনাদের উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণাগারে রাখলে শুধু যে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে তা বাঁচবার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে তাই নয়, আপনারা সেই মালের জন্য একটা রসিদও পাবেন—যাতে ক'রে আপনাদের মাল 'অচল' প'ড়ে না থেকে লাভজনক ব্যবসাতে এবং সংগত বিপণনের ক্ষেত্রে 'সচল' হয়ে উঠবে।

সংরক্ষণাগারের রসিদ ব্যাঙ্ক চলে। এর বলে আপনারা মাল স্থানান্তরিত না ক'রেও ধার পেতে পারেন। এসব ধারের জন্য ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয় তার হার অন্যান্য ঋণের সুদের হারের চেয়ে কম, এবং যে-হারে সুদ দিয়ে আপনারা এখন টাকা ধার নেন তার চেয়ে অনেক কম। টাকা ধার নিয়ে আপনারা ব্যবসাতে অথবা চাষের কাজে লাগাতে পারেন। তারপর, বাজারের দর যখন অনুকূল মনে

হবে, তখন আপনারা নিজেদের মাল শুদ্ধ ওই রসিদ হস্তান্তর করেই বিক্রি করে দিতে পারেন। রসিদটা হস্তান্তরযোগ্য এবং সংরক্ষণশালা থেকে মাল না সরিয়েই তার উপর লেনদেন করা চলে। এর ফলে সময় আর শ্রম বেঁচে যায়, তা ছাড়া, চালানি-খরচাও দিতে হয় না।

এই সংরক্ষণশালা কৃষকদের ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্য সুদে টাকা ধার নেওয়ার এবং বাজারদর ভাল বুঝে মাল বিক্রির সুযোগ দেবার সহায়ক।

বর্তমানে আহারযোগ্য তৈলবীজ সমেত খাদ্যদ্রব্য, গবাদি পশুর খাদ্য, খইল, তুলো (বীজ-সহ ও বীজ-ছাড়ানো), তুলোবীজ, কাঁচা পাট এবং উন্মিষ্ট তেল সংরক্ষণাগারে রাখবার জন্য নেওয়া হয়। আরও বেশি স্থান-সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হ'লে, আরও জিনিস নেওয়া হবে।

কেন সংরক্ষণাগারে রাখবেন?

কারণ—

- (১) মাল রাখার গুদামগুলি একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সেখানে মাল রাখবার সময় জীবগণ্ড-শোধন করে নেওয়া হয় ;
- (২) গুদগ অনুযায়ী মালের শ্রেণীবিভাগ করা হয় ;
- (৩) নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে মাল খারাপ হ'তে বা নষ্ট হ'তে পারে না।
- (৪) মালখানা থেকে যে রসিদ পাওয়া যায়, তার দরুন আপনাদের রক্ষিত মাল 'অচল' পড়ে না থেকে, লাভজনক ব্যবসায় 'সচল' হয়ে থাকে।



হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশ

হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশে গবাদি পশু রাখার বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কয়েকজন মালিক সেখান থেকে তাঁদের গো-মহিষ সরিয়ে নিয়ে গেছেন—এই মর্মে সম্প্রতি কোন কোন সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছে, তার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুগ্ধ উপনিবেশের ৭,২৫টি পশুর মধ্যে ৪,৩৭৩টি পশু (গোরু ও মহিষ উভয়ই) নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মাত্র ২,৭৪২টি পশু অবশিষ্ট আছে। হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশ থেকে গো-মহিষ স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার আরও কয়েকটি কারণ আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যথা (ক) মালিকদের কাছে যে পশুখাদ্য সরবরাহ করা হয় তার মূল্যের অপেক্ষাকৃত আধিক্য এবং পশুখাদ্যের অপকর্ষ, (খ) উপনিবেশে পশু-রক্ষণের উচ্চ ব্যয়, এবং (গ) উপনিবেশে রক্ষিত পশুগুলির মালিকেরা যে দুগ্ধ সরবরাহ করেন, তার জন্য প্রদত্ত অ-লাভজনক মূল্য। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশে রক্ষিত পশুদের মধ্যে মৃত্যুহার উচ্চ।

হরিণঘাটা থেকে কলিকাতার অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশকে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় বলে এ ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের দ্বারা শুল্ক আতঙ্কেরই সৃষ্টি হ'তে পারে। জনসাধারণকে আশ্বাস দানের জন্য সরকার জানাতে চান যে, কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

কোন দুগ্ধ উপনিবেশে পশুদের আগমন ও বিহগমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যেসকল পশু দুগ্ধহীন এবং বন্ধ্যা, সেগুলি উপনিবেশে রাখা মালিকদের পক্ষে লাভজনক নয় বলেই সেগুলিকে অপসারণ করা হয়। এর ফলে যে-সব দুগ্ধবিহীন পশুর বাছুর হবে না, সেগুলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ও মাসে মাসে নতুন গো-মহিষ ভর্তি করা

হচ্ছে। কিন্তু কোন সময়েই বর্তমান তিনটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিটে ৩,০০০এর বেশি পশু ছিল না—যদিও এগুলিতে ৩,৬০০টি পশুর স্থান হ'তে পারে। অতএব এখান থেকে ৪,৩৭৩টি পশুকে অপসারণের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। দুগ্ধ-দেওয়া পশুগুলিকে শুল্ক যে অপসারণ করা হয় নি, তাই নয়, ১৯৫৯ সালের জুন ও জুলাই মাসে উপনিবেশে ১,৪৫৭টি পশু রাখার জন্য অগ্রিম আবেদন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। বেসরকারী গো-মহিষ-মালিকদের মধ্যে হরিণঘাটা উপনিবেশের জনপ্রিয়তা এতেই প্রমাণিত হয়। তবে, অর্ধেক লাইসেন্স-ফী দিয়ে মোট স্টল-স্পেসের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত স্থানে নির্দিষ্ট-সংখ্যক দুগ্ধহীন গাভী রাখার বিশেষ সুবিধা সরকার লাইসেন্স-ধারীদের দিয়েছেন। লাইসেন্সধারীদের মাসিক পশুপ্রতি নামমাত্র ১ টাকা ব্যয়ে দুগ্ধবিহীন পশু-গুলিকে কল্যাণী নর্থ ফার্মে চরাতে দেওয়া হয়েছে। দুগ্ধবিহীন পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের এসকল সুবিধা দেওয়ার সঙ্গে লাইসেন্সধারীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পশুগুলির দুগ্ধ দেওয়ার কালের শেষে তাদের অকালবন্ধ্যা ক'রে এবং কসাইদের কাছে বন্ধ্যা পশুগুলি বিক্রি ক'রে নগদ মূল্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা ওসব পশুর যত্ন করা ও পুনরায় তাদের গর্ভবতী করানো অনেক ভাল।

হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশে পশুখাদ্যের মূল্য সম্পর্কে বলা যায় যে, বোম্বাই-এর আরে দুগ্ধ উপনিবেশে যেখানে মণপ্রতি ৯১ নয়া পয়সা মূল্য নেওয়া হয় সেখানে হরিণঘাটার কতৃপক্ষ পারা-ঘাসের জন্য মণপ্রতি ৭৫ নয়া পয়সা ধার্য করেন। বীরশিম, জই ইত্যাদির মত অতি পুষ্টিগত কাঁচা পশুখাদ্যের মূল্য মণপ্রতি ১ টাকা থেকে ১ টাকা ১২ নয়া পয়সা। কলিকাতার বাজারে এগুলোর মূল্য মণপ্রতি ২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা থেকে ৩

টাকার মধ্যে। সুতরাং দেখা যাবে যে, কাঁচা পশু-খাদ্যের জন্য হরিণঘাটা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীদের কাছ থেকে কোন মূল্যনা করেন না।

পশুখাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বলা যায় যে, গো-মহিষাদির মালিকেরা পশুখাদ্য নির্বাচন সমিতির সদস্য এবং হরিণঘাটার গবাদিকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তা তাঁরা নিজেসই নির্বাচন করেন।

হরিণঘাটা-কর্তৃপক্ষ দুধের জন্য যে মূল্য দিয়ে থাকেন তার সম্বন্ধে বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দুধের মাখন স্নেহ-উপাদান এবং অন্যান্য উপাদানের শতকরা হারের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তা ছাড়াও, ঐ দুধ পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুশূন্যতার দিক দিয়ে নির্ধারিত মান-সম্মত হওয়া চাই। বোম্বাই-এর আরে এবং হরিণঘাটার দুধ উপনিবেশের দুধের দামের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, আরে দুধ উপনিবেশে শতকরা ৮.২০ ভাগ স্নেহপদার্থযুক্ত দুধের জন্য যেখানে মণপ্রতি ৩২ টাকা ২৯ নয়া পয়সা দেওয়া হয় সেখানে ঐ একই প্রকার দুধের জন্য হরিণঘাটায় ৩৬ টাকা ২৮ নয়া পয়সা মূল্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার স্নেহদ্রব্য-সমন্বিত মাখনের মধ্যে মূল্যের তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু বোম্বাইতে শতকরা ৮.২০ ভাগ স্নেহদ্রব্য-সমন্বিত মাখন থেকে ৬ ভাগ স্নেহদ্রব্য-সমন্বিত মাখনের মধ্যে দামের তারতম্য হয় ৩২ টাকা ২৯ নয়া পয়সা থেকে ২২ টাকা ২৯ নয়া পয়সা, সেখানে হরিণঘাটার প্রতি মণে দামের তারতম্য ৩৬ টাকা ২৮ নয়া পয়সা থেকে ২৬ টাকা ৬০ নয়া পয়সা। মোটামুটি হরিণঘাটার গোয়ালারা আরে দুধ উপনিবেশের গোয়ালারাদের তুলনায় মণপিছ ৪ টাকা বেশি পেয়ে থাকেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মাখনের স্নেহদ্রব্য যত কম হবে সেই অনুসারে দামও তত কম হবে।

হরিণঘাটার দুধের একটি মান আছে, কলিকাতার নাগরিকদের স্বার্থের দিকে চেয়ে সেই মান রক্ষা করা প্রয়োজন।

কলোনিতে গো-মহিষ রাখবার ব্যয় ধরা হয়েছে দুধবতী পশুপিছ প্রত্যেকদিন ৪৪ নয়া পয়সা ও দুধবিহীন পশুপিছ প্রত্যেকদিন ২২ নয়া পয়সা। এই ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা জল সরবরাহের খরচা, বৈদ্যুতিক খরচা, ছাউনিগুলি পরিষ্কার রাখার ব্যয়, মালিকদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, পশুদের সাধারণ অসুখের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা-সাহায্য, পশুদের প্রজননের সুবিধাদি এবং দুধ উপনিবেশ থেকে দুধশালায় বিনা খরচে দুধ নিয়ে যাওয়া-আসা। আরে দুধ উপনিবেশে গো-মহিষ দুধবতীই হোক আর দুধবিহীনই হোক তাদের মাথাপিছ ৪৫ নয়া পয়সা করে একইরূপ হার ধরা হয়। এ ছাড়া হরিণঘাটায় প্রদত্ত কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা এবং উপ-জীবিকা-ব্যয় আরে দুধ উপনিবেশের লাইসেন্সধারীদের দেওয়া হয় না।

হরিণঘাটা দুধ উপনিবেশের গো-মহিষগুলির মধ্যে মৃত্যুহার সম্পর্কে তদন্ত করে জানা গিয়েছে যে, তা মাত্র হাজারপিছ তিনটি। এই মৃত্যুহার অত্যন্ত কম এবং এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, হরিণঘাটা দুধ উপনিবেশে যেসকল সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় সেদিক দিয়ে হরিণঘাটায় যে খরচা লাগে এবং কলিকাতার চারিপাশের ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর খাটালগুলিতে গো-মহিষ রাখার যে ব্যয় পড়ে—উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।

পানচাষের কথা

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

[আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সংলাপ]

প্রশ্নঃ পান আমাদের অতি পরিচিত অথচ এর আবাদ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। আজ আমাদের সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তরঃ চাষ-আবাদের কথা বলার আগে একটু ভূমিকার প্রয়োজন অর্থাৎ পান কী, কেমন করে তার ব্যবহার হয় আর কেনই বা হয়।

প্রশ্নঃ বেশ বেশ, বলুন না।

উত্তরঃ পান বা তাম্বুল ইংরেজীতে 'বিটেল লিফ' রূপে পরিচিত এবং মালয়ী 'ভেভিলা' কথাটিই পতুগীজরা 'বিটল' রূপে চালু করেছিল কয়েক শ' বছর আগে। তা থেকেই এর বৈজ্ঞানিক নাম 'পাইপার বিটল'। আবার এই পাইপার-বর্গের মধ্যে আরও দুটো প্রজাতি আছে যাদের আমরা খুবই চিনি। তারা হচ্ছে 'পাইপার লংগাম' অর্থাৎ পিপুল যার লম্বা ফলটি মূল্যবান এবং 'পাইপার নিগ্রাম' বা গোলমরিচ যার কালো গোল ফলটিও আমাদের পরিচিত।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, বাংলাদেশে পানের চাষের কথা আমরা জানি, কিন্তু পিপুল আর গোলমরিচও হয় নাকি?

উত্তরঃ পিপুল আর গোলমরিচের চাষ উত্তরবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে করে সফল পাওয়া গেছে, তবে ব্যাপক চাষ এখনও শুরুর করা নানা কারণে সম্ভব হয় নি। যাই হোক আমরা কিন্তু আসল পানের কথাই ছেড়ে যাচ্ছি।

পান আমাদের জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। এবং এর প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের পূজাপার্বণে এর ব্যবহার। পান বাদ

দিয়ে কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়। এর অবশ্য কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রকাররা বুঝে-ছিলেন, যেসব জিনিস আমাদের উপকারী এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেগুলোকে যদি আমাদের ধর্মকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে জনসাধারণ নিবিচারে সেসব ব্যবহার করবে। কারণ আজকের দিনের ডিক্টেটরের মত তখনকার দিনের শাস্ত্রকারদের নির্দেশ পালন করার রীতি ছিল। পান খাওয়াকে লক্ষ্মীশ্রীর সঙ্গে যুক্ত করা হ'ত ব'লেই লক্ষ্মীর পাঁচালিতে বলা হয়েছে—

“স্নান করি’ যেবা নারী মুখে দেয় পান,
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান।”

পানের প্রধান গুণই হচ্ছে হজমে সাহায্য করা এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করা। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে আমরা সবাই ডাল-ভাত খাই সেখানেই পানের প্রয়োজন অনেক। কেননা ডাল-ভাতের কণা সহজেই গাঁজিয়ে ওঠে এবং পান খেয়ে মুখ পরিষ্কার করলে আর সে ভয় থাকে না। পান মুখের ভেতরকার গ্রন্থিগুলি থেকে জীর্ণ রস বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে এবং তাতেই হজম ভাল হয়। তাই ভূরিভোজের পর আমরা পান দিয়ে অভ্যর্থনা করি।

পানের রস আয়ুর্বেদীয় ওষুধ খেতে একটি প্রধান অনুপান হিসেবে বিখ্যাত। সুপারি, খয়ের এবং চুন সহযোগে যে পান খাওয়া হয়, তারও বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে; তবে আজ আর সে প্রসঙ্গের অবতারণা করব না।

প্রশ্নঃ বেশ কথা। এবার তা হ'লে পানের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তরঃ পানের চাষ হয় পানের পাতার জন্য, অর্থাৎ অন্যান্য ফসলের চাষ যেমন তার ফল ও বীজের জন্য হয়, এর তা নয়।

আপনারা দেখেছেন, বর্ষাকালে গাছপালার ছায়ায় সবুজ পাতার কী সমারোহ! সরস মাটিতে জোলা হাওয়ায় ছায়া পেলে লতাপাতা যেন দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে। আমাদের চাষীভাইরা গাছের এই গুণেরই পুরো সুযোগ নিয়ে পানের চাষ করেন।

পানচাষে প্রয়োজন—জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি, প্রায় একই রকম তাপ এবং যতদূর সম্ভব একই রকম আর্দ্র আব-হাওয়া।

শুধু উত্তরবঙ্গের সুপারিবাগানেই এইসব অনু-কূল পরিবেশ পাওয়া কিছুটা সম্ভবপর এবং তাই শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গেই আমরা গাছপানের চাষ দেখতে পাই। গাছপান নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এদের সুপারি বা যে-কোন গাছে লতিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়। অবিভক্ত বাঙলার দক্ষিণ অঞ্চলেও এইভাবে পানের চাষ প্রচলিত আছে এবং সেখানকারই এক গ্রামের লোক সুপারিগাছে লতানো পানের গায়ে সাদা ময়লা দেখে বলেছিল—

“কি বা দেশে আইলাম রে, ভাই,
কি বা দেশের গুণ,
একই গাছে পান সুপারী,
একই গাছে চুন।”

গাছপান একটু ঝাঁঝালো বেশি হয় এবং এই কারণেই আধুনিক শহরবাসীরা এ পান পছন্দ করেন না।

অন্য দূরই জাতের পান দেশী, ছাঁচি, কড়ুই, মজানো আর মিঠে পান। পানের বরজে বা ঘরে পানচাষ করা হয়। বরজে পানের চাষ উত্তরবঙ্গে দেখা যায় না, এটা পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণ ভাগেই দেখা যায়।

বরজের জমি উঁচু করা এবং জলের ব্যবস্থা এই দুইটি সমস্যার সমাধান চাষীভাইরা করেন ডোবা

কেটে সেই মাটি জমিতে দিয়ে। ডোবা থেকে জল পাওয়া যায় এবং বৎসরান্তে তার তলানি পাক-মাটি সার হিসাবে ব্যবহার হয় এবং বরজের জমিটাও জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু হয়ে যায়।

পানের চাষে ফুল-ফলের বালাই নেই। কাজেই এর চাষে পটলচাষের মত লতার টুকরো কেটে বসাতে হয়। লতার টুকরো ২-৩ বছরের পুরানো গাছ থেকে নিতে হয় এবং দু’ধারে দু’টো পাতা সহ এবং মধ্যে একটি গাঁট সহ লতার টুকরো কাটতে হয়। টুকরোটা মাটিতে খাড়া করে গাঁটটি মাটিতে পুঁতে দিতে হয় উপরের পাতা পর্যন্ত।

পৌষ আর চৈত্র বাদ দিয়ে সমস্ত বছর ধরেই লতা বসানো চলে; তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে কান্তিক-অগ্রহায়ণই প্রশস্ত। অনেক চারা নষ্ট হয়ে গেলে লতা হাপরে বসানো হয় এবং যখন গাঁট থেকে নতুন শেকড় বের হয় এবং নতুন কচি পাতা ছাড়তে শুরু করে, তখন উঠিয়ে বরোজের মধ্যে বাসিয়ে, সেই ফাঁকটা পূরণ করা হয়। অধিকাংশ সময় হাপরে বা সারিতে লতা বসানোর পর খড়কুটো দিয়ে লতাগুলো ঢেকে দিয়ে যতদিন না শেকড় বের হয় ততদিন পর্যন্ত সকালে-বিকালে জল দিতে হয়। বরজ তৈরি করতে প্রয়োজন বাঁশ, ছন বা উলু ঘাস অথবা প্যাকাটি বা নলখাগড়ার। এজন্য মেদিনীপুরের অনেক জায়গায় পানের বরজের পাশেই নলখাগড়ার আবাদ দেখতে পাওয়া যায়। বরজটি হবে ছায়ায় ঘেরা সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, যার আবহাওয়া হবে আর্দ্র এবং উষ্ণ। যাতে গরম হাওয়া না ঢুকতে পারে সেজন্য চার ধারে প্যাকাটি বা নলখাগড়া দিয়ে দেওয়া হবে। মাটির ওপরে এই বেড়া এক-মানুষ-সমান উঁচু হয়ে থাকবে এবং তার ওপরটা খড়, উলুঘাস বা ছন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে ভেতরটা আলো এবং অন্ধকার দুয়েরই একটা সমন্বয় হয়। বরজের মধ্যকার বাথারিগদূলি সারি ক’র বসানো হয়— আড়াআড়িভাবে যাতে ওর মধ্য দিয়ে একজন লোক অনায়াসে যেতে পারে। এই বাথারির ওপরই

থাকবে বরজের খড়-ঘাসে ছাওয়া চাঁল। এই বাখারির লাইনের মধ্যে এক বিষয় অন্তর লতা বা চারা বসাতে হয়। গাছ বড় হ'তে আরম্ভ করলে ২-৩টি নতুন কাঠি পদ্ধতিতে তার প্রথমটিতে লতাটা ঘাস দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। এবং এইভাবে পানের গাছটি বরজের চাল পর্যন্ত লতিয়ে ওঠে। তারপর আবার সেই লতাটিকে ঘুরিয়ে মাটিতে এনে; যে অংশটুকু মাটির ওপরে থাকে তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে আবার লতাটিকে পরের কাঠিটাতে উঠিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত বছরে তিনবার এরকম করা হয় এবং প্রতি বারই লতাটা যেখানে সোজা উঠে যায় সেখানকার কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন: আচ্ছা, পানের গাছে সার-টার কিছুর দিতে হয় না?

উত্তর: নিশ্চয়ই, সার ভিন্ন কোন গাছই বাড়তে পারে না। যেমন আমরা খাবার না খেয়ে বড় হ'তে পারি না। চাষীভাইরা বরজের মধ্যে পানের গাছের সারির দূর পাশে পুকুরের শুকনো পাঁকমাটি গুঁড়ো করে জড়ো করে রাখেন, তারপর খইলের গুঁড়ো আর গোবরসার ছিঁড়িয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেন। যতবার মাটি চাপা দেওয়া হয় ততবারই একই কাজের পুনরাবৃত্তি হয়। আমাদের দেশে পানের সার প্রয়োগ সম্বন্ধে তেমন কোন গবেষণা হয় নি। তবে বেশ পরিমাণে নাইট্রোজেন সার প্রয়োজন—যেটা খইল, পুকুরের পাঁক বা গোবরসারে খুব কম আছে এবং অ্যামোনিয়া সারে যেটা শতকরা ২০ ভাগ থাকে আর প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ পটাশের—এর জন্য কাঠের ছাই দিলেও হয়। অথবা মুরিয়েট অব পটাশের প্রয়োজন ভাল স্বাদের পাতা তৈরির জন্য এবং গাছটিকে রোগমুক্ত রাখার জন্য।

মাসে দু'বার করে পানপাতা তোলা হয় এবং গাছপ্রতি খরার দিনে ২ থেকে ৪টি পাতা এবং বর্ষার দিনে ৪ থেকে ৬টি পাতা তোলা হয়।

প্রয়োজন হ'লে প্রতি সপ্তাহেও পান তোলা যেতে পারে। একটা গাছে ২৮ থেকে ৩২টা পর্যন্ত পান জন্মানো যেতে পারে। শ্রাবণে লাগালে পাতা তোলা শুরুর হয় কান্টিকৈ। কিন্তু যদি কান্টিকৈ লাগানো হয় তবে পাতা তোলা হয় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে।

একটা পানের বরজে পাঁচ-ছয় বছর বেশ ভাল ফলন হয়। তারপর বরজটিকে ভেঙে নতুন করে সাজাতে হবে। কিন্তু এমন অনেক চাষী আছেন যাঁদের বরজে ২০-২২ বছরেও ফলন কমে নি। যত্ন করলে এবং আবহাওয়া ভাল থাকলে একই বরজে অনেকদিন চাষ চলে।

এক বিষে বরজ তৈরিতে প্রথম বছরে ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা এবং তার পরের বছরগুলিতেও ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা খরচ হবে।

এক বছর পর থেকে যখন পান ভাঙা চলবে তখন বছরে মোট আয় হ'তে পারে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং খরচ বাদ দিয়ে ১,৫০০ টাকা নীট লাভ প্রতি বছরে হ'তে পারে।

এক বিষে জমির পানচাষে অন্তত ৩ হাজার টাকা হাতে থাকা দরকার। কিন্তু যত্ন করে চাষ করলে এক বিষের পানচাষ থেকে একটা সংসার চলতে পারে।

বাংলাদেশের পান উত্তর ভারতের সর্বত্রই সবাই সমাদর করেন এবং আমাদের পান ওইসব রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে চালান যায়।

পানের চাষে খুব যত্নের প্রয়োজন এবং পানচাষী মাত্রই তার বরজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। বরজের মধ্যে বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং জুতো ইত্যাদি পায়ে দিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ। অপরিচ্ছন্ন থাকলে বরজে রোগ বা পোকার আক্রমণ হ'তে পারে। কারণ, বরজের ভেতরের আর্দ্র এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় রোগ বা পোকার একবার আক্রমণ হ'লে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সহজ হয়।

সাধারণত রসচোষা কালো পোকা পানের ক্ষতি করে। আঁশ পোকা প্রচুর ডিম পাড়ে এবং সেই ডিমেই পানের ক্ষতি হয় বেশি কারণ, সে পান বাজারে বিক্রি হয় না। তামাকপাতার জলই প্রতি-কারের জন্য ব্যবহার করা প্রশস্ত এবং সহজ।

পানগাছে বেশি পাতা হ'লে পাতা প'চে যায়। তবে সেটা খুব মারাত্মক ক্ষতি নয়। গাছের গোড়া-পচাই খুব ক্ষতিকর। কোনক্রমে গোড়ায় জল বসলেই এই রোগ হ'তে পারে। কাজেই জল-নিকাশের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।



হেতালপাতার প্রচলন

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্দশশতাব্দীর জেলার সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণ হেতালপাতা জন্মে, কিন্তু এ অঞ্চলের জনসাধারণ ঘরের চাল ছাইবার এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি হাতের কাছে আনায় এসে এবং নামমাত্র মূল্যে পাওয়া সত্ত্বেও, এর ব্যবহারের পদ্ধতি তাঁদের জানা না থাকায়, এ জিনিস তাঁদের কোন উপকারে লাগছে না। ফলে প্রতি বছর যে-পরিমাণ পাতা জঙ্গলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকে জাতীয় সম্পদের অপচয় বলা যেতে পারে। এই জিনিসটি কাজে লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সুন্দরবন অথবা তার কাছাকাছি এলাকার তিন-চার লক্ষ লোকের ঘর তৈরির জন্য প্রতি বছর যে ধানের খড়ের দরকার হয়, তা গৃহপালিত পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করলে গবাদির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা সহজেই সম্ভব হবে, অথবা খড়ের কতক অংশ ধানের ক্ষেতেই পুড়িয়ে দিতে পারলে ধানের উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার বলেই এই প্রয়োজনীয় বনজ জিনিসটির সম্বন্ধে সুপারিশ করা যাচ্ছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করার জন্য গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে উক্ত অঞ্চলের কয়েকটি বনবিভাগীয় অফিসে কতকগুলি নমুনা-ঘর তৈরি করে রাখা হয়েছে। বাগুনা, দত্তর, সজনাখালি, বিদ্যা প্রভৃতি অফিসে গেলেই এই নমুনা-ঘর দেখা যাবে। নিচে মোটামুটিভাবে এই পাতার উপকারিতা সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলা হ'ল। এ পাতা ব্যবহার করে জনসাধারণ উপকৃত হ'লে সানন্দে একে আমরা জাতীয় সম্পদের সূচী ব্যবহার বলে স্বীকার করব।

হেতালপাতার উপকারিতা

- (১) হেতালপাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ধানের খড় বেঁচে যাবে।

(২) হেতালপাতা নামমাত্র মূল্যে প্রতি বছর সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(৩) পাতা ব্যবহারের পদ্ধতিতে যে নিয়মে ঘরের চাল তৈরি করতে বলা হয়েছে, সেই-ভাবে চাল বাঁধলে ৮-৯ বছর পর্যন্ত চাল মেরামত করবার কোনও দরকার হবে না। তাতে গরিব গৃহস্থদের অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

(৪) ধানের খড়গুলি গবাদি পশুর খাদ্যরূপে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, অথবা কিছু অংশ ধানের ক্ষেতে পুড়িয়ে দিয়ে ধানের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হবে।

(৫) হেতালপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের একটি বিশেষত্ব এই যে, আগুন লাগলে তা ছড়িয়ে পড়ার ভয় খুব কম এবং আগুন ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগে। অল্প জল দিয়ে সামান্য চেষ্টাতেই আগুন নেভানো সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যেখানে আগুন লাগে, শব্দ সেই জায়গাটাই আস্তে আস্তে পুড়ে গর্ত হয়ে যায়।

হেতালপাতা সংগ্রহ এবং ব্যবহার করার নিয়ম

(১) মাঝবয়সী পাতা পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে পারলে খুব ভাল হয়। ওই সময়ের আগে বা পরেও সংগ্রহ করা চলতে পারে কিন্তু নিয়মিতভাবে পরিশোধন করতে না পারলে পোকা ধরার ভয় থাকে।

(২) পাতাগুলি গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে আড়াই ফুট পর্যন্ত লম্বা করে কেটে নিতে হবে।

(৩) কুড়িটি করে পাতা এক তড়াতে নিয়ে শক্ত করে আঁট বাঁধতে হবে।

(৪) পাতা সংগ্রহ করার দু'-তিন দিনের মধ্যে আঁট সহ পাতাগুলি তিন-চার সপ্তাহ পর্যন্ত লবণজলে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পাতাগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করার এইটিই একমাত্র অবশ্য-পালনীয় নিয়ম।

(৫) নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাতাগুলি জল থেকে তুলে আঁট সহ ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে।

(৬) ভাল করে শুকানো হলে আঁটগুলি ছায়াতে গুছিয়ে রেখে, তার উপর কোন ভারি জিনিস চাপা দিয়ে রাখতে হবে—ব্যবহারের আগে পর্যন্ত।

(৭) ঘরের চাল তৈরি করতে যে রকম কাঠামো বাঁধা হয়, সেই রকম কাঠামো হলেই যথেষ্ট হবে; বরং এ চালের ডাসা (চালের প্রস্থের দিকে যে কাঠ অথবা বাঁশ দেওয়া হয়) ১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে দিলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু বাতা (ষেগুলি চালের দৈর্ঘ্যের দিকে দেওয়া হয়) ১২ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি দূরে দূরে দিতে হবে। প্রথম প্রস্থ হেতালপাতার আঁট (পাতার আগার দিক) চালের কাঠামোর বাইরে ছ' ইঞ্চি ঝুলিয়ে আঁটগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়ে, ১২ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি উপরে একটি চাপ বাঁধতে হবে। বাঁধন-গুলি এক হাত থেকে দেড় হাত দূরে দূরে

দিলেই চলবে। দেখতে হবে, আঁটের আগা ধরে টান দিলে যেন আঁটের গোড়াটি শক্ত করে বাঁধা হয়েছে বলে বন্ধুতে পারা যায়।

এইভাবে এক প্রস্থ আঁট বাঁধা হলে আবার আর-এক প্রস্থ আঁট ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে সাজাতে হবে এবং পূর্ব নিয়ম অনুসারে চাপা বাঁধতে হবে। এইভাবে সমস্ত চালটি হেতালপাতার আঁট দিয়ে ছেয়ে ফেলতে হবে।

(৮) মটকা বাঁধার সময় মটকায় আড়াআড়িভাবে একটি আঁটের গোড়া এবং পরের আঁটের আগা—এইভাবে গায়ে গায়ে লাগিয়ে, সাজিয়ে নিতে হবে এবং মটকার দু' পাশে দু'টি চাপা বাতা বেঁধে দিতে হবে।

আঁটগুলো যত গায়ে গায়ে ঠেসে শক্ত করে বাঁধা যাবে, চাল ততই মোটা হবে, এবং পরে দেখা যাবে যে, চালটি ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা হয়েছে। চাল যত মোটা হবে ততই তা টেকসই হবে এবং আগুন ছড়ানার ভয়ও ততই কম হবে।

(৯) চাল বাঁধবার জন্য দড়ির প্রয়োজন খুবই কম। যাঁরা খরচ করতে পারবেন তাঁরা দড়ি ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণ গৃহস্থ জংগল থেকে পাতা সংগ্রহ করার সময় কালি-লতা অথবা ঢেঁকিলতা সংগ্রহ করে কিছুদিন জলে ফেলে রাখলে তাও দড়ির মত ব্যবহার করতে পারা যাবে।*

*পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বনবিভাগ থেকে প্রচারিত

লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা

কলিকাতার সমিহিত লবণ-হ্রদ পুনরুদ্ধার পরি-
কল্পনা সম্বন্ধে সম্প্রতি নিম্নলিখিত সমালোচনা
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছেঃ (১) ২ লক্ষ মণ
মাছের সরবরাহে ঘাটতি, (২) ২.৫ লক্ষ মণ আমন
ধানের ঘাটতি, (৩) ২০,০০০ কৃষিজীবী ও অ-কৃষি-
জীবী শ্রমিকের কর্মহীনতা এবং (৪) ২,০০০
উদ্ভাস্তু সহ ৫০,০০০ লোকের বাস্তুচ্যুতি।

এর মধ্যে কয়েকটি মন্তব্য তথ্যের দিক থেকে
অযথার্থ বা বিভ্রান্তিকর বলে সরকার এমনভাবে
অবস্থার বিশ্লেষণ করতে চান যাতে জনসাধারণ
এই পরিকল্পনাটিকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে
বিচার করতে পারেন।

৩.৭৫ বর্গমাইল সম্পর্কে প্রযোজ্য

সাধারণের বিশ্বাস যে, উত্তর ও দক্ষিণ লবণহ্রদের
সমগ্র বিজ্ঞাপিত এলাকাই উন্নয়নের জন্য গৃহীত
হবে, তা ঠিক নয়। নগরীর সম্প্রসারণের জন্য
উত্তর লবণহ্রদের ৩.৭৫ বর্গমাইল এলাকার উদ্ধার-
পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যই টেন্ডার আহ্বান
করা হয়েছে। উত্তর লবণহ্রদের যে এলাকা নগরীর
সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার বাহির্ভূত, তাতে এখন হাত
দেওয়া হবে না। কাজেই উত্তর লবণহ্রদের এই
অংশে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের চিন্তিত হবার
কারণ নেই। ভবিষ্যতে যখন পোল্ডার পরিকল্পনার
কাজ শুরুর হবে, তখন নগরী সম্প্রসারণ এলাকার
মত এ অঞ্চলের মৎস্যজীবীদেরও পুনর্বাসনের
ব্যবস্থা হবে। শূদ্র যে বর্তমান মৎস্য-উৎপাদনই
বজায় রাখা হবে তাই নয়, এই সকল জলকরে
কর্মরত সকল মৎস্যজীবীই যাতে দক্ষিণ
লবণহ্রদের নতুন জলকরগুলিতে যথাযথভাবে
পুনর্বাসিত হন সে-বিষয়েও মৎস্য-অধিকার নিশ্চিত
দৃষ্টি রাখবেন।

মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন

বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ লবণহ্রদ এলাকায় বৎসরে
প্রায় দুই লক্ষ মণ মৎস্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে
কেবলমাত্র ৩৬,০০০ মণ মৎস্য নগরী-সম্প্রসারণ
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উত্তর লবণহ্রদ এলাকার
৩.৬৩ বর্গমাইল জায়গা থেকে পাওয়া যায়। এতে
৮৮০ জন মৎস্যজীবী সংশ্লিষ্ট। সরকার ইতো-
মধ্যেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এসকল জলকরের
কোনটিকেও বিঘ্নিত করা হবে না, কিংবা মৎস্য-
বিভাগ কর্তৃক মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন-পরি-
কল্পনার কাজের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কোন
মৎস্যজীবীকে স্থানচ্যুত করা হবে না। এসকল
মৎস্যজীবীকে দক্ষিণ লবণহ্রদে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়
গঠিত নতুন জলকরে আশ্রয় দেওয়া হবে। নতুন
জলকর থেকে নগরী সম্প্রসারণ এলাকায় যত মৎস্য
এখন পাওয়া যায়, তা পাওয়া যাবে।

এভাবে বর্তমান মৎস্য-উৎপাদন বজায় রাখা হবে
এবং এসকল জলকরে কর্মরত ৮৮০ জন মৎস্যজীবী
কাকেও জীবিকানির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত
করা হবে না। এই এলাকায় কর্মরত মৎস্যজীবী-
দের সমবায় সমিতির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থারও কোন
অসুবিধা করা হবে না। মৎস্যজীবীদের সমবায়-
সমিতিতেও দক্ষিণ লবণহ্রদের জলকরে বিকল্প
মৎস্যক্ষেত্রের সুবিধা দেওয়া হবে।

আরও লক্ষ্য করা আবশ্যিক যে, এই পুনরুদ্ধার-
কার্য চলবে পাঁচ থেকে ছয় বৎসর ধরে এবং এক-
কালে মাত্র একটি অংশেই কাজ হবে। মৎস্যজীবী-
দের অপসারণ ধীরে ধীরে হবে, যাঁদের জলকর এই
কাজের সঙ্গে বিজড়িত কেবলমাত্র তাঁদেরই স্থানচ্যুত
করা হবে।

মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি গঠন

সম্ভবত একথা উপলব্ধি করা হয় নি যে,
বর্তমানে লবণহ্রদের সমস্ত জলকর স্বত্বসংখ্যক

ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এঁরা স্বল্পপেমোদী ভিত্তিতে ঐগদলি মধ্যস্বত্বাধিকারীদের কাছে ইজারা দিয়ে থাকেন। মৎস্যজীবীরা প্রধানত মজুদ হিসাবেই কাজ করেন। সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে দক্ষিণ লবণহ্রদের জলকরগদুলি (এখানে উত্তর লবণহ্রদের মৎস্যজীবীরা পুনর্বাসিত হবেন) স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এতে শূদ্ধ স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আর্থ-নীতিক অবস্থার উন্নতিই ঘটবে না, কলিকাতার বাজারগুলিতে মাছের দরের উপরও শূদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে। এভাবে এই পরিকল্পনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা স্থাপনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। এটা লক্ষণীয় যে, দক্ষিণ লবণহ্রদকে মৎস্য-চাষের জন্য সুসংগঠিত করলে উৎপাদনের বর্তমান হার হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে যথাযথ সম্ভাব্যতার ফলে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

জমিদারদের মালিকানার অধীন জলকরগদুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নগরীর সম্প্রসারণার্থে নির্বাচিত এলাকা হ'তে বাদ দেওয়া হয়েছে—এমন একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে বলে মনে হয়। এই ধারণা একেবারে ভুল। মনে রাখা উচিত যে, সমগ্র পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞরা এবং তাঁরাই কার্য পরিচালনার সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নগরী সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকার সীমানা নির্ধারণ করেছেন। বড় বড় জলকর-মালিকেরা যে এই এলাকার বাইরে পড়েছেন এটা শূদ্ধই ভৌগোলিক ঘটনাচক্র।

আবাদী জমিতে হস্তক্ষেপ করা হয় নি

বলা হয়েছে যে, উন্নয়ন-পরিকল্পনার ফলে ২৫ লক্ষ মণ মাণের ঘাটতি হবে। এটা ঠিক নয়। লবণহ্রদ এলাকায় প্রকৃত আবাদী জমির মোট আয়তন ৬.৬ বর্গমাইল। একরপ্রতি ধানের গড় উৎপাদন ১৫ মণ ধরলে আবাদী জমির মোট উৎপাদন (শূদ্ধ ধান-উৎপাদন হয় ধ'রে নিলে) প্রায় ৬৩,০০০ মণ।

তর্কের খাতিরে এও যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, উক্ত এলাকায় ১.৩ বর্গমাইল পরিমাণ বর্তমান পতিত জমি চাষ করা হয়, তবে এগদলি থেকে অতিরিক্ত ১২,০০০ মণ ধান পাওয়া যাবে। অতএব লবণহ্রদ এলাকায় ধানের ফসলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদন হবে ৭৫,০০০ মণ। সুতরাং, রাজ্যে ২৫ লক্ষ মণ ধানের ঘাটতি পড়বে—এটা অতুষ্টি। লক্ষণীয় যে, প্রস্তাবিত নগরী সম্প্রসারণ এলাকায় কোন পতিত জমি কিংবা প্রকৃত আবাদী জমি নেই; উচ্চ বাস্তুজমি নিয়ে যে পাড় এলাকা রয়েছে (যা দখল করা হচ্ছে না) তা বাদ দিলে সমগ্র অঞ্চলটিই জলমগ্ন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, ৮ বর্গমাইল চাষ-যোগ্য ও পতিত জমির মধ্যে মাত্র ২ বর্গমাইল উত্তর লবণহ্রদের মধ্যে পড়েছে, বাকি ৬ বর্গমাইল দক্ষিণ লবণহ্রদে—এই অংশে এই পরিকল্পনা অনুসারে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

বিস্তৃত সবজি চাষ

প্রস্তাব আছে যে, নগরী সম্প্রসারণ এলাকার বিহীন উত্তর লবণহ্রদের ১২ বর্গমাইল এলাকাকে পরে সবজি উৎপাদনের জন্য উন্মোচন করা জমিতে পরিণত করা হবে। পরিকল্পনা অনুসারে সেচের জলাধারের ব্যৱস্থাও এতে আছে, তার জলে প্রায় ৬,০০০ একর জমিতে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদিত হবে। হিসাব করা হয়েছে যে, শূদ্ধ যদি সবজিই উৎপাদন করা হয় তা হ'লে বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মণ সবজি উৎপাদিত হবে। উৎপন্ন সবজির সর্বনিম্ন আনুমানিক মূল্য হবে ১ কোটি টাকা। অথ'র বিচারে নতুন ফসলের মূল্য উক্ত এলাকায় বর্তমানে উৎপন্ন ফসলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি এবং উত্তর ও দক্ষিণ লবণহ্রদে মৎস্যের বর্তমান উৎপাদনের মূল্যের সমান হবে। সুতরাং, আর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে প্রস্তাবটি আকর্ষণীয় এবং তা কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সবজি সরবরাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

জমি উদ্ধার পরিকল্পনায় কৃষিশ্রমিক

কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী শ্রমিকদের সম্পর্কে বলা যায় যে, ইতঃপূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে বেকারীর প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কারণ জমি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাটির দ্বারা বর্তমান কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী অধিবাসীদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ ঘটবে। তাঁদের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হ'ল চাষের পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া।

একাধিকবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, নগরী সম্প্রসারণ এলাকার মধ্যবর্তী ২৫ বর্গমাইল বসত-জমিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কেবলমাত্র জলকরের মধ্যবর্তী ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন এলাকার অধিবাসীদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা হ'তে পারে। তাঁদেরও দক্ষিণ লবণহ্রদে নতুন জলকরে বসতজমি দেওয়া হবে।

উদ্ধারকরা এলাকা সম্পর্কে সরকার দেখবেন যে, যেসকল লোকের বসতজমিতে হস্তক্ষেপ করা হবে

তাঁদের যেন উক্ত এলাকার মধ্যেই উপযুক্ত বাসস্থান দেওয়া হয়।

বৃহৎ বসতজমি ও প্রচুর উৎপাদন

সংবাদপত্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, লবণহ্রদ ব্যতীত কলিকাতার ও শহরতলীর চারপাশের এলাকার উন্নয়ন বাঞ্ছনীয়; ধারণা করা হয়েছে যে, এতে ব্যয় অল্প হবে। এই প্রস্তাবের দু'টি অসুবিধা আছে। প্রথমত, কলিকাতার চারপাশে গৃহনির্মাণের উপযুক্ত বৃহৎ ভূমির অভাব আছে এবং দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যে জমি গ্রহণ করতে হ'লে চাষের জমির ক্ষতি করতে হবে এবং তার ফলে খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হবে। বস্তুত, পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার প্রধান সুবিধা এই যে, এর ফলে নগরীর বাসস্থান-সমস্যার সমাধান হবে এবং সেসঙ্গে বর্তমান অর্থনীতির ব্যাঘাত না ক'রে লবণহ্রদ এলাকার সম্পদের সম্ভাব্যহারের ফলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।



বনমহাৎসবে লাগানো গাছের হিসাব

গাছ লাগানো হয়েছে			গাছ বেঁচেছে			বেঁচেছে শতকরা
ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট	ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট	
১৯৫০--						
৭,২৬,১৯৬ ..	১২,০৮,৫৪০	১৯,৩৪,৭৩৬	৩,০৭,২৮৮	৪,০২,৮৭৫	৭,১০,১৬৩	৩৭
১৯৫১--						
৬,৪৭,৭২৩ ..	১১,০০,৩৮৩	১৭,৪৮,১০৬	২,৭৮,৬৩৬	৪,২৮,৩৩৮	৭,০৬,৯৭৪	৪০
১৯৫২--						
৪,৪০,২৫৬ ..	৩৭,৪১,৮১৮	৪১,৮২,০৭৪	২,৪৮,৯৬৫	২০,২৮,৯৭২	২২,৭৭,৯৩৭	৫৪
১৯৫৩--						
৪,০৩,৭৪৩ ..	১৮,৮৯,৫২০	২২,৯৩,২৬৩	২,৪৩,০৯৩	১৩,৩৪,৫৪৮	১৫,৭৭,৬৪১	৬৯
১৯৫৪--						
৩,৬৭,৫৭৫ ..	১০,৫৩,০৭৩	১৪,২০,৬৪৮	২,৪৫,৫১৯	৫,০৭,৭৯০	৭,৫৩,৩০৯	৫৩
১৯৫৫--						
৩,২৬,৩১০ ..	৩৩,৮০,৭৬০	৩৭,০৭,০৭০	২,১৪,৯৬০	১১,৬৯,৭৬৬	১৩,৮৪,৭২৬	৩৭
১৯৫৬--						
২,৪৩,৫৯৭ ..	৩,২৩,৪২২	৫,৬৭,০১৯	১,৬১,২২৪	১,৮৪,৮৭৯	৩,৪৬,১০৩	৬১
১৯৫৭--						
(পুরুলিয়া বাদে)						
৩,১০,৫৭৭ ..	৬,১২,৬৭০	৯,২৩,২৪৭	২,০৩,১০০	৩,৩০,৮৬৫	৫,৩৩,৯৬৫	৫৭

বন-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে কৃষি-অধিকার কর্তৃক কলম ও
চারা দেওয়া হয়েছে চারা বিক্রি হয়েছে

১৯৫০	৫,৬১,৩৪৭	৪,৬০০
১৯৫১	৩,৮৭,৮০৩	৭৯,৭১৮
১৯৫২	৪,০৯,৫৮২	১৩,৮৫৪
১৯৫৩	৩,৩৫,৩৭৯	১,১৫,৭০৫
১৯৫৪	৪,৪৮,৬৫২	২৯,০৯৬
১৯৫৫	৫,১১,৪৩৪	৫৪,৯৮০
১৯৫৬	৫,৪২,৩৫৭	৯৪,৮৭৬
১৯৫৭	৭,৮৫,০৫৬	৭৬,৭২২
১৯৫৮	৭,৬৮,০৮২	৯২,৫২৫

উদ্ভিদ-উদ্যান-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে--

১৯৫৩	৩,৩৮২
১৯৫৪	৮,১৩৯
১৯৫৫	৪,৫৭৬
১৯৫৬	৫,৫৬৯
১৯৫৭	১০,০৭৫
১৯৫৮	৭,৪৪৮

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০ বর্ধমান	দুর্মুখ, থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।	পানিয়া সারদাবাদ সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।*	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়†
লাগানো হয়েছে ৩,৮৩,৮৩২ .. বৈচেছে ১,৪৭,৫২৬ ..	১০,৬৪৯ ৬,৯৭১	৬৭,৩৩১ ৬১,২৪০	১৮,৪৫৮ ৯,৮১৪
১৯৫১ মেদিনীপুর	বারিদা, থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।	‘ডক্টর গ্রাহামস হোসস’ কালিম্পঙ, দাজিলিঙ।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ৭,৫৫,৩৪৮ .. বৈচেছে ২,১৪,২৬২ ..	১৬,৬৫৪ ১৬,২৬৪	২৪,৩৫৫ ১৮,২৬৪	১১,৩৭৬ ৮,৩৯৩
১৯৫২ মেদিনীপুর	লাক্ষা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর।	লাক্ষা প্রদর্শনী** প্রতিষ্ঠান, জেলা মেদিনীপুর।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ৩৩,৬৪,০৬৩ .. বৈচেছে ১৮,৫৭,১২০ ..	৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	৫,৬৭৮ ৪,৩৪৭

*১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় ‘সর্দার প্যাটেল শীল্ড’ পেয়েছে।

†১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় ‘মুনী শীল্ড’ পেয়েছে।

**১৯৫২ সালের ফলাফলের উপর এ প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় ‘সর্দার প্যাটেল শীল্ড’ পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৩ মেদিনীপুর	বেথকুণ্ড, তমলুক, জেলা মেদিনীপুর।††	পানিসিটি সোনাডল, জেলা মেদিনীপুর।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
লাগানো হয়েছে ১৫,৪৮,৭৭৭ .. বৈচেছে ১১,৪২,৪৭৪ ..	১,১০,১৬১ ১,০৮,০৫২	১,০০,৮৪৯ ৫৬,২৩৪	৮,৯৭১ ৫,৭৫১
১৯৫৪ নদিয়া	দেবগ্রাম, নদিয়া	পানিসিটি ভগিনোদল, জেলা মেদিনীপুর।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ৯৯,৭৮৮ .. বৈচেছে ৭৫,৩৯৪ ..	১৭,৫১৮ ১২,৩৪০	৮,৮৭০ ৫,১২২	৭,৬৩৮ ৫,৭৭০
১৯৫৫ মেদিনীপুর	চৌদা, চুলী, মেদিনীপুর।	কামারদা ইং বোর্ড।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ২৯,৭৫,৬৮৭ .. বৈচেছে ৯,০৩,৩৬২ ..	১,৫৭,৯৭০ ১,৪৬,৮০৬	৫০,৫০০ ৪১,৭৫০	৪,৩৩৫ ৩,৬২০
১৯৫৬ মেদিনীপুর	শ্যামসুন্দরপুর, তমলুক, মেদিনীপুর।	পানিসিটি ল্যাণ্ডস, মেদিনীপুর।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ১,৪৯,৪৩৮ .. বৈচেছে ৯০,৭৪৩ ..	৬,৮৯২ ৪,২৯০	৩,৬৯৭ ২,১৩৪	২,৮১৬ ২,৪৬৪
১৯৫৭ মেদিনীপুর	উল্লপুকুরী, কোচবিহার।	খোজুরী সোস্যাল এডুকেশন সেন্টার, মেদিনীপুর।	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
লাগানো হয়েছে ৩,৭০,৭৬৯ .. বৈচেছে ১,৯৩,৫৩৮ ..	৫,২৫০ ৪,২০০	৩,৪৫২ ২,৬২৬	১,৭৪৫ ১,২৬১

††১৯৫৩ সালের ফলাফলের উপর এ গ্রাম সর্বভারতীয় ‘জওহর শীল্ড’ পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি

১৯৫০	.. শ্রীনীলোৎপল গুহ, গ্রাম সপাই (পশ্চিম), থানা কাঁধি, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		৫,৪২৯ ৩,৪৮৩
১৯৫১	.. শ্রীসাদ্য দজি, দেবরিপানি, পোঃ স্মিথাপোখরী, জেলা দাঙ্গিলিঙ।	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		১৫,০০০ ৯,০০০
১৯৫২	.. শ্রীমুরলীধর বড়, গ্রাম গোপালপুর, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		১,৯৫,১৪৪ ১,২০,৫৩৯
১৯৫৩	.. শ্রীবিজয়ভূষণ বেরা, গ্রাম চিদ্রগানিয়া, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		৫৪,৩৫৬ ৪৩,৩৫৬
১৯৫৪	.. শ্রীনীলমণি হাজরা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		১৯,৮০০ ১২,৬০০
১৯৫৫	.. শ্রীরাসবিহারী মাইতি, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		১,৫৪,৬৩০ ১,৪৪,০৮০
১৯৫৬	.. শ্রীভূতনাথ মজুমদার, গ্রাম ফেগুয়াসোল, থানা গঙ্গাজলঘাট, জেলা বাঁকুড়া।	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		২,৬৬৮ ১,৮৮১
১৯৫৭	.. শ্রীযত্ন লেপচা, কালিম্পঙ, জেলা দাঙ্গিলিঙ	লাগিয়েছেন বেঁচেছে		১৫,০০০ ১০,০০০



টুকিটাকি

আদিবাসীদের সুবিধা দরে বীজ বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তফসিলীভুক্ত আদিবাসীদের কল্যাণার্থে বীজশস্য বিতরণের ব্যয় নির্বাহার্থে নিম্নলিখিত অর্থ মঞ্জুর করেছেনঃ বাঁকুড়া ১,৪৩৫ টাকা ; জলপাইগুড়ি ১,৯৬০ টাকা ; পশ্চিম দিনাজপুর ১,৪৮৯.৫০ টাকা ; মালদহ ১,২১০ টাকা ; মুর্শিদাবাদ ৪৮০.৫০ টাকা ; নদিয়া ৪২৮ টাকা ; চব্বিশপরগনা ১,০৬৫ টাকা ; হুগলি ৯৪০ টাকা ; মেদিনীপুর ২,২৭০ টাকা ; কোচবিহার ২৪৭.৫০ টাকা ; দার্জিলিং ৮৩২.৫০ টাকা ; বর্ধমান ১,৫২৬ টাকা ; পূর্বদিল্লী ১,৫০০ টাকা এবং রীরভূম ১,২৬৯.৫০ টাকা।

কাংস্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন

১৯৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলার কেবলমাত্র ঘাটাল মহকুমাতেই বিভিন্ন আকারের থালা, বাটি ইত্যাদি সমেত প্রায় ৭,০০০ মণ কাঁসার জিনিস তৈরি হয়েছে।

খারারের কাংস্যশিল্পীদের সাম্প্রতিক এক সভায় ভাষণপ্রসঙ্গে মেদিনীপুরের শিল্প-আধিকারিক শ্রী বি এম দাশগুপ্ত এই তথ্য প্রদান করেন। সরকারের কাছ থেকে তারা যাতে পর্যাপ্ত সাহায্য লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের নিজস্ব সমবায় সমিতি স্থাপনের পরামর্শ দেন।

বর্তমানে উক্ত এলাকায় ঐ ধরনের দু'টি সমবায় সমিতি আছে এবং আরও সমিতি স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন ও সংঘবদ্ধ এই পিতল ও কাঁসার শিল্পের প্রতি স্বাধীনতা-লাভের আগে পর্যন্ত কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। এখন সরকার সুলভে কাঁচামাল সরবরাহ, উপযুক্ত

ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যদান, বিপণনের সুবিধাদান ইত্যাদির সাহায্যে উক্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছেন। কোন কোন কারিগর ইতোমধ্যেই প্রাচীন নির্মাণপদ্ধতি ছেড়ে দিয়েছেন এবং যুক্তি-সংগত পুনর্বিन্যাসের উপায়স্বরূপ খারারে কয়েকজন কারিগর 'রোলিং মিল' স্থাপন করেছেন।

ঘাটাল, রামজীবনপুর ও খারারে, ঝাড়গ্রাম মহকুমার চিঁচড়ায় এবং কাঁথি মহকুমার চন্দনপুরে উক্ত শিল্প বর্তমানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ঘাটাল মহকুমার খারারেই মূল্য কাঁসার কেন্দ্র অবস্থিত।

জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উন্নয়ন মহাধ্যক্ষ শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, গত ৩রা জুন ডোমজুড় জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ব্লকের রাজাপুরে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে জনগণের নিকট আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন, সমাজশিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষণকেন্দ্র ও ডোমজুড় জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ব্লকের যোঁথ প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই শ্রেণীর প্রদর্শনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি এই কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জনগণের নিকট এই শিক্ষণ বহন করে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানান এবং গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

ভারত-সরকারের সমার্ট-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের শিক্ষণ মহাধ্যক্ষ শ্রী এস সি রায় প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সভায় ভাষণ দেন

ও গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আদিবাসী এলাকাগুলিতে জল-সরবরাহ

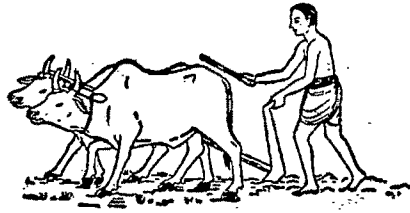
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ চলতি আর্থিক বৎসরে নিম্নোক্ত জেলাগুলির আদিবাসী এলাকায় জলসরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিকদের হস্তে প্রদানের জন্য নিম্নরূপ অনুদান মঞ্জুর করেছেন:

পূর্নুলিয়া ৩২,০০০ টাকা; বাঁকুড়া ৩৬,০০০ টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যয়িত অংশ বাবত ২,০০০ টাকা; বীরভূম ২৬,৭০০ টাকা; বর্ধমান ৩০,২৮৪ টাকা; মেদিনীপুর ৪৭,০০০ টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যয়িত অংশ বাবত ৩,৩২২ টাকা; হুগলি ১৯,৫০০ টাকা; চন্দ্রবংশপরগনা ২০,৫৫০ টাকা; নদিয়া ৬,০০০ টাকা; মুর্শিদাবাদ ১৪,০০০ টাকা; মালদহ ১২,৪০২ টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যয়িত অংশ হিসাবে ৭,৬০০ টাকা; পশ্চিম

দিনাজপুর ১৬,০০০ টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যয়িত অংশ হিসাবে ১৫,৮০০ টাকা; জলপাইগুড়ি ৩০,৬২৫ টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যয়িত অংশ হিসাবে ৫,৪০২ টাকা; কোচবিহার ৪,০০০ টাকা এবং দার্জিলিং ১০,২০০ টাকা।

আদিবাসী এলাকায় সবজি তথা ফলের বাগান

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার আদিবাসী-পরিবারগুলির মধ্যে কলম, চারা ইত্যাদি বিতরণের সাহায্যে সবজি তথা ফলের বাগান করার উৎসাহ সঞ্চারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত অর্থ-প্রদান অনুমোদন করেছেন: মেদিনীপুর ২,৩০০ টাকা, পূর্নুলিয়া ১,৫০০ টাকা, পশ্চিম দিনাজপুর ১,৫০০ টাকা, জলপাইগুড়ি ২,১০০ টাকা, বাঁকুড়া ১,৬০০ টাকা, বর্ধমান ১,৬০০ টাকা, বীরভূম ১,০০০ টাকা, মালদহ ১,০০০ টাকা, হুগলি ৮০০ টাকা, দার্জিলিং ৮০০ টাকা, মুর্শিদাবাদ ৫০০ টাকা; নদিয়া ৪০০ টাকা ও কোচবিহার ৪০০ টাকা।



সম্পাদক: শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ম্যালেরিয়াকে অগ্রাহ্য করবেন না



জ্বর হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখান

আর কুইনিন্ খেতে বললে কেনবার সময় অবশ্যই দেখে
নেবেন তা' যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুইনিন্ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

কুইনিন্

খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ

সব বড় বড় ঔষধালয়ে এবং সরকারী
কুইনিন্ বিক্রয়কেন্দ্র, ওল্ড হিন্দুস্থান
বিল্ডিংস, কলিকাতায় পাওয়া যায়।



ম্যালেরিয়ার নির্ভরযোগ্য
প্রতিবেদক হিসেবে
কুইনিন্ কয়েক শ' বছর
ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
এ ওষুধ খুব দ্রুত রক্তে
মিশে যায় এবং এর বিষ-
ক্রিয়া অতি সামান্য।
কুইনিন্ ব্যবহার করলে
ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রতি-
রোধ ক্ষমতা জন্মায় না
বলেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ৰ্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজবজ	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বলগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগুদা
	পোঃ নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিকলয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	
১৪। ঐ ..	হাবড়া	ক্যান্টনমেন্ট।	
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সদেখখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া		

বনুন্দর

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ	ডোমজুড়
৩।	ঐ	আমতা

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	হাওড়া
২।	ঐ	উলুবেড়িয়া
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪।	ঐ	বাগনান
৫।	ঐ	শ্যামপুর
৬।	ঐ	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	স্বাক্ষর	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	বেথুয়াডহরি
৩।	ঐ	রানাবাট
৪।	ঐ	শান্তিপুর

১।	স্বাক্ষর	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	রানাবাট
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনী
৪।	ঐ	চাকুদা
৫।	ঐ	হাঁসখালি
৬।	ঐ	রানাবাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	স্বাক্ষর	বহরমপুর
২।	ঐ	হরিহরপাড়া
৩।	ঐ	দমকল
৪।	ঐ	রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ	ভগবানগোলা
৬।	ঐ	ধুলিয়ান
৭।	ঐ	নবগ্রাম

১।	স্বাক্ষর	বহরমপুর
২।	ঐ	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ	কান্দি
৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা
৬।	ঐ	বারওয়ান, পোঃ পাঁচখুপী
৭।	ঐ	কান্দি
৮।	ঐ	ভরতপুর

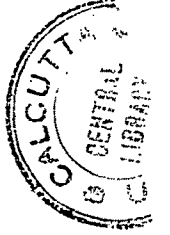
মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশচন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪।	ঐ ..	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫।	ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর



পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	বালুরঘাট
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর

ক্রমিক	স্থিতিবান	বালুরঘাট
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	দার্জিলিং (সদর)
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ ..	ধুম
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি

ক্রমিক	স্থিতিবান	দার্জিলিং
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কালিম্পঙ
৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়াট, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
৮।	ঐ ..	কালিম্পঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	কোচবিহার
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	একলিগঞ্জ
৩।	ঐ ..	মাখাভাঙ্গা

ক্রমিক	স্থিতিবান	কোচবিহার
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪।	ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	প্রাথমিক	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা	
১।	প্রাথমিক পশ্চচিকিৎসক	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া	২।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	কালচিনি		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
			৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	প্রাথমিক পশ্চচিকিৎসক	গুস্করা	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..	মেমারী	২।	ঐ ..	কাটোয়া
৩।	ঐ ..	সেহাবাজার	৩।	ঐ ..	কালনা
৪।	ঐ ..	কালনা	৪।	ঐ ..	আগানসোল
৫।	ঐ ..	কাটোয়া	৫।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	ভাতার
৬।	ঐ ..	নতুনহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৭।	ঐ ..	আগানসোল	৬।	ঐ ..	মঙ্গলকোট
৮।	ঐ ..	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ ..	শক্তিগড়
৯।	ঐ ..	দুর্গাপুর	৮।	ঐ ..	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	প্রাথমিক পশ্চচিকিৎসক	সাঁইথিয়া	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..	বোলপুর	২।	ঐ ..	রামপুরহাট
৩।	ঐ ..	দুবরাজপুর	৩।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	নলহাটি
৪।	ঐ ..	রামপুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৫।	ঐ ..	নলহাটি	৪।	ঐ ..	মহম্মদবাজার
			৫।	ঐ ..	আমেদপুর
			৬।	ঐ ..	বোলপুর,
					শ্রীনিকেতন

হুগলি

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুঁচুড়া

১।	প্রাথমিক পশ্চচিকিৎসক	চুঁচুড়া	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	ত্রিবেণী	২।	ঐ ..	শ্রীরামপুর
৩।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	৩।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	আরামবাগ
৪।	ঐ ..	ভারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
			৪।	ঐ ..	খানাকুল
			৫।	ঐ ..	পুরসুরা,
					পো: চাঁপাডাঙ্গা
			৬।	ঐ ..	পোলবা,
					পো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরখাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুয়া
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটাশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওলা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুয়া

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডাল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডাল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮২
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,১০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,১০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,১০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

যে ইঁদুর লোহা খেয়েছিল

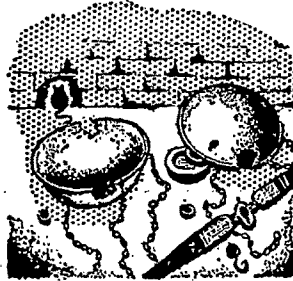
(পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প)

নাটুক বলে এক ব্যবসায়ী সব টাকা পরস্রা খুঁয়ে বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল। যাওয়ার আগে সে তার বন্ধু লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বলল— “তাই লক্ষ্মণ, আমার এই দাঁড়ী পাল্লাটা তোমার কাছে রেখে দাও যতদিন না আমি ফিরি। ওটা বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওটা আমাদের পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আছে।” তারপরে সে চলে গেল।

কিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাকা পরস্রা রোজগার করে দেশে ফিরে এলো। সে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বলল— “দাঁড়ীপাল্লাটা রেখে তুমি আমার খুব উপকার করেছ। এখন ওটা আমায় দাও।”

“তোমার দাঁড়ীপাল্লাটা ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে।” লক্ষ্মণ উত্তর দিল। “ইঁদুর কি করে অত তরী দাঁড়ীপাল্লা খাবে?” নাটুক চটে মটে বলল— “ওটার ওজন ছিল ২৫০ সের।” “আমার বাড়ী বোঝাই ইঁদুর। ২৫০ সের ওদের কাছে আর এমন কি বেশি?”

নাটুক বুঝল সোজা। আঙ্গুলে ঘি উঠবেনা। “ঠিক আছে”—সে একটু হেসে বলল— “তুমি আর কি করবে বল আমারই ভাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর থেকে স্নান করে আসি? তোমার ছেলেকে আমার জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাবে?” লক্ষ্মণ বন্ধুর এই সাধারণ অমুরোধটি এড়াতে পারলেনা।



নদীর থেকে ফেরার পথে নাটুক ছেলেটিকে একটি শুহায় পুরে এক-বিরটি পাথর দিয়ে শুহার মুখটি চাঁপা দিয়ে দিল। তারপর সে ফিরে এলো লক্ষ্মণের বাড়ী। “আমার ছেলে কোথায়?” লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করল বেশ একটু অবাক হয়ে।

“এক বিরটি বাজ পাখী ছেঁ। মেরে ওকে নদীর পার থেকে নিয়ে গেল।” নাটুক বলল।

“মিথ্যাবাদী! একটা বাজপাখী কি করে ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যাবে?”

“কেন না? যদি ইঁদুরে ২৫০ সেরের দাঁড়ীপাল্লা খেতে পারে তাহলে একটা বাজপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষ্মণ! ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দাঁড়ীপাল্লা ফিরিয়ে দাও।” বলাই বাহুল্য নাটুক তার দাঁড়ীপাল্লা ফিরে পেয়েছিল।

নীতি: খাঁর দিকে সত্য আছে তিনি সব সময় মিথ্যাকে দমন করতে পারেন। বনস্পতির কথা ধরুন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা পরিষ্কার-ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি একটি পুষ্টিকর বাদ্য। পরীক্ষা করে এ সত্য যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেবেজ তেলে থেকে। ‘ডালডা’ একটি সর্ব

উপযোগী রান্নার মাধ্যম। ‘ডালডা’ কম খরচায় আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’। ‘ডালডা’র প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। সব জায়গায় গৃহিনীরা একবাক্যে স্বীকার করেন—‘ডালডা’ শুধু রান্নার মাধ্যমই নয় একটি খাদ্যও বটে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ ...	১০১
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ ...	১০৪
ফল ও সবজি সংরক্ষণ ...	১১১
বনমহোৎসবের উদ্বোধন ...	১২৮
খরিফ খন্ডে ধানের চাষ ...	১৩০
মানবকল্যাণে খাল ও বাঁধ ...	১৩৪
আগমার্ক কী ...	১৩৭
নানা স্থানে বনমহোৎসব ...	১৪০
টুকিটাকি ...	১৪২

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (স্লাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিষাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বহুধরা

১২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে আজ খাদ্যাভাব। সেই অভাব পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বাড়ানো। এ আলোচনা আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই বহুবার করা হয়েছে যে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আরও বেশি পরিমাণ জমি চাষে খাটাবার উপায় আমাদের নেই। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ রাজ্যে চাষের জমি অনেক কম এবং জমির পরিমাণ কোন উপায়েই আর বাড়ানো যাবে না। এই কম জমিতেই উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের খাদ্যের অভাব দূর করতে হবে।

সেটা কীভাবে সম্ভব তাও আজ আর পশ্চিম বাঙলার চাষীদের অজানা নয়। সাবেকী রীতি বর্জন করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করলে জমির ফসলের ফলন অনেক বেশি হবে—এটা সুপ্রমাণিত সত্য। আর, বছরে একফসলী চাষের পরিবর্তে জমিতে দোফসলী তেফসলী—সম্ভব হলে চৌফসলী—চাষ চালাতে হবে; বছরের কোন সময়ই চাষের জমি বেকার ফেলে রাখা চলবে না।

আমাদের চাষীভাইরা এসব কথা এখন ভাল করেই জানেন এবং বোঝেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পশ্চিম বাঙলার বেশির ভাগ চাষীই এত গরিব যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করার জন্য ভাল বীজ, পর্যাপ্ত ভাল সার বা আবশ্যিক যন্ত্রপাতি কেনা তাঁদের পক্ষে

সম্ভব হয় না। দোফসলী তেফসলী চাষ চালাতে হলে প্রচুর জলের যোগান চাই। নলকূপ বসিয়ে বা পাম্প কিনে সেচের জলের ব্যবস্থা করা একক চাষীর কল্পনারও অগোচর। এ অবস্থায় অনেক চাষীকেই এখন টাকা ধার নিতে হয় সমবায় ব্যাংক থেকে। এ থেকেই স্বভাবত সমবায় কৃষির কথাও ওঠে। সমবায়ই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার দ্বারা চাষীরা চাষের এসব বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে, প্রচুর ফসল ফািলিয়ে আমাদের খাদ্যাভাব দূর করতে পারেন।

কোন আইনে কানুনে 'সমবায় কৃষি' কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি—শুধু পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার বিধিতে বিষয়টির সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এদেশে সমবায় কৃষি চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা গত কিছুকাল থেকেই—এমন কি জমিদারি গ্রহণ আইন পাস হবার আগে থেকেই বিবেচনা করা হচ্ছে। বহু চাষীরই চাষের জমি টুকরো টুকরো ভাগ হ'তে হ'তে এত ছোট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাতে ভালভাবে চাষ-আবাদ করা যায় না, ফলে উৎপাদন হয় কম। এমন চাষে লাভ দূরে থাকুক, অনেক সময় লোকসানের কাড়িই গুনতে হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এসব টুকরো টুকরো জমিকে কীভাবে এক করে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে নানা উপদেশ এবং পরামর্শ পাওয়া গেছে এবং সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে যথেষ্ট।

১৯৪৬ সালে সমবায় পরিকল্পনা সমিতি 'সমবায় কৃষি'র সংজ্ঞাকে 'সংযুক্ত কৃষি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। উক্ত সমিতি সংযুক্ত কৃষিকে মূল্যায়ন দৃষ্টিতে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। দৃষ্টি শ্রেণীর দৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরন আছে।

প্রথম শ্রেণীতে সমিতি গঠন করা হবে এমন সব সদস্য নিয়ে যাঁরা চাষের জমির মালিক, আর, দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাষের জমি হবে সমিতির এবং সে-জমির ওপর পৃথকভাবে সদস্যদের কোন মালিকানা থাকবে না।

সংযুক্ত কৃষি

১। ব্যক্তিগত মালিকানা

(ক) সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি (কো-অপারেটিভ বেটার ফার্মিং সোসাইটি)

(খ) সমবায় যুক্ত কৃষি সমিতি (কো-অপারেটিভ জয়েন্ট ফার্মিং সোসাইটি)

২। সমিতির মালিকানা

(ক) সমবায় রায়তী কৃষি সমিতি (কো-অপারেটিভ টেন্যান্ট ফার্মিং সোসাইটি)

(খ) সমবায় সমবেত কৃষি সমিতি (কো-অপারেটিভ কলেক্টিভ ফার্মিং সোসাইটি)

১(ক) প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রথম ধরনের সমিতিতে সদস্যেরা মিলিতভাবে চাষ-আবাদের একটা পরিকল্পনা স্থির করবেন। তাতে তাঁরা উন্নত পদ্ধতির কৃষিকাজের পরিকল্পনা করতে পারেন। সমিতি সদস্যদেরই ব্যয়ে নগদে অথবা ধারে সদস্যদের বীজ, সার, উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি এসব যোগাতে পারে এবং উৎপাদিত ফসলের উর্ব্বৃত্ত অংশের বিপণনে সাহায্য করতে পারে। চাষের জমিতে জল-সেচনের জন্য সমিতি পাম্প-যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে, শস্য মজুত রাখবার জন্য নিজস্ব গুদাম করতে পারে এবং অর্থের বিনিময়ে সদস্যদের এসব ব্যবহার করতে দিতে পারে। এই হচ্ছে 'সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি'।

১(খ) প্রথম শ্রেণীর অপারেটিভে অর্থাৎ 'সমবায় যুক্ত কৃষি সমিতি'তে সদস্যেরা চাষের একটা সাধারণ পরিকল্পনা তো স্থির করবেনই, তা ছাড়া, কয়েক বছরের জন্য উৎপাদনের একটা সাধারণ কর্মসূচিও তৈরি করবেন। সদস্যেরা জমির মালিকানা ছাড়বেন না, কিন্তু জমি ছেড়ে দেবেন সমিতির হাতে—যাতে যুক্তভাবে তাতে চাষ-আবাদ করা যায়। প্রত্যেক সদস্যের জমির যা মূল্য, সেটা সমিতিতে তাঁর আদায়ীকৃত অংশীদারী মূলধন রূপে গণ্য হবে।

সেই মূলধনের উপর সদস্যেরা লভ্যাংশ পাবেন, এবং সর্বসম্মতভাবে স্থির হ'লে বোনাসও পেতে পারেন। সামর্থ্য এবং নৈপুণ্য অনুযায়ী সদস্যেরা বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদলে বিভক্ত হবেন এবং সমিতি তাঁদের কাজ ভাগ করে দেবে। শ্রমিক-কর্মীরা সময় অথবা কাজের হারে পারিশ্রমিক পাবেন। যিনি যতটা কাজ করবেন, সেই অনুযায়ী তিনি উৎপাদন-বোনাসও পাবার অধিকারী হবেন। চাষের ফসল উঠলে, সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে, সঞ্চয়-ভান্ডারে এবং উন্নয়ন-খাতে অর্থ রেখে, তারপর যা থাকবে, সেইটা নিট লাভ ব'লে ধরা হবে।

২(ক) 'সমবায় রায়তী কৃষি সমিতি'তে জমির মালিক হচ্ছে সমিতি। তাই সমিতি মধ্যস্বত্ববানের ভূমিকা নিয়ে, নগদ খাজনা বা ফসলী খাজনার বিনিময়ে বিভিন্ন লপ্তের জমি বিভিন্ন সদস্যকে বা সদস্যদলকে বণ্টন করে দেবে। সমিতি সদস্যদেরই ব্যয়ে তাঁদের শস্য-পরিকল্পনা, চাষের কাজে বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যোগানো, উর্ব্বৃত্ত ফসল বিক্রি করা প্রভৃতি ব্যাপারে কাজ করবে।

২(খ) 'সমবায় সমবেত কৃষি সমিতি'তে সদস্যদের সাহায্যে সমিতিই কৃষিকাজ চালাবে এবং সদস্যদের

কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেবে। ফসল উঠলে সমিতি নিট লাভটা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করবে। 'সমবায় যুক্ত সমিতি'তে যেভাবে নিট লাভ ধার্য হবে, এই ক্ষেত্রেও নিট লাভ ধার্য হবে সেইভাবে।

এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখন ১৩৫টি উন্নত কৃষি সমিতি, ৫৬টি যুক্ত কৃষি সমিতি, ১টি রায়তী কৃষি সমিতি এবং ১৪টি সমবেত কৃষি সমিতি আছে। মোট এই ২০৬টি সমিতির মধ্যে বেশির ভাগই শৃঙ্খল নামেই আছে—কাজে নয়।

এই 'সংযুক্ত কৃষি' সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের আলোচনা হয়েছে, যেমন—১৯৪২ সালে গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় সংযুক্ত সমবায় সমিতির যে পরিকল্পনা দিয়েছেন তা প্রায় উপরে বর্ণিত 'সমবেত কৃষি সমিতি'রই অনুরূপ। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে এদেশের কৃষির ক্ষেত্রে সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন; তবে, তার রূপ কী হবে তা বলা হয় নি। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের আর্থনৈতিক কর্মসূচি সমিতি এবং ১৯৪৯ সালে কংগ্রেস কৃষি সংস্কার সমিতি 'সমবায় কৃষি'র প্রকৃত-তাৎপর্য ব্যক্ত করে, এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'সমবায় কৃষিকে উৎসাহ দান করা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয় নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'সমবায় কৃষি'র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং তার ধারাদ্বারা সম্বন্ধেও কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মনে হয়, উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঋণ এবং তার প্রয়োগের উপরই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশি।

নাগপুর কংগ্রেসে পরিস্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সমবায় সংযুক্ত কৃষি'-কর্মের দ্বারা কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়ন করা, এবং প্রথম তিন বছরের মধ্যে সমবায় 'কৃত্যক সমিতি' বা কৃষি-সহায়ক সমিতির সাহায্যে এই কাজ আরম্ভ করতে হবে।

এখন যেভাবে কাজ চালানো হবে বলে স্থির করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক জায়গায় দুই ধরনের সমিতি থাকবে: (১) কৃত্যক ও বিপণন সমবায় সমিতি এবং (২) উৎপাদকদের ও কর্মীদের সমবায় সমিতি। কৃত্যক সমবায় সমিতিতে সদস্যের সংখ্যা থাকবে কম—যেমন ১৫; তার মধ্যে ৬ জন হবেন উৎপাদক ও কর্মী সমিতির প্রতিনিধি, ৬ জন হবেন অংশীদারদের প্রতিনিধি এবং সরকার থেকে যদি সমিতির অংশ খরিদ করা হয় তবে ৩ জন থাকবেন সরকারী প্রতিনিধি।

সমবায় কৃষি সমিতিগুলি সঠিক কী ধরনের হবে তার একটা বিস্তারিত ও বিশ্লেষিত রূপ দাঁড় করাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সমবায় আইন-কানুনের সংশোধন করতে হবে।

সমবায় কৃষি সম্বন্ধে সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন, তাতে এ বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে 'কৃত্যক সমবায়' ('সার্ভিস কো-অপারেটিভ') বা কৃষি সহায়ক সমবায় সমিতির প্রবর্তন করা হবে বলে মনে করা যায়। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক সমিতি নিয়োগ করেছেন। এই সমিতি তাঁদের বিবরণী পেশ করলে, মন্ত্রিসভায় তা আলোচিত হবে এবং তার পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে, জমিদারির বিলোপ-সাধনের ফলে উক্ত বিভাগের হাতে যে দেড় লক্ষ একর জমি এসেছে, তা তাঁরা সমবায় বিভাগের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত আছেন। তা ছাড়া, সমবায় কৃষি পদ্ধতি চালু করতে হলে যদি অধিক-সংখ্যক কর্মচারী দরকার হয়, তাও উক্ত বিভাগ থেকে ধার দেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় চাষ

জীৱাধারমণ গোস্বামী

সমবায় কৃষি-সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক

হয়

পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকাঃ ভূমিসংস্কার আইন ও সমবায় চাষ

কয়েক বছর আগেও বাঙলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদানীন্তন ইংরেজ শাসক লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদিও নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের একটা পথ ক'রে দিয়েছিল এবং অনেক লোককে কৃষিকার্যে উৎসাহিত করেছিল তবুও বলতে হয় এটা ছিল একটি ত্রুটিবহুল ব্যবস্থা। এতে কৃষিকার্যে লিপ্ত সংগতিপন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয় নি বাঙলাদেশে, বরঞ্চ এই বন্দোবস্তের ফলে চাষীদের অবস্থার অনেকটাই অবনতি ঘটে। আইনে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষিত না থাকতে জমি ক্রমশই অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হ'তে থাকে। জমিদারদের ঝোঁক ছিল কত বেশি খাজনা আদায় করা যায় তার দিকে, কৃষির উন্নতির দিকে নয়। ছোট ছোট ভাগে ভাগ ক'রে জমি বিলি করা, খাজনার হার বাড়ানো, উচ্ছেদ ও ক্রোকের সংখ্যা বাড়ানো—এসবের মধ্যোই আবদ্ধ রইল জমিদারদের দৃষ্টি। তারপর ১৮১৯ সালে পত্তনি তালুক রেগুলেশন পাস হওয়ার ফলে জমিদারদের নিচে সৃষ্টি হ'ল বিভিন্ন নিম্নস্বত্বের। ফলে সমাজে উন্মত্ত হ'ল শূদ্র নিজ নিজ লাভ-আদায়কারী অগণিত মধ্য ও নিম্ন স্বত্বাধিকারীরা, কৃষির উন্নতির দায়িত্ব নেবার জন্য রইল না কেউ। ফলে কৃষির এল চূড়ান্ত বিপর্যয়, কৃষককুল ডুবলো। দুঃসহ দারিদ্র্য। কৃষি

ও কৃষককে এই অবনতির পথে নিয়ে যাবার কারণ-স্বরূপ আছে অনেক কিছু, যেমন, বিদেশী শাসন-সংঘাতে কুটিরশিল্পের ধ্বংস, উত্তরাধিকার আইনের প্রভাব, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, হুগলিনদীর দুইপারে বিদেশী মালিকানায় গঠিত বড় বড় যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাঙালী মজুরের স্থানাভাব, ফলে জমির উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে জমিদারি দখল আইন প্রবর্তিত ক'রে নতুন যুগধর্মের বিবর্তনে ১৬২ বছরের পুরানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয় কৃষি-উন্নতির এক নতুন অধ্যায় সূচনার উদ্দেশ্যে। ফলে সেই বছরের ১৫ই এপ্রিল রাজ্যের সমস্ত জমিদারিতে মধ্যস্বত্বাধিকারীর সব ক্ষমতা ও অধিকার নির্দয় অবস্থায় সরকারের অধীনে চ'লে এসেছে। এইভাবে জমিদারি-বিলোপ একটি উপায় মাত্র। কৃষি-উন্নয়নের কর্মসূচিকে যদি ফলপ্রসূ করতে হয়, মৃতকল্প পল্লীসমাজকে যদি পুনর্বুদ্ধজীবিত করতে হয় তা হ'লে প্রকৃত চাষীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ঘটাতে হবে সরকারের, মাঝখানে কোনও মধ্যবর্তী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃত চাষীই হবে জমির মালিক। আইনের বিধান অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বাধিকারে রাখতে দেওয়া হয়েছে বসতবাটির জমি, ১৫ একর পর্যন্ত খাস অকৃষি-জমি, ২৫ একর পর্যন্ত খাস কৃষি-জমি, মৎস্যচাষের জন্য পুষ্করিণী, চা-বাগানের জমি ইত্যাদি।

আইন পাস ক'রে বিদেশী শাসকের আইনকে রদ করা সহজ কিন্তু কৃষিব্যবস্থায় যে বিপর্যয়কে আমরা

উত্তরাধিকারসূত্রে পেলাম তার পদনগঠন এত সহজ কি? পশ্চিম বাঙলায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এক কোটি আটশ লক্ষ একর—রাজ্যের মোট আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে এক কোটি সতেরো লক্ষ একর জমিতে (অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৯২ ভাগে) চাষ হয়। রাজ্যে লোক-সংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। সহজেই তা হ'লে বদ্বা যায় যে, নতুন চাষ-আবাদের উপযুক্ত সুযোগ ও জমি এ রাজ্যে বিশেষ নেই।

এই ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর আবাদী কৃষিজমির উপরে নির্ভর করে আছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ লোক অথবা ৩২ লক্ষ পরিবার। মাথাপিছু তা হ'লে জমি পড়ে ৮৬ একর করে। শতকরা ৩৪.৫ জনের মাথাপিছু ২ একরের কম জমি, ২ থেকে ৫ একর জমি আছে শতকরা ৩৬.২ জনের, ৫ থেকে ১০ একর জমি আছে শতকরা ২০.২ জনের, ১০ থেকে ২৫ একর জমি আছে শতকরা ৭.২ জনের, আর ২৫ একরের বেশি জমি আছে শতকরা মাত্র ১.৮ জনের। সোজা কথায়, ৫ একরের কম জমি আছে শতকরা ৭০.৭ জনের—মানে, পাঁচজন লোকের একটি কৃষি-পরিবারের জীবিকার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষেও অপര്্যাপ্ত। ৫ থেকে ১০ একরের মালিক যারা, প্রায় ৫.১০ লক্ষ চাষী-পরিবার, তাদেরও অতি সাধারণভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। যদি প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করে জমি দেওয়া যায় তা হ'লে বর্তমানের মোট কৃষিজীবীর শতকরা ৩০ ভাগ অর্থাৎ ৯ লক্ষ পরিবারকে কোনও জমিই দেওয়া যাবে না। তারপরে এই চাষী-সম্প্রদায় আবার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। শতকরা ৫৬.৫ জন চাষী নিজ জমি চাষ করে, ভাগচাষীর সংখ্যা শতকরা ২১ জন, ভূমিহীন চাষী শতকরা ২১.৪ জন আর অন্যান্য শতকরা ১.১ জন।

বিপর্যস্ত কৃষিব্যবস্থার পদনগঠন এবং সরকার কর্তৃক জমিদারি গ্রহণ করার সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় ১২ লক্ষ বর্গদার ও ভূমিহীন চাষী-পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুপারিকল্পিত নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় জমিদারি দখল আইনের

কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে কৃষির উন্নয়নের জন্য সমবায় কৃষি ও জোতের সমীকরণ বা একত্রীকরণের বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য উৎপাদন-ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো। সমবায় কৃষিকেন্দ্র স্থাপন এবং জমিদারি দখলের পরে সরকারের হাতে-আসা উন্মুক্ত জমি ভূমিহীন বা অত্যন্ত অল্প জমির মালিকদের মধ্যে বন্টন করে সমবায় চাষ প্রবর্তন এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। যদিও আজ পর্যন্ত এই ভূমিসংস্কার আইনের সবগুলো বিধান চালু করা হয় নি তবুও সমবায় চাষ সম্পর্কিত অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আইনের ৪৩ ধারায় বিধান রয়েছে, যে-কোনও ৭ জন রায়ত মিলে তাদের জমি হস্তান্তর করে একটি সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন করতে পারবে। এই গঠনব্যাপার হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক, কোনও রকম আইনের জুলুম এখানে নেই। যাতে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জমিকে সমীকরণ দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ জোতে পরিণত করে সমবায় প্রথায় উন্নত ধরনের চাষে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। সমিতির পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে সভ্যদের হাতেই থাকবে, সরকার বা বাইরের কেউ অথবা হস্তক্ষেপ করতে আসবে না। অনুপ্রেরণা ও গোড়াকার সাহায্য হিসাবে এই ভাবে গঠিত সমবায় কৃষিসমিতিগুলো সরকার থেকে নিম্নলিখিত সাহায্য পাবে এবং তা আইনের ৪৮ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যথাঃ

- (১) কম হারে খাজনা।
- (২) প্রথম তিন বছর বিনা মূল্যে এবং পরে কম মূল্যে প্রয়োজনীয় বীজ ও সার।
- (৩) বিনা মূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপদেশ।
- (৪) নানাবিধ আর্থিক সাহায্য।
- (৫) উৎপাদিত ফসল ন্যায্যমূল্যে বিপণনের স্বাধোগ্য ব্যবস্থা।

আইনের ৪৯ ধারায় ব্যবস্থা রয়েছে সরকারের হাতের উন্মুক্ত জমি স্থানীয় ভূমিহীন চাষী বা ২ একরের কম জমির মালিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন করার এবং যারা সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন করে এ-জাতীয় জমি পাবার জন্য আবেদন করবে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারীভাবে এই নীতিও কার্যকরী করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই সমবায় কৃষি-সমিতি গঠনের ব্যাপারে আইনের জুলুমের কোনও প্রশ্ন নেই। চাষীরা নিজেরা দেখেশুনে, সমবায় প্রথায় চাষের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে, সমবায় নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে স্বেচ্ছায় সমবায় চাষের প্রবর্তন করবে, এটাই সরকারী নীতি এবং এই নীতি সম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত। আশা করা যায়, ভূমিসংস্কার আইন সম্পূর্ণরূপে চালু হবার পরে রাজ্যের সর্বত্র চাষীরা স্বেচ্ছায় উন্মুক্ত হয়ে কৃষির ও নিজেদের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অগণিত সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে তুলবে এবং তা সরকারী আনুকূল্যে দিনদিন পূর্ণাঙ্গ লাভ করবে।

রাজ্যে সমবায় চাষের প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সমবায় দফতর দ্বিতীয় পাঁচসাল্য পরি-কল্পনায় একটি কার্যরীতি চালু করেছেন। গোড়াতে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল যে, পরি-কল্পনার পাঁচ বছরে সারা রাজ্যে (পূর্বাঙ্গলিয়া ও বিহার থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য অঞ্চল সমেত) মোট ৫০৮টি সমবায় কৃষি-সমিতি স্থাপন করা হবে। তদনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ সনের জুন অবধি গঠিত হয় ৯৭টি সমিতি এবং ১৯৫৭-৫৮ সনের জুনে ১৬০টি। পরে, লক্ষ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লক্ষ্যের এই সংখ্যাপূরণের দিকটিকে গোঁগ করে দেওয়া হয়েছে। এখনকার লক্ষ্য হচ্ছে শুধু সংখ্যাপূরণ নয়, দেশের সর্বত্র যাতে সত্যিকার শক্তিশালী কৃষি-সমিতি গড়ে ওঠে সেইদিকে—তাতে পূর্বনির্দিষ্ট সংখ্যাপূর্তি হোক আর না হোক। এই ১৬০টির

মধ্যে চার রকমের সমিতিই আছে, যথা, বোটর ফার্মিং, টেনেন্ট ফার্মিং, জয়েন্ট ফার্মিং ও কালেক-টিভ ফার্মিং। চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সমিতির ধরন নির্ধারণ করেছে, সরকারী প্ররোচনা বা চাপে নয়। সবগুণী সমিতিই যে উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করেছে তা নয়, অনেক সমিতি বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করেছে। বর্ধমানের সমবায় কৃষি-সমিতিগুলি বিশেষত যেখানে যৌথচাষ প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে উৎপাদনের হারে প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য সফলকাম সমিতির মধ্যে বাঁকুড়ার মাকড়কোল চুয়াপাড়া সমিতি, হুগলির ত্রিফসলী সমিতি, নদিয়ার মদনপুর সমিতি, মর্শিদাবাদের কুমারসন্দা সমিতি ইত্যাদির নাম করা যায়। খণ্ডিত বা পতিত জমিকে জোড়া লাগিয়ে সমবায়ায়ক চাষে যে উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান এই সমিতিগুলির কর্মপ্রচেষ্টা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সমবায় কৃষি-সমিতিগুলিকে সরকারী ও আধা-সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাষের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য অথচ আমাদের চাষীদের মধ্যে এই মূলধনের অভাব অত্যন্ত বেশি। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করতে না পারলে উৎপাদন বাড়বে কী করে? নিচের তালিকায় সরকারী ও আধা-সরকারী সাহায্যের তালিকা দেওয়া হ'লঃ

- (১) ম্যানেজারের বেতন বা চাষের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নির্বাচিত সমিতিতে বার্ষিক সরকারী খরচাতি ৫০০ টাকা।
- (২) ভারি যন্ত্রপাতি বা পাম্পিং সেট কেনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ও অল্প সদ্দে নির্বাচিত সমিতিপিছদ সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা সরকারী ঋণ।
- (৩) সরকারী খরচে সমিতির ম্যানেজারের সমবায় ও কৃষি-বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা।

- (৪) বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপদেশ।
- (৫) ছোটখাট সেচব্যবস্থা বিষয়ে অগ্রাধিকার।
- (৬) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক থেকে স্বল্পমূল্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
- (৭) কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী সমবায় ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
- (৮) সরকারী খাতে এবং স্বকীয় গুদাম নির্মাণের জন্য খয়রাতি ও ঋণ মিলিয়ে নির্বাচিত সমিতিপিছু ১০,০০০ টাকা দান ও দাদনের বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং আশা করা যায়, চলতি বছরেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সমিতিগুলি যাতে সুদৃষ্টভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য সমবায় দফতর ও কৃষি-দফতরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে রাজ্য কৃষি-কলেজে এক বিশেষ ধরনের 'কোর্স' প্রবর্তিত করে চলতি বছরের গোড়ার দিকে ২০ জন সমবায় কৃষি-সমিতির ম্যানেজারের শিক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অধিকতর-সংখ্যক ম্যানেজারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যকের রূকগুলিতে সমিতি স্থাপন ও পরিবর্ধনের নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে এবং যথাযথভাবে এই নীতিকে বাস্তবে রূপদান করা হচ্ছে। মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সমবায় কৃষি-সমিতি রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত। তদুপরি অনুন্নত ও উপজাতীয় শ্রেণীর মধ্যে কৃষির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে তাদের জন্য কোনও কোনও জেলায় যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও পশ্চিম দিনাজপুরে কিছু কিছু সমবায় কৃষি-সমিতি গঠিত হয়েছে। পূর্বেকার কিছু কিছু বিবিধার্থক সমিতি অধুনা সমবায় চাষের কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় যুদ্ধ-ফেরতা সৈন্যদের নিয়ে সমবায় খামারের পত্তন করা হয়েছে।

গত বছর ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যের সমবায় কৃষি-সমিতিগুলির পরিচালনা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে একটি আন্তর-দফতর সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতিতে আছেন রাজস্ব-পর্ষদ ও ভূমিরাজস্ব দফতরের, উপজাতি উন্নয়ন, কৃষি ও সমবায় দফতরের প্রতিনিধিগণ। সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে এই সমিতি নীতি-নির্ধারণ করেন এবং তদনুযায়ী নির্দেশ দান করেন। এই সমিতির সদুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় আবার একটি করে উপ-সমিতি গঠিত হয়েছে, তাতে আছেন অতিরিক্ত সমাহর্তা, জমিদারি গ্রহণ), সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধক, জেলার কৃষি-অধ্যক্ষ এবং জেলা উন্নয়ন আধিকারিক। দু'জন করে প্রগতিশীল কৃষককেও এই উপ-সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। জেলার সমবায় কৃষি-সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান এই উপ-সমিতি করেন এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বন্ধে রাজ্যের আন্তর-দফতর সমিতিতে অবহিত করেন।

এই পর্যালোচনা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হবে যে, যদিও গোড়াতে সমবায়-চাষের প্রসারকল্পে দ্বিতীয় পাঁচসালী পরিকল্পনায় সমবায় দফতরই কর্মকল্পনাটি চালু করেছিলেন, আজ প্রয়োজন অনুযায়ী সেটি তার গন্ডি ছাড়িয়ে তার উচ্চতর পর্যায়ে উঠে গিয়েছে। আজ এ-রাজ্যে সমবায় চাষের প্রসার ও পরিবর্ধন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্মিলিত প্রয়াসের গন্ডিভুক্ত হয়ে পড়েছে। বাঙলার চাষ ও চাষীর আজ বড় দুরবস্থা। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, রাজ্যের প্রয়োজনীয় সাংবৎসরিক খাদ্য এখানে উৎপাদিত হয় না। বছরে একমাত্র চালেরই ঘাটতি পড়ে ৭ লক্ষ টন। টুকরো টুকরো অসংখ্য অপরিপাক্ত পরিমাণ জমি, জমির উপরে অত্যধিক চাপ, মূলধনের রিজুতা আর বিত্তহীন অনগ্রসর

কৃষকসম্প্রদায়—এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা। এখানে সনাতন রীতিতে একক ও বিচ্ছিন্ন ধরনে চাষের কোনও অবকাশ আছে কি? কাজেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সমবায়াত্মক কৃষি-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রবর্তন। নান্যঃ পন্থা।

সাত

সমবায় কৃষি-সমিতি গঠনে সতর্ক পদক্ষেপ

গোড়াতেই এ কথাটা সকলের মনে রাখা দরকার যে, সমবায় চাষ এমন কিছু ভেল্কি বা যাদুমন্ত্র নয় যে, সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন করলেই রাতারাতি চাষের চেহারা পালটে যাবে আর চাষী হয়ে উঠবে পয়সমন্ত। গোড়াকার কথা হচ্ছে সমবায়-নীতিতে বিশ্বাস, আন্তরিক প্রচেষ্টা, সততা, অকুণ্ঠ শ্রম এবং সর্বোপরি মৌলিক উপাদানগুলোর সুসমঞ্জস যোগাযোগ। যে পরিমাণে এই যোগাযোগে সামঞ্জস্য-সাধন করা যাবে ঠিক সেই পরিমাণেই সমবায় চাষ সাফল্যমণ্ডিত হবে। বস্তুত পৃথিবীতে এমন কোনও নির্দিষ্ট বিধান বা ফরমুলা নেই যা অবলম্বন করে বিনা আয়াসেই চাষ ও চাষীরা চেহারা ফিঁদিয়ে ফেলা যায়।

প্রথমত জমির ব্যাপার। খণ্ডিত ও ইতস্তত-ছড়ানো জমির সমীকরণ করে সবটা জমি একলপ্তে জোড়া লাগানো প্রয়োজন; তাতে করে প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমিতে উন্নত প্রণালীতে শস্যের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী চাষ-আবাদ করা চলে। প্রথমেই সবটা জমির উর্বরতা, প্রকৃতি, ফলন-সম্ভাবনা, গঠন ইত্যাদি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দরকার, কারণ একেজো ও অন্যর জমি নিয়ে সমবায় চাষে নামলে চাষ মোটেই লাভজনক হবে না, বলাই বাহুল্য। তাতে শুধু যে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় তাই নয়, সমবায় চাষের তাতে অহেতুক দুর্নাম হবে এবং চাষীদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে। আমাদের বাঙলাদেশে এ রকম একত্রীকরণ করে একলপ্তে ২৫ বা ৩০ একর ভাল জমি পেলেই সমবায় চাষের প্রবর্তন করা চলে।

দ্বিতীয়ত সভ্যদের কথা। যেমন তেমন করে যে-কোনও চাষীকে ধরে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নয়। যারা সমবায় নীতিতে বিশ্বাসী, যাদের জমি সমিতির জমি একত্রীকরণে সহায় হবে এবং সর্বোপরি যারা সম্ভাব্যবিশিষ্ট এমন চাষীর ভিতরে থেকেই সভ্যশ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে। জমি একত্রীকরণ মানে যে, যৌথচাষে নামা তা নয়, শুধু খণ্ডিত জমিগুলিকে একলপ্তে আনা। যৌথচাষে নামা-ন্য নামা সভ্যদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। একটা নির্দিষ্ট বয়সের গন্ডির মধ্যে থেকে যেসব চাষী শিক্ষার, রুচিতে, আর্থিক সচ্ছলতায় সকলেই প্রায় সকলের সমান, এমন সমজাতীয় চাষীরা মিলে যদি সমিতি গঠন করে তা হ'লে তা সবদিক থেকে বাঞ্ছনীয়। কোন সমিতিতে কতজন সভ্য গ্রহণ করা উচিত এ সম্বন্ধে কোনও পূর্বনির্দিষ্ট বিধান থাকতে পারে না। এই সংখ্যা নির্ভর করবে সমিতির কার্যকারিতা এবং স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। তবে একটু সতর্ক থাকতে হবে সভ্যসংখ্যা যেন প্রয়োজনের অনুপাতে অথবা শুধু শেয়ার বিক্রির গরজে অনর্থক গুরুভার না হয়।

সমিতির এলাকা হওয়া উচিত সাধারণত একটি গোটা গ্রাম, বড়জোর দুই বা তিনটি গ্রাম। এতে সভ্যদের মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় থাকে, সমিতির পক্ষেও সভ্যদের সেবা করা সহজ হয়। গাঁয়ের মাঠে চাষ-আবাদ নিয়ে সমিতির কাজ, সেক্ষেত্রে আস্ত একটা ইউনিয়ন নিয়ে সমিতি রেজিস্ট্রি করার কোনই সার্থকতা নেই। গোড়াতে সমিতির সীমা ক্ষুদ্রায়তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গোড়া থেকেই সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যন্য উপাদান থাকা সত্ত্বেও শুধু সদ-পরিচালনার অভাবে অনেক সম্ভাবনামুগ্ধ সমিতি নষ্ট হয়ে গেছে এ অভিজ্ঞতা নূতন নয়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে পরিচালন-ব্যবস্থার দরুন খরচ যেন অযথা বেড়ে না যায়, তাতে চাষীর ল'ভের ঘরে টান পড়বে। পরিচালনা সুদৃঢ় করার

জন্য সৎ ও অভিজ্ঞ লোকের হাতে কর্মভার দিলেই শৃঙ্খল চলেবে না, সাধারণ সভাদেরও সমবায় চাষের নীতি ও কর্মপ্রণালীতে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেরাই কর্ণধার হয়ে উঠতে পারে। গোড়াতে সরকারী বিশেষজ্ঞের উপদেশ এবং সক্রিয় সাহায্য অপরিহার্য হ'লেও, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন যথাসম্ভব শীঘ্র সভোরা নিজেরাই সমিতির ভার গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ে সমবায় চাষে সভোর কাজের মান ও মূল্য বাচাই নিয়ে বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং এক্ষেত্রেই প্রয়োজন সুদক্ষ পরিচালনার।

সমবায় চাষে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এসম্বন্ধে কৃতিশীল হয়ে তবেই সমবায় চাষে হাত দেওয়া উচিত। নইলে সমিতি গড়ে কোনও কাজ আরম্ভ না করতে পারলে বা শেষটায় মূলধনের অভাবে আরম্ভ কর্ম অর্ধসমাপ্ত থাকলে সমবায় চাষ অহেতুক দুর্নামের ভাগী হবে। শৃঙ্খল একটা নামের মোহে বা হুজুগে মেতে সমবায় চাষে নামা কাজের কথা নয়, অতি ধীরস্থিরভাবে সবদিক ভেবেচিন্তে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে তবেই একাজে হাত দেওয়া উচিত।

সমবায় চাষের অপর একটি সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে মিশ্র-চাষ প্রবর্তনের এবং আনুষঙ্গিক কুটিরশিল্প গঠনের। সভ্যদের আর্থিক সংগতি বাড়াবার জন্যই এই প্রয়োজন। ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন, হাঁসমুরগি-পালন, ফলের, ফুলের বা সবজির চাষ প্রবর্তন সমবায় চাষের ক্ষেত্রে সহজ হয় এবং এই মিশ্রচাষের প্রবর্তন যৌথভাবেও হ'তে পারে অথবা সভোরা এককভাবেও করতে পারে। ঠিক তেমনি আনুষঙ্গিক শিল্প যেমন ধানমাড়াই, আখমাড়াই, তেলের ঘানি প্রভৃতি গড়ে তোলা সমবায় চাষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজ। এতে সভ্যদের হাতে দু'টো বাড়তি পয়সা আসে, নতুন নতুন কর্মসৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে এবং গ্রামের অনিয়োজিত শ্রমশক্তি নিয়োগের একটা পথ হয়।

এই বাড়তি আয়ের দরুন সমবায় চাষের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা সভ্যদের মনে দৃঢ়মূল হবে সন্দেহ নেই। এবং এভাবে আস্থা-সঞ্চারই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, শৃঙ্খল নীতিকথা বলে নয়, বাস্তবক্ষেত্রে সভ্যদের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে।

মোন্দা কথা, সমবায় চাষে নামতে গেলে যতটুকু নিষ্ঠা, শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন তা পুরোপুরি নিয়োগ করতে হবে। সমবায় চাষ মানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সেখানে ঢিলেমির ফাঁক থাকলে প্রতিষ্ঠান জোরালো হবে না কোনদিনই।

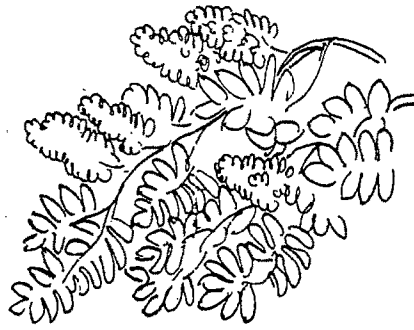
সমবায় চাষে আর-একটি দিকে গোড়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে, তা হচ্ছে সভ্যদের মনে পরনির্ভরতার মনোভাব এবং সরকারী সাহায্যের উপরে অত্যধিক ঝোঁক। শৃঙ্খল সরকারী সাহায্যের আকর্ষণে ও ভরসায় যে সমিতি গঠিত হবে, এক কথায় বলা যায়, তা দু'দিনের বেশি টিকবে না, কারণ এর ভিত্তিমূল শিথিল। সমিতির আসল শক্তি রয়েছে সভ্যদের আপন আপন কর্মশক্তির উপরে, বিশ্বাসের মধ্যে। সরকারী সাহায্য এই মূলশক্তির সহায়ক মাত্র, মূলকেন্দ্র নয়।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় কৃষি-সমিতি রেজিস্ট্রি হয় ১৯৪০ সনের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইনের বিধান অনুসারে। এই রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের জন্য কোনও ফি দিতে হয় না। ন্যূনতম সংখ্যায় যে-কোনও সাতজন রায়ত বা কৃষক মিলে সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে। প্রত্যেক জেলায় সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধকের অফিস আছে। একমাত্র হুগলি ও জলপাইগুড়ি জেলার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। হুগলির অফিস হাওড়ায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার কাজ দার্জিলিংয়ের সহকারী নিবন্ধক দেখাশোনা করেন। সহকারী নিবন্ধকের অফিসে প্রয়োজনীয় উপবিধি এবং ফরম মজুদ আছে। এই ফরম এবং উপবিধিও বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং তা পূরণ করে উক্ত অফিসে দাখিল করতে হয়। প্রয়োজনীয় সরকারী তদন্তের পরে উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে সমিতি নিবন্ধন বা

রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়। কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় সহকারী নিবন্ধকের সংশ্লিষ্ট একজন করে সমবায় কৃষি-সমিতির পরিদর্শক আছেন। তা ছাড়া স্থানীয় সমবায় সমিতির পরিদর্শকও আছেন। সমবায় কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে এঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা বিধেয়।

আগেই বলা হয়েছে, সমবায় কৃষি-সমিতি গঠন সভ্যদের স্বেচ্ছাধীন এবং এতে সরকারী চাপ বা

আইনের জুড়লুমের কোন কথাই নেই। অতএব প্রস্তাবিত কৃষি-সমিতির ভাবী সভাগণ এবং বিশেষ করে সংগঠকগণ সমিতির সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্বন্ধে এবং মৌলিক উপাদানগুলো সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধানের ফলে কৃতিশ্রম হয় তবেই সমবায় কৃষি-সমিতি গঠনে উদ্যোগী হবেন এটাই কাম্য। সমবায় চাষ যাদুমন্ত্রও নয়, তাড়াহুড়ো বা হুজুরের ব্যাপারও নয়। সমবায় চাষের সর্বস্তরে সবিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।



ফল ও সবজি সংরক্ষণ

জীবাণীভূষণ রুদ্র, এম এস-সি

ডিপ্লোমা ইন ফুট টেকনলজি

বাংলাদেশ ফল-ফুলে সমৃদ্ধ। কত রকমের ফল আর সবজি আমাদের দেশে হয় তার সব খবরও আমরা রাখি না। ফলের রাজা আমের বহু রকমের ফলন হয় আমাদের দেশে। অন্যান্য যে-কোনও দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ফল খুব একটা কম হয় না অথচ যে-কোনও দেশের তুলনায় আমরা ফল খুব কম খাই। অসুস্থ হয়ে না পড়লে ফলের ব্যবহার খুব কমই হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক সাধারণ পরিশ্রম করলে দৈনিক তার ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। আমাদের দৈনন্দিন আহাৰের মধ্যে অন্তত তিন আউন্স ফল এবং তিন আউন্স সবজি থাকা উচিত। আহাৰের পরিপূৰ্ণতা সাধন করতে এবং সামঞ্জস্য রাখতে ফল ও সবজি বিশেষ সহায়তা করে।

সহজপ্রাপ্য কয়েকটি ফল এবং সবজির মধ্যে কোন জিনিসটি কী-পরিমাণে থাকে তার একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল:

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য

ফল বা সবজি বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়; কারণ এইসকল দ্রব্য সহজেই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ফল ও সবজি জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে বেশিদিন আহাৰের উপযুক্ত করে রাখা। সংরক্ষণের ফলে যে-কোনও সময় যে-কোনও ফল বা সবজির আস্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং যে-কোনও ফলের বা সবজির মরসুম বাড়িয়ে দিয়ে সহজলভ্য করা যায়। মরসুমের সময় যখন ফল বা সবজির দাম খুব কম যায়, তখন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং সংরক্ষিত দ্রব্যের দামও খুব বেশি হয় না। কোন বছর ফল বা

সবজির ফলন যদি খুব বেশি হয় এবং স্থানীয় লোকেরা চাহিদা মিটিয়ে অপব্যাপ্ত থাকে, তা হ'লে সংরক্ষণ প্রণালীর দ্বারা অপচয় বন্ধ করা যায়। এমন কোনও জায়গায় যেখানে এই ফল বা সবজি খুব বেশি পরিমাণে জন্মান এবং যেখান থেকে সেগুলো টাটকা পাঠানো সম্ভব নয় কিংবা যেখানে যাওয়া যায় না, সেখানে সংরক্ষণ প্রণালীর সাহায্য নিয়ে এইসকল ফল ও সবজি অনেকদিন রাখা সম্ভব হয় এবং সুবিধামত পাঠানোর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক'রে-পড়া ফলের অপচয় হয়। সংরক্ষিত ফল বা সবজি সহজেই বহন করা যায় এবং আহাৰের জন্য সহজলভ্য। বিশেষ ক'রে বৃষ্টির সময় বা হঠাৎ প্রয়োজনের সময় এই সংরক্ষিত ফলের বা সবজির মূল্য উপলব্ধি করা যায়।

পচবার বা নষ্ট হবার কারণ

জলে, স্থলে এবং বাতাসে সর্বত্রই জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। প্রধানত তিন জাতীয় জীবাণু ফল বা সবজি নষ্ট করে: 'ঈস্ট', 'মোল্ড' এবং 'ব্যাক্টেরিয়া'। 'এনজাইম' নামে আরও একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে যা অনেক সময় এই পচন ধরাতে সহায়তা করে। সংরক্ষণ করতে গেলে প্রথমেই এসব জীবাণু আর 'এনজাইম' ধ্বংস করতে হবে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে।

পচন নিবারণের সাধারণ উপায়

ভাল করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলে ফল বা সবজিকে অনেক জীবাণু থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। খুব ঠান্ডায় ফল বা সবজি রাখতে পারলে

নাম	শতকরা জলীয় পদার্থ	শতকরা ছানা-জাতীয় পদার্থ (প্রোটিন)	শতকরা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ	শতকরা খনিজ পদার্থ	শতকরা জাশ (কাইবার)	শতকরা শর্করা-জাতীয় পদার্থ (কার্বো হাইড্রেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পাকা আম	৮৬.১	০.৬	০.১	০.৩	১.১	১১.৮
কাঁচা আম	৯০.০	০.৭	০.১	০.৪	...	৮.৮
কাঁঠাল	৭৭.২	১.৯	০.১	০.৮	১.১	১৮.৯
কলা	৬১.৪	১.৩	০.২	০.৭	...	৩৬.৪
জাম	৭৮.২	০.৭	০.১	০.৪	০.৯	১৯.৭
পেয়ারা	৭৯.১	১.৫	০.২	০.৮	৬.৯	১৪.৫
আনারস	৮৬.৫	০.৬	<০.১	০.৫	০.৩	১২.০
বাতাৰি	৮৮.০	০.৬	<০.১	০.৫	০.৬	১০.২
পাকা পেঁপে	৮৯.৬	০.৫	০.১	০.৪	...	৯.৫
তরমুজ	৯৫.৭	০.১	০.২	০.২	...	৩.৮
পাতিনেবু	৮৪.৬	১.৫	০.১	০.৭	১.৩	১০.৯
টন্যাটো	৯৫.৫	১.০	০.১	০.৫	...	৩.৯
বাঁধাকপি	৯০.২	১.৮	০.১	০.৬	১.০	৬.৩
কুলকপি	৮৯.৪	৩.৫	০.৪	১.৪	...	৫.৩
পালং শাক	৯১.৭	১.৯	০.৯	১.৫	...	৪.০
গাজর	৮৬.০	০.৯	০.২	১.১	১.২	১০.৭
চালকুমড়া	৯৬.০	০.৪	০.১	০.৩	...	৩.২
আলু	৭৪.৭	১.৬	০.১	০.৬	...	২২.৯
ছোট পেঁয়াজ	৮৪.৩	১.৮	০.১	০.৬	...	১৩.২
শশা	৯৬.৪	০.৪	০.১	০.৩	...	২.৪
কনাইগুটি	৭২.১	৭.২	০.১	০.৮	...	১৯.৮
কাঁচাকলা	৮৩.২	১.৪	০.২	০.৫	...	১৪.৭
ঢেঁড়স	৮৮.০	২.২	০.২	০.৭	১.২	৭.৭
এঁচড়	৮৪.০	২.৬	০.৩	০.৯	২.৪	৯.৪

৪৫০.৬ গ্রাম=১ পাউণ্ড
১,০০,০০০ মিলিগ্রাম=১০০ গ্রাম

সবজি

পরিমাণ

২৩ নং ১৯৫১ পত্র থেকে গৃহীত

শতকরা চুন-জাতীয় পদার্থ (ক্যাল- সিয়াম)	শতকরা ফসফরাস	শতকরা লোহা	১০০ গ্রামে তাপের পরিমাণ (ক্যালরি)	খাদ্যপ্রাণ 'ক' আন্তর্জাতিক মান প্রতি ১০০ গ্রামে	খাদ্যপ্রাণ 'খ' মিলি- গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	নিকোটিনিক অ্যাসিড মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	রিবোফ্লোবিন মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	খাদ্যপ্রাণ 'গ' মিলি- গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
০.০১	০.০২	০.৩	৫০	৪,৮০০	..	০.৩	৫০	১৩
০.০১	০.০২	৪.৫	৩৯	১৫০	..	..	৩০	৩
০.০২	০.০৩	০.৫	৮৪	৫৪০	..	০.৪	..	১০
< ০.০১	০.০৫	০.৪	১৫৩	..	১৫০	০.৩	৩০	১
০.০২	০.০১	৩	..	..	..	..	..	..
০.০১	০.০৪	১.০	৬৬	..	..	০.২	৩০	২৯৯
০.০২	০.০১	০.৯	৫০	৬০	..	..	১২০	৬৩
০.০৩	০.০৩	০.১	৪৪	২০০	..	০.২	..	২০
০.০১	০.০১	০.৪	৪০	২,০২০	..	০.২	২৫	৪৬
< ০.০১	০.০১	০.২	১৭	..	..	০.২	..	১
০.০৯	০.০২	০.৩	৫৯	২৬	..	০.১	..	৬৩
রসে								
০.০১	০.০২	০.১	২১	৩২০	১২০	০.৪	৬০	৩২
০.০৩	০.০৫	০.৮	৩৩	২,০০০	১৫০	০.৪	৩০	১২৪
০.০৩	০.০৬	১.৩	৩৯	৩৮	৩৩০	০.৯	৮০	৬৬
০.০৬	০.০১	৫.০	৩২	২,৬০০	২১০	০.৫	৬০	৪৮
				থেকে ৩,৫০০				
০.০৮	০.৫৩	১.৫	৪৭	২,০০০	১৮০	০.৪	২০	৩
				থেকে ৪,৩০০				
০.০৩	০.০২	০.৫	১৫	..	৬৩	০.৪	..	১
< ০.০১	০.০৩	০.৭	৯৯	৪০	৬০১	১.২	১০	১৭
০.০৪	০.০৬	১.২	৬১	২৫	১২০	০.৫	..	..
০.০১	০.০৩	১.৫	১৪	..	৯০	০.২	৪	৭
০.০২	০.০৮	১.৫	১০৯	১৩৯	৩৬০	০.৮	১৩	৯
০.০১	০.০৩	০.৬	৬৬	৫০	৪৫	০.৩	২০	২৪
০.০৯	০.০৮	১.৫	৪১	৫৮	৬৩	..	..	১৬
০.০৩	০.০৪	১.৭	৫১	..	..	০.২	..	..

৩.৫ আউন্স = ৮.৬২ তোলা

< = কম

জীবাণু বাড়তে পারে না এবং বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। এজন্য দেখা যায়, শীতের সময় খাদ্যদ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না। বরফ দিয়ে মাছ রেখে দেওয়া হয় যাতে পচে না যায়। খুব গরমেও, যেমন ফুটন্ত জলের তাপে, জীবাণু মরে যায়। হঠাৎ গরম করে তৎক্ষণাৎ ঠান্ডা করে সংরক্ষণের নাম 'পাস্তুরাইজ' করা। দুধ এবং ফলের রস এইভাবে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু এসব উপায়ে কেবল সাময়িক সংরক্ষণই সম্ভব। বেশি দিন কোন জিনিস সংরক্ষণ করতে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। জীবাণু বা 'এনজাইম' সাধারণত বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না। ফুটন্ত জলের তাপে এরা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাদ্যদ্রব্য আক্রমণ করতে পারে না। ফল বা সবজি কোন পাত্রে রেখে গরম করে ভেতরের হাওয়া বের করে নিয়ে, ঐ গরম অবস্থাতেই পাত্রটি বন্ধ করে দিলে বাইরের জীবাণুর আক্রমণ থেকে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। ভেতরের জীবাণু বা 'এনজাইম'ও নষ্ট হয়ে যায় গরম করার সময়। সেজন্য বন্ধ পাত্রটি গরম জলের ভেতর ডুবিয়ে বা গরম বাষ্পে কিছুক্ষণ রাখতে হয়। অল্প কিছুক্ষণ ফুটন্ত জলে রেখে বন্ধ পাত্রটি বের করে নিয়ে ঠান্ডা জলে বসিয়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে নিতে হয়, কারণ বেশিক্ষণ গরম অবস্থায় থাকলে ভেতরের ফল একেবারে গলে যাবে এবং দেখতে বিপ্রী হয়ে যাবে। ফলে অম্লতা থাকার দরুন ফুটন্ত জলের তাপই জীবাণু নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সবজিতে এই অম্লতা থাকে না বলেই বেশি তাপের প্রয়োজন হয় জীবাণু দূর করার জন্য। এইভাবে সংরক্ষণকে বলা হয় 'শূন্য' করে তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা। টিনের কোটাতে যে ফল বা সবজি পাওয়া যায় তা এভাবে সংরক্ষিত হয়।

জল বা জলীয় পদার্থ এই সব জীবাণু বা 'এন-জাইম' বাড়তে সাহায্য করে। কোনও উপায়ে এই জল বা জলীয় পদার্থ সরিয়ে নিতে পারলে জীবাণু

মরে যায় এবং তাদের বংশবৃদ্ধিও বন্ধ হয়। এরকম শূন্যকিয়ে সংরক্ষণ আমাদের দেশে বহুল-প্রচলিত এবং পুরাকাল থেকে চলে আসছে। আমচুর, আমসি, আমের গোলা, আমসত্ত্ব, শূন্যকো সবজি, শূন্যকি মাছ প্রভৃতি উদাহরণ।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণপ্রণালী অবশ্য আধুনিক। তবে কতকগুলি জিনিসের সংরক্ষণের নিয়ম প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে বর্তমান আছে। নুন এবং সিরকা (ভিনিগার) বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মোরস্বা, আরক এবং চার্টনিকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ চিনি অথবা ১৫ ভাগ নুন যে-কোন জিনিসে থাকলে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। সেজন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জ্যাম, জেলি বা মোরস্বা তৈরি করার সময় চিনির ভাগটি যেন বেশ বেশি থাকে এবং জারক তৈরি করার সময় নুনের ভাগটাও যেন ঠিক থাকে। সিরকার ভিতর 'অ্যাসেটিক অ্যাসিড' শতকরা ৪ ভাগ থাকে এবং তৈরি জিনিসে শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ এই অ্যাসিড থাকলে পচন নিরোধ করতে পারে। আরও দু'টি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা সংরক্ষণ আইনের আওতায় পড়ে এবং শরীরের কোনও প্রকার অনিষ্ট করে না। এই রাসায়নিক পদার্থ দু'টি হচ্ছে 'পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট' এবং 'সোডিয়াম বেনজোয়েট'। এই দু'টি পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণে লাগে এবং বহুদিন সংরক্ষণের সহায়তা করে। অম্লতার সংস্পর্শে এসে প্রতিক্রিয়া হয়ে 'পটাসিয়াম মেটাবাই-সালফাইট' ভেঙে "সালফার ডাই-অক্সাইড" আর 'সোডিয়াম বেনজোয়েট' ভেঙে 'বেনজোয়িক অ্যাসিড' হয় এবং এরাই জীবাণু বা 'এনজাইম' ধ্বংস করে। সালফার ডাই-অক্সাইড উবে চলে যেতে পারে বলে এর দ্বারা সংরক্ষিত দ্রব্য ভাল করে আটকে রাখতে হয়। সাধারণত স্কোয়াশ, করভিয়েল এবং ফলের রস পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু যেসব জিনিসের রঙ থাকে, যেমন

টম্যাটোর চাৰ্টনি ইত্যাদি, সেসব জিনিস এই ৰাসায়নিক দ্বাৰা সংৰক্ষণ কৰতে গৈলে ৰঙ ফিকে হয়ৈ যায়। কাজেই এসব ক্ষেত্ৰে সোডিয়াম বেন-জোয়েট এবং সিরকা ব্যবহার করা হয় সংৰক্ষণের জন্য।

সংৰক্ষণ-প্ৰণালী অবলম্বনের গোড়ার কথা

প্ৰথমেই আমাদেৱ দেখতে হবে যেন খুব তাড়া-তাড়ি বাগান থেকে সুস্থ এবং ভাল ফল বা সবজি সংগৃহীত হয় এবং সংৰক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতার উপৰ বিশেষ দৃষ্টি ৰাখতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে জীবাণুৰ সংখ্যা কমে যায় ও তাদের আক্ৰমণের তীব্রতা হ্রাস পায়। ব্যবহৃত যন্ত্ৰপাতি প্ৰতিদিন ভাল কৰে ধুয়ে ৰাখতে হবে। সংৰক্ষণের জন্য যেসব ফল বা সবজি নেওয়া হয়েছে, সেসবও বেশ পৰিষ্কাৰ কৰে ধুয়ে নিতে হবে। ধুয়ে না ৰাখলে যন্ত্ৰপাতিৰ মধ্যে ফলের রস বা টুকরা লেগে থাকতে পারে, যা পচে গিয়ে জীবাণুৰ খাদ্য হবে এবং তাদের বংশ-বৃদ্ধিৰ সহায়তা কৰবে।

এমন পাত্ৰ ব্যবহার কৰতে হবে যার সম্পর্শে ফলের অম্লতা বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যে কোনরকম প্ৰতিক্ৰিয়া না ঘটে। বিশেষ কৰে কাঁসার এবং পিতলের বাসন একেবারে পৰিহাৰ কৰতে হবে। এনা-মেলের এবং 'স্টেনলেস স্টীল'-এর পাত্ৰ সবচেয়ে ভাল। কাঠের বা পাথরের পাত্ৰও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাইৰেক্স কাচের পাত্ৰও বিশেষ উপযোগী। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্ৰও ব্যবহার করা যেতে পারে।

টিনের কৌটায় সংৰক্ষণ

সংৰক্ষণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ কৰতে হ'লে প্ৰথমেই দেখতে হবে ফল বা সবজি যেন নীৰোগ, তাজা এবং পুষ্ট হয়, কোথাও পচা বা পোকাকার দ্বাৰা আক্ৰান্ত না হয়ে থাকে। এর পর দেখতে হবে ফলগুদো যেন পকতায়, আকারে ও

ওজনে প্ৰায় সমান হয়। সবজিৰ বেলাতেও এই সমতার দিকে লক্ষ্য ৰাখতে হবে। এ ব্যবস্থা অবলম্বন কৰলে টিন খোলাৰ পর সবজি বা ফল-গুদো দেখতে ভাল দেখায়—অসমান এবং অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু। গৰম চিনিৰ রস (ফলের টিনে) এবং গৰম নুন-জল (সবজিৰ টিনে) সাধাৰণত ব্যবহার করা হয়। খুব গৰম অবস্থায় টিনেৰ মূখ যন্ত্ৰেৰ সাহায্যে ভাল কৰে বন্ধ কৰে যত শীঘ্ৰ সম্ভব গৰম জলে ফোটাতে হবে।

সংৰক্ষণের জন্য বিভিন্ন ৰকমের টিনেৰ কৌটা পাওয়া যায়। এই ধরনের টিনেৰ কৌটা পৰিষ্কাৰ কৰে ধুয়ে সমান ওজনের সমপৰু ফল একই ৰকম-ভাবে কেটে সাজাতে হবে সুন্দৰভাবে এবং দেখতে হবে যেন চাপ লেগে নিচের টুকরোগুদো ভেঙে না যায়। সবজিৰ বেলাতেও এমনিভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন কৰতে হবে। ফল বা সবজি এমনিভাবে ভৰ্তি কৰতে হবে যেন উপরে ঠু ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকে, কাৰণ টিন বন্ধ কৰাৰ সময় ঢাকনাৰ চাপে উপরের ফল বা সবজি নষ্ট হ'তে পারে এবং গৰম কৰাৰ সময় ভিতরের জিনিস বেড়ে ঢাকনাৰ গায়ে খুব চাপ দিতে পারে।

আমের মত বড় ফল খোসা ছাড়িয়ে লম্বা কৰে কেটে বোঁটার দিক থেকে নিচের দিকে মাঝখান থেকে আঁটি বাদ দিয়ে টিনেৰ মধ্যে লম্বালম্বি সাজাতে হয়। ছোট ফল আন্ত এবং বড় ফল বিচি বাদ দিয়ে ভৰ্তি কৰতে হয়। আনারসেৰ খোসা মোটা কৰে কেটে বাদ দিয়ে, গোল গোল চাকার মত কেটে ভিতরের শক্ত অংশ ফুটো কৰে বাদ দিয়ে টিনেৰ ভিতরে ভৰ্তি কৰতে হয়। সবজিৰ বেলাতেও এমনিভাবে সাজাতে হবে যেন দেখতে সুন্দৰ হয়।

টিনেৰ ভিতৰ ফল বা সবজি ভৰ্তি করা হ'লে ফলের টিনে চিনিৰ রস (আধ সের জলে চাৰ ছটাক চিনি) এবং নুনের জল সবজিৰ টিনে (এক সের জলে তিন ছটাক নুন) ভাল কৰে ফুটিয়ে ঢালতে হবে এবং টিনেৰ মূখের কাছে ঠু ইঞ্চি ফাঁকা ৰাখতে

হবে। এর পর ফল বা সবজির টিনগুলো একটি বড় পাত্রে বসিয়ে এমনভাবে পাত্রে জল দিতে হবে যেন টিনগুলো অর্ধেক ডুবে যায়। এর পর এই জল ফোটাতে হবে এবং যখন টিনের ভিতরের রস বা নুন-জল গরম হয়ে বাষ্পাকারে বের হতে থাকবে তখন তাড়াতাড়ি যন্ত্রের (ডাব্ল সীমিং মেশিন) সাহায্যে টিনের মুখে ঢাকনা বসিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এর পর একটি বড় পাত্রে জল ভর্তি করে বন্ধ-করা টিনগুলো তাতে ডুবিয়ে রেখে ফোটাতে হবে। টিনের ভিতরের ফল যদি নরম থাকে তবে অল্প সময় এবং ফল যদি শক্ত হয় তবে বেশি সময় এই ফোটানো জলে রাখতে হবে। এইভাবে গরম করার ফলে টিনের ভিতরের জিনিসও গরম হবে এবং যদি কোনও জীবাণু থাকে তা মরে যাবে। সবজিতে অম্লতা নেই বলে বেশি তাপ এবং সময় দরকার হয় এই জীবাণুমুক্ত করার জন্য। এই বেশি গরম অবস্থায় রাখলে ভিতরের ফল বা সবজি গলে গিয়ে বিগ্ৰী হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়টুকু রেখে টিনগুলো তাড়াতাড়ি বের করে ঠান্ডা জলে বসিয়ে রাখতে হবে এবং বার বার ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল করে টিনগুলো মুছে শুকনো ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়।

ঠিকভাবে টিন বন্ধ করতে না পারলে কিংবা ভাল করে মুছে না রাখলে টিনে মরচে ধরে ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ফুটো দিয়ে হাওয়া ঢুকে ভেতরের জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সাধারণত বাঙলাদেশের আমের মধ্যে কেবল ফজলি এবং ল্যাংড়া আমই টিনে সংরক্ষণ করা সম্ভব; কারণ অন্য যে-কোনও আমই টিনের ভিতর গরম জলে ফোটার সময় গলে যায়। আমের টিন ১০ থেকে ১৫ মিনিট; আনারস ২০ থেকে ২৫ মিনিট এবং টম্যাটো ৩০ থেকে ৫০ মিনিট ফুটন্ত জলে রাখতে হয়।

বোতলে সংরক্ষণ

বিশেষ ধরনের বড় মুখওয়ালা বোতল পাওয়া যায় যা সংরক্ষণের পাত্র হিসাবে ঠিক টিনের

কোটারই মত। এই বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে তাতে ফল বা সবজি ঠিক টিনের কোটার ভিতর যেভাবে সাজানো হয় সেইভাবে সাজিয়ে নিয়ে তাতে গরম চিনির রস বা নুনের জল ঢেলে ঠিক টিনের কোটার মত গরম জলে বসিয়ে গরম করতে হয়। যখন ভিতর থেকে বাষ্প বেরোবে তখন বোতলের মুখ ভাল করে বিশেষ ঢাকনার সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। ঢাকনার ভেতর দিকে একটা রবারের চাকতি থাকে। এই চাকতি এমনভাবে বোতলের মুখে এঁটে যায় যে, বাইরের হাওয়া বা অন্য কিছুই আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না কিংবা ভিতরের কোনও জিনিস বাইরে আসতে পারে না। এর পর ঠিক টিনের কোটা যেভাবে ফোটাতে হয় ঠিক তেমনিভাবে বোতলগুলো জলের ভিতর ডুবিয়ে ফোটাতে হয়। বোতলগুলো মুছে শুকিয়ে নিয়ে ঠান্ডা শুকনো জায়গায় রাখতে হয়।

ফলের বা সবজির রস সংরক্ষণ করা হয় সরু মুখ বোতলে এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে। টিনে বা বোতলে সাধারণত এসব জিনিস সংরক্ষণ করা হয় না। ফলের রস, সবজির রস এবং সিরাপ, পটা-সিয়াম, মেটাবাইসালফাইড দ্বারা সংরক্ষিত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড উবে যায় বলে সর্বদাই ঠান্ডা রসে ভিজিয়ে ভাল করে ছাঁপি বন্ধ করে বোতলে রাখতে হয় এই রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা সংরক্ষিত রস। সালফার ডাই-অক্সাইড জীবাণু ধ্বংস করে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে। সবজির রসে অম্লতা নেই বলে তার সঙ্গে অম্ল-রস, যেমন—লেবুর রস, সাইট্রিক বা টারটারিক অ্যাসিড অথবা সিরকা মেশাতে হয়। সোডিয়াম বেনজোয়েটও সংরক্ষণে সাহায্য করে। এখানে বেনজোয়িক অ্যাসিড জীবাণু ধ্বংস করে। সিরকার ব্যবহার সংরক্ষণে বহুল প্রচলিত এবং প্রাচীন। আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ আইন কেবলমাত্র উপরি-উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলিরই ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

জ্যাম, জেলি বা মারম্যালেড তৈরি

জ্যাম এবং জেলির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জ্যামের মধ্যে ফলের যে-কোন অংশ থাকতে পারে, এমনকি ফলের বিচি পর্যন্ত; কিন্তু জেলি কেবলমাত্র ফলের রস দিয়ে তৈরি হয় এবং ফলের অন্য কোনও অংশ এতে থাকে না। মারম্যালেড এ দু'টোর মাঝামাঝি এবং কেবল লেবু-জাতীয় ফল থেকে তৈরি হয়। মারম্যালেড ঠিক জেলির মতই কিন্তু এতে কমলালেবুর খোসা ছোট ছোট করে কাটা থাকে এবং স্বাদেও একটু তিক্তভাবাপন্ন।

জ্যাম, জেলি এবং মারম্যালেড তৈরি করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে ফলগুলো যেন তাজা এবং পুষ্ট হয়। পরিপক্ব ফলের সঙ্গে কিছু অর্ধ-পক্ব ফল মিশিয়ে নেওয়া ভাল, কারণ অধিক পক্ব ফলে পেক্টিন কম থাকে বলে জ্যাম, জেলি বা মারম্যালেড জমানো মদুশকিল হয়। ভাল জ্যাম, জেলি এবং মারম্যালেড-এর বিশেষত্ব এই যে, তা পরিষ্কার এবং দেখতে সুন্দর হবে, তার রঙও সুন্দর হবে, তাতে ফলের বিশেষ গন্ধ হবে, জিনিসটা ভাল করে জমবে অথচ আঠালো বা শক্ত হবে না, যাতে মাখবার সময় কষ্ট হয় এবং অনেকদিন রাখা সম্ভব হবে।

জ্যাম

ফল ধুয়ে নিয়ে, বড় ফলের খোসা ছাড়িয়ে বিচি বাদ দিয়ে ফল ছোট করে কেটে নিতে হয়। ছোট ফলের খোসা বা বিচি বাদ দিতে হয় না। শক্ত ফল হলে সামান্য জলে সিদ্ধ করে নরম করে নিয়ে সবটাই থেঁতলে দিতে হয়। যে ফলে জলীয় অংশ বেশি তাতে আর জল না দেওয়াই ভাল। সিদ্ধ হবার পর যখন বেশ নরম হয়ে যায় তখন থেঁতলে একটা মণ্ডের মত করে চিনি দিতে হয়। আগে চিনি দেওয়া একেবারেই উচিত নয়, তাতে ফল শক্ত হয়ে যায় এবং ফলের টুকরো বড় থেকে যায়। ফল সিদ্ধ হবার পর ওজন করে নিয়ে চিনির পরিমাণ ঠিক করতে হয়। প্রতি সের ফলের

সঙ্গে চা-চামচের এক চামচ সাইট্রিক অ্যাসিড এবং তিন পোয়া চিনি মেলাতে হবে। বেশি টক ফলের সঙ্গে আরও কম অ্যাসিড এবং বেশি চিনি মেশানো দরকার। এক সের সিদ্ধ ফলের জন্য এক সের চিনির বেশি দরকার হয় না। অ্যাসিড মেশাতে হবে যখন জ্যাম তৈরি করা প্রায় শেষ হয়ে আসবে তখন। যখন বেশ থকথকে হয়ে আসবে তখন উনুন থেকে নাবিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে বড় মদুখওয়ালা বোতলে ভরে রাখতে হবে। ৫ সের ফল এবং ৪ সের চিনি দেওয়া হলে (৪×৫÷৩) প্রায় ৬ সের ২½ পোয়া ওজনের জ্যাম হবে। ওজন করেও বোঝা যেতে পারে। তখন এই জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে এবং উনুন থেকে নামানো দরকার। তার মানে জ্যামে শতকরা ৬০ ভাগ চিনি থাকা চাই। বোতলে ঢালার পর জ্যাম ঠান্ডা হলে বোতলের মুখে জ্যামের উপর গোল করে পাতলা কাগজ কেটে বসিয়ে দিয়ে তার উপর গলিয়ে ঢেলে দিতে হয়। এর পর ভাল করে ঢাকনা এঁটে ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হয়। ব্যবহারের আগে ঢাকনা খোলার পর আস্তে কাগজ সমেত মোম বের করে নিতে হয়। ব্যবহার করতে আরম্ভ করার পর প্রতিবারই মদুখ ভাল করে বন্ধ করে এঁটে রাখা উচিত।

আমের জ্যাম

আম ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে গোলা বের করে নিতে হবে। এর পরে এই আমের গোলা পাতলা কাপড়ে বা বাঁশের চালুনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে আঁশগুলো বাদ দিতে হবে। এই ছাঁকা গোলার ওজন নিয়ে তাতে নিয়মমত চিনি এবং অ্যাসিড দিয়ে ফোটাতে হবে এবং শেষে ওজন করে নামাতে হবে। বেশি টক আম হলে খুব কম অ্যাসিড দিতে হয়।

জামের জ্যাম

জাম ভাল করে বেশ তাড়াতাড়ি ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিতে হয়; কারণ বেশিক্ষণ জলে রাখলে রঙ

এবং রস দুই-ই নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। এর পর হাত ভাল করে ধুয়ে নিয়ে ফলগুলো চটকে নিয়ে বিচিগুলো বাদ দিতে হবে। এর পর ফলের অংশ ভাল করে থেঁতলে নিয়ে ওজন করতে হবে। ওজন অনুযায়ী চিনি এবং অ্যাসিড দিয়ে ফোটাতে হবে। তৈরি হয়ে যাওয়ার আগে ওজন নিয়ে বোঝা যাবে কখন ফোটানো দরকার। এমনতেও বোঝা যায় যখন বেশ থকথকে হয় তখন উন্নতের উপর থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে বোতলে ভর্তি করে ঠিক যেমন বলা হয়েছে তেমনিভাবে রেখে দিতে হবে। অ্যাসিড উন্নত থেকে নামাবার একটু আগে মেশানো ভাল।

পেয়ারার জ্যাম

পেয়ারা ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে বা না ছাড়িয়ে খুব ছোট করে কেটে অল্প জলে সিদ্ধ করে বেশ যখন নরম হবে, তখন থেঁতলে নিয়ে একটা মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে রসটা আলাদা রাখতে হবে, পরে জেলি তৈরি করার জন্য সিদ্ধ করার সময় একটু সাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। কারণ এতে পেষ্টিন ভালভাবে ফল থেকে বের হয়ে আসবে এবং পরে জেলি জমাতে সাহায্য করবে। এর পর পেয়ারার মণ্ডটা আটা চালুনি বা বাঁশের চালুনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে বিচিগুলো বাদ দিতে হবে। ছাড়ানো এই মণ্ডটা ওজন করে নিয়ে পরিমাণমত চিনি এবং বাকি অ্যাসিডটা দিয়ে জ্যাম তৈরি করে দেখে দিতে হবে।

ন্যাসপাতি বা আপেলের জ্যাম

এই ফলগুলো ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে বোটার দিক থেকে নিচের দিকে অর্ধেক করে কেটে নিয়ে ভিতরের এবং শক্ত অংশটি বাদ দিয়ে ছোট করে কাটতে হবে। আপেলের খোসা এবং ভিতরের শক্ত অংশটা আলাদা করে রেখে দিয়ে তা থেকে জেলি করা যেতে পারে।

ন্যাসপাতির বেলা সেটা সম্ভব নয়, কারণ এই ফলে পেষ্টিন কম থাকে বলে জেলি জমে না।

ছোট ফলের টুকরোগুলো অল্প জলে সিদ্ধ করে যখন বেশ নরম হবে তখন থেঁতলে নিয়ে ওজন করে পরিমাণমত চিনি এবং অ্যাসিড দিয়ে ফোটাতে হবে। তারপর ওজন নিয়ে উন্নত থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে, বোতলে ভর্তি করে যেমনভাবে রাখতে হয়, রেখে দিতে হবে। চিনি সবদাই ফল থেঁতলে দেওয়ার পর দেওয়া উচিত, কারণ আগে চিনি দিলে ফলের টুকরোগুলো শক্ত হয়ে যায়, পরে আর তা নরম করা যায় না এবং জেলিতে ফলের টুকরো থেকে যাওয়ায় দেখতে বিস্ত্রী হয়।

জেলি

সব রকমের ফল থেকে জেলি তৈরি করা সম্ভব নয়, কারণ পেষ্টিন কোনও ফলে বেশি থাকে আবার কোনও ফলে খুবই কম থাকে। যেসব ফলে পেষ্টিন বেশি থাকে সেসব ফল থেকে জেলি তৈরি করা সম্ভব এজন্য যে, জেলি ভালভাবে জমানো যায়। যেসব ফলে পেষ্টিন কম থাকে যদি বাইরে থেকে আলাদা পেষ্টিন মেশানো যায় তা হলেই তা দিয়ে জেলি তৈরি করা সম্ভব। এতে খরচ বেশি পড়ে যায়। জেলি কেবলমাত্র রস থেকেই হয় এবং এতে ফলের অন্য কোনও অংশ থাকবে না। রস যতটা সম্ভব পরিষ্কার হওয়া উচিত, কারণ ভাল জেলি খুব পরিষ্কার হতে হবে এবং জমবে ভালভাবে। আঠালো জেলি বা শক্ত জেলি ভাল নয়, কারণ তা মাথাতে অসুবিধা হয়। ফল টাটকা হওয়া চাই এবং বেশি পাকা ফল বাদ দিতে হবে।

ফল ভাল করে ধুয়ে কেটে নিয়ে জলে ৪ থেকে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করতে হবে। রসাল ফলে কম জল লাগবে, কিন্তু যে ফলের রস কম তাতে এমনভাবে জল দিতে হবে যেন ফলের টুকরোগুলো ঢাকা পড়ে। খুব বেশি জল দেওয়া উচিত নয়। সিদ্ধ করার সময় একটু অ্যাসিড দিয়ে ফল ভেঙে দিতে হবে, তা হলে অম্লতার দরুন পেষ্টিন ভালভাবে আহরিত হবে। যে ফল এমনিতেই খুব টক তাতে অ্যাসিড না দিলেও হয়। ৫ সের ফলে চা-চামচের

আধ চামচ অ্যাসিড দিলেই যথেষ্ট। সিম্ধ হবার পর এই রস একটি মোটা কাপড়ে ছাঁকতে হবে এবং আপনা থেকেই যে রসটা বের হয়ে আসবে সেটাই নিতে হবে। চাপ দিয়ে কোনও রস বের করা উচিত নয়, কারণ তাতে ঘোলাটে অপরিষ্কার রস বের হবে এবং জেলি দেখতে খারাপ হবে। বিকালে সিম্ধ ক'রে কাপড়ে বেঁধে রাখলে সারারাত ধ'রে বেশ পরিষ্কার রসটা বের হয়ে আসে। যে ফলে বেশি পেষ্টিন আছে (যেমন আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি) সেই ফলের মণ্ডটা দ্বিতীয়বার সিম্ধ ক'রে আর একবার রস বের ক'রে নিয়ে, দু'বারের রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। জেলি ভালভাবে জমাতে হ'লে পেষ্টিন, অ্যাসিড এবং চিনির পরিমাণ ঠিক হওয়া চাই। এর কোনও একটি কম বা বেশি হ'লে জেলি নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমবে না।

রসের মধ্যে পেষ্টিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কতটা চিনি দিতে হবে। যদি রসটা মনে হয় বেশ ঘন, তবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, এই রসে পেষ্টিন যথেষ্ট আছে। সবচেয়ে সহজ অথচ ভাল পরীক্ষা হচ্ছে ই থেকে ১ ঘণ্টা সিম্ধ হওয়ার পর এক চামচ রস আলাদা তুলে ঠান্ডা ক'রে একটি কাঁচের গেলাসে বা পেয়ালায় নিয়ে, তার ভিতর তিন চামচ মের্সিলেটেড স্পিরিট ঢেলে দিলে দেখা যাবে একটা থকথকে জিনিস (যদি তালগোলায় মত) আলাদা হয়ে যাবে স্পিরিট থেকে। যদি এই থকথকে জিনিসটা বেশ ভাল জমাটভাব নেয় তবে বোঝা যাবে যে, বেশ পেষ্টিন আছে এবং প্রতি পাঁচ পোয়া রসে এক সের চিনি দিতে হবে জেলি তৈরির জন্য। কিন্তু যদি এই জিনিসটা ভাল জমাটভাব না নিয়ে ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায় তবে পেষ্টিনের পরিমাণ কম আছে বুঝতে হবে এবং পাঁচ পোয়া রসে তিন পোয়া অথবা তার একটু কম চিনি দেওয়া উচিত। রসটা যখন বেশ ফুটতে আরম্ভ করবে তখন তাতে আস্তে আস্তে চিনি ঢেলে দিয়ে বেশ ভাল ক'রে গলিয়ে নিতে হবে। এরপর এতে একটু সাইট্রিক অ্যাসিড

দিয়ে ফোটাতে হবে। এক সের রসে চা-চামচের আধ চামচে হিসেবে দিলেই চলবে। খুব তাড়া-তাড়ি ফোটাতে হবে এবং গাদ সরিয়ে ফেলতে হবে। বেশিক্ষণ ফোটাতে গেলে পেষ্টিন নষ্ট হয়ে যায় এবং চিনিও ধ'রে যেতে পারে, ফলে জেলি আর জমানো সম্ভব হবে না। যতক্ষণ না চামচে ক'রে ফুটন্ত রস তুলে একটু ঠান্ডা ক'রে ঢালতে গেলে চাপ বেঁধে আসবে এবং ফোঁটা ফোঁটা পড়বে না, ততক্ষণ অবধি রসটাকে অ্যাসিড এবং চিনি দিয়ে ফোটাতে হবে। আর একটা উপায় হচ্ছে তাপমাত্রা দিয়ে তাপ দেখে, ২২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হ'লেই ফোটানো বন্ধ ক'রে দিতে হবে। একটু ঠান্ডা ক'রে জ্যামের মত মোম দিয়ে বন্ধ ক'রে ঢাকনা এংটে ঠান্ডা শুকনো জালগায় রেখে দিতে হবে।

আপেলের জেলি

আপেল ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে একটু পুরু ক'রে খোসা ছাড়াতে হবে যাতে একটু ফলের অংশ থাকে খোসার সঙ্গে। এর পর ফলটা কেটে নিয়ে ভিতরের শক্ত অংশটাও খোসার সঙ্গে নিয়ে, সামান্য সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে (চা-চামচের ছয় ভাগের এক ভাগ প্রতি সের খোসা এবং শক্ত অংশের জন্যে) পরিমাণমত জলে সিম্ধ বসাতে হবে। প্রতি সের খোসার জন্যে দেড় সের জল নিলেই যথেষ্ট। ১ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা সিম্ধ করার পর একটি মোটা কাপড়ের সাহায্যে রসটা ছেঁকে নিতে হবে। আপনা থেকেই যতটা রস ছেঁকে বেরিয়ে আসে সেটাই নিতে হবে। কখনই চেপে রস বের করা উচিত নয়, কারণ এতে ঘোলাটে রস বের হবে এবং ফলে জেলি পরিষ্কার না হয়ে ঘোলাটে আর বিস্ত্রী দেখাবে। এর পর পেষ্টিনের পরিমাণ দেখে নিয়ে রসটা ওজন ক'রে, পরিমাণমত চিনি এবং আরও সামান্য অ্যাসিড (প্রতি সের রসে চা-চামচের ই চামচ) দিয়ে ফোটাতে হবে এবং যখন একটু ঠান্ডা ক'রে চামচে থেকে ঢালতে গেলে চাপ বেঁধে যাবে

তখন উনুন থেকে নামিয়ে, জেলি একটু ঠান্ডা ক'রে নিয়ে বোতলে ঢেলে, উপরে মুখের কাছ থেকে গাদটা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মোম দিয়ে এ'টে ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হবে।

পেয়ারার জেলি

পেয়ারার বোঁটার দিকটা এবং নিচের শুকনো ফুলের দিকটা বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো ক'রে বা গোল গোল চাকার মত ক'রে কেটে একটু অ্যাসিড এবং সামান্য জলে সিদ্ধ বসাতে হবে। (জলের পরিমাণ এবং অ্যাসিড আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনি দিতে হবে) জেলি তৈরি করতে অনেকেই লেবুর রস ব্যবহার ক'রে থাকেন কিন্তু এতে ফলের নিজস্ব বিশেষ গন্ধের সঙ্গে লেবুর গন্ধ মিশে কেমন যেন একটা আলাদা গন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া, লেবুর রস অনেকটা দিতে হয় কিন্তু তার পরিবর্তে সাইট্রিক অ্যাসিড অনেক কম পরিমাণ দিলেই চলে; তাতে খরচও কম পড়ে আর পেয়ারার গন্ধও বজায় থাকে। রস ছেঁকে নিয়ে ঠিক আগের মত পেষ্টিনের পরিমাণ দেখে চিনির পরিমাণ ঠিক ক'রে সামান্য অ্যাসিড (আগে যেমন বলা হয়েছে) দিয়ে জেলি তৈরি করতে হবে। রস যখন বেশ চাপ বেঁধে উঠবে তখন ফোটানো বন্ধ ক'রে উনুন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা ক'রে, আগে যেমন বলা হয়েছে সেভাবে বোতলে রেখে দিতে হবে।

— গারম্যালোড

এর এবং জেলির প্রস্তুতপ্রণালী ঠিক একই রকম। কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে, প্রতি ৫টি কমলালেবু পিছু একটি ক'রে গোঁড়ালেবু পাতলা ক'রে খোসা ছাড়িয়ে কেটে একসঙ্গে সিদ্ধ করতে হবে। এতে অ্যাসিড দেবার প্রয়োজন হয় না, ৪ থেকে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ হবার পর পেষ্টিনের পরিমাণ দেখে নিয়ে, চিনির পরিমাণ ঠিক করতে হবে। সাধারণত এতে পেষ্টিন ভাল পরিমাণেই থাকে। কমলালেবুর খোসা সরু সরু লম্বা ক'রে কেটে

সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিতে হবে এবং ভাল ক'রে ধুয়ে নিতে হবে। এতে লেবুর খোসার তিক্ততা ক'মে যাবে এবং খোসা নরম হবে। সিদ্ধ কমলালেবু এবং গোঁড়ালেবুর রসটা ভাল ক'রে ছেঁকে নিয়ে পরিমাণমত চিনি দিয়ে ফোটাতে হবে। সিদ্ধ করা কাটা কমলালেবুর খোসা একটা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরোতে ফুটন্ত চিনিমেশানো রসে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। চিনির রসটা আস্তে আস্তে খোসার ভিতর ঢুকবে এবং মিষ্টি হবে। যখন ফোটানো প্রায় শেষ হয়ে আসবে এবং রসটা বেশ চাপ বেঁধে আসবে, তখন ৫ মিনিট ঠান্ডা ক'রে বোতলে ঢেলে তার উপর খোসাগুলো ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে খোসা ছেড়ে দিলে বোতলের ভিতর বেশ সমানভাবে এই খোসার টুকরোগুলো ছড়িয়ে থাকবে। যদি রসের সঙ্গে মিশিয়ে খোসা বোতলে ছাড়া হয় তবে বেশির ভাগ খোসার টুকরো উপরে ভেসে উঠে এবং বোতলের মুখের কাছে জড়ো হয়। একটু ঠান্ডা হ'লে, যেমন আগে বলা হয়েছে তেমনিভাবে কাগজ কেটে জাম দিয়ে বন্ধ করতে হবে এবং শুকনো এবং ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। প্রতি দু'সের রসের জন্য আধপোয়া খোসার টুকরোই যথেষ্ট।

স্কোয়াশ

সুস্থ সুপক্ক ফল ভাল ক'রে ধুয়ে, তা থেকে রস বের ক'রে নিয়ে, তার সঙ্গে চিনির রস ভাল ক'রে মিশিয়ে স্কোয়াশ তৈরি করা হয়। যে ফলের রসে অম্লতা কম তাতে একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে অম্লভাব এনে স্কোয়াশকে সুস্বাদু করা হয়। স্কোয়াশ তৈরি করতে ফলের রস কখনই ফোটাতে হয় না। চিনির রস আলাদাভাবে ফুটিয়ে নিয়ে, ময়লা পরিষ্কার ক'রে ঠান্ডা করতে হয়। ঠান্ডা চিনির রস পরে ফলের রসের সঙ্গে ভাল ক'রে মেশাতে হয়। স্কোয়াশ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়। ঘন রস হ'লে সাধারণত সমান ভাগে ফলের রস, চিনি এবং জল দিতে হয়। যদি ১ সের ফলের রস হয়, তবে ১ সের চিনি ও ১ সের

জল মিলিয়ে চিনির রস তৈরি ক'রে ফলের রসের সঙ্গে মেশাতে হবে। আমের স্কেয়াশে এই পরিমাণমত রস, চিনি এবং জল মেশাতে হয়। অ্যাসিড প্রতি ৩ সের স্কেয়াশে আধ চা-চামচে দিলেই ভাল। কিন্তু কমলালেবু বা পাতিলেবুর স্কেয়াশ তৈরি করার সময়, রসটা পাতলা ব'লে, আরও ঘন চিনির রস দিতে হয়। এতে প্রতি সের ফলের রসে আধ-সের জল এবং ১৫ থেকে ২ সের চিনি লাগে। পাতিলেবুর স্কেয়াশে আর অ্যাসিড দিতে হয় না, কিন্তু কমলালেবুর রসে সামান্য অ্যাসিড দিলে স্বাদ ভাল হয়। প্রতি তিনসের রসে চা-চামচের চার ভাগের এক ভাগ দিলেই যথেষ্ট। যে রাসায়নিক দ্রব্যটি স্কেয়াশের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়, তার নাম পটার্সিয়াম মেটাবাইসালফাইট। ফল সংরক্ষণ আইনানুসারে এই রাসায়নিক দ্রব্যটির ৩৬০ ভাগ ১০ লক্ষ ভাগ স্কেয়াশে দেওয়া সম্ভব। এতে এক আউন্স পটার্সিয়াম মেটাবাইসালফাইট প্রতি ১০০ পাউন্ড স্কেয়াশে মেশানো চলে। প্রতি ১০ পাউন্ড স্কেয়াশে আধ চা-চামচে দেওয়া যেতে পারে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি ঠান্ডা স্কেয়াশে ভাল ক'রে তাড়াতাড়ি মিশিয়ে বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি বোতলে ঢেলে ছিপি আঁটতে হয় এইজন্য যে, অম্লতার সংস্পর্শে আসবার পর এই দ্রব্যটি ভেঙে সালফার ডাই-অক্সাইড হয়ে উবে যেতে পারে। গরম স্কেয়াশে এই দ্রব্যটি মেশালেও এই একই ব্যাপার ঘটবে। সালফার ডাই-অক্সাইড সংরক্ষণে সাহায্য করে। এটা যাতে উবে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে সব সময় ভাল ক'রে ছিপি এঁটে রাখা উচিত, নতুবা স্কেয়াশ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

আমের স্কেয়াশ

বেশ পাকা দেশী আম ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে বোঁটার দিকটা বাদ দিয়ে খোসা ছাড়াতে হবে। এর পর ভাল ক'রে হাত ধুয়ে নিয়ে যতটা সম্ভব গোলা

বের ক'রে নিয়ে বাঁশের চালদুনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে আঁশ বাদ দিতে হবে। আঁশমুক্ত আমের গোলা ওজন ক'রে, ঠিক সমান ওজনের চিনি এবং জল মিশিয়ে চিনির রস তৈরি ক'রে গোলার সঙ্গে মেলাতে হবে। আমের গোলার ওজন যদি ১ সের হয়, তবে ১ সের জলে ১ সের চিনি মিশিয়ে ফোটাতে হবে এবং গাদ সিরিয়ে ময়লা কেটে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর চিনির রসটা ঠান্ডা ক'রে আমের গোলার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশাতে হবে। প্রতি তিন সের স্কেয়াশে আধ চা-চামচে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ভালভাবে গুঁড়ো করা পটার্সিয়াম মেটাবাইসালফাইট চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ মেশাতে হবে। অল্প একটু স্কেয়াশ নিয়ে তাতে অ্যাসিড এবং এই রাসায়নিক দ্রব্যটি তাড়াতাড়ি গুলে নিয়ে সমস্তটা স্কেয়াশ ভাল ক'রে ঠান্ডা ক'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি খুব ভাল ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে। এর পর বোতলে তাড়াতাড়ি ঢেলে ছিপি এঁটে ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হবে। সালফার ডাই-অক্সাইড স্কেয়াশকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং পচন রোধ করতে সহায়তা করে। রাসায়নিক দ্রব্যটি মেশানোর পর বেশিক্ষণ খোলা রাখলে তার সব উবে যাবে। গরম স্কেয়াশেও এ দ্রব্যটি মেশানো ঠিক একই কারণে উচিত নয়।

কমলালেবু, পাতিলেবু ও আনারসের স্কেয়াশ

কমলালেবু, পাতিলেবু ও আনারসের স্কেয়াশের প্রস্তুত-প্রণালী একই রকমের। কমলা বা পাতিলেবুর কোয়ার ভিতর যে রসভরা ছোট ছোট সরু সরু রসথলে বা রসদাঁড়া থাকে, সেগুলো দিয়ে দিতে হয়। সেগুলোর থাকা একান্ত প্রয়োজন স্কেয়াশে। এই রসদাঁড়াগুলি স্কেয়াশের বোতলে নিচের দিকে কিছুটা জমে এবং কিছু উপরের দিকে মুখের কাছে ভেসে থাকে। আনারসের স্কেয়াশে কিছু ছিবড়ে রসের সঙ্গে মেশাতে হয়। কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে চটকে রস বের করা যেতে পারে অথবা

অর্ধেক ক'রে কেটে কাঁচের বা প্লাস্টিকের ছোট যন্ত্রের সাহায্যে কাঠের চাপ দিয়ে রস বের করা যেতে পারে। পাতিলেবু অর্ধেক ক'রে কেটে চটকে বা ছোট কাঠের চাপ দিয়ে রস বের করার যন্ত্রের দ্বারা রস বের করা হয়। পাতিলেবু বেশি চটকানো ভাল নয়, কারণ তাতে রস তেতো হয়ে যায়। আনারসের বেলা যন্ত্রের সাহায্যে বা থেঁতলে রস বের করা যেতে পারে।

কমলালেবুর স্কোয়াশে প্রতি সের রসে এক সের চিনি এবং একসের জল মিশিয়ে তাতে আধ চা-চামচে অ্যাসিড দিতে হবে। এতে একটু কমলার আতর দিলে আরও ভাল হয়।

পাতিলেবুর স্কোয়াশে প্রতি সের রসে ২ সের চিনি এবং ২ সের জল দিতে হয়। এতে আর অ্যাসিড দিতে হবে না। এতে লেবুর আতর দিলে বেশ ভাল হয়।

আনারসের স্কোয়াশে প্রতি ১ সের রসে ১১ সের চিনি ও ৩ পোয়া জল দিয়ে সামান্য অ্যাসিড চা-চামচের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়।

এসব স্কোয়াশে প্রতি তিন সেরের জন্য চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ পটাসিয়াম মেটো-বাইসালফাইট ভাগ ক'রে গুঁড়ো ক'রে, আগে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে মিশিয়ে, বোতলে ছিপি এঁটে রাখতে হয়।

কৃত্রিম সিরাপ

যে-কোন ফলের গন্ধের কৃত্রিম আতর এবং খাওয়ার উপযুক্ত যে-কোন রঙ কিনতে পাওয়া যায়। গোলাপের আতর দিয়ে সিরাপ তৈরির খুব চল আছে। সাধারণত কৃত্রিম সিরাপে শতকরা ৫০ ভাগ চিনি থাকে। এতে একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে দেওয়া হয় যাতে স্বাদে সামান্য অম্লভাব থাকে। ৫ সের জলে ৫ সের চিনি মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে গাদ সরিয়ে ময়লা কাটতে হবে। এর পর রসটা ছেঁকে ঠান্ডা ক'রে তাতে অ্যাসিড ভাল ক'রে মিশিয়ে

পটাসিয়াম মেটোবাইসালফাইট দিয়ে দিতে হবে। প্রতি ৬ সের সিরাপে এক চামচে সাইট্রিক অ্যাসিড ও আধ চা-চামচে পটাসিয়াম মেটোবাইসালফাইট দিতে হবে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি ভাল ক'রে গুঁড়িয়ে অল্প একটু সিরাপে বেশ ক'রে গুলে, সেটা সমস্ত সিরাপে তাড়াতাড়ি মিশিয়ে, সিরাপটা বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে রাখতে হবে। অ্যাসিড এবং রাসায়নিক দ্রব্যটি দেবার আগে যে ধরনের সিরাপ দরকার, সে রকম আতর এবং রঙ মিশিয়ে নিতে হবে। গোলাপের সিরাপে গোলাপের আতর প্রতি সের রসে চার চা-চামচে এবং লাল রঙ আধ চা-চামচে বেশ ক'রে মেশাতে হবে। রঙ একটু বেশি দেবার কারণ পটাসিয়াম মেটোবাইসালফাইট ভেঙে সালফার-ডাই-অক্সাইডে রঙ হাল্কা ক'রে দেয়। কমলার সিরাপে কমলার আতর প্রতি সের রসে এক আউন্সের চার ভাগের একভাগ বা চার চা-চামচে এবং কমলা রঙ আধ চা-চামচে দিতে হবে। কাঁচা আমের সিরাপে একই হিসাবে আমের আতর এবং হাল্কা সবুজ রঙ দিতে হয়। এভাবে যে-কোনও ফলের কৃত্রিম সিরাপ তৈরি করা যায়। এভাবে তৈরি সিরাপ বেশ কিছুদিন রাখা সম্ভব। ব্যবহার করার পর সবদাই ভাল ক'রে ছিপি এঁটে রাখতে হবে। সালফার ডাই-অক্সাইড উবে গেলেই সিরাপ রাখা সম্ভব হবে না এবং তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে যাবে।

ফল বা সবজির মোরস্বা

বেশি ক'রে চিনির সাহায্যে সংরক্ষণের উদাহরণের মধ্যে মোরস্বা অন্যতম। মোরস্বা তৈরি ক'রে ফল বা সবজি বহুদিন সংরক্ষণ করা চলে। এভাবে সংরক্ষণ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বহুল প্রচলিত। ফল বা সবজি পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে বেগুনের খোসা ছাড়ানোর দরকার ছাড়িয়ে, প্রমাণ-মত টুকরো ক'রে কেটে, চিনির রসে ফুটিয়ে আন্তে আন্তে রসটা ঘন ক'রে ফেলে, তাতে কিছু দিন রেখে ফলের বা সবজির টুকরোগুলো তুলে শুকিয়ে নিতে

হয়। টুকরোগুলোর গায়ে চিনির রসটা শর্দিকিয়ে সাদা একটা আবরণ তৈরি হয়ে যায় এমনকি চিনি দানা বেঁধে যায়। পরে এই ফলের বা সবজির টুকরো পাতলা কাগজে জড়িয়ে পরিষ্কার টিনে বা কাচের পাত্রে ভর্তি করে শুকনো এবং ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়।

চিনির রসে যদি সামান্য একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে নেওয়া হয় তবে চিনি আর দানা বাঁধতে পারে না অথচ একটা চকচকে ভাব এনে দেয়। তাই এরকম অ্যাসিড-সমৃদ্ধ চিনির রসের মোরস্বাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'গ্লেজড্ ফ্রুট' বা 'গ্লেজড্ ভেজিটেবল'।

সুবিধামত মাপে কাটা ফল বা সবজির টুকরো-গুলোকে চুলের কাঁটা বা খাওয়ার টেবিলে ব্যবহারের কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দিতে হয়। চালকুমড়া এবং কাঁচা আমের চুকরো সামান্য চুনের জলে এক রাতি ভিজিয়ে রাখতে হবে। (প্রতি সের জলে ২ ছটাক পানে খাওয়ার চুন) পরের দিন এই টুকরো-গুলো চুন-জল থেকে তুলে ভাল করে ধুয়ে গরম জলে ফুটিয়ে জলটা ফেলে দিতে হবে। অন্যান্য ফল বা সবজির টুকরো চুনের জলে ডুবিয়ে রাখা হয় না। সব সময় ফলের বা সবজির টুকরোগুলো অল্প সময় একটু ফুটিয়ে নেওয়া উচিত নরম করে নেওয়ার জন্য। এতে চিনির রসটা ভালভাবে ফলের বা সবজির ভিতরে ঢুকবে। ফুঁড়ে দেওয়ার কারণ, তাতে ভিতরে রস ঢুকতে সুবিধা হয়। জল সর্বদাই ভাল করে ঝেড়ে নিতে হবে।

সেরপ্রতি জলে আধ সের চিনি গুলে একটু ফুটিয়ে নিয়ে, তাতে ফলের বা সবজির টুকরো ভিজিয়ে রাখতে হবে একরাতি। এই টুকরোগুলো যাতে ভেসে না ওঠে সেজন্য একটি কাচের প্লেট বা এনামেলের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে, তার উপর ভারি কিছু চাপা দিতে হবে। চাবিশ ঘণ্টা এভাবে রাখার পর সবজি বা ফলের টুকরোগুলো সরিয়ে রসটা ফোটাতে হবে এবং আরও সামান্য ঘন হ'লে এই রসে

এক পোয়া চিনি গুলে, টুকরোগুলো তার ভিতর দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে আবার চাবিশ ঘণ্টা রাখতে হবে। এখনও যদি টুকরোগুলো ভেসে ওঠে তবে আবার আগের মত চাপা দিতে হবে প্লেট বা ঢাকনার সাহায্যে। এভাবে চিনির রসটা আরও ঘন হ'লে, ২৪ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা রাখতে হবে। যদি চকচকে করতে হয় তবে এ সময় প্রতি সের রসে এক চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ সাইট্রিক অ্যাসিড মেশাতে হবে।

যখন রসটা ফোটাতে ফোটাতে মধুর মত ঘন হবে তখন তাতে ফলের বা সবজির টুকরোগুলো তিন-চার দিন রাখতে হবে। তারপর একটি পাত্রে উপর বাঁশের চালদুনি বসিয়ে তার উপর পাতলা কাপড় বিছিয়ে এই ফলের বা সবজির টুকরোগুলো সাজিয়ে শুকোতে হবে। রস গড়ালে তা নিচের পাত্রে পড়বে। এই টুকরোগুলো আর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। শর্দিকিয়ে গেলে আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে রেখে বড়মুখ কাঁচের বোতলে বা টিনে রেখে দিতে হবে।

আনারস, কাঁচা আম, কমলালেবু, বা পার্ভিলেবু (খোসা সমেত আধফালি করে কাটা), গাজর, পটল, চালকুমড়া, ইত্যাদির সুন্দর মোরস্বা তৈরি হয়।

খোসার মোরস্বা

অধেক করে কাটা কমলালেবু বা পার্ভিলেবুর খোসা নুন-জলে (প্রতি সের জলে ২ ছটাক নুন) ভিজিয়ে রাখতে হবে তিন-চার দিন। এরপর ভিতরের ছিবড়ে আপনি আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বের করে আসবে। এই খোসাগুলো ভাল করে ধুয়ে দু'-তিনবার সিদ্ধ করে জল ফেলে দিতে হবে। এতে তিক্ততা কমে যাবে। এরপর একটু ফুঁড়ে দিয়ে ঠিক মোরস্বার মত ধাপে ধাপে চিনির রসে ডুবিয়ে এবং ঘন করে খোসার মোরস্বা করতে হয়। এতে একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিতে হবে, আগে যেমন বলা হয়েছে ঠিক সেই হিসাবে। খুব সুন্দর হয় দেখতে এই মোরস্বা। এগুলো 'কেক'এ

দেওয়া হয়। চালকুমড়োর মোরস্বাও দেওয়া হয় 'কেক'-এ।

কেচপ্, চার্টনি, জারক ও আচার

কেচপ্ : সাধারণত টম্যাটো থেকে তৈরি কেচপ্ বা সস্। পাকা টম্যাটো ভাল ক'রে ধুয়ে বোঁটার দিকটা বাদ দিয়ে, ছোট ক'রে বা চার টুকরো ক'রে কেটে অল্প জলে সিদ্ধ বসিয়ে নরম ক'রে নিতে হয়। সিদ্ধ করার সময় যথেষ্ট রস বের হয়। এর পর বাঁশের চালানির সাহায্যে খোসা এবং বিচি বাদ দিতে হয়। তারের চালানিরও ব্যবহার চলে, তবে তাড়াতাড়ি ছাঁকলে লোহার তারের সঙ্গে টম্যাটোর অম্লতার ক্রিয়ায় রসের রঙ খারাপ হয়ে যায়। পাতলা কাপড়ের সাহায্যেও ছাঁকতে পারা যায়। ছাঁকবার পর খোসা, আঁশ এবং বিচি বাদ দিয়ে টম্যাটোর রস এবং মণ্ডটা নিয়ে ওজন ক'রে তাতে পরিমাণমত চিনি, নুন এবং মসলা দিয়ে ফোটাতে হবে। মসলা একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় পট্টুদলি ক'রে রসে ডুবিয়ে রাখতে হবে যাতে মসলার ছিবড়ে এই কেচপ্ বা সসের সঙ্গে মিশতে না পারে।

সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ফোটালেই হয়, কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় 'স্টেনলেস স্টীল'-এর পাত্রে ক'রে ফোটাতে পারলে। অ্যানামেল-করা পাত্রও খুব ভাল। প্রতি ৫ সের রসের জন্য দেড় পোয়া চিনি ১ ছটাক নুন দিয়ে ফোটাতে হবে এবং দু'টো ছোট পেঁয়াজের কুচি, এক কোয়া রসুন, আন্দাজ-মত লঙ্কার গুঁড়ো, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এবং গোলামরিচ (সব মিলিয়ে দু'ছটাক) কাপড়ের পট্টুদলিতে বেঁধে ফটন্ত রসের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এই মসলার রস আস্তে আস্তে বের হয়ে টম্যাটোর রসের সঙ্গে মিশতে থাকবে। রস যখন ঘন হয়ে দুধের মত হবে তখন নামিয়ে ওজন ক'রে, প্রতি ১ সের কেচপে ১ আউন্স থেকে ১½ আউন্স সিরকা এবং তিন ভাগের একভাগ সোডিয়াম বেনজোয়েট ভাল ক'রে মিশিয়ে গরম অবস্থায় শুকনো বোতলে পুরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

এর পর বোতলের মুখের সঙ্গে ছিপিটা ভাল ক'রে কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে যেন পরে গরম করার সময় খুলে না আসে। সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইট ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ, সালফার ডাই-অক্সাইড টম্যাটোর রসকে হলদে ক'রে দেয় এবং তা দেখতে বিস্ত্রী হয়। ঘন হওয়ার জন্য এবং সিরকা ও সোডিয়াম বেনজোয়েট-এর জন্য সস্ বা কেচপ্ বেশ কিছুদিন রাখা সম্ভব হয়। কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিপি সহ বোতলগুলো একটি পাত্রের ভেতরে তোয়ালে বা চটের টুকরো বিছিয়ে তার উপর কাত ক'রে সাজিয়ে দিয়ে জল ঢালতে হবে যেন বোতলগুলো ডুবে যায়। এর পর জল ফোটাতে হবে এবং এই ফটন্ত জলে বোতলগুলো ১৫ মিনিটের মত রেখে জল থেকে বোতলগুলো তুলে নিয়ে ভাল ক'রে মুছে রাখতে হবে। এভাবে ফোটানোকে পাস্তুরাইজ-করা বলে। ঠান্ডা হ'লে ছিপি থেকে কাপড়ের টুকরোগুলো খুলে ফেলতে হবে।

আমের চার্টনি

যে আমের আঁঠি খুব শক্ত হয় নি সেরকম কাঁচা আম ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে, বোঁটার দিকটা কেটে বাদ দিয়ে খোসা ছাড়াতে হবে। এইবার লম্বা ক'রে টুকরো কাটতে হবে (বোঁটার দিক থেকে নিচের দিকে) এবং ওজন নিয়ে দু'ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা চুনের জলে রেখে (প্রতি সের জলে ২ থেকে চার ছটাক চুন দিতে হয়) পরিষ্কার জলে ভাল ক'রে ধুয়ে নিতে হবে এবং একটু ফটুটিয়ে নিলে ভাল হয় (১০ থেকে ১৫ মিনিট)। জল ঝ'রে গেলে এই আমের টুকরোগুলো চিনির রসে ফোটাতে হবে। প্রতি চার সের আমের টুকরোর জন্য দেড় পোয়া চিনি, ১½ ছটাক নুন, ১ ছটাক লঙ্কার গুঁড়ো এবং ১ ছটাক আদার কুচি ভাল ক'রে মেখে অ্যালুমিনিয়াম বা 'স্টেনলেস স্টীল'-এর পাত্রে অল্প জলে (১) সের ফোটাতে হবে। রসটা বেশ ঘন হয়ে গেলে ২ ছটাকের মত পরিষ্কার কিসমিস দিয়ে ভাল ক'রে মিশিয়ে উনুন থেকে নামাতে হবে। এর মধ্যে এখন

অন্তত ১ পোয়া সিরকা ভাল ক'রে মিশিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে একটু ঠান্ডা ক'রে শুকনো বড়মুখ বোতলে ঢেলে, মুখটা এঁটে রাখতে হবে। বোতল-সুস্থ চার্টনি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া ভাল। একটু পুরানো হ'লেই চার্টনি সুস্বাদু হয়। শুকনো ঠান্ডা জায়গায় এই চার্টনি রেখে দিলে বহুদিন নষ্ট হয় না। চিনি, মসলা এবং সিরকা সংরক্ষণে সহায়তা করে।

এঁচোড় এবং শসার আচার

আচার এবং জারকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আচারে নুনের সঙ্গে অন্যান্য মসলাও মেশানো হয় এবং চিনির পরিমাণ মন্দ থাকে না। আচার তৈরি করতে তাপের সাহায্য নিতে হয়, অর্থাৎ রান্না করতে হয়। জারকে কেবল নুনের সাহায্য নেওয়া হয় এবং তাপ বা মসলা কোনটিরই দরকার হয় না। নুন আচারে এবং বিশেষ ক'রে জারকে সংরক্ষণে খুব সাহায্য করে। সবজি সাধারণত ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা নুন-জলে (প্রতি ৫ সের জলে ১ সের নুন) ডুবিয়ে রাখতে হয়। যাতে সবজির টুকরো ভেসে না ওঠে তার জন্য একটি কাঠের ঢাকনা ভারি জিনিস দিয়ে নুন-জলের ভেতর চেপে রাখতে হবে। আচার তৈরির আগে অনেক সময় দেখা যায় যে, সবজির টুকরোগুলো নুন-জলে না ডুবিয়ে রেখে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা শুকনো নুন মাখিয়ে রাখা হয়। এতেও একই কাজ হয়।

নুন মাখিয়ে বা নুন-জলে রেখে দিলে সবজি থেকে জলীয় এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায় এবং সবজিতে শুকনো কচুকে অবস্থা এনে দেয়। সবজির রঙটাও একটু বদলে যায়। শসার হালকা সবুজ রঙ বদলে গাঢ় সবুজ হয়। বাঁধা কপিঁর ভিতরের পাতা দিয়ে এবং ফুলকপি দিয়ে যে জারক তৈরি হয় সেগুলোর রঙ ধবধবে সাদা হয়।

এঁচোড়ের খোসা ছাড়িয়ে মাঝের শক্ত অংশটা বাদ দিয়ে ভাল ক'রে ধুয়ে ওজন নিতে হবে এবং প্রতি

সের এঁচোড় একপোয়া নুন মাখিয়ে ১২ ঘণ্টার মত রোদে শুকিয়ে নিয়ে, ওজন অনুযায়ী মসলা মাখিয়ে কিছুক্ষণ তেলে ভেজে সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে এঁচোড়ের সঙ্গে আদার রস মেশাতে হবে এবং ওজন মত চিনি দিয়ে আরও পাঁচ-দশ মিনিট উনুনের উপর রেখে বেশ ভাল ক'রে নেড়ে মিশিয়ে সিরকা ঢালতে হবে। সবটা বেশ ক'রে মিশিয়ে শুকনো বড়মুখ বোতলে রেখে ভাল ক'রে মুখটা বন্ধ করে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হবে। সিরকা, নুন এবং মসলা পচন রোধ করবে এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

শসার খোসা ছাড়িয়ে বোঁটার এবং নিচের দিকটা বাদ দিয়ে গোল গোল চাকা ক'রে কেটে ঠিক এঁচোড়ের আচার তৈরির পদ্ধতি অনুযায়ী আচার তৈরি করতে হবে। এখানে পেঁয়াজের রসও দিতে পারলে ভাল হয় আদার রসের সঙ্গে।

প্রতি তিন সের কাটা এঁচোড়ের জন্য চাই—

সাদা জিরে	...	৪ চামচ (বড়)
শুকনো লঙ্কা	...	আন্দাজ মত (২ ছটাক)
নুন	...	১ থেকে ২ ছটাক
গুড়ো তেজপাতা	...	১ চামচ (বড়)
হলুদ	...	১ ছটাক
আদা	...	১ ছটাক
কাঁচা লঙ্কা	...	১ ছটাক
চিনি	...	দেড় পো
সরষে	...	৪ চামচ (বড়)
মেথি	...	১ চামচ (বড়)
তেল	...	১ সের
সিরকা	...	তিন পো থেকে ১ সের

প্রতি সের খোসা-ছাড়ানো শসার জন্য চাই—

চিনি	...	১ ছটাক
নুন	...	১ ছটাক থেকে ২ ছটাক
গুড়ো সরষে	...	১ ছটাক
তেল	...	১ পোয়া

হলুদ এবং শুকনো লঙ্কা	...	সামান্য (দু'টো মিলে ১ ছটাক)
আদা	...	১ ছটাক
পেঁয়াজ	...	১ পোয়া
গরম মসলা	...	সামান্য (১ ছটাক)
সিরকা	...	১ই পোয়া

সিরকা তৈরির প্রণালী

এখানে পচনের সাহায্য নেওয়া হয় এবং 'ঈস্ট' এই পচন ধরাতে সাহায্য করে। গুড় থেকে কিংবা কোন ফল যা একটু পচে গেছে এবং যাতে শর্করা-জাতীয় জিনিস বেশ আছে তা থেকে সিরকা তৈরি করা সম্ভব। সাধারণত শতকরা ২০ থেকে ২২ ভাগ চিনি বা শর্করা-জাতীয় জিনিস থাকলেই এই পচন আরম্ভ হ'তে পারে। বেশি থাকলে ভাল হয় না। ফলের রসে একটু গুড়, বা কেবল গুড় একটু পাতলা ক'রে গুলে পাথরের বয়ামে কিংবা কাঠের পাত্রে রেখে দিলে কিছুদিন পর বৃদ্ধিবৃদ্ধ হবে, ফেনা কাটবে এবং উপরে বেশ একটা গাদের মত হবে। ঐ গাদ একটু পরিষ্কার ক'রে কিছুটা রেখে, আরও কিছুদিন রেখে দিতে হবে এবং প্রায় মাসখানেক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই বেশ ভাল সিরকা তৈরি করা সম্ভব হবে। বাজারে 'ঈস্ট' কিনতে পাওয়া যায়। সামান্য 'ঈস্ট' দিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। যত পুরানো হবে ততই সিরকা ভাল হবে। সর্বদাই বোতল বা কাঠের পাত্রের মুখ কাপড়ের সাহায্যে ঢেকে রাখতে হবে যেন কোনও পোকা, মাছি ইত্যাদি না পড়তে পারে। এইভাবে তৈরি করার নাম গাঁজানো বা ফার্মেন্টেশন।

শুকিয়ে বা জলীয় পদার্থ দূর ক'রে সংরক্ষণ

আমাদের দেশে এভাবে সংরক্ষণ বহুল প্রচলিত এবং প্রাচীন। আমের গোলা একটু একটু ক'রে ছাড়িয়ে শুকিয়ে আমসত্ত্ব করার প্রচলন এদেশে বহুদিন থেকেই চলে আসছে। সবজি বা মাছ শুকিয়েও রাখা হয় বহুদিন থেকেই। ফল বা সবজি

সাধারণত ১ সূর্যধামত কেটে রোদ্রে বা তাপের সাহায্যে শুকিয়ে বহুদিন রাখা সম্ভব। রঙ এতে একটু বদলে গিয়ে দেখতে খারাপ হয়, কিন্তু ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখলেই প্রায় আগের রঙ ফিরে আসে। আপেলের খোসা ছাড়িয়ে গোল গোল চাকার মত ক'রে কেটে শুকানো হয়। ডুমুর সুতায় গেঁথে শুকানো হয়। আঙুর শুকিয়ে কিসমিস বা মনাক্সা করা হয়। শুকনো খেবানি বা পিচও বাজারে পাওয়া যায়। ফুলকাঁপির ফুল ছোট ক'রে ভেঙে শুকিয়ে রাখা হয় এবং বাঁধা-কাঁপির বাইরের পাতা বাদ দিয়ে ভেতরটা ছোট টুকরো ক'রে শুকানো হয়। আলুও পাতলা গোল ক'রে কেটে শুকিয়ে নেওয়া যায়। ছোট ছোট ক'রে কাটলে শুকোতে অনেক সুবিধে হয়। শুকোবার আগে ফল বা সবজির টুকরো যদি একটু পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট গোলা জলে ধুয়ে নেওয়া যায় তবে পোকা ধরতে পারে না—শুকনো ফলে বা সবজিতে। (৪ সের জলে চা-চামচের ৪ চামচ পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট লাগে।)

ফলের রস ঠান্ডা ক'রে জমিয়ে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের সাহায্যে ঘোরালে রসটা বের হয় এবং জল বরফের টুকরো হয়ে ভেতরে থেকে যায় মেশিনের মাধ্যমে। এভাবে বারবার জমিয়ে এবং সেন্ট্রি-ফিউজের সাহায্যে রস খুব ঘন করা যায়। এই-ভাবে জল সরিয়ে ঘন রস বহুদিন রাখা সম্ভব হয়—বোতলে বা টিনের কোঁটার মধ্যে ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে রাখলে।

চারজন লোক চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা খাটলে, কম ক'রে দু'ডজন ১ পাউন্ড ওজনের ফল, সবজি, জ্যাম বা জেলি তৈরি ক'রে ভালভাবে মুখ বন্ধ ক'রে আরও দু'ডজন বোতল স্কেয়াশ তৈরি করতে পারে। এটা প্রতি ঘরেই করা সম্ভব। চার্টনি করতে গেলেও কম ক'রে ৬ থেকে ৮ বোতল (১ পাউন্ড ওজনের) অল্পপায়ে তৈরি করা যেতে পারে।

বর্ণিতভাবে সংরক্ষণের জন্য সাধারণত যেসব জিনিস দরকার হয় সেসবের মোটামুটি দাম সহ একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

	টাকা
*১। টিন বন্ধ করার যন্ত্র (১টি) ...	১৫০
*২। কুকার জাতীয় যন্ত্র (১টি) ...	৩০০
*৩। রস বের করার যন্ত্র (১টি) ...	২৫
৪। ছুরি (৬টি) ...	১৫
৫। বড় চামচে (৩টি) ...	৫
৬। ছোট চামচে (৬টি) ...	৬
৭। টিন খোলার যন্ত্র (২টি) ...	২
৮। অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি	
১৮ ইঞ্চি (২টি) ...	১৮
১৪ " (৩টি) ...	২১
১২ " (৪টি) ...	২৪
১০ " (৪টি) ...	২০
৯। কার্টের চামচে (৪টি) ...	২.৫০
১০। টিন (১০০টি) ...	৫০
১১। $\frac{১}{২}$ পাউণ্ড ধরে এমন স্কোয়াশের	
বোতল (১০০টি) ...	৬
১২। ১ পাউণ্ড ধরে এমন কেচপের	
বোতল (১০০টি) ...	১২
১৩। বড়মুখ জ্যাম বা জেলির বোতল—	
১২ আউন্সের (১০০টি) ...	৫০
১ পাউণ্ড (১০০টি) ...	৭০
১৪। কাচের বা প্লাস্টিকের যন্ত্র—	
কমলালেবুর রস বের করার জন্য (৫টি) ...	৫
১৫। লেবুর রস বের করার	
কার্টের যন্ত্র (৪টি) ...	৪
১৬। চালুনি (৪টি) ...	৩.৫০

*সাধারণভাবে বাড়িতে সংরক্ষণ করতে গেলে তারকাচিহ্নিত জিনিসগুলোর দরকার বড় একটা হয় না। কারবারী আকারে করতে হ'লে এসব জিনিস কেনা দরকার।

	টাকা
১৭। ছিপি (১ থ্রোস) ...	৮
১৮। তোলা উনুন অথবা স্টোভ	
(৪টি) ...	৬ বা ৮০
*১৯। সোডা বা লেমোনেডের বোতলের	
টিনের ছিপি (১ থ্রোস) ...	১৫
*২০। টিনের ছিপি আঁটবার যন্ত্র (১টি) ...	৮০০
*২১। চিনি বা নুনের পরিমাণ মাপবার	
যন্ত্র (২টি) ...	৪০
*২২। তাপ মাপবার যন্ত্র (২টি) ...	৩০
*২৩। তাড়াতাড়ি দেখবার জন্যে (কতটা	
চিনি দিতে হবে জেলি বা জ্যামে)	
যন্ত্র (২টি) ...	৫০
উপরের জিনিসগুলো ছাড়াও আরও কতকগুলো	
জিনিসের একান্ত দরকার—	

	টাকা
২৪। রাসায়নিক পদার্থ—	
(ক) পটাসিয়াম মোটাইসালফাইট	
(১) পাউণ্ড ...	১০
(খ) সোডিয়াম বেনজোয়েট (১ পাউণ্ড) ...	৫
(গ) গিরকা ভিনিগার (১ বোতল) ...	১২
(ঘ) অ্যাসেটিক অ্যাসিড (১ পাউণ্ড) ...	৩
(ঙ) সাইট্রিক অ্যাসিড (১ পাউণ্ড) ...	৩
(চ) মেথিলেটেড স্পিরিট (১ পাউণ্ড) ...	২
(ছ) সোম (২ পাউণ্ড) ...	৩
২৫। অ্যানামেল-করা চোঙ ফানেল (৪টি) ...	৭
২৬। মোটা কাপড় (৫ গজ) ...	৪
২৭। মলমল পাতলা কাপড় (৫ গজ) ...	৪
২৮। সাবান, তোয়ালে এবং ডাস্টার ...	৬
২৯। চিনি, নুন, মসলা ইত্যাদি ...	৪০

বনমহোৎসবের উদ্বোধন

রবিবার ৫ই জুলাই—আষাঢ়ের বর্ষগম্ভীর প্রভাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কলিকাতায় লোয়ার সাকুলার রোড এবং ক্যাথিড্রেল রোডের মোড়ে 'রাজ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র'র অঙ্গনে একটি রক্তকরবীর চারা রোপণ করে দশম বনমহোৎসবের উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে এ রাজ্যের বনমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, বনবিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রীচিন্ময়-

শালিনী, যারা ফলবর্জিতা, যারা পদ্মপাহীনা এবং পদ্মশালিনী, তারা ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমাদের মদুস্ত করুক।”

উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছেন প্রচারবিভাগের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা—কবিগদ্যরূর “মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শুন্যে...”। বেথুন কলেজের কয়েকজন ছাত্রী নৃত্য ও সংগীতে এই উৎসবে আনন্দময় পরিবেশের সঞ্চার করেন। নৃত্য সহযোগে তাঁরা রক্তকরবীর চারাটি রাজ্যপালের হস্তে



দশম বনমহোৎসবের উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

কুমার রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিভিন্ন গছের কয়েকটি চারা রোপণ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণে প্রার্থনা করেন—“যেসকল ওষধি ফল-

অর্পণ করেন। রাজ্যপাল যখন চারাটি রোপণ করেন সেই সময়ে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের “আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল” গানটি গীত হয়।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে দেশবাসীদের বনবিনাশের অকল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, দেশের শৃঙ্খল বর্তমানের নয়—ভবিষ্যতের কল্যাণের কথাও চিন্তা করে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা কর্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, বৃক্ষের বিনাশ হ'লে ভূমির উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়, মরুভূমির সৃষ্টি হয় এবং নদীর তীর ভেঙে বন্যার আশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁর মতে, নির্মমতার দিক থেকে যুদ্ধে ব্যাপক নরহত্যা করা এবং বৃক্ষবিনাশ করার মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা শৃঙ্খল মাত্রাগত, কারণ বৃক্ষ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে মূলগত ঐক্য; তারা প্রকৃতির অভিব্যক্তির পৃথক রূপমাত্র। রাজ্যপাল বলেন যে, তিনি নিজে উদ্যানচর্চায় বিশেষ উৎসাহী, এবং তিনি অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, অবসর-জীবনে তিনি উদ্যানলালনে আগ্নিবেশ করবেন।

এ রাজ্যের সাধারণ ভূমিতে এবং পথের পাশে প্রতি বছর বনমহোৎসব উপলক্ষে যেসব গাছের চারা

লাগানো হয়, কৃষি-পশুপালন ও বনবিভাগের সচিব সেসব গাছের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁর ভাষণে। তিনি বলেন যে, ১৯৫০ সাল থেকে গত নয় বছরে এ রাজ্যে যে এক কোটি ষাট লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে, তার মধ্যে বেঁচে আছে শতকরা মাত্র পঞ্চাশটির মত। সুতরাং গাছের চারা শৃঙ্খল রোপণ করলেই চলবে না, সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও করতে হবে সকল প্রযত্নে। চারা রোপণ করলে, সেটি বেঁচে থেকে যদি বৃক্ষে পরিণত হয়, তবেই সেই রোপণ সার্থক।

রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে বৃক্ষরোপণে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মেদিনীপুর জেলাকে রাজ্যপাল এই উৎসবে 'রাজ্য শিল্ড' উপহার প্রদান করেন। উক্ত জেলার পক্ষ থেকে জেলাশাসক এই উপহার গ্রহণ করেন।



খরিফ খন্দ ধানের চাষ

ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যো

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা

আমাদের দুইটি খন্দ, একটা খরিফ খন্দ আর একটা রবি খন্দ। খরিফ খন্দ দেয় ভাতের যোগান, আর রবি খন্দ দেয় ডালের। এই ডাল-ভাতই বাঙালী জনসাধারণের প্রধান খাদ্য।

কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় আজকাল খাদ্যসমস্যা যে কত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

উৎপাদন বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় চাষের জমি বাড়ানো। আমাদের মোট চাষের জমির তেরো আনাতে ধান, আর বাকি তিন আনা জমিতে অন্যান্য খাদ্য ও পণ্য শস্য উৎপন্ন হয়। এই যে তিন আনা পরিমাণ জমি, এ থেকে ধানের জমি বাড়ানো আর সম্ভবপর নয়। কাজেই এই সীমাবদ্ধ জমি থেকেই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে যাতে বেশি ফলন পাওয়া যায়, সে উপায় আমাদের দেখতে হবে।

আপনারা জানেন যে, বীজ যদি ভাল হয়, তা হলে ফসলও ভাল হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশের চাষীরা ভাল ফসল পাওয়ার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত জাতের ভাল বীজ ব্যবহার করেন না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগ বহুদিন থেকেই উন্নত জাতের বীজ সংরক্ষণ করে চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে আসছেন। এইজন্য বর্ধমান, মালদহ, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় বীজ-উৎপাদনকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে উন্নত বীজ উৎপাদন করে চাষীদের দেওয়া হয়। তা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানা এলাকায় ৯৭টি বীজ-পরিবর্ধনকেন্দ্র গড়ে

তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ২৫ একর কিংবা অরও বেশি করে জমি নেওয়া হয়েছে এবং তাতে উন্নত বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে।

গত বছর সরকারী তত্ত্বাবধানে ৪৬ হাজার মণ উন্নত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। তা থেকে এ বছর খরিফ মরসুমে পশ্চিম বাঙলায় ৩৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে এক মণ হিসাবে ৩৮ হাজার মণ উন্নত বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। বাকি ৮ হাজার মণ বীজ যেসব অঞ্চলে বীজের খুব অভাব, সেসব জায়গায় দেওয়া হবে। যা হোক, এই ৩৮ হাজার মণ বীজে মণপ্রতি ৩ একর করে জমি চাষ করতে পারলেও মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমি চাষ করা চলবে। তা থেকে যদি আমরা খুব কম করেও একরপ্রতি ১৬ মণ করে ফলন পাই, তা হলে ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার মণ উন্নত বীজ পাব। এ থেকে চাষীদের নিজ খরচ এবং অপচয় বাদে যদি আমরা শতকরা ৫৫ ভাগও রাখতে পারি তা হলেও মোটামুটি ১০ লক্ষ মণ বীজ থাকবে। এই বীজে মণপ্রতি ৩ একর করে জমি ধরলে আমরা পরের বছর ৩০ লক্ষ একর জমি উন্নত বীজ দিয়ে আবাদ করতে পারব। তা থেকে একরপ্রতি আমরা যদি ২ মণ করেও ফসল বাড়াতে পারি তা হলে আমাদের ৬০ লক্ষ মণ বেশি ফসল হবে। এইভাবে বছর বছর আমরা বীজ পরিবর্ধন করে যদি কাজে লাগাতে পারি তা হলে অচিরেই গোটা পশ্চিম বাঙলার সব জমিতেই উন্নত বীজের আবাদ করতে আর কোন অসুবিধা থাকে না। এখন চাষীভাইরা যদি উৎসাহী হয়ে এইসব উন্নত বীজ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে তুলে চাষে লাগান, তবেই এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

বীজ সংরক্ষণ কিছু কঠিন কাজ নয়। কয়েকটি কথা মনে রাখলে চাষীরা সহজেই বীজ বাছাই করতে পারেন।

- (১) ফসল তোলার সময় যেসব গাছে শস্যের সংখ্যা বেশি সেই গাছগুলি পৃথক খোলায় ভিন্ন করে রাখতে হবে।
- (২) সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে যত্ন করে তুলে রাখতে হয়।
- (৩) বীজ সংরক্ষণের জন্য বাইরের সারি থেকে কোন গাছ নির্বাচন করা ঠিক নয়। কারণ চেহারা দেখে যদিও এগুলো বেশ ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু বরাবর যে এরা ভাল ফল দেবে সে কথাও জোর করে বলা যায় না।
- (৪) যেসব গাছ বিক্ষিপ্ত সেগুলো থেকে এবং সারির প্রথম ও শেষ গাছ থেকে বীজ নির্বাচন করা উচিত নয়।

ভাল বীজ ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই দেখবেন, যে জাতটি আপনি লাগাতে চান, নির্বাচিত জাতটি ঠিক তাই কিনা। তা ছাড়া সুপক্ক এবং সুপুষ্টি বীজগুলিই সব সময় ব্যবহার করতে হয়। সুপক্ক এবং সুপুষ্টি বীজ, অপক্ক এবং অপুষ্টি বীজের চেয়ে ওজনেও ভারি। লক্ষ্য করলেই আপনারা তা বুঝতে পারবেন। যে বীজে অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা যত বেশি, সে বীজ তত ভাল। সেজন্য নমুনা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। একটা অগভীর পাত্রে ভিজে বালি নিয়ে তার ওপর বীজ রেখে বেশ করে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়—যেন পিঁপড়ে বা ইঁদুরের খেয়ে না ফেলে। এইভাবে রাখার ২-৩ দিনের মধ্যে যেগুলোর অঙ্কুর বেরোয় সেগুলো গুনে দেখতে হয়। যেসব বীজের অঙ্কুর বেরোয় তা যদি মোট বীজের শতকরা ৯৫টি হয়, তা হলে বুঝতে হবে, বীজ খুবই ভাল। শতকরা ৭৫টি পর্যন্ত যে বীজের অঙ্কুর বেরোয় সে বীজও নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এর চেয়ে কম হলে সে বীজ নিয়ে চাষ না করাই ভাল।

সব সময় মনে রাখবেন যে, চাষের জন্য চাই নীরোগ, পুষ্টি আর বেশি ফলনের উন্নত-জাতীয় বীজ। সেজন্য বীজ বাছাই খুব যত্ন করে করতে হবে। এর জন্য এক বালতি জলে ছয় ছটাক লবণ গুলে নেবেন। তাতে বাছাই বীজগুলো ফেলে ভাল করে নাড়তে হবে। দেখবেন খারাপ বীজগুলি উপরে ভেসে উঠেছে আর ভাল বীজগুলি জলের নিচে পড়েছে। তখন খারাপ বীজগুলি ছেঁকে ফেলে নিচের ডোবা বীজগুলো তুলে হালকাভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এ রকম চার সের বীজের সঙ্গে এক তেলা 'অ্যাগোসেন জি এন' মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হয়। তখন আপনার বীজ বোনার উপযুক্ত হয়েছে বুঝবেন। এতে গাছের রোগের ভয় কম থাকবে।

ধান অনেকটা জলজ ফসল। সেজন্য ধানচাষে জলের দরকার সবচেয়ে বেশি। জলের অভাব দূর করার জন্যও কৃষি ও সেচ বিভাগ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পশ্চিম বাঙলায় সেচের ছোটবড় নানা রকম পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। এইসব সুযোগ আগে চাষীরা ধারণাও করতে পারেননি। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কালেও গত আড়াই বছরে এ রাজ্যে ছোট ছোট সেচব্যবস্থা কার্যকরী করায় প্রায় ৮১ হাজার একর জমিতে সেচ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বড় বড় সেচ পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। নলকূপ বসাবার চেষ্টা চলেছে। সেচের পাম্প সরবরাহ করারও কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। এবং পুষ্করিণী উদ্ধারের কাজ চালু রাখা হয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এখন আর দেশের বাইরে থেকে পাম্প আনা সম্ভবপর নয়। তাই দেশীয় শিল্পের উপরেই নির্ভর করে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। সরকার থেকে যতটা যা করা সম্ভব তা তো করা হচ্ছেই, এখন সকলে যদি সরকারের কাজে সহায়তা করেন এবং সকলে একজোট হয়ে সেচ, বা জল নিকাশের জন্য খাল খনন, পুরাতন খালের সংস্কার ও সাঁকো তৈরি

ক'রে জল নিকাশের ব্যবস্থা, বৃষ্টির জল ধ'রে রাখার জন্য বাঁধ তৈরি, স্লুইস গেট তৈরি ক'রে জলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ছোট ছোট কাজে একটু হাত দেন, তা হলে সব কাজ সার্থক হয়ে ওঠে।

ধানচাষে জলের যেমন দরকার, তেমনি দরকার সারের। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জমিতেই নাইট্রো-জেনের অভাব বেশি দেখা যায়। অথচ ধানের ফলন বাড়তে হলে জমিতে এই উপাদান বেশি পরিমাণে থাকা দরকার। কিন্তু দেশে উৎপাদিত রাসায়নিক সারের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম কাজেই চাহিদা অনুযায়ী রাসায়নিক সার আমরা পাচ্ছি না। এই অবস্থায় বেশি সার দিয়ে বেশি ফলন পেতে হলে আমাদের জৈব সারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। দেশে আগাছা জঙ্গলের অভাব নেই। সেগুনি পচিয়ে সার ক'রে জমিতে দিলে শুদ্ধ যে ফসল বাড়ে তাই নয়, পরিবেশটাও সুন্দর হয়। ধানচাষে সবুজসার দেবার রীতি বেশি ক'রে চালু হলে আমাদের সারের জন্য পরনির্ভরতাও কমবে। ভাল ফলনও পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে গত বছর সরকার থেকে দু'লাখ প্যাকেট ধগেবীজ চাষীদের মধ্যে আমরা বিতরণ করেছি এবং এ বৎসর ছয় লাখ প্যাকেট ধগেবীজ দেওয়া হয়েছে। এখন চাষীরা যদি এসব বীজ নিয়ে বীজ পরিবর্ধন ক'রে নিজের নিজের জমিতে সবুজসার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন তবে জমির উর্বরতা অনেক বেড়ে যাবে এবং তাতে ধানের ফলনও অনেকটা বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশের অসংখ্য লোকের মলমূত্র অযথা যেখানে সেখানে নষ্ট হয়। এটা যে শুদ্ধ অপচয় তাই নয়, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ক্ষতিকর। তাই আজ সকলের উচিত এই মলমূত্রকে সার হিসাবে ব্যবহার করা। এ বিষয়েও পরীক্ষামূলকভাবে একটা পরিকল্পনা সরকার থেকে চাষীদের মধ্যে চালু করা হয়েছে। পল্লীবাসীরা এ বিষয়ে আরও চিন্তা ক'রে দেখবেন বলে আমার বিশ্বাস।

রেগ আর পোকাকার আক্রমণে ধানের বড়ই ক্ষতি হয়। দেশের লোকের খবার রোগ-পোকায় নষ্ট ক'রে ফেলবে এ বড়ই দুঃখের কথা। এ শুদ্ধ অপচয় নয়, অপরাধও বটে। বর্তমানে রোগ-পোকা দমনে নানা রকম রোগনাশক ও কীটনাশক ওষুধ এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। গত বছর এ রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে প্রায় তিনলক্ষ বিঘা ধানের জমিতে গাঁধি পোকা দমন করা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশ্য নানা জায়গায় শস্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের চাষীদের এ বিষয়ে আরও সহযোগী এবং সচেতন হওয়া দরকার।

প্রতি মরসুমে এক ছটাক জমিও যাতে পতিত পড়ে না থাকে তাও আমাদের দেখতে হবে। সোনারপুত্র-আরাপাট এলাকায় বিস্তীর্ণ জলাজমি উদ্ধার ক'রে ধানচাষ করার বহু চাষীর উপকার হয়েছে তা আপনারা অবশ্যই জানেন। জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তার বিস্তীর্ণ চরেও ধানচাষের আয়োজন চলেছে। ইতোমধ্যে চ্যাংমাড়ী চরে প্রায় তিন হাজার বিঘা জমি উদ্ধার ক'রে চাষে লাগানো হয়েছে। মৌদীনীপুত্রের গড়বেতা-কেলেঘাই অঞ্চলে অনুর্বর পতিত ডাঙা জমি উদ্ধার ক'রে প্রায় পাঁচ হাজার বিঘাতে চাষ করা হয়েছে। গড়বেতা ও কেলেঘাই-এর যে বিশাল মাঠ এতদিন অকেজো হয়ে পড়েছিল আজ তাতেও ফলছে ধান। কিছু কিছু উদ্ভাস্ত কৃষক-পরিবারকেও এখানে স্থায়ীভাবে বসানোর চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া দেশের মাটির গুণাগুণ নির্ণয় করা এবং তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে মাটি ও চাষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের চাষীরা তাঁদের চাষের জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

এ থেকে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন, দেশের চাষ-আবাদকে বড় ক'রে তোলবার জন্য সরকার কী বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে কাজে রতী হয়েছে। এইসব সুযোগ সুবিধা নিয়ে চাষী-ভাইরা যদি উৎসাহশীল হয়ে কাজে এগিয়ে আসেন

তবেই তো সরকারের সব পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য রাতারাতিই যে আমরা বড় হয়ে যাব, আমি সেকথাও বলছি না। বড় হতে হ'লে আগে কাজ দেখিয়ে তার সূচনা করতে হয়। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই কাজ যত ছড়িয়ে পড়বে, ততই দেখা দেবে আমাদের বড় হবার সম্ভাবনা। যে আদর্শে আমরা দেশকে গড়ে তোলা-বার সংকল্প নিয়েছি তার অর্থ এই যে, দেশে চাষবাসের উন্নতি করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমাদের প্রত্যেকটি লোকই পরিপূর্ণ আহার পেয়ে আনন্দে বাস করতে পারে। কৃষিজ পণ্যই যখন আমাদের প্রধান সম্পদ, তখন দেশকে

সমৃদ্ধতর করে তুলতে হলে আমাদের কৃষিজ উৎপাদন বাড়িয়ে তোলাই হ'ল একমাত্র উপায়। এই উৎপাদন একমাত্র দেশের চাষীদের কাজের ভিতর দিয়েই বাড়তে পারে। কাজেই দেশের প্রত্যেকটি চাষী যদি ব্যক্তিগতভাবে অধিকতর ফসল উৎপাদনের কাজে এগিয়ে না আসেন, তা হলে আমাদের অন্নান্ন কখনোই ঘুচবে না।

তাই আজ এই খরিফ মরসুমে দেশের প্রত্যেকটি চাষীর কাজ হ'ল সরকারের কাজে সহযোগিতা করা এবং দেশের কৃষিসম্পদ যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য আমন এবং আউশ ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা।*

*আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে



মানবকল্যাণে খাল ও বাঁধ

শ্রীদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায়

স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ার, সেচবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

খাল ও বাঁধের সম্বন্ধ জল আর মাটির সংগে, যে জল ও মাটি দিয়ে গড়া আমাদের এত বড় পৃথিবী। এই জল আর মাটি মানুষের জীবনে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। কারণ এরাই এনেছে মানুষের সমাজে প্রচুর শস্যসম্ভার, বিপুল ধনরত্ন এবং সুখের অজস্র উপকরণ। কিন্তু আশীর্বাদ পেলেই তো সবটুকু পাওয়া হয় না। প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা চাই, তাকে রক্ষা করা চাই, সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সে আশীর্বাদের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে যথাযথরূপে প্রয়োগ করা চাই। তাই স্বাধীনতালাভের পরেই ভারত-সরকার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে এই বিশাল দেশের জলরাশিকে কাজে লাগাবার দিকে নজর দিয়েছেন।

সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতি নদ-নদী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিপুলায়তন এই ভারতবর্ষকে স্নেহময়ী জননীর মত বেষ্টিত করে আছে। মায়ের স্নেহ সন্তানের জীবনগঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হ'লেও সে স্নেহের আতিশয্য শিশুসন্তানের জীবনকে যেমন পঙ্গু করে তোলে, ঠিক তেমনি করেই ভারতের নদীগুলি প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তাদের স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে হঠাৎ কখনও কখনও তীরসংলগ্ন সমৃদ্ধ নগর ও জনপদসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। ঠিক এখানেই খাল ও বাঁধ নির্মাণের আশু প্রয়োজনীয়তা।

হাজার হাজার বছর আগের কথা, যেদিন মানুষ যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে প্রথম ঘর বাঁধতে শিখল, শিখল, মাটির ফসলে ক্ষুধানিবৃত্তি করে দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করতে, সেদিন থেকেই সম্বন্ধ, মানুষ চেষ্টা করে আসছে কেমন করে যথাসময়ে

নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ প্রকৃতির খেলালে জলের পরিমাণ কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কম, কোথাও বা বেশি। অথচ এ দুটোর কোনটাই জমিতে ফসল ফলানোর পক্ষে কাম্য নয়।

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি তার উৎপন্ন ফসলের উপরেই প্রধানত নির্ভর করে। অথচ চাষের জন্য যে-সময়ে যে-পরিমাণ জলের প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে তার ব্যতিক্রম হয়ে পড়ে। এর ফল খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

জলবিরল স্থানসমূহে খাল কেটে নদীপ্রবাহকে সেই দিকে পরিচালিত করে সেইসব স্থানের মাটিকে চাষের উপযোগী করে তোলা হয়—খাল কাটানোর এ যেমন একটা উদ্দেশ্য তেমনি অতিবৃষ্টির ফলে জলক্ষীতি ও প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিলে ঐ খালের সাহায্যেই অতিরিক্ত জল-রাশি নদী অভিমুখে পরিচালিত করে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহকে প্লাবন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। সুতরাং জলসরবরাহ ও জলনিকাশ উভয় কার্যের জন্যই যেমন খাল খননের আবশ্যিকতা আছে তেমনি বন্যা ও জলপ্লাবনের হাত থেকে দেশের সম্পদ ও জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণের আবশ্যিকতাও রয়েছে। ভারতবর্ষ বৈদিক যুগ থেকেই জলসঞ্চয়, জলবন্টন ও জলনিষ্কাশনের জন্য কূপখনন এবং খাল ও বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করে দেশ ও জাতিকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। ভূগর্ভ খনন করে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বেশনগরে যে খালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে তার নির্মাণকাল আনুমানিক

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা আরও কিছু পূর্বে। এ ছাড়া প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই এক হাজার বছরের মধ্যে যতগুলি দীঘি ও খাল খনন করা হয়েছে তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর খালগুলি অন্যতম। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক যমুনা নদীর পশ্চিমাংশ থেকে কতকগুলি খাল কাটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে খনন করা হ'ল উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর খাল। যা হোক গত একশ' বছরের মধ্যে আরও অনেক-গুলি খাল নির্মাণ করে চাষের উপযোগী জল-সরবরাহের চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের সবগুলির দৈর্ঘ্য যোগ করলে দাঁড়ায় ৬০ হাজার মাইলের উপর।

ভারত স্বাধীনতালাভের পর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করেন। এই প্রথম পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য ৬১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকা গত দেড়শ' বছর ধরে সমগ্র ভারতে সেচকার্যে যে অর্থব্যয় করা হয়েছিল তাকে বহুগুণে অতিক্রম করে গেছে। এই বিপুল অর্থব্যয়ে ৮৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য কিঞ্চিদধিক ৯১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে ভারতের কয়েকটি বৃহৎ পরিকল্পনার নাম হ'লঃ (১) পাঞ্জাবের শতদ্রু অঞ্চলে ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এটি দ্বিতীয় উচ্চতম বাঁধ; (২) মহাশূর অঞ্চলে তুঙ্গভদ্রা; (৩) উড়িষ্যা হীরাকুদ; (৪) পশ্চিম বাঙলায় ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী; (৫) মাদ্রাজে নিম্নভবানী; (৬) মহাশূরে ভদ্রা; (৭) বোম্বাই প্রদেশে কাকড়া-পাড়; (৮) বিহারে বহুমুখী দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে পশ্চিম বাঙলার কল্যাণ ও সমৃদ্ধি; (৯) বিহারে

কোশী; (১০) রাজস্থানে চম্বল; এবং (১১) অন্ধ্র রাজ্যে নাগার্জুনসাগর।

পশ্চিমবঙ্গে খাল ও বাঁধের সাহায্যে যেসমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে কিংবা হ'তে চলেছে তাদের মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সর্ববৃহৎ ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিহার রাজ্যে বরাকর নদীর উপরে তিলায়া ও মাইথনে এবং দামোদরের উপরে পাণ্ডেত হিলে ও তার শাখানদী কোনারের উপরে বাঁধ নির্মাণ করে বিশাল জলাধার তৈরি করা হয়েছে। এই জলাধারসমূহের মোট জলসংরক্ষণ-ক্ষমতা প্রায় ১৬ লক্ষ একর-ফুট। পশ্চিম বাঙলায় দুর্গাপুরে দামোদরের উপর ২,২৭১ ফুট দীর্ঘ একটি জল-নিয়ন্ত্রণ ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই ব্যারেজের উভয়প্রান্ত থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলি জেলায় মোট ১,৫৫০ মাইল দীর্ঘ খাল কেটে প্রায় ১০ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করা হবে। এর ফলে কিঞ্চিদধিক ৩৭ লক্ষ মণ অতিরিক্ত ধান্যশস্য এবং নানাবিধ তরিতরকারি, ইক্ষু ও রবিশস্য উৎপন্ন হবে। এই ব্যারেজের পূর্বতীরে প্রধান সেচ খালটির সাহায্যে রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা অবধি নৌ-চলাচল সম্ভব হবে। দামোদর পরিকল্পনার ফলে নিম্ন অঞ্চলে অতীতের কুখ্যাত দামোদর বন্যার অবসান হবে। এই পরিকল্পনায় জলাধারসমূহের জল নিঃসরণ-মুখে যন্ত্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বোথারোতে কল্লা থেকে উদ্ভূত বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে একটি পৃথক বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার প্রধান সেচ-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কিঞ্চিদধিক ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বীরভূম জেলার সিউড়ি শহর থেকে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বিহার-পশ্চিম বাঙলা সীমান্তবর্তী সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে মশানজোড় গ্রামে ময়ূরাক্ষীর উপরে ২,১৭০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় ১৬,৬৫০ একর সুদূর-প্রসারী স্থান এক বিশাল রিস্তৃত জলাশয়ে পরিণত

হয়েছে। জলপূর্ণ অবস্থায় এই জলাধারে ৫ লক্ষ একর-ফুট জল সংরক্ষিত থাকবে। সিউড়ির নিকট তিলপাড়াতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ১ হাজার ১৩ ফুট দীর্ঘ একটি ব্যারেজ নির্মিত হয়েছে। মূল ব্যারেজের উভয় প্রান্তে ৭৫ মাইল দীর্ঘ দু'টি প্রধান খাল থেকে প্রায় ৮৫০ মাইল দীর্ঘ একাধিক শাখা-খাল খনন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে ধান্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী জলসরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিম বাঙলায় যে জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থাগুলির কাজ সমাপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে সোনারপুত্র-আরাপাচি পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতালাভের প্রথম পদক্ষেপেই পশ্চিমবঙ্গ-সরকার-নিযুক্ত বৃহত্তর কলিকাতা পয়ঃনিঃসারণ কমিটি যেসকল পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে এইটিই ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বাপেক্ষে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। চব্বিশপরগনা জেলার সোনারপুত্র-বারুইপুত্র-উত্তরভাগ অঞ্চলের ৫৭ বর্গমাইল স্থানের জলনিষ্কাশের জন্য পিয়ালী নদীর তীরে উত্তরভাগ গ্রামে চারটি অতিকায় জল-নিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এই যন্ত্র চারটির সমবেত জল-নিষ্ক্ষেপ ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গ্যালন। প্রতিটি যন্ত্র ৬৩০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন। বিদ্যুৎ-চালিত এই যন্ত্রদানব শৃঙ্খল ভারত-বর্ষে নহে, সম্ভবত সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বৃহত্তম জল-নিষ্কাশক যন্ত্র। মাঝেরহাট থেকে গড়িয়া-সোনারপুত্র-বারুইপুত্র হয়ে দীর্ঘ ১৯ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে বিদ্যুৎশক্তি উত্তরভাগে এই যন্ত্র চালনা করছে। প্রায় ২৭ মাইল দীর্ঘ মূল এবং শাখা-খালের সাহায্যে প্লাবিত অঞ্চলের জল এই যন্ত্রদানবের মুখগহ্বরে নীত হয়। যন্ত্রগুলি এই বিপুল জলরাশিকে প্রায় ১৫ ফুট উর্ধ্বে উত্তোলিত করে পিয়ালী নদীতে নিষ্ক্ষেপ করে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হওয়ায় এই এলাকায় বাৎসরিক প্রায় ৫ লক্ষ মণ অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে যার মূল্য বর্তমান বাজারদরে প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের আর-একটি পরিকল্পনার কথাও এই সংগে বলছি—এর নাম কংসাবতী পরি-কল্পনা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর কাজও আরম্ভ করা হয়েছে। এর আনুমানিক ব্যয় ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বাঁধের সাহায্যে কংসাবতী ও তার শাখানদী কুমারীর জলরাশিকে বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগর শহরের এক মাইল উপরে সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে যে জলাধার সৃষ্টি হবে তাতে প্রায় ৯ লক্ষ একর-ফুট জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই জলরাশি দু'টি প্রধান খালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে এর সাহায্যে প্রধানত বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় এবং হুগলি জেলার সামান্য অংশে কৃষির উপযোগী জলসেচনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতের অগণিত জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে যতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেচ পরি-কল্পনাগুলি তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বৃহত্তম ও মহত্তম। শৃঙ্খলিত অর্থ ও শ্রমের বিপুলতা কিংবা আয়তনের বিশালতাই যে এই পরিকল্পনাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে তা নয়—এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এর সঞ্জীবনী শক্তি। অজস্র জলরাশির যে সৃজনশীল শক্তি দেশের মাটিতে সোনা ফলাতে পারে—জনগণকে দিতে পারে নতুন প্রাণ, বিপুল উদ্যম আর সুখ ও শান্তি দিয়ে গড়া স্নেহের নীড়, যে শক্তি নব নব শিল্পসম্ভারে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে তার শ্রেষ্ঠ ও বিশালতা অনস্বীকার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় সরকারের এই জলশক্তি নিয়ন্ত্রণের কল্যাণমুখী সাধনা একদিন সার্থক হয়ে উঠবে, আর সেই সার্থক সাধনাই হবে ভাবীকালের জন-গণের কাছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ দান—সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। [৯ই জুন তারিখে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে প্রদত্ত ভাষণ থেকে]

আগমার্ক কী

‘আগমার্ক’ জিনিস দেখলেই বদ্বতে হবে সেটি খাটি—যেটি ১৯৩৭ সালে ভারত-সরকারের প্রবর্তিত “কৃষিজাত দ্রব্য (শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিতকরণ)” আইন-বলে বাছাইকরা বিশুদ্ধ জিনিস বলে স্বীকৃত হয়েছে। ‘আগ’ অর্থে ‘প্রাণিকালচার’ অর্থাৎ কৃষি এবং ‘মার্ক’ অর্থে ‘মার্কিং’ অর্থাৎ চিহ্নিতকরণ। এই দুইটি কথার পরিচায়ক হিসাবে সংক্ষেপে বলা হয় ‘আগমার্ক’। কোন জিনিস বা জিনিস সমেত মূল্য-আঁটা পায়ে এ চিহ্ন দেখলেই বদ্বতে হবে সেই জিনিস আইন অনুযায়ী প্রচারিত, নির্দিষ্ট গুণ-বিশিষ্ট ও শ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষজ্ঞ-কর্তৃক বিশেষ-ভাবে পরীক্ষিত।

আপনারা সবাই জানেন যে, কৃষিপণ্য এদেশে, তৈরিই হোক কি কাঁচাই হোক, বাছাই করে বিক্রি করা হয় না। সবই একসাথে মিশিয়ে বেচে দেওয়া হয়। ফলে ব্যবসাদারদেরই সুবিধা হয় বেশি। নিকৃষ্ট পণ্যের সঙ্গে উৎকৃষ্ট পণ্য যা আছে তার জন্য উৎপাদনকারীরা উচিত-মূল্য পান না। তা ছাড়া এইরকম পণ্য থেকে ব্যবহারকারীদের অনিশ্চিত-গুণবিশিষ্ট জিনিস পাওয়ার প্রশ্নও জড়িত থাকে।

এই অবস্থা পরিহারকল্পে কৃষিসংক্রান্ত তদন্তের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ভারত-সরকার কৃষিজাত দ্রব্য (শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিতকরণ) আইনটি প্রণয়ন করেন—যাতে উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়েরই সুবিধা হয়।

বিক্রেতা, উৎপাদনকারী অথবা ব্যবসাদার যিনিই হোন না, তিনিই তাঁর জিনিসে আগমার্ক চিহ্ন করে নেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে দরখাস্ত করতে হবে ভারত-সরকারের কৃষিজ-বিপণন পরামর্শদাতার কাছে—রাজ্য কৃষিজ-বিপণন অধিকর্তার মাধ্যমে। অনেক নিয়মকানুন আছে।

সেগুলো মানতে হবে দরখাস্তকারীকে। যদি দরখাস্তকারীর আবেদন সন্তোষজনক বিবেচিত হয় এবং তিনি সব রকম বিধিনিষেধ যথাযথ পালন করতে রাজি থাকেন তা হলে তাঁকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং তাঁর জিনিসে ‘আগমার্ক’ চিহ্ন করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

যেসব নিয়মকানুন মানার কথা বলা হ’ল, সে-গুলো আর কিছুই নয়, এইটুকু স্বীকৃতি তাতে থাকবে যে, দরখাস্তকারীর জিনিস আইন অনুসারে যথাযথভাবে পরীক্ষা ও বাছাই করে তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর গুণবিশিষ্টতা তাতে আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩০টি পণ্যের গুণাগুণের মান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, আরও অনেক কৃষিপণ্যের স্থান এতে হবার সুযোগ আছে। দরকার অনুযায়ী অন্য মালও বিবিধবন্দে নিয়মে চিহ্নিত করা চলতে পারে।

পণ্যের কী করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি। ধরুন, ঘি। একজন বিক্রেতা তাঁর তৈরি ঘি ‘আগমার্ক’ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করতে চাইলে তাঁর একটা ‘ল্যাবরেটরী’ অর্থাৎ রাসায়নিক পরীক্ষণশালা থাকা দরকার যেখানে ভারত-সরকারের কৃষিজ-বিপণন পরামর্শদাতার অধীনে একজন রসায়নী ঘি-এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। রসায়নী গুণাগুণ পরীক্ষা করে নিরূপণ করবেন বিশেষ কোন শ্রেণীতে ঐ ঘি আগমার্ক অনুযায়ী বিন্যস্ত করা চলবে এবং সেইমত নির্দিষ্ট শ্রেণীর আগমার্ক লেবেল দেওয়া হবে প্রতিটি ঘি-এর টিনের উপর। তার পর সেই ঘি পরিষ্কার শুকনো পায়ে ‘প্যাক’ করবার ব্যবস্থা করা হবে। সব পাঠ যে একই মানের হবে তা নয়। এক সের থেকে আঠারো সের ঘি ধরে এই রকম বিভিন্ন মানের পায়ে রাখা হলে ঘি, আর ‘প্যাক’

করতে হবে রসায়নীর সামনেই। বিশেষ শ্রেণীর ঘি-এর জন্য দেওয়া হবে আগমার্ক লাল লেবেল এবং সাধারণ শ্রেণীর জন্য দেওয়া হবে সবুজ লেবেল। ঘি খারাপ ব'লে ধরা পড়লে অথবা বিশুদ্ধ ঘিও অস্ফল্য যদি শতকরা ২.৫ ভাগের বেশি হয় তা হ'লে সেই ঘি বাতিল করা হয়। বিশেষ ধরনের এক রকম কাগজে ছাপা লেবেল লাগানো হয় পাত্রের গায়ে। লেবেল যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য ভারত-সরকারের টাকশালে নোট ছাপানোর জন্য যে ছাপাখানা আছে সেখানে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আগমার্ক লেবেল ছাপানো হয়।

প্যাক-করা মাল খুচরো ব্যবসায়ীদের মারফত বাজারে উঠলে সেই মালের নমুনা রাজ্য-সরকারের কৃষিজ-বিপণন আধিকারিক এবং ভারত-সরকারের আঞ্চলিক কৃষিজ-বিপণন আধিকারিক কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে কানপুর্নে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে প্রেরিত হয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। যদি কোন কারণে উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত না হয় তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সেইসব মাল থেকে আগমার্ক লেবেল তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া যদি কোন ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় মালে ভেজাল দেওয়া হয়, তা হ'লে সেই অসাধু ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে।

ভেজাল দেওয়া ও শ্রেণীবিন্যাস বিধির ব্যতিক্রম হ'লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যাকে শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাঁকে বা তাঁদের কৃষিজ-পণ্য (শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিতকরণ) আইনে শাস্তি দেবার বিধানও আছে।

কাজেই আগমার্ক জিনিস যে সরকার থেকে বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খাঁটি ব'লে প্রচারিত হওয়ার দাবি করে তা অবশ্যই বৃদ্ধিতে পারছেন।

আজকাল খাঁটি ঘি পাওয়া দুস্কর। ঘি বনস্পতির সঙ্গে মিশিয়ে খাঁটি ঘি ব'লে বাজারে

ছাড়া হচ্ছে এবং সেই অনুপাতে এর দামও নেওয়া হয় বাজারে অনেক বেশি। ফলে ক্রেতারা গেছেন বিরক্ত হয়ে। তাঁদের ধারণা, বাজারে খাঁটি ঘি যখন নেই তখন বনস্পতি কেনাই চলুক। তাতে আর যা হোক দাম অনুপাতে জিনিস তো পাওয়া যাবে। আগমার্ক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর এই অসুবিধা দূর হয়েছে এবং বাজারে আজ খাঁটি ঘি পাওয়ার সুযোগ ক্রেতাদের হচ্ছে।

সরষের তেলের এবং কৃষিজাত অন্যান্য পণ্যেরও ঠিক একইভাবে আগমার্ক করা হয়।

এইবার বলছি ফলের কথা। আপনারা জানেন, ফলের (যেমন ধরুন, আমের অথবা লেবুর) বড়-বড়গুলো ঝড়িড়ির উপরের দিকে রেখে নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিকৃষ্টগুলো দিয়ে সাজানো হয়। ফলে ক্রেতারা বুঝে উঠতে পারেন না ঝড়িতে সব একই আকারের মাল আছে কিনা। কিন্তু ফলের কোন ঝড়ি কি বাক্সের গায়ে আগমার্ক লেবেল থাকলে নির্ভাবনায় ক্রেতারা সেই মাল নিতে পারেন। ঝড়িতে সব একই মাপের ফল আছে কি না এসব ভাবনা আর তাঁদের করতে হয় না তখন।

ডিমের বেলায়ও ঠিক একই উপায়ে আগমার্ক করা হয় ডিমের আকার এবং গুণের তারতম্যের উপর লক্ষ্য রেখে। সেজন্য দেখতে হয় ডিমের ওজন এবং ভেতরের অবস্থা। এইগুলো পরীক্ষা করবার এক রকম যন্ত্র আছে। তা দিয়ে পরীক্ষা করলে অনায়াসেই ভারি, হালকা এবং নিকৃষ্ট ডিম-গুলি ধরা পড়ে। তখন এগুলো বড়, মাঝারি, ছোট হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা চলে। আগমার্ক ডিম কিনলে ক্রেতারা দাম অনুযায়ী ঠিক জিনিস পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা, বর্ধমান, লালগোলা, ভগবানগোলা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, সাঁইখিয়া, ভালুকা রোড এবং সাগরদিঘিতে ডিম বাছাই করার কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আগমার্ক পণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তামাক,

শণ, লেবুর তেল, শূকরের লোম প্রভৃতি এদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের ব্যবসায়ীরা আগে এক রকম জিনিসের নমুনা দেখিয়ে রপ্তানির সময় অন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাল পাঠাত। ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের একটা বদনাম হয়ে যায়। সেজন্য আগমার্ক জিনিস না হ'লে বিদেশে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্য চালান দেওয়া 'কাস্টম' আইনের ১৯নং ধারানুযায়ী নিষেধ করা হয়েছে।

বিদেশী বণিকরা এখন আগমার্কের উপর আস্থা রাখেন। আগমার্ক দেখে তাঁরা এখন জিনিস কিনে থাকেন। ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য হয়েছে প্রসারিত এবং জিনিসের দর উঠেছে বেশি। নইলে অনিশ্চিত জাতের জিনিস ব'লে বৈদেশিক ক্রেতার জিনিসের দর দিচ্ছিলেন কম। ফলে বৈদেশিক মদ্রাও যেমন আমরা কম পাচ্ছিলাম, আমাদের বদনামও তত ছড়িয়ে পড়ছিল।

ভারতের সর্বত্রই 'আগমার্ক'র চল। হরেক রকম মালে আগমার্কের চিহ্ন। তবুও একথা স্বীকার করতে হয় যে, ব্যবহারকারী ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে এখনও আগমার্ক ততটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

ব্যবহারকারীদের মধ্যে আগমার্ক জিনিসের চাহিদা বাড়লে, বিক্রিও বেশি হবে। ফলে যাঁরা নিজেদের মাল আগমার্ক ক'রে নেবেন তাঁদের ন্যায্য লাভও হবে বেশি। তবে আগমার্ক ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেবার জন্য কিছু ধরাট তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। কেননা, বিধি অনুযায়ী পণ্য আগমার্ক ক'রে নিতে হ'লে আনুযায়িক কিছু খরচখরচা আছে। তবে ভাল

জিনিস ব্যবহারের যাঁরা প্রয়াসী তাঁরা সব সময়েই কিছু বেশি দাম দিয়ে আগমার্ক জিনিস কিনতে প্রস্তুত থাকেন, কেননা তাঁরা জানেন যে, এ জিনিস খাঁটি এবং বাছাই-করা।

ক্রেতার সহজেই যাতে এ জিনিস পেতে পারেন সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি 'আগমার্ক' এম্পো-রিয়ম' অর্থাৎ খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা চলেছে। তা হ'লে অনুমোদিত বিক্রেতার প্রচুর পরিমাণে আগমার্ক জিনিস সরবরাহ করতে পারবেন ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে। এর মধ্যেই এরকম খুচরো দোকান কয়েকটি খোলা হয়েছে কলকাতায় এবং কয়েকটি জেলায়। এইসব কেন্দ্রে ঘি, সরষের তেল এবং আটা বিক্রি হয়। চাহিদা বাড়লে অন্য বিক্রেতারও যে আগমার্ক জিনিস রাখবার জন্য 'এম্পোরিয়ম' খুলতে আবেদন করবেন তা আশা করা যায়।

প্রাচ্যে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর যেমন হিড়িক, এরকম আর পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় না। দূর করতে হবে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি, উৎসাহ দিতে হবে উৎপাদনকারীদের জিনিস খাঁটি রাখবার জন্য—ভাল দামের আশ্বাস দিয়ে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নজর রেখে সচেতন হয়ে আমাদের সকলেরই আগমার্ক জিনিস ব্যবহার-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

"আগমার্ক" দ্রব্যের অনুরাগী জনসাধারণ রাইটাস' বিন্ডিংসে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যুক্ত কৃষিজ বিপণন অধিকর্তার কাছে চিঠি লিখতে বা তাঁর সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে পারেন।

নানা স্থানে বনমহোৎসব

জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দশম বনমহোৎসব পালন করা হয়েছে। এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য সভা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন জেলার নানা স্থানে 'বনমহোৎসব' উদ্‌যাপনের কয়েকটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'লঃ

মেদিনীপুর

৮ই জুলাই জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন, আই এ এস, কালেক্টরেটে এক সভায় উৎসবের উন্মোচন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বনমহোৎসব উদ্‌যাপনে মেদিনীপুরের অধিবাসীদের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে এই উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও একটি কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, বি এল, শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট প্রভৃতিও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ব্যান্ড-বাদন ও মেদিনীপুর মিউজিক কলেজের ছাত্রদের রবীন্দ্রসংগীত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলা বনমহোৎসব-কৃত্যে প্রথম স্থান লাভ করে। সর্বাধিক-সংখ্যক চারা রোপণের এবং তার মধ্যে সর্বাধিক-সংখ্যক গাছ বাঁচিয়ে রাখার গৌরব এই জেলাই অর্জন করেছে।

হাঁসখালি

গত ৬ই জুলাই নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার হাঁসখালিতে অবস্থিত মাদুয়া সমাজশিক্ষা কেন্দ্র এবং পাটকাবাড়ী জুনিয়র হাইস্কুল প্রাঙ্গণে 'বনমহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। রানাঘাটের মহকুমা-শাসক শ্রী সি আর গুহমজুমদার, আই এ এস, সভাপতিত্ব করেন। সভায় বহু আদিবাসী উপস্থিত ছিল। শ্রী গুহমজুমদার বনমহোৎসব পালন এবং বিপুলসংখ্যক বৃক্ষরোপণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

করেন। এই উপলক্ষে শ্রী গুহমজুমদার কয়েকটি চারা রোপণ করেন।

জগদীপুর

'রেশমের গুটি' উপাদানের উদ্দেশ্যে এই জুলাই স্থানীয় আদালত-প্রাঙ্গণে কয়েকটি তুঁতগাছের চারা রোপণ করা হয়। বনমহোৎসবের মধ্য দিয়ে কুটিরশিল্পের উন্নতি এবং মর্শিদাবাদের প্রাচীন ও বিখ্যাত রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ গাছের চারা লাগানো হয়। মহকুমা-শাসক শ্রী এস চৌধুরী, শ্রীকুবের হালদার, এম এল এ, শ্রী জে এল দাস প্রমুখ বহু ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মির্জাপুর

৩রা জুলাই মর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রী ভি এস সি বোনার্জি, আই এ এস-এর সভাপতিত্বে মির্জাপুরে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা-শাসক শ্রী এস চৌধুরী বৃক্ষরোপণ এবং তার উপযোগিতা সম্পর্কে ভাষণ দেন। বৃক্ষাদি-পরিপূর্ণ অরণ্য নদীর ভাঙনের কবল থেকে ভূমিকে রক্ষা করে, জনগণকে ছায়া, ফল ও কাষ্ঠ যোগায় বলে তিনি অরণ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। তিনি সরকার কর্তৃক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমির পুনরুদ্ধার এবং বনগঠনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মর্শিদাবাদের রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে জেলাশাসক সমগ্র জেলার যেখানে সম্ভব সেখানেই তুঁতগাছ লাগাবার প্রস্তাব করেন। মির্জাপুর এই জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেশমশিল্পকেন্দ্র।

চন্দননগর

১লা জুলাই চন্দননগরের মহকুমা-শাসকের দফতরের প্রাঙ্গণে বনমহোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত

সভায় শ্রী পি কে মধুখোপাধ্যায়, শ্রী অরুণ দত্ত, শ্রী বি বি ঘোষ প্রমুখ অনেকে জাতীয় উৎসবস্বরূপ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান পালনের আবশ্যকতা সম্পর্কে ভাষণ দেন। চন্দননগরের মহকুমা-শাসক শ্রী এস সি সেন উত্তরপুরুষদের জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। এই উপলক্ষে তিনি কয়েকটি ফলের কলম ও চারা রোপণ করেন।

সিউড়ি

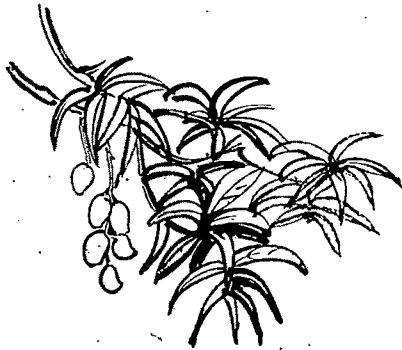
১লা জুলাই বৈকালে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে উৎসবের সূচনা করা হয়। বীর-ভূমির জেলাশাসক শ্রী এম সরকার, আই এ এস সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বস্তা বনমহোৎসবের উপযোগিতা ও তাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তাদের মধ্যে ছিলেন 'সেবা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অশ্বিনী মধুখোপাধ্যায়, সিউড়ির বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সদর মহকুমা-শাসক শ্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাশাসক জনগণের নিকট আরও অধিক বৃক্ষরোপণ করতে এবং সেগুলিকে সযত্ন সতর্কতায় পালন করতে অনুরোধ জানান। জেলাশাসকের পত্নী শ্রীমতী সরকার এবং অন্যান্য অনেকে কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করেন।

ডায়মন্ডহারবার

৬ই জুলাই ডায়মন্ডহারবার আদালত-প্রাঙ্গণে উৎসব হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডায়মন্ডহারবারের মহকুমা-শাসক শ্রী নীতীশ কুমার মজুমদার, আই এ এস। আনুষ্ঠানিকভাবে গাছের চারা রোপণ করা হয় এবং বনমহোৎসবের উপযোগিতার কথা ও রাজ্যের বনসম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা জনগণকে উপলব্ধি করতে সভাপতি অনুরোধ জানান।

বালুরঘাট

বালুরঘাটে পশ্চিমদিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার-গৃহের প্রাঙ্গণে বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসক শ্রী বি বি মন্ডল, আই এ এস। 'বার অ্যাসোসিয়েশন'এর সম্পাদক শ্রী নীলকান্ত বাগচি ও জেলাবোর্ডের সভাপতি শ্রী রজকুমার রায়চৌধুরী তাঁদের বক্তৃতায় পূর্বের অপেক্ষা অধিকতর বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাঙ্গণে বহু গাছের চারা রোপণ করা হয়। এই উপলক্ষে প্রচারবিভাগের স্থানীয় শাখা 'মহাভারত' সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।



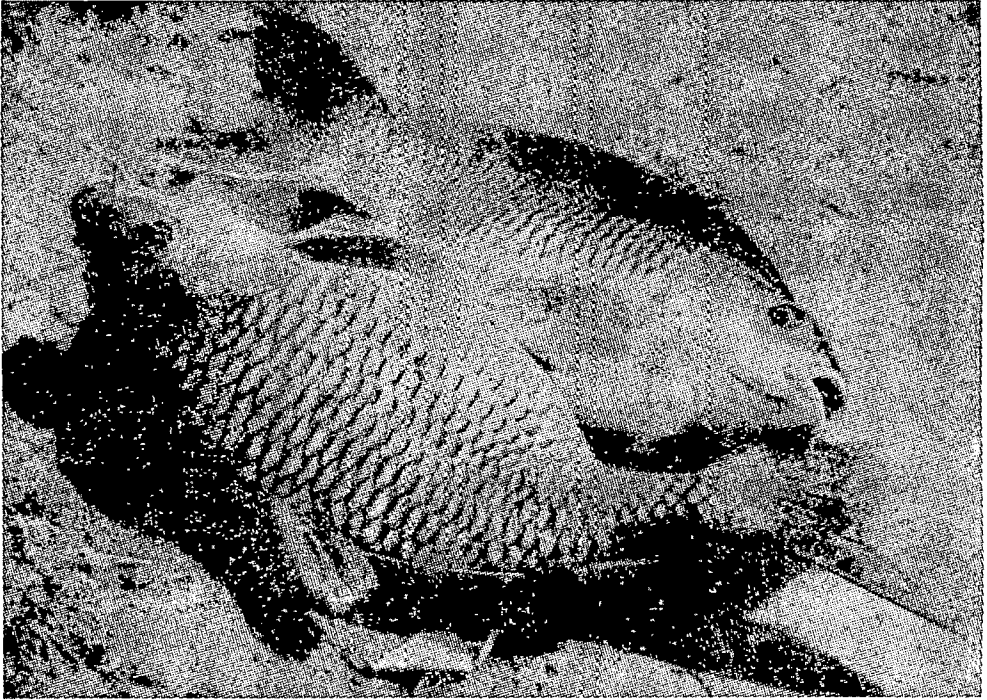
টুকিটাকি

রুই শ্রেণীর নতুন ধরনের মাছ

চব্বিশপরগনা জেলার দত্তাবাদে মাছের চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে প্রদর্শনী খামার আছে, সেখানে নতুন এক শ্রেণীর রুইমাছের চাষ করা হচ্ছে—এর বৈজ্ঞানিক নাম ‘সাইপ্রিনাস কার্পিও’। এদেশের চলতি রুইমাছের সঙ্গে এই নতুন রুই-মাছের কতটা মিল আছে তা দেখবার জন্য ভারতে এর চাষ করার চেষ্টা এই প্রথম।

মাছের প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা ২০০ পোনা আমদানি করে উক্ত খামারে এর চাষ লাগানো হয়। ফল হয়েছে খুবই সন্তোষজনক। এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে এ শ্রেণীর যে মাছগুলো সবচেয়ে বড় হয়েছে তার এক-একটি লম্বায় হয়েছে ২০ ইঞ্চি আর ওজনে ৬ পাউন্ড!

এ মাছের আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বংশবৃদ্ধি করে প্রচুর সংখ্যায় এবং বন্ধ টাটকা মিষ্টি জলে



চীন থেকে আনা রুই জাতীয় মাছ এদেশে পালনের চেষ্টা হচ্ছে

চীনদেশের সব জায়গায় সেখানকার চলতি রুই-মাছের সঙ্গে একযোগে ‘সাইপ্রিনাস কার্পিও’ মাছের চাষ করা হয়। পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গাতেই এ মাছের চাষ চালু করে তা থেকে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এই

ডিম পাড়ে আর এরকম জলেই এদের বাচ্চা ফোটে। সাধারণ রুই-কাতলা প্রভৃতি মাছ কিন্তু ভরা নদীতে, স্রোতের জলে বা হ্রদ প্রভৃতি বিশাল আকারের জলাশয়ে বংশবৃদ্ধি করে। সাধারণ রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের সঙ্গে এরা টিকতে

পারে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একই পদ্ধত্রে ওসব মাছের সঙ্গে 'সাইপ্রিনাস কার্পিও'র চাষ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, সাধারণ রুই-কাতলা প্রভৃতি মাছের দ্বারা নতুন মাছের বৃদ্ধিতে কোন বাধা ঘটে না এবং নতুন মাছের দ্বারাও ওসব সাধারণ মাছের বৃদ্ধিতে কোন তারতম্য ঘটে না।

এসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফল থেকে এ রাজ্যের মাছের চাষীরা ব্যাপকভাবে এই নতুন রুইমাছের চাষে সাহায্য পেতে পারেন। 'সাইপ্রিনাস কার্পিও'র বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা বিপুল, কাজেই বাইরে থেকে পোনা সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার না করেই অল্প সময়ের মধ্যে এ মাছের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাবে।

দ্বিফসলী চাষের জন্য সর্বাধি দরে বীজ ও সার

দামোদর উপত্যকা ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় সেচের যেসকল সর্বাধি দেওয়া হয়েছে, সেসব যাতে কৃষকেরা গ্রহণ করেন সেজন্য এবং বর্তমানে যেসব জমিতে বছরে একটিমাত্র ফসলের চাষ করা হয় সেগুলিতে দ্বিফসলী চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ সাহায্যকে বীজ ও সার সরবরাহ করা হবে। চলতি আর্থিক বছরে এই পরিকল্পনার ব্যয় পড়বে আনুমানিক ৪২ হাজার টাকা। যাঁরা সর্বাধি পাবেন তাঁদের কাছ থেকে অধিক খরচ আদায় করা হবে।

খাদ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রী-সমিতি

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ব্যবস্থার সুপারিশ করবার জন্য সরকার নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছেনঃ মৃদুমন্ত্রী, খাদ্য গ্রাণ ও সংভরণ মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী, উন্নয়ন এবং উদ্ভাস্তু গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (কারা) এবং উদ্ভাস্তু গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের উপমন্ত্রী।

এলাচ গাছের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা

দার্জিলিঙ জেলার একটি অর্থকরী ফসল এলাচ। গত কয়েক বছর ধরে এই জেলার এলাচ গাছগুলি 'ফুরকি' রোগের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগ সম্বন্ধে তদন্ত ও এর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যক্রম চালু আছে। এই কার্যক্রম আরও তিন বছর চালু থাকবে।

ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি কার্যক্রম চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার উপযোগী এবং অধিক রস দানে সক্ষম শ্রেণীর ইক্ষু আবিষ্কার এবং উৎপাদনব্যয় হ্রাসের জন্য কৃষিপদ্ধতি উন্নততর করার উদ্দেশ্যে সরকার আরও দু' বছর এই কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন।

রাস্তাঘাটে মাল পরিবহণের জন্য সমবায় সমিতি

সরকার মাল পরিবহণ কৃত্যক চালাবার উদ্দেশ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠনের এক পরিকল্পনা চালু করার সিদ্ধান্ত করেছেন। পর্যাপ্ত মাল পরিবহণের সুযোগ আছে, এরকম সকল আন্তঃশহর বা আন্তঃরাজ্য পথে উক্ত সমিতি মাল পরিবহণের গাড়ি চালাবে। চলার পথগুলি নির্বাচন করবেন সরকার এবং উক্ত সমিতির সদস্য ও পরিচালক মনোনয়নের জন্য পরিবহণ মহাধ্যক্ষের অধীনে একটি পর্ষদ গঠন করা হবে।

উত্তরবঙ্গে থেকে ধান-চাল চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা

১২ই জুন (১৯৫৯) তারিখের বিশেষ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৯৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান-চাল নিয়ন্ত্রণাদেশের ৫ম অনুচ্ছেদ-বলে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার স্থল ও জলপথে বা বিমানযোগে ধান বা চাল চালানোর উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, তা মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

মধ্যে ধান-চালের আন্তঃজেলা চলাচলের উপর প্রযোজ্য নহে। এই জেলাগুলির মধ্যে আন্তঃজেলা চলাচল বিধিসংগত হ'লেও, উত্তরবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে গঠিত এলাকার মধ্যবর্তী

কোন স্থান থেকে এই এলাকার বাইরের কোন স্থানে কোনরূপ চালান দেওয়া চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে চলাচল বিধিসংগত হ'লেও, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে চলাচল 'পারমিট' ব্যতীত বিধিসংগত নয়।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাধুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণালয় অধীক্ষক
শ্রীশঙ্করেন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মদ্রিত।

পবসমু-৫২/৬০-৩৮৪২এফ-৪, ৮৫৫

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer) এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং'

পত্রিকা পড়ুন

কৃষকদের নিজস্ব পত্রিকা এটি। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা করছেন আর যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবকিছু জানতে পাবেন আপনি এই পত্রিকায়। সহজ ইংরেজীতে রচিত এর চিত্রগ্রাহী রচনাগুলি—ছাপা হয় নানা বর্ণে। 'ম্যান অফ দ্য মাস্থ', 'হিস্ট্রিস্ টু দ্য ফার্মার', 'কোম্পেন্স্ উইথ্ অ্যান্সাস', প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ আছে এতে; তা ছাড়া থাকে পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বৃক্ষপালন প্রভৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্যের মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে। 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং' কৃষকের বন্ধু।

মূল্য

প্রতি সংখ্যা—৫০

বার্ষিক চাঁদা—৯

ছবিতে ভর্তি আর দ্রুত রঙে ছাপা
এজেন্সির শর্তের জন্য আবেদন করুন

এই কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন

Business Manager :

INDIAN FARMING

Indian Council of Agricultural
Research, Queen Victoria Road,
New Delhi.

I am interested in the *Indian Farming*. Kindly enrol me as a member and send the first copy by V. P. P. covering Annual/Half-yearly subscription.

Name :

Address :

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রামপুরহাট	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	মাঝেরআট	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুদা (মেদি: দঃ)	কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড।
৭। রানাঘাট	রানাঘাট	রানাঘাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮। ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড	ঘাটাল।
৮। কান্দি	ধাগড়াঘাট	কান্দি।	২৯। তমলুক	তমলুক (আউট এন্টেন্সি)	তমলুক।
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁধি	কণ্টাই রোড	কাঁধি।
১০। লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ	বালুরঘাট।
১৩। রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩। মালদহ	মালদহ কোর্ট	মালদহ।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাভাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪। জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫। আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬। দার্জিলিং	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭। কালিম্পাং	শিলিগুড়ি	কালিম্পাং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮। শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। মাথাভাঙ্গা	কোচবিহার	মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চবিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওলাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেন্ডু।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিম বঙ্গ

সরকারের



কুইনিন

খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ

বঙ্গবাসীকে পথপ্রদর্শিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক

গবর্ণমেন্ট কুইনিন সেল ডিপো

ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩

দে'জ মেডিকাল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

৯২বি লিগুসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

এবং সব বড় বড় ঔষধালায়ে পাওয়া যায়।

৬৭-৪৪-৫৪

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ৰ্যাত্ত চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর
২। ঐ ..	জয়নগর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়
৫। ঐ ..	ক্যানিং
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ
৮। ঐ ..	মথুরাপুর
৯। ঐ ..	কুলপী
১০। ঐ ..	সাগর
১১। ঐ ..	বারাকপুর
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া, পো: নৈহাটী
১৩। ঐ ..	বারাসাত
১৪। ঐ ..	হাবড়া
১৫। ঐ ..	বসিরহাট
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ
১৭। ঐ ..	সদেখখালি
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	বেহালা
৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বারুইপুর
৭। ঐ ..	হাবড়া, পো: তববেড়িয়া
৮। ঐ ..	বনগাঁ
৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১০। ঐ ..	বাগ্‌দা
১১। কৃষি-গোপালন শিল্প চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট।	শিক্ষালয়ের পশু-

বহুত্ব

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া
নতুন মহাকরণভবন, চারতলা,
১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	প্রাথমিক	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক হাওড়া
২।	ঐ ..	ডোমজুড়	২।	ঐ .. উলুবেড়িয়া
৩।	ঐ ..	আমতা	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা। উলুবেড়িয়া
			৪।	ঐ .. বাগনান
			৫।	ঐ .. শ্যামপুর
			৬।	ঐ .. ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,
পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	বেথুরাডহরি	২।	ঐ ..	রানাঘাট
৩।	ঐ ..	রানাঘাট	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া কলোনি
৪।	ঐ ..	শান্তিপুর	৪।	ঐ ..	চাকুদা
			৫।	ঐ ..	হাঁসখালি
			৬।	ঐ ..	রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,
পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	হরিহরপাড়া	২।	ঐ ..	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ ..	দমকল	৩।	ঐ ..	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ ..	রঘুনাথগঞ্জ	৪।	ঐ ..	কান্দি
৫।	ঐ ..	ভগবানগোলা	৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলভাঙ্গা
৬।	ঐ ..	ধুলিয়ান	৬।	ঐ ..	বারগুমান, পোঃ পাঁচখুপী
৭।	ঐ ..	নবগ্রাম	৭।	ঐ ..	কান্দি
			৮।	ঐ ..	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশচন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪।	ঐ ..	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫।	ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ	
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর	
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..		হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..		কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ ..	যুম	
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ	
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যানি	
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি	
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..		কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..		কালিম্পাঙ
৪।	ঐ ..		শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		রংলি-রংলিয়াট, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..		ফুলবাঙ্গার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..		সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
৮।	ঐ ..		কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ	
৩।	ঐ ..	মাথাভাঙ্গা	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..		তুর্কানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		দিনহাটা
৪।	ঐ ..		সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	দোমহানি
২।	ঐ	বীরপাড়া
৩।	ঐ	কালচিনি
৪।	ঐ	আলিপুরদুয়ার

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	জলপাইগুড়ি
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ	ময়নাগুড়ি
৪।	ঐ	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	স্বাক্ষর	গুস্করা
২।	ঐ	মেমারী
৩।	ঐ	সেহারাভাঙ্গার
৪।	ঐ	কালনা
৫।	ঐ	কাটোয়া
৬।	ঐ	নতুনহাট
৭।	ঐ	আসানসোল
৮।	ঐ	রানীগঞ্জ
৯।	ঐ	দুর্গাপুর

১।	স্বাক্ষর	বর্ধমান
২।	ঐ	কাটোয়া
৩।	ঐ	কালনা
৪।	ঐ	আসানসোল
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ভাতার
৬।	ঐ	মঙ্গলকোট
৭।	ঐ	শক্তিগড়
৮।	ঐ	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	স্বাক্ষর	সাঁইখিয়া
২।	ঐ	বোলপুর
৩।	ঐ	দুবরাজপুর
৪।	ঐ	রামপুরহাট
৫।	ঐ	নলহাট

১।	স্বাক্ষর	সিউড়ি
২।	ঐ	রামপুরহাট
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	নলহাট
৪।	ঐ	মহম্মদাবাজার
৫।	ঐ	আমেদপুর
৬।	ঐ	বোলপুর, শ্রীনিকেতন

হুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুঁচুড়া

১।	স্বাক্ষর	চুঁচুড়া
২।	ঐ	জিবেণী
৩।	ঐ	শ্রীরামপুর
৪।	ঐ	তারকেশ্বর

১।	স্বাক্ষর	চুঁচুড়া
২।	ঐ	শ্রীরামপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	আরামবাগ
৪।	ঐ	খানাকুল
৫।	ঐ	পুরসুরা, পোঃ চাঁপাডাঙ্গা
৬।	ঐ	পৌলবা, পোঃ চুঁচুড়া

মোদিনীপুর এলাকা

মোদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মোদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মোদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মোদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মোদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুয়া
১২।	ঐ ..	কীরপাই

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মোদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটাশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা	
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়	
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর	
৫।	ঐ ..	সোনিমুখী	
৬।	ঐ ..	খাতরা	

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর	
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনিমুখী	
৪।	ঐ ..	পাতিয়ায়	
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ	

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর	
৩।	ঐ ..	মানবাজার	
৪।	ঐ ..	ঝালদা	
৫।	ঐ ..	কাশীপুর	
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর	

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর	
৩।	ঐ ..	হুয়া	

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি।

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমল ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			শেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

নতুনের অভিযান...



দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাদা জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেরেছে সে নতুনের আশ্বাস.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামী পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে
চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিটার

PR 2-X52 BG

সুচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	১৪৫
গ্রাম-উন্নয়ন	১৪৭
ভারতে আঙ্গুরের চাষ	১৪৯
গবেষণার সাহায্যে মৎস্যচাষের উন্নয়ন	১৫৩
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে কৃষি-উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৫৬
খরিফ খন্ডে তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান	১৭১
সমবায় বাঁচিয়েছে	১৭৩
ধানের সাধারণ কীটশত্রু	১৭৭
বীজস্থপারি নির্বাচন ও স্থপারির চারা উৎপাদন	১৭৯
রাষ্ট্রীয় শস্যগোলা	১৮১
টুকিটাকি	১৮৪

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (স্লাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিষাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।



বন্ধুধরা

১২শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে চা'লের যে ঘাটতি চলছে, সে বিষয়ে সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ জানান যে, আমাদের রাজ্যে দোফসলী জমি সমেত চাষের জমির পরিমাণ ১৪০ লক্ষ একর, তার মধ্যে ১০০ লক্ষ একরে ধানের চাষ হয়। বিভিন্ন জেলাতে মিলে বছরে যে ধান উৎপন্ন হয় তা থেকে চা'ল পাওয়া যায় গড়ে প্রায় ৪৩ লক্ষ টন। তবে, পোকাকার আক্রমণে এবং অন্যান্য কারণে কিছু চা'ল নষ্ট হয়, বীজের জন্য কিছু শস্য ব্যবহার হয়—এসকল বাদ গিয়ে থাকে ৩৮ থেকে ৩৯ লক্ষ টন। কিন্তু এ রাজ্যের অধিবাসীদের চা'লের প্রয়োজন হয় বছরে ৪৭-৪৮ লক্ষ টন। অর্থাৎ বছরে ঘাটতি পড়ে ৯ লক্ষ টনের।

কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী বলেন যে, আরও ৯ লক্ষ টন চা'ল বেশি জন্মালেই চলবে না, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা দিকে লক্ষ্য রেখে, এ রাজ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য বছরে আরও ১২ লক্ষ টন চা'ল বেশি উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বছরে আরও ১২ লক্ষ টন চা'ল বেশি জন্মানোর লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য রাজ্যসরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন দফতর সম্প্রতি যে পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য আবশ্যিক আর্থিক মঞ্জুরি যদি পাওয়া যায়, তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাত তা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে। বেশি পরিমাণ ধান উৎপাদন করার

জন্য চাষীরা যাতে দরকারমত ভাল বীজ, সার এবং সেচের জল পেতে পারেন, সেদিকে অবশ্যই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন সংক্রান্ত কর্ম পরিচালনার ভার একজন আধিকারিকের হাতে থাকার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। বীজ, সার, সেচের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আবশ্যিক দ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব থাকবে তাঁর উপর। গত জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি মন্ত্রিসভার খাদ্যোৎপাদন বিষয়ক উপ-সমিতির সঙ্গে এবং খাদ্যোৎপাদন দফতরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সমিতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে যে বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে—চাষীদের উন্নত ধরনের বীজ দেওয়া দরকার এবং বিশেষ করে বীজ বণ্টন করা প্রয়োজন সেইসব অঞ্চলেই যেখানে চাষের জমিতে সেচের জল পাবার সুবিধা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন ২৬ লক্ষ একর চাষের জমিতে সেচের জল পাওয়া যায়। আগামী দু' বছরের মধ্যে দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠান থেকে আরও দু' লক্ষ একর জমিতে এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা থেকে আরও এক লক্ষ একরে সেচের জল পাওয়ার সুবিধা হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষিমন্ত্রী জানান যে, সেচের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিপুল উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সুপারিশ করেছেন উক্ত সমিতি। তবে, বড় বড়

সেচব্যবস্থার কাজ পরিচালনার ভার সেচ-বিভাগের উপর। পশ্চিম বাঙলায় এ পর্যন্ত সেচের উপযোগী নলকূপ বসানো হয়েছে ৭৩টি, তার মধ্যে ৩৬টি হয়েছে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এলাকাগুলোতে। গভীর নলকূপ বসিয়ে তার সাহায্যে সেচের জল সরবরাহ করার সম্ভাব্যতা নিয়ে সরকার থেকে চব্বিশপরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, মেদিনীপুর-বাঁকুড়া অঞ্চলে এ ধরনের নলকূপ বসানো আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিকর, কেননা ওসব জায়গায় এ ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী জল পাওয়া যায় না। একটি গভীর নলকূপ থেকে সাধারণত ২৫০ একর জমির উপযোগী সেচের জল পাওয়া যায়। এরকম একটি নলকূপ বসাতে খরচ পড়ে ৭০ হাজার টাকা। এ ছাড়া এ কাজে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যয়ও আছে।

খাদ্যোৎপাদন-মন্ত্রী ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে, দীর্ঘ পদ্ধতির প্রভৃতি জলাশয়ের সাহায্যে যাতে সেচের জলের ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে এ বিষয়ে আইনের কিছু সংশোধন করার কথা উঠতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অনেক দীর্ঘ পদ্ধতির অকেজো হয়ে পড়ে আছে—যেগুলো কাজে লাগালে সেচের দিক দিয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া সেচের জল যোগানোর উপযোগী ছোট ধরনের সাধারণ নলকূপ বসাবার কথাও ভেবে দেখতে হবে।

খাদ্যোৎপাদন-মন্ত্রী বলেন যে, নতুন পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয়, তবে বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা-গুলোর ব্যবস্থাপনা থেকে আরও ৮ লক্ষ একর জমিতে এবং ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনাগুলোর ব্যবস্থাপনা থেকে আরও ৫ লক্ষ একরে সেচের জলের যোগান পাওয়া যাবে। এর ফলে যে পরিমাণ

ধান বেশি উৎপন্ন হবে, তা থেকে চাল পাওয়া যাবে আরও ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন। এ ছাড়া, ৫৫ লক্ষ একর জমির উপযোগী উন্নত ধরনের বীজ যদি দেওয়া যায়, তবে আরও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন চাল বেশি পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গের ৩৮ হাজার গ্রামের জন্য ৩৮ হাজার মণ ভাল ধরনের বীজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন যে, পশ্চিম বাঙলায় যে পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োজন, তার শতকরা দশ ভাগও পাওয়া যায় না। এ রাজ্যের প্রয়োজন বছরে ৫ লক্ষ টন রাসায়নিক সার, আর, এ বছর ৩৮ পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৮ হাজার টনের কিছু বেশি। অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার টন রাসায়নিক সারও যদি এখন পাওয়া যায়, তবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন বেশি চাল পাওয়া সম্ভব হবে। 'কম্পাস্ট' প্রভৃতি জৈব সারের উপর আমাদের জোর দিতে হবে এবং মল-মূত্রের সার ব্যবহারের কথাও ভাবতে হবে। মল-মূত্রের সার এদেশে উপেক্ষিত, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী চীনদেশে এ সার সুপ্রচলিত হয়ে উঠেছে। 'কম্পাস্ট' বা পচা সার ছাড়া সবুজসারের উপর জোর দিতে হবে। ধানের চাষে সবুজসারের উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যথাযথভাবে সবুজসার প্রয়োগ করলে আরও এক লক্ষ ছয় হাজার টন বেশি চাল পাওয়া যেতে পারে।

সাংবাদিক বৈঠকে কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী তাঁর আলোচনার উপসংহারে বলেন যে, এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার উপর। তাঁর এই কথার প্রতি আমরা আমাদের চাষীভাইদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা ছাড়া কৃষি-উৎপাদনে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই ফলবতী হ'তে পারে না।

[স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন, পশু-চিকিৎসা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় প্রসারণ কৃত্যক মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে যে ভাষণ দিয়েছেন, এখানে তা প্রকাশ করা হ'ল—বঃ সঃ]

স্বাধীনতা পাওয়ার পরই সরকার দেশ গড়ার কাজে মন দিয়েছেন। তার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ লোকের বাস যেহেতু গ্রামেই তাই তাদের উন্নতির জন্য সরকার থেকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা। অর্থাৎ তাদের আর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু এ উন্নতির দায়িত্ব প্রধানত নিতে হবে গ্রামবাসীদের নিজেদেরই। কারণ, কোনও মানুষ খারাপ অবস্থা হ'তে যদি উঠে উঠতে চায় তা হ'লে তাকে যেমন স্বাবলম্বী হয়ে নিজের চেষ্টায় বড় হ'তে হয়, জাতির বেলাতেও তেমনি; সকলে আপন আপন চেষ্টা ও পরিশ্রমে সমাজ ও জাতিকে বড় করার জন্য কাজ করেন। আমাদের দেশে গ্রামীণ সমাজের কাঠামো গত দু'শ বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণে অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আজ হয়তো গ্রামের লোকেরদের সেই আত্মবিশ্বাস পুরোমাত্রায় নেই। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা না আনতে পারলে কোন মানুষ বড় হয় না, কোন সমাজকেও বড় করা যায় না।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এতদিনকার পরাধীনতার ফলে গ্রামের লোকের মেরুদণ্ড যখন দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন তাদের ঘাড়ে সমাজ-উন্নয়নের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? আমাদের গ্রামীণ সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু দায়িত্ব না দিলে কি মানুষ দায়িত্ব নিতে পারে? আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় বিদেশী সরকার তো বারবার বলতেন, ভারতবর্ষ জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষায় শতধা বিভক্ত, এ দেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা ডেকে আনা। আমরা সে কথা মানি নি এবং স্বাধীন হয়ে সমস্ত জাতকে দেখিয়ে দিয়েছি, গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ শাসন করতে আমরা কোন দেশের চেয়ে কম

শক্তিশালী নই। আমাদের দেশের জনসাধারণও দু'টি সাধারণ নির্বাচনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কেতাবী বিদ্যা না থাকলেও তাঁরা কত দূরদর্শী, কত শক্তিশালী, কত শান্তিপ্রিয়।

আমাদের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, আমরা সমাজ-উন্নয়ন রকে অনেক টাকা খরচ ক'রে রাস্তা করে দিয়েছি, পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি, স্কুল খুলে দিয়েছি, কোন কোন গ্রামে লাইব্রেরি-ও ক্লাব গড়ে দিয়েছি, কিন্তু সব করার পরে দেখা গিয়েছে, গ্রামের লোক যতটা উৎসাহ নেওয়া দরকার ছিল ততটা উৎসাহ নেন নি। তার ফলে, তাঁর রাস্তা আবার খারাপ হয়ে গিয়েছে, সরকার হ'তে টাকা না দিলে স্কুল আর চলে না, আর গ্রামের লোকও আর্থিক উন্নতির পথ খুঁজে পান না। এ অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে গ্রামের লোকেরা নিজেরা এগিয়ে না আসেন, কাজ করার দায়িত্ব না নেন, সেখানে কোন স্থায়ী উন্নতি হয় না।

গ্রামে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরি ইত্যাদির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং এসব গ'ড়ে তোলার জন্য সরকারী সাহায্যও কিছুটা দরকার। কিন্তু গ্রামের মূল সমস্যা হ'ল দু'টি—কৃষি ও কুটিরশিল্প। গ্রামের লোক ভাতকাপড় না পেলে সমাজ-উন্নয়নের বুনিনাশ শক্ত হবে না। কৃষির উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থার প্রয়োজন। বীজ, সেচ, সার, কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা পাকাপাকি যেমন হওয়া দরকার, তেমনি কৃষকের জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও দরকার। কৃষির উন্নতি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় কৃষক রোগে ভুগছে, বা সমবায় সমিতিতে যোগ দেওয়ার অর্থ বৃদ্ধিতে পারছে না, তা হ'লে চাষ-আবাদ বাড়ানোর পথে বাধা পড়বে। সুতরাং গ্রামের লোকের জন্য ঔষধপত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। কৃষির উন্নতি যাতে দ্রুত হয় সোঁদিকে দেখতে হবে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে শুধু কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না, কুটিরশিল্পের উন্নতির

ব্যবস্থাও করতে হবে। এই দুই মূল সমস্যার সমাধান যাতে ভালভাবে হয় আমাদের সকলের তা দেখতে হবে। আর গ্রামের লোক যদি চাষ-আবাদ ও কুটিরশিল্পে দৃঢ় পয়সা ঘরে তুলতে পারে তা হ'লে অন্য সবদিকে তার উৎসাহও বেড়ে উঠবে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রম এই দুই মূল সমস্যার উপর দৃষ্টি রেখে গড়া হয়েছে। কৃষির জন্য রাসায়নিক ও জৈবিক সার এবং তার সঙ্গে সবজিসার চাষী যাতে পান ও তৈরি করতে পারেন, ছোট ছোট পুকুর উদ্ধার ক'রে, কুয়ো ও নলকূপ খুঁড়ে এবং পাম্প বসিয়ে সেচের জন্য জল পেতে পারেন, চাষের সময় কৃষিঋণ ও কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন সেসব বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দেবার জন্য প্রতি ব্লকে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ আছেন। কিন্তু গ্রামের লোক নিজেরা যাতে দায়িত্ব নিয়ে এসব কাজ করতে পারেন তার জন্য গত মাসে মহাশূরে উন্নয়ন মহাধক্ষদের এক সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে, পণ্ডায়েত ও সমবায় সমিতির মারফত আসল কাজ করা হবে এবং প্রতি গ্রামে পণ্ডায়েত ও সমবায় সমিতি গড়া হবে। পশ্চিম বাঙলায় পণ্ডায়েত গঠন শুরুর হয়ে গিয়েছে এবং সমবায় সমিতিও গড়া হচ্ছে।

আমরা গ্রামে যদি অনুকূল অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি এবং গ্রামের লোক যদি নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে খেটে নিজেদের অবস্থা ফেরাবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন, তা হ'লে দীন ভারতবর্ষকে আমরা আবার সোনার ভারত ক'রে গড়ে তুলতে পারি। চাষ-আবাদের সময় ছাড়া অন্য সময় গ্রামের লোক তো ব'সে সময় কাটান। বাড়িতে যদি একটু সর্বাঙ্গ-বাগান করা যায়, হাঁসমুরগি পোষা যায়, তা হ'লে চাষী নিজেও কিছু পুষ্টিকর খাবার পান এবং বাড়তি জিনিস বেচে দৃঢ় পয়সা ঘরে আনতে পারেন। ঘরের মেয়েদের অনেক অবসর সময় থাকে। সে সময় চরকা কেটে, আচার তৈরি ক'রে, খড় বা পাটের দড়ি তৈরি ক'রে সংসারে সহজে সচ্ছলতা আনতে পারেন। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ঘরের মেয়েরা

ঘরের কাজ ক'রেও ছোটখাট কুটিরশিল্পে মন দেন এবং অবসর সময়ে অনেক কাজ করেন।

সমাজ-উন্নয়নের কাজে আমরা যতটা আশা করেছিলাম তত বেশি কাজ হয়তো হয় নি। কিন্তু আগেই বলেছি, সমাজ-উন্নয়নের কাজে সমাজের লোকেদের অর্থাৎ গ্রামবাসীদের নিজেদের এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। হতাশ হবার ঠকান কারণ নেই, চেষ্টা করলে আমরাও সফল হব।

আমাদের নিকট-প্রতিবেশী চীনদেশের কথা ধরা যাক। চীনদেশের লোকেরা রাতারাতি অনেক উন্নতি করেছে, খবরে পড়া যায়। কিছু খবর হয়তো বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, চীনের অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রম করে। কলিকাতার চীনা ছুতোরমিস্ত্রীদের যাঁরা কাজ করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন কত কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা কত ভাল কাজ করেন এবং তার জন্য আমরা বেশি পয়সা দিতেও রাজী হই। চীনাদের মত আমরাও যদি দিনে অন্তত আট ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করি, কাজে ফাঁকি না দিই এবং তাঁদের মত আত্ম-নির্ভরশীল হই, তা হ'লে আমরাও আমাদের দেশকে বড় করতে পারি।

আজ পুণ্য স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের দেশকে বড় ক'রে তুলতে আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমত পরিশ্রম করব, নিজের নিজের গ্রামের উন্নতি করতে গ্রামবাসী সকলকে একত্রিত করব, নিজের নিজের সংসারে সুখ আনতে আত্মনির্ভর হব। সেই দেশই তো স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদ পাবে যেখানে প্রতিটি লোক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ের ওপর নিজে দাঁড়াতে পারে, জীবনধারণের জন্য অন্য কারও মন্থাপেক্ষী হয়ে থাকে না। গান্ধীজী আমাদের আত্মনির্ভর হবার শিক্ষাই দিয়েছেন; আজ এই পুণ্য দিনে আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ ক'রে আমাদের কাজে আরও জোরের সঙ্গে এগিয়ে যাবার ব্রত গ্রহণ করি।



ভারতে আঙ্গুরের চাষ

শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষ দস্তিদার

ডাক্তার বললেন, “আঙ্গুর, বেদানা, ন্যাসপাতি
খাও—অসুখ সেরে যাবে।”

“বাব্বাঃ, আঙ্গুর-বেদানা! ডাক্তারের কী? আঙ্গুর
তো চার টাকার কম বাজারের কোথাও পাওয়া
যায় না। ও কি আর আমাদের দেশী ফল?”

সত্যি কি আঙ্গুর বিদেশী ফল? ভারতের
মাটিতেও যে আঙ্গুর যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে সে
ধারণা অনেকেরই নেই। যেসমস্ত আঙ্গুর আমরা
বাজারে দেখি তা আমাদের দেশে কাস্মীর কিংবা
আফগানিস্থান অথবা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে
আমদানি ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। একথা
শুনলে অনেকে আশ্চর্য হবেন যে, আমাদের দেশে
বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, মহাশূরে এবং মাদ্রাজে
আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে
আঙ্গুরের চাষ হচ্ছে।

আঙ্গুর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল। সবচাইতে
উপাদেয়, স্বাস্থ্যপ্রদ আর বলকারক ফল হিসাবে
আঙ্গুরের আদর পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু দ্রুতের
বিষয়, পৃথিবীতে যা আঙ্গুরের ফলন হয়, তার প্রায়
৮২ শতাংশ আঙ্গুরের স্ৱারাই মদ তৈরি হয়।
কাজেই আঙ্গুর সর্বসাধারণের ভোগ্য ফল হয়ে
উঠতে পারে নি

আঙ্গুর ফলই শূদ্ধ দেখতে সুন্দর নয়, এর
লতাও খুব সুন্দর হয়। ইংলন্ডে পঞ্চদশ ষোড়শ
শতাব্দীতে আঙ্গুরলতারকে বাড়ির বাইরে সুন্দর
ক'রে মাচায় তুলে দেওয়া হ'ত। একে গৃহকর্তার
শিল্পীমনের ও সমৃদ্ধির পরিচয় ব'লে ধরা হ'ত।
ভারতে এই ফলের চাষ কবে আরম্ভ হয় সঠিক বলা
যায় না, তবে বোধ হয় ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইরান ও
আফগানিস্থান থেকে মুসলমানরাই প্রথম ভারতে
আঙ্গুর নিয়ে আসেন।

আঙ্গুরের চাষ করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের
জানতে হবে; আঙ্গুর কয়প্রকার, আবহাওয়া ও
জমি কেমন হবে, জল ও সার কতটা দরকার, কী
ক'রে লতা লাগাতে হবে, যত্ন নিতে হবে এবং
আরও নানা খুঁটিনাটি বিষয়।

সব আঙ্গুরকেই মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা
যায়ঃ (১) ‘টেবিল গ্রেপ’—যা টাটকা টাটকা খাওয়া
যায়, এবং (২) ‘রেইজিমস্’—এইজাতীয় আঙ্গুর
খেতে সুস্বাদু, তবে এর বেশির ভাগই ভবিষ্যতের
জন্য শুকিয়ে রাখা হয়। আর-এক ধরনের আঙ্গুর
আছে, যা থেকে আরক ও খুব ভাল মদ তৈরি করা
হয়। আঙ্গুরের আকার, রঙ, রস বিচার ক'রে
এই তিন ভাগ করার পরও, বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন
আঙ্গুরগুলিকে নানা রকমের নাম দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুর

বোম্বাই-দাক্ষিণাত্যের এবং হায়দরাবাদে সাধারণত
বোকারী, পাকতি, পাদরী সাহেব, কার্লি সাহেব,
গোলাবী, কান্দারী, আন-ই-সাহী প্রভৃতি নানা
ধরনের আঙ্গুর জন্মায়। মহাশূরে বাঙ্গালোর
রুদ্র, এবং মাদ্রাজে পাঁচী দ্রাক্ষীই বেশি জন্মে থাকে।
একদম অন্য ধরনের আঙ্গুর জন্মায় পাঞ্জাবে, যার
নাম ‘ডাক’।

হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই
‘বোকারী’ জন্মে। এই আঙ্গুরগুলি গোল, সবুজ,
রসাল আর মিষ্টি। এই আঙ্গুর দেখতে সুন্দর,
থোকাগুলি বড় মোচাকৃতি আর বাঁধুনিও খুব ভাল।
ফলনও যথেষ্ট।

মহাশূরে যে ‘বাঙ্গালোর রুদ্র’ জন্মায় সেইগুলি
একদম অন্য রকমের। রঙটা নীল আর হলদে,
আকার গোল, মাংসল, রসাল আর মিষ্টি। রস ঘন
ব'লে বোতলে রেখে দেওয়া যায়। থোকাগুলোও
ভাল হয়।

পাঞ্জাবে যে 'ডাক' জাতীয় আঙ্গুর জন্মায় তার রস অত্যন্ত ঘন আর ফলনও প্রচুর। তাই এই আঙ্গুরের চালান হয় নানা দেশে।

এইগুলি ছাড়া আরও নানা জাতীয় আঙ্গুরের চাষ আছে, তবে তাদের সুস্বাদু পার্থক্য বিশেষজ্ঞ ছাড়া সহজে ধরা পড়ে না।

রকমারি আমদানি

কিসমিস, ম্যাসকাট, হ্যামবুর্গ ব্ল্যাক হ্যামবুর্গ এবং গ্রস কোলম্যান প্রভৃতি নানা ধরনের আঙ্গুর ভারতের দক্ষিণে, উত্তরে ও পশ্চিমে ৩০ বৎসর ধরে চাষ করা হচ্ছে। ফলে বেলুচিস্থানে আজকাল যে কিসমিস হচ্ছে তা কালিফোর্নিয়ার বীচিশুনা 'টমসনের' সাথে তুলনার যোগ্য। এই ধরনের সুস্বাদু আঙ্গুর মাদ্রাজে মাদুরা জেলার অন্তর্গত পটিভিরামপটি ও গ্যানগুভারপটিতেও ফলানো সম্ভব হয়েছে। কাজেই আমাদের কাছে আঙ্গুর মূল্যবান ফল হ'লেও দেশে কিন্তু খুব কম আঙ্গুর জন্মায় না। ফলনও ভাল আর জাতও এর উৎকৃষ্ট।

আবহাওয়া

আঙ্গুর জন্মানোর জন্য প্রয়োজন উষ্ণ, শুষ্ক, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্ম আর শীতের বৃষ্টি। নতিশীতোষ্ণ ব'লে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সমশীতোষ্ণ ও আর্দ্রগ্রীষ্মে আঙ্গুর জন্মায় না। বায়ুতে আর্দ্রতার ভাব বেশি থাকলে আঙ্গুর-গাছে ছত্রাক রোগ দেখা দেয়, গাছও নষ্ট হয়ে যায়। উত্তর ভারতে কোদাই কানাল অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, সেখানে মূল্যবান সব দ্রাক্ষালতার চাষ আরম্ভ হয়েছে। বৎসরে বৃষ্টিপাত ২০ ইঞ্চির বেশি হয় না ব'লে, ফল বড় হয় আর তাতে মিষ্টত্বও থাকে।

বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে ১,০০০ একর জমিতে আঙ্গুরের চাষ শুরুর হয়েছে। এই অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার দু'হাজার ফুট উঁচু ব'লে এবং বৃষ্টিপাতও কম ব'লে বায়ু শুষ্কই

থাকে কাজেই আঙ্গুরের চাষও ভাল হয়। বর্তমানে অবশ্য বায়ুর আর্দ্রতা কমানোর জন্য দ্রাক্ষার বাগানে বায়ুরোধক গাছ আর ঝোপে ঝোপে আঙ্গুরের কুণ্ডলী বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

জমি

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, "আঙ্গুরচাষের জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন কোন জমির প্রয়োজন হয় না"। যে-কোন জমিতেই আঙ্গুর জন্মে। তবে দেখা গেছে, সহজ ভূগুর, হালকা, অল্প অল্প কালো দো-আঁসলা জমিতেই আঙ্গুরের ফলন ভাল হয়। তবে জমিটা যেন শক্ত আঠালো কিংবা চুনা জমি না হয়। আর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনমতেই জমিতে যেন জল না দাঁড়ায়।

রোপণ

আঙ্গুরলতার বংশবৃদ্ধি ঘটে কী করে? বীজ থেকে অথবা আঙ্গুরের পুরানো গাছ থেকে কলম করেও নতুন লতা জন্মানো সম্ভব। সাধারণত বীজ থেকে যে চারা করা হয় তা আগের গাছের মত ভাল হয় না। কিন্তু কলমের গাছগুলো সব সময়ই এক রকম হয়। কলম করার নিয়ম হ'ল, সাধারণত এপ্রিল ও অক্টোবরে গাছ যখন ছেঁটে ফেলা হয় তখন প্রায় এক ফুটের মত শক্ত ভাল ডাল কেটে নিতে হবে। প্রত্যেক ডালে যেন দু'একটা অঙ্কুর-উদ্গমের সম্ভাবনা রয়েছে এমন গিঠ থাকে। সমতলভূমি তৈরি করে ডালগুলো এক ফুট অন্তর লাগিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অঙ্কুর-উদ্গমের দু'একটি গিঠ উপরে থাকে। পরে ডালে কচিপাতা দেখা দিলে শিশু চারাটিকে সমস্ত মাটিসুন্দ তুলে প্রায় ১১ ফুট গর্ত করে লাগিয়ে দিতে হবে। অবশ্য সব সময় এই পদ্ধতিতেই চারা রোপণ করতে হবে তার কোন নিয়ম নেই। কলম কেটে সরাসরিও বাগানে লাগানো চলে। বরং এই ধরনের চাষে এক বছরের আগেই ফল পাওয়া যায় আর গাছটিও সতেজ হয়, কারণ এতে পুনরোপণের বালাই নেই।

এই কলম করার উপরই কিন্তু আঙ্গুরের ফলন, জাত ও মিষ্টত্ব নির্ভর করে। আঙ্গুরের চারা লাগানোর সাথে সাথে “পানগাস” জাতীয় এক ধরনের গাছও আঙ্গুরের চারার পাশে লাগিয়ে দিতে হবে। এই গাছেই আঙ্গুরলতাগুলো জড়িয়ে ওঠে। আর এই গাছের পাতা পড়িয়ে আঙ্গুরের জমির ভাল সারও হয়।

সার প্রয়োগ

আঙ্গুর জন্মানোর জন্য খইল ও সবুজ সারের প্রয়োজন। লতা ছেঁটে ফেলার পরই জমিতে সার দিতে হয় এতে গাছগুলো শক্ত হয় আর ফলনও ভাল হয়। যদি গাছগুলো কাছাকাছি লাগানো হয়, (যেমন ৮×৩ ফুট) তবে প্রতিটি গাছের গোড়ায় সার না দিয়ে, উপযুক্ত পরিমাণে সমস্ত জমিতে সার দেওয়াই ভাল। আগাছা জন্মে যেন জমির সার নষ্ট না করে সৌদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জলসেচ

আবহাওয়া ও জমির প্রকৃতির উপরই জলসেচের পরিমাণ নির্ভর করে। বোম্বাই-দাক্ষিণাত্যের কালো জমিতে এপ্রিলে ছাঁটাইয়ের ঠিক পরই তিনবারের বেশি জলসেচের প্রয়োজন হয় না। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির সময় জলের কোন প্রয়োজনই নেই। তারপর আবার অক্টোবরে ছাঁটাইয়ের সময় দু'একবার জলের প্রয়োজন হতে পারে।

ছাঁটাই এবং পরিচর্যা

আঙ্গুরলতা কী করে ছাঁটতে হবে, তা একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। ছাঁটাইয়ের উপরই ফলন বৃদ্ধি, জাত ভাল ও রসালো ফল হওয়া নির্ভর করে। বোম্বাই-দাক্ষিণাত্যে সাধারণত লতা-গুলিকে দু'দিকে বাড়তে দেওয়া হয়। এতে দেখা গেছে, ফল এবং ফলন দুই-ই ভাল হয়। লতাকে বেশি পরিমাণে লম্বা হ'তে দিলে গাছের রস কান্ডেই চলে যায়, তাতে গাছ এবং ফল ও ফলন সবই

খারাপ হয়। আবার গাছ বেশি ঝোপড়া হ'লেও ফল ভাল হয় না। আঙ্গুরলতা তাই বছরে দু'বার ছেঁটে ফেলতে হয়। চারা লাগানোর পর মাঝে মাঝে দু' সারির মধ্যের ফাঁকা জমি খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হয়। সবুজ-জাতীয় উদ্ভিদ গাছ আঙ্গুরলতার সাথে চাষ করে, বৃষ্টি হওয়ার আগেই সেগুলো মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এই সার দ্রাক্ষালতার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ‘পানগাস’-এর সাথে, অথবা বাঁশের সাথে লতা-গুলো ভাল করে বেঁধে দিতে হবে যেন মাটিতে না পড়ে।

চার মাসের কলমের গাছেই আঙ্গুরের ফলন আরম্ভ হয় আর ফলগুলিও মিষ্টি হ'তে থাকে। এই সময় ফলগুলিকে রাত্রি-দিন কাক-পক্ষীর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

রোগ ও মড়ক

নানা রকমের ছত্রাক রোগের হাত থেকে দ্রাক্ষালতাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই আঙ্গুরের চাষ করে ঘরে না তোলা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। একবার ছত্রাক রোগ দেখা দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বাগান নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য গাছ পুরানো হ'লে, এই রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষ ঘটে না। তাই বিশেষভাবে চারাগাছগুলোকেই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় জমিতে ‘সালফার’ মিশিয়ে ও ‘ব্রোডেন্স’ ছিটিয়ে।

পোকা

মাঝে মাঝে ‘উদয়া’ নামক পোকা আঙ্গুর গাছের ক্ষতি করে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে, গাছগুলোর আগা কয়েকদিন কলাগাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যখন দেখা যাবে ঐ কলা-পাতাতেই পোকাগুলো আশ্রয় নিয়েছে, তখন কেরোসিন দিয়ে ঐ পাতাগুলো জ্বালিয়ে ফেলতে হবে।

সংগ্রহ ও রপ্তানি

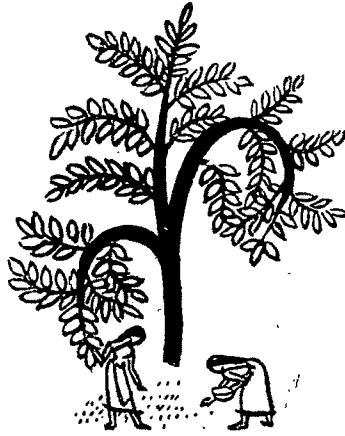
আঙ্গুর শব্দ দেখতেই নরম নয়, প্রকৃতিও এর অত্যন্ত রম্য। কাজেই আঙ্গুর তোলার সময় খুব সতর্ক হয়ে তুলতে হয়, গাছে বা থোকাতে যেন ঝাঁকুনি না লাগে। গাছে একদম পেকে গেলেই আঙ্গুর তুলতে হয়। ঘরে রেখে আঙ্গুর পাকানো যায় না। ছড়াসুন্দরই আঙ্গুর তুলতে হয়, তাতে দেখতেও সুন্দর হয় আর থাকেও কয়েকদিন।

অত্যন্ত নরম বলে, আঙ্গুর দূরে চালান দেওয়ার সময় খুব সাবধানে 'প্যাক' করতে হয়। বাগে

ভাল করে ঘাস, খড় দিয়ে আস্তে আস্তে আঙ্গুরের ছড়াগুলো সাজাতে হয়, যাতে ফলগুলো খেঁতলে না যায়।

ইংলন্ডে আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য কাঁচের ঘরে আঙ্গুরের চাষের রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও আঙ্গুর খুব কম জন্মায় না। আমরা যদি আরও একটু সচেতন হই তবে হয়তো যথেষ্ট পরিমাণেই আমাদের দেশে এই পুষ্টিকর, বলকারী আঙ্গুরের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত “গ্রেপ কালচার ইন ইণ্ডিয়া” পুস্তক অবলম্বনে



গবেষণার সাহায্যে

মৎস্যচাষের উন্নয়ন

চিল্কা হ্রদ। এখানকার জেলেরা নবাগত একদল লোকের কাজ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নবাগতরা মাছের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে, কিন্তু কী রকম যেন তাদের হাবভাব। তারা মাছ বিক্রি করে না, খায় না। তবে? মাছের সমীক্ষা করছে তারা।

জেলেরা যাই ভাবুক না কেন, নবাগতরা অম্ভুত কিছু একটা করার জন্য চিল্কা হ্রদে আসেন নি। তাঁরা একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন—সমীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে মৎস্যচাষ উন্নয়নের দায়িত্ব।

দেশের অন্যান্য স্থানের ধীবরদের মত চিল্কা হ্রদের ধীবররাও মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণার সূক্ষ্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ভারত-সরকার কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। এ ধরনের দু'টি কেন্দ্র ভারতে আছে। একটি কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে—দেশাভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষের জন্য এবং অপরটি দক্ষিণ ভারতের মন্ডপমে—সামুদ্রিক মৎস্যচাষের জন্য।

ভারতে প্রতি বছর দশ লক্ষ টনের কিছু বেশি মাছ ধরা হয়। বিশ্বের মৎস্য-প্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দেশের আভ্যন্তরীণ নদী ও জলাশয়গুলি থেকে পাওয়া যায়।

চিল্কাতে যে গবেষণা-কর্মীদল রয়েছেন তাঁরা দেশাভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্রের লোক। ১৯৪৭ সালে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে কী পরিমাণ মাছ পাওয়া যেতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার সমীক্ষা এবং সেগুলির

সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজ।

এই কেন্দ্রের আবার দু'টি উপকেন্দ্র আছে: একটি কটকে—পদ্মকিরণীতে মাছ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এবং অপরটি এলাহাবাদে—নদী ও হ্রদে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। তা ছাড়া বহু গবেষণা ইউনিট আছে। নদীর মোহানায় মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণা করে ব্যারাকপুরের কেন্দ্রটি।

এই কেন্দ্রের গবেষণা-কর্মীগণ দেশাভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ-কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবিরাম চেষ্টা করছেন। এই কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর থেকে তাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজও করেছেন।

‘ধর আর চাষ কর’—এই হ’ল এই কর্মীদের মূলমন্ত্র—মৎস্যচাষ উন্নয়নের দু'টি ভিন্ন পদ্ধতি।

‘ধরা’ বলতে বোঝায় জল থেকে মাছ ধরে মাছের উৎকর্ষ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ‘চাষ’ বলতে বোঝায় নতুন জলে মৎস্যচাষ। প্রথমটির সঙ্গে বনায়ন সংক্রান্ত গবেষণার তুলনা চলতে পারে। কারণ এখানে গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণালব্ধ ফলের যথাযথ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু পরেরটির সঙ্গে তুলনা চলে কৃষিকাজের, কারণ কৃষির মূল উদ্দেশ্য হ’ল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ব্যারাকপুরের কেন্দ্র যেসব বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে তার মধ্যে হুগলি নদীতে মাছের পরিমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য। এতে এই নদীতে মাছের বাড়তি-কর্মতির কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। ফলে, মৎস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে।

সম্প্রতি ভাল মাছের ডিমপোনার বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে। রুই, কাঁতা, মগেল ও কালবোস বন্ধ জলে চাষের উপযোগী। কিন্তু এগুলি সাধারণত বন্ধ জলে ডিম পাড়ে না। সেজন্য নদী থেকে ডিম সংগ্রহ করে বন্ধ জলে সেগুলি ফোটাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এর কতকগুলি অসুবিধা আছে। ব্যারাকপুরের কেন্দ্রে গবেষণা করে জানা গিয়েছে যে, এই মাছদের শরীরে পিটুইটারি হরমোন ইনজেক্ট করে দিলে এগুলি বন্ধ জলেও ডিম পাড়ে। এতে আসামে ও উড়িষ্যায় বাণিজ্যিক হারে মাছের ডিম উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

নদীতে মৎস্যচাষ সম্বন্ধেও এই কেন্দ্রে গবেষণা করা হচ্ছে। মাছের ডিম প্রচুর পরিমাণে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা জানা গিয়েছে। মৎস্য-

চাষের উপর দূষিত জলের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি ইউনিট গঠিত হয়েছে। কলকাতার ময়লা জল নদীতে ফেলার ফলে মৎস্যচাষ বিঘ্নিত হয়।

ইলিশ মাছ সংক্রান্ত গবেষণা ইউনিট ইলিশ মাছের পরিমাণ ও বাণিজ্যিক হারে ইলিশ-শিকারের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই অনুসন্ধানের ফলে বছরে বছরে ইলিশ মাছের বাড়তি-কমতির কারণ জানা যাবে।

সুন্দরবনে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণার একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। সারা বছরে নদীর মোহানায় বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে নৌকা দিয়ে মৎস্যশিকার সম্ভব নয় বলে এ অঞ্চলের মৎস্য-সম্পদ পুরাপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি।



পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ১৭ই জুন বারাকপুরে কেন্দ্রীয় দেশাভ্যাস্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যচাষ গবেষণা ভবনের উদ্বোধন করেন

ভারতে বিদেশী মাছের চাষ করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে থাইল্যান্ড থেকে আনা সাধারণ বাটা মাছ নিয়ে গবেষণা চলছে। এই মাছ পুকুরে প্রচুর ডিম পাড়ে। বিভিন্ন রাজ্যে এই মাছ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ভারতে এর চাষ সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এই কেন্দ্রে এক বছরের জন্য মৎস্যচাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজ্যসরকারের মৎস্যচাষ বিভাগের অফিসার, কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে বিদেশী শিক্ষার্থী এবং বেসরকারী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষালাভ করে। কৃতী শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

কলিকাতার কাছে ব্যারাকপুর্নে নতুন ভবনে উক্ত কেন্দ্রটি গত ১লা জুন স্থানান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ১৭ই জুন (১৯৫৯) আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনের উদ্বোধন করেন। ভবনটি নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে বারো লক্ষ টাকা। শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ও কেন্দ্রের কর্মচারীদের জন্য গৃহের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই গবেষণা কেন্দ্রের আরও সম্প্রসারণ করা হবে।



পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে কৃষি-উন্নয়নের সর্গক্ষপ্ত বিবরণ

এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট আটটি সারণীতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভারতের কৃষি-ফসল উৎপাদনের কার্য-ক্রম ও সাফল্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১নং সারণী।—এই সারণীতে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে) ভারতে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ধান্যবর্গীয় খাদ্যশস্য এবং ছোলা ও অন্যান্য ডাল প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে এইসকল ফসলের উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে; উপরন্তু চিনি, আখ ও তুলা উৎপাদনের পরিমাণও দেওয়া হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে গড়পড়তা শস্য উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টন গড়পড়তা ফসল উৎপাদনের পরিমাণ অতিক্রম করে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন হয়েছে। সারণীতে বাৎসরিক ফল উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যও দেখানো হয়েছে।

১৯৫১-৫২ সালে ফসল উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা ৪৩ লক্ষ টন কম হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতি বছরের ফসল সাধারণত নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়েছিল। গড়পড়তা হিসাবে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ফসল উৎপাদন করা হয়েছিল—যা এই পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট উৎপাদনলক্ষ্য ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন অপেক্ষা প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ১১ লক্ষ টন অতিক্রম করে ১৬ লক্ষ টনে উপনীত হয়েছিল,

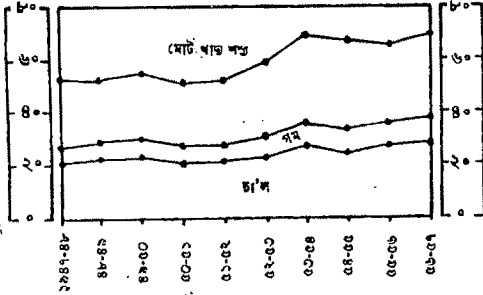
অর্থাৎ শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলাও এইভাবে শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.২ লক্ষ গাউ থেকে ৪০.২ লক্ষ গাউতে উন্নীত হয়।

২নং সারণী।—এই সারণীতে বুনিয়াদী বছরের (অর্থাৎ যে বছরের ফলনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনের চরম লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে) ফসলের পরিমাণ, ১৯৫৬-৫৬ সালে ফসল উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, প্রথম পরিকল্পনার প্রতি বছরের ফলনের প্রকৃত পরিমাণ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ফলনের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। এই সারণীতে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের খাদ্য-শস্য, ডাল, মোট খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ ফলনের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা অনেক বেশি হয়েছে। আখের ফলন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি—যদিও ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে আখ ও চিনি উৎপাদন সন্তোষজনক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে আখ ও চিনির উৎপাদন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছেছিল। ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছালেও ১৯৫৪-৫৫ সালে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্রম করে গিয়েছিল। পাটের উৎপাদনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় নি।

৩নং সারণী।—১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে এবং তার পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের চাল, গম, জোয়ার, বাজরা এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য মোট খাদ্যশস্য, ছোলা, অড়হর ও অন্যান্য ডাল, মোট ডাল এবং মোট খাদ্যশস্যের বাৎসরিক গড়পড়তা অতিরিক্ত ফলনের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫১-৫২ সাল

পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়পড়তা ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের স্থলে ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ প্রথম পাঁচ বছর অপেক্ষা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টন বেশি হয়েছিল। যেসব

স্বাধীনতালাভের পর খাদ্যশস্য উৎপাদন
দশলক্ষ টন



মূল্যে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য ৪০০ টাকা টন হিসাবে এই অতিরিক্ত ফসলের বাৎসরিক মূল্য ৫২০ কোটি টাকা অথবা শেষ পাঁচ বছরে মোট অতিরিক্ত ফসলের মূল্য ২,৬০০ কোটি টাকা।

৪নং সারণী।—এই সারণীতে খাদ্যশস্যের আমদানি ও রপ্তানির বিষয় বলা হয়েছে। শ্রদ্ধা ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে কিছু কিছু রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল। মোট ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করে আমরা ৮,৭৮,০০,০০০ টাকা পেয়েছিলাম। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে বাৎসরিক প্রায় ১৩৭ কোটি টাকা মূল্যে অন্তত ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ৪৭.০২ কোটি টাকা মূল্যে ৮.০৮ লক্ষ টন, ১৯৫৫ সালে ৩৩.১১ কোটি টাকা মূল্যে ৭ লক্ষ টন ও ১৯৫৬ সালে ৫৬.৩৪ কোটি টাকা মূল্যে ১৪.২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিন বছরে আমাদের খাদ্যশস্যের মোট আমদানি

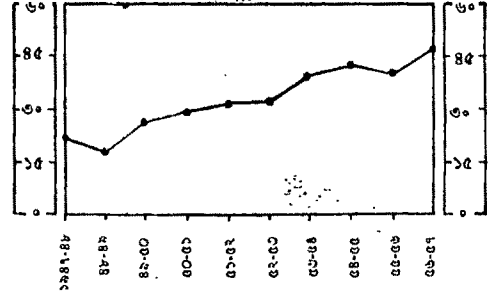
পূর্ববর্তী তিন বছরের গড়পড়তা বাৎসরিক আমদানি অপেক্ষা কম হয়েছিল। শ্রদ্ধা এই তিন বছরেই ভারত থেকে কিছু কিছু খাদ্যশস্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল।

৫নং সারণী।—১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত খাদ্যশস্য এবং ডালের একরপ্রতি ফলন ও মোট উৎপাদন ৫নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে:—

ধানসম্পর্কিত: চাল, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, রাগি, গম, যব ও ছোট জন্নার ইত্যাদি।

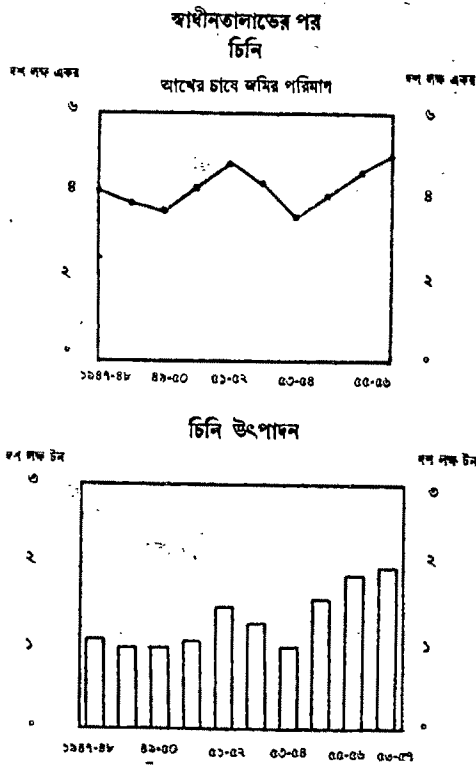
ডাল: ছোলা, অড়হর এবং অন্যান্য ডাল।

স্বাধীনতালাভের পর তুলা উৎপাদন
লক্ষ গাট



স্বাধীনতালাভের পর প্রথম পাঁচ বছরের ও তার পরবর্তী পাঁচ বছরের প্রতি দফার একরপ্রতি ফলন এবং মোট উৎপাদনের অঙ্ক ৫নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত গড়পড়তা একরপ্রতি ফলনও প্রতি দফায় ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত একরপ্রতি গড়পড়তা ফলন অপেক্ষা অনেক বেশি হয়েছে দেখা যায়। গমের একরপ্রতি গড়পড়তা ফলন ৫৮৫ পাউন্ড থেকে ৬৬৩ পাউন্ড (+১৩ শতাংশ) হয়েছে ও ভুট্টা ৫৬০ পাউন্ড থেকে ৬৯৫ পাউন্ড হয়েছে (+২৪ শতাংশ)। অন্যান্য ফসলের একরপ্রতি গড় ফলনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যথা—জোয়ার (৬৬ পাউন্ড), চাল (৮৮ পাউন্ড), ছোলা (৮৩ পাউন্ড), অড়হর (১৩৬ পাউন্ড) ও অন্যান্য ডাল (৪১ পাউন্ড)।

৬নং সারণী।—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দফার নির্ধারিত লক্ষ্যের স্থলে প্রকৃতপক্ষে কতটা কার্যকরী হয়েছে তার বিবরণ ৬নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে। প্রতি দফায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা



কাজ কী পরিমাণ কম হয়েছে তা এখান থেকে বোঝা যায়। ছোটখাট সেচব্যবস্থা হোক বা বড় সেচ-ব্যবস্থাই হোক, ভূমি উন্মার ও উন্নয়নই হোক বা

জৈব সার ও রাসায়নিক সার এবং উন্নত বীজের ব্যবস্থাই হোক—সব বিষয়েই কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা অনেক কম হয়েছে ও ন্যূন হিসাবে প্রায় ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রায় তিন ভাগের দু' ভাগ মাত্র কাজ করা হয়েছে।

চাষের জাপানী প্রথা ও অন্যান্য কার্যাবলী প্রচার করায় কৃষি-ফলনের ঘাটতি শুধু দূরীভূত হয় নি, কৃষিজাত ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বহুল অংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

৭নং ও ৮নং সারণী।—১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অ্যামোনিয়ম সালফেট ও স্ফাপারফসফেটের বার্ষিক উৎপাদন, আমদানি ও খরচ ৭নং ও ৮নং সারণীতে পৃথগ্ভাবে দেখানো হয়েছে। সূত্ররূপে দেখা যাচ্ছে যে, অ্যামোনিয়ম সালফেট ও স্ফাপারফসফেটের উৎপাদন, আমদানি ও খরচ বছরের পর বছর সমানভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৫৩ সালে ৪২৭.০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম সালফেট খরচ হয়েছিল এবং ১৯৫২ সালে ২৭৬.৩ টন খরচ হয়। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে অ্যামোনিয়ম সালফেটের খরচ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ১৯৫০ সালে ৩৬০ হাজার টন ও ১৯৫২ সালে ২৮.৭ হাজার টন খরচের স্থলে ১৯৫৩ সালে স্ফাপারফসফেটের খরচ বেড়ে ৫১.৪ হাজার টনে পৌঁছায়। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে স্ফাপারফসফেটের খরচ ১৯৫৩ সালের স্ফাপারফসফেটের প্রায় দ্বিগুণ হয়।

১নং সারণী

স্বাধীনতার পর খাদ্য, চিনি এবং তুলা উৎপাদন

খাদ্যশস্য			১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত ৫ বছরের গড়পড়তা
চা'ল (দশ লক্ষ টন)	..	..	২১.২	২২.৬	২৩.২	২০.৩	২১.০	২১.৬
গম	..	..	৫.৬	৫.৬	৬.৩	৬.৪	৬.১	৬.০
জোয়ার এবং বাজরা	..	..	৮.৮	৭.২	৮.৫	৮.০	৮.৩	৮.২
অন্যান্য খাদ্যশস্য	..	..	৮.১	৭.৯	৮.০	৭.০	৭.৫	৭.৭
মোট খাদ্যশস্য	..	..	৪৩.৭	৪৩.৩	৪৬.০	৪১.৭	৪২.৯	৪৩.৫
ছোলা এবং ডাল	..	..	৮.৩	৮.৪	৮.০	৮.৩	৮.৩	৮.৩
মোট খাদ্যশস্য--								
(ক) উৎপাদন	..	..	৫২.০	৫১.৭	৫৪.০	৫০.০	৫১.২	৫১.৮
(খ) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য	..	..	..	..	..	..	৫৫.৫	..
চিনি	..	..	১.১	১.০	১.০	১.১	১.৫	১.১
আখ (দশ লক্ষ একর)	..	..	৪.১	৩.৮	৩.৬	৪.২	৪.৮	৪.১
তুলা (এক লক্ষ গাঁট)	..	..	২১.৯	১৭.৭	২৬.৩	২৯.১	৩১.৩	২৫.২

স্বাধীনতার পর খাতি, চিনি এবং তুলা উৎপাদন

খাদ্যশস্য	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়পড়তা
চাউল (দশ লক্ষ টন)	২২.৫	২৭.৮	২৪.৫	২৬.৮	২৮.১	২৫.৯
গম	৭.৪	৭.৯	৮.৮	৮.৬	৯.১	৮.৪
জোয়ার এবং বাজরা	১০.৪	১২.৪	১২.৫	১০.০	১০.৪	১১.১
অন্যান্য খাদ্যশস্য	৮.৯	১০.২	৯.৯	৯.১	৯.৭	৯.৬
মোট খাদ্যশস্য	৪৯.২	৫৮.৩	৫৫.৭	৫৪.৫	৫৭.৩	৫৫.০
ছোলা এবং ডাল	৯.০	১০.৪	১০.৯	১০.৮†	১১.৪†	১০.৫

মোট খাদ্যশস্য--

(ক) উৎপাদন	৫৮.৩	৬৮.৭	৬৬.৬	৬৫.৩†	৬৮.৭	৬৬.৫
(খ) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য	৫৭.০	৫৮.৬	৬০.১	৬১.৬	৬৬.০†	৬০.৭
চিনি	১.৩	১.০	১.৬	১.৯	২.০২	১.৬
আখ (দশ লক্ষ একর)	৪.৩	৩.৫	৪.০	৪.৬	৫.০	৪.৩
তুলা (এক লক্ষ গাঁট)	৩১.৯	৩৯.৪	৪২.৩	৪০.০	৪৭.২	৪০.২

সং--কতক পরিমাণে সংশোধিত প্রাক্কলন

চু--চূড়ান্ত প্রাক্কলন

†সেই সময়কার মত

২নং সারণী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সাফল্য

শস্য	বুনিয়াদী বছর	নির্দিষ্ট লক্ষ্য ১৯৫৫-৫৬	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬ (সং)	(সংখ্যা নিম্নলিখিত বা দশ লক্ষ)	
								১৯৫৬-৫৭ (চ.)	১৯৫৭-৫৮ (চ.)
খাদ্যশস্য (টন)	..	..	..	৪৬.০০	৫২.৫০	৪২.৮৯	৪৯.২২	৫৫.৭৩	৫৮.২৭
ডাল (টন)	..	..	..	৮.০০	৯.১০	৮.২৯	৯.০৪	১০.৮৭	১০.৮৯
খাদ্যশস্য (টন)	..	..	..	৫৪.০০	৬১.৬০	৫১.১৮	৫৮.২৬	৬৬.৬০	৬৮.৭২
তৈলবীজ (টন)	..	..	..	৫.০৮	৫.৪৮	৪.৯৬	৪.৬৬	৬.২৪	৬.১১
আখ (গুড়) (টন)	..	..	..	৫.৬২	৬.৩২	৬.০৭	৫.০২	৫.৭৬	৫.৯৮
ভুনা (প্রতি গাটে ৩৯২ পাঃ)	..	..	..	২.৯১	৪.১৭	৩.১৩	৩.১৯	৪.২৩	৪.০০
পাট (প্রতি গাটে ৪০০ পাঃ)	..	..	..	৩.২৮	৫.৩৭	৪.৬৮	৪.৫৯	৫.৯৩	৫.২০

১৬১

খাদ্যশস্যের বুনিয়াদী বছর—১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ ও অন্যান্য

সং--কতক পরিমাণে সংশোধিত প্রাক্কলন

চু--চূড়ান্ত প্রাক্কলন

৩নং সারণী

স্বাধীনতান্নানের পর অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন

(সংখ্যা '০০০ টন)

পণ্যদ্রব্য	গড়পড়তা উৎপাদন		গড়পড়তা অতিরিক্ত উৎপাদন
	১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর	১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল (কলম ১-কলম ২) পর্যন্ত পাঁচ বছর	
১	২	৩	৪
খাদ্যশস্য (১):			
চা'ল	২১,৬৪৬	২৫,৯৬৫	৪,৩১৯
গম	৫,৯৯১	৮,৩৩৭	২,৩৪৬
জোয়ার এবং বাজরা	৮,১৫৯	১১,১৩২	২,৯৭৩
অন্যান্য খাদ্যশস্য	৭,৭৪৫	৯,৫৫১	১,৮০৬
মোট খাদ্যশস্য	৪৩,৫৪১	৫৪,৯৮৫	১১,৪৪৪
ডাল			
ছোলা	৩,৯২৬	৫,১১০	১,১৮৪
টুর	১,২৯৫	১,৮১৫	৫২০
অন্যান্য ডাল	৩,০৩৭	৩,৬০১	৫৬৪
মোট ডাল	৮,২৫৮	১০,৫২৬	২,২৬৮
মোট খাদ্যশস্য	৫১,৭৯৯	৬৫,৫১১	১৩,৭১২

৪নং সারণী

স্বাধীনতালভের পর খাজশস্ত্রের আমদানি

(সংখ্যা '০০০ টন)
(দাম লক্ষ টাকা)

চাল	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
পরিমাণ	৪৮৫	৮৬৭	৭৬৭	৩৫৩	৭৪৯	৭২২	১৭৫	৬০৩	২৬৫	৩২৫
দাম	২,৩৬৫	৫,০৭৪	৪,১৯১	১,৯৯৩	৪,২২০	৪,৯৮৭	২,৪২৩	..	..	..
গম এবং ময়দা	৮৫৭	১,৩১১	২,২০০	১,৪০৭	৩,০১৫	২,৫১১	১,৬৮৪	১,৯৭	৪৩৫	১,০৯৫
দাম	৩,৮৪৪	৫,৪৮০	৮,২৬৮	৫,১৭৫	১৪,৩৬৪	১৩,১০৮	৬,৬০৯	..	..	..
মোট শস্য	৯৯২	৬৬৩	৭৩৯	৩৬৫	৯৬১	৬৩১	১৪৯	৭	..	..
দাম	৩,১৯০	২,৪১৮	২,০০১	৮৯১	৩,০৯৫	২,৮১২	৫৬৩	..	..	..
মোট	২,৩৩৪	২,৮৪১	৩,৭০৬	২,১২৫	৪,৭২৫	৩,৮৬৪	২,০০৩	৮০৭	১,৪২০	৩,১৩৪
দাম	৯,৩৯৯	১২,৯৭২	১৪,৪৬০	৮,০৬০	২১,৬৭৯	২০,৯০৭	৮,৫৯৫	৩,৩১১	৫,৬৩৪	১৬,৩৪৪

১৬৩

স্বাধীনতালভের পর খাজশস্ত্রের রপ্তানি

চাল	পরিমাণ	দাম	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
পরিমাণ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
দাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
গম এবং ময়দা	পরিমাণ	দাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
মোট শস্য	পরিমাণ	দাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
মোট	পরিমাণ	দাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৬৬

৫নং সারণী

স্বাধীনতালাভের পর ষাটশস্ত্রের মোট উৎপাদন এবং একরপ্রতি ফলন

শস্য	মোট উৎপাদন/একরপ্রতি ফলন।	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে গড়পড়তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খাদ্যশস্য ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২১,২৪৭	২২,৫৯৭	২৩,১৭০	২০,২৫১	২০,৯৬৪	২১,৬৪৬
চা'ল ..	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৭৩৯	৬৯৮	৬৮৮	৫৯৬	৬৩৭	৬৭২
জোয়ার ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৫,৯৭১	৫,০২২	৫,৭৭৭	৫,৪০৮	৫,৯৮১	৫,৬৩২
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৩৬৯	৩০৫	৩৩৮	৩১৫	৩৪০	৩৩৩
বাজরা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৮১৩	২,১৭১	২,৭৯০	২,৫৫৪	২,৩০৯	২,৫২৭
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৩০৩	২৬৪	২৭৩	২৫৭	২২০	২৬০
ভুট্টা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৪৩১	২,০৭২	২,০১৪	১,৭০২	২,০৪৩	২,০৫২
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৬৪০	৫৫১	৫৫৯	৪৮৮	৫৬০	৫৬০
রাগি ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,৪৫৫	১,৪৬৫	১,৫২০	১,৪০৭	১,২৯১	১,৪২৮
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৬৩৩	৬১৩	৬২৫	৫৭৯	৫৩৫	৫৯৭
গম ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৫,৫৭০	৫,৬৫০	৬,২৯০	৬,৩৬০	৬,০৮৫	৫,৯৯১
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৫৯৯	৫৬৬	৫৮৪	৫৯২	৫৮২	৫৮৫
যব ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৬৪০	২,২০৬	২,২১৫	২,৩৪০	২,৩৩০	২,৩৪৬
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৭৮১	৬৪১	৬৩১	৬৮১	৬৬৯	৬৮১
নিকুট জোয়ার	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,৬২৪	২,১৩১	২,২৪২	১,৭২২	১,৮৮৫	১,৯১৯
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৪১৮	৩১৪	৩৭৫	৩৩৯	৩৫৯	৩৬৭
মোট খাদ্যশস্য	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৩৩,৭৪১	৪৩,৩১৪	৪৬,০১৮	৪১,৭৪৪	৪২,৮৮৮	৪৩,৫৪১
ডা'ল							
ছোলা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৪,৫০৩	৪,৫৩৫	৩,৬৬৭	৩,৫৯৩	৩,৩৩৪	৩,৯২৬
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৫২২	৪৯৬	৪০১	৪৩০	৪৩৩	৪৫৮
চুর ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,০১৫	৯৬৬	১,০০০	১,৬৯২	১,৮০১	১,২৯৫
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৪১৯	৪৪০	৪০৩	৭০৩	৬৬৭	৫২৬
অন্যান্য ডা'ল	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৭৩৫	২,৯৩৯	৩,৩৬৩	২,৯৯৩	৩,১৫২	৩,০৩৭
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	২৯৬	৩১৭	৩১৭	২৯১	৩০১	৩০৪
মোট ডা'ল ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৮,২৫৩	৮,৪৪০	৮,০৩০	৮,২৭৮	৮,২৮৭	৮,২৫৮
মোট খাদ্যশস্য	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১১,৯৯৫	১১,৭৫৪	১১,০৪৮	১০,০০২	১১,১৭৫	১১,৭৯৯

স্বাধীনতালাভের পর খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন এবং একরপ্রতি ফলন

শস্য	মোট উৎপাদন/একরপ্রতি ফলন	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৪ কলমে থেকে ৮ কলমের ১৯৫৬-৫৭ চতুর্থে শতকর সাল পর্যন্ত বেশি (+) পাঁচ বছরের বা কম (-) গড়পড়তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
খাদ্যশস্য ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২২,৫৩৭	২৭,৭৬৯	২৪,৫৩১	২৬,৮৬৪	২৮,১৪২	২৫,৯৬৫	(+) ২০.০
চা'ল ..	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৬৮২	৮০৫	৭২৪	৭৮২	৮০৬	৭৬০	(+) ১২.৮
জোয়ার ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৭,২৪৩	৭,৯৫৪	৯,০৯৩	৬,৬০২	৭,৪২৭	৭,৬৬৪	(+) ৩৬.১
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৩৭৪	৪০৬	৪৬৯	৩৪৫	৪০৩	৩৯৯	(+) ১৯.৮
বাজরা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৩,১৪২	৪,৪৭৫	৩,৪২১	৩,৩৭৯	২,৯২৬	৩,৪৬৯	(+) ৩৭.৩
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	২৬৪	৩৩৩	২৭৪	২৭০	২৩৮	২৭৬	(+) ৬.২
ভুট্টা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৮২৫	২,৯৯১	২,৯৩৯	২,৫৫৪	৩,০২০	২,৮৬৬	(+) ৩৯.৭
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৭১০	৭০১	৭০৭	৬২৮	৭৩২	৬৯৫	(+) ২৪.১
রাগি ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,৩১৬	১,৮৪৬	১,৬৪৬	১,৮২০	১,৯১৪	১,৭০৮	(+) ১৯.৬
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৫৩২	৭১৭	৬৪৬	৭১৬	৭৫৬	৬৭৩	(+) ১২.৭
গম ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৭,৩৮২	৭,৮৯০	৮,৭৭৮	৮,৫৬৯	৯,০৬৮	৮,৩৩৭	(+) ৩৯.২
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৬৮১	৬৭০	৭১৫	৬৩২	৬১৮	৬৬৩	(+) ১৩.৩
যব ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	২,৮৮২	২,৯০৫	২,৮৭০	২,৭৪৯	২,৭৪৪	২,৮৩০	(+) ২০.৬
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৮০৫	৭৪৬	৭৭৪	৭৩৫	৭১৫	৭৪৭	(+) ৯.৭
নিকট জোয়ার	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,৮৯৫	২,৪৩৮	২,৪৫৬	১,৯৩৭	২,০১০	২,১২৫	(+) ১০.৭
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৩৪১	৩৮৯	৩৯৬	৩৪১	৩৬৯	৩৬৫	(-) ০.৫
মোট খাদ্যশস্য	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৪৯,২২২	৫৮,২৬৮	৫৫,৭৩৪	৫৪,৪৫৬	৫৭,২৫১	৫৪,৯৮৬	(+) ২৬.৩
ডা'ল								
ছোলা ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৪,১৪২	৪,৭৫৬	৫,৩৯৩	৫,৩৩১	৫,৯৩০	৫,১১০	(+) ৩০.১
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৫১৭	৫৪২	৫৪৮	৪৯৪	৫৫৪	৫৩১	(+) ১৫.৯
চুর ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	১,৬৭৫	১,৮৩৪	১,৬৮৮	১,৮৩০	২,০৪৭	১,৮১৫	(+) ৪০.১
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৬৩৩	৬৯১	৬৩৬	৭২৭	৮০৫	৬৯৮	(+) ৩২.৭
অন্যান্য ডা'ল	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৩,২২৭	৩,৮৬০	৩,৭৮৯	৩,৩২৮	৩,৩৫৮	৩,৫১২	(+) ১৫.৬
	একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড)	২৮৭	৩০৯	৪৪১	৩০১	২৮১	৩৩৬	(+) ১০.৫
মোট ডা'ল ..	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৯,০৪৪	১০,৪৫০	১০,৮৭০	১০,৪৮৯	১১,৩৩৫	১০,৪৩৮	(+) ২৬.৪
মোট খাদ্যশস্য	মোট উৎপাদন ('০০০টন)	৫৮,২৬৬	৬৮,৭১৮	৬৬,৬০৪	৬৪,৯৪৫	৬৮,৫৮৬	৬৫,৪২৩	(+) ২৬.৫

পি--কতক পরিমাণে সংশোধিত প্রাক্কলন

এফ--চূড়ান্ত প্রাক্কলন

৬নং সারণী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন

	নির্দিষ্ট লক্ষ্য	প্রকৃত সাফল্য
বড় সেচ-ব্যবস্থা	২.০১	০.৯৫
ছোট সেচ-ব্যবস্থা	২.৩৮	২.১৬
ভূমি উদ্ধার ও উন্নয়ন	১.৫১	১.১৬
পচা সার এবং রাসায়নিক সার	১.১৫	০.৫৮
উন্নত বীজ	০.৫৬	০.৩১
মোট	৭.৬১	৫.১৬

৭নং সারণী

স্বাধীনতালাভের পর অ্যানোনিয়াম সালফেটের উৎপাদন, আমদানি এবং খরচ

(সংখ্যা '০০০ টন)

বছর	উৎপাদন	আমদানি	মোট কত পরিমাণ পাওয়া যায় (কলম ২ + কলম ৩)	খরচ
১	২	৩	৪	৫
১৯৪৭	২১.৩	১৩১.৮	১৫৩.১	পাওয়া যায় না
১৯৪৮	৩৫.২	১৩৩.২	১৬৮.৪	„
১৯৪৯	৪৫.৯	১২০.৮	১৬৭.৭	„
১৯৫০	৪৭.৩	৩৭০.০	৪১৭.৩	২৭৫.০
১৯৫১	৫২.৭	১০৪.০	১৫৬.৭	২৮২.৪
১৯৫২	২২০.৩	১৭০.০	৩৯০.৩	২৭৬.৩
১৯৫৩	৩২১.৪	১০০.০	৪২১.৪	৪২৭.০
১৯৫৪	৩৪০.২	৭৪.০	৪১৪.২	৪৫৩.০
১৯৫৫	৩৯৩.১	২০০.০	৫৯৩.১	৪৯৯.০
১৯৫৬	৩৮২.০	২০০.০	৫৮২.০	৬৫০.০

(প্রাক্কলন
করা হয়েছে)

৮নং সারণী

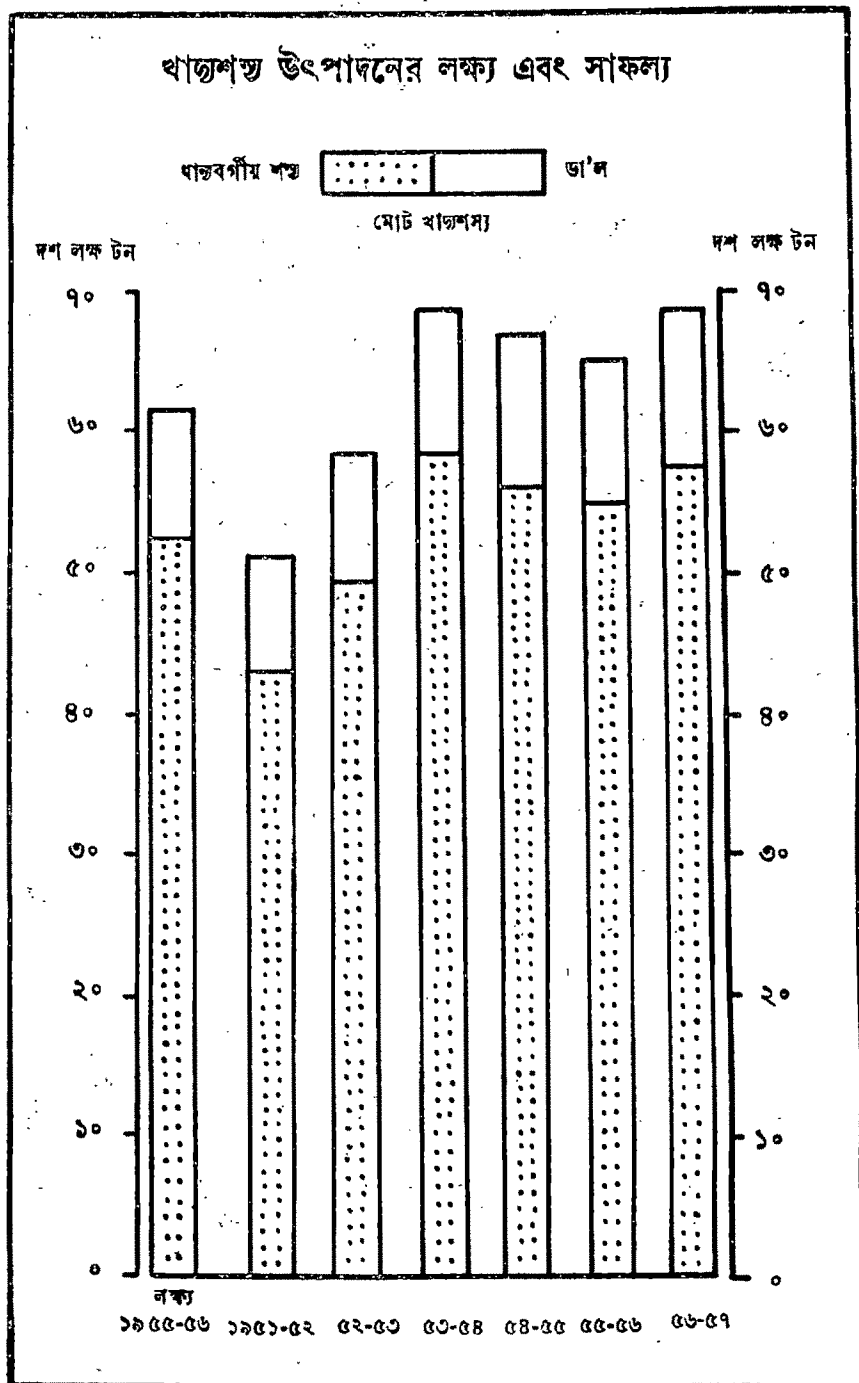
স্বাধীনতাব্যবস্থার পর স্থপার ফসফেটের উৎপাদন, আমদানি এবং খরচ

(সংখ্যা '০০০ টন)

বছর	উৎপাদন	আমদানি	মোট কত পরিমাণ পাওয়া যায়	খরচ
১	২	৩	৪	৫
১৯৪৭	৫.০	০.৪	৫.৪	পাওয়া যায় না
১৯৪৮	২১.৪	১.০	২২.৪	„
১৯৪৯	৫০.৬	০.২	৫০.৮	„
১৯৫০	৫২.৪	০.৪	৫২.৮	৩৬.০
১৯৫১	৬১.০	২.৬	৬৩.৬	৪৩.৩
১৯৫২	৪৬.৭	২.১	৪৮.৮	২৮.৭
১৯৫৩	৪৮.৩	৬.৮	৫৫.১	৫১.৪
১৯৫৪	১০৪.৭	*	১০৪.৭	৯২.৪
১৯৫৫	৭৫.৭	*	৭৫.৭	৭৮.০
১৯৫৬	৮৯.০	*	৮৮.০	১০০.০ (প্রাক্কলন করা হয়েছে)

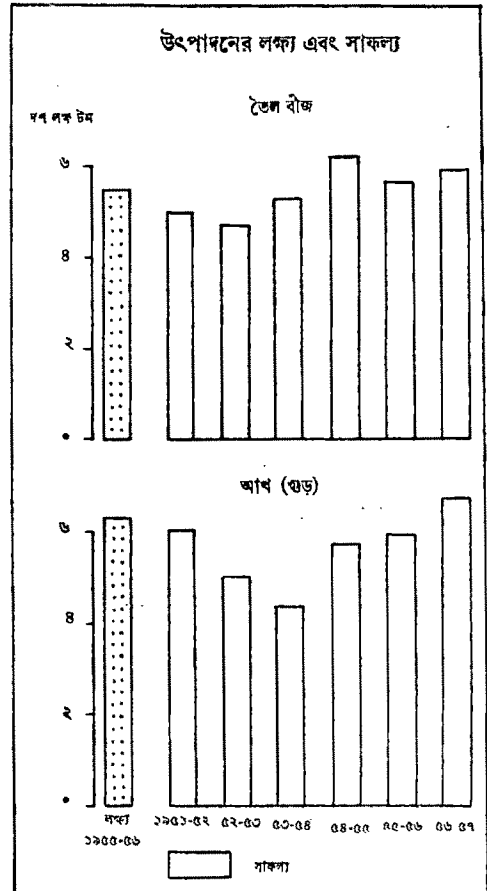
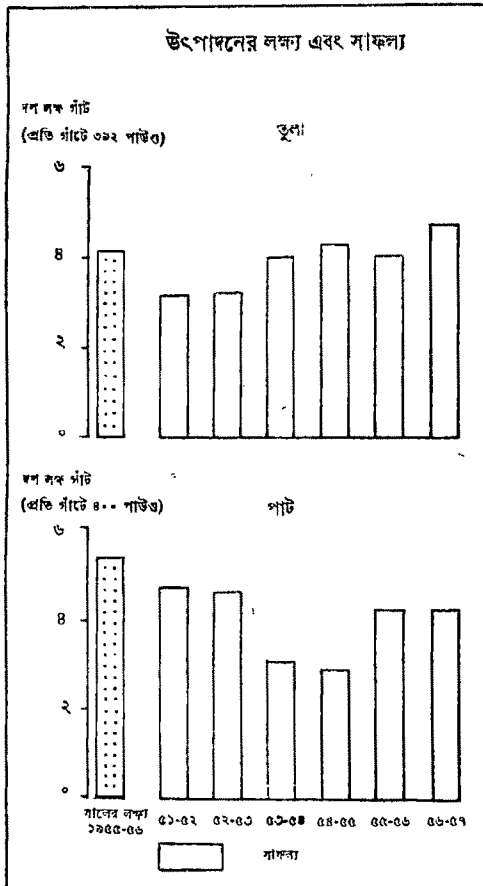
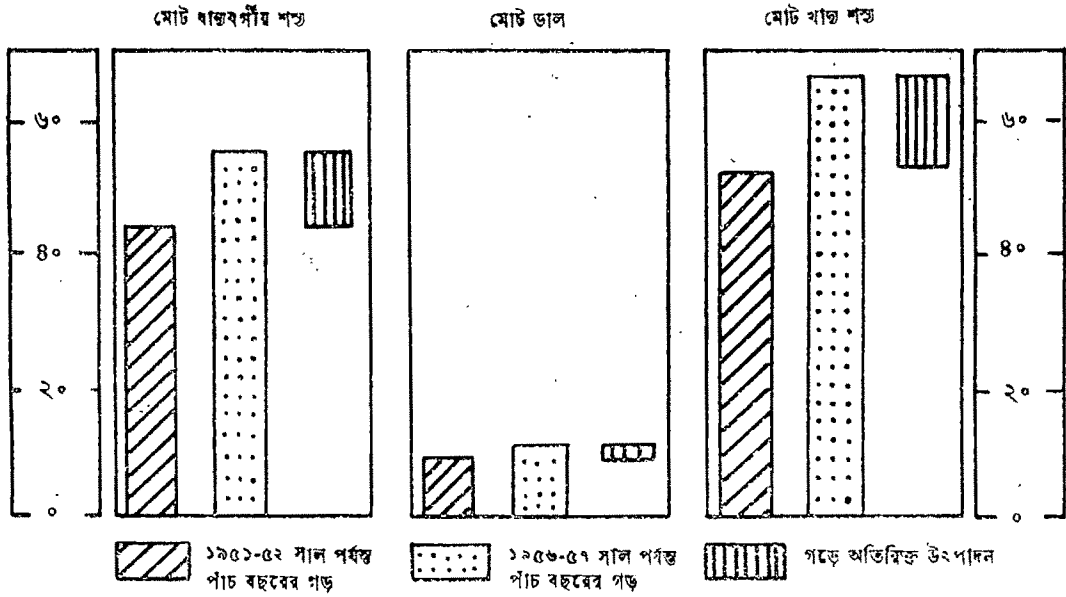
*কৃষিকার্য সম্পর্কে কোন আমদানি করা হয় নি

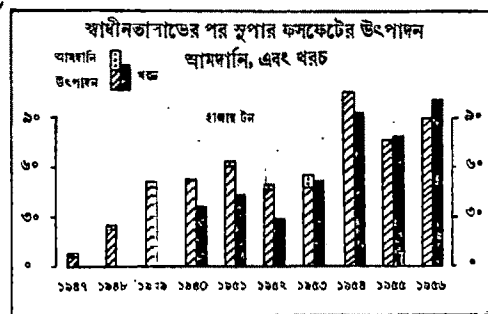
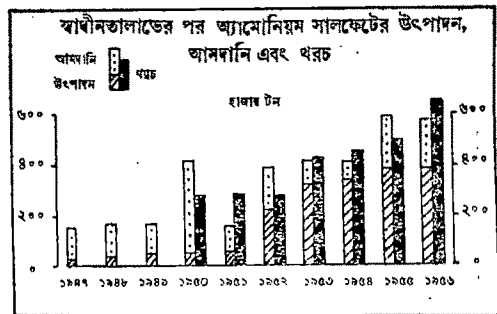
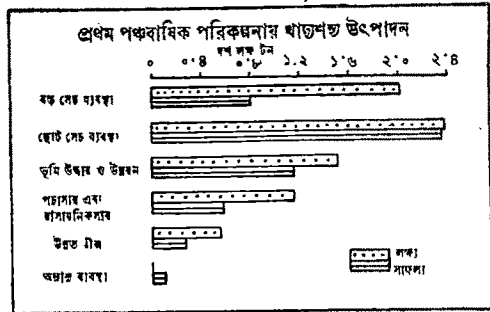
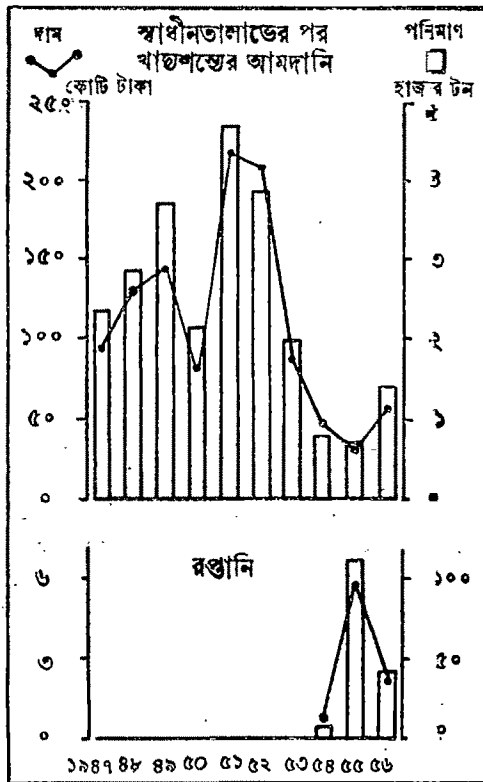
দ্রষ্টব্য।—ভারতের রাসায়নিক সার সমিতির পুস্তিকা থেকে উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলি পাওয়া গিয়েছে



স্বাধীনতালভের পর অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন

দশ লক্ষ টন





প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে অনুলিখিত।

খরিফ খান্দ তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান

তৈলবীজের উৎপাদন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক। তৈলবীজ অনেক প্রয়োজনেই আসে। সরষের তেল ছাড়া তো বাঙালী-ঘরের রান্নাই হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নানান রকম তেল রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন বাদামতেল, নারকেলতেল, তিলতেল ইত্যাদি। রাশিয়াতে সূর্যমুখীবীজের তেল দিয়ে তরকারি রান্না হয়। চীনাবাদাম, নারকেল ও তিলের তেলকে জমিয়ে উন্নিভজ তেল তৈরি হয়—যাকে আমরা বলে থাকি ‘বনস্পতি’ ঘি। বর্তমানে এ-জিনিসের ব্যবহার আমাদের দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন শিল্পেও উন্নিভজ তেলের ব্যবহার অপরিহার্য। রেড়ির তেল কল-কব্জায়, বিশেষত রেলের ইঞ্জিনে, প্রয়োজন হয়। আজকাল জেট এরোপ্লেনেও রেড়ির তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এইসব কাজে যে তেল ব্যবহার করা হয় তাকে বিশেষভাবে পরিম্লুত করে নিতে হয়। ঔষধ হিসাবে, বিশেষ করে জোলাপের জন্য, শোধিত রেড়ির তেল ব্যবহারের কথা আপনারা সবাই জানেন। রঙ ও বার্নিশের কাজে তিসির তেলের ব্যবহারের কথাও আপনাদের জানা আছে।

রপ্তানি-দ্রব্য হিসাবে তৈলবীজ উৎপাদনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। চীনাবাদাম তেল ও খইল ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ থেকেই সবচেয়ে বেশি রেড়ির তেল বিদেশে রপ্তানি হয়। বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হওয়ার অর্থই হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা যায়। বর্তমানে ভারতে আবশ্যিক-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এ সমস্যার সমাধানে অনেকটা সাহায্য করতে পারি।

তৈলবীজের আরও অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। তেল নিষ্কাশনের পর যে খইল থেকে যায়, তাও আমাদের দেশের কৃষি-শিল্পকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। গোখাদ্য হিসাবে আমরা যেমন সরষের খইল ব্যবহার করি, তেমনি রেড়ির খইল বা অন্যান্য খইল জমিতে জৈব সার হিসাবে প্রয়োগ করার পক্ষে খুবই উপযোগী।

ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৈলবীজ উৎপাদনে অগ্রগামী। চীনাবাদামের চাষ ও উৎপাদন ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশি হয়। ভারতে বোম্বাই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি চীনাবাদামের চাষ হয়। তন্দ্র, মহীশূর এবং মাদ্রাজেও প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। বাঙলাদেশে চীনাবাদামের চাষ হয় না বললেই চলে।

চীনাবাদামের পরেই সরষের চাষ। উত্তরপ্রদেশ, পাজাব, রাজস্থান, কাশ্মীর ও পশ্চিম বাঙলায় প্রধানত এর চাষ হয়।

এর পরই তিলের চাষ। তিল উৎপাদন প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই—এসব রাজ্যে হয়। বাঙলাদেশেও তিলের চাষ অল্পবিস্তর আছে।

তিসির চাষও ভারতে ব্যাপকভাবে হয় এবং তিসির উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

রেড়ি ভারতেই সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়। বাঙলাদেশে এর চাষ প্রায় হয় না বললেই চলে। লোকের বাড়ির আনাচেকানাচে ও খামারের সংলগ্ন জায়গায় এমনি দু’চারটা গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

এখন আমরা যদি পশ্চিম বাঙলার অবস্থা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব যে, বাঙলাদেশে তৈলবীজের চাষ ব্যাপকভাবে হয় না। যদি সরষের কথাই ধরি, দেখা যায়, বাঙলাদেশে মাত্র ২ লক্ষ একর জমিতে এর চাষ হয়। খুব কম করে ধরলেও যেখানে আমাদের বৎসরে ২৫-২৬ লক্ষ মণ সরষের তেলের দরকার, সেখানে আমরা মাত্র ৩ লক্ষ মণ

তেল উৎপাদন করি। তাই আমাদের পরের মদ্য চেষ্টা থাকতে হয়। প্রায় ১৩ লক্ষ মণ তেল উত্তর-প্রদেশ থেকে বাঙলাদেশে আসে এবং আনুমানিক ৩০-৩৫ লক্ষ মণ সরষে পশ্চিমবঙ্গের কলসমূহকে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়।

অন্যান্য তৈলবীজ সম্পর্কেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। তিলের চাষ পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১০ হাজার একর জমিতে হয়। তিসির চাষ এ রাজ্যে মোটামুটি মন্দ হয় না; প্রায় ৮০-৯০ হাজার একর জমিতে এর চাষ হয়, কিন্তু এতে আমাদের চাহিদা মেটে না। পশ্চিম বাঙলায় প্রায় ১১ লক্ষ মণ তিসি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। চীনাবাদামের চাষ আমাদের রাজ্যে মাত্র কয়েক শ' একর জমিতে হয়। অথচ এর চাহিদা প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ মণ চীনাবাদাম-তেল এবং ৯ লক্ষ মণ বাদাম-তেল আমদানি করতে হয়। রেড়ির সম্বন্ধে আগেই বলেছি। এর চাষ এ-রাজ্যে হয় না বললেই চলে, অথচ শিল্পোন্নতির সাথে সাথে এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ সারা ভারতবর্ষে তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় তৈলবীজ সমিতির তদারকে একটা সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও এ বিষয়ে স্বেচ্ছা কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

খরিফ খন্ডে ফসলের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য একটা ব্যাপক অভিযান শুরুর করা হয়েছে। খরিফ খন্ডে তৈলবীজের চাষও এই অভিযানের একটি অঙ্গ।

খরিফ খন্ডের তৈলবীজের মধ্যে তিল, চীনা-বাদাম ও রেড়ি প্রধান। তিল অনুর্বর জমিতেও ফলানো চলে। কথায় বলে তিলে জমি। পশ্চিম-বঙ্গের কৃষিবিভাগ এসমস্ত জমির উপযোগী উন্নত ধরনের কয়েক রকম তিলবীজের উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে খুব অল্প সময়ে পাকে, এরকম বীজও আছে। এইসমস্ত বীজের জন্য আপনাদের নিকটস্থ কৃষি-কর্মচারীর সঙ্গে যোগস্বাপন করুন। চীনাবাদাম নদীর চরে এবং বেলে মাটিতে ভাল

জন্মায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রাঢ় অঞ্চলের রাঙামাটিতেও চীনাবাদাম চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। একটু যত্ন নিলে ফলন ভালই হয়। তা ছাড়া, চীনাবাদাম চাষের একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এর গাছের ডগা গোখাদ্য হিসাবে অতি পুষ্টি-কর। চীনাবাদামের গাছ জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

রেড়ির চাষ করতে কোন কষ্ট করতে হয় না, কারণ, প্রতিকূল অবস্থায়ও জন্মাতে এ অস্বাভাবিক। পাথুরে জমিতেও এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। কাজেই, যে জমিতে আমরা কোন লাভজনক ফসল লাগাতে পারি না, সেখানে অতি সহজে রেড়ির চাষ করতে পারি। পাথুরে জমিতে যে গাছ জন্মাতে পারে, পশ্চিম বাঙলার যে কোন রকম মাটি তার পক্ষে সোনা। অথচ দৃষ্টান্তের বিষয়, এর চাষ সম্পর্কে আমরা একেবারে উদাসীন। রেড়ির চাহিদা আজকাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং দামও বেশ পাওয়া যাচ্ছে।

খামারের চারধারে অনেক জমি পড়ে থাকে। সেখানে রেড়ির গাছ লাগিয়ে দেওয়া যায়। খালের বাঁধের ওপর বা পুকুরের চারপাড়ে অনায়াসে রেড়ির চাষ হতে পারে। আর, যে-জমি অনাবাদী ও পতিত থাকে সেখানে রেড়ির গাছ বেশি সংখ্যায় লাগিয়ে একটু বড় আকারে চাষই গড়ে তোলা চলে।

তৈলবীজ সংক্রান্ত এ আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, একটু চেষ্টা করলে আমরা অর্থকরী কতকগুলি ফসল ভালভাবেই জন্মাতে পারি। এতে আমাদের দেশের, বিশেষ করে চাষীভাইদের অনেক আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উৎস যে কৃষি তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে যদি আমরা উন্নত করতে না পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যেসমস্ত তৈলবীজ-শস্যকে আমরা এতদিন অবহেলা করে এসেছি, সেগুলোর চাষে আজকাল যথেষ্ট অর্থগতির সম্ভাবনা হয়েছে। তাই, আসুন, আমরা এই খরিফ তৈলবীজের উৎপাদন-বৃদ্ধির অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি।

সমবায় বাঁচিয়েছে

কলিকাতা থেকে বাইশ মাইল দূরে বারাসত মহকুমায় দিঘা একটি ছোট গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় সমস্ত অধিবাসীর পেশাই হ'ল জুতো তৈরি করা। এটি তাঁদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা। এ গ্রামে প্রায় দু'শ লোক জুতো তৈরির পেশায় নিযুক্ত। কিছুদিন আগেও তাঁদের কাজের কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। এমনকি সেলাইএর কাজ পর্যন্ত তাঁরা হাতেই করতেন।

তাঁরা আগে পূর্ব বাঙলার কয়েকটি জেলায় জুতো সরবরাহ করতেন। প্রত্যেক পরিবারেরই হাতে প্রচুর কাজ থাকত। ক'চামাল বা পুঞ্জির কোনও অভাবই ছিল না। তাঁরা অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদের জুতোই তৈরি করতেন বেশি এবং যশেহর ও খুলনা জেলার এ ধরনের জুতোর চাহিদা দিঘার চর্মশিল্পীরাই মেটাতে। তাঁরা বেশ সুখে সামাজিক জীবনযাপন করতেন আর দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজেদের আয়ের একটা বিরাট অংশ খরচ করতেন সানন্দে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হ'ল। এর ফলে অবিভক্ত বাঙলার সংহত অর্থনীতির উপর আঘাত এল অতর্কিতে। জিনিসপত্রের অবাধ সরবরাহ এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। আর দিঘার চর্মশিল্পীরাও এ আঘাত থেকে রেহাই পেলেন না। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জেলা-গুলিতে দিঘার জুতোর ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। চর্মশিল্পীরা ভয়ানক আর্থিক অসুবিধায় পড়লেন। জীবনধারণের জন্য তাঁদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে গেল।

এরূপ দুরবস্থায় চর্মশিল্পীদের প্রায় অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শরণাপন্ন হলেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। তাঁদের অনেকে আর্থিক সাহায্যও পেয়েছিলেন ব্যবসা চালাবার জন্য। কিন্তু তাঁদের সংগঠন-ক্ষমতা ছিল না। দৈনিক তাঁরা ৩০

জোড়া জুতো তৈরি করতেন। কিন্তু কলিকাতার পাইকাররা এত কম সরবরাহে আগ্রহশীল ছিল না। সুতরাং যে-কোনও দামে তাঁরা তৈরি জুতো বিক্রি ক'রে দিতেন—মহাজনদের দেওয়া দামেই। এর ফলে লাভ এত কম হ'ত যে, অনেকেই সরকারী ঋণ আর পরিশোধ করতে পারতেন না। ব্যবসার পুঞ্জিও নষ্ট হয়ে গেল। কলিকাতার পাইকারী মহাজনরা এ সুযোগ ছাড়ল না। তাঁদের ব্যবসায় সাহায্য করার নামে মহাজনরা প্রচুর দাদন দিতে আরম্ভ করল—কিন্তু এই শর্তে যে, মহাজনদের নির্ধারিত দামেই জুতো বেচে দিতে হবে।

এই অবস্থায় কিছুদিন ব্যবসা চলল। একজন চর্মশিল্পী বললেন—“আমাদের মজুরির বিনিময়ে আমরা দৈনিক মোট তের থেকে চৌদ্দ আনা রোজগার করতাম। আর এই উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হ'ত এক-একটি গোটা পরিবারকে।”

এই সময়ে বারাসতের ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার এবং ঐ ব্লকের সমবায় সমিতিগুলির পরিদর্শক চর্মশিল্পীদের বললেন যে, তাঁদের সমস্যার সমাধান হ'তে পারে যদি তাঁরা সমবায় সমিতি স্থাপন ক'রে সমবায় প্রথায় কাজ করেন।

সমবায় সমিতিগুলির পরিদর্শক বলেন যে, ঐ প্রস্তাবে কেউ বিরোধিতা করেন নি এবং তাঁরা বদ্বতে পারলেন যে, এই সমবায়ের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের জন্য আরও পুঙ্কৃত হবেন।

দিঘার চর্মশিল্পীদের সমবায় সমিতি স্থাপনের কাহিনী হ'লঃ কী ক'রে মৃষ্টিমেয় কয়েকজন কারিগর দারিদ্র্য ও দৈন্যের মধ্যে দাঁড়াতে না পেরে, মহাজন ও ফড়েদের হাত এড়াবার জন্য এবং নিজেদের বাঁচাবার জন্য সমবায়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

যখন সমবায় সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হ'ল, তখন তার রূপ দিতে অবশ্য বেশি দেরি হয় নি। চৌত্রিশ জন চর্মশিল্পী প্রথমেই সমিতির সদস্য

হলেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এই সমিতি রেজিস্ট্রি করা হ'ল। এর নাম হ'লঃ দিঘা চর্ম-শিল্পী সমবায় সমিতি। গত পনের মাস ধরে এই সমিতির কাজ চলছে। এর বর্তমান সদস্য-সংখ্যা হ'ল ৬৫।

মূলধন। সমিতির মূলধন বৃদ্ধিকল্পে খাদি বোর্ড সম্প্রতি পনের হাজার টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। বারাসতে সমিতির একটি খুচরা বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য খাদি বোর্ড আরও চার হাজার টাকা প্রদান করেছেন।



দিঘার চর্মশিল্পীরা ক্রমশ সমবায় সমিতির শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন

এই সমিতির প্রবীণতম সদস্য শ্রীগোবর্ধন দাস বলেন যে, তাঁরা যদি সমবায় সমিতির সদস্য না হতেন তা হ'লে দিঘা থেকে জুতোর ব্যবসা উঠে যেত আর স্থানীয় চর্মশিল্পীরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন।

শ্রী দাস আরও বলেন যে, তাঁদের সমিতি গড়ে উঠল এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই যে, তাঁদের একক শ্রমে আর কোনও লাভ নেই। “আমরা একসঙ্গে বাঁচব নয় মরব”—আত্মবিশ্বাসে তাঁর কণ্ঠ দৃঢ়।

প্রারম্ভে দিঘা চর্মশিল্পী সমবায় সমিতি ৩,৬০০ টাকার শেয়ার বিক্রয় করে। এই টাকাই সমিতির

দিঘায় এখনও সমস্ত চর্মশিল্পীই সমিতিতে যোগদান করতে পারেন নি। তাঁরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই আগেকার মত কোনও রকমে কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সমিতির উদ্যোক্তারা বলেন যে, সমিতির আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হ'লেই সমস্ত চর্মশিল্পীকে সমিতির সদস্যভুক্ত করা হবে।

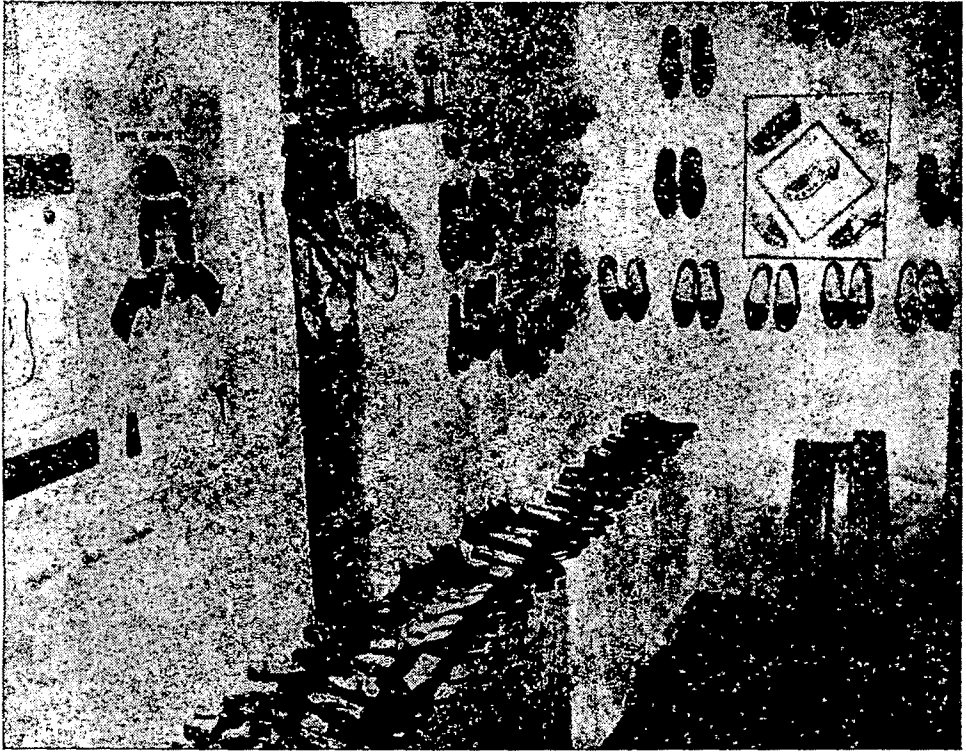
দিঘার চর্মশিল্পী সমবায় সমিতির সদস্যরা যাতে উন্নত ধরনের জুতো তৈরি করতে পারেন সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্পদফতর ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে দিঘাতে একটি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন

করেন। শিক্ষণ-সময় ছ' মাস। ২০ জন শিক্ষার্থী ইতোমধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। ব্রকের বাজেট থেকে ষোল হাজার টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই একটি শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে। সমিতির সম্পাদক শ্রীসনাতন দাস বলেন যে, এর ফলে সমিতি উৎপাদনের উৎকর্ষ ও উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে।

গত ১৫ মাসে সমিতি ১,৮৪৬ জোড়া জুতো তৈরি করেছে। এই জুতো বিক্রি করে মোট ১৮,৫০০ টাকা পাওয়া গেছে। এই উৎপাদনের সমস্তটাই কলিকাতার পাইকারী বাজারে বিক্রি করা হয়েছে।

বলেন, “সমিতির কাজ আরম্ভ হওয়ার পর সমিতির সদস্যদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য এসেছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়তে হ'লে আমাদের আরও মূলধন চাই।”

একজন চর্মশিল্পীই বললেন যে, সমিতি স্থাপিত হওয়ার পূর্বে তাঁরা জনপ্রতি দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ আনা রোজগার করতেন। কিন্তু এখন তাঁদের কাজের মজুরি হিসাবে দৈনিক আড়াই টাকা করে দেওয়া হয়। শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের দৈনিক মজুরি বাবত তিন টাকা করে



সমিতির কারখানার একাংশ

বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করেন শ্রীরমানাথ দাস। তিনি নিজে একজন দক্ষ চর্মশিল্পী এবং কেনাবেচার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি

পাবেন ব'লে আশা রাখেন। পূর্ণাপ্ত মূলধন পেলেই তাঁরা উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে পারবেন ব'লে আশা রাখেন। যাতে কায়িক শ্রম

হাস করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বন্দপাতিও আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাঁরা আশা করেন যে, এর ফলে সদস্যদের উৎপাদনের উপর বোনাস দেওয়া সম্ভব হবে।

সমিতির কারখানা এখন যে বাড়িতে আছে তার জন্য মাসিক ষাট টাকা ক'রে ভাড়া দিতে হয়। সমিতি ইতোমধ্যেই একটা জমি সংগ্রহ করেছেন কারখানা তৈরির জন্য।

চর্মশিল্পীদের গ্রামে গেলে দেখা যাবে, প্রতি বাড়ির দাওয়ায় দিনরাত জুতো তৈরির কাজ চলছে। ছোট গ্রামখানি আজ কর্মচঞ্চল। একটি বাড়ির

দাওয়ায় শ্রীনাথ জুতো তৈরি করছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন তাঁর স্ত্রী। এমনকি তাঁদের আট বছরের ছেলে রামুও কাজে হাত লাগিয়েছে।

চর্মশিল্পীরা দরিদ্র। এখনও তাঁরা নানা রকম বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আর এখন হতাশার চিহ্ন নেই—সেখানে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ। তাঁরা বদ্বর্তে পেরেছেন যে, একা চলার দিন চলে গেছে। তাই তাঁরা অজ একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছেন। কারণ, তাঁরা কারও মদুখাপেক্ষী থাকতে রাজী নন—একমাত্র তাঁদের সম্বন্ধে শক্তির উপরই তাঁরা আস্থা রাখবেন।



ধানের সাধারণ কীটশত্রু

ভারতে ধান ফসলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সাধারণত নিম্নলিখিত সাত রকম পোকাকার দ্বারা। এরা ধানের প্রধান কীটশত্রু। বি-এইচ-সি অথবা ডি-ডি-টি প্রয়োগ করে এদের দমন করা যায়।

(১) লেদা পোকা

লেদা পোকা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। এরা রাতের বেলা আক্রমণ চালায়। ধানের চারাগাছগুলো খেয়ে ফেলে, আর দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে। ধানের মরসুমে এরা তিন থেকে পাঁচ বার পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

এই কীট আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, মহাশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ধান ফসলের ক্ষতি করে।

(২) পামরি পোকা

এ পোকাও ধানের চারাগাছগুলোকে আক্রমণ করে। পোকাগুলো পাতার সবুজ ভাগটা খেয়ে ফেলে। তার ফলে পাতার গায়ে সাদা সরু রেখার মত দাগ পড়ে। পোকাকার শূককীটগুলো পাতার আঁশে বাস করে এবং পাতা খেয়েই জীবনধারণ করে।

সাধারণত পামরি পোকা কচিপাতার ডগার দিকটাতে সরু লম্বা লম্বা ছেঁদা কেটে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ফোটার পরে পোকাকার শূককীটগুলো পাতার আঁশের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই বড় হয়। এইভাবে এই পোকাকার জীবনের সকল স্তরই ধানগাছের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

ভারতের প্রায় সমস্ত ধানী এলাকায় বিশেষ করে হায়দরাবাদ, মহাশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এই পোকাকার উপদ্রব দেখা যায়।

(৩) নীল গোবরে পোকা

এই পোকাকারও আক্রমণের লক্ষ্য ধানের চারা। এরা দেখতে ছোট, সরু ও লম্বা। এদের গায়ের রঙ নীল। প্রায়ই পামরি পোকাকার সঙ্গে এদের দেখতে পাওয়া যায়। পামরি পোকাকার মত ঠিক একই পদ্ধতিতে এরাও ধানের চারাগুলোকে আক্রমণ করে এবং সারা জীবন ধান গাছের উপর কাটায়। মাদ্রাজ, কুর্গ, মহাশূর, বোম্বাই, মালাবার এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেই এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) ধানের ফড়িঙ

ধানের ফড়িঙ ধানগাছের নরম শীষ ও পাতা আক্রমণ করে। এদের উপদ্রবের ক্ষেত্র হচ্ছে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম, বিন্ধ্য-প্রদেশ ও বোম্বাই।

(৫) নলী পোকা

ছোট কীড়া অবস্থায় এই পোকা ধান গাছের কচি ডাঁটা ও পাতার উপর আক্রমণ চালায়। নলী পোকা নতুন পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূক-কীটগুলো বেরিয়ে সেই পাতা ছোট ছোট করে কেটে নলের মত তৈরি করে তার ভেতর থাকে। জলের নিচেও এরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে।

এই পোকাকার উৎপাত বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহাশূর এবং বাঙলাতেই বেশি।

(৬) গাঁধি পোকা

গাঁধি পোকা ধানের শীষগুলোকে আক্রমণ করে এবং বাড়ন্ত কচি ধানের ভিতরের রস চুষে খেয়ে নেয়; তার ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। ধানের মঞ্জরীগুলো তখন সাদা হয়ে ঝরে পড়ে। আসাম,

বাঙলা, বোম্বাই, দ্বিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবেই এদের প্রাদুর্ভাব বেশি।

(৭) মাজরা পোকা

মাজরা পোকাকর কীড়া ধান গাছের ডাঁটা ছিদ্র করে ভিতরের মাজটি খেয়ে ফেলে। ফলে ধান গাছ শুকিয়ে যায়। এরা পাতার উপরে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে শুককীট বেরিয়ে গাছের ডাঁটা ছিদ্র করে। বিহার, বোম্বাই, দ্বিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, কুর্গ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বাঙলাতে এ পোকাকর আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

ধানের কীটশত্রু দমনের উপায়

কীটশত্রু দমনের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হ'ল গাছের উপর বি-এইচ-সি গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া অথবা ডি-ডি-টি ছিটানো।

যখনই মাঠে এর যে-কোন রকম পোকা দেখা যাবে তখনই নিম্নলিখিত উপায়ে বি-এইচ-সি অথবা ডি-ডি-টি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) চারা অবস্থা

ধানগাছের চারা অবস্থায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি গুঁড়ো একরপ্রতি ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড হারে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। অথবা নিম্নলিখিত উপায়ে ০.২৫ শতাংশ শক্তির ডি-ডি-টি তৈরি করে ছিটানো যেতে পারেঃ—জলে গুলে

যায় এমন ৫০ শতাংশ শক্তির ১ পাউন্ড ডি-ডি-টি ২০ গ্যালন জলে মিশিয়ে নিলে একরপ্রতি জমির ধানের চারার উপর ছিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে।

(২) রোপণ করার পরে

এই অবস্থায় পুনরায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি ২৫ থেকে ৩০ পাউন্ড একর-পিছ জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। অথবা ৫০ শতাংশ শক্তির ১ পাউন্ড দ্রবণীয় ডি-ডি-টি ২৫ গ্যালন জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এক একর জমির পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট।

(৩) মঞ্জরী ও ধানে দুধ হবার সময়

ধান গাছে মঞ্জরী এবং ধানে দুধ হওয়ার সময়ে ৫ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে।

ওষুধ ছড়ানো যন্ত্র

কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো বা ছিটানোর জন্য হাতে-চালানো যন্ত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। প্রতিটিটির দাম প্রায় ১০০ টাকা। ১০ থেকে ১২ একর পর্যন্ত জমিতে এসব যন্ত্র দিয়ে ভাল কাজ হয়।

কীটদমনের আর্থিক উপকারিতা

এই প্রবন্ধে বর্ণিত পোকাগুলো স্বাভাবিক বৎসরে শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ ধানের ক্ষতি করে। কীট দমনে খরচ পড়ে একরপিছ মাত্র ৫ টাকা। এসব পোকা দমন করতে পারলে চাষীর একরপিছ অতিরিক্ত লাভ হবে ২০ টাকার উপর।*

*ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে

বীজসুপারি নির্বাচন ও সুপারির চারা উৎপাদন

কোন অঞ্চলে চারাবাগানের জন্য বীজসুপারি সংগ্রহ করতে হবে তা সেই অঞ্চল পরিদর্শনান্তে স্থির করা হবে। স্থানীয় বাগানগুঁলি পর্যবেক্ষণ করে যেসকল সুপ্রসিদ্ধ বাগানে মাঝারি বয়সের (২৫ থেকে ৫০ বৎসর) অধিক-ফলপ্রসূ সুপারিগাছের সংখ্যা বেশি থাকবে সেই বাগানগুঁলি নির্দিষ্ট করে তথাকার বীজসুপারি গ্রহণের যোগ্য বড় বড় গাছগুঁলি বেছে নিতে হবে এবং চিহ্নিত করতে হবে। যে-কোন বাগানে অত্যধিক ফলপ্রসূ ও একেবারে ফলদানে অপারগ পরিণতবয়স্ক সুপারিগাছ যথেষ্ট এলো-মেলোভাবে রোপিত থাকে। মালিকের বাগানে এসকল গাছ সমভাবে পরিচর্যা পেলেও তাদের ফলধারণশক্তির তারতম্যের কারণ বোধহয় তাদের জন্মঘটিত প্রকৃতির বৈষম্য। গঠনতত্ত্ব এবং কোন প্রকৃতি অধিক পরিমাণে ফলধারণশক্তির উপযুক্ত তার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলেও বীজসুপারি-প্রসূ গাছগুঁলির তেজ ও ফলধারণশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুঁলির নির্বাচন করতে হবে।

বাৎসরিক ফলসংগ্রহের পূর্বে বাগানের সমস্ত গাছ পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিতে হবে, কোন গাছের কিরূপ তেজ ও ফলধারণশক্তি আছে। যাবতীয় ব্যাধিগ্রস্ত, নিস্তেজ এবং অল্প-ফলপ্রসূ অর্থাৎ দশটি উন্মুক্ত-পত্র অপেক্ষা কম পত্রযুক্ত গাছ, যেসকল গাছে চার থোকা ফল অপেক্ষা কম ফল থাকবে সে সকল গাছ ও ক্ষীণকায় গাছ বাতিল করতে হবে এবং বাকি নির্বাচিত গাছগুঁলি চিহ্নিত করে সেগুঁলিতে ধারা-বাহিকরূপে নম্বর দিতে হবে। পরবর্তী বৎসর-গুঁলিতেও তথাকার অনিয়মিতভাবে ফলপ্রসূ গাছ-গুঁলিকে চিহ্নিত করতে হবে (প্রথম বৎসরে ‘আর’, দ্বিতীয় বৎসরে আর ১ ও তৃতীয় বৎসরে ‘আর’ ২) যাতে তৃতীয় বৎসরের শেষে সমস্ত অবাস্তবীয় গাছ

—নিস্তেজ, সতেজ অর্থাৎ ফলপ্রসূ এবং অনিয়মিত ফলপ্রসূ গাছগুঁলিকে শ্রেণীবিন্ধিত করে বাতিল করা যাবে। উপরি-উক্ত পর্যবেক্ষণ ও বাতিলকরণ প্রথা তিন বৎসর পরেও চালানো যেতে পারে এবং যতদিন পর্যন্ত না বীজসুপারি-প্রসূ গাছগুঁলি নিয়মিতভাবে অধিক-ফলপ্রসূ হয় ততদিন এই প্রথা চালাতে হবে।

বীজ নির্বাচন

চিহ্নিত বীজসুপারি-প্রসূ গাছগুঁলির মধ্যবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় থোকা থেকে গাছ-পাকা সুপারি সংগ্রহ করতে হয়। সুপারি সংগ্রহের সময় হলে সুপারির থোকাগুঁলি দড়ির সাহায্যে নামিয়ে নিতে হয়।

বীজসুপারি সংগ্রহ করবার অল্পক্ষণের মধ্যে সেগুঁলি বপন করতে হয়। কিছুকাল রেখে দিতে হলে সেগুঁলিকে ছায়াতেই রাখতে হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে বপন করতে হয়।

চারাবাগানে চারা প্রস্তুত

এক ফুট গভীর গর্ত খনন করে ও মাটি আলগা করে জমির উপর থেকে তিন-চার ইঞ্চি গভীর বালুকার দ্বারা পূরণ করবার পর সুবিধামত আকারে চার ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি গভীর গর্তে নির্বাচিত সুপারিগুঁলি বপন করতে হয়। বালু-স্তরের উপর সুপারিগুঁলির বোঁটা যেন উর্ধ্বমুখ থাকে সেইভাবে বপন করে সেগুঁলিকে বালুকার দ্বারা অবিলম্বে আবৃত করতে হয়। প্রত্যহ সুপারির উপর জলসেচের প্রয়োজন। স্বাভাবিক ছায়া না থাকলে সুপারির কেয়ারির উপর ছায়া বিস্তারের ব্যবস্থা করা উচিত। বপন করার চল্লিশ দিন পরে সচরাচর সুপারিগুঁলিতে অঙ্কুরোদগম হয় এবং একশ দিন পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম চলতে পারে।

বীজ বপনের তিন মাস পরে চারাগুলি চারা-বাগানের কেয়ারিতে রোপণ করতে হয়। চারা-বাগানের জমি লাঙল দিয়ে উত্তমরূপে কর্ষণ করে ১২ ফুট ব্যবধানে ছায়া ফসল কলাগাছের সারি রোপণ করতে হয়। ঐ সারিগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত হওয়া চাই এবং প্রতি সারিতে ৯ ফুট অন্তর কলাগাছ রোপণ করতে হয়। অঙ্কুরিত সুপারিগুলি রোপণ করবার অন্তত ৬ মাস পূর্বে কলার তেউড় রোপণ করতে হয় যাতে সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অঙ্কুরিত সুপারিগুলিকে প্রয়োজনমত ছায়া দিতে পারে। কলার সারির মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে ৫ টন পচা গোবরসার প্রয়োগ করে দক্ষিণ-উত্তরে লম্বিত ৪ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি উচ্চ কেয়ারি প্রস্তুত করতে হবে। কেয়ারিগুলি সুবিধামত লম্বা করা যেতে পারে। দু' সারি কলাগাছের মধ্যে ৪ ফুট চওড়া দু'টি করে কেয়ারি করতে হয়। জলনিকাশ ও সেচের জন্য কেয়ারি দু'টির মধ্যে ১২ ফুট প্রশস্ত নালী কাটা উচিত। কলাগাছের ছায়া পর্যাপ্ত না হলে প্রতি কেয়ারির পশ্চিম সীমান্তে শ্রুটিবগীয় ফসলের গাছের (যথা শন বা ধপের) বীজ বপন করা উচিত। এ গাছ বড় হলে প্রচুর ছায়াদান করবে।

চারাবাগানের কেয়ারিতে সুপারির চারাগুলি ১×১ ফুট ব্যবধানে রোপণ করতে হয় এবং প্রতি

কেয়ারির দুই প্রান্তে ১ ফুট ছেড়ে তিন সারি সুপারির চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের পর কেয়ারিগুলিতে কাঁচা ও শুষ্ক পাতা পচতে দিতে হয়। বর্ষাকালে কেয়ারিগুলিতে জল-নিকাশের এবং গ্রীষ্মকালে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।

এক বৎসরে পাঁচ বা তদধিক পাতা জন্মায় এমন উত্তম-বেড়যুক্ত সতেজ চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

চারাগুলিকে বহুদূরে পাঠাতে হলে উত্তমরূপে মোড়ক বাঁধতে হবে যাতে শিকড়ে আঘাত না লাগে বা প্রধান কাণ্ড ভেঙে না যায়।

কীটের আক্রমণ

চারাবাগানে লাল ও সাদা কীট সাধারণত সুপারি চারার পাতায় আক্রমণ চালাতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার তলার দিকে এইসকল কীটের আস্তানা দেখা যায়। পাতাগুলি ক্রমশ হরিদ্রাবর্ণ হয় ও শুষ্ক হতে থাকে। পোকাকার দ্বারা পাতাগুলি আক্রান্ত হয়েছে দেখামাত্র গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত জল (২ গ্যালন জলে ১ আউন্স গন্ধকচূর্ণ) পিচকারির দ্বারা ছিটিয়ে দিলে কীট দমিত হয়।*

*ভারতীয় কেন্দ্রীয় সুপারি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে



রাষ্ট্রীয় শস্যগোলা

১ম ব্যক্তিঃ বৃদ্ধলে মোড়ল! চাষীর হ'ল শতক শত্রু। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে ফসল ফলালে; ফসলও হ'ল ভালই। মনে কত আশা—ছেলেটার বায়না একটা শীতের জামা হবে, বোঁ-এর একটা অনেক দিনের শখ রূপোর বিছে চাই, আর কিছ্ টাকা থাকলে ঘরের দাওয়াটা পাকা করব। কিন্তু অদেষ্ঠ মন্দ। বাজারে ফসলের নাকি দাম পড়েছে—ফোড়েরা বলল। এত কষ্টের ফসল, এবার যাও বা বেশি ক'রে ফলালাম, তা তোমার ঐ যে কী বলে, লাভের গুড় পিঁপড়ের খেল।

২য় ব্যক্তিঃ বল কী! পিঁপড়ের সব খেলে।

১ম ব্যক্তিঃ আরে পিঁপড়ের কি আর খাচ্ছে? খেলে তোমার হারান ফোড়ে। ছেলেটা অসুখে পড়ল। টাকা না হ'লেই নয়। তাই বাধ্য হয়েই বেচতে হ'ল হারানের কাছে। আর ও যা দাম দিলে, তাই হাত পেতে নিলাম। আমি খেটে মলাম, আর ব্যাটা টাকার জোরে উটকো দু' পয়সা কামিয়ে নিলে। দেখ নি ঘরদোর সব পাকা করছে?

২য় ব্যক্তিঃ তা ঠিক। ঐ ফোড়েরা মাঝ থেকে দই মারছে। তা আর করবেই বা কী? ফসল বাঁধা রেখে তো আর কেউ টাকা দিচ্ছে না। তোমার না হয় ছেলের অসুখ হঠাৎ দরকার হওয়ায় বেচেছ। আর আমরা কী করি বল তো? ফসল যে গোলায় ধ'রে রাখব, ট্যাকে পয়সার সে জোর কই? দিন আনি দিন খাই—এই তো অবস্থা।

১ম ব্যক্তিঃ আরে ধেঁ তোমার গোলা, নিকুচি করেছে গোলায়। রেখেছিলাম তো গতবার কিছ্ পাট গোলায় ধ'রে। চার মাস পরে দেখি ইন্দুরে সেই পাট কেটে সর্বনাশ ক'রে দিয়েছে। লাভ তো দু'রের কথা, মোটা লোকসানই হয়ে গেল।

মণ্ডলঃ আজ দেশে বেশি ফসল ফলানো কত দরকার। খাবার চাই, পয়সা চাই, তা না হ'লে আমাদের চলবে কী ক'রে? তার মধ্যে বাড়তি ফসল হ'লেও যদি ফোড়ের হাতে আর ইন্দুরের পেটেই লাভটা চ'লে যায়, তবে তো আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। পাকা ভাল গুদাম আমরা সাধারণ চাষীরা পাবই বা কোথায় আর সে সামর্থ্যই বা ক'জনের আছে বল? তবে কি জান, সরকার এত বিবেচনা ক'রে পাঁচসালা পরিকল্পনা করেছেন। ও'রা কি এ বিষয়ে কিছ্ ব্যবস্থার কথা ভাবেন নি?

১ম ব্যক্তিঃ আরে ধেঁ। আমাদের কথা আর কে ভাবে?

মণ্ডলঃ কী আশ্চর্য! এ যে সরকারী মালগুদাম করপোরেশনের সেক্রেটারিমশাই এখানে! দেখুন, এখনি আমরা ফসল গুদামজাত করার অসুবিধা আর ক্ষয়ক্ষতির কথা আলোচনা করছিলাম। ফসল বেশি ফলিয়েও চাষীরা যদি ফোড়ের হাতে মার খায় তবে আমাদের লাভ হবে কী? তা ছাড়া, অনেকের তো গুদামজাত ক'রে ফসল ধ'রে রাখবার মত ক্ষমতাও নেই। আর যাদের আছে তাদেরও গুদাম এত মামূলি ধরনের যে, ফসলের তাতে ভারি লোকসান হয়। এই তো মঙ্গলময় বলছিল, পাট গুদামজাত ক'রে ইন্দুরে কেটে ও'র লোকসান করিয়ে দিয়েছে। এটা তো কম লোকসান নয়, কী বলেন?

সেক্রেটারিঃ দেখুন, মোড়ল মশাই, আপনি তো শুধু মঙ্গলময়ের লোকসান দেখছেন। আর আমরা সরকার থেকে দেখছি দেশের সমস্ত চাষীর লোকসান। আমাদের পশ্চিম বাঙলাতেই ধরুন, কত হাজার হাজার মঙ্গলময় রয়েছে। সকলের লোকসান একত্র করলে—সারা দেশে কতটা লোকসান হচ্ছে ভাবুন তো! ফসল আমাদের সম্পদ—যা আমাদের চাষীরা বহুকষ্টে তৈরি করেন। এভাবে তার

অপচয় হওয়াটা কত দুঃখের! যেখানে নিজেরা খেতে পাচ্ছি না, সেখানে ইন্দুরে পোকামাকড়ে কত কোটি টাকার ফসল প্রতি বছর খেয়ে বা নষ্ট করে ফেলছে, বলুন তো? আমাদের মোট ফসলের প্রায় দু' আনা থেকে তিন আনা পরিমাণ প্রত্যেক বছর নানাভাবে, মাঠে গুদামে পোকামাকড় আর ইন্দুর ইত্যাদির পেটে যায়। এটা বাঁচাতে পারলে এতেই আমাদের দেশের সব লোক বছরের বেশ কিছুদিন খেতে পেত। আমাদের দেশে রোজই নগ্নতার ওপর মানুষ জন্মাচ্ছে। ভাবুন অবস্থাটা। এখুনি আমাদের সম্বলের ফসল দিয়ে - লোকের পেট ভরছে না। এর ওপর ৫-১০ বছর এভাবে লোক বাড়লে খাবার জুটবে কোথা থেকে? এ অবস্থায় এক দানা ফসলও নষ্ট করা চলে না। আর চাষীর আর্থিক অবস্থার তাড়াতাড়ি উন্নতি না হলে বেশি ফসল ফলানোও তার পক্ষে মর্শকিল। তাই একদিকে যেমন চাষীদের আর্থিক উন্নতির সন্ধান ক'রে দেওয়া দরকার তেমনি অন্য দিকে আমাদের কষ্টার্জিত প্রতিটি ফসলের কণা, নষ্ট হ'তে না দিয়ে, কাজে লাগানো উচিত।

১ম ব্যক্তি: তা তো বদ্বালাম; কিন্তু উপায়টা কী, বলুন। কোন চাষী তার পরিশ্রমের ফসল নষ্ট করতে চায়?

সেক্রেটারি: সেটা ঠিকই বলেছেন। দেখুন, সমস্যাটা মোটামুটি এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের চাষীরা ফসল ওঠার সাথেসাথেই দাম কমে গেলেও বিক্রি ক'রে দিতে বাধ্য হন। তার দু'টো কারণ। প্রথমত, তার ফসল ভালভাবে গোলাজাত ক'রে রাখবার নিজের কোন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই পরসার এত অভাব যে, ফসল ওঠার সাথে সাথেই, দাম কম থাকলেও বিক্রি ক'রে দিতে হয়। যদি ফসল ভালভাবে গোলাজাত ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা যায় এবং চাষীরা যদি কিছুদিন ক'রে রেখে তেজী দামে বিক্রি করতে পারেন তা হলে তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের কিছুটা দাম পাবেন।

এতে যেমন অপচয়ও কমবে তেমনি জাতীয় সম্পদও বাড়বে।

মন্ডল: তা ঠিক। আমরাও তো তাই ব'ঝি। কিন্তু কিভাবে এই ব্যবস্থা হ'তে পারে তা তো ব'ঝি না। চাষীরও তো ফসল ওঠার সাথেসাথেই টাকার দরকার হবেই। আর সেই টাকা না পেলে চাষী তো ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবেই—তা আপনার গোলাজাত করবার যত ভাল ব্যবস্থাই থাক না কেন।

সেক্রেটারি: দ্বিতীয় পাঁচসালী পরিকল্পনায় এ বিষয়টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের চাষীরা যাতে ভালভাবে ফসল গোলাজাত করবার সুবিধা পান আর তাঁদের টাকার প্রয়োজনটাও যাতে মেটানো যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতিই এই পরিকল্পনাটি চালু করা হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা পুরো চালু করতে এখনও কিছু সময় লাগবে। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে, সরকার আইন ক'রে কেন্দ্রীয় “ওয়ার হাউসিং কর্পোরেশন” গঠন করেছেন—যাকে চলতি কথায় কেন্দ্রীয় মালগুদাম কর্পোরেশন বলা চলে। প্রত্যেক রাজ্যে “ওয়ার-হাউসিং কর্পোরেশন” গঠিত হয়েছে।

২য় ব্যক্তি: এতে কাজটা কী হবে?

সেক্রেটারি: কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন দেশের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে খুব বড় বড় গুদাম তৈরি করবেন। এক-একটা গুদামে ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ২ লাখ ৭০ হাজার মণ মাল মজুত করা যাবে। আর রাজ্য কর্পোরেশন যেসব গুদাম করবেন তার প্রত্যেকটিতে ২৭ হাজার থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার মণ মাল মজুত রাখা চলবে। রাজ্যের গুদাম-গুলিও নানা ব্যবসাকেন্দ্রের কাছাকাছি তৈরি করা হবে। আমাদের পশ্চিম বাঙলাতেও ইতোমধ্যেই তিন জায়গায় গুদাম খোলা হয়েছে।

মন্ডল: মালগুদামের কাজকারবার কীভাবে হবে একটু ব'ঝিয়ে বলুন না।

সেক্রেটারিঃ এইসব গদুদামে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে—যাতে পোকা-মাকড়ে গদুদামজাত ফসল নষ্ট না করে বা মাল পচে কোন ক্ষয়ক্ষতি না হ'তে পারে। গদুদামের কর্ম-চারীকেও ভালভাবে মাল মজুত রাখবার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কারবারের তদারকি ভালভাবে হ'তে পারবে। এইসব মাল-গদুদামে যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে এসে নিজের ফসল জমা রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। এর জন্য অবশ্য ফসলের মালিককে সামান্য কিছু মাসিক ভাড়া দিতে হবে।

মণ্ডলঃ এতে চাষীর মাল গদুদামজাত ক'রে রাখবার একটা সুব্যবস্থা হ'ল ; কিন্তু আপনি যে বললেন চাষীর আর্থিক সুবিধার কথা, সেটা কী ক'রে হবে তা তো বুঝলাম না।

সেক্রেটারিঃ ক্ষেত থেকে ফসল ওঠার পর চাষীরা তা এসব গদুদামে জমা রাখতে পারেন। মাল জমা দিলে গদুদাম থেকে তাঁরা একখানা রসিদ পাবেন। সেই রসিদখানা ব্যাংকে জমা দিয়ে গচ্ছিত মালের চলতি বাজারদর অনুযায়ী মোট দামের দশ-এগার আনা পরিমাণ দাম পেতে পারবেন। এই টাকায় নিজে-দের প্রয়োজন তাঁরা মেটাতে পারবেন। পরে ফসলের চড়া দর পেলে সুবিধামত বিক্রি ক'রে পণ্যের দরুন নেওয়া আগাম টাকাটা মিটিয়ে দেবেন।

১ম ব্যক্তিঃ আমাদের সব ছোট ছোট চাষী, তাঁরা কি মনে করেন যে, অত হাঙ্গামা ক'রে ব্যাংক থেকে মালের রসিদ দিয়ে টাকা আনতে পারবেন?

সেক্রেটারিঃ কথাটা ভালই বলেছেন। ছোট ছোট চাষীদের পক্ষে সামান্য সামান্য ফসল নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় এভাবে টাকা নেওয়া একটু শক্ত। তবে তাঁরা মিলে যদি সমবায় বিপণন সমিতি গড়ে নেন, তা হ'লে সেই সমিতিই তাঁদের হয়ে মাল-গদুদামে তাঁদের ফসল জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে চাষীদের দিতে পারবেন। এখন ছোট চাষীদের সংঘবন্ধ না হ'লে চলবে কেন বলুন? আশ্রয়ক্ষর জন্যই এটা দরকার। তা হ'লেই দেখুন যে, রাষ্ট্রীয় গোলাঘরের মারফত আমাদের চাষীরা যেমন ভালভাবে গোলাজাত ক'রে ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবার সুযোগ পাচ্ছেন তেমনি আর্থিক অনটনের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পেতে পারবেন। তা ছাড়া এই বিরাট অপচয় থেকে ফসল বাঁচিয়ে দেশের অনটন অনেকটা দূর করতে পারবেন।

মণ্ডলঃ না হে গোবিন্দ। এ'রা ভেবে চিন্তে ভাল রাস্তাই ঠাউরেছেন। সত্যিই তো, এই ব্যবস্থায় তো সব চাষীরই মঙ্গল হবে। এ'দের বৃদ্ধির তারিফ করতে হয়, কী বল?

সকলেঃ তা নিশ্চয়।

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মূল সংলাপ অবলম্বনে

টুকিটাকি

কালিম্পঙে ধনস

এ বছর জুলাই মাসে কালিম্পঙে প্রবল বর্ষাণের ফলে যে ক্ষতি হয় তার সম্পূর্ণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, বরাভালুখোপ, স্যাংসে, দলাপচান, পাইয়ং, সান্টুক ও স্যাংসে সিকোনাক্ষেত্রের সন্নিহিত এলাকাগুদুলিতে পার্বত্য ঢাল জায়গাগুদুলির ব্যাপক ক্ষয় হয়েছে। স্যাংসে সিকোনাক্ষেত্র, স্যাংসে, বরাভালুখোপ এবং তারখোলা থেকে বহুসংখ্যক প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

এ সকল জায়গায় সম্প্রতির বাস্তবিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-উপমন্ত্রী শ্রী এন বি গুরুদ্বং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুদুলি পরিদর্শনকালে স্যাংসে সিকোনাক্ষেত্রে ধনস-বিধ্বস্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গৃহহারাাদের গ্রাণের ব্যবস্থাস্বরূপ একাদশ মাইল ঋষি রোড, মহাকাল দাঁড়া, ভালুখোপ, স্যাংসে ও আলগড়াতে শিবির খোলা হয়েছে। এসকল শিবিরে তিন শতেরও বেশি লোককে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং যাঁদের গৃহ বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত তাঁদের অনেকেই তথায় আশ্রয়লাভ করবেন বলে আশা করা যায়। স্থানীয় সাহায্যাদি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের খাদ্য গ্রাণ ও সরবরাহ বিভাগের গ্রাণ-শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় গ্রাণ-ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আত্ম পরিবারগুদুলিকে গরম কাপড় প্রভৃতি সরবরাহের জন্য স্থায়ী বিবেচনাধীন তহবিল থেকে ১,২৫০ টাকা দান করেছেন।

দুর্গত অঞ্চলে সফরের সময়ে শ্রী গুরুদ্বং ধানের জমিগুদুলির সেচন-সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। এসকল জমিতে পুরোদমে ধানচাষ চলছিল।

যেসব খাল থেকে এসকল ধানের জমিতে জল সরবরাহ করা হ'ত, ধনসের ফলে সেগুদুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষীরা বলেন যে, সাময়িকভাবেও এই খালগুদুলির সংস্কার অবিলম্বে শুরু না করলে বহু ধানের জমি শূন্য হয়ে যাবে, ফলে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হবে। ধান রোয়ার মরসুম শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, অতএব সরকার থেকে অবিলম্বে বিনা সন্দেহে কৃষিক্ষণ ও অন্যান্য ঋণ দেওয়ার জন্য কৃষকগণ উপমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। বরাভালুখোপ, স্যাংসে ও সানতুকের অধিবাসীরাও পাহাড়ের ঢালের জমিগুদুলির বিপজ্জনক অবস্থার কথা উপমন্ত্রীকে জানান। তাঁরা বলেন যে, এসব অঞ্চলে আর বসবাস ও চাষ-আবাদ চলবে না। এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অঞ্চলে বনসৃষ্টি করতে হবে।

দুর্গত অঞ্চলের পরিবারগুদুলি যেসব শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, সেগুদুলিতে চিকিৎসামূলক সাহায্যের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। দুর্গত পরিবারগুদুলিকে নগদ সাহায্য, রেশন, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে। কালিম্পঙে মহকুমা-শাসকের সভাপতিত্বে গ্রাণ-সমিতি সরকারী ও বেসরকারী স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় গ্রাণকার্য শুরু করেছেন।

শ্রী গুরুদ্বং ডোলে অবস্থিত জলাধার পরিদর্শন করেন এবং জনস্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কালিম্পঙ শহরে অস্থায়িভাবে নিয়মিত জলসরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করেন। এই সরবরাহ ঝোরাসের কাছাকাছি স্থান থেকে পাইপ দিয়ে শহরে আনা হবে এবং ধনসের ফলে পাইপ-লাইনের ক্ষতির দরুন ডোলের জলাধারের ঘাটতি সরবরাহ পূরণ করা যাবে।

আলগড়া ও কালিম্পাঙের মধ্যবর্তী ঋষি রোডের পঞ্চদশ মাইলে যে রাস্তা ভেঙে গেছে শ্রী গুরুদ্বং তাও পরিদর্শন করেন এবং সরাসরি গাড়ি চলার রাস্তা সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় পুত্ৰ ও গৃহনিৰ্মাণ বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। জানা যায় যে, বর্ষাকাল শেষ হ'লে এই রাস্তা চালু হবে।

কল্যাণীতে বনমহোৎসব

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বন-উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২রা জুলাই কল্যাণী-স্থিত প্রশাসন-ভবনে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্য এবং ডাঃ জ্ঞান মজুমদার, এম এল এ, বৃক্ষরোপণের তাৎপর্য সম্পর্কে ভাষণ দেন।

সভাপতির ভাষণে উপমন্ত্রী মহাশয় বৃষ্টি আনয়ন, মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, সরকারী উদ্যোগে আরম্ভ এই কাজ জনসাধারণই অব্যাহত রাখবেন এবং উভয় পক্ষই একযোগে কাজ করে গ্রামে ও শহরে উৎসাহের সঞ্চার করবেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল বালিকাদের সঙ্গীত।

উপমন্ত্রী মহাশয় কল্যাণী রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রেও কয়েকটি চারা রোপণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ভেষজ উদ্ভিদ কমিটির এক সাম্প্রতিক সভায় পশ্চিমবঙ্গে ভেষজ-উদ্ভিদ উৎপাদনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ কমিটির সভাপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এতে সভাপতিত্ব করেন। ইপিকাক চাষ যথারীতি চলছে এবং আগামী তিন অথবা চার বৎসরের মধ্যে ইপিকাকের 'ড্রাই রোডিক্স' উৎপাদন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ২০,০০০ পাউন্ডে পৌঁছবে।

রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ কমিটির উদ্যোগে ইপিকাক উৎপাদন শুরুর হয় ১৯৫৩-৫৪ সালে। চলতি বৎসরে প্রায় ৫,০০০ পাউন্ড মূল উৎপাদন করা হয়েছে এবং প্রতি বৎসরই তা বৃদ্ধি করা হবে। আশা করা যায়, ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ৪০,০০০ পাউন্ডে পৌঁছবে এবং তার মূল্য হবে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা। অনুমান করা হয়েছে যে, এক লক্ষ পাউন্ড মূলের দ্বারা ই দেশের চাহিদা মিটবে, এবং বাড়তি উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। ইপিকাক থেকে 'এমিটিন হাইড্রোক্লোরাইড' প্রস্তুতকারী একটি প্রাচীন ও বহু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই অর্থকরী হারে উৎপাদন আরম্ভ করেছে এবং তাঁদের করাখানা বর্তমানে কলিকাতাতেই অবস্থিত।

অধিকতর পরিমাণ এবং উন্নততর ধরনের উপক্ষার প্রদানকারী উন্নততর ইপিকাক-গাছ উৎপাদনের জন্য তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্তমানে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলেছে। উদ্যানে ও বীক্ষণাগারে এই গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, ঐ গাছের শূদ্ধ শিকড়েই নয়, কাণ্ড এবং পত্রের বহুল পরিমাণে উপক্ষার আছে। ১ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত আকারের কাণ্ডে প্রায় ২ শতাংশ এবং পাতায় ১-১৮৬১ শতাংশ উপক্ষার (মোট উপক্ষার—এমিটিন রূপে গণ্য) আছে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের সম্পর্কে এমিটিন-জাত দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারকেরা খুবই আগ্রহান্বিত। উল্লেখযোগ্য যে, এমিটিন হাইড্রোক্লোরাইড প্রস্তুতের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ ইপিকাক-মূল উৎপাদনের একমাত্র স্থান হ'ল পশ্চিমবঙ্গ। এ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা ও নিকারাগুয়া থেকে ইপিকাকের মূল আমদানি করা হ'ত, কিন্তু মূল ও কাণ্ডে অধিকতর সমৃদ্ধ উপক্ষার সমন্বিত ইপিকাকের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশই বৃদ্ধি পাওয়ায় শূদ্ধ ভারতেরই নয়, বিশ্বের বাজারের চাহিদাও মেটানো যাবে।

উক্ত কমিটি সপর্গন্ধার অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি 'বিস্ময়কর' ঔষধগাছ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

সম্পর্কেও আলোচনা করেন। ঐ সপর্গন্ধা থেকে রিসারপাইন ও অন্যান্য উপক্ষার নিষ্কাশন করা হয়। সর্বাধুনিক গবেষণায় জানা যায় যে, সপর্গন্ধা থেকে নিষ্কাশিত উপক্ষার অপেক্ষা রাউভোলিকিয়া কেনসিনস থেকে যে উপক্ষার পাওয়া যায়, তা উৎকৃষ্টতর। ফলে সপর্গন্ধার মূল অপেক্ষা শেষোক্তটির মূলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। রাউভোলিকিয়ার চাষ সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আর্থনীতিক এবং সে সম্পর্কে ভেষজ উদ্ভিদ কর্মিটি সাফল্যের সহিত কাজ চালিয়েছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের রোঙগোতে ঐ দুই রকম উদ্ভিদের চাষ হচ্ছে। এইভাবে উৎপাদন-ব্যয় বহুল-পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফলে ন্যায়সংগত মূল্যে ঐ ঔষধ পাওয়া সম্ভব হবে।

আগট অন রাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটালিসের উৎপাদনও বেড়ে গেছে এবং শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে সেসব ঔষধ প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটাতে পারা যাবে বলে আশা করা যায়।

কার্যরত চা'লকলগুলির জন্য লাইসেন্স

কেন্দ্রীয় সরকারের এক আদেশবলে ১৯৫৮ সালের চা'লকল-শিল্প (নিয়মিতকরণ) আইন, ১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ করা হয়েছে। এই আইনের বিধান অনুসারে রাজ্য-সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি নতুন চা'লকল (ধানভানার কলও তার মধ্যে পড়বে) স্থাপন করতে পারবেন না। তা ছাড়া, বর্তমানে, হেসকল চা'ল-কলে ১৯৫৮ সালের ২২এ এপ্রিল থেকে ১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রিল পর্যন্ত যে-কোন সময় চা'ল উৎপাদনের কাজ চালানো হয়েছে সেগুলিকে, উক্ত আইন কার্যকরী হওয়ার পরে চা'ল উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উক্ত আইন অনুসারে লাইসেন্স নিতে হবে। কিন্তু এরূপ চা'লকলগুলির যদি ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গে চা'ল ও ধান নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে লাইসেন্স থাকে তবে ঐসকল লাইসেন্স অনুসারে ১৯৫৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর

পর্যন্ত চা'ল উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাওয়া চলবে। রাজ্যসরকার সেই অনুসারে ১৯৫৯ সালের ৩রা অগাস্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এক আদেশ প্রচার করেছেন।

বন্ধ-হয়ে-যাওয়া কোন চা'লকল, অর্থাৎ (১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রিল তারিখে যে কলের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু যেখানে) ১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রিলের পূর্বে অন্তত এক বৎসর চা'ল উৎপাদনের কাজ চালানো হয় নি, সেই কলকে চা'ল উৎপাদনের কাজ আবার শুরু করার জন্য রাজ্যসরকারের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে বলেও এই আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত আইনে আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রাজ্য-সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও চালু চা'লের কল তার স্থান-পরিবর্তন করতে বা চা'ল উৎপাদনের সামর্থ্য বাড়াতে পারবে না।

পারমিট ও লাইসেন্স প্রদান এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতাবলী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারকে অর্পণ করা হয়েছে।

শুষ্কনিয়াতে পশুখামার

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট ৭৯,১৮৪ টাকা ব্যয়ে তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণার্থে বাঁকুড়া জেলার শুষ্কনিয়াতে একটি পশুখামার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন।

কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ

যাতে উৎপাদকেরা ন্যায্য মূল্য আর ক্রেতার খাটি জিনিস পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ চিহ্নিতকরণের এক ব্যাপক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে।

বহুকালের নিজস্ব ঐতিহাসম্বিত বাঙলার বেশম উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম দ্রব্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। তালা তৈরিকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩,০০০ কারিগর-পরিবার উক্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

হাওড়া জেলার যে বড়গাছিয়া গ্রামের চতুর্দিকে ৫০ বৎসরের প্রাচীন তালা-শিল্প অবস্থিত, সেখানে এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় তালা-কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রেতা ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সাহায্য করার জন্য শিল্প-অধিকর্তা কলিকাতার ১৪নং হেয়ার স্ট্রীটে গ্রিভলে একটি সিটি অফিস করেছেন। সেখানে উৎকর্ষ চিহ্নিতকরণ পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত একজন প্রাধিকারিক রয়েছেন।

তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বর্ষে প্রধানত তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য প্রণীত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণ সম্পর্কে অনধিক ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে মঞ্জুরি দিয়েছেন।

১৯৫৯-৬০ সালে মেদিনীপুর জেলার ঢোলকত গ্রাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের লোথাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের মোট ১,১০০ টাকার এক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই শর্তে অনুমোদন দিয়েছেন যে, পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ২০ শতাংশ সংঘকেই বহন করতে হবে।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক
শ্রীশুভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

পৃথিবীর অশ্রুত্ব

কুকনো পাতার ওপোর একটা ফল পড়ে শব্দ হ'ল 'ধূপ'। খরগোস ভাবলে, সর্বনাশ! এ নিশ্চই পৃথিবীর ভেঙে পড়ার শব্দ! চাচা আপন প্রান বাঁচা...পালিয়ে বাঁচি আগে...

একটা হরিণ কাছেই চরে বেড়াচ্ছিল, সে খরগোসের ঐ বাঁচামরা দৌড় দেখে জিজ্ঞাসা করলো—“তায়্যা ব্যাপার কী—এমন উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে দৌড়ছে যে?”

‘জানোনা বুঝি, পৃথিবী যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে!’ দম নিয়ে খরগোস জবাব দেয় ‘প্রানে যদি বাঁচতে চাও তো ভাগো আমার সঙ্গে।’

“আরে বাসরে বলে কী!” হরিণ প্রানপনে দৌড় লাগালো ওর পিছু পিছু। কিছু পরেই তাদের দৌড়বাজীতে যোগ দেয় একটা মোষ, বুনো বাঁড় একটা, গণ্ডার, একটা বাঘ, একটা হাতি এমন কী একটা সিংহও। চাই কি দেখতে দেখতে বনের যতো জন্তু জানোয়ার ছিল তারা সবাই ওদের পেছনে দৌড়ের এক মিছিল বানিয়ে ফেলে।

ক্লাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই জানোয়াবের দল দুদাড় করে গাছপালা ভেঙে ক্রোশের পর ক্রোশ দৌড় দেয়। কিন্তু হাতী বেচারী আর পারেনা। কতক্ষণ ধরে দৌড়ছে সে, কিন্তু কই পৃথিবী খতম হওয়ার কোন চিহ্নই দেখা যায়না তো! দেখা যাক একবার বাঘ ভায়াকে জিজ্ঞাসা করে। ও বাঘ মশাই, আপনি ঠিক জানেন তো যে পৃথিবী ভেঙে পড়ছে?

বাঘ থমকে দাঁড়ায়। উত্তরে বললে—“গণ্ডার দাদা তো ওই কথাই আমাকে বললে।”

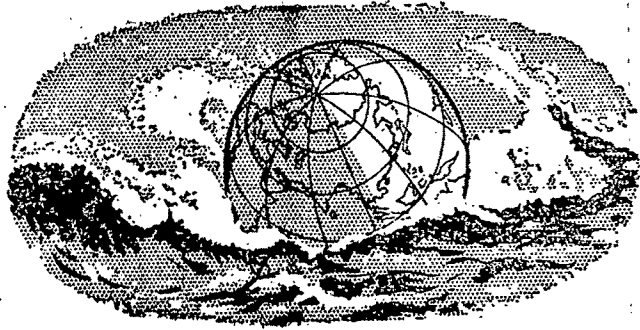
গণ্ডার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খেঁকিয়ে ওঠে—“আমি ও সব জানি টানি না বাপু; ওই বুনো বাঁড়টাই তো দিলে আমার এ খবর।”

বুনো বাঁড় ঘড় ঘড় ক'রে প্রতিবাদ জানায়—“আমায় কেন দোষ দাও বাপু; মোষ আমায় যা বলেছে সেই কথাই আমি তোমাকে শুনিয়েছি।”

মোষ দেখায় হরিণকে; হরিণ ঢোক গিলে জবাব দেয়—“এই খরগোস ছোকরাই তো এই খবরের মূল!”

শুনে হাতি তো রেগে টং, ভুঁড় উচিয়ে থপ থপ করে খবগোসের কাছে এগিয়ে এসে শুধায়—“ওহে ছোকরা, কে তোমায় বললে শুনি যে পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে?”

বুক চিতিয়ে খরগোস জবাব দেয়—“আমাকে বলার কারুর দরকার করেনা। ‘ধূপ’ শব্দ শুনেই ব্যাপা-



রটা আমি বুকে ফেলেছি। ধরেই নিলুম এ শব্দ নিশ্চয়ই পৃথিবী ভেঙে পড়ার শব্দ।”

এতো কষ্টের পরেও বেচারী হাতি না হেসে থাকতে পারেনা,—“ও, শুজবের মূল তা'হলে তুমিই।” হো, হো করে হাসতে হাসতে দলের সবাই যে যার ডেরায় ফিরে যায়।

গল্পের নীতিঃ প্রকৃত তথ্য পাওয়া গেলে ও জানা থাকলে শুজবে বিশ্বাস করার দরকার করেনা। যেমন ধরুন ‘ডালডা’। এর সম্বন্ধে আসল তথ্যটি কী? সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উদ্ভিজ্য বিস্কুত তেল থেকে তৈরী ‘ডালডা’ রাঁধবার একটা সর্ব উপযোগী মাধ্যম। পুষ্টিগুণ বাড়ার জন্যে এতে আউন্স প্রতি ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। এর প্রতি আউন্সে আরও রয়েছে ৫৬ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’। লক্ষ লক্ষ গৃহলক্ষীরার রান্নার জন্যে ‘ডালডা’ই ব্যবহার করে থাকেন। কেননা তাঁরা জানেন যে কেবল রান্নার মাধ্যমই নয় এটা একটা খাদ্যও বটে।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্ত অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer) এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্ত নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং'

পত্রিকা পড়ুন

কৃষকদের নিজস্ব পত্রিকা এটি। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা করছেন আর যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবকিছু জানতে পাবেন আপনি এই পত্রিকায়। সহজ ইংরেজীতে রচিত এর চিত্তগ্রাহী রচনাগুলি—ছাপা হয় নানা বর্ণে। 'ম্যান অফ দ্য মাস', 'হিন্টস্ টু দ্য ফার্মার', 'কোম্পেন্স উইথ অ্যান্সার', প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ আছে এতে; তা ছাড়া থাকে পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বৃক্ষপালন প্রভৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্যের মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে। 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং' কৃষকের বন্ধু।

মূল্য
প্রতি সংখ্যা—৫০
বার্ষিক চাঁদা—৯

ছবিতে ভর্তি আর দ্রুত রঙে ছাপা
এজেন্সির শর্তের জন্য জ্ঞাপন করুন

এই কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন

Business Manager :

INDIAN FARMING

Indian Council of Agricultural
Research, Queen Victoria Road,
New Delhi.

I am interested in the *Indian Farming*. Kindly enrol me as a member and send the first copy by V. P. P. covering Annual/Half-yearly subscription.

Name :

Address :

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চাঁদ্বনপল্লবগনা			২১।	সিউড়ি	সিউড়ি।
১।	বারাগত	বারাগত।	২২।	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২।	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩।	বেহালা	বেহালা।	২৩।	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪।	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪।	বিক্রপুর	বিক্রপুর।
৫।	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫।	মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর।
৬।	কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর।	২৬।	বেলুয়া (মেদিনীপুর)	কন্টাই রোড।
৭।	রানাবাট	রানাবাট।	২৭।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা শ্রীশ্রীদাবাদ			২৮।	ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড
৮।	কাশি	কাশি।	২৯।	ভবলুক	ভবলুক (আউট এঞ্জেসি)
৯।	জলীপুর	জলীপুর রোড	৩০।	কাঁথি	কন্টাই রোড
১০।	লালবাগ	মুন্সিগাঁও	উত্তর এলাকা		
১১।	বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১।	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২।	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২।	বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ
১৩।	রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩।	মালদহ	মালদহ কোর্ট
১৪।	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫।	আরামবাগ	চাঁপাভাঙ্গা	৩৪।	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬।	হুগুড়া	হুগুড়া।	৩৫।	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬।	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭।	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭।	কালিম্পাং	কালিম্পাং।
১৮।	আগানসোল	আগানসোল।	৩৮।	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯।	কালনা	বাগনাপাড়া	জেলা কোচবিহার		
২০।	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯।	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০।	মাখাভাঙ্গা	মাখাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ডেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওলাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁধি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদুং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।



খাঁটি
কুইনিন

এবং সিনকোনা
থেকে তৈরি
অত্যন্ত ওষুধগুলি

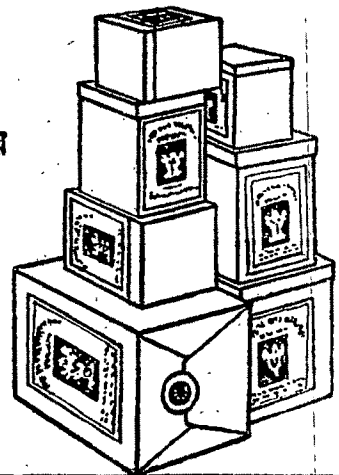
কেনবার সময় দেখে নেবেন সেগুলি যেমন
পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের

কুইনিন কারখানার

তৈরি হয়

কুইনিন, কুইনিডিন, ইউকুইনিন, টোটাকুইনা,
সিনকোনা, ফেব্রিকিউজ ইত্যাদি পাউডার এবং ট্যাবলেট

সব বড় বড় ঔষুধালয়ে এবং সরকারী কুইনিন
সেল ডিপো, ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,
কলিকাতা-১৩ হইতে পাওয়া যায়।



পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (**District Veterinary Officer**) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ণাত চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগুদা
	পোঃ নৈহাটা	১১। কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পশু- চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট।	
১৩। ঐ ..	বারাসাত		
১৪। ঐ ..	হাবড়া		
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সন্দেশখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়েয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা,
১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

	ব্রাহ্ম্যমাণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্ম্যমাণ পশ্চিচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ ..	ডোমজুড়
৩।	ঐ ..	আমতা

	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	হাওড়া
২।	ঐ ..	উলুবেড়িয়া
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪।	ঐ ..	বাগনান
৫।	ঐ ..	শ্যামপুর
৬।	ঐ ..	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,
পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	ব্রাহ্ম্যমাণ পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	বেথুয়াডহরি
৩।	ঐ ..	রানাঘাট
৪।	ঐ ..	শান্তিপুর

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	রানাঘাট
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনী
৪।	ঐ ..	চাক্দা
৫।	ঐ ..	হাঁসখালি
৬।	ঐ ..	রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,
পোঃ বহরমপুর

১।	ব্রাহ্ম্যমাণ পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	হরিহরপাড়া
৩।	ঐ ..	দমকল
৪।	ঐ ..	রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ ..	ভগবানগোলা
৬।	ঐ ..	ধুলিয়ান
৭।	ঐ ..	নবগ্রাম

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ ..	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ ..	কান্দি
৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেনডাঙ্গা
৬।	ঐ ..	বারওয়ান, পোঃ পাঁচধুপী
৭।	ঐ ..	কান্দি
৮।	ঐ ..	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালাদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা। হরিশচন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ	৩।	ঐ .. খড়বা, পোঃ চঞ্চল
			৪।	ঐ .. রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
			৫।	ঐ .. মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর	৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর	৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	ধুম	২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ	৩।	ঐ ..	কালিম্পাঙ
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়াই, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি	৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি	৭।	ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
			৮।	ঐ ..	কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	কোচবিহার	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ	২।	ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩।	ঐ ..	মাথাডাঙ্গা	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
			৪।	ঐ ..	সিঁড়াই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

প্রাথমিক		ঠিকানা	স্থিতিবান		ঠিকানা
১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	কালচিনি	সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
			৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	গুস্করা	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..	মেমারী	২।	ঐ ..	কাটোয়া
৩।	ঐ ..	সেহারা বাজার	৩।	ঐ ..	কালনা
৪।	ঐ ..	কালনা	৪।	ঐ ..	আসানসোল
৫।	ঐ ..	কাটোয়া	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	ভাতার
৬।	ঐ ..	নতুনহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৭।	ঐ ..	আসানসোল	৬।	ঐ ..	মঙ্গলকোট
৮।	ঐ ..	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ ..	শক্তিগড়
৯।	ঐ ..	দুর্গাপুর	৮।	ঐ ..	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	সাঁইথিয়া	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..	বোলপুর	২।	ঐ ..	রায়পুরহাট
৩।	ঐ ..	দুবরাজপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	নলহাটি
৪।	ঐ ..	রায়পুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৫।	ঐ ..	নলহাটি	৪।	ঐ ..	মহম্মদবাজার
			৫।	ঐ ..	আমেদপুর
			৬।	ঐ ..	বোলপুর, শ্রীনিবেশ

হুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুঁচুড়া

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	ত্রিবেণী	২।	ঐ ..	শ্রীরামপুর
৩।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	আরামবাগ
৪।	ঐ ..	তারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
			৪।	ঐ ..	ধানাকুল
			৫।	ঐ ..	পুরসুন্দরা,
					পো: চাঁপাডাঙ্গা
			৬।	ঐ ..	পোলবা,
					ধো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ	মেদিনীপুর
৩।	ঐ	বালিচক
৪।	ঐ	গড়বেতা
৫।	ঐ	খড়গপুর
৬।	ঐ	তমলুক
৭।	ঐ	মহিষাদল
৮।	ঐ	নরঘাট
৯।	ঐ	ঘাঁটাল
১০।	ঐ	কাঁথি
১১।	ঐ	এগুয়া
১২।	ঐ	ক্ষীরপাই

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ	তমলুক
৩।	ঐ	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ	ভগবানপুর
৬।	ঐ	পটেশপুর
৭।	ঐ	খেজুরি
৮।	ঐ	তমলুক
৯।	ঐ	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ	ওন্দা
৩।	ঐ	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ	সোনিমুখী
৬।	ঐ	খাতরা

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনিমুখী
৪।	ঐ	পাতসায়ার
৫।	ঐ	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্বত্বাধার পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ	বলরামপুর
৩।	ঐ	মানবাজার
৪।	ঐ	ঝালদা
৫।	ঐ	কাশীপুর
৬।	ঐ	রঘুনাথপুর

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্বাধার	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ	হুরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্লড-স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ

জলপাইগুড়ি

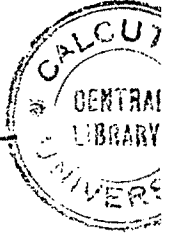
- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পোট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডাল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডাল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর



হাতের মুঠোয় চাঁদ

(একটি প্রাচীন ভারতীয় গল্প)

ছোট বাঁদরেরা খুব রেগে গেছে। “আমাদের বাবা মায়েরা সবসময় বলেন আমাদের নাকি সব কিছু জানবার বয়স হয়নি”—একটা জঙ্গলে সবাই সমবেত হয়ে তারা প্রতিবাদ জানাল “আমরা কক্ষনো অত ছোট নই।” তাদের দলপতি বলল—“আর আমরা সেটা প্রমাণ করব। আমরা এবার থেকে নিজেরা দল করে ঘুরব তাহলেই আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারব।”

সভা শেষ হলে তারা সবাই বাড়ী গেল। কিন্তু সে রাতে কেউ তার বাপ মায়ের পাশে ঘুমোতে গেলোনা। তারা নিজেরা ছোট ছোট দল করে এক দীঘির ধারে এক বিরাট গাছের মগডালে ঘুমোতে গেল।

প্রায় মাঝরাতে একজন ছোট বাঁদরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে গাছের মগডাল থেকে দেখল দীঘির জলে চাঁদ চক্চক করছে। “ওরে ওরে তোরা সব উঠ—” সে চিৎকার করে উঠল—“চাঁদটা দীঘির জলে পড়ে গেছে! চল আমরা সবাইয়ের আগে গিয়ে ওটাকে টেনে তুলি।” “ঠিক ভাই, যা বলেছি!” ওর বন্ধুরাও সবাই সাড় দিল—“ওঃ আমাদের নাম হুহু করে ছড়িয়ে পড়বে।”

তাদের দলপতি বলল—“চাঁদ পর্যন্ত পৌছতে হলে আমাদের একটা শেকলের মত তৈরী করতে হবে।”

বাঁদরেরা এ ওর লাজ চেপে ধরে একটা লম্বা শেকলের মত বানাল। তারপর জঙ্গল কাঁপিয়ে এক বিরাট শব্দ করে দলপতির পিছু পিছু বাঁদরেরা দিল জলে ঝাপ। “ঝপাস্” করে একটা আওয়াজ হোল তারপরেই সব শেষ। সবকটা বাঁদর পড়ল মারা। যারা ভাবে সব জানে তাদের উপদেশ নিতে নেই। উপদেশ নিতে হয় তাদেরই কাছ থেকে যারা সত্যিই জানে। বনস্পতির কথা ধরুন। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিশারদেরা এ বিষয়ে একমত যে বনস্পতি একটি পুষ্টির খাদ্য এবং ভারতীয় খাদ্যে অতিরিক্ত পুষ্টি দেয়।

‘ডালডা’ বনস্পতি অসংখ্য গৃহলক্ষ্মীর নিত্য-সঙ্গী। সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী এটি তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেজ তেল থেকে। ‘ডালডা’ সবরকম রান্নাতেই ব্যবহার করা চলে এবং এটি শক্তিদায়ী স্নেহপদার্থের একটি উৎস। তাছাড়া, ‘ডালডা’ অতিরিক্ত পুষ্টি দেয়। ‘ডালডার’ প্রতি আউন্সে ৭০০ আর্পু-জাতীয় ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। তার ওপরেও এর প্রতি আউন্সে যোগ করা হয় ৫৬ আর্পুজাতীয় ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’।

হ্যাঁ, ‘ডালডা’ শুধু রান্নার জন্যেই ভাল নয়—এটি একটি খাদ্যও বটে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	১৮৯
সহায়ক সমবায় সমিতি : কী এবং কেন	১৯১
সাধারণ খাত্তজব্যের পুষ্টিমান	১৯৮
তৈলবীজ	২১০
‘মালদহ ম্যাংগো প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি’	২১৩
বালুকাময় জমিতে নারকেলচারারোপণ	২১৬
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের আখ	২১৮
গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার	২২৫
কাষ্ঠ-সংরক্ষণ	২২৭
কেন্দ্রীয় খাত্ত ও কৃষি মন্ত্রকের আদেশ	২২৯
টুকিটাকি	২৩০

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা।

বিশ্বাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বসুন্ধরা

১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসীদেরই প্রধান আহাৰ্য্য ভাত। বাকি অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকের মূখ্য খাদ্য ভাত আর রুটি। অল্প কিছু লোকে প্রধান খাদ্য হিসাবে শুদ্ধ রুটিই খেয়ে থাকেন। কিন্তু শুদ্ধ ভাত বা শুদ্ধ রুটি অথবা কেবলমাত্র ভাত আর রুটিতে যে পুষ্টি-উপাদান আছে, তা দিয়ে কারও দেহের সম্যক পোষণ হ'তে পারে না। আমাদের দেহের যথাযথ পোষণের জন্য শ্বেতসার, খাদ্যপ্রাণ, শর্করা, লবণ, চুন প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যোপাদান অত্যাৱশ্যক। রুটিতে বা ভাতে এসবের মধ্যে বিশেষ একটি বা দু'একটি উপাদান বেশি পরিমাণে আছে, অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কোনটা অল্প মাত্রায় আছে, কোনটা বা একেবারেই নেই।

ভাতে এবং রুটিতে দেহপুষ্টির যেসব উপাদান অল্প মাত্রায় আছে, ডালের মধ্যে হয়তো তার কোন-কোনটি অধিক পরিমাণে রয়েছে। আবার ভাত-রুটি এবং ডালের মধ্যে যেসব উপাদান অল্প পরিমাণে আছে, তারই কোন-কোনটি হয়তো খুব বেশি মাত্রায় আছে কোনও শাকে বা সবজিতে। আবার ভাত-রুটি, ডাল, শাক-সবজির মধ্যে যেসব পুষ্টি-উপাদান কম আছে বা মোটেই নেই, সেসব হয়তো রয়েছে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ-খাদ্যে। আর দুধ তো এমন একটি আহাৰ্য্য-পানীয় যা দেহপোষণের উপযোগী প্রায় সমস্ত উপাদানে সমৃদ্ধ। তাই দেহের যথাযথ পুষ্টিসাধন করতে হ'লে, দেহের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খেতে হবে। আমরা যে ভাতের

সঙ্গে ডাল এবং নানা রকমের তরকারি খাই, জল-যোগে যে ভিন্নতর খাদ্য খাই, এ প্রথার প্রচলন হয়েছে এইজন্যই—বিভিন্ন খাদ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ ক'রে যাতে দেহের যথার্থ পোষণ করতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই।

কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আচরণ দেখে মনে হয়, খাদ্যের সঙ্গে যে পুষ্টির কোন সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই। তার একটা প্রমাণ, দু'মুদ্রা দিয়ে অতি উচ্চাঙ্গের সকল রকম পুষ্টি-উপাদান সংগ্রহেরও আর্থিক সামর্থ্য যাঁদের আছে, তাঁরাও শুদ্ধ মদ্যরুটির দিকে লক্ষ্য রেখে এবং পুষ্টির সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থেকে এমন ধরনের খাদ্য ও তরকারি প্রস্তুত করেন যা খেলে দেহের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই হয় না। বিত্তবানদের কথা বাদ দিয়ে এবং খাদ্যকে অখাদ্য করার কথা ছেড়ে দিয়ে এখানে সাধারণ লোকের কথা এবং খাদ্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার কথা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

আমাদের মধ্যে খুব বেশি লোকেরই অভ্যাস হচ্ছে প্রধান খাদ্য ভাত বা রুটির উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করা। সামান্য একটু তরকারি সাক্ষী ক'রে এক থালা ভাত কিংবা ডজনখানেক রুটি উদরসাৎ করলে পেটটা ভরে বটে কিন্তু হেজনে খাওয়া, সেই উদ্দেশ্যে এতে সাধিত হয় না। খাদ্যের দু'একটা পুষ্টি-উপাদান প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে দেহের মধ্যে গিয়ে অনিষ্ট করে এবং অন্য উপাদানগুলির

যোগান পায় না ব'লেও শরীরের ক্ষতি হয়। আর্থ-নীতিক হিসাবের দিক দিয়েও এ অভ্যাসটা হানিকর, কেননা এতে প্রধান খাদ্য ভাত এবং রুটির অপচয় হয়। বহু লোকের দ্বারা সংঘটিত এ অপচয় জাতীয় শস্যভান্ডারে ঘাটতি ঘটায়। আমাদের মত খাদ্যাভাবের দেশে এ ঘাটতি মারাত্মক। আর, জন-সাধারণ যদি খাদ্যের ব্যাপারে প্রধান খাদ্যের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে তা হ'লে কোন দেশেরই খাদ্যসমস্যার সমাধান কোন কালে হ'তে পারে না।

একই খাদ্যের উপর অর্তিনির্ভরশীল না হয়ে আমরা যদি দেহের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য থেকে যথাযথ পুষ্টি-উপাদান সংগ্রহ করি, তা হ'লে দেহস্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে, সেইসঙ্গে জাতীয় খাদ্যশস্যের ভান্ডারেও ঘাটতি নিবারিত হয়। এ বিষয়ে শহর-অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু অসুবিধা আছে। তাঁদের সব জিনিসই অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয়। চাল এবং আটা যে-দরে পাওয়া যায়, পুষ্টি-কর নামে অভিহিত কোন কুলীন খাদ্যদ্রব্য সেই দরে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুষ্টি-কর খাদ্য বলতে শুধু মাছ-মাংস ইত্যাদিকে বঝলে চলবে কেন? অনেক শাক-সবজি আছে যেগুলো চাল-আটার অনুপাতে কম দামে অথবা সমান দামে পাওয়া যায় অথচ বিভিন্ন পুষ্টি-উপাদানে অসাধারণ সমৃদ্ধ। দুগ্ধের বিষয়, অর্থমূল্যে সস্তা এবং পুষ্টিগুণে মূল্যবান বহু জিনিসকে অনেকে ত্যাগ করে। খাদ্য হিসাবে আলুকে আমরা আদর করি, কিন্তু শাখ-আলু বা রাঙা-আলু যে গুণে আলুর চেয়ে বড় কম যায় না, সেকথা অনেকে মনে জানলেও আচরণে মানি না। এমনি অনেক শাক-সবজিই আমাদের উপেক্ষিত। কাঁচা চীনা-কম্বু, ভিজে ছোলা ইত্যাদি অনেকের শুধু উপেক্ষার নয়, উপহাসের বস্তু।

শহরতলি এলাকায় অনেক লোকেরই বসতবাটীর সংলগ্ন দু'-এক চিলতে জমি থাকে। তাঁরা সেই জমিতে কিছু শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারেন।

মুরগিপালন করতেও বেশি জমির দরকার হয় না। একটু বেশি জমি যাঁদের আছে তাঁরা তো গোরু পুষে দুগ্ধের ব্যবস্থাই করতে পারেন। যাঁদের পুকুর বা অন্তত একটা ডোবাও আছে, তাঁরা মাছের চাষ তো করতে পারেনই, হাঁসও পুষতে পারেন।

সবচেয়ে সুবিধা পল্লীবাসীদের। পল্লী-অঞ্চলই কৃষির এলাকা। সকল রকমের খাদ্যসামগ্রীই সেখানে জন্মানো যেতে পারে। কৃষিকাজ বলতে শুধু ধান, পাট, ডাল, তিল, তিসি প্রভৃতি এবং শাক-সবজি উৎপাদন করাকে বঝলেই চলবে না। মৎস্য-উৎপাদনকে তো আমরা চলতি কথায় ব'লে থাকি মাছের চাষ। মাছের চাষ, গো-পালন, হাঁস-মুরগি পোষা—এসবকেও কৃষিকাজের অঙ্গীভূত ব'লে ধরতে হবে। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশেই এসব কৃষিকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের চাষী-ভাইরাও সেটা মেনে নিন।

ভাতের উপরে অত্যধিক নির্ভরতা আমাদের পল্লী-অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় এবং এমনি, বহু চাষী-পরিবারেই। অথচ শস্য, সবজি, মাছ, দুগ্ধ, ডিম—এসব তাঁরাই উৎপাদন করেন। সকল রকম খাদ্য থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করে দেহ-পোষণের সুযোগ তাঁদেরই বেশি। ধান, গম—এসব তাঁরাই উৎপাদন করেন, এসবের জন্য মায়াবোধও তাঁদেরই মনে বেশি হওয়া উচিত। তাঁদের দেখা উচিত যাতে প্রধান খাদ্যশস্যের অপচয় কোনরূমেই না ঘটে।

ভাত-রুটি থেকে শুধু করে মসলাপাতি পর্যন্ত যেসব জিনিস আমরা সাধারণত খেয়ে থাকি, তার কোনটিতে কোন পুষ্টি-উপাদান কী পরিমাণে আছে, এ সংখ্যাতেই অন্যত্র (পৃঃ ১৯৮) একটি তালিকায় তা দেখানো হ'ল। তা থেকে আমাদের পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা নির্দেশ পাবেন ব'লে আশা করা যায়।

সহায়ক সমবায় সমিতি :

কী এবং কেন

(১) সমবায় কেন

ভারতবর্ষে প্রতি দশজন গ্রামবাসীর মধ্যে সাতজনই কৃষক। আপনিও হয়তো তাঁদের মধ্যে একজন।

বীজ বোনার মরসুমের গোড়াতেই বীজ আর সারের জন্য কিংবা হয়তো সেচের কুয়ো নতুন করে ঝালাই করার জন্য আপনার প্রয়োজন টাকা। হয়তো আপনার নতুন লাঙ্গল বা একজোড়া বলদেরও দরকার। যদি নগদ টাকা না থাকে তবে আপনাকে ধারই করতে হবে।

সাধারণত, যদি বন্ধক দেওয়ার মত কিছু জমি না থাকে, তবে ব্যাংক আপনাকে অগ্রিম দেবে না। তখন মরিয়া হয়ে আপনাকে গ্রামের মহাজনের কাছেই যেতে হবে। সে আপনাকে টাকা ধার দিতে পারে—অতি চড়া সুদে।

টাকা না হলে আপনি ভাল বীজ, ভাল যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সারও পাবেন না। ফলে উৎপাদন হবে কম এবং শস্যও হবে খারাপ ধরনের। মাঝে মাঝে আপনার শস্যও মহাজনের কাছে বন্ধক থাকে, সেই মহাজনই তখন শস্যের দাম ঠিক করে দেয়। কঠিন পরিশ্রমের পর আপনি যা পান তাতে আপনার নিজের আর পরিবারবর্গের ভরণপোষণেরই খরচ চলে না।

প্রয়োজনীয় ধান এবং অন্যান্য জিনিস ন্যায্য মূল্যে ঠিক সময়মত না পেয়ে, আপনার উৎপাদন বাড়ানোর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আমাদের গ্রামে এমন অনেক কৃষকই আছেন যাঁদের এই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

এই সমস্যা যদিও কঠিন, তবু এর সমাধান সম্ভব। আপনি এবং আপনার সহযোগী কৃষকভাইদের খরচ বাদে যা সামান্য টাকা হাতে থাকে, তা দিয়ে সবাই মিলে একটা সাধারণ অর্থভান্ডার খুলতে পারেন। এই সাধারণ অর্থভান্ডার নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানও

গড়া যায়। এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সকলকে সাহায্য করবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় সহায়ক সমবায় সমিতি। আপনাদের চাঁদায় যে ভান্ডার গঠিত হবে, তাই হবে এই সমিতির অংশীদারী মূলধন। এই সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে অংশীদারী মূলধনের চেয়ে অনেক বেশি টাকাও ধার পেতে পারে। সমিতিকে আপনি যে চাঁদা মূলধনী অংশ হিসাবে দিয়েছেন, সমিতি সেই টাকা নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আপনাকে ধার দিতে পারে। এ ছাড়া চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-আদিও সমিতি আপনাকে সরবরাহ করতে পারে।

(২) সহায়ক সমবায় সমিতি কী

সহায়ক সমবায় সমিতি হল এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে গ্রামবাসীরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যে সাধারণ আর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটান এবং কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হন।

(৩) সমিতি থেকে আপনি কী পাবেন

বীজ বোনার সময় সমিতি আপনাকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার দেবে। শস্য বিক্রি হয়ে গেলেই, টাকাটা আপনি ফেরত দিয়ে দেবেন। কারণ, যে ঋণ কয়েক মাসের মধ্যেই ফেরত দিয়ে দিতে হয় তাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলা হয়। টাকা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য আপনার উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করে বলে, সহায়ক সমবায় সমিতি আপনার জমি বন্ধক দেবার অধিকার আছে কিনা তা দেখে ধার দেয় না। আপনার চাষের জমির পরিমাণ, আপনার উৎপাদন-পরিকল্পনা, শ্রম ও প্রযত্ন এবং কী পরিমাণ ফসল আপনি পেতে পারেন, তা বিবেচনা করেই সমিতি স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। এই সমিতি আপনাকে

বাড়তি ফসল কাছাকাছি বিপণন সমিতির মারফত বিক্রি করতেই বলবে এবং এই বিক্রির টাকার থেকেই ধারের টাকা শোধ নেবে।

বলদ কেনা, জমির উন্নতি, কুয়ো কাটা, পাম্প বসানো প্রভৃতির প্রয়োজনে যখন বেশ কিছুদিনের জন্য আপনার ঋণ আবশ্যিক হবে, তখন সমিতি আপনাকে মধ্যম-মেরাদী ঋণও দেবে।

এ ছাড়া সহায়ক সমবায় সমিতি চাষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রও সরবরাহ করবে। যেমন বীজ, সার, লাঙল, নিড়ানী, রোগপোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য নানারকম ওষুধ, পশুখাদ্য ইত্যাদি। সহায়ক সমবায় সমিতি এসমস্ত জিনিস প্রচুর পরিমাণে কেনে, তাই সস্তায় পাইকারি দরেই কিনতে পারে। পাইকারি দর খুচরা দর থেকে সব সময়ই কম, কাজেই আপনি সহায়ক সমবায় সমিতির সভ্য হিসাবে সস্তায় এসব জিনিস পাবেন।

আরও একটি সুবিধা আছে। যদি আপনি নগদ টাকায় কিনতে না পারেন, তবে সমিতি ধারেও এসব জিনিস দেবে। যে ফসল উৎপাদনের জন্য এসমস্ত জিনিস লাগানো হবে, সেই ফসল উঠলে পরে, এই ধার শোধ করে দিতে পারেন।

চাষের জিনিসপত্র ছাড়া, দৈনন্দিন ব্যবহারের দরকারী জিনিসপত্রও আপনি এই সমিতি থেকে পেতে পারেন। যেমন ধরুন, আপনাকে কিনতে হয় কেরোসিন, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই ইত্যাদি। চাষের জিনিসপত্রের মতই এসব জিনিসও সমবায় সমিতি সভ্যদের কাছে কমদামে বিক্রি করতে পারে। প্রত্যেক মাসে কোন্ জিনিস কার কতটা দরকার সমিতি প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে তা জেনে নিয়ে, সেই অনুযায়ীই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করবে। এর ফলে জিনিসপত্রের দামের ওঠানামার দরুন ক্ষতির হাত থেকেও সমিতি রক্ষা পাবে।

সহায়ক সমবায় সমিতি আপনাদের বাড়তি ফসল সংগ্রহ করবে এবং কাছের কোন বিপণন সমিতির মারফত বিক্রির ব্যবস্থা করবে। এতদিন আপনারা

বাড়তি ফসল ফড়ে অথবা স্থানীয় কোন ব্যবসায়ীর কাছেই বিক্রি করে এসেছেন। নিজেরা লাভ করার জন্য তারা সবসময়ই আপনাকে ন্যায্য পাওয়ার চেয়ে কম দামই দেয়। সমবায় বিপণন সমিতির মারফত বিক্রি করলে কোন মধ্যবর্তী পক্ষের হাতে পড়তে হয় না। সুতরাং আপনি আপনার উৎপাদিত জিনিসের জন্য সবচেয়ে বেশি দাম পাবেন।

সহায়ক সমবায় সমিতি গ্রামের মধ্যে কয়েকজন প্রগতিশীল চাষী বেছে নিয়ে তাঁদের ভাল বীজ উৎপাদনে সাহায্য করবে। তাঁরা পচাসার, গোবর-সার প্রভৃতি নানা রকম জৈব সার আঞ্চলিকভাবে উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন।

অবস্থা ভাল হলে সহায়ক সমবায় সমিতি সভ্যদের কল্যাণের জন্য আরও নানা কাজে হাত দিতে পারে।

(৪) সহায়ক সমবায় সমিতি কীভাবে গড়তে হবে

এখন আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, সহায়ক সমবায় সমিতি আপনাকে নানা আর্থনৈতিক বিপদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি এতে যোগ দিতে চাইবেন। কিন্তু কীভাবে যোগ দিতে হবে? কাজটা খুবই সহজ। অনেক সমবায় সমিতি এখন আমাদের দেশে কাজ করছে। আপনার গ্রামেও একটা সমবায় সমিতি থাকতে পারে। প্রথমে সমিতিটি কোথায় এবং কে তার সচিব আপনাকে তার খোঁজ নিতে হবে। তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করে সদস্য হওয়ার জন্য দরখাস্ত করবেন। তিনিই আপনাকে সমিতি সম্বন্ধে সব খবর দেবেন এবং কী করে সভ্য হতে হবে তাও বলে দেবেন।

হয়তো এমনও হতে পারে যে, আপনার গ্রামে এখনও কোন সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে নি। সে অবস্থায় আপনি আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবেন, বলবেন সকলের কল্যাণে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার কথা। খুব কম লোকই যে এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর গ্রামসেবক, কাছাকাছি সমবায় দফতরের আধিকারিক অথবা সমিষ্ট-উন্নয়ন

রুলকের আধিকারিকের সঙ্গে যোগস্থাপন করবেন। তাঁরাই আপনাকে বলে দেবেন, কী করে সমবায় সমিতি গড়ে হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফরম ইত্যাদিও তাঁরাই এনে দেবেন।

(৫) সহায়ক সমবায় প্রত্যেকের জন্যই

আঠারো বছর বয়স হলে প্রত্যেক গ্রামবাসীই সহায়ক সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারেন। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের লোককেই সহায়ক সমবায় সমিতির সভ্য করার জন্য চেষ্টা করবেন। ৫০ জন অথবা গ্রামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক যদি যোগ দেন তবে সমবায় সমিতি খোলার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। গ্রামের যত লোক সমবায় সমিতিতে যোগ দেবে ততই সমিতির অংশীদারী মূলধন বৃদ্ধি পাবে। অর্থভান্ডার যত বাড়বে সভ্যদের ততই বেশি ধার দেওয়া যাবে। আপনি জানেন, সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কত ধার পাবে তা নির্ভর করবে সমিতির নিজস্ব অংশীদারী মূলধনের উপর।

(৬) একটি গ্রাম—একটি সমিতি

দূর দূর গ্রামের লোককে আপনাদের সমিতির সভ্য করার প্রয়োজন নেই। আপনার গ্রামে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের নিয়েই যদি সমিতি গড়ে তুলতে পারেন তবেই ভাল। সমবায় সমিতির সভ্যরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘনিষ্ঠভাবে জানবেন। তা না হলে তাঁদের সমীচীন মনোভাব থাকবে না এবং তাতে পারস্পরিক কতব্যবোধও গড়ে উঠবে না। যাকে আপনি চেনেন না, ভাল করে জানেন না, তাঁর জন্যও যে আপনার কিছু ঋণ নেওয়া বা ত্যাগ স্বীকার করা উচিত একথা কিছুতেই আপনার মনে আসবে না।

অবশ্য আপনার গ্রাম যদি খুব ছোট হয়, তা হলে কাছাকাছি তিন-চারটি গ্রামের লোককে সভ্য করা ভাল। কিন্তু সভ্যসংখ্যা যেন এক হাজারের বেশি না হয়।

পঞ্চাশ-ষাটজন মিলে যদি সমবায় সমিতি গঠন করতে চান তবে তাঁদের প্রত্যেককেই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে হবে না। দশ থেকে পনেরো জন সভ্য যদি সমিতি নিবন্ধনের (রেজিস্ট্রেশনের) জন্য স্বাক্ষর করেন তা হলেই চলবে।

(৭) নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, নিবন্ধন করতে হবে কেন? এর একটি সংগত কারণ আছে। সকল রাজ্যসরকারই সমবায় আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করেছেন। এইসব আইনে অনেক সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। আপনার সমিতিও নিবন্ধন করা হলে এইসমস্ত সুযোগসুবিধা পেতে পারে। নিবন্ধভুক্ত না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও কোন অগ্রিম টাকা দেবে না। আপনার সমিতির স্বার্থেই সমবায় আইনের বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে আসা প্রয়োজন।

(৮) সমিতির নিবন্ধন করতে হয় কী করে

আপনি এবং আপনার সহযোগী ১৪ জন চাষীভাই যদি সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাবপত্রে স্বাক্ষর করেন, তা হলে সেই প্রস্তাবপত্রটি ব্লক-উন্নয়ন আধিকারিক অথবা কাছাকাছি সমবায় দফতরের কোন আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধক অথবা জেলার সমবায় আধিকারিক এই দরখাস্ত পরীক্ষা করবেন। যখন তিনি দেখবেন যে, আপনাদের প্রস্তাবটি ত্রুটিহীন এবং দরখাস্তটিও যথাযথ, তখন তিনি নিবন্ধনের সার্টিফিকেট দেবেন। এই সার্টিফিকেট পেলে তবেই আপনার সমিতি কাজ আরম্ভ করতে পারবে।

(৯) ভর্তির ফী এবং 'শেয়ার'

সহায়ক সমবায় সমিতির সদস্য হতে হলে প্রত্যেককেই ভর্তির জন্য ফী দিতে হবে। ফী খুব সামান্যই, ৫০ নয়া পয়সা থেকে এক টাকা। আপনাকে অবশ্যই ১০ টাকার একটি অংশও (শেয়ার) কিনতে হবে। কত ফী দিতে হবে আর শেয়ারের

দাম কত হবে তা সমিতির উপদায় লেখা থাকে। এক সঙ্গে এত টাকা যদি দিতে না পারেন তা হ'লে কিস্তিবন্দি হিসাবে দিলেও চলবে।

(১০) রূপ পরিবর্তন

বর্তমানে প্রায় ১,৭৮,০০০টি পল্লী সমবায় সমিতি আছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই ঋণ-সমিতি। কৃষকদের এই সমিতি শুধু টাকাই ধার দেয়। এ ধরনের কোন কোন সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্যেরই ঋণের দায় এবং সমিতির প্রতিশ্রুতি সেই সদস্য কতগুলি অংশ কিনবেন তার উপর নির্ভর করে। আর এক ধরনের সমিতি আছে যার দায়ের কোন সীমা বাঁধা থাকে না। এ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট দায়মুক্ত কতকগুলি বিবিধার্থক সমবায় সমিতি রয়েছে যেগুলি সব রকম কাজকর্ম করে থাকে।

আপনার পক্ষে সমচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল একটি সহায়ক সমবায় সমিতির। আপনি কৃষিঋণ সমিতি অথবা বিবিধার্থক সমবায় সমিতিতে চালু আইনের উপদায়ের কিছু সংশোধন করে সহায়ক সমবায় সমিতিতে পরিবর্তিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে আপনি সহায়ক সমবায় সমিতির আদর্শ আইনের উপদায়ও গ্রহণ করতে পারেন।

যেসব সমিতির দায় অসীম সেইসমস্ত সমিতিতে অসীম দায়ের অধিকারী সমিতিতে রূপান্তরিত করা উচিত। অবশ্য তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যরা মিলে সমিতির দায় কী রকম হবে তা স্থির করবেন।

যেখানে কোন ঋণদান বা বিবিধার্থক সমিতি নেই, সেখানে প্রথম থেকেই সহায়ক সমবায় সমিতি গঠন করা যায়।

(১১) সমিতি কে পরিচালনা করবেন

আপনি এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যরাই সমিতি পরিচালনার মালিক। আপনারা সকলে মিলে সমিতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা এবং স্থির করবেন।

এই বৈঠককে সমিতির সদস্যদের সাধারণ সভা বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষেই যখন-তখন সমবেত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ সভা ঘন ঘন করা যায় না।

আপনাদের মধ্যে যাঁদের সমিতির কাজকর্মের প্রতি সর্বক্ষণ গভীর মনোযোগ দেবার মত সময় আছে, তেমন কয়েক জনকে যদি বেছে নেন তবে সবচেয়ে ভাল হয়। সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোট নিয়ে এই নির্বাচন করা যায়। এই নির্বাচিত ব্যক্তিরাই সহায়ক সমবায় সমিতির পরিচালক সমিতি গঠন করবেন। সাধারণ সভা হবে বছরে একবার কি দু'বার এবং তাতে সমিতির সাধারণ নীতিরই নির্ধারণ করা হবে। এই সভাতেই পরিচালক সমিতিকে সাধারণ নীতি অনুযায়ী সমিতির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

(১২) পরিচালক সমিতি

পাঁচ থেকে সাতজন সদস্য নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবেন একজন সভাপতি, একজন সচিব এবং একজন কোষপাল। পরিচালক সমিতির প্রত্যেক সদস্যই সমিতির অন্তত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যেমন ধরুন, একজন ঋণ বিভাগের দায়িত্ব নেবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সরবরাহ শাখা দেখাশুনা করবেন। এভাবে তৃতীয় ব্যক্তি দায়িত্ব নেবেন হয়তো কেনা-বেচা প্রভৃতির।

যদি আপনার সমিতির পক্ষে সম্ভব হয় তবে একজনকে হিসাবনিকাশ এবং দফতরের বিবিধ কাজ করার জন্যও রাখা চলে। গ্রামের কোন শিক্ষিত যুবককে এই কাজ বিশ্বাস করে দেওয়া চলে। অবৈতনিকভাবে অথবা সামান্য বেতন নিয়ে দৈনিক কিছুক্ষণ সে এইসব কাজ করতে পারে।

আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরিচালক সমিতি মাসে অন্তত একবার করে মিলিত হন। যেসব সদস্য সমিতির কোনও শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে বার্ষিক ও বিশেষ বার্ষিক সভায় নিজ নিজ বিভাগের অগ্রগতি এবং

সমস্যা সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করেন, সে সম্বন্ধে আপনাকে স্থিরনিশ্চয় হ'তে হবে। পরিচালক সমিতি সদস্যদের প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ এবং সকল সদস্যের জন্য অন্যান্য জিনিস কী-পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে তা অনেক আগে থেকেই জেনে নেবেন।

(১৩) শিক্ষা

কোন কাজ ভালভাবে করতে হলেই সে বিষয়ে আপনার কিছু শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। কীভাবে আজ আপনি একজন ভাল চাষী হয়েছেন সে কথা ভেবে দেখুন। প্রথম দিকে কীভাবে লাঙল দিতে হয় বা নিড়ানি চালাতে হয় সেসব বিষয়ে আপনার জ্ঞান ছিল অতি সামান্যই। কোন্ শস্যের জন্য ঠিক কতটা সার দিতে হয়, তাও আপনি জানতেন না। আপনার বাবা অথবা কাকা তাঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আপনাকে মাঠে নিয়ে যেতেন। তাই আপনি শিক্ষাও পেয়েছেন, অভিজ্ঞও হয়ে উঠেছেন। সমবায়ের ক্ষেত্রেও সেই রকম। আপনি এবং আপনার সহযোগী কৃষকরা যাঁরা সমিতি গড়ে তুলেছেন, তাঁরা একটা নতুন ব্যাপারে হাত দিয়েছেন। তাই সমবায়ের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাদের খানিকটা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ ক'রে সভাপতি, সচিব, কোষপাল প্রভৃতি যাঁরা পরিচালক সমিতিতে আছেন তাঁদের এবং বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের সমবায় সমিতি কী ক'রে চালাতে হয় সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন।

নিখিল ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন নামে এক প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যাঁরা এই ধরনের শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণশিবির খোলেন। আপনাদের অঞ্চলে যখনই কোন শিক্ষণশিবির খোলা হবে, তখন আপনাদের প্রত্যেকেই অবশ্য সেই শিবিরে যোগ দেবেন। সমবায় সমিতির কাজ কীভাবে চলে, এই শিক্ষণের ফলে আপনারা তা বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া এই সমিতি থেকে যাতে ব্যক্তিগতভাবে

আপনার এবং সমিতির কোন ক্ষতি না হতে পারে, এই শিক্ষার ফলে সোদিকেও আপনি দৃষ্টি রাখতে পারবেন।

(১৪) আপনার অধিকার

আপনি যদি সহায়ক সমবায় সমিতির সদস্য হন তা হ'লে আপনার কয়েকটি অধিকার থাকবে। আপনি ভোট দিতে পারবেন এবং সমিতির কাজে অংশও গ্রহণ করতে পারবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সময়মত ঋণও আপনি পাবেন। সমিতির পক্ষ থেকে যেসব কাজ হবে আপনি তার সুযোগসুবিধাও নিতে পারবেন। সমিতির কার্যকলাপে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, তা হ'লে আপনি আপনার অভিযোগের প্রতিকারের জন্য পরিচালক সমিতিতে এবং সাধারণ সভায় আপনার অভিযোগ জানাতে পারেন।

(১৫) আপনার দায়িত্ব

সদস্য হিসাবে যেমন অধিকার আছে তেমন আপনার দায়িত্বও আছে। সমিতি যাতে সমাজের জন্য এবং আপনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আপনারও কিছু করণীয় আছে। কত টাকা ঋণ আপনার প্রয়োজন তা সমিতিতে অনেক আগেই জানাতে হবে। যে উদ্দেশ্যে টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই টাকাটা ব্যয় করবেন। যেমন ধরুন, আপনাকে একটা লাঙল কেনার জন্য টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি একটা ভোজ লাগাবেন না।

যে টাকাটা আয় হবে তা থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করবেন। বীজ, সার, যন্ত্রপাতি এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র সমিতি থেকেই কিনবেন। অতিরিক্ত ফসলও সমিতির মারফত বিক্রয় করবেন। আপনার মতামত সহজ, সরল সংস্কারহীনভাবে ব্যক্ত করবেন যাতে সমিতি আপনার উপদেশ থেকে উপকৃত হতে পারে।

সমিতি যে আপনার এবং আপনারই জন্য আর আপনিও সমিতিরই জন্য—সে কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।

‘সকলের তরে সকলে আমরা’—এই হল সমবায়ের মূলমন্ত্র। সমিতিতে কাজে লাগান, সমিতির অনুগত হোন এবং সমবায়কে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে শেখান।

(১৬) কী করে সমিতিতে শক্তিশালী করতে হবে

সহায়ক সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা নির্ভর করবে সমিতির সম্পদের উপর, অর্থাৎ কত টাকা সমিতির অধিকারে আছে তার ওপর। সভ্যদের টাকা নিয়ে এবং কাজের মধ্য দিয়েই সমিতি সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। এটা করা যেতে পারে (ক) অংশীদারী মূলধন বাড়িয়ে, (খ) সভ্যদের সঞ্চয়ের উৎসাহ বাড়িয়ে এবং (গ) সমিতির অর্জিত অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু জমিয়ে। সদস্য ন’ন এমন লোকদেরও সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে সমিতি সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে।

আপনারা জানেন যে, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক থেকেও টাকা ধার পাওয়া যায়। কিন্তু আপনাদের সমিতিতে যাতে বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে না হয়, সব সময়েই তা বিশেষভাবে দেখা উচিত। অল্প সূদে ঋণ দেওয়া ও অন্যান্য কাজ এবং বিপণনের নতুন সুযোগের সম্ভাবহার করতে পারলেই আপনার আয় বাড়বে। সে টাকা ভোজ বা উৎসবে নষ্ট করবেন না। সেই আয় থেকেই আপনার সমিতির শেয়ার কেনার জন্য কিছু ব্যয় করুন। সমিতি যখন লাভ করবে তখন শেয়ার অনুযায়ী আপনিও লাভ করবেন। আপনি যদি সঞ্চিত টাকা তাড়াতাড়ি ফিরে পেতে চান তবে সমবায় সমিতিতেই সঞ্চয় করুন। তার ওপর সূদ পাবেন। আপনাকে সঞ্চয়ী হতে হবে।

(১৭) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যোগ থাকা চাই

সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আপনার গ্রামের সমবায় সমিতি বড় হতে পারে না। এই সমিতিতেই ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে আপনার সমিতি রাজ্যের রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শিকলেরই একেবারে শেষ ভাগ। তারই জন্য আপনার সমিতির জেলার সদরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের এবং একটি হ’লে রক ইউনিয়নের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। বিপণন সমিতির সাথেও আপনার সমিতিতে যুক্ত হতে হবে।

সমিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিপণন সমিতির শেয়ারও কিনতে হবে। এর দ্বারা সমিতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের কাছ থেকে আরও টাকা ধার নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিপণন সমিতির হাতে অতিরিক্ত টাকা কড়ি থাকার যে সুবিধা সেই সুবিধা বাড়তি সাহায্য হিসাবে আপনার সমিতিই পাবে।

মরসুমী কৃষিকাজের জন্য ভারতের ‘রিজার্ভ’ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংককে টাকা ধার দিয়ে থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক শস্য কেনাবেচার জন্য কম সূদে টাকা ধারও দেয়। এইসব ঋণই শেষ পর্যন্ত শীর্ষ এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সূত্র ধরে আপনার সমিতির কাছেই পৌঁছে।

(১৮) মনে রাখতে হবে

সহায়ক সমবায় সমিতি সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সবই আপনাকে বলা হল। এটা কীভাবে গঠিত এবং কীভাবে পরিচালিত হয় তা আপনারা জানলেন। সর্বোপরি আপনি জানলেন এ থেকে কত রকমের সুবিধা আমরা পাই। সুতরাং এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কী আমাদের করণীয় এবং কী করণীয় নয় তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

করণীয়

(১) আপনার এবং আপনার সহযোগী সদস্যদের উৎপাদনের সমস্যাটা কী তা বুঝে দেখুন। আপনাদের সকলের মোট প্রয়োজন জানুন এবং সেই অনুসারে উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও তৈরি করুন।

(২) সমিতি যাতে ছোটখাট সেচব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদি উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে হাত দিতে পারে তার চেষ্টা করুন।

(৩) ঘন ঘন সভা করুন, একসঙ্গে ভাবুন এবং ভবিষ্যতের কথাও ভাবুন।

(৪) সমিতির মূলধনী অংশ এবং সঞ্চয় নিয়ে গঠিত নিজেদের তহবিলের উপর বেশি নির্ভর করুন এবং সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করুন।

(৫) সমিতির হিসাবপত্র ঠিকমত করুন এবং হালফিল করে ফেলুন।

(৬) সময়মত হিসাব পরীক্ষা করান এবং সাধারণ-সভার কাছে যথাসময়ে সেই পরীক্ষিত হিসাব পেশ করুন।

(৭) সদস্যদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে পরিচালক সমিতিকে সাহায্য করুন। বিশেষ

বিশেষ কাজ দেখাশোনা করার জন্যে বিভিন্ন উপ-সমিতি নিয়োগ করুন।

করবেন না

(১) সমবায় সমিতি থেকে দূরে থাকবেন না। তার সঙ্গে যুক্ত থাকলে সফল পাবেন।

(২) সমবায় সমিতির অকেজো সদস্য হবেন না, সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত খবর রাখবেন এবং সমিতির আলোচনায় যোগ দেবেন।

(৩) কাছাকাছি কোন সমবায় আধিকারিক বা সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে ইতস্তত করবেন না।

(৪) সমিতিকে শুধুই বর্তমান সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। গ্রামের সকলে যাতে আকৃষ্ট হয়ে সমিতিতে যোগ দেন তার চেষ্টা করুন।



সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান

বসুন্ধরা : ১৫৫ এম : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রতি আউন্সে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ অউন্স	ক্যালরি	প্রোটিন গ্রাম	চর্বি গ্রাম	শর্করা (কার্বো- হাই- ড্রেট) গ্রাম	চুন (ক্যাল- সিয়াম) মিলি- গ্রাম	লৌহ মিলি- গ্রাম	কারো- টিন শতাংশ	ভিটামিন বি ১/ ইউ- গ্রাম	নিরো- টিনিক অ্যাসিড মিলি- গ্রাম	রিবো- ফ্লাভিন/ ইউ- গ্রাম	ভিটামিন সি মিলি- গ্রাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক) ধাতবর্গীয় শস্য ও তজ্জাত দ্রব্য												
(১) গম, আটা ..	..	১	১০০	৩.৪	০.৫	২০.৫	১১	২.০	১০৮	১.২	২৩	..
(২) গম, ময়দা ..	..	১	৯৯	৩.১	০.৩	২১.০	৬	০.৩	১১	০.৩	..	..
(৩) চা'ল, গিজ, চেকিঁটা ..	..	১	৯৯	২.৪	০.২	২২.৫	৩	০.৮	৭৭	১.১	৩৪	..
(৪) চা'ল, আতপ ..	..	১	১০০	২.৪	০.২	২২.২	৩	০.৮	৫১	০.৭	৩৪	..
(৫) চা'ল, গিজ, কলোঁটা ..	..	১	৯৮	১.৮	০.১	২২.৫	৩	০.৬	৬০	১.১	..	..
(৬) চা'ল, আতপ, কলোঁটা ..	..	১	৯৯	২.০	০.১	২২.০	৩	০.৩	১৭	০.৩	২৩	..
(৭) খুদ ..	..	১	৯৯	১.৯	০.৩	২২.২	৬	২.৩	৬০	১.১	..	..
(৮) মুড়ি ..	..	১	৯৩	২.১	০.১	২১.১	৬	১.৮	৬০	১.২	..	..
(৯) কাটি, সাদা ..	..	১	৭৩	২.৩	০.২	১৫.৬	৪	০.২	২০০	০.২	১০	..
(১০) গমের খুদ ..	..	১	৯৭	৩.৯	০.৭	১৮.৭	১০	১.৪	১০	০.৩	২০	..
(১১) বিস্কুট, সাধারণ ..	..	১	১০৭	৩.৪	০.৯	২১.৩	২৩	০.৬	৪০	০.২	১০	..
(১২) বিস্কুট, বাহারী মিষ্টি ..	..	১	১৩৬	২.০	৬.৮	১৬.৮	১৪	০.৩	২০	..	..	..
(১৩) প্রাতিরাশের ধানবর্গীয় শস্য ..	..	১	৯৭	৩.৭	৬.৭	১৬.৯	৯	১.৩	৪০	০.৩	২০	..

[illegible]

৮৬
(৮)

(১) মস্তুরি	..	..	..	..	১৫	১৬.১	০.০	০.২	১৬.০	৬.০	১২৫	৪.০	১৫৫	১০
(২) খেসারি	..	..	..	..	১	১০০	৮.০	০.২	১৬.৫	৩.১	৬৭	১.৬	১১৫	১০
(৩) বাঙলা ছোলা, খোসা সমেত (গোটা ছোলা)	..	..	..	..	১	১০৩	৪.৯	১.৫	১৬.৪	৫.৪	০৫	২.৮	১২৫	১০
(৪) বাঙলা ছোলা, খোসা-ছাড়ানো ভাজা (ভাজা ছোলা বা হাতু)	..	..	..	..	১	১০৬	৬.৪	১.৫	১৬.৭	২.০	..	২.৫	১১০	১০
(৫) বাঙলা ছোলা, খোসা-ছাড়ানো (ছোলা)	..	..	..	..	১	১০৬	৬.৪	১.৫	১৬.৪	২.০	..	২.৫	..	১০
(৬) কাঁচা মুগ, খোসা সমেত (গোটা মুগ)	..	..	..	..	১	৯৫	৬.৮	০.৪	১৬.১	৪.০	৭৪	২.৪	১০৫	১০
(৭) কাঁচা মুগ, খোসা-ছাড়ানো	..	..	..	..	১	৯৫	৬.৮	০.৪	১৬.১	৪.০	৪৫	২.৪	১০০	১০
(৮) শুভ্র, খোসা-ছাড়ানো	..	..	..	..	১	৯৫	৬.৩	০.৫	১৬.২	৪.০	৬২	২.৫	১২৫	১০
(৯) কলাই (বিউনি), খোসা-ছাড়ানো	..	..	..	..	১	৯৯	৬.৮	০.৪	১৬.১	৬.০	১৫	২.৮	১১৫	১০
(১০) মটর, শুকনো	..	..	..	..	১	৮৯	৫.৬	০.০	১৬.১	২.০	..	১.০	১২৫	১০

খাদ্যদ্রব্য

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ অউন্স	ক্যালরি	প্রোটিন গ্রাম	চর্বি গ্রাম	শর্করা (কাঁচা- হাই- ড্রেট) গ্রাম	চুন (ক্যাল- সিয়াম) মিলি- গ্রাম	লৌহ মিলি- গ্রাম	কার্বো- টিন আন্তর্জা- তিক একক	ভিটামিন বি ১/ ইউ- গ্রাম	নিকোটিনিক অ্যাসিড মিলি- গ্রাম	রিবো- ফ্লাভিন/ ইউ- গ্রাম	ভিটামিন মিলি- গ্রাম
(১১) মটর, ভাজা	১	১০২	৬.৫	০.৮	১৮.০	৮	১.৮	১৭	১৪২	০.৮	১৩৫	১৩
(১২) ধবধি	১	৯৩	১.০	০.২	১৫.৮	২০	১.১	৩৪	২১৯	০.৮	৫৫	১৩
(১৩) কুলখি কলাই	১	৯১	৬.৩	০.১	১৬.৩	৮০	২.১	৩৪	২১৯	০.৮	৫৫	১৩
(১৪) ভকনো শিম	১	৯৯	১.১	০.২	১৭.০	২০	০.৬	৩৪	২১৯	০.৮	৫৫	১৩
(১৫) ডাল (গড়ে)	১	৯৭	৬.১	০.৭	১৬.৫	৪৭	২.৬	৩৪	২১৯	০.৮	৫৫	১৩

(গ) শাকসবজি

২০০

(ঘ) শাক

(১) পালঙ	১	৯	০.৫	০.৩	১.১	১৭	১.৮	৭৩৮ থেকে ৯৯৪	১৪	০.১	১৭	১৪
(২) কনমি	১	৯	০.৮	০.১	১.২	৩১	১.১	৯৩৭	১৪	০.২	৩৪	৩৯
(৩) বাঁধাকপি	১	৯	০.৫	০.১	১.৮	৮	০.২	৫৬৮	১৭	০.১	৯	৩৫
(৪) লেটুস (গ্যানাড)	১	৭	০.৬	০.১	০.৯	১৪	০.৭	৬২৫	১১	০.১	৩৪	৪
(৫) মটরশাক	১	৪১	২.৩	০.১	৭.৭	৮৮	৮.০	১,৯০৩	..	..	..	..
(৬) ন'টোগাক	১	১৩	১.৪	০.১	১.৬	১৪০	৬.১	৭১০ থেকে ৩,১২০	৮	০.৩	২৮	৪৯

(৭) বেথো (নেটো) শাক

১	১১	১.৩	০.১	১.০	৪২	১.২	..	..	..	..	৪১	..
---	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----

(৮) বেগারিশাক

১	১৮	১.৭	০.৩	২.২	৪৫	২.১	১,৭০৪	..	..	..	..	..
---	----	-----	-----	-----	----	-----	-------	----	----	----	----	----

(৯) কচি নিমপাতা	..	..	৮৫	১.১	০.৯	৬.০	১৭	৭.২	১,৩০৬	১৭	..	..
(১০) ছোলাশাক	..	..	২৫	২.০	০.৮	১.৩	৯৭	৬.৮	..	..	..	..
(১১) গাজরশাক	..	..	১৬	১.৮	০.১	২.১	৯৬	২.৫	..	..	০.১	৮১
(১২) পুদিনা	..	..	১৬	১.৮	০.২	২.১	৬০	৮.৮	৭৬৭	১৮	০.১	২১

(খ) সবজি

মূল ও কদ

(১) পোন আলু	..	..	২৮	০.৫	০.১	৬.৫	১	০.২	১	২৮	০.১	২	৬
(২) নিষ্টি আলু	..	..	১৭	০.১	০.১	৮.৮	৬	০.২	১	২১	০.২	১১	৭
(৩) লাল মুনো	..	..	১০	০.২	০.১	১.১	১০	০.১	১	১৭	০.১	৬	৫
(৪) সাদা মুনো	..	..	৬	০.২	০.১	১.২	১০	০.১	১	১৭	০.১	..	৮
(৫) চুবড়ি আলু, হাতিখুরো কচু	..	..	২২	০.১	০.১	৫.২	১০	০.২	১২১	১৭	০.২	২০	..
(৬) গোটেকচু	..	..	১১	০.৮	০.১	৭.৭	২০	০.৮	..	২০	০.২	..	..
(৭) কালোকচু, মানকচু	..	..	২৯	০.৯	০.১	৬.১	১১	০.৬	১১	২৬	০.১	৯	..
(৮) বিট	..	..	১৮	০.৫	০.১	১.৯	৫৭	০.১	..	১১	০.১	২৬	২৫
(৯) গাজর	..	..	১১	০.১	০.১	১.০	২১	০.৮	৫৬৮	১১	০.১	৬	১
									থেকে				
									১,২২১				
(১০) পেঁয়াজ, ছোট	..	..	১৭	০.৫	০.১	১.৭	১০	০.১	৭	২১	০.১	..	১
(১১) পেঁয়াজ, বড়	..	..	১৮	০.১	০.১	১.১	৫০	০.২	..	২১	০.১	১	৬

[illegible]

(১৭) মটর-কাঁচা, ভাজা, অ-সিদ্ধ	১	১৭	১.৬	..	২.৭	৪	৫.০	১২	০৪	০২	০০	৮
(১৮) আম, কাঁচা	১	১১	০.২	০.১	২.৫	৩	১.৩	০৪	১১	১০	০	১
(১৯) চালকুমড়া	১	৪	০.১	০.১	০.৯	৪	১.০	..	২৭	২০	..	১
(২০) বিড়ি	১	৫	০.১	০.১	১.০	৫	৫.০	১৬	১২	১২	০	১

(ব) মাছ

(১) কুই	১	২৩	৪.৮	০.৪	..	১৭	০.০	০৭	০০	..	১২	..
(২) আড়	১	২২	৪.৬	০.৪	..	১০৯	০.২	..	..	..	..	..
(৩) মুরগেল	১	২৫	৫.৬	০.২	..	৯০	০.০	৩৩	০০	..	..	..
(৪) কাতলা	১	২৯	৫.৬	০.৭	..	১৩৬	০.২	২০	২০	..	৭০	..
(৫) ইলিশ	১	৭৪	৬.২	৫.৫	..	৪৪	০.০	৪	৩০	..	২০	..
(৬) ভেটিকি	১	১০	৩.৫	০.৩	..	১৪১	০.০	১৩	৫০	..	১০	..
(৭) কুই	১	৩৯	৪.২	২.৫	..	১০০	০.৪	৩৩	১০০	..	৬০	..
(৮) মাগুর	১	২৪	৫.৪	০.৩	..	৫৬	০.২	১০	২০	..	৭০	..
(৯) সিঙ্গি	১	৩৪	৮.০	০.২	..	১৬৯	০.৬	৭	..	..	..	..
(১০) বাচা	১	৩৫	৫.২	১.৬	..	১৪৮	০.২	১২	..	..	..	..
(১১) সরপুট	১	৩৯	৪.৭	২.২	..	৬২	০.২	৩২	..	..	২০	..
(১২) টাই	১	৪৭	৪.০	৩.৪	..	১০৩	০.০	২০	..	..	..	..
(১৩) টাংরা	১	৩৮	৫.৪	১.৮	..	৭২	০.৬	২২	..	..	..	..
(১৪) পাবদা	১	২৭	৫.৫	০.৬	..	৮৭	০.০	..	..	..	..	..
(১৫) পারশে	১	৩৪	৪.৭	১.৭	..	২৮০	০.৬	৬০	৩০	..	৪০	..
(১৬) ভাঙড় (বাটা, বড়)	১	৪০	৪.২	২.৫	..	১৫৫	০.২	১৩	৪০	..	১০	..
(১৭) মাছ, ভাজা, সাধারণ (গড়ে)	১	৩৫	৫.২	১.৫	০.১	৪৯	১.১	..	..	..	..	..

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ - ক্যালোরি	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	চুন	লৌহ	কারো-	ভিটামিন	ভিটামিন	নিকোটিনিক	রিবো-	ভিটামিন
গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম
(১) মাংস ও ডিম	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(২) পাঠ্য বা বাসির মাংস (পেশী)	১	৫৫	৫.৩	৩.৮	৪.৩	০.৭	...	...	৫১	১.৯	৭৭	...
(৩) মুরগির মাংস	১	৩১	৭.২	০.২	৩	৩	...	...	...	...	...	...
(৪) ডিমের মাংস (টাটকা)	১	৪৩	৫.৪	২.১	০.৪	৩	১.৮	...	১০২	৫.২	৪৮৩	৬
(৫) খুণ্ডের মাংস (টাটকা, পেশী)	১	৩২	৫.৩	১.২	২.৩	৮	০.৩	...	১৫৩	৭.০	২৬	১
(৬) পানির মাংস	১	৩৯	৬.৬	১.৪	...	৩	...	...	...	...	...	...
(৭) হাঁসের মাংস, টাটকা	১	৩৭	৬.১	১.৪	...	১	...	...	...	...	...	...
(৮) গোবর মাংস (পেশী)	১	৩২	৬.৪	০.৭	...	৩	০.২	...	৪৩	১.৭	১২	১
(৯) খুণ্ডের মাংস, শুকনো	১	১২৮	৩.১	১২.৮	...	৩	০.০	...	২০০	০.৩	৬০	...
(১০) হাঁসের ডিম	১	৫১	৩.৮	৩.৯	০.২	২০	০.৯	২৫৫	৩৪	০.১	...	...
(১১) মুরগির ডিম	১	৪৯	৩.৮	৩.৮	...	১৬	০.৬	২৪৪	৩৭	০.১	...	...
(১২) ডিমের শ্বেতাংশ	১	১০	২.৬	...	...	২	০.৩	...	...	...	...	...
(১৩) দুগ্ধ ও তত্বাত দ্রব্য	১	১৮	০.৯	১.০	১.৪	৩৪	০.১	৫১	১৪১	০.৩	৫৭	১
(১৪) গোবর দুগ্ধ, টাটকা	১	৩৩	১.২	২.৫	১.৪	৬০	০.১	৪৬	১১	০.১	...	...
(১৫) মায়ের দুগ্ধ, টাটকা	১	২৪	১.১	১.৬	১.৪	৪৮	০.১	৫২	...	...	১১	১
(১৬) জগলের দুগ্ধ, টাটকা	১	১৯	০.৩	১.১	২.০	৬	০.১	৫৯	...	...	৯	...
(১৭) মাগুরের দুগ্ধ, টাটকা	১	১৯	০.৩	১.১	২.০	৬	০.১	৫৯	...	...	৯	...

(৫) ক্রিম-করা দুধ	১	৮	৬'০	০'১	১'৩	৩৪	০'১	১০৫	০	১০	০'১	১
(৬) শুকনো খাঁটি দুধ	১	১০৮	১'৩	১'৬	১০'১	২৫৪	০'২	৩০০	৮৭	০	২'০	১
(৭) জমানো খাঁটি দুধ (মিষ্টি-দেওয়া)	১	৮৯	২'৩	২'৬	১৪'১	৮২	০'১	১০৫	৩০	০'১	১০০	১
(৮) চর্নাতি মানের (৩.৭ শতাংশ চর্বি) টাটকা দুধ	১	১৯	০'৯	১'১	১'৪	৪০	০	৪৬	১০	০'১	১৪০	১
(৯) জমানো খাঁটি দুধ (মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের, মিষ্টি না-দেওয়া)	১	৪০	২'০	২'৩	২'৭	৬৯	০'১	৯০	১০	০'১	১০০	১
(১০) ক্রিম-করা দুধের গুঁড়ো	১	১০১	১'০	১'১	১৪'৪	৩৯০	০'৪	১৬	১৬	০'১	১	১
(১১) দই	১	২৬	০'৯	১'৯	১'৪	৫০	০	১	১	০	১	১
(১২) মাখন	১	২১১	০'১	২৩'৪	০	৪	০	১,১৪০	১	০	১	১
(১৩) পনির	১	৯৯	৬'৮	১'১	১'৮	২২২	০'৬	৭৭	১	০	১	১
(১৪) মাখন-তোলা দুধ	১	৪	০'২	০'৩	০'১	৮	০	১	১	০	১	১
(১৫) ঘোল	১	১৪	৭'০	৭'০	৭'৯	০	০	১	১	০	১	১
(১৬) জমানো খাঁটি দুধ (যুক্তরাজ্যের, মিষ্টি না-দেওয়া)	১	৪৬	২'৪	২'৬	৩'৩	৮৭	০'১	১০৫	২০	০'১	১০০	১
(১৭) ঘৃত	১	২৫৩	০	২৮'১	০	০	০	৩৫০	১	০	১	১

(ছ) ফল

(১) আম, পাকা	১	১৪	০'২	০'১	৩'৩	৩	০'১	১,৩৬৩	১১	০'১	১৪	৪
(২) কমলালের, মিষ্টি	১	১৪	০'৩	০'১	৩'১	১৪	০'১	৯৯	৩৪	০	১৭	১৯
(৩) পেঁপে, পাকা	১	১১	০'১	০'১	২'৭	৩	০'১	৫৭৩	১১	০'১	৭১	১৩
(৪) পেয়ারা, দেশী	১	১৯	০'৪	০'১	৪'১	৩	০'৩	১	৭	০'১	৯	৮৫

বঙ্গবন্ধু : ১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

খাদ্যভব্য

খাদ্যভব্য	পরিমাণ	ক্যালরি	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	চুন	লৌহ	কারো-	ভিটামিন	নিকোটিনিক	রিবো-	ভিটামিন
অউন্স	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম	গ্রাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(৫) পেয়ারা, পাহাড়ী	...	১১	০.১	০.১	২.৩	১৪	০.৩	...	...	০.১	...	৪
(৬) কলা, পাকা	...	৪৩	০.৪	০.১	১০.৩	৩	০.১	...	৪৩	০.১	৯	১
(৭) নোনা	...	২৬	০.৪	০.১	৫.৯	৩	০.২	...	...	...	...	...
(৮) খেজুর, পারসী	...	৮০	০.৯	০.১	১৯.১	২০	৩.০	১৭০	২৬	০.২	৯	...
(৯) কাঁঠাল	...	৪	০.৫	০.১	৫.৪	৬	০.১	১৫৩	৮	০.১	...	৩
(১০) মিঠে লেবু	...	১৬	০.৩	০.৩	৩.১	২০	০.৭	...	৬	০.১	১	১১
(১১) কাগজি বা পাতি লেবু	...	১৭	০.৪	০.৩	৩.১	২৫	০.১	৭	৬	০.১	...	১৩
(১২) বাতাবি লেবু	...	৯	০.২	০.১	২.০	৬	০.১	...	৩৪	০.১	৬	৯
(১৩) আপেল	...	১৬	০.১	০.১	৩.৮	৩	০.৫	...	৩৩	০.১	৯	১
(১৪) আনারস	...	১৪	০.২	০.১	৩.৪	৬	০.৩	১৭	...	...	৩৪	১৮
(১৫) কাঁজু (হিজলী) বাদাম	...	১৪	০.১	০.১	৩.৩	৩	০.১	...	...	...	...	...
(১৬) পিচ ফল	...	১১	০.৪	০.১	২.১	৩	০.৫	...	৬	০.১	৩	১
(১৭) টম্যাটো, পাকা	...	৬	০.৩	০.১	১.১	৩	০.১	৯১	৩৪	০.১	১৭	৯
(১৮) ন্যাশপাতি	...	১৩	০.১	০.১	৩.৩	৩	০.২	৪	৬	০.১	৯	...
(১৯) বিনিতি ন্যাশপাতি	...	১৬	০.৩	০.১	৩.৭	৩	০.২	২৩	২৬	০.১	...	...
(২০) কুল (লাল জাতের)	...	১১	০.২	০.১	২.৫	৬	০.১	৬৫	৩৪	০.১	৯	১
(২১) তরমুজ	...	৬	০.২	...	১.৩	৪	০.১	২৪	১০	০.২	১০	৩

(জ) বাদাম ও তৈলবীজ

(ঝ) চাঁবি ও তেল

(৯) উদ্ভিজ্জ তেল

বঙ্গবন্ধা : ১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

খাদ্যপ্রদা

১

(এ৩) মসজিদ

(১) কাঁচালক্ষা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(২) শুকনো লক্ষা	১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
(৩) ধনে	১	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
(৪) জিরে	১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১
(৫) রসুন	১	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
(৬) আদা	১	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
(৭) সরষে	১	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪	১৫৪
(৮) শুকনো গোলমরিচ	১	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭
(৯) হলুদ	১	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯
(১০) লবঙ্গ (শুকনো)	১	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩
(১১) এলাচ	১	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫
(১২) মেথি	১	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫
(১৩) তেঁতুল	১	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২
(১৪) হিঙ	১	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭

(ট) বিবিধ

(১) সাঙ	..	..	১০০	০.১	০.১	২৪.৭	৬	০.৪	..	৩	০.১	..
(২) চিনি, সাদা	..	..	১০৮	..	..	২৭.০	..	..	..	..	..	..
(৩) টক্কি	..	..	১২৯	০.৯	৫.৭	১৭.৫	২৩	..	২৭	..	..	..
(৪) সসু	..	..	৪০	১.১	২.৮	২.৫	৩২	..	৩০	১০	..	৩০
(৫) শুকনো পানিকল	..	..	৯৫	৩.৮	০.২	১৯.৫	২০	০.৭	..	..	..	..
(৬) গুড়	..	..	১০৯	০.১	০.১	২৭.০	২৩	৩.২	৭৯	৬	০.৩	..
(৭) কভলিভার তেল	..	..	২৫৬	..	২৮.৪	..	..	ভিটা- মিন-এ	৭,০৪০ থেকে ৫৬,৮০০	..	..	..
(৮) আরারুটের ময়দা	..	..	৯৫	৬.৬	০.৩	২৩.৬	৩	০.৩	..	..	..	..

তৈলবীজ

শ্রীহরিতারণ বক্ষ্যাপাধ্যায়, বি এম-সি, এগ্রি(এলাহাবাদ);

এম এম-সি (বট), বেনারস, তৈলবীজতত্ত্ববিদ; পশ্চিমবঙ্গ

প্রধান শস্যগুলির মধ্যেই তৈলবীজের স্থান। খাওয়া, জ্বালানি, গো-খাদ্য, সার তৈরির প্রভৃতি আমাদের অনেক কাজে লাগে এই তৈলবীজ। কাজেই অত্যাবশ্যক দ্রব্য হিসাবে তৈলবীজের গুরুত্ব খুবই বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২,০৯,৬০০ একর জমিতে বিভিন্ন তৈলবীজের চাষ হয়। এ থেকে বছরে আমরা তৈলবীজ পাই ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টন।

এদেশে মোট যত জমি চাষ হয় তার মধ্যে সরষের চাষ হয় ১,৮৯,০০০ একরে, তিসির চাষ ১২,৯০০ একরে, তিলের চাষ ১১,০০০ একরে এবং অন্যান্য তৈলবীজের চাষ ৪,৬০০ একরে।

তৈলবীজের চাহিদা দেশের উৎপাদন থেকে মেটে না। সেজন্য এ রাজ্যকে এদিক দিয়ে ঘাটতি অণ্ডল বলা চলে। এই ঘাটতি পূরণ করা হয় বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে মাল আমদানি করে।

বৈদেশিক মদ্রা অর্জনেও তৈলবীজের গুরুত্ব খুবই বেশি। সেজন্য সারা ভারতে এর উৎপাদন বাড়াতে

বিভিন্ন রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ চেষ্টা চলেছে।

কেন্দ্রীয় তৈলবীজ উৎপাদন সমিতির এক পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯৫০ সাল থেকে এই রাজ্যে রাই-সরষে, তিসি, চীনাবাদাম, তিল, রেড়ি, প্রভৃতি প্রধান প্রধান তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর কাজ চলছে। নিচে এইসব কাজের একটা সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হচ্ছে:

রাই-সরষে

প্রথমে রাই-সরষের উন্নত জাতের (Brassica Species) বীজ বাছাই করে নেওয়া হয়। সেজন্য ১৯৭টি জাত রাজ্যের ভেতর এবং বাইরে থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ভিন্ন জাতের বীজ আলাদা আলাদা বাছাই করে ভিন্ন ভিন্ন করে রাখা হয় এবং উৎপাদিকাশক্তি যেসব বীজের কম এবং যেগুলো নিকৃষ্ট জাতের সেগুলো বেছে বাদ দেওয়া হয়। বাছাই-পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল:

উন্নত জাত (Brassica Sp.)

বেশি উৎপাদিকাশক্তির বীজ

(ক) রাই (Brassica Juneca)

প্রকৃতি—গাছ হয় খুব লম্বা, ডালপালা বেশ ছাড়ে, বীজের দানা ছোট এবং রঙ কালচে লাল ও বাদামী। তেলের উৎপাদন শতকরা ৩৭-৩৮ ভাগ এবং একরপ্রতি গড় ফলন ৮-১১ মণ।

(খ) হলদে জাত (Yellow Sarson)

প্রকৃতি—গাছ হয় অধিক ডালপালাযুক্ত, সবুজ সোজা এবং লম্বা, বীজের আকার মাঝারি এবং হলদে, বীজের উপরটা বেশ মসৃণ এবং তেলের ভাগ শতকরা ৪৪-৪৭ ভাগ। গড় ফলন একরপ্রতি ৮ থেকে ১১ মণ।

কম উৎপাদিকাশক্তির বীজ

(ক) টোরি (Brassica napus)

প্রকৃতি—ছোট গাছ, ডালপালা বেরোয় খুব, বীজের দানা বড়, রঙ কালচে বাদামী। বীজের উপরটা বেশ মসৃণ এবং তেলের উৎপাদন শতকরা ৩৫-৩৭ ভাগ। একরপ্রতি গড় ফলন ৪-৮ মণ।

(খ) বাদামী জাত (Brown Sarson)

প্রকৃতি—ডালপালাযুক্ত ছোট গাছ, জলদি জাত, বীজের আকার মাঝারি, রঙ কালচে বাদামী, তেলের ভাগ শতকরা ৩৭-৩৮ ভাগ। গড় ফলন একরপ্রতি ৫ থেকে ৭ মণ।

এ রাজ্যের জন্য উন্নত জাতের বীজ

বীজ বাছাইএর পর সেগদুলির উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা হয়। ৩-৪ বছরের চেষ্টার পর যেগদুলি পশ্চিমবঙ্গের জন্য উন্নত জাত বলে বিবেচিত হয় সেগদুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

জাত নং	কোন জাতের বীজের উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে ?	লাগানোর কত দিন পর কাটার উপযুক্ত হয় ?	একরপ্রতি গড় ফলন (মণ)	বীজে শতকরা তেলের ভাগ (গড় হিসাব)
(ক) রাই বি-৮৫ (উন্নত বীজ)	স্থানীয় মাধবপুর বীজ নিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভব করা হয়েছে।	১০২-১১০	১১০০	৩৮.২

কন্ট্রোল রাই-৫ (বিভাগীয়)	×	১০২-১১০	৮.৯	৩৮.৮
---------------------------	---	---------	-----	------

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় জাতের ফলন একরপ্রতি ৪-৫ মণ।

(খ) টোরিয়া বি-৫৪ (উন্নত বীজ)	স্থানীয় ধুলিয়ান বীজ নিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভব করা হয়েছে।	৮০-৮৭	৮.৬	৩৭.৬
-------------------------------	---	-------	-----	------

কন্ট্রোল টোরিয়া-৭ (বিভাগীয়)	×	৮০-৮৭	৪.৩	৩৩.৬
-------------------------------	---	-------	-----	------

(গ) ব্রাউন স্মারসন বি-৬৫ (উন্নত বীজ)	স্থানীয় সাহানগর বীজ নিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভব করা হয়েছে।	৮০-৮৭	৬.৭	৩৮.৩
--------------------------------------	--	-------	-----	------

স্থানীয় জাত	×	৮০-৮৭	৫.৫	৩৭.৪
--------------	---	-------	-----	------

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় জাতের ফলন একরপ্রতি ৪-৫ মণ।

উন্নত জাতের প্রকৃতি

রাই বি-৮৫ঃ লম্বা গাছ। শাখা প্রশাখাও বেশ বাড়ে। একরপ্রতি গড়ে ১১ মণ ফলন হয়। এই বীজের চাষে বিভাগীয় রাই নং ৫-এর চেয়ে একরপ্রতি ২ মণ বেশি এবং স্থানীয় জাতের চেয়ে প্রায় ৫ মণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। শতকরা ৩৮ ভাগ তেল হয় এই বীজ থেকে। নারি জাতের এই ফসল লাগানোর পর ১০২ থেকে ১১০ দিনে পাকে।

টোরিয়া বি-৫৪ঃ গাছ হয় ছোট ছোট। তবে ডালপালা বেশ বাড়ে। একরপ্রতি গড় ফলন ৮ মণ।

বিভাগীয় টোরিয়া নং ৭-এর চেয়ে এর ফলন ৩ মণ এবং স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪ মণ বেশি। বীজে শতকরা ৩৭ ভাগ তেল হয়। জলদি জাতের এই ফসল পাকতে সময় লাগে ৮০ থেকে ৮৭ দিন।

বাদামী সরষে বি-৬৫ঃ গাছ হয় ছোট ছোট। তবে ডালপালা বেশ ছাড়ে, একরপ্রতি গড় ফলন ৬৭ মণ। স্থানীয় জাতের চেয়ে এর ১.৩ মণ ফলন বেশি। তেলের ভাগ শতকরা ৩৮। পাকতে সময় লাগে ৮০ থেকে ৯০ দিন। জলদি জাত।

উন্নত জাত উৎপাদন

ঠিক হয়েছে যে, আগামী বছর থেকে, মলদহ বীজ-উৎপাদন কেন্দ্রের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই উন্নত বীজ বহুলপরিমাণে উৎপাদন করা হবে। বীজ পরিবর্ধন পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে রাই-৫ এবং টোরি-৭-এর বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। এর জন্য টাকা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় তৈলবীজ উৎপাদন সমিতি। সমিতি চান যে, শুদ্ধ উন্নত বীজ দ্বারা দেশময় তৈলবীজ উৎপাদন করা হবে। হতদিন অধিকতর উন্নত জাতের উদ্ভব সম্ভব হয় নি, হতদিন এই রাই-৫ এবং টোরি-৭-এর বীজ পরিবর্ধন করা হ'ত। এখন অধিকতর উন্নত জাতের উদ্ভব করা হয়েছে। কাজেই আগামী বছর থেকে এসব বীজের পরিবর্তে সেই উন্নত জাতের বীজই পরিবর্ধন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার এখন থেকে বছর-বছরই এই উন্নত বীজ প্রায় ২৫০ মণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারবেন।

চাষ-প্রণালী

রাবি খন্ডেই এই উন্নত বীজের চাষ করতে হয়। কাজেই অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত হচ্ছে এই বীজ বোনার

সময়। তবে বৃষ্টি হ'লে আগেও বোনা চলে। যে-কোন মাটিতেই এর আবাদ চলে। শুদ্ধ এঁটেল বা বেলে মাটিতে এর চাষ করতে নেই। বোনার আগে জমিতে বেশ ক'রে সার দিতে হয়। সেজন্য একরপতি শুদ্ধ ১৫০-২০০ মণ ভাল পচা গোবর-সার হ'লেই চলে। সেচের সুবিধা থাকলে ২-১ বার যদি সেচ দেওয়া যায়, তা হ'লে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

একরপতি আড়াই সের থেকে ৩ সের বীজ হ'লেই চলে। এক চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ৬ ইঞ্চি। কাজেই বোনার পর চারা তুলে জমি পাতলা ক'রে দিতে হয়। ৪ গ্যালন (প্রায় ৯-৯½ সের) জলে ২ সি সি ফলিডল গুলে ফসলের উপর একবার ফুল ফোটার আগে এবং আর-একবার কুড়ি হবার সময় ছিটাতে পারলে জাব পোকা বা মেড়ি পোকার আক্রমণের ভয় থাকে না।

বীজ পাওয়া যায় কোথায়

খুব কম পরিমাণ উন্নত বীজ এই বছর বিতরণ করা হবে। আগ্রহশীল চাষীরা মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অবস্থিত রাজ্য কৃষি-উদ্যান থেকে এই বীজ সংগ্রহ করতে পারেন।



‘মালদহ ম্যাংগা প্রেসিগ কো-অপারেটিভ সোসাইটি’

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

সমবায় কৃষি-সমিতির সহকারী নিবন্ধক

“ফাগুন মাসে দখিন হ’তে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আশ্রয় বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুনগুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।”

বসন্তসমাগমে আমার মদুকুলের নিবিড় ব্যাকুল
গন্ধে যখন পথ ও প্রান্তর আচ্ছন্ন হয় তখন কি
কেবল মৌমাছির দলই উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে
ঘুরে বেড়ায়? জাতিবর্ণনির্বিশেষে নরনারীর মনে
লাগে না কি তার স্পর্শ? উদ্বেল হয় না কি
তাদের চিত্ত?

বসন্তের এই উৎসবে, ফাগুনের সুগন্ধ প্রভাবে
আর উদাস সন্ধ্যায়, মালদহ জেলার পথে ও
প্রান্তরে আশ্রয়মুকুলের সম্ভার যেমন নিবিড় হয়ে
গন্ধ ছড়ায় তেমনিটি বৃষ্টি আর কোথাও নয়।
প্রকৃতির বদান্যতার অকুপণ আশ্বাসে জেলাবাসীর
মুখে মুখে অনির্বচনীয় আনন্দের আভা লাগে।

কিন্তু আমার বোলের প্রারম্ভ এই কাব্যিক
দিকটাই তো সব নয়, এর পরিণতির একটা অর্থকরী
দিকও তো রয়েছে। মালদহ জেলায় প্রায় ২০
হাজার একর জমিতে আমার চাষ হয় আর আমার
ফলন হয় বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ মণ। তার
উপর বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি চতুর্থ বছরে জোয়ার
আসে আমার ফলনে। ১৯৪৭ সালের আগে যখন
পূর্ব বাঙলার বাজার হাতছাড়া হয়ে যায় নি তখন
অসংখ্য আমার নৌকা বোঝাই ক’রে ব্যাপারীরা
পাড়ি জমাত ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়া-
খালির দিকে। পাকিস্তান হওয়ার দরুন আর

সেই চালানি নৌকার ভিড় নেই। ফলে যোগান ও
চাহিদার ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। কলকাতার
চাহিদা যদিও যথেষ্ট কিন্তু পরিবহণের ব্যবস্থা
দ্রুত নয়, অথচ আম সহজে পচনশীল ফল।
কাজেই প্রত্যেক বছর অপচয় হ’তে লাগল প্রচুর
আমের আর তার ফলে আর্থিক ক্ষতি বহন করতে
হ’ল আমবাগানের মালিকদের।

কিন্তু বছরের পর বছর এই ক্রমবর্ধমান ক্ষতি তো
কোনও কাজের কথা নয়। অনেক আলাপ-
আলোচনার পরে আমার অপচয় বন্ধ করার জন্য
জেলার আশ্রয়ব্যবসায়ীরা আর বিধানসভার সদস্যরা
যুক্ত আবেদন জানালেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে।
ফলে ভারত-সরকারের, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ও
অন্যান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি
গঠিত হ’ল ১৯৫৭ সালে। সমিতি জেলার নানা
জায়গায় ঘুরলেন, নানা তথ্যের অনুসন্ধান করলেন,
শেষে সুপারিশ করলেন সমবায়ের ভিত্তিতে একটি
কারখানা স্থাপনের জন্য। স্থান নির্বাচিত হ’ল
পুরাতন মালদহ শহর—ইংলিশবাজার থেকে তিন
মাইল দূরে যেখানে মহানন্দা আর কালিন্দী নদীর
সংগম ঘটেছে। সমিতির সুপারিশ সরকার গ্রহণ
করলেন অতি সহজেই এবং প্রারম্ভিক মূলধন
হিসাবে ১ লক্ষ টাকা ঋণও মঞ্জুর করলেন। চলতি
বছরের ১৩ই ফেব্রুয়ারি নিবন্ধন (রেজিস্ট্রি) হ’ল
এই সমবায় সমিতির—অগণিত শ্রদ্ধানুধ্যায়ীর
শুভেচ্ছা বহন ক’রে। অপর কয়েকটি সূত্র থেকেও
মূলধনের টাকা পাওয়া গেল। জেলা উন্নয়ন
সমিতির তহবিল থেকে জেলাশাসক এই সমবায়
সমিতিতে খয়রাতি সাহায্য করেছেন ১০,০০০ টাকা

আর খণ দিয়েছেন ৬৫,২০০ টাকা। জেলার আশ্রয়-ব্যবসায়ীদের সংঘ থেকে ধার পাওয়া গেছে ৩,০০০ টাকা। তা ছাড়া তাঁরা কিছু খয়রাতি সাহায্যও করেছেন। প্রতিটি শেয়ারের দাম ১০০ টাকা। আজ পর্যন্ত হাজার দশেক টাকার শেয়ার বিক্রি হয়েছে।

তারপরে চলতি বছরের ১লা মে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপমন্ত্রী প্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্রের পৌরোহিত্যে সমিতির আনুষ্ঠানিক উদ্‌ঘাটন হ'ল। জেলার আশ্রয়ব্যবসায়ীদের যা ছিল স্বপ্ন তা পরিণত হ'ল বাস্তবে। এই স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য অতি যত্নে একটি একটি করে টাকা তুলে জেলা উন্নয়ন সমিতি সঞ্চয়-ভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন; সেই সঞ্চিত অর্থ এতদিনে লাগল কাজে। হুত-গৌরব পুরানো মালদহ শহরের প্রান্তে আবার কর্মোদ্যমের স্পন্দন ধ্বনিত হ'ল। ভ্রমোদ্যম বাঙালীর জীবনে আবার অসীম সম্ভাবনা নিয়ে অঙ্কুরিত হ'ল একটি নতুন আশা।

সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য খুব শক্তিশালী করে সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়েছে। সভাপতির পদে আছেন জেলাশাসক মহোদয়, আর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৪ জন অভিজ্ঞ আশ্রয়ব্যবসায়ী ও আশ্রয়-উৎপাদক এবং ৩ জন গদম্ভ সরকারী কর্মচারীকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

উৎপাদনের যে পরিকল্পনা সমিতি গ্রহণ করেছেন তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মালদহ জেলায় কারখানা স্থাপন প্রথম পর্যায়ভুক্ত। এখানে তৈরি করা হবে আশ্রয়মন্ড আর লবণসিক্ত আশ্রয়ফলক। আশ্রয়মন্ড যা উৎপাদিত হবে তার অধেকটা শীর্ষকিয়ে আমের গুঁড়ো তৈরি করা হবে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে। প্রথম পর্যায়ে সাকুল্যে খরচ হবে ১,৯০,৮০০ টাকা।

যদি সমিতির উৎপাদিত জিনিস বাজারে বেশ ভালভাবে চালু হয়, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর

ঘরে ঘরে যদি তার চাহিদা বাড়ে, তা হ'লে আশ্রয়-চূর্ণ উৎপাদনের সম্প্রসারণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এনে মালদহ জেলাতেই আমের গুঁড়ো তৈরি আরম্ভ করা হবে আগামী বছরের জানুয়ারি নাগাত। এই সম্প্রসারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপারে এবং সাকুল্যে এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪,৩২,০০০ টাকা।

তৃতীয় অথবা চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬০-৬১ সালে শিলিগুড়িতে একটি কারখানা স্থাপন করা হবে। সেখানে কাজ চলবে আনারস, কমলালেবু, শর্কট, টম্যাটো, বাঁধাকপি ইত্যাদি নিয়ে আর তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪,৩৭,২০০ টাকার।

সাধারণত বর্তমান মূল্যমানে একটি বড় ধরনের ফলের কারখানায় দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকার মূলধনের দরকার হয়। তাতে বছরে গড়ে প্রায় এক হাজার টন ফলজাত বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা যায়। পরিচালনব্যবস্থায় যদি গলতি না থাকে তা হ'লে এ জাতীয় কারখানা থেকে বছরে প্রায় আড়াই লাখ টাকা লাভের আশা করা যায়।

মালদহ ফলের সমিতির জিনিস বাজারে বেরিয়েছে। ইতোমধ্যেই ২৪,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি এনে বসানো হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ যন্ত্রকুশলী ও কারিগরেরা নিযুক্ত হয়েছে। এখন যদিও ভাড়াটে বাড়িতে কারখানার কাজ চলছে, শীঘ্রই সমিতি নিজস্ব বাড়ি ও কারখানা তৈরি করে সেখানে উঠে যাবে। কারখানায় 'এ সি' বিদ্যুৎধারার সুবিধা পাওয়া গেছে। একটি যন্ত্র-চালিত নলকূপ ও ২,০০০ গ্যালনের জলাধার স্থাপন করা হয়েছে কারখানার জন্য।

গত বছরের ৩১এ জুলাই পর্যন্ত যে নির্ধণ্ট পাওয়া গেছে তা থেকে সমিতির উৎপাদনের নমুনা ও পরিমাণ নিচে দেওয়া গেলঃ—

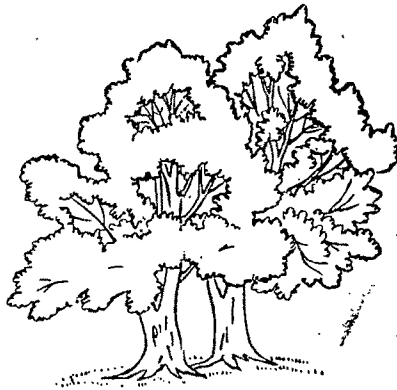
- (১) ৪৫ গ্যালনের কাঠের জালায় ভর্তি কাঁচা আশ্রয়ফলক—৫০২ জালা

- (২) ৪৫ গ্যালনের কাঠের জালায় ভর্তি পাকা আমের মণ্ড—৫০ জালা
- (৩) সিরাপ-সিক্ত আশ্রফলক—৮২৪ টিন
- (৪) ছোট টিনে ভর্তি পাকা আশ্রমণ্ড—৪৭৭ টিন
- (৫) আমের স্কোয়াশ—২০০ বোতল
- (৬) আমের জ্যাম—৩১ টিন
- (৭) আমের চার্টনি—১২৫ পাউন্ড
- (৮) আমসত্ত্ব—২ মণ

এদের প্রত্যেকটি জিনিসই সদুস্বাদু হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিবেশকদের কাছ থেকে যেসব অভিমত পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, সমিতির উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার ভোজনরসিক গৃহীজনদের রসনার যথোচিত তৃপ্তি সাধন করতে পেরেছে। এটাই মস্তবড় আশার কথা। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে শুধু যে জেলার আমের বাৎসরিক অপচয়ের পথ বন্ধ করা হয়েছে তাই নয়, কারখানার বিভিন্ন স্তরে প্রায় পাঁচশ' লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে,

তার মধ্যে দুর্যস্থ বিধবা ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। দেশের এই আর্থনৈতিক দুর্দিনে এ-জাতীয় কর্মসংস্থানের মূল্য অনেকখানি। কর্তৃপক্ষ আশা রাখেন, সমিতির জিনিসের চাহিদা যদি উত্তরোত্তর বাড়ে, যদি বিদেশের বাজারেও মাল পাঠানো সম্ভবপর হয়, তা হলে পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ের রূপায়ণ স্বরূপিত হবে আর সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হবে প্রায় হাজার পাঁচেক লোকের—বর্তমান সংখ্যার দশগুণ।

বর্তমান বৎসরে সমিতি যত তৈরি করেছে সবই পরীক্ষামূলকভাবে। যদি এসব জিনিসের চাহিদা বাজারে চালু হয়ে যায়, তা হলে সমিতির ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। তখন বর্তমানের ক্ষুদ্রাকার সমিতিটিই আগামী দিনের বাঙালীর আর্থনৈতিক জীবনের একটা বিশেষ দিকের পথপ্রদর্শক বলে পরিচিত হবে সন্দেহ নেই। মালদহবাসীর এই কর্মোদ্যোগ, সমবায়ের মাধ্যমে অর্থকরী উন্নয়নের এই সদুসংহত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক—এটাই দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনা।



বালুকাময় জমিতে নারকেলচারা রোপণ

নব-রোপিত নারকেল-চারাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার না দিয়ে, আগাছার জঞ্জাল সাফ না করে এবং গোরু-ছাগলের ভোগ্যসামগ্রী করে যেভাবে রেখে দেওয়া হয় তাতে খুব উন্নত জাতের চারা হ'লেও সেগুলি বাড়তে পারে না এবং সেগুলির হ্রাসিক বৃদ্ধিও নৈরাশ্যজনক দেখা যায়। তথাপি এই সময়টা—চারাগাছ এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ করার পরে প্রথম কয়েক বছর—নারকেলগাছের জীবনে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়। চারাগাছ রোপণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত যত্ন এবং বীজ-চারার সূচক পরিচর্যার অভাব হ'লে তার ফলে শুধু যে বিপর্যয় দেখা দেবে এবং ক্রমিক বৃদ্ধিও হ্রাস পাবে তাই নয়, পরে যদি চারাগাছ রোপণের উপযুক্ত ব্যবস্থা কার্যকরীও করা হয় তথাপি এই ক্ষতি পরে সম্পূর্ণ সামলে উঠা কষ্টকর হবে। অর্থাৎ চারাগাছের প্রথম অবস্থাতেই তার দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে যাতে তা নিজেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে সূচক জীবন আরম্ভ করতে পারে।

পর্যাপ্ত আর্দ্রতা আবশ্যক

সার দিয়ে, আগাছা সাফ করে, গোরু-ছাগল, পোকা এবং রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে চারা-গাছগুলির পরিচর্যা করতে হবে, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী বিবেচনার বিষয় যেটা তা হ'ল চারাগাছ-গুলিকে যথোপযুক্ত আর্দ্রতা পরিবেশন করা—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টির সময়ে। যে অঞ্চলের জমি বালুকাময়, গ্রীষ্মের উষ্ণতম দিন-গুলিতে যেখানে জমির আর্দ্রতা ০.১ শতাংশ পর্যন্ত নেমে যেতে দেখা গিয়েছে, যার ফলে চারাগাছগুলি নেতিয়ে পড়ে অথবা তাদের বেড়ে উঠার শক্তি অচল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছোয়, এরকম ক্ষেত্রে এই মনোযোগ আরও বেশি প্রয়োজন। গাছের মাথা ছাড়া প্রায় সবগুলি পাতাই শুকিয়ে যায়, চরম অবস্থায় গাছের মাথা পর্যন্ত শুকোতে আরম্ভ করে

এবং চারাগাছ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। চারা-গাছগুলিকে এক জায়গা থেকে তুলে এনে আর এক জায়গায় রোপণ করার পরে সেগুলি অনাবৃষ্টির প্রথম অবস্থাতেই যে বিপরীত ফল ভোগ করে তা খুবই সাংঘাতিক, কারণ তাদের গোড়াপত্তন তখন পর্যন্ত মজবুত হয় না এবং শিকড়গুলিও পরিপুষ্ট হ'তে পারে না। বছরের পর বছর কাটে, সাথে সাথে জমির শূন্য অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকবার শক্তি তাদের জীবনের প্রারম্ভ কয়েক বছরে যতটা থাকে তা থেকে অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। এক জায়গা থেকে চারাগাছগুলিকে তুলে এনে অন্য জায়গায় জমিতে এমনিভাবে রোপণ করার পরে প্রথম কয়েকটা বছর অভাব পূরণের জন্য আর্দ্রতা-পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন। জমির আর্দ্রতা যখন কম থাকে সেই সময় চারাগাছগুলিতে জলসেচ করে এ কাজ করা যেতে পারে। অসুবিধা এই যে, যখন সর্বত্রই নিদারুণ জলাভাব—এমন কি তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত যখন পাওয়া যায় না ঠিক সেই সময়টাই চারাগাছ-গুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে জল আবশ্যক। চারা-গাছগুলিতে জলসেচ করা তখন—বিশেষ করে যেখানে বহুসংখ্যক গাছ লাগানো হয়েছে—অসম্ভব যদি না-ও হয়, একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে, জমিতে অধিক পরিমাণে আর্দ্রতা সংরক্ষণ অথবা জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ-ক্ষমতার উন্নতি সাধনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করতে হবে যাতে চারাগাছগুলি প্রতিকূল আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারে। কার্যকরী শিক্ষণ-দানের সময়ে নারকেলগাছের চারা রোপণের কালে নারকেলের ছোবড়া মাটিতে পুতে অথবা গাছের শিকড়ের চারধারে ভিজা খড় বা পাতার স্তূপে করাতে গুঁড়ো বা নারকেল-ছোবড়ার গুঁড়ো চারা-গাছের গোড়ায় গর্তের মধ্যে রেখে হাতে-কলমে কাজ করে এটা শিক্ষণার্থীদের দেখানো হয়েছে।

নারকেল ছোবড়া দিলে জমির আদ্রতা সূচনিসূচক

বছরের বেশির ভাগ সময় যে অঞ্চলে অনাবৃষ্টি লেগেই আছে সেখানকার জমিতে নারকেলচারা রোপণের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

নারকেলচারা রোপণের জন্য যে আকারের গর্ত খোঁড়া সাধারণত অনুমোদিত, তার চেয়ে একটু বড় আকারের গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তগুলি ৩ই ফুট গভীর করা যেতে পারে, তার চারদিকের ধারগুলি ঢালু হবে, উপরের দিক হবে ৪ ফুট সমকোণবিশিষ্ট এবং তলার দিকটা হবে তিন ফুট সমকোণবিশিষ্ট। গর্তগুলির তলায় নারকেলের ছোবড়া সাজিয়ে দিতে হবে, দেখতে হবে যেন আগে কখনও এই ছোবড়া-গুলি বৃষ্টিতে ভিজ়ে না থাকে। ছোবড়াগুলি ভিতর-পিঠ উপরের দিকে রেখে দু-তিন থাক করে ৯ ইঞ্চি থেকে এক ফুট পুরু করে সাজাতে হবে। প্রত্যেক থাক সাজার পরে ভিতরকার ফাঁকা জায়গা এবং ছোবড়ার ভিতরকার গর্ত বোজাবার জন্য মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। গর্তের মধ্যে ছোবড়ার স্তরের ঠিক মাঝখানে নারকেলচারাটিকে রোপণ করে পরে আরও কিছু ছোবড়া তার চারদিকে সাজিয়ে দিতে হবে। তারপরে গর্তে আরও মাটি ঢালতে হবে—একেবারে নারকেল চারাটির গলা পর্যন্ত এবং সেই মাটি জোরে নিচের দিকে চেপে দিতে হবে। দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নারকেলচারাটি যাতে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য উপযুক্ত অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ষার প্রারম্ভ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি এভাবে নারকেলচারা রোপণ করা যেতে পারে, যাতে নারকেল ছোবড়া যথাশক্তি জল টেনে নিয়ে তা রক্ষা করে ক্রমবর্ধমান চারাগাছের গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে। ছোবড়া মাটিতে পড়তে দেবার সুফল দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, এমন দেখা গিয়েছে। সে সময়ের মধ্যে নারকেলের চারা সংকট-কাল পার হয়ে টিকে থাকতে এবং মজবুত শিকড়-জাল সৃষ্টি করতে পারে। এই শিকড়গুলিই পরে

পুনর্বীর জলসেচ ব্যতীত চারাগাছগুলিকে সন্তোষজনকরূপে বড় হতে শক্তি দান করবে।

ছোবড়া যদি দুষ্প্রাপ্য হয়

যেসব জায়গায় নারকেলের ছোবড়া সহজে মেলে না বা অত্যন্ত মহার্ঘ সেখানে নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়ো অথবা কাঠের গুঁড়ো জাতীয় জিনিস চারা-গাছের গর্তে শিকড়ের চারদিকে দেবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মমার্যিক চারাগাছ রোপণ করা যেতে পারে, কিন্তু বর্ষা ঋতু শেষ হবার সময়ে চারাগাছের গর্তের জমির উপরি-ভাগে দুই-তিন ইঞ্চি পুরু করে ছোবড়ার গুঁড়ো বা কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা দেখা প্রয়োজন হতে পারে যে, এইসমস্ত জিনিস চারা-গাছের গলার অংশের বাস্তব সংশ্রবে না আসে। উপরিভাগে শিকড়ের চারদিকে ছড়ানো এইসব জিনিস বাষ্প সৃষ্টি করে আদ্রতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। এইভাবে অধিক পরিমাণে আদ্রতা চারাগাছের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল শেষ হবার অব্যবহিত পরেই চারাগাছের শিকড়ের চারদিকে গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবার কাজ নতুন করে করতে হতে পারে। জমি বালুকা-মিশ্রিত হলে উইপোকাকার আক্রমণের আশঙ্কা নেই কিন্তু তথাপি যদি উইপোকাকার আবির্ভাব ঘটে ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি ছড়িয়ে তা আয়ত্তে আনা যাবে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতির সুফল বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যেসব অঞ্চলের জমি বালুকা-মিশ্রিত সেখানকার নারকেলচাষীদের বীজ বপন করার সময় উল্লিখিত পদ্ধতির যে-কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, যেটা তাঁদের পক্ষে উপযোগী মনে হবে। এই ব্যবস্থাগুলি যে ইচ্ছামত জলসেচনের সমান ফলপ্রসূ বিকল্প ব্যবস্থা হবে এমন দাবি করা যায় না বা তা করাও হচ্ছে না। উপযুক্ত সন্যোগ-সুবিধা থাকলে যথেষ্ট জলসেচনের ব্যবস্থা করাই ভাল।*

* ১৯৫৯ মার্চ সংখ্যা 'কোঁকোনাট বুলেটিন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের আখ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চলের দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় যেসব আখ ভাল জন্মাতে পারে, সেগুলোর বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হ'ল।

মাটি

বেলে, বেলে এন্টেল, এন্টেল প্রভৃতি কয়েক রকম মাটি এ অঞ্চলে দেখা যায়। মাটির দানা মিহি, রঙ কালো থেকে ধূসর। এইসব মাটিতে জৈব পদার্থ এবং নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে এতে চুন, ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশের ভাগ খুব কম। মাটি টোকো বা অম্লভাবাপন্ন।

শস্যপৰ্যায়

(ক) আউশ অথবা আমন ধান—আখ, মুড়ি আখ

(খ) সবুজসার—আখ, মুড়ি আখ।

(গ) পতিত অথবা জলুদি শিম্বি-জাতীয় ফসল—গম, ভুট্টা—আলু, আখ।

উপযুক্ত জাত

দার্জিলিঙঃ—কো ৫২৭, ৪২১, চাষের সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে মার্চ-এপ্রিল (সমতল ভূভাগে) এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে মে-জুন (পাহাড় অঞ্চলে)।

জলপাইগুড়িঃ—কো ৪২৯, ৫২৭, ৩১৩, ৪৫৩, বি ও ১১, চাষের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, জানুয়ারি থেকে মার্চ।

কোচবিহার—কো ৪১৯, ৫২৭, ৩১৩, ৪৫৩, বি ও ১১, চাষের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ।

জমি তৈরি

আখচাষে ভাল ফল পেতে হ'লে মাটিতে জল-নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। আখ লাগানোর সময় দুইটি—বসন্তকালে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এবং শরৎকালে অক্টোবর থেকে নবেম্বর মাস

পর্যন্ত। মাটির রকম, লাগানোর পদ্ধতি প্রভৃতির উপর জমি তৈরি নির্ভর করে।

সাধারণত যেভাবে আখ লাগানো হয় তা হচ্ছেঃ

(১) খরিফ খন্দে পতিত জমিতে আখের চাষ,

(২) খরিফ খন্দে সবুজসার করে আখের চাষ,

(৩) খরিফ খন্দে ধান, তুলো প্রভৃতি ফসল উঠে গেলে সেই জমিতে আখের চাষ,

(৪) রবি খন্দে আলু, মটর ইত্যাদি উঠে যাবার পর সেই জমিতে আখের চাষ।

খরিফ খন্দে জমি পতিত রাখার পর

গ্রীষ্মকালে ৯-১০ ইঞ্চি গভীর করে দু'বার জমিতে চাষ দিতে হবে। সেজন্য 'সবকাম', 'সাবাস' প্রভৃতি পাখনাওয়ালা ভারি লাঙল ব্যবহার করা ভাল। আর চাষ দিতে হবে আগের ফসল উঠে যাবার পর-পরই। এতে জমি শুধু ভাল হয় তাই নয়, জমির মধ্যে পোকা-মাকড় কিছু থাকলে তা বেরিয়ে যায় এবং আগছা কিছু থাকলে তা মাটিতে চাপা পড়ে পচে জমির সারের কাজ করে। এর পর বর্ষায় এবং বর্ষার পরই মাটি ৬ ইঞ্চি গভীর করে ১০-১২ বার হালকা চাষ দিতে হয়। এজন্য দেশী লাঙল দিয়ে চাষ করলেই চলে। শেষকালে ২-৩ বার মই দিয়ে মাটি সমন করতে হয়।

খরিফ খন্দে সবুজসারের পর

সবুজসারের জন্য গ্রীষ্মকালে জমিতে চাষ দেওয়ার পর জুন-জুলাই মাসে ধোঁ, শন, গুয়ারা, লোবিয়া প্রভৃতি যে-কোন একটি সবুজসারের বীজ বুন দিতে হয়। ৮-১০ সপ্তাহ পরে গাছে ফুল ধরার আগে চাষ দিয়ে গাছগুলি মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। গাছ পচার সময় জমিতে রস-টান পড়লে জমিতে সেচ দিতে হবে। সবুজসারের গাছ মাটিতে মিশিয়ে দেবার মাসখানেক পরে জমি ভারি লাঙল দিয়ে বেশ

ভাল করে চ'ষে মাটি উলটে দিতে হয়। তারপর দেশী লাঙল দিয়ে আরও কয়েকবার চাষ দিয়ে জমি সমান করতে হয়।

খরিফ খন্দে ধান, তুলো এবং রবি খন্দে

আলু, মটরের পরে

অনেক চাষী আগের খরিফ এবং রবি খন্দে জমি ফেলে রাখেন না। রবি খন্দে জমিতে ফসল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে মাটির জোর যায় ক'মে এবং আখচাষের জমি তৈরি করতে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। এ রকম জমিতে ফলন কম হয়। তার কারণ, ফসলের যখন বাড়ের সময় তখন এসব রবিশস্য বিয়ান ছাড়তে থাকে এবং তার জন্য জমি থেকে খাবার টানতে থাকে। তবে যেক্ষেত্রে এ রকম অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর নয় সেখানে আগের খরিফ খন্দের শস্য উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে ৬ থেকে ৮ বার চাষ দিতে হবে। কেননা রবি খন্দে আলু-মটরের পর জমি তৈরির জন্য বেশি চাষ দেওয়া সম্ভবপর হয় না। যাই হোক, জমি তৈরির জন্য যত বেশি বার পারা যায় চাষ দিতে হবে।

অড়হর ও চীনাবাদামের সঙ্গে

অড়হর ও চীনাবাদামের সঙ্গেও আখের চাষ করা যায়। সেক্ষেত্রে সারি করে ৯ ফুট দূরে দূরে অড়হর লাগাতে হয়। আর ঐ সারি থেকে পৌনে দু' ফুট দূরে দূরে লাইনে চীনাবাদাম বসাতে হয় খরিফ খন্দে। নবেম্বর মাসের প্রথমের চীনাবাদাম তুলে নেওয়া যায়। তখন সারির মধ্যে যে জমি খালি হয় তাতে আখের কাটিং বসাতে হয়। অড়হর ওঠে মাঘ মাসে। তখন আখের গাছ থাকে খুবই ছোট, কাজেই কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য এমন অনেক জায়গা থাকতে পারে যেখানে নবেম্বরের প্রথমের চীনাবাদাম তুলে নেওয়া সম্ভবপর হয় না। সেখানে চীনাবাদামের পরিবর্তে শিম্ব-জাতীয় কোন ফসল লাগালেই চলে। এতে জমিতে সারের কাজও বেশ ভাল হয়।

রবি খন্দের পর আখ না লাগিয়ে খরিফ খন্দে আখ লাগানোর পর সেই জমি থেকে ছোলা, মটর প্রভৃতি রবি ফসল তুলে নেওয়া যায়। সারি করে আখ লাগিয়ে দুই সারির মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাতেই রবি ফসল চাষ করে তুলে নিতে হয়।

নালীতে আখ লাগাতে হ'লে ৩ই ফুট ব্যবধানে ৯ ইঞ্চি গভীর করে নালী করতে হয়। নালী খুঁড়ে বেশ করে মাটি উলটে-পালটে নিতে হয়। তারপর নালীতে সার দিয়ে মাটিতে বেশ করে মিশিয়ে দিতে হয়।

মুড়ি আখ রাখা হ'লে জমির আইল কুপিয়ে সমান করে দিতে হয়। তা হ'লে জমির উঁচু জায়গাও ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়।

সার দেওয়া

যে জমিতে একরপতি ৩০ টন অর্থাৎ প্রায় ৮১০ মণ আখ উৎপন্ন হয়, সে জমি থেকে ফসল ওঠার সঙ্গে ১ মণ ১২ সের নাইট্রোজেন, ৩ মণ ৩৭ সের ফসফেট এবং ৩১ সের পটাশ সার চলে যায়। জমির এই ক্ষতি পূরণ করা দরকার। সেজন্য জমিতে ১ই মণ নাইট্রোজেনী সার দেওয়া উচিত। নাইট্রোজেনী সার দিতে হ'লে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল সবুজসার দেওয়া। অন্যথায় খাটালের গোবরসার অথবা কম্পোস্ট প্রভৃতি জৈব সার দেওয়া চলে। এইসব সার দেওয়া হ'লে ক্ষতিপূরণের জন্য মোট যে ১ই মণ নাইট্রোজেনী সার দেবার কথা বলা হয়েছে, তার ঠু ভাগ জমিতে সংযোগ করা হবে। বাকি ঠু ভাগ পূরণ করতে হয় খইল প্রভৃতি হালকা জৈব সার এবং অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে। সবুজসার, জৈবসার এবং রাসায়নিক সারের কতকগুলি সহজ মিশ্রণের উপায় নিচে বলা হ'ল:

(১) ২৫০ মণ খাটালের গোবরসার অথবা কম্পোস্ট ও ২ই মণ অ্যামোনিয়ম সালফেট,

(২) সবুজসার, ১০০ মণ খাটালের গোবরসার অথবা কম্পোস্ট ও ২ই মণ অ্যামোনিয়ম সালফেট।

(৩) অ্যামোনিয়ম সালফেট পাওয়া না গেলে পূর্ববর্তী ১ ও ২ নম্বরে যে ২৫ মণ হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট মেশানোর কথা বলা হয়েছে তার পরিবর্তে ১২ মণ করে রৌড়ির খইল দিলেও চলবে,

(৪) শুদ্ধ ৪০০ মণ খটালের গোবরসার অথবা কম্পোস্ট,

(৫) সবুজসার, ১২ মণ রৌড়ির খইল ও ২৫ মণ অ্যামোনিয়ম সালফেট,

(৬) সবুজসার ও ৫ মণ অ্যামোনিয়ম সালফেট।
কীভাবে ও কখন এই সার দিতে হবে তা নিচে বলা হ'ল:

(ক) জমি তৈরি

(১) খরিফ খন্দের পরে: আখ লাগানোর ১৫ মাস থেকে ২ মাস আগে জমিতে ২০০-২৫০ মণ পুরনো গোবরসার অথবা কম্পোস্ট জমিতে দিতে হয়। নালীতে আখ লাগানো হ'লে নালীর মধ্যে এই সার দিতে হবে। নালীতে না লাগিয়ে আখের কাটিং যদি জমিতে শুইয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে সমান করে ঢেকে দেওয়া হয়, তা হ'লে সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে বেশ ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়।

জমিতে ফসফরাসের ভাগ কম থাকলে আখ লাগানোর আগে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফেট সার নালীর মধ্যে দিয়ে দিতে হয়। সেজন্য একরপতি ২৫ সের ফসফেট সার লাগে।

(২) সবুজসারের পর খরিফ খন্দে: বর্ষার মূখে শনবীজ একরপতি ১ মণ অথবা ধগ্গেবীজ একরপতি ২০ সের বোনা দরকার। জমিতে ফসফেটের অভাব থাকলে সবুজসারের গাছের বীজ বোনার আগে অথবা গাছ ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার সময় একরপতি ২৫ সের ফসফেট সার দেওয়া উচিত। নালীতে কাটিং লাগানো হ'লে একরপতি ১৫ সের হিসাবে নাইট্রোজেনী সার নালীর মধ্যেই দিতে হয়। তা ছাড়া ৭৫ মণ গোবরসার অথবা কম্পোস্ট নালীতে দিতে হয়।

(৩) খরিফ খন্দে ধান, তুলা এবং রবিখন্দে আলু-মটরের পরে: আগের খন্দে জমিতে যে-সার দেওয়া হয় অনেক সময় জমিতে তার অবশিষ্ট কিছু যে না থাকে তা নয়, তবু ফসল উঠে গেলেই জমিতে ১৫-২০ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট দিতে হয়। অড়হর ও চানাবাদামের সঙ্গে যেখানে আখের চাষ করা হয়, সেখানে অড়হর ও চানাবাদাম লাগানোর সময় জমিতে একরপতি ২৫ সের হিসাবে ফসফেট সার দিতে হয়। তা হ'লে তিন ফসলেরই উপকার হয়। যেসব জমিতে ফসফেটের ভাগ কম, সেখানে এইভাবে সার দিলে খুবই সুফল পাওয়া যায়।

(খ) পরিচর্যা

জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ সার দিলেও খইল এবং রাসায়নিক সার দেওয়াও দরকার। শুদ্ধ খইল ব্যবহার করা হ'লে আখ লাগানোর ২-৪ সপ্তাহ আগে জমিতে দেওয়া উচিত। অ্যামোনিয়ম সালফেটের সঙ্গে খইল ব্যবহার করা হ'লে বীচন লাগানোর সময়ও দেওয়া চলে। তবে ঐ সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা দরকার। খইল পাচিয়ে ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। পাচাতে হ'লে একটা গর্ত করে তা খইলের টুকরো দিয়ে ভর্তি করে জল দিতে হয়। এক সপ্তাহ ধরে এইভাবে খইল পাচাতে হয়। শুদ্ধ সার দেওয়া হ'লে তিন দফায় সমান সমান ভাগে দেওয়া উচিত। বীচন লাগানোর সময় একবার দিতে হয়, আর একবার দিতে হয় আখ লাগানোর দেড় মাস পরে এবং শেষবার জমি খুঁচিয়ে দেবার সময় আখের গোড়ার চারপাশে মাটি ধরিয়ে দিতে হয়। হালকা মাটিতে এইভাবে সার দেওয়া খুবই ভাল। তবে ভারি মাটিতে তিন দফার পরিবর্তে দু'দফায়ই সব সার দেওয়া সমীচীন। নাইট্রোজেনী সব সার ভেঁলি বাঁধার সময় দিতে হয়।

পল জাতের আখ অর্থাৎ যেসব আখ চিবোতে শক্ত, সেসব আখের জমিতে একরপতি আরও ২৫ সের হিসাবে নাইট্রোজেনী সার দেওয়া ভাল। লাগানো আখের ক্ষেতে যে নিয়মে সার দিতে হয়,

মুড়ি আখের ক্ষেতেও সেই একই নিয়মে সার দেওয়া দরকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—(১) ক্ষার-জমিতে অ্যামোনিয়ম সালফেট এবং টোকো জমিতে সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করা উচিত।

(২) টোকো জমিতে সুপার ফসফেট না দিয়ে হাড়ের গুঁড়ো দেওয়াই ভাল।

(৩) সেচ দেওয়া বা বৃষ্টির পর জমি চাষের উপযুক্ত হ'লে ইউরিয়া দিতে হয়।

(৪) যে জমিতে বছর-বছরই পলি পড়ে সেখানে অধিক মাত্রায় সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীচন চাই

(১) বীচনের জন্য ক্ষেত থেকে তেজী আর তাজা গাছ বাছাই ক'রে নিন। বীচনের জন্য কখনও মুড়ি আখ ব্যবহার করতে নেই। আখের ডগার দিক থেকে বীচন নিলে চারা তাড়াতাড়ি বাড়ে। নালা কেটে তার মাঝখানে লম্বালম্বি বসিয়ে দিতে হয়। প্রতি বীচনে যেন তিনটি চোখ থাকে।

(২) যাতে উই ধরতে না পারে সেজন্য নিম্নলিখিত উপায়ে বীচন শোধন ক'রে নিনঃ

একশ' ভাগ জলে ১ ভাগ ডি ডি টি অথবা একশ' ভাগ জলে ২৫ ভাগ বি এইচ সি অথবা একশ' ভাগ জলে ১ ভাগ ক্লোরোডেন মিশিয়ে সেই জলে বীচন ডুবিয়ে নিন। এক একর জমির বীচন শোধনের জন্য ১১ মণ ওষুধ-জল হ'লেই চলবে।

অথবা

চুন বা লেড আরসেনেট সলিউশন ১০.১ কিংবা একশ' ভাগ জলে ২ ভাগ ফিনাইল গুলে তাতে লাগানোর ২৪ ঘণ্টা আগে বীচন ভিজিয়ে নিলেও চলে।

(৩) একশ' ভাগ জলে ৫ ভাগ অ্যারটন গুলে সেই জলে ৫ মিনিট ডুবিয়ে নিলে গাছ ভাল গজায়।

(৪) শুকনো, হালকা অথবা তেজী মাটির জমিতে আখ নালীতে লাগানো চলে। যেসব অঞ্চলে বেশি

বাতাস লাগে, সেখানে নালীর মাঝখানে লম্বালম্বি ৩ ফুট তফাত ক'রে বীচনগুলো বসিয়ে মাটিচাপা দিতে হয়।

বেলে এবং শুকনো মাটিতে যদি উইএর উপদ্রব থাকে, তা হ'লে একটার পর আর একটা বীচন চোখে চোখে মিলিয়ে বসাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চোখগুলি যেন পাশের দিকে পড়ে। যে মাটিতে উইএর উপদ্রব নেই, সেখানে বীচনগুলি পরপর বসিয়ে গেলেই চলে। নালীর মধ্যে কাটিং বা বীচন মোটামুটি ৩-৪ ইঞ্চি পুরু মাটি দিয়ে ঢেকে বসাতে হয়। নালীর শেষ মাথায় উভয় দিকে ২ গজ পর্যন্ত জোড়া সারিতে বীচন লাগানো উচিত। একরপ্রতি ৪০-৬০ মণ বা ১০-১২ হাজার কাটিং লাগে।

ভাল ফসল নির্ভর করে আখ যথাসময়ে লাগানোর ওপর। দেরিতে বীচন লাগালে ফলন কম হয়। কাটিং লাগানোর পর সেচ দেওয়া দরকার।

মুড়ি আখ

(১) রোগ-পোকাদ্বারা ক্ষেতে কখনও মুড়ি আখ রাখতে নেই।

(২) কোনও জমিতে মুড়ি আখ রাখলে একবারের বেশি সে জমি থেকে ফসল নিতে নেই। তবে যেসব জমিতে প্রতি বছরই পলি পড়ে সেখানকার কথা ভিন্ন।

(৩) মুড়ি আখ রাখতে হ'লে আখ কাটার পর ক্ষেতের মধ্যে শুকনো আখের পাতা ছড়িয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। তাতে রোগ-পোকাদ্বারা উপদ্রব কমে। ফসল কাটার পর জমি চ'ষে দিতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা

কাটিং লাগানোর মাসতিনেক পরে প্রথমবার গোড়ায় মাটি টেনে দিতে হয়। প্রতিবার সেচ দেবার পরে মাটির উপরের চটা ভেঙে দিন। এই সময় ক্ষেতে কোনও আগাছা থাকলে তা তুলে দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে হবে।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বীচন যদি নালীতে লাগানো হয়, তা হ'লে পরে মাটি কোপানোর সময় নালীর ধারগুলি মেরে আস্তে আস্তে জমির সঙ্গে সমান ক'রে দিতে হয় আর গোড়ায় মাটি উঁচু ক'রে ভেলি বেঁধে দিতে হয়। প্রায় চার সপ্তাহ পরে জুলাই মাসের শেষ নাগাত ভেলি বাঁধা শেষ করতে হবে। এর মাসখানেক পরে আখগাছ শুকনো পাতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিতে হয়। তা হ'লে গাছ শুয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে না।

রোগ-পোকা

আখের রোগ-পোকা হরেক রকমের। সাধারণত যেসব উপায় অবলম্বন করলে গাছকে রোগমুক্ত রাখা যায় তা নিচে বলা হ'লঃ

(১) রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে এমন জাতের আখের চাষ করতে হয়।

(২) রোগমুক্ত বীচন নিয়ে চাষ করতে হয়।

(৩) আখ কাটার পর ক্ষেতের যাবতীয় আবর্জনা তুলে নিয়ে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুতে ফেলেতে হয়।

(৪) কোনও ক্ষেতে রোগ-পোকা দেখা দিলে সেখান থেকে মুড়ি আখ না রাখাই শ্রেয়।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের দমনপ্রণালী নিচে দেওয়া হ'লঃ

(১) লাল ডোরা ধসা রোগ—(ক) নিচু জমি এবং যে জমি থেকে জলনিষ্কাশের ভাল বন্দোবস্ত নেই, সেখানে আখের চাষ না করাই ভাল ; (খ) রোগ-ধরা গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন ; (গ) সব রকম আগাছা জঞ্জাল তুলে দিয়ে জমি পরিষ্কার ক'রে দিন ; (ঘ) লাগানোর সময় কার্টিং-এর দু'মাথা দেখে, কোনটাতে লাল দাগ থাকলে সেই কার্টিং বেছে ফেলে দেবেন।

(২) ছিপটি ডুবা রোগ—রোগ-ধরা গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

(৩) পচা গলা রোগ—আধ সের অ্যাগালল অথবা অ্যাবাভিট্‌স অথবা অ্যারিটান আড়াই মণ জলে গুলে রোগ-ধরা গাছে ছিটিয়ে দিন।

(৪) কুটে রোগ—রোগ-ধরা গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

(৫) মরচে রোগ—রোগ-প্রতিরোধক জাতের চাষ করুন।

পরগাছা ও জগাছা

ক্ষেতে পরগাছা ও আগাছা জন্মালে ফলনের খুব ক্ষতি করে। পরগাছা ও পোকা দমনের প্রণালী নিচে দেওয়া হ'লঃ

ভুলকী পরগাছা—ফুল ফোটান আগেই আগাছা তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

উইপোকা—(ক) ভাল ক'রে পচা জৈবসার ব্যবহার করুন ; (খ) নালীতে শতকরা ৫-শক্তির বি এইচ সি গুঁড়ো, ক্লোরোডেন অথবা অ্যালড্রেন গুঁড়ো ছিটিয়ে বীচন বসাবেন। এই গুঁড়ো একরপ্তি দরকার হবে ৭৫ থেকে ১০ সের, অথবা শতকরা ১-শক্তির অ্যালড্রিন ইমালশন জল মিশিয়ে নালীতে বীচনে ছিটিয়ে দেবেন। একরপ্তি এই ইমালশন দরকার হবে ১ পাউন্ড, অথবা শতকরা ০:২৫-০:৫ শক্তির ডায়েলড্রিন ইমালশন ক্ষেতে ছিটিয়ে দিন। একরপ্তি ডায়েলড্রিন দরকার হবে ২৫ ছটাক। ইমালশন লাগবে ৩ টিন ; (গ) আক্রমণ সামান্য হ'লে ক্ষেতে 'সেচ' দিয়ে দিন। বেশি আক্রমণ দেখা দিলে ক্ষেত জল দিয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া একটা চট 'ব্লুড অয়েলে' ভিজিয়ে সেচের নালীতে রাখবেন ও মাঝে মাঝে ব্লুড অয়েলে ভিজিয়ে

নেবেন। একরপ্রতি রুড অয়েল দরকার হবে ৫ থেকে ৭ই সের।

অ্যালুড্রিন এবং ডায়েলড্রিন বছরের যে-কোনও সময় ক্ষেতে উইএর উপদ্রব দেখা দিলেই প্রয়োগ করা চলে।

পাইরিলা

(১) আখের পাতায় ডিম দেখলেই সেসব পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হয়। এপ্রিল-মে নাগাত এই বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রেখে পোকা দমনের ব্যবস্থা করতে হয়।

(২) শতকরা ৫-শক্তির ডি ডি টি গুঁড়ো গাছের উপর ছিঁড়িয়ে দিতে হবে—একরপ্রতি ১০ থেকে ১৫ সের এপ্রিল-জুন মাস নাগাত এবং একরপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ সের হারে ছিঁড়িয়ে দিতে হবে অক্টোবর-নবেম্বর নাগাত।

ফাডিং

(১) জমির আইলের উপর ঘাস বা অন্য কোন আগাছা থাকলে সেগুলো তুলে নিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলুন।

(২) শতকরা ৫ থেকে ১০-শক্তির বি এইচ সি গুঁড়ো একরপ্রতি ৫ থেকে ২০ সের হিসাবে ছিঁড়িয়ে দিন।

সাদা মাছি

(১) জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দিন। (একর-প্রতি অন্তত ১ মণ ১০ সের হারে যেন নাইট্রোজেনী সার প্রয়োগ করা হয়।)

(২) যেসব পাতায় সাদা মাছি ডিম পেঁড়েছে, সেগুলো তুলে নিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলুন।

(৩) বি এইচ সি শতকরা ০.২৫ ভাগ জলে গুলে গাছে ও পাতায় ছিঁটিয়ে দেবেন।

এঁটুলি

(১) ফসল কাটার পর আখের ডগা, পরিত্যক্ত পাতা প্রভৃতি আবর্জনা সব একসঙ্গে জড়ো করে আগুন দিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলুন।

সাদা এঁটুলি

শতকরা ০.০২৫ ভাগ প্যারাথিয়ন অথবা শতকরা ০.০৮ ভাগ ম্যালাথিয়ন ইমালশন গাছে ও পাতায় ভাল করে ছিঁটিয়ে দিন।

মাকড়সা

পোকা-ধরা পাতা তুলে নিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলুন।

মাজরা পোকা

(১) যেসব ক্ষেতে পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়, সেখানে মৃদি আখ না রাখাই ভাল।

(২) ফসল কাটার পর সব রকম আবর্জনা পুঁড়িয়ে ফেলুন।

অনেক রকমের মাজরা পোকা আছে। প্রত্যেকটির দমনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিচে দেওয়া হল:

(ক) সাদা মাজরা পোকা (টপুবোরার)—(১) পোকা-ধরা পাতা দেখলেই তা কেটে নিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে; (২) শতকরা ০.১-শক্তির এন্ড্রিন ইমালশন গাছে ও পাতায় ভাল করে ছিঁটিয়ে দিতে হবে; (৩) আক্রমণের প্রথমেই আক্রান্ত ডগা কেটে ফেলে ভেতরকার কীড়াটিকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত; (৪) এই পোকাকার প্রজাপতিও আলোতে আকৃষ্ট হয়, কাজেই আলোক-ফাঁদের ব্যবস্থা করে প্রজাপতি মেরে ফেলতে হয়।

(খ) মাজরা পোকা (স্টেমবোরার)—ধূসর রঙের এই প্রজাপতিগুলি দিনের বেলায় আখগাছের পাতার

নিচে লুকিয়ে থাকে বলে প্রায়ই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। রাতে এরা বোরিয়ে পাতার মাঝের শিরার উপর ২-৩ সারিতে সাদা রঙের ডিম পাড়ে। ৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বোরিয়ে আসে ও কাঁচা পাতা খেতে থাকে। তারা বড় আখের ডাঁটার নরম অংশ ফুটো করে কাণ্ডের ভিতর ঢুকে পড়ে। ডাঁটার ভিতরের নরম অংশ খেয়ে তারা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে। এই কীড়াগুলির মাথার রঙ বাদামী, শরীরের বাকি অংশ ফিকে হলদে। ২১-২২ দিন বাদে কাণ্ডের ভিতর থেকে কীড়া কাণ্ডের পাশ ফুটো করে। এই ফুটোর মুখ এরা জাল বুনবে বন্ধ করে রাখে এবং তার ভিতরে পুত্তলী আকার ধারণ করে। ৮-১০ দিন পরে পুত্তলী থেকে প্রজাপতি (মথ) বোরিয়ে আসে।

আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আখের মাঝপাতাটি শুকিয়ে ওঠে। গাছ যখন বড় হয় তখন ডাঁটার গায়ে অনেক ফুটো দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ সাধারণত একেবারে মরে না। তবে আক্রমণের ফলে আখে রসের ভাগ কমে যায়।

প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করুন—

(১) কাটিং লাগাবার আগে ভাল করে দেখে নেবেন যেন ভিতরে মাজরা পোকা না থাকে।

(২) মুড়ি আখ এক বছরের বেশি না রাখাই ভাল। তাতে মাজরা পোকা তার ভিতরে শীতকালে সহজে বাসা বেঁধে থাকতে পারে।

(৩) আলোক-ফাঁদে প্রজাপতি মারা যেতে পারে।

(৪) গাছের চারা অবস্থায় অত্যন্ত দু'বার করে মাটি চাপা দেওয়া দরকার।

(৫) বি এইচ সি শতকরা ০.০২ ভাগ জলে গুলে অথবা এন্ড্রিন শতকরা ০.১ ভাগ জলে গুলে গাছে ও পাতায় ভাল করে ছিটিয়ে দেবেন।

ফসল কাটা

আখ সদুপরিপক্ব হ'লে কেটে নিতে হয়। যে যে লক্ষণ দেখে এটা ঠিক করতে হয় তা নিচে দেওয়া হ'লঃ

(১) রঙ আর অবস্থা দেখে আখ ঠিকমত পেকেছে কিনা বুঝে নিন। আখের গায়ে ঘা মারলে যদি কনকনে আওয়াজ করে তা হ'লে বুঝতে হবে যে আখ কাটার সময় হয়েছে।

(২) খেয়াল রাখবেন, আখ যদি পাকার আগে বা পরে কাটেন তা হ'লে মিষ্টি হবে কম, তার ফলে তা থেকে গুড় হবে কম।

(৩) আখ একেবারে মাটির সমানে কাটবেন, নইলে আপনারই লোকসান।

আখ মাড়াই

লোহার কলে আখ মাড়াই করতে হয়। এই আখ-মাড়াই কল গরম জলে ধুয়ে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে, নইলে অপরিষ্কার কলে আখ মাড়াই করলে রস টক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

গুড় তৈরি

আখ থেকে রস বের করবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা গুড় তৈরির জন্য জ্বাল দিতে হয়।

রসের মধ্যে যাতে কোন নোংরা জিনিস না থাকে সেজন্য রস শোধন করে নিতে হয়। ১০ সের ভেঁড়ি ২ মণ জলে চটকে সেই জলে ১০০ মণ রস পরিষ্কার করা চলে। রোগ-ধরা বা শুয়ে-পড়া আখগাছের রস পরিশোধন করতে হ'লে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হয়। এজন্য সোডিয়াম কার্বোনেট এবং বাইকার্বোনেট ব্যবহার করতে হয়। পরিমাণ—১ মণ রসে ২০-২৫ গ্রাম।

যখন দেখবেন আর ময়লা গাদ কাটছে না তখনই বুঝবেন, রস পরিষ্কার হয়েছে এবং এ থেকে ভাল গুড় তৈরি হবে।

গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন

৩

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান একথা আমরা সকলেই জানি। এই কৃষিকার্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আমাদের গোসম্পদের উপর। কৃষিজাত মাল বহনের কাজও হইয়ে থাকে প্রধানত গো-যান দ্বারা—বিশেষ করে পল্লী-অঞ্চলে। যাতা-য়াতের জন্যও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই এখনও প্রয়োজন হয় গোযানের। তা ছাড়া গোসম্পদ থেকেই আমরা পেয়ে থাকি দুগ্ধ—প্রকৃতির দেওয়া সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সুস্থ, সবলকায় ও উন্নত-জাতীয় গোসম্পদ তাই একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের ভিতরে নানাবিধ ব্যাধি আমরা দেখতে পাই। কতকগুলি সংক্রামক ও কতকগুলি সাধারণ রোগ। গোজাতির ভিতরও তেমনি বিভিন্নজাতীয় ব্যাধি দেখা যায়। সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ সাধারণত অনেক স্থানেই ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং গরিব কৃষকদের চাষের বলদ ও দুধের গোরু নিঃশেষ করে দেয়। সংক্রামক রোগ থেকে গোসম্পদকে কী করে রক্ষা করা যায় সকলেরই সে বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

সংক্রামক রোগ সাধারণত ছাড়িয়ে পড়ে লোক-মারফত, বাতাস ও পানীয় থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে মশা, মাছি ইত্যাদির দ্বারা। সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে মারাত্মক হ'ল গোবসন্ত, বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা। এ ছাড়া এঁষো আর-একটি বিশেষ সংক্রামক ব্যাধি। এঁষো রোগ সাধারণত মারাত্মক হয় না এবং উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগ হ'তে গোরুকে নিরাময় করা যায়। কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হ'লে বেশ কিছু দিনের জন্য বলদের কার্যক্ষমতা ও গাভীর দুধ দেওয়া কমে যায়। এই রোগ আমাদের দেশে প্রায় সর্বদাই দেখা যায়।

এই রোগের সাধারণ লক্ষণ হ'ল, গোরুর খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; জ্বর, প্রথমদিকে কোষ্ঠ-বন্ধতা, পরে দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল, স্বেগ স্বেগ রক্ত; দাঁতের মাড়িতে ও জিভের নিচে ছোট ছোট সাদা দাগ—তা থেকে ঘাসের মত হওয়া; কখনও কখনও গায়ে বসন্তের মত গুটি দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত হ'লে ঔষধাদিতে বিশেষ সূক্ষ্মতা পাওয়া দুরূহ। রোগের একেবারে প্রথমদিকে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগ থেকে গোরুকে বাঁচাতে হ'লে প্রতি-ষেধক টিকা দেওয়াই তার একমাত্র উপায়। প্রত্যেক কৃষকেরই কর্তব্য নিজ নিজ গোরু-বলদকে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। নিকটস্থ পশু-চিকিৎসককে খবর দিলেই তাঁরা ব্যবস্থা করে দেন। একবার টিকা নিলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না।

গলাফোলা আর একটি সংক্রামক ব্যাধি। এর বিশেষ লক্ষণ হ'ল খুব জ্বর ও গলা ফুলে ওঠা। আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। ফোলা জায়গায় ব্যথা হয় এবং হাত দিলে গরম মনে হয়। গলাফোলা কখনও কখনও অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায় এমন কি ঘাড়-বুক পর্যন্ত ফুলে ওঠে এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।

রোগের প্রথম দিকেই যদি উপযুক্ত ঔষধ দেওয়া যায় তা হ'লে হয়তো ফল পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এর প্রতিষেধক ব্যবহার করেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। এ রোগও দেখা দিলে গ্রামের সমস্ত গোরু-বলদকে প্রতিষেধক-টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। নিকটস্থ পশুচিকিৎসককে খবর দিলেই তিনি তার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন।

তড়কা আর একটি অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এর প্রধান লক্ষণ হ'ল প্রবল জ্বর, শ্বাস-কষ্ট ও খিঁচুনি। রোগের তীব্রতা অনুযায়ী অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। এই রোগে আক্রান্ত হ'লে ঔষধ প্রয়োগ ক'রে কোন বিশেষ ফল হয় না। অনেক সময় চিকিৎসা করার সময়ও পাওয়া যায় না। এই রোগ দেখা দিলে যাতে সংক্রামিত না হয় সে বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা দরকার। এই রোগ মানুষের ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। নিকটস্থ পশু-চিকিৎসক দ্বারা এর প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা খুব দ্রুত করা প্রয়োজন, না হ'লে অল্প সময়ের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে খুব ক্ষতিকারক হ'তে পারে।

বদলা আর একটি অতি সংক্রামক রোগ। এই রোগ সাধারণত অল্পবয়স্ক গবাদি পশুর মধ্যে হয়ে থাকে এবং তাদের পক্ষেই বেশি মারাত্মক। এই রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রথমেই পশুকে খোঁড়াতে দেখা যায় পরে তার পায়ের উপরভাগে ফোলা দেখা দেয়। ফোলা জায়গায় টিপলে করকর শব্দ হয়। এই রোগেও ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। নিকটস্থ পশুচিকিৎসকের সাহায্যে প্রতিষেধক-টিকার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন।

যে-কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে, প্রথমেই নীরোগ অন্যান্য গোরুকে রোগাক্রান্ত গোরুর নিকট হ'তে সরিয়ে ফেলা বিশেষ দরকার এবং যাতে রোগের বীজ ছড়াতে না পারে সে বিষয়ে যতটা সম্ভব সাবধান হওয়া উচিত। এসমস্ত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত গোরু মারা গেলে গ্রামের বাইরে গভীর গর্ত ক'রে প্রচুর পরিমাণে চুন দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া উচিত। তা হ'লে মৃত গোরুর দেহ হ'তে এইসব রোগ ছড়াবার আশঙ্কা থাকে না। তড়কা রোগের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ ক'রে পালন করা উচিত। কেননা, এ রোগ মানুষের ভেতরেও সংক্রামিত হয়।

এঁষো রোগ সাধারণত খুব মারাত্মক হয় না। তবে এই রোগ আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়,

সাধারণত ফাল্গুন হ'তে বৈশাখ মাস পর্যন্ত। সময়মত এই রোগে আক্রান্ত পশুর যত্ন করলে জীবনরক্ষা হয় কিন্তু, পূর্বেই বোলিছি, কৃষকের পক্ষে এই রোগ সাময়িকভাবে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়। এই রোগে দাঁতের মাড়িতে, জিহ্বায়, খুরের মাঝখানে ফোলা হতে পারে। গাই গোরুর বাঁটের উপরেও এই রকম ফোলা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হ'তে থাকে।

ফিটকারিজল দিয়ে প্রত্যহ ২-৩ বার মুখের ভিতর ভাল ক'রে ধুয়ে দেওয়া দরকার। পায়ের খুরের ভিতরে ফিটকারিজল দিয়ে প্রত্যহ ২-৩ বার ক'রে ধুয়ে পায়ের ঘা শীঘ্র সেরে যায়। এই রোগে সময়মত শুল্ক প্রয়োগে বিশেষ প্রয়োজন। নরমজাতীয় খাদ্য, পরিষ্কার পানীয় জল, ভাতের মাড় ইত্যাদি যত্ন সহকারে খাওয়ানো প্রয়োজন যাতে রোগাক্রান্ত গোরু দুর্বল না হয়ে পড়ে। গোরুর বাঁটে ঘা দেখা দিলে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার এবং দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ খুব সাবধানে দোয়ানো প্রয়োজন। এই রোগ নিবারণের জন্য টিকার ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে, কিন্তু খুব ব্যয়সাধ্য। সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

যেসকল সংক্রামক ব্যাধির সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল এগুলো ছাড়া আরও অনেক সংক্রামক গোব্যাদি দেখা যায়, কিন্তু সেসব রোগ সাধারণত আমাদের দেশে খুব কম হয়ে থাকে। কোন রোগ দেখা দিলেই নিকটস্থ পশুচিকিৎসকের সাহায্য সময়মত নিলে সব রকম সংক্রামক ব্যাধিতেই বিশেষ ক্ষতির হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর। তাই সময়মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে সকল সময়ই আমাদের খেয়াল রাখা একান্ত দরকার।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দেশ থেকে গোবসন্ত দূর করার জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা সরকার হ'তে নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সকল গোরুকে অতি দ্রুত প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়েছে।

কাষ্ঠ-সংরক্ষণ

কাষ্ঠ সচরাচর কাষ্ঠ-পোকা আর নানা রকমের ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে কাষ্ঠে পচন ধরে। ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশে উইপোকাতে যে সর্বনাশ করে তা কোঠাবাড়ি ও আসবাবপত্রে ব্যবহৃত কাষ্ঠের, এবং কেটে-ফেলা গাছগুলির পক্ষেও সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক।

উইপোকা

উইপোকা অনেক সময় কাষ্ঠে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে বসে। সিমেন্ট আর কংক্রিটের গাঁথুনির ফাটলের মধ্যদিয়ে তাদের যাতায়াতের পথ, আ-ঢাকা জায়গার উপর দিয়ে যেখানে তাদের যাওয়া-আসা করতে হয়, সেখানে তারা পথের উপরে এমন একটা কাঠামো তৈরি করে যা তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যখনই তারা অরক্ষিত কাষ্ঠের সংস্পর্শে আসে তখনই কাষ্ঠের উপরিভাগ থেকে তলার দিকে অনেকদূর পর্যন্ত গভীর গর্ত করে, আর এই গর্ত করার সময় উপরিভাগের আবরণ বা রঙ-মাখানো জায়গাটা আপাতদৃষ্টিতে অবিকৃত রেখে দেয় কিন্তু ভিতরটাকে দেয় অন্তঃসারশূন্য ক'রে।

উইপোকা দমনের জন্য খুব শক্তিশালী কীটনাশক পদার্থ রাখা দরকার এবং তার গুণ যেন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কারণ এই পোকার প্রকৃতি এমন বিচিত্র যে, সোজাসুজি কীটনাশক পদার্থ তাদের উপরে ছিড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী 'ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন' কীটনাশক পদার্থ 'ডিএলড্রিন' উইপোকা দমনে অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দেয়। এ জিনিস পেট্রোলসম্প্রদায় দ্রাবক-পদার্থের উপরে ছিটিয়ে দিলে ভিতরদিকের কাষ্ঠে বেশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফলপ্রসূ থাকবে। মাটির মধ্যে আবদ্ধ হ'লে এ এমন দুর্ভেদ্য বাধার সৃষ্টি করবে যে, কোন উইপোকা তা অতিক্রম করতে গেলেই মারা পড়বে। কাষ্ঠ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পদার্থের সঙ্গে যদি 'ডিএলড্রিন' মিশিয়ে নেওয়া

হয় তা হ'লে সিংহলের মত দেশের পক্ষে তা সম্পূর্ণ কার্যকরী হবে।

গৃহনির্মাণে 'ডিএলড্রিন'

এক গ্যালন জলের সঙ্গে দুই আউন্স (তরল) 'ডিএলড্রিন ২০' মিশিয়ে তৈরি 'ডিএলড্রিনের' আরক দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিলে গৃহনির্মাণের কাজে উইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ভিত্তির গর্ত খনন করা হয়ে গেলেই কিন্তু ভিত্তি পত্তন করার আগে, এটা করা উচিত। ভিত্তিস্থাপনের জন্য খোঁড়া গর্তের তলা ও পাশ-গুলি আগাগোড়া এই আরক দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া দরকার এবং কোঠাবাড়ির সমগ্র এলাকা ও ভিত্তির বাইরের দিকের তিন ফুট চওড়া জমিটাও এই আরক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়ে নেওয়া উচিত। এতে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, বহু বছর পর্যন্ত কোঠা-বাড়িটা উইপোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং এই প্রক্রিয়ার জন্য যে ব্যয় হবে, তা বারে বারে উইপোকার আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার ফলেই উসুলা হবে। কাষ্ঠ সংরক্ষণের উপযোগী পদার্থ সোজা-সুজি ব্যবহার ক'রে কাষ্ঠ রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

কাষ্ঠের চিকিৎসা

সিংহলে কাষ্ঠের যেসমস্ত ক্ষয়ক্ষতি দেখা যায় তার অধিকাংশই যদিও উইপোকা এবং কাষ্ঠছিদ্রকারী একজাতীয় পোকার কাজ, কাষ্ঠের তৈরি জিনিসের আয়ু ক্ষয় করবার কাজ ছত্রাকও যথেষ্টই ক'রে থাকে, সুতরাং কাষ্ঠসংরক্ষণক্ষম পদার্থের সঙ্গে ছত্রাকনাশক ঔষধ মিশিয়ে নিলে উপকার হ'তে পারে। এতে যে শূন্য উইপোকা ও অন্যান্য কীটই দমিত হবে তাই নয়, ছত্রাকও দমন করা যাবে। সম্প্রতি দুইটি কাষ্ঠ-সংরক্ষক পদার্থ 'শেল উড প্রিজার্ভেটিভস' চালু করা হয়েছে, এর

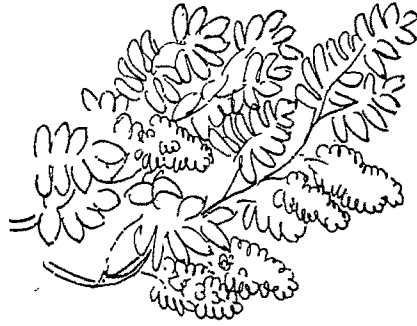
মধ্যে আছে কাঠের পচন রোধ করার জন্য 'ডিএল-ড্রিন' ও কার্যকরী এক রকম ছত্রাকনাশক পদার্থ।

যেসব দেশে কাষ্ঠ ধ্বংসকারী ছত্রাক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অতীতে সেইসব দেশ থেকে কাষ্ঠসংরক্ষক পদার্থ আমদানি করা হত। এগুলি খুব সাংঘাতিক ছত্রাকনাশক পদার্থ কিন্তু কীটনাশক পদার্থ হিসেবে এগুলোর কাজ খুবই মৃদু। এই দুইটি পদার্থ অবশ্য বিশেষভাবে সিংহলে ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত এবং কীট ও ছত্রাক উভয়কে দমন করার পক্ষেই চমৎকার। এই দুইটি

পদার্থের একটি দূষিত হয় না এবং যে কাঠে পরে রঙ লাগানো হবে সেই কাঠে ব্যবহারের উপযুক্ত, আর দ্বিতীয় পদার্থটি যে-কাঠে রঙ করা হবে না (যেমন ছাদের কড়িবরগার কাঠ) সেইসব কর্কশ-অমসৃণ কাঠে ব্যবহারের পক্ষেই কেবল উপযুক্ত।

স্নানের টবে বা ড্রামে কাষ্ঠসংরক্ষণকারী পদার্থ-মিশ্রিত জলে কাঠ ডুবিয়ে সারারাত খাড়া অবস্থায় রেখে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। অবশ্য যেখানে তা কাজে করা সম্ভব নয় সেখানে উপযুক্ত কাষ্ঠ-সংরক্ষণকারী পদার্থ দ্বারা কাঠ আগাগোড়া ব্রাশ করে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া আবশ্যিক।*

*'স্ক্যান' পত্রিকার সৌজ্ঞে



খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রক (খাদ্য বিভাগ)

আদেশ

নয়াদিল্লী, ৮ই জুলাই, ১৯৫৯

জি এস আর ৮১৪—যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, ভুট্টার পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য এরূপ করা আবশ্যিক, সেই কারণে এক্ষণে অত্যাৱশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫ সালের ১০নং আইন)-এর ৩য় ধারার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা নিম্নলিখিত আদেশ প্রণয়ন করিতেছেন।

১। সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভ—(১) এই আদেশ ভারতীয় ভুট্টা (শ্বেতসার প্রস্তুতকার্যে ব্যবহার নিষেধকরণ) আদেশ, ১৯৫৯—এই নামে অভিহিত হইবে।

(২) উহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ এই আদেশে—

(ক) “ভারতীয় ভুট্টা” বলিতে ভারতে উৎপন্ন ভুট্টাকে বুঝাইবে ;

(খ) শ্বেতসার কারখানা সম্পর্কে “স্বত্বাধিকারী” বলিতে এরূপ কারখানার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ; এবং

(গ) “শ্বেতসার কারখানা” বলিতে যে কারখানায় শ্বেতসার প্রস্তুত হয় সেই কারখানা বুঝাইবে।

৩। ভারতীয় ভুট্টা শ্বেতসার কারখানাসমূহে ব্যবহার করা যাইবে না—কোন শ্বেতসার কারখানার স্বত্বাধিকারী শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় ভুট্টা ব্যবহার করিবেন না বা ব্যবহার করাইবেন না।

৪। শ্বেতসার কারখানাসমূহে কতৃক ভারতীয় ভুট্টা ক্রয় করা যাইবে না—কোন শ্বেতসার কারখানার

স্বত্বাধিকারী শ্বেতসার কারখানায় শ্বেতসার প্রস্তুতকার্যে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ভুট্টা ক্রয় করিবেন না বা ক্রয় করাইবেন না।

৫। প্রবেশ, তল্লাশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা—
(১) এই আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা দেখিবার উদ্দেশ্যে অথবা এই আদেশ যে প্রতিপালিত হইতেছে সে বিষয়ে স্বীয় প্রতীতি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, সহ অবর (আরক্ষা) পরিদর্শকের অপেক্ষা কম পদমর্যাদাবিশিষ্ট নহেন এরূপ কোন আরক্ষা-কর্মচারী অথবা এতৎপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বা, স্ব স্ব অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে, কোন রাজ্যসরকার কিংবা কোন সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসক যাহাকে ক্ষমতা দেন তিনি,

(২) কোন গৃহ, যানবাহন বা জাহাজে এই আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে, হইতেছে বা লঙ্ঘিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকিলে উক্ত গৃহ, যানবাহন বা জাহাজে প্রবেশ এবং তল্লাশ করিতে পারিবেন অথবা প্রবেশ, এবং তল্লাশ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন ;

(৩) যে ভারতীয় ভুট্টা সম্পর্কে এই আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে, হইতেছে বা লঙ্ঘিত হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাসের কারণ থাকিলে উহা আটক করিতে বা আটকের জন্য ক্ষমতা দিতে পারেন।

(৪) তল্লাশ ও আটক সম্পর্কে, দণ্ডপ্রণালী সংহিতা, ১৮৯৮-এর ১০২নং ও ১০৩নং ধারাসমূহের বিধানাবলী এই প্রকরণ মতে তল্লাশ ও আটক সম্পর্কে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।*

*‘ক্যালকাটা গেজেট’এর ৩১-৭-৫৯ তারিখের বিশেষ প্রকাশনে প্রকাশিত আদেশের বঙ্গানুবাদ।

টুকিটাকি

অধিক খাদ্য উৎপাদনের আবশ্যকতা

চন্দননগরে ২৮এ অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এক ভাষণে কৃষিজীবীদের আয়বৃদ্ধি সন্নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং সেইসঙ্গে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী মূল্যে তাঁদের খাদ্য সরবরাহ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চন্দননগরে রানীবাগানস্থিত রাজ্য নারিকেল নাশারিতে 'নারিকেল দিবস' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বকালে কৃষিমন্ত্রী বলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কৃষিজীবীদের ও মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। তিনি বলেন যে, কৃষিজীবীদের আয় বৃদ্ধি পেলে শিল্পোন্নতির সহায়তা হবে এবং ফলে অধিকতর কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি হবে।

রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল, আম ও অন্যান্য ফলের গাছের চারা রোপণের এক পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৫ হাজার মাইল রাস্তা আছে যার উভয় পাশে প্রায় ৫০ হাজার মাইল লম্বা জমি রয়েছে গাছের জন্য। ঐসকল গাছ থেকে যথাসময়ে ফলের মারফত প্রায় ১০ কোটি টাকা আয় হবে এবং সেসব ফলের শিল্পসংক্রান্ত সম্ভাব্যতার যথোচিত সম্ভাবহার করা হলে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে।

মন্ত্রিমহাশয় এ উপলক্ষে নারিকেলচাষের শিল্পগত সম্ভাবনা সংক্রান্ত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি চারাবাগানে একটি নারিকেলচারাও রোপণ করেন। এ সংক্রান্ত এক ভাষণে তিনি বলেন যে, খাদ্যের ন্যায্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী করার জন্য দেশের কৃষিপদ্ধতির উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রতি বৎসর বিপুল

পরিমাণ খাদ্য আমদানির জন্য তার সীমাবদ্ধ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং, এই অর্থ যাতে কৃষকদের সাহায্যে ব্যয় করা যায়, সেজন্য রাজ্যের খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলেন যে, দেশের অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কৃষি এবং সমৃদ্ধিশালী কৃষকই জাতির অগ্রগতির ভিত্তিস্বরূপ।

খাদ্যোৎপাদন-মন্ত্রী আরও বলেন যে, কৃষির উন্নতির জন্য সেচ-ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা দেওয়া আবশ্যিক, কিন্তু এর জন্য প্রচুর ব্যয় করতে হবে। বর্তমানে রাজ্যের কৃষিজমির মাত্র ২২ শতাংশ সেচের জল পায়, কিন্তু এই সুবিধা আরও প্রসারিত না করা পর্যন্ত জনগণ বঁসে থাকতে পারেন না।

মন্ত্রিমহাশয় বলেন যে, ইতোমধ্যে সরকার কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত শ্রেণীর বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ করেছেন। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার পাওয়া যায় না। অতএব কৃষকদের কম্পোস্ট, সবুজসার ও মলসার প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন যে, সকলপ্রকার প্রাপ্ত-সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবহার এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে প্রতি একরে ফলন প্রচুর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

কৃষিমন্ত্রী সরকারের উপর নির্ভর করার প্রবণতার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, সরকার তাঁদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সাহায্য দিতে পারেন, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কর্তব্য কৃষকদের নিজেদেরই সাধন করতে হবে।

কৃষি-অধিকর্তা ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী 'নারিকেল দিবসের' তাৎপর্য এবং নারিকেল চাষের শিল্প-সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করেন।

রেশম-শিল্পী সমবায় সংঘ

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য ও আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার সম্প্রতি সোনামুখীতে

রেশম-শিল্পী সমবায় সম্বন্ধে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রী আর ঘোষ, আই এ এস, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রমহাশয় তাঁর ভাষণে রেশম-শিল্পের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দানের প্রয়োজনের উপর জোর দেন এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাস দেন যে, এর উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগের বিরুদ্ধে

অভিযান

১৯৫৯ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পশুচিকিৎসা অধিকার গবাদি পশুর মহামারীর ১৫০টি এবং হাঁস-মুরগির মহামারীর ৪০টি খবর পান এবং চিকিৎসা করেন। এগুলির মধ্যে ৮টি পশু গোবসন্ত রোগে, ৫৯টি 'হেমারেজিক স্টিপ্টোসেমিয়া' রোগে, ৩২টি 'ব্র্যাক কোয়ার্টারে' এবং ২১টি পদ ও মূখগহবরের রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। হাঁস-মুরগিদের ক্ষেত্রে ৩৪টি রানীক্ষেত রোগে, ৩টি মুরগি কলেরায় ও ৩টি মুরগি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এসব রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে ৪,০১৬টি পশুকে গোবসন্তের, ৮,৫৭৯টি পশুকে 'হেমারেজিক স্টিপ্টোসেমিয়া'র, ৪,৭৪৭টি পশুকে 'ব্র্যাক কোয়ার্টারে'র এবং ৭,২৩৬টি পশুকে 'অ্যানথ্রাক্স'র আক্রমণ-সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়। পদ ও মূখগহবরের রোগের প্রাদুর্ভাব দমনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

রানীক্ষেত রোগ, মুরগির কলেরা ও মুরগির বসন্ত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যথাক্রমে ৯,৬১২, ৮০ ও ৭৭টি হাঁস-মুরগিকে টিকা দেওয়া হয়েছে। উক্ত মাসে ৮৮টি গো-মহিষ ও ৩৬টি হাঁস-মুরগি বিভিন্ন রোগে মারা গিয়েছে।

রিন্ডারপেস্ট বা গোবসন্ত, 'হেমারেজিক স্টিপ্টোসেমিয়া', 'অ্যানথ্রাক্স', রানীক্ষেত রোগ ও মুরগির

বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক টিকা দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে গোবসন্ত রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে ১,২৮,৬৭৩টি, 'হেমারেজিক স্টিপ্টোসেমিয়া' রোগের বিরুদ্ধে ১,৬৮১টি, 'অ্যানথ্রাক্স' রোগের বিরুদ্ধে ৬০টি গো-মহিষকেও রানীক্ষেত এবং মুরগির বসন্ত রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৭,৫৩১ এবং ৬৩৩টি হাঁস-মুরগিকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য নারকেল-উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একটি রাজ্য নারকেল-উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন, তার সভাপতি হয়েছেন কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন বিভাগের পরিষৎ-সচিব এবং সদস্যগণ হলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা; পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি নিবন্ধক; কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন বিভাগের 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' ও (পদাধিকারবলে) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপসচিব; কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপসচিব; পশ্চিমবঙ্গের উপ-শিল্প-অধিকর্তা (কুটির); উদ্ভাস্তু গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপসচিব শ্রী জে কে সান্যাল; ভারতীয় কেন্দ্রীয় নারকেল সমিতির সচিব; ছোবড়া পর্ষদের সদস্য শ্রী এস সি রায়, শ্রীতপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ; শ্রী এন কে মল্লিক; শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্তী; শ্রীআবদুস সোবুর এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রাধিকারিক (আল্) ডক্টর হিরণচন্দ্র চৌধুরী—সচিব।

এই পর্ষদের কার্য হ'ল এ রাজ্যে নারকেল-উন্নয়ন সম্পর্কে সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান (খাদ্যশস্যরূপে ও সেইসঙ্গে ছোবড়া-শিল্পে কাঁচামাল রূপে নারকেলের উপযোগিতা); এই রাজ্যে নারকেলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির পর্যালোচনা—রাজ্যের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় যার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে!

চা'লকল ও ধানভান্না কলের লাইসেন্স

১৯৫৮ সালের চা'লকল শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে প্রতি চালু চা'লকলকে একটি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। কোন ব্যক্তি নতুন চা'লকল স্থাপন করতে বা ১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রিলের পূর্বে এক বৎসরের অধিককাল যাবৎ বন্ধ কোন চা'লকলে চা'ল উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক থাকলে তাঁকেও অনুমতিপত্র (পারমিট) নিতে হবে। কলিকাতায় ১১-এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে অবস্থিত খাদ্য, দ্রাণ ও সংভরণ (খাদ্য ও সংভরণ শাখা)/বিভাগ কর্তৃক এসকল 'পারমিট' দেওয়া হবে। ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান ও চা'ল নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী চা'লকলসমূহকে (ধানভান্না কল সহ) প্রদত্ত বর্তমান লাইসেন্সগুলির মেয়াদ ১৯৫৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ঐ তারিখের মধ্যে বর্তমান সকল চা'লকল ও ধানভান্না কলগুলিকে ১৯৫৮ সালের চা'লকল-শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানকারী প্রাধিকারীদের নিকট থেকে অবশ্যই লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। চব্বিশপরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পূর্বদুর্গা, মেদিনীপুর, নদিয়া, মর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর এবং কলিকাতার

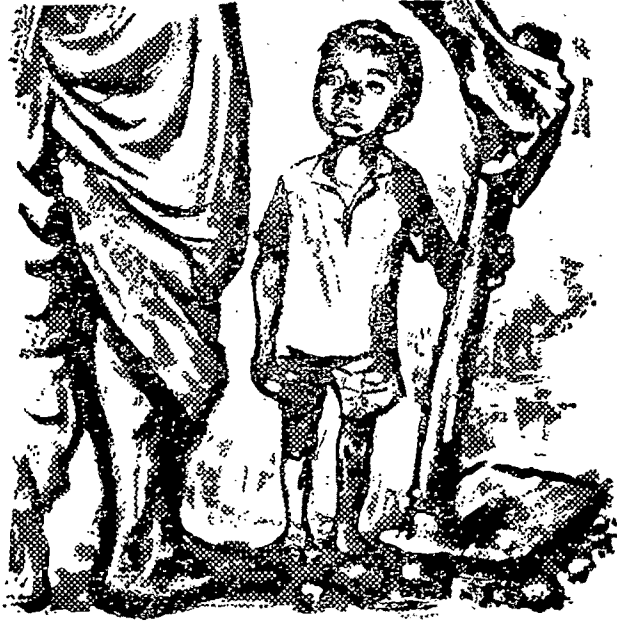
জন্য 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অফ প্রোজেক্টরমেন্ট'দের তাঁদের স্ব স্ব অধিকারক্ষেত্রে 'লাইসেন্সিং অফিসার' নিযুক্ত করা হয়েছে। অর্বাশন্ত জেলাগুলির জন্য কলিকাতার ১১-এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটেস্থিত 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ফুড লাইসেন্সিং অফিসার' নিযুক্ত হয়েছেন।

লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য আবেদনের ফরম প্রোজেক্টরমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওন্যাল কন্ট্রোলার ও ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওন্যাল কন্ট্রোলারদের অফিস এবং কলিকাতা ১১-এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটেস্থিত অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ফুডের অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফী বাবত প্রদেয় ও টাকার ট্রেজারী চালান সহ লাইসেন্সের জন্য অবিলম্বে স্ব স্ব লাইসেন্সিং অফিসারদের নিকট আবেদন করতে হবে। বাঁকুড়া, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সম্পর্কে আবেদনপত্রসমূহ স্ব স্ব ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওন্যাল কন্ট্রোলার অফ প্রোজেক্টরমেন্ট-এর অফিসেও পেশ করা চলবে। তাঁদের উক্ত আবেদনসমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ফুড-এর নিকট প্রেরণের নির্দেশ দান করা হয়েছে।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।



তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে থেলনা। ইম্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিষয়, আরও বিষয় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্তব্য আর কৰ্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কৰ্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রাস্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামী পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে বাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্তান লিভার

PR.3-X52 BQ

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, মার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রামপুরহাট	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	নাওরখাট	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুয়া (মেদিনীপুর)	কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড।
৭। রানাঘাট	রানাঘাট	রানাঘাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মর্শিদাবাদ			২৮। ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড	ঘাটাল।
৮। কালি	খাগড়াবাট	কালি।	২৯। তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)	তমলুক।
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রমুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁধি	কণ্টাই রোড	কাঁধি।
১০। লালবাগ	মুশিদাবাদ	মুশিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। বালুরঘাট	কালিমাগঞ্জ	বালুরঘাট।
১৩। রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	৩৩। মালদহ	মালদহ কোর্ট	মালদহ।
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডা	আরামবাগ।	জেলা জনপাইগুড়ি		
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৪। জনপাইগুড়ি	জনপাইগুড়ি	জনপাইগুড়ি।
পশ্চিম এলাকা			৩৫। আলিপুর-মুম্বার	আলিপুর-মুম্বার	আলিপুর-মুম্বার।
জেলা বর্ধমান			জেলা দার্জিলিং		
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৬। দার্জিলিং	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৭। কালিম্পং	শিলিগুড়ি	কালিম্পং।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	৩৮। শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	জেলা কোচবিহার		
			৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। বাধাডাঙ্গা	কোচবিহার	বাধাডাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চবিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁধি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেন্ডু।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

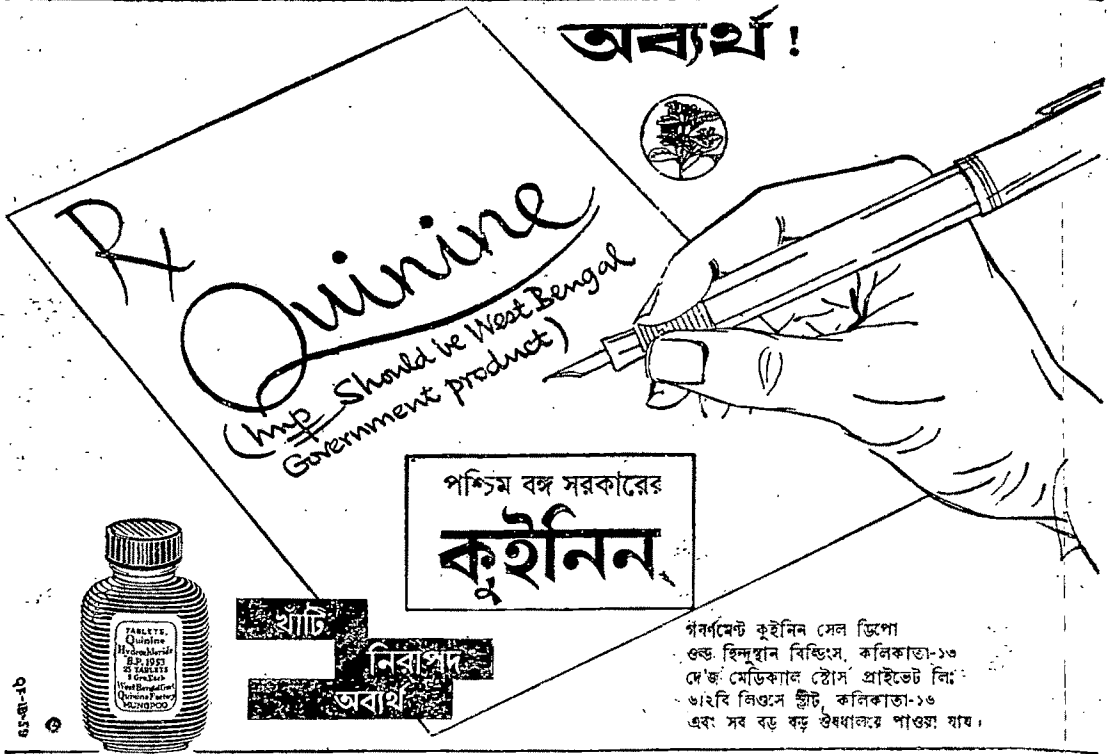
মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্ম অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের স্থতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্ম নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

অব্যর্থ!

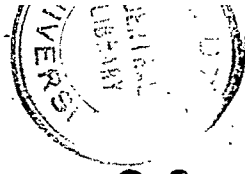


Rx Quinine
(Imp. Should be West Bengal Government product)

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের
কুইনিন

খাটি নিরাপদ অবাধ

গর্ভমেষ্ট কুইনিন সেল ডিপো
ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩
মেডিক্যাল স্টোন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬২বি লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬
এবং সব বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



বসুন্ধরা : কান্তিক : ১৩৬৬

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (**District Veterinary Officer**) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ্র	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইবাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগ্দা
	পোঃ নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন শিল্প	শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড,	দমদম
১৪। ঐ ..	হাবড়া	ক্যান্টনমেন্ট।	
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সন্দেশখালি		
১৮। ঐ ..	হাডোয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারভলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাথমিক	স্বতন্ত্র	স্থিতি	স্থিতি
১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	স্বতন্ত্র	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক
২।	ঐ ..	ডোমজুড়	২।	ঐ ..
৩।	ঐ ..	আমতা	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।
			৪।	ঐ ..
			৫।	ঐ ..
			৬।	ঐ ..

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	বেথুয়াহরি	২।	ঐ ..	রানাবাট
৩।	ঐ ..	রানাবাট	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনি
৪।	ঐ ..	শান্তিপুর	৪।	ঐ ..	চাক্দা
			৫।	ঐ ..	হাঁসখালি
			৬।	ঐ ..	রানাবাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	হরিহরপাড়া	২।	ঐ ..	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ ..	দমকল	৩।	ঐ ..	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ ..	রসুনাবাগ	৪।	ঐ ..	কান্দি
৫।	ঐ ..	ভগবানগোলা	৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা
৬।	ঐ ..	ধুলিয়ান	৬।	ঐ ..	বারওয়ান, পোঃ পাঁচথুপী
৭।	ঐ ..	নবগ্রাম	৭।	ঐ ..	কান্দি
			৮।	ঐ ..	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্ম্যমাণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্ম্যমাণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশচন্দ্রপুর
৩। ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪। ঐ ..	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫। ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্ম্যমাণ	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ	
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর	
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্ম্যমাণ	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ ..	ধুম	
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ	
৪।	ঐ ..	মিরিক(কাসিয়াঙ)	
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি	
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি	
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কালিম্পাঙ
৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বংলি-বংলিয়ট, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
৮।	ঐ ..	কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্ম্যমাণ	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকনিগঞ্জ	
৩।	ঐ ..	মাথাভাঙ্গা	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪।	ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দোসহানি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া
৩।	ঐ ..	কালচিনি
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	গুরুত্ব
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	গুরুত্ব
২।	ঐ ..	মেমারী	
৩।	ঐ ..	সেহারা বাজার	
৪।	ঐ ..	কালনা	
৫।	ঐ ..	কাটোয়া	
৬।	ঐ ..	নতুনহাট	
৭।	ঐ ..	আসানসোল	
৮।	ঐ ..	রানীগঞ্জ	
৯।	ঐ ..	দুর্গাপুর	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..	কাটোয়া	
৩।	ঐ ..	কালনা	
৪।	ঐ ..	আসানসোল	
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ভাতার	
৬।	ঐ ..	মঙ্গলকোট	
৭।	ঐ ..	শক্তিগড়	
৮।	ঐ ..	গুরুত্ব	

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	সাইখিয়া
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	সাইখিয়া
২।	ঐ ..	বোলপুর	
৩।	ঐ ..	দুবরাজপুর	
৪।	ঐ ..	রামপুরহাট	
৫।	ঐ ..	নলহাটি	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	সিউড়ি
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..	রামপুরহাট	
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	নলহাটি	
৪।	ঐ ..	মহম্মদবাজার	
৫।	ঐ ..	আগেদপুর	
৬।	ঐ ..	বোলপুর, শ্রীনিকেতন	

হুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুঁচুড়া

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	ত্রিবেণী	
৩।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	
৪।	ঐ ..	তারকেশ্বর	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	আরামবাগ	
৪।	ঐ ..	খানাকুল	
৫।	ঐ ..	পুরসুরা, পো: চাঁপাডাঙ্গা	
৬।	ঐ ..	পৌলবা, পো: চুঁচুড়া	

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
২। জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক্
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগ্রা
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটেশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্লক স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
জোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর



আগামীরা প্রস্তুতি

খোকা আর আর খোকা নেই। আজ সে বড় হয়েছে। ছাঁদিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরা-বাঁচার সংগ্রামে।.....
বুড় বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের ভাঁজে ভাঁজে তার বার্জকোর ছাপ। জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সঙ্কল্প দিয়ে খোকাকে সে বড় করে তুলেছে। তাঁর বুক ঢালা মেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট্ট চারাটির মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর জেনেছে জীবনের কঠিন সত্যকে—বৈচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।
এ শুধু আগামীরাই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান সংগ্রামই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সুখের উজ্জ্বল হাসি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীরা পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে—

আজও আগামীতেও দেশের পেরায় হিন্দুস্থান লিভার

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	২৩৩
সমাধানের পথ	২৩৫
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	২৩৮
লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার	২৪০
পশ্চিম বাঙলায় মাছচাষের কথা	২৪৫
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ	২৪৭
ভারতের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল	২৫০
হুপারির চাষ	২৬৫
আখচাষের জারিগান	২৬৮
পশ্চিম বাঙলায় সিনকোনা চাষ	২৭১
টালিগঞ্জে পক্ষিপালনের সরকারী খামার	২৭৩
টুকিটাকি	২৭৫

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিঘাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বহুঙ্করা

১২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা : কার্তিক ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

এবার পশ্চিমবঙ্গে যে অভাবনীয় বন্যা হ'ল, গত সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তার ভয়াবহতার তুলনা মেলে না। অগণিত মানুষের জীবনে যে অপরিসীম দুর্গতি নেমে এসেছে, বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র জুড়ে যে রিক্ততার হাহাকার জেগে উঠেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বর্ণনা ক'রেও লাভ নেই। প্রকৃতিজননীর খামখেয়ালিকে তার অজস্র সন্তান মাথা পেতে নিরুপার-ভাবে মেনে নিয়েছে, নেয় নি শৃঙ্খল তার প্রেষ্ঠ সন্তান মানুষ। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সে প্রকৃতির সংগ্রামী সন্তান। সমুদ্রমুখে যেমন অমৃতের উল্ভব হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার। সেই সংগ্রামে মানুষ যতই করেছে জয়লাভ ততই হয়েছে সভ্যতার বিস্তার এবং চিরদিন যে মানুষ শৃঙ্খল জয়লাভই করেছে তা তো নয়, বারবার তার পরাজয়ও ঘটেছে। কিন্তু পরাজয়ে সে দমে যায় নি, অমিত উৎসাহে তেজীয়ান হয়ে সে আবার মেতেছে আহবে।

প্রকৃতির রাজ্যে কারও নিরাপদ বাসের জন্য কোন গৃহের ব্যবস্থা নেই। মানুষ নিজের নিরাপদ বাসের জন্য নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে গৃহ রচনা করেছে। গড়েছে কুটির, গড়েছে ইমারত। প্রকৃতির এক তান্ডব-লীলায় হয়তো কারও কাঁচা কুটির আর কারও পাকা ইমারত একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। গৃহবাসীদের জীবনে তাতে দঃখ এসেছে, দুর্গতি নেমেছে, কিন্তু সেই পরাজয়ের প্লানি ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন উদ্যমে তারা ঘর বেঁধেছে আরও দৃঢ়

ক'রে। পরাজয়ের মধ্যে সে পেয়েছে নতুন জয়ের উদ্দীপনা। এই হচ্ছে মানবধর্ম। এই সংগ্রামী ধর্ম মানুষের এক বিশেষত্ব।

প্রকৃতির বিপুল সলিললীলা বাধাবন্ধের চির-বিরোধী; কিন্তু চিরকাল বাঁধ বেঁধে জল রুখে, জলকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে মানুষ নিজের কল্যাণ রচনা ক'রে চলেছে। আবার, প্রকৃতির ভৈরব জলতান্ডবে যুগে যুগে কত বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে। মানুষ তাতে দমে নি। সে আবার বেঁধেছে বাঁধ—নব নব কৌশলে আরও দৃঢ় ক'রে। পরাজয়ের অভিজ্ঞতার বদনি-য়াদেই গড়ে উঠেছে নবসৃষ্টি। এমনি ক'রেই চিরদিন চলেছে মানুষের সংগ্রাম। দুর্গতিকে উপেক্ষা করার মধ্যেই পাওয়া যায় মানুষের এই সংগ্রামী রূপের পরিচয়।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এ রাজ্যের বন্যাদুর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে মানুষের এই পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছেন। তিনি দেখেছেন, অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যেও কোথাও মানুষের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় নি, তাদের মুখে হাসি, বদকে আশা, চোখে নতুনের স্বপ্ন। প্রকৃতির খামখেয়ালির নিদারুণ আঘাতে তারা দমে যায় নি, নুয়ে পড়ে নি, নিরাশ হয় নি। এইটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা।

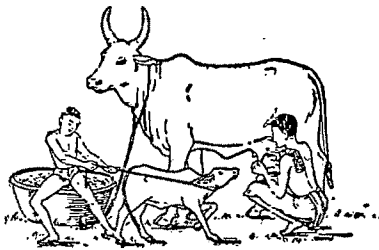
ধ্বংসের স্তূপে সৃষ্টির সাধনা করা মানুষের ধর্ম। দিকজোড়া অনেক মাঠের কৃষি বন্যার জলে তলিয়ে গেছে। যা গেছে, তা তো গেছেই; সেই যাওয়ার মধ্যে পাওয়ার সম্ভান করতে হবে নতুন উদ্যমে। বন্যার

জল নেমে যাচ্ছে। অনেক মাঠ থেকে নেমে গেছে। জল কিছুদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে জমিতে যে পলি জমেছে, ফসলের তা ভাল সার। এই সারে সারালো জমিকে নতুন করে তৈরি করে নিয়ে, এবার রবি ফসলের চাষ শুরুর করতে হবে অবিলম্বে। ভাল করে চাষ করলে মাঠে মাঠে সেনা ফলবে। বাড়তি সার হয়তো আর না দিলেও চলবে। সামান্য কিছু যদি দরকার হয়, সরকার ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে সক্রিয় হয়েছেন। বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকায় সার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গবাদি পশুর জন্য খাদ্যও সরবরাহ করা হচ্ছে। আর পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন রবিশস্যের উন্নত ধরনের বীজ। চাষীভাইরা নতুন উৎসাহে নেমে পড়ুন চাষের মাঠে।

আশার কথা, বন্যার জলে মাঠে মাঠে যত ফসল নষ্ট হয়েছে বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, জল নেমে যেতে এখন দেখা যাচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে পাকা আউশ ধান বানের জলে ডুবে গিয়েছিল। জল নেমে যেতে দেখা গেছে, পলিকাদায় গাছসমেত ধান চাপা পড়ে মাঠ একেবারে

কাদামাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু তার ওপর হালকা এক পসলা বৃষ্টি হতেই দেখা গেল, কাদার আবরণ সারে গিয়ে ধান জেগে উঠেছে। পাকা ধান জলে পচে যায় নি। কাদা-লুটানো গাছগুলোর সব ধান হয়তো ঘরে উঠবে না। কিন্তু যেখানে সবই গেছে বলে ধরা হরেছিল, সেখানে কিছু যাওয়া ঢের ভাল। যাক, যা গেছে—খড়ে-ধানে পচে সার হবে আমন ধানের।

রবিশস্য আমাদের অন্যতম প্রধান ফসল। তার চাষে নতুন উৎসাহ নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। দুঃখের কথা যদি ধরা যায়, তবে বলতে হয়, এবারের অতিবৃষ্টির বন্যাজলে শহরের আর শহর-তলির মানুষও প্রচুর নাকানিচুবানি খেয়েছে। অনেক জায়গায় এখনও জল জমে আছে—এই কান্ট্রিকের প্রথম ভাগেও। তারা হতাশ হয় নি। আশার দৃষ্টি মেলে তারা চেয়ে আছে গ্রামের দিকে। গ্রামের ভাইরা সকলের জন্য মাঠে মাঠে ফলাবেন খাদ্যশস্য। ভাবনা কী? আমাদের চাষীভাইরা গ্রামের আর শহরের সকল মানুষের প্রত্যাশা সফল করে তুলুন।



সমাধানের পথ

জীবাণুনাশ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে—কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। নানা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের দুঃখকষ্ট দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ আজ আন্তরিকতাশূন্য হইয়াছে। কেহ অন্যর লইয়া কোন কাজে হাত দেয় না। গতানুগতিকভাবে কাজ করিয়া যায়—সে কাজের কি ফল হইবে, বা কি ফল হইল সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখে না।

আমরা গত বহু বৎসর ধরিয়া সারা জুলাই মাস ধরিয়া বৃক্ষ রোপণ উৎসব করিয়া থাকি। সরকার হইতে বহু গাছের চারা বিতরণ করা হয়, সরকারী উদ্যোগে বহু স্থানে বহু গাছ রোপণ করা হয় কিন্তু সকল কাজেই আন্তরিকতার অভাব থাকায় দেশে গাছের সংখ্যা না বাড়িয়া ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, সরকারী পথের ধারে কেহ যদি একটি গাছ লাগাইত, সে গাছ বড় হইয়া গেলে (অর্থাৎ গোরু-ছাগলে আর খাইতে না পারে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে) রোপণকারীকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইত। এ ব্যবস্থা থাকায় বহু দরিদ্র মানুষ টাকার লোভে গাছ পুতিত ও তাহা রক্ষা করিত। বর্তমান সময়ে অবশ্য ৫ টাকা কিছুই নহে—সে স্থলে ২০ টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলে হয়তো বহু লোক অর্থের লোভে এ কাজে অগ্রসর হইতে পারে। শূদ্র সরকারী পথের ধারে নহে—যে-কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ স্কুল, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, আদালত ও অন্যান্য সরকারী কার্যালয়ের সন্নিহিত সাধারণ ভূমিতে—যেখানে কেহ একটি গাছ ঐভাবে বড় করিয়া দিবে, তাহাকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলে দেশে কিছুসংখ্যক নতুন গাছ সৃষ্ট হইতে পারে।

জাম, জামরুল, পেয়ারা, আতা, বাতাবি লেবু, আম, লিচু, কাঁঠাল, তেঁতুল, চালতা, আমড়া প্রভৃতি গাছের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যদি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহারা (সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতারাও উদ্যোগী হইবেন) নিজ নিজ গৃহে ঐ সকল গাছ তৈয়ার করিতে পারে। যে-কোন উপায়ে বর্তমানে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নানা প্রকার ফলমূলের গাছ বাড়িলে সেগুদলি পরিপূরক খাদ্য হিসাবে কাজে লাগিবে। যেসকল স্থানে নারিকেল ভাল ফলে, সেসকল স্থানে যাহাতে অধিক সংখ্যায় নারিকেলগাছ লাগানো হয়, সেজন্যও সরকারী ব্যবস্থায় লোককে উৎসাহিত করা দরকার।

পূর্বে শূদ্র পল্লীগrame নহে, শহরতলিতে, এমনকি শহরে পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে সবজি-চাষের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে আমরা সভ্য হইয়াছি, ছেলেমেয়ে মাটিতে হাত দিলে তাহারা অসভ্য হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করি। প্রতি গৃহে সবজির বাগান তৈয়ার করিবার জন্য যদি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সবজির চাষ বাড়িয়া যাইবে এবং এত অধিক মূল্যে গৃহস্থকে তরিতরকারি ক্রয় করিতে হইবে না। পূর্বে আমার বাটীর নিকট কামারহাটি (চাম্বশপরণা) সাগর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ঐভাবে সবজিচাষে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতে দেখিয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ের নিজস্ব পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন জমি আছে। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক যদি ছাত্র-ছাত্রীদ্বগকে এ বিষয়ে কর্তব্য নির্দেশ করেন এবং ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বাটীতে কিরূপ সবজি-বাগান করিল, তাহা দেখিয়া তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সবজি-চাষ খুব বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক গৃহস্থের

বাড়িতে যে সামান্য জমি আছে, তাহাতে লাউ, কুমড়া, শসা, বেগুন, কলা, শাক প্রভৃতির চাষ করিলে বাজারে তরকারির দাম অনেক গরিমাণে কমিয়া যাইবে। বহু বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণের সময় খেলাধুলা প্রভৃতির জন্য যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়, তেমনই বৃক্ষরোপণের জন্য বা সবজি-বাগান বা ফুলের বাগান তৈয়ারির জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ফুলের চাষও দেশে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। টগর, শিউলি, কলিকা, জবা প্রভৃতি ফুলের গছ তো প্রায় দেখা যায় না। বেল, মল্লিকা, গোলাপ, জুঁই, গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতির তো কথাই নাই। একবার বৈশাখ মাসে সাতক্ষীরা শহরে সভা করিতে গিয়া-ছিলাম—ভোরে একটি পথে যাইয়া দেখিলাম, পথের দুই ধারের বকুল গাছ হইতে ফুল পড়িয়া সমস্ত পথটি বকুলফুলে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সেদিন কী আনন্দই না হইয়াছিল। সর্বত্র তো ঐভাবে বকুলফুলের গাছ লাগাইয়া মানুষকে সুগন্ধ ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করা যায়। সকলের মন যেন সৃষ্টি-বিমুখ হইয়াছে—ঐভাবে সম্পদ ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে কেন মানুষের মন আকৃষ্ট হয় না, জানি না। সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িলে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা এ কাজ সত্তর ও বহুলপরিমাণে সম্পাদিত হইতে পারে। জেলা স্কুল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেও এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কতব্য স্থির করিতে হইবে। মফস্বলের তো কথাই নাই, কলিকাতার মত শহরেও এইরূপ ফুলের গাছ বা সবজিবাগান করার স্থানের অভাব হইবে না। শ্রেণ্য সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাহার কলিকাতার বাড়িতে টবে (বারান্দায় ও ছাদে) যে ফুলের বাগান করিয়া রাখিয়াছেন, স্থান থাকা সত্ত্বেও অনেকে সেরূপ বাগান করার চেষ্টা করেন না। শহরে অনেক বাড়িতে টবে সবজির চাষ করিতেও দেখা যায়—তবে তাহার সংখ্যা অতি কম—এইরূপ বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পূর্বে হিন্দুরা স্থানে স্থানে

বট, অশ্বথ, পাকুড় প্রভৃতি গাছ পুঁতিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিতেন। এখন মানুষের মনে ধর্মভাব কমিয়া যাওয়ায় সে প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অশিক্ষিতের দল এখনও স্থান পাইলেই বট বা অশ্বথ গাছ পুঁতিয়া প্রত্যহ তথায় জল দিয়া থাকে। শিল্পাঙ্গলে বহু স্থানে ঐরূপ নতুন গাছ হইতে দেখা যায়। এ কার্যে তাহাদের উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করিলে গাছের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও পাক তৈয়ারি করিতেছে। ঐসকল পাকের নতুন গাছ বসাইলে দেশ নানা দিক দিয়া উপকৃত হইবে।

যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে মানুষ ক্রমশঃ কৃষিবিমুখ হইতেছে। চাষের প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় না। পূর্বে ধনী মাত্রই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ফলভোগ করিবার জন্য ফলের বাগান করিতেন—এখন আর নতুন ফলের বাগান করিতে দেখা যায় না। সমবায় প্রথায় বড় জমি লইয়া ফলের বাগান করা হইলে ফলের দাম কমিয়া যাইবে ও পরিপূরক খাদ্য পাইয়া মানুষের প্রাণ বাঁচবে। সমবায় প্রথায় পেঁপে, কলা প্রভৃতি বারমাসের ফলের চাষ একদিকে যেমন লাভজনক, অন্যদিকে তেমনই খাদ্য-সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায়। কলা ও পেঁপে উভয় ফলই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য।

পশ্চিম বাঙলায় খাদ্য-উৎপাদনের স্বতন্ত্র দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে ও সেজন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। কাজেই এ বিষয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা ও আন্দোলন করা দরকার। একদিকে যেমন ধান, গম, কলাই, সরিষা, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, সূপারি, আলু, পেঁপাজ প্রভৃতির চাষ বাড়াইয়া ঐসকল খাদ্যের বিষয়ে পশ্চিম বাঙলাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে হইবে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক খাদ্য (বাড়াইয়া) মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায়ও মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা পল্লীগrame আত্মকট্টালের সময় ভাত-খাওয়া কমাইয়া দিতাম। জাম-জামরুল, পেয়ারা, বাতাবিলেবু

প্রভৃতি বেশি পাইলে অন্য জলখাবারের প্রয়োজন অনুভব করিতাম না। পাকা কলা সকল সময়ে সকল শ্রেণীর মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত। নারিকেলের দেশে নারিকেল শ্রেষ্ঠ পরিপূরক খাদ্য। কিন্তু আমরা বর্তমানে সর্বত্র এত অধিক ডাব ব্যবহার করিতেছি যে, তাহার ফলে পাকা নারিকেল দেশে ক্রমে দুল্ভ হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় একটি ডাবের মূল্য তিন-চার আনা ও একটি পাকা নারিকেলের মূল্য তাহার দ্বিগুণ। ইহা সত্ত্বেও লোকে ডাব বিক্রয় করিতে উৎসাহী হয় কেন জানি না।

দুধ, মাছ, ডিম, মাংস প্রভৃতির অভাব যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, একথা বলা নিঃপ্রয়োজন। গোপালন সম্বন্ধে আমরা এতই উদাসীন যে বিদেশ হইতে গুঁড়া দুধ আমদানি বন্ধ করা হইলে আমাদের সকালের চা খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। এ কথা জানিয়াও পরিশ্রমের ভয়ে নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া আমরা গোপালনে বিরত থাকি। মাছের চাষ করা তো আর কেহ প্রয়োজন মনে করে না—ফলে ৪-৫ টাকা সের দরেও বাজারে মাছ কিনিতে বাধ্য হয়। অথচ দেশে অসংখ্য পদ্ধিকারিণী, ডোবা,

জলা প্রভৃতি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে—কেহ সেগুলিকে সংস্কার করিয়া কাজে লাগাইতে চাহি না।

হাঁস বা ছাগল পোষা কেন এককালে নিব্ধিত হইত জানি না। বর্তমান যুগে প্রত্যেক গৃহস্থের হাঁস ও ছাগল পোষা একান্ত কর্তব্য। মাছের পরিবর্তে হাঁসের ডিম বিশেষ উপকারী খাদ্য। ছাগল পুষ্টিতে মাংসের দাম কমিয়া যাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের দুধ ব্যবহার করা চলিবে।

সরকার নতুন নতুন সেচ-ব্যবস্থা, সার ও বীজ সরবরাহ প্রভৃতির দ্বারা ধান, গম, আলু প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। তাহা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিয়া একই জমিতে বৎসরে তিনবার ফসল উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা আনন্দের সংবাদ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিপূরক খাদ্য উৎপাদনে অব্যাহত না হইলে দেশের সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরা এজন্য এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সকলের চিন্তা যেন এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয়ে নিযুক্ত হয়, ইহাই একান্তভাবে কামনা করি।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের বন-উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ভাষণ প্রচারিত হয়, এখানে তা প্রকাশ করা হ'ল।—বঃ সঃ]

স্বাধীনতার পর থেকে বনমহোৎসব এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক বন-সম্পদ এবং বন্যজন্তু রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বাধীনতার আগে বিশেষ অবহিত করা হ'ত না। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরে নিয়মিত বনমহোৎসব এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ পালনের ফলে জনসাধারণ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। এখানেই গণতন্ত্রের সার্থকতা। বন্যজন্তু সংরক্ষণ সপ্তাহ বা বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতাও এখানে—এরই মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে চাই বলিষ্ঠ জনমত—নির্বিচারে বন ও বন্যপ্রাণী নাশের বিরুদ্ধে। তাই বনমহোৎসব এবং বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালনের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভাল বনই হ'ল পাখি এবং পশুদের আদর্শ বাসস্থান। পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির এক বিরাট অংশ তিন বছর আগেও জনসাধারণের হাতেই ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন জঙ্গল কাটা বন্ধ করা যায় নি এবং চাষ-আবাদের জন্যও অনেক জমি পরিষ্কার করা হয়েছে। তারই ফলে আজ বনের মধ্যে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি।

এসমত ফাঁকা বনে বন্যপ্রাণী বাস করতে পারে না। বনে চাষবাসের জন্য জমি পরিষ্কার করতে গিয়ে জনসাধারণ কখন আত্মরক্ষার জন্য কখনও বা শিকারের লোভে বহু প্রাণী ধ্বংস করেছে। বন্যপ্রাণীরা গৃহপালিত পশু ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে, বনবাসীরা বিপন্ন বোধ করে তাদের মারতে থাকে। বনভূমিতে যারা চাষ-আবাদ করে শস্য উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করেন তাঁরা অত্যন্ত গরিব

চাষী। পুরাতন পদ্ধতিতে বনভূমি চাষ করে তাঁরা মাত্র দু'-একবারই শস্য উৎপাদন করতে পারেন। তৃতীয় বছর আর তা থেকে বেশি শস্য পান না। চাষী সার দিয়ে জমিকে ভাল করার কোন চেষ্টাই করেন না, কারণ তাঁর সমস্ত গোরুই হিংস্র জন্তুর কবলে চলে যায়। ক্রমে চাষীর বন্যজন্তু শিকার করাটাই জীবিকা হয়ে দাঁড়ায় এবং অ-মাংসাশী জীবের মাংসই তাঁদের খাদ্য হয়ে পড়ে। শুধু তীরধনুক দিয়েই শিকার নয়, মাচা বেঁধে ফাঁদ পেতে এক সাথে অনেক পশু-পাখিও ধরা হয়। বাচ্চা-পাখিগুলিকেও তাদের মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বনে বসবাসকারীদের বাঁশ, কাঠ এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস, গোরু, ছাগল, হাঁস এবং বসবাসের গৃহ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য বনসম্পদের উপরই নির্ভর করতে হয়। শুধু তাই নয়, বনের কাঠ কেটে যে মজুরি পাওয়া যায়, বনজ সামগ্রী চালান দিয়ে যে মূল্য পাওয়া যায়, তাতেই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। বনের পক্ষে কী ভাল এবং ভবিষ্যতে তাঁদের নিজেদের পক্ষেই বা কী ভাল তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না।

বন এবং বন্যপ্রাণী উভয়ের পক্ষেই সবচেয়ে ক্ষতিকারক হ'ল আগুন। বিশেষ করে গ্রীষ্মে যখন বনে আগুন দেওয়া হয়ে থাকে তখন বড় বড় গাছ-গাছগুলি যায় বলসে এবং ভবিষ্যতের আশা ছোট চারা-গাছগুলিও যায় নষ্ট হয়ে। আর, ছোট ছোট বন্যপ্রাণীরা আগুনে পুড়ে মরে, ডিমগুলি নষ্ট হয়, প্রাণভয়ে বড় বড় জন্তুগুলি যেদিকে আগুন নেই সেদিকেই দৌড়াতে থাকে, আর বনবাসীরা সেই সুযোগে তাদের ধ্বংস করে। এইভাবে যদি বন্যজন্তু ধ্বংস হ'তে থাকে তবে এর ক্ষতিপূরণ করতে আমাদের অনেকদিন লাগবে।? বেশিরভাগ বনেই

এখন আর বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, হরিণ অথবা অন্য কোন বড় প্রাণী চোখে পড়ে না। অথচ প্রাকৃতিক সাম্য রক্ষার জন্য এদের বেঁচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করা আবশ্যিক। নির্বিচারে বন ও বন্যপ্রাণী নষ্ট করলে স্বাধীন জাতি হিসাবে আমরা এ দু'টি বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারব না। বন নিজের সম্পদ ছাড়াও, মানুষের কৃষি-উন্নতির প্রধান সহায়ক। বনভূমি নষ্ট করলে বন্যা দেখা দেয় ভয়াবহ রূপে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঁধ নির্মাণে বহু টাকা ব্যয় হয়। মেদিনী-পদ্র, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পদ্রুলিয়া অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে অনেক ক্ষতি হচ্ছে, কাছাকাছি বনভূমির ধ্বংসসাধনই হ'ল এর প্রধান কারণ। আর শ্যামল বিস্তীর্ণ বনভূমি ডেকে আনে বৃষ্টি—ধীরে ধীরে করে সুজলা-সুফলা।

এর সাংস্কৃতিক দিকটাও আমাদের বিচার করতে হবে। জাতি হিসাবে আমরা বস্তুতান্ত্রিক নই, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নত ব'লে দাবি ক'রে থাকি। আমাদের দেশেই সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। অহিংসার প্রতীক বুদ্ধদেব আমাদের জাতির গর্ব—বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধীর দেশে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে নিরপরাধ বন্যাপশুকে নির্বিচারে হত্যা করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না—চিড়িয়াখানাতে প্রাণীগদুলোর প্রতি যত্নের অভাব হ'লে আমাদের অভিযোগের অন্ত থাকে না, কিন্তু বন্যপ্রাণীর প্রতি হিংস্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ওঠে না। জীবজন্তুর প্রতি আমরা যদি এই নিষ্ঠুর আচরণের অবসান না

ঘটাই তবে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অমর্যাদাই করা হবে।

শুধু বনে আগুন লাগানো এবং বন্যপ্রাণী-হত্যা বন্ধ করাই নয়, বন্যপ্রাণী যাতে নিশ্চিন্তে বাড়তে পারে তার এবং যেসব বন্যপ্রাণীর জাত ধ্বংস হচ্ছে তাদের পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থাও করতে হবে। মেদিনীপদ্র, বাঁকুড়া এবং পদ্রুলিয়া এই তিনটি জেলার মিলিত পাহাড়ী জায়গায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে অভয়ারণ্য স্থাপন ক'রে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই স্থানটিতে অনেক জমি থাকায় জলসেচের কাজ এমনিতেই হবে আর গোরু, মানুষ এবং আগুনের হাত থেকেও বন্যপ্রাণীরা রক্ষা পাবে। এইভাবে আমরা বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান আরম্ভ করতে পারি।

লোহা, কয়লা, যাতায়াতের পথ এবং যেসমস্ত বড় বড় বাঁধ গড়ে উঠেছে, তা আমাদের প্রগতির নিদর্শন সন্দেহ নেই, কিন্তু বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করাও আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন।

আজ আমি এই কথা ব'লেই শেষ করব যে, ভারত-সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা সকলেই সমর্থন করব এবং আমরা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করব যে, 'বুদ্ধ এবং গান্ধীজীর দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সে দেশের মাটিতে লালিতপালিত হয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বনভূমি এবং প্রতিবাদে অক্ষম পশুদের হিংস্র হত্যাকাণ্ড ও অযথা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব।'

লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার

শ্রীদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায়

স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ার, লবণ হ্রদ

ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে 'লবণ হ্রদ' নামে পরিচিত বিশাল জলাভূমি রয়েছে। পশ্চিমদিকে হুগলি নদী এবং পূর্বদিকে লবণ হ্রদ থাকায় কলিকাতার ভৌগোলিক অবস্থান এই মহানগরীর প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাবার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণভাবে হুগলি নদীর বাম তীর বরাবর উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এই মহানগরী লম্বালম্বিভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিদ্যাধরী নদী কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ময়লা জল নিষ্কাশনের সর্বপ্রধান অববাহিকা ছিল। এই নদী লবণ হ্রদ এলাকায় পরিণত হয়ে পোর্ট ক্যানিং-এর নিকটে মাতলা নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই কারণে এই বিদ্যাধরী নদী যখন সজীব এবং বঙ্গ-উপস্বীপের জোয়ার-ভাটায় উন্মিলিত মোহনায় উর্মি-মুখর ছিল তখন লবণ হ্রদের বৃহত্তর অংশ বিদ্যাধরীর মুক্তধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশেছিল। এমনভাবে লোনা জল সমুদ্রমুখ থেকে নদী বেয়ে চলে এসেছে। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাধরী নদী আজ মৃত, জোয়ারের বেগে লোনা জল আর লবণ হ্রদ এলাকায় এসে পৌঁছায় না। এই এলাকার অভ্যন্তরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধের এক তন্তুজাল তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকার খাড়ি-গুলি এখন মাছের চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। লবণ হ্রদের কিছু অংশ ধানচাষের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এখানে কিছু জায়গা প্রায় অকেজোই পড়ে আছে, কারণ সেখানে প্রচুর নলখাগড়া আর অজস্র কচুরিপানা জন্মাবার ফলে তা ধানচাষ বা মৎস্যচাষ কোনটারই উপযুক্ত নয়। যেসব জায়গা অপেক্ষাকৃত উঁচু তেমন কতগুলি জায়গায় মানুষের বসতি গড়ে উঠে দূরে দূরে অবস্থিত

গ্রামগুলির উন্নতিসাধন করেছে। যে বিদ্যাধরী নদী এই অঞ্চলের ময়লা জল নিষ্কাশনের কাজ করত সেই বিদ্যাধরী মজে যাবার ফলে সমুদ্রের সঙ্গে লবণ হ্রদের সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় এর জল এখন আর লবণাক্ত হয় না; সুতরাং এখন লবণ হ্রদ নামটা ব্যবহার করাই ভুল।

লবণ হ্রদ পূর্বে অর্ধবৃত্তাকারে কলিকাতার পূর্বদিক বেষ্টন করে কার্যত প্রায় ৭০ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা অধিকার করে ছিল। কিন্তু এখন লবণ হ্রদ বলতে সাধারণ ৩৩ বর্গমাইল পরিমিত দুইটি অঞ্চলকে বুঝায়—কলিকাতা কর্পোরেশনের বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য কুলটিতে পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হওয়ায় এই অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সেই দুই ভাগ হলঃ

(ক) উত্তর ও পূর্বদিকে কৃষ্ণপদর খাল, দক্ষিণ দিকে বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পয়ঃপ্রণালী এবং পশ্চিম দিকে কেন্দ্রীয় হ্রদের খাত নতুন খনন করা একটি পরিখায় পরিবেষ্টিত ১৮ বর্গমাইল বহুভুজবিশিষ্ট অঞ্চল—এটাই উত্তর লবণ হ্রদ নামে পরিচিত।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিম পরিখার দক্ষিণ দিকে ১৫ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা টালিগঞ্জ নালার দ্বারা পশ্চিম দিকে সোনারপুর পর্যন্ত প্রসারিত পূর্ব রেলপথের নগরোপকণ্ঠস্থিত সড়ক ও পঞ্চান্নগ্রাম বাঁধ, উত্তর দিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের দক্ষিণদিক থেকে পশ্চিমদিকে প্রসারিত পরিখা এবং পূর্বদিকে অধুনালুপ্ত বিদ্যাধরী নদী—এটা দক্ষিণ লবণ হ্রদ নামে পরিচিত।

লবণ জলের হ্রদের সমস্যা বহু বছরের পুরানো। বাস্তবিক গত সওয়া শতাব্দীরও অধিককাল ধরে এই সমস্যা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। দীর্ঘকাল পূর্বে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক স্বয়ং বাঁধনির্মাণ করে এর পুনরুদ্ধারের প্রথম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তারপর থেকে এই ব্যাপার নিয়ে বহু বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্টের গঠিত গার্নার কমিটি “একদিকে খনন করে অন্যদিক ভরাট করার” পদ্ধতি অনুসরণ করে উত্তর লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারের পন্থা নির্দেশ করেছিল। এই পন্থানুযায়ী কাজ করলে প্রয়োজনীয় উচ্চ মাপে ঐ এলাকার ৫০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করতে ২০ বৎসর সময় লাগত।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট কর্তৃক গঠিত পয়ঃ-প্রণালী অনুসন্ধান সমিতি সতর্ক বিচার-বিবেচনার পরে যে সুপারিশ করেছিলেন নিম্নে তা দেওয়া গেল:

(১) গার্নার সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী রাজভবন থেকে ৭ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে উত্তর লবণ হ্রদের যে এলাকা অবস্থিত তার বৃহত্তর অংশ শিল্প ও বাসস্থানের কাজে লাগাবার জন্য উন্নীত ও পুনরুদ্ধার করা হবে।

(২) উত্তর লবণ হ্রদের অবশিষ্টাংশের উন্নতি-সাধন করে তাকে পল্লী-বসতি, মৎস্যপালন ও কৃষিকাজের উপযুক্ত করা।

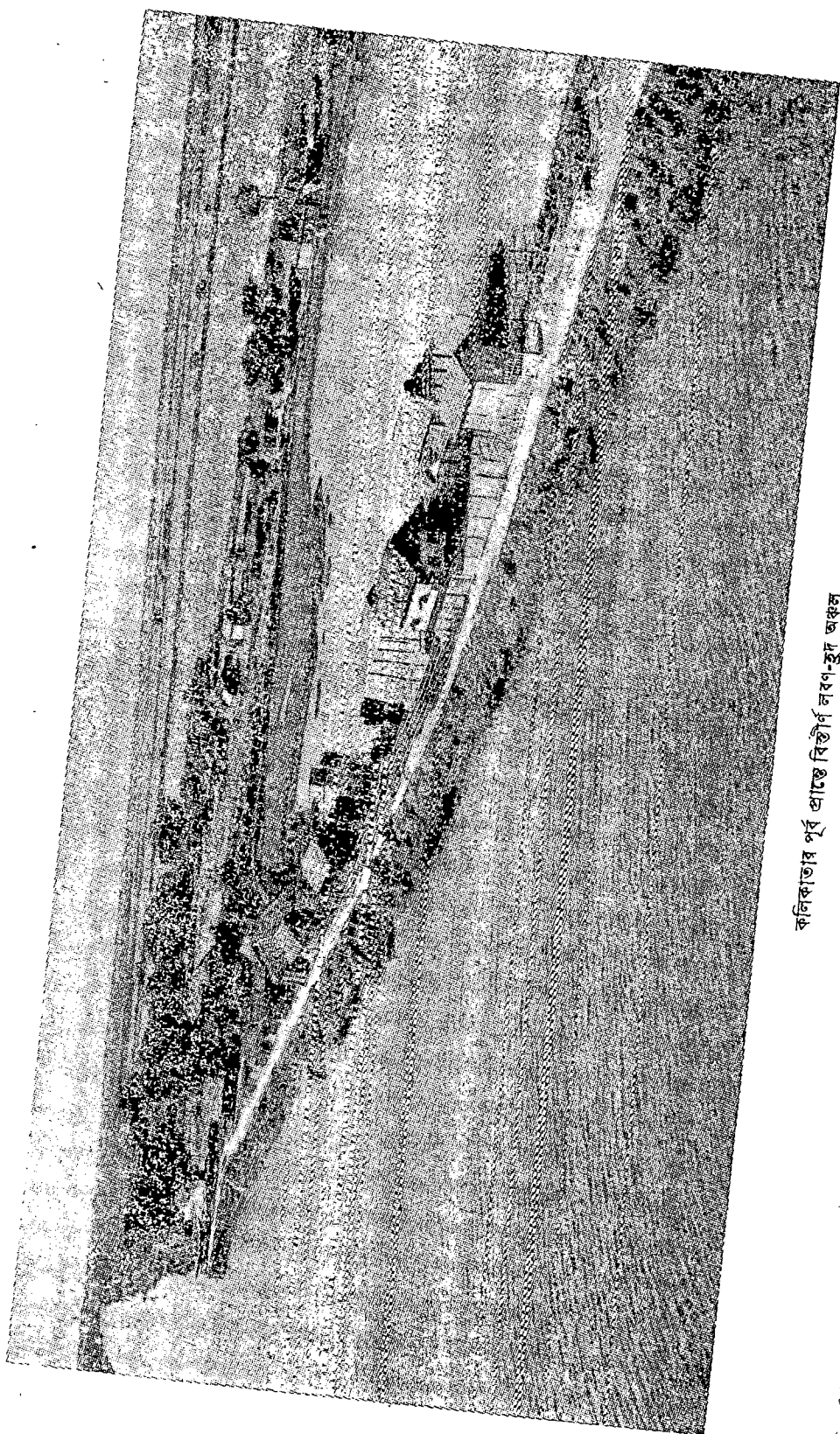
(৩) যথোচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দক্ষিণ লবণ হ্রদের অধিকাংশ স্থান মৎস্যপালন কিংবা মৎস্যপালন-তথা-কৃষিকাজে লাগানো হবে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পরে কলিকাতার চতুর্দিকে বিস্তৃত জলনিমগ্ন ও ম্যালেরিয়া-অধুষিত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাজভবন থেকে ৩০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলের ময়লা জল

নিষ্কাশনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে “বৃহত্তর কলিকাতা মহাপরিকল্পনা সমিতি” স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমিতি লবণ হ্রদ সমস্যা আলোচনা করে তাঁদের মতামত জানানেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা এখন একটি বিরাট জনবহুল মহানগরী। মোটামুটি ১৮,০০০ একর পরিমিত স্থান জুড়ে এই মহানগরী বিস্তৃত এবং ১৯৫১ সালের গণনা অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা মোটামুটি ২৫ লক্ষ। অর্থাৎ গড়ে প্রতি একর জমিতে ১৪০ জন লোকের বসতি। এই বিপুলসংখ্যক লোকের ঘনবসতির ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্ভাস্তদের আগমনের ফলে, তা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

এই অস্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি একর জমিতে অত্যধিক ঘন-বসতি হওয়ায় এই মহানগরীর সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত স্থানের সন্ধান করা একান্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এইভাবে বসবাসের উপযুক্ত একটু ভাল জায়গা পাওয়ার সমস্যাও বেড়ে গিয়েছে। শহরবাসীদের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করার কাজ যেমন বেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে করার ব্যাপার, সেইজন্য অনতিবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সমগুরুত্ব সহকারে এই মহানগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত অঞ্চলসমূহের উন্নতি-সাধন করা। আগেই বলা হয়েছে, এই মহানগরী ইতোমধ্যেই লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত হয়েছে। সকলেই সাধারণভাবে একথা স্বীকার করেন যে, যে শহরের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের সঙ্গে বেমানান তার জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট সংরক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান প্রভৃতি কাজের ব্যয় খুব বেশি পড়ে। সুতরাং সেই শহরের দৈর্ঘ্যের দিকে অধিকতর সম্প্রসারণ বাঞ্ছনীয় নয়। এই পরি-স্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার উত্তর লবণ হ্রদ



কলিকাতার পূর্ব প্রান্তে বিত্তীয় লবণ-স্তম্ভ অঞ্চল

পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা এবং বিশেষভাবে নানা সমস্যায় প্রপীড়িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য এই মহানগরীর প্রসারকল্পে এর কিছু অংশের উন্নতিসাধনের বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দেখছেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে উত্তর এবং দক্ষিণ লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারের জন্য অনুসন্ধান ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য এবং টালির নালার (এই নালার পাশ দিয়ে পূর্বে আদিগঙ্গা প্রবাহিত হ'ত) উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১৯৫৩ সালে নেদারল্যান্ডের ইঞ্জিনিয়ারিঙ পরামর্শদাতাদের ও ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করেছিলেন।

উত্তর লবণ হ্রদ সম্পর্কে 'নেডেকো'র (Nedeco's) প্রস্তাব দুইভাগে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে এই এলাকার ৩.৭৫ বর্গমাইল এই মহানগরীর অব্যবহিত উপকণ্ঠে অবস্থিত উল্টাডাঙ্গা-মাণিকতলা থেকে প্রায় এক ফুট উঁচু করে পুনরুদ্ধারের সুপারিশ করা হয়েছে। হাওড়া এবং বিবেকানন্দ (উইলিংডন) সেতুর মধ্যবর্তী স্থানে, বিশেষ করে চিংপুর জলনিরোধক কপাটের অনতিদূরে ঘুসুরি চর এলাকা খনন করে তা ভরাট করার জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করা হবে। চিংপুর লক-এ অবস্থিত পাম্পিং স্টেশনে তা চালান করা হবে এবং সেখান থেকে পাইপ-লাইনের সাহায্যে পুনরুদ্ধার-অঞ্চলে পাঠানো হবে। এই ৩.৭৫ বর্গমাইল পরিমিত এলাকা উন্নীত করে তা শহরের উপনগরীরূপে তার সমস্ত সুযোগসুবিধা—যেমন রাস্তা, জল-সরবরাহ, ভূমি-নিম্নস্থ পয়ঃ-প্রণালী ও জলনিঃসরণ-ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ, রম্য উদ্যান, ইত্যাদি সহ গড়ে তোলা হবে। একটি ব্যাপার থেকে এই কাজের বিরাট অচিরেই উপলব্ধি করা যাবে যে, সাড়ে ছয় বৎসরেরও অধিক কাল ধরে খনন করে প্রায় ৬,৬০০ লক্ষ ঘনফুট মালমসলা পাম্পের সাহায্যে এই এলাকায় পাঠাতে হবে। এই উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হ'তে আনুমানিক

আরও প্রায় তিন বৎসর সময় লাগবে। 'নেডেকো' যে আনুমানিক হিসাব ধার্য করেছেন তার পরি-প্রেক্ষিতে এই কাজের জন্য মোট ১৫.৭০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন হবে।

নগর সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হ'ল শহরের কেন্দ্রস্থলের সন্নিহিতে অবস্থিত এবং তার যানবাহন ইত্যাদি-ব্যবস্থার সর্গে যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে স্বল্প-অ-স্বাভিষ্ট লোকদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া। এটা উপলব্ধি করা যাবে যে, এইজন্য যে এলাকা মনোনীত করা হয়েছে সেই এলাকাটি মাণিকতলা অঞ্চলের ঠিক পূর্বাংশে অবস্থিত। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এই অঞ্চলটিকে আধুনিক পদ্ধতিতে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলছেন। সরকারের পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপান্তরিত হবে এবং এই অঞ্চল পূর্ণাঙ্গরূপে উন্নত হবে সেদিন এইভাবে পুনরুদ্ধার করা এই এলাকার ৬০ শতাংশ স্থান লোকবসতি নির্মাণের জন্য পাওয়া যাবে, বাকি অংশ রাস্তা, বিদ্যালয়, রম্য উদ্যান, হাসপাতাল, দোকানঘর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হ'ল এই যে, কোঠাবাড়ি তৈরির জন্য পাঁচ কাঠা পরিমিত জমির প্রত্যেকটি প্লট কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট মাণিকতলা-সংলগ্ন অঞ্চলে এখন যে মূল্যে বিক্রয় করছেন তার চেয়ে যথেষ্ট কম মূল্যে এখানে বিক্রয় করা হবে।

উত্তর লবণ হ্রদ সম্পর্কিত 'নেডেকো'র পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগে বাকি ১৪ বর্গমাইল এলাকা যৌথ-কৃষিকাজের জন্য পুনরুদ্ধৃত এলাকা হিসাবে ব্যবহারের জন্য লবণ হ্রদ থেকে পুনরুদ্ধার করবার পরিকল্পনা স্থির হয়েছে। এই পুনরুদ্ধৃত অঞ্চলে সেচকাজের জন্য একটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের সমতায় অবস্থিত জল থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত পুনরুদ্ধৃত অঞ্চলে জমির জলের সমতা

পাম্প ক'রে উচ্চ পর্যায় থেকে কমিয়ে ইচ্ছানুসৃত প'রে রাখা হয়—সেই পুনরুদ্ধৃত অঞ্চলকে (Folder) পুনরুদ্ধৃত এলাকা বলে। এই পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক খসড়া হিসাবে ২৮৪ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই এলাকায় শাকসবজি চাষের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বছরে দু'বার ফসল ফলাতে হবে। এ থেকে বছরে ৬৭,২৭৫ টন ফসল পাওয়া যাবে আশা করা যাচ্ছে। প্রতি সেরের মূল্য গড়ে ১৭ নয়া পয়সা হ'লে এই উৎপন্ন দ্রব্যের আর্থিক মূল্য হবে প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকা।

টালির নালা উন্নয়ন সম্পর্কে 'নেডেকো'র পরিকল্পনায় হেস্টিংসের নিকটে যেখানে গিয়ে এই নালা শেষ হয়েছে সেখান থেকে প্রায় গাড়িয়ার কাছাকাছি পর্যন্ত—এর ব্যবধান প্রায় দশ মাইল—নালাটির পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। গাড়িয়ার প্রান্ত-সীমানায় একটি স্রোতস্বতী অববাহিকা নির্মাণের কাজও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল, বিশেষভাবে দক্ষিণ লবণ হ্রদ এলাকা এবং টালিগঞ্জের খানিকটা জায়গার প্রান্ত-সীমানায় ময়লা জল স্বেচ্ছাভাবে নিঃসরণের জন্য এই নালা ঠিক রাখা।

উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৎস্য পালনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দক্ষিণ লবণ হ্রদ এলাকার একাংশ উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। এই মৎস্যপালন-কেন্দ্রগুলি শুধু যে নগর সম্প্রসারণ ও উত্তর লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধৃত অঞ্চলে বর্তমানে উৎপন্ন মৎস্য রক্ষা করতে সমর্থ হবে তাই নয়, পরন্তু মৎস্যের পরিমাণও প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। সরকার-উদ্ভাবিত এই পরিকল্পনা অনুসারে দক্ষিণ লবণ হ্রদের মৎস্যপালন-কেন্দ্রগুলি—এই জায়গায় উত্তর লবণ হ্রদ এলাকা

থেকে ধীরেদেব এনে পুনর্বাসিত দেওয়া হবে—স্থানীয় ধীরেদেবের সমবায় সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এর ফলে শুধু যে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ব্যক্তিগত আর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে তাই নয়, পরন্তু কলিকাতার বাজারে মাছের দামের ব্যাপারেও এর সুফল দেখা যাবে। এখন যাঁরা লবণ হ্রদ এলাকার অধিবাসী তাঁদের সকলকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং পুনরায় তাঁরা নিজেদের পূর্ণ কর্ম-নিরত দেখতে পাবেন। এমনভাবে এই পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রবাদের খাঁচে সমাজগঠনের কাজে সাফল্যলাভে সুস্পষ্ট অগ্রগতির পরিচয় দেবে।

এইভাবে মৎস্যের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ না কমিয়ে পুনরুদ্ধৃত এলাকা বৎসরে দুইবার শাকসবজির চাষের জন্য ব্যবহার ক'রে উত্তর লবণ হ্রদ থেকে মৎস্যপালন কেন্দ্রগুলিকে স্থানান্তরিত করলে, হিসাব ক'রে দেখা গেছে, জাতীয় সম্পদে বছরে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার মত লাভ হবে।

উপসংহারে আমি এ কথাও বলতে চাই, যে সময়টুকু আমি পেয়েছি, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যাটি এবং এই সমস্যা সমাধানের যেসকল বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। উল্লিখিত পন্থায় এর উন্নতির ফলে শুধু যে নগরের স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হবে তাই নয়, বাসোপযোগী আরও জায়গার সংকুলান হবে এবং আরও খাদ্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও এইসব এলাকায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটলে কুটির-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনযাত্রারও উন্নতি হবে।

পশ্চিম বাঙলায় মাছচাষের কথা

ত্রিবিজ্ঞাপতি মাঝি

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিষদ সচিব

বাঙালীর মাছভাত খাবার অভ্যাস আজকের নয়। শোনা যায়, স্বাধীন বাঙলার ধীবরগণ বন্ধজলের মধ্যে মাছচাষের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আর নৌসৈনিকগণ স্রোতের জলে প্রচুর মাছ শিকারের পথ দেখিয়েছিলেন।

বাঙলাদেশ যৌদিন দ্বিখণ্ডিত হয় সেদিন ধীবর ও সৈনিক-বংশধরদের কথা বড় কেউ চিন্তা করেন নি। নতুবা আজ ২০ হাজার নবগত জেলেকে সীমান্ত এলাকায় কথায় কথায় নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হ'ত না। অনেকেই বোধ হয় জানেন, একদিন নদী-মোহনা ও সুন্দরবন এলাকার মৎস্যক্ষেত্র হ'তে ঐসব জেলে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য সংগ্রহ করতেন। তাই বর্ষাকালের মৎস্য-সঙ্কটের সময় স্রোতের জলের ইলিশ, চিংড়ি প্রভৃতি মাছের যথেষ্ট আমদানি হ'ত।

কয়েক দিন হ'ল কয়েকজন মৎস্য-বিশেষজ্ঞ সুন্দর-বন এলাকা হ'তে ফিরে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মৎস্যক্ষেত্রটি নষ্ট হ'তে চলছে। অনেক জেলে কোন উপায়েই বড় মাছ ধরতে না পেরে মৎস্যক্ষেত্রে ছোট ফাঁসের জাল দিয়ে শিশুমাছ ধরে আনছে। দুই বছর যাবৎ জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না বলে বর্তমানে জালের ফাঁস ছোট করে ফেলেছে। আজ তাই এই রাজ্যে সমতল ভূমিতে অধিক পরিমাণ মাছ চাষ করবার দিকটাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাপকভাবে করবার জন্য অনেকেই বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপিত করছেন। কিন্তু রাজ্যের ৯৬ হাজার জেলের মধ্যে ৬ হাজার জেলের নিজস্ব জলাভূমি নেই। বাকি ৯০ হাজার জেলের মধ্যে নৌকা, জাল ও খাদ্যের অভাবে পীড়িত হয়ে আছে

প্রায় ৪০ হাজার জন। এ অবস্থায় বন্ধ জলাভূমিতে কী উপায়ে আরও অধিক পরিমাণ মৎস্যচাষ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এই প্রশ্নটাই আজ বড় হয়ে উঠেছে।

ময়লা জলাভূমি, লবণাক্ত জলাভূমি ও মিঠা জলাভূমির মধ্যে দেখা যায়, সর্বাপেক্ষা লবণাক্ত ও ময়লা জলাভূমিতে ভেরী, ঘেরী ও বিল প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে মাছচাষ হচ্ছে।

এসময় কেন্দ্র এবং অন্যান্য অঞ্চল হ'তে বছরে দেড় লক্ষ স্থলে তিন লক্ষ মণ মাছ আমদানি হচ্ছে বলে বৃহৎ কলিকাতাবাসী আজও টাটকা মাছ খেতে পারছে। এতদ্ব্যতীত বন্ধ জলাভূমির মধ্যে খাল, বাঁধ, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় এ রাজ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। এমনকি ধানচাষের যেসব নিম্নভূমিতে প্রচুর জল জমে থাকে সেইসব অঞ্চলকেও বন্ধ জলাভূমির সামিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

রাজ্যে ৩৯ লক্ষ বিঘা বন্ধ জলাভূমিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- (১) পোনামাছ চাষের যোগ্য জলাভূমি,
- (২) পোনামাছ চাষের জন্য সংস্কারযোগ্য জলাভূমি,
- (৩) অন্যান্য জলাভূমি।

অতএব ৩৯ লক্ষ বিঘা জলাভূমিতে পশ্চিম বাঙলায় প্রতি বছরের প্রয়োজনীয় ১ কোটি ২০ লক্ষ মণ মাছ উৎপাদন করা সহজসাধ্য নয়। কেননা, বর্তমানে ৬০ লক্ষ মণ নানা জাতীয় মাছ প্রতি বছর উৎপাদিত হচ্ছে না। অবশ্য পশ্চিম বাঙলার প্রতিটি জলাশয়ের মালিক এবং প্রতিজন মৎস্যজীবী যদি মনেপ্রাণে পূর্বোক্ত ন্যায় মৎস্যচাষে যত্নবান হন

তা হ'লে দুই-তিন বছরের মধ্যে অন্তত ৯০ লক্ষ মণ বিভিন্ন জাতীয় মাছ উৎপাদিত হ'তে পারে।

মৎস্য-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ গভীর সমুদ্র হ'তে মাছ ধ'রে এবং সমুদ্র-উপকূল হ'তে মাছের সার, শূটকি মাছ এবং 'শার্ক' লিভার অয়েল' তৈরি ক'রে মৎস্যশিল্প ব্যবসার গোড়াপত্তন করছেন। শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ একাজে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে শীতকালে কলিকাতার মাছের চাহিদা কৃষ্ণং পরিমাণ মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। রাজ্যসরকার এজন্য কাকম্বীপে একটি জেটি নির্মাণ ক'রে সেখানকার হিমঘরে স্রোতের জলের মাছ মজুত ক'রে কলিকাতার বাজারে অধিক পরিমাণ মাছ সরবরাহের বিহিত ব্যবস্থা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১৭টি জেলায় এবং ৪১টি মহকুমায় মৎস্য-বিশেষজ্ঞদের কার্যালয় স্থাপন করেছেন। এক-একটি থানা অঞ্চলে মৎস্য-প্রদর্শনী কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় মৎস্যচাষ শিক্ষা বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। কৃত্রিম উপায়ে রুই, কাতলা, মগেল, ভেটীক, কালবাউস, প্রভৃতি মাছের চাষেরও বিশেষ আয়োজন হচ্ছে। এখন প্রতি জেলাকে শুধু মৎস্যচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করলেই যথেষ্ট হবে না। সরকার এজন্য যেখানে খাল-বিল অধিক আছে সেই অঞ্চলেও অধিক মাছ উৎপাদনের আশায় বড় বড় বিল সংস্কারের জন্য যত্নবান হয়েছেন।

দশ বছর যাবৎ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সরকার নানা আয়োজন করছেন। এজন্য কৃষি, সেচ, পুর্ন ও গ্রাণ বিভাগের দ্বারা রাজ্যের প্রায় ৬,০০০টি জলাভূমির সংস্কার হয়েছে। খালে বিলে বাঁধে ও ধানের জমিতে প্রচুর পরিমাণ জিউল, কই এবং ঐ জাতীয় মাছ চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাজ্যবাসী যদি ঐসব মাছ ছোট অবস্থায় বিনাশ না ক'রে, একটু বড় ক'রে তোলেন তা হ'লে উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে। মৎস্যচাষ বিষয় পরীক্ষাকেন্দ্র এতদিন কেবলমাত্র দস্তবাদে ছিল,

এখন জনপদ ও কল্যাণীতে পরীক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

আপনারা শুনেন আনন্দিত হবেন যে, এই রাজ্যে ৯৬ হাজার জেলাকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে শক্তিশালী করার জন্য ইতোমধ্যে ৪৫০টি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এরকম আরও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি স্থাপনের জন্য আজ আহ্বান জানাচ্ছি। কলিকাতায় কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সুন্দরবন ও কাঁথি অঞ্চলে যেমন মাছ সংগ্রহে যত্নবান হয়েছে সেরূপ কলিকাতায় আর-একটি মৎস্য ক্রয় এবং বিক্রয় কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা হচ্ছে। মৎস্যভোজীদের মাছ সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। মৎস্য বিক্রয়-কেন্দ্র গড়ে তুলবার জন্য রাজ্যবাসী যত্নবান হয়েছেন।

আজ আমি বিনীতভাবে বলছি—জেলেদের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং কারিগরি দান ও খয়রাতি সাহায্য দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ মাছ বৃদ্ধি হবে না। রাজ্যসরকার এজন্য নিজস্ব জলাভূমি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে ও জেলেদের বিলি করছেন।

এ রাজ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জলাভূমি বহু মালিকের অধীনে রয়েছে। তাঁরা যদি মাছভাত-সংকটের সময় জেলেদের তথা উৎপাদনকারীদের দিয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে যত্নবান না হন তা হ'লে সংকটমোচনের একটি গুরুতর বাধা হ'লে জনমত তীব্র হয়ে উঠবে। আজ তাই বলছি, গ্রামসেবক হ'তে আরম্ভ ক'রে ব্লক অফিসার এবং ফিশারী অফিসারগণ যেন প্রতি অঞ্চলের জলাশয়ে মাছচাষের জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হন। তাঁরা যদি এক-একটি অঞ্চলে সমবায় সমিতি দ্বারা মাছের চাষ, সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তা হ'লে পশ্চিম বাঙলার ২ কোটি ৪০ লক্ষ জন মৎস্যভোজী মাথাপিছু এক ছটাক মাছ খেতে পাবে।

আশা করি দেশবাসী এরূপ কল্যাণ-কাজে সর্বতোভাবে যত্নবান হবেন।*

*আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজত্রে

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ

শ্রী এ কে দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় নিবন্ধক

আজকাল সমবায় কৃষি সমিতি সম্বন্ধে সংবাদপত্র মারফত অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে। নানা ধরনের অভিমতও ব্যক্ত করা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিষয়টির ব্যাখ্যা দরকার।

সমবায় কৃষি সমিতি নানা ধরনের হ'তে পারে। সমিতির সদস্যদের চাষ-করা জমির পরিমাণ ও প্রকৃতি, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বিলবণ্টন পদ্ধতি অনুসারে সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। ১৯৪৬ সালে ভারত-সরকার কর্তৃক নিষ্পত্ত সমবায় পরিকল্পনা কমিটি চার ধরনের সমবায় কৃষি সমিতি গঠনের উল্লেখ করেছেন, যেমন—সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি, সমবায় যৌথ কৃষি সমিতি, সমবায় রায়তী কৃষি সমিতি আর সমবায় মিলিত কৃষি সমিতি।

সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি

এই ধরনের সমিতির সদস্যদের জমির পূর্ণ মালিকানা আছে। তাঁদের ভাগের জমি তাঁরা চাষ করেন এবং লাভ-ক্ষতির ভাগ ব্যক্তিগতভাবে বহন করেন। কিন্তু তাঁরা উন্নত পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করতে রাজী হ'তে পারেন এবং সবাই মিলে চাষের কোন পরিকল্পনা ক'রে থাকলে তা অনুসরণ করতেও তাঁরা পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমিতির কাজই হ'ল সাহায্য করা। বীজ, সার ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ঋণের ব্যবস্থা করা এবং উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ে এই সমিতি সদস্যদের সাহায্য ক'রে থাকে। সমিতি সদস্যদের ব্যবহারের জন্য পাম্প সংগ্রহ বা গুদামঘর নির্মাণ

করলে সদস্যদের তা ব্যবহারের জন্য সমিতিকে টাকা দিতে হবে।

সম্প্রতি নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে সাহায্যকারী সমবায় কৃষি সমিতির এই রূপই কল্পনা করা হয়েছে।

তারপর হ'ল সমবায় যৌথ কৃষি সমিতি। এখানেও জমির উপর সদস্যদের মালিকানা থাকে। তবে সমিতি উৎপাদনের কোন সাধারণ কার্যসূচি গ্রহণ করলে সদস্যরা যৌথভাবে চাষ-আবাদের জন্য (প্রয়োজন হ'লে ঠিকাচাষী নিয়োগ করা হয়) সমিতিকে জমি দিয়ে থাকেন। এই জমির দাম সদস্যদের আদায়ীকৃত অংশীদারী (শেয়ার) মূলধন বলে গণ্য হয়। তাঁরা আদায়ীকৃত অংশীদারী মূলধনস্বরূপ কিছু নগদ টাকা দিয়ে থাকলে তার উপরেও ঐ মূলধন জমা হবে। সমিতি নিজের হিসাবে চাষ-আবাদ ক'রে থাকে। সদস্যদের অংশীদারী মূলধন নিয়ে আর সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ক'রে এই কাজ করা হয়। সদস্যদের দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁদের নানা দলে ভাগ করা হয়। তাঁদের ঠিকা কাজ বা সময়ের হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে এবং কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের পর মোট লাভ হিসাব করা হয়। বিধিবদ্ধ অর্থ সংরক্ষিত তহবিলরূপে পৃথক ক'রে রাখার পর সদস্যদের অংশের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় এবং তাঁদের পরিশ্রম অর্থাৎ তাঁরা যে কাজের জন্য যে বেতন পেয়েছেন তারই অনুপাতে তাঁদের 'বোনাস' দেওয়া হয়।

নাগপুরে কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই ধরনের সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেসব জমির ক্ষুদ্র

মালিকগণ নিজেরাই চাষ-আবাদ ক'রে থাকেন, শুধুমাত্র তাঁদের পক্ষেই এই সমিতি উপযুক্ত হ'তে পারে।

তৃতীয় হ'ল সমবায় রায়তী চাষ-আবাদ সমিতি। এখানে সমিতিই হ'ল জমির মালিক। সরকার বা অন্য কোন জমিদারের কাছ থেকে সমিতি নিষ্কর বা ইজারাতে জমি নিয়ে থাকে। সমিতি জমি রকে বা প্লটে ভাগ ক'রে সদস্যদের বিলি ক'রে দেয় এবং তাঁদের কাছ থেকে নগদ টাকায় বা অন্যভাবে খাজনা আদায় করে। সদস্যেরা নিজেদের ভাগের জমি চাষ করেন এবং এর দরুন লাভ-ক্ষতি তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। সমিতি তাঁদের চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে এবং উৎসৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ে সহায়তা করতে পারে।

এইবার সমবায় মিলিত কৃষি সমিতির প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে সমিতি জমির পুরা-পুরি মালিক কৃষি-উৎপাদনের বার্ষিক কার্য-সূচি সমিতি রচনা করে এবং তার তত্ত্বাবধানে চাষ-আবাদে ব্যবস্থা করে। ষোঁথ কৃষি সমিতি যেমন সদস্যদের চাষের কাজে নিয়োগ করে, ঠিক সেইভাবে এই সমিতিও সদস্যদের দ্বারা কাজ করায়। সদস্যেরা ঠিকা কাজ বা সময়ের হিসাবে বেতন পান। সংরক্ষিত তহবিলের জন্য টাকা আলাদা রেখে এবং শেয়ারের ডিভিডেন্ড দেবার পর সদস্যদের শ্রমের অনুপাতে বোনাস দেওয়া হয়।

মিলিত কৃষি সমিতির সদস্যেরা মোটামুটি বেতনজীবীর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এর কতকগুলি সুবিধাও আছে। ব্যাংক টাকা রাখার মত সদস্যদের সচ্ছল অবস্থা হয়। সদস্যদের প্রয়োজনে সমিতিতে বিরাট জমির সংস্কার করতে হ'লে সেখানে এই পদ্ধতিতে ব্যাপকহারে চাষ-আবাদ সম্ভব হবে। ভূমিহীন শ্রমিক, সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব কর্মী ও উল্ভাস্ত্রদের পক্ষে এই ধরনের সমিতি খুবই উপযোগী। কিন্তু যেসব কৃষি-জীবীর নিজস্ব জমি আছে তাদের কাছে এর কোন আকর্ষণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতি

গত বৎসর ৩০এ জুন পশ্চিমবঙ্গে ১৬৭টি সমবায় কৃষি সমিতি ছিল, এগুলোর মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৭,০৩২। ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার অংশীদারী মূলধন ও ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা কার্যকরী মূলধন ছিল। সমিতির আওতাভুক্ত জমির মোট পরিমাণ ছিল ১৩,০৩৭ একর। সমিতির মধ্যে ১০৯টি উন্নত কৃষি সমিতি, ১৮টি ষোঁথ কৃষি সমিতি, ৫টি রায়তী কৃষি সমিতি, ২৯টি মিলিত কৃষি সমিতি এবং ৬টি মিশ্র সমিতি ছিল।

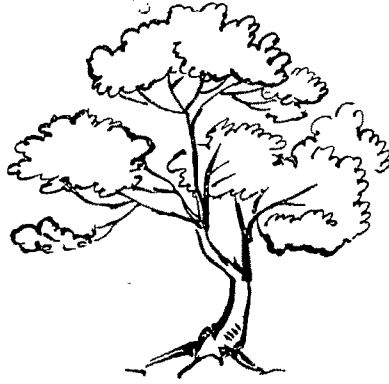
সমিতির সংখ্যা বেশি হ'লে ১২টির বেশি সমিতির কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে কিনা সন্দেহ। আয় ব্যয়ের হিসাব, উৎপাদনব্যয় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বিলিভটন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলার সদ্য সমবায় কৃষি সমিতি, হুগলি জেলার ত্রিবেণী ত্রিফলী সমবায় কৃষি সমিতি, তিস্তা উপত্যকা সমবায় কৃষি সমিতি আর জোড়াই প্রান্তর সৈনিক ষোঁথ কৃষি সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য। সদ্য সমবায় কৃষি সমিতির অংশীদারী মূলধনের পরিমাণ হ'ল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। সমিতি ৩০০ একর জমিতে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ-আবাদের পরিকল্পনা করছে।

দেখা গিয়েছে যে, যেখানে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির মত অনুকূল অবস্থা, যেমন—সেচব্যবস্থা, উন্নত বীজ ও সার সংগ্রহের সুবিধা, সমবায় ব্যাংক থেকে কম সুদে তাড়াতাড়ি ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা এবং কারিগরি নির্দেশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, শুধু সেখানেই সমবায় কৃষি-সমিতিগুলির প্রসার ঘটতে পারে। এসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকলে, শুধুমাত্র কৃষি-সংস্কার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটালেই কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে বছরে ১০০টি করে ৫০০টি সমবায় কৃষি সমিতি গঠনের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীনগরে

অনুষ্ঠিত উন্নয়ন-সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে মন্তব্য করা হয় যে, এ ধরনের সমবায় কৃষি-সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে তার গুণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করাই সমীচীন হবে। সেজন্য আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পরিবর্তন করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতিকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও সমস্ত জেলায় সরকারী তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত করা হয়। এ ধরনের সমিতিগুলিকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করা হবে।

এই লক্ষ্যের পূরণের সংশোধন ও সাহায্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন বিবেচনা করছেন। এ ধরনের সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সেগুলি যাতে কৃষি-উৎপাদন ও আমাদের কৃষি-জীবীদের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে সেজন্য আশা করা যায় শীঘ্রই একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ব্যাপক হারে চেষ্টা চালানো হবে। [আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে]



ভারতের নাতিশীতোষ্ণ

অঞ্চলের ফল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল, যাকে আমবা পাহাড়ী ফল বলে থাকি, সাধারণত ভারতের বিশেষ কয়েকটি রাজ্যেই ফলে থাকে। ভারতের জলবায়ুতে প্রায় হাজার চারেক ফুট উঁচুতে ছাড়া এইসব ফল ভাল জন্মে না। বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, আসাম আর উত্তরপ্রদেশেই এইসব ফলের চাষ করা হয়। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি পাহাড়েও কিছু কিছু ফল জন্মায়।

এ সব পাহাড়ী ফল নানা রকমের হয়। তবে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে এগুলিকে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আপেল, নাসপাতি, বিলিতি কিসমিস, চৌর এবং ওয়ালনাট। এসব ফল হিমালয় অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে খুব ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাল জন্মায়। আরও বেশি উঁচুতেও জন্মাতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে পীচ, জাপানী কিসমিস, বাদাম, ভিনিফেরা আঙ্গুর এবং বিলিতি গাব। এ গুলির জন্য ততটা ঠান্ডা আবহাওয়ার দরকার হয় না। সাধারণত অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়াতে সাড়ে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় এসব ফল জন্মায়।

পাহাড়ী ফলফলারির মধ্যে কতগুলো আপনা থেকেই জন্মায়, কিন্তু যেসব ভাল ফলের রীতিমত চাষ করা হয়, সেগুলি ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা। ভারতীয় রাজরাজড়া এবং উৎসাহী বিদেশী বণিকদের চেষ্টায় ভারতে পাহাড়ী ফলের রীতিমত চাষ শুরুর করা হয়। ১৯৩৬ সালে তদানীন্তন পাতিয়ালা রাজ্যের সরকার কার্লফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ডবলিউ হজসনকে রাজ্যে ফলচাষের উন্নয়নের ব্যাপারে পরামর্শ দেবার

জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন। তাঁরই সুপারিশ অনুসারে ঠান্ডা অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় ১০টি বগান তৈরি করা হয়। এই পরীক্ষার ফলে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে পাহাড়ী ফলের চাষ খুব বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে না হলেও গুণের দিক দিয়ে এসব খুবই উঁচুজাতের এবং বিদেশী ফলের সমতুল্য। কিন্তু মর্শাকিল এই যে, বর্তমানে চাহিদার তুলনায় এসব ফলের উৎপাদন অতি সামান্য আর সেজন্যই দামও খুব বেশি। অথচ এদেশে পাহাড়ী ফলের উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এখন এই সুযোগের সম্ভাবহার করতে হলে এইসব পাহাড়ী ফলের মধ্যে কোনটা কোন জমিতে ভাল জন্মায়, ফলের উৎপাদন বাড়াতে হলে জমিতে কী কী সার দিতে হয়, কীভাবে কলম করলে গাছ ভাল হয় ইত্যাদি নানা তথ্য জানা প্রয়োজন।

ভাল বাগান তৈরি করতে হলে খুবই সতর্কভাবে তার পরিচালনা করা দরকার। এ ব্যাপারে ভুলচুক এড়াতে হলে আগে কাগজেকলমে বাগানের একটা নকশা করে নেওয়া উচিত। এই নকশা খুব কাজে লাগবে। নকশা দেখলেই বোঝা যাবে যে, কোথায় কোন্ ধরনের কত গাছ লাগানো হয়েছে এবং বাগানে মোট গাছেরই বা সংখ্যা কত।

চাষ

আপেল, নাসপাতি এবং অন্যান্য ফলের গাছ বিভিন্ন ধরনের জমিতে ভালভাবেই চাষ করা যেতে পারে, তবে এসব ফলের গাছের পক্ষে বেশ খানিকটা গভীর মাঝারি দোআঁশ মাটিই সবচেয়ে ভাল। জমিতে জল-নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। 'ডেজার্ট' শ্রেণীর

আপেলের জন্য খুব ভাল জমি এবং তাতে জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। আপেলের জমির মত অত শুকনো মাটির জমিতে নাসপাতি হয় না, তাই নাসপাতির জন্য ভারি মাটি আর জল-নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই।

কিসমিস এবং তরকারির উপযোগী আপেলের জন্য অত ঝঞ্ঝাট নেই—সব রকম অবস্থায় এবং বিভিন্ন ধরনের জমিতে এর চাষ হতে পারে। এমন কি যদি জমিতে নুড়িও থাকে তা হলেও জমি ভাল ক'রে খুঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে পচা সার বা কম্পোস্ট সার দিয়ে চারা লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপত্যকার নিচু জমি—যেখানে কুয়াশা জমে থাকে সেখান থেকে দূরেই এসব ফলের চাষ করা উচিত। কোন কোন শ্রেণীর ফল আবার কুয়াশা সহ্য করতে পারে, কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে ঠিকমত চারা নির্বাচন করতে পারলে কুয়াশায় বিশেষ ক্ষতি হয় না।

শুধু জমিই নয়, যথাযথ দিকও ঠিক করতে হবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক সাধারণত উত্তর ও পূর্বদিকের চেয়ে উষ্ণ। কাজেই নিচু জায়গায় দক্ষিণ দিকে গাছ হলে সেগুঁলি মে-জুন মাসে খরা ভোগ করতে পারে। অপরপক্ষে উঁচু জায়গায় দক্ষিণ দিকই সুবিধাজনক।

শ্রেণী নির্বাচন

কোন শ্রেণীর চারা নির্বাচন করতে হবে তা নির্ভর করে চাষের উদ্দেশ্যের উপর। বাড়ির বাগানের জন্য চাষকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পছন্দই শেষ কথা। পছন্দমত শ্রেণীর চারা সংখ্যায় এমন হওয়া দরকার যাতে ক'রে মরসুমের গোড়া থেকে পরের বছরের বসন্ত পর্যন্ত বরাবর প্রচুর ফল পাওয়া যায়। যিনি ব্যবসার জন্য চাষ করবেন, তাঁর পক্ষে বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখাই সবচেয়ে যুক্তিসংগত কাজ। সুতরাং তাঁর জমিতে বিশেষ আবহাওয়ায় যে-শ্রেণীর গাছ ভাল হবে সেই শ্রেণীর চারাই বেছে নিতে হবে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি

বিষয়ের দিকেও নজর রাখতে হবে যেমন, কুঁড়ি যাতে পর পর ঠিক ফোটে তা দেখা, রোগ-কীট-বিনাশক ওষুধজল ছিটানো ও ফল পাকার জন্য সময় দেওয়া ইত্যাদি।

কত রকমের চারা লাগানো যাবে তা বাগানের পরিধি, ফল সংগ্রহের সময় কত শ্রমিক পাওয়া সম্ভব এবং বিক্রির ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ফল সংগ্রহের সময় যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। চাষী যদি নিজেই ক্রেতার কাছে ফল বিক্রি করতে চান তা হলে তাঁর পক্ষে যেমন মাত্র দু'রকমের চারাও লাগানো উচিত নয়, তাতে কোন এক ধরনের ফলের চাহিদা পূরোপূরি মেটানো সম্ভব হয় না।

ভাল বাগানের উপযোগী চারা নির্বাচন

প্রথম শ্রেণীর বাগানের গাছ হবে বেশ বাড়ন্ত, গাছের ছাল পরিষ্কার ও মসৃণ এবং গাছের আগা বেশ শক্ত হবে, ভাল কুঁড়ি ও ডালপালা থাকবে। কলমের জোড় নিখুঁত হওয়া দরকার তা না হলে কিছুকাল পরে ভেঙে যেতে পারে। গাছে কোন রকম পোকামাকড় বা রোগ থাকা চলবে না। সাধারণত এক বছরের চারাই বাগানে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত।

জমি তৈরি

চারা বসানোর আগে জমি ভাল ক'রে লাঙল দিয়ে বা গভীর গর্ত করে নেওয়া দরকার। জমি নতুন হলে সেখান থেকে অন্যান্য গাছপালা, গাছের শেকড়, বোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা দরকার। জমি অসমতল হলে সিঁড়িমত ক'রে এবং জলনিকাশের নালা কেটে নিতে হবে। তারপর নকশা অনুসারে গাছ বসানোর জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। জমি ভাল হলে গর্ত গভীর করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত চারা বসানোর জন্য কোন সার দিতে হয় না।

চারা বসানো

চারা বসানোর সময় লাইন যাতে ঠিক থাকে সেদিকে নজর রাখা দরকার। তা না হলে বাগান শুধু দেখতেই খারাপ হয় না, চাষেরও অসুবিধা। দুর্দৃষ্টি

চারার মধ্যে কতখানি জমি ফাঁক রাখা দরকার তা নির্ভর করে জমির উর্বরতা, সেচের সুবিধা ইত্যাদির উপর। বেশি উর্বর জমিতে কম উর্বর জমির তুলনায় দু'টি চারার মধ্যকার ফাঁক বেশি হবে। এ ছাড়া গাছের বাড় এবং আকার মূল শিকড়ের উপর খুব বেশি নির্ভর করে। সুতরাং মূল শিকড়ের ধরনের উপর দু'টি চারার মধ্যে কতটা জমি ফাঁক রাখতে হবে তা নির্ভর করে।

সাধারণ অবস্থায় বিভিন্ন ফলের চারার মধ্যে কতটা ফাঁক রাখতে হবে এখানে তা উল্লেখ করা হ'ল:

আপেল	(খোলা এবং বীচি থেকে তৈরি জাতের)	২৫ থেকে ৩০ ফুট
"	(বামন জাতের)	১৫ " ১৫ "
"	(বেটনীপুষ্টি বামন জাতের)	২ " ৩ "
		আলাদা ৬ ফুট লাইনে
"	(ঝোপ-পুষ্টি আধাবামন জাতের)	১৫ থেকে ১৮ ফুট
"	(মতিফা রেড লীডার)	১৫ " ২০ "
নাসপাতি	(নাসপাতি জাতীয় ফলের ওপর পিরামিড বেটনীপুষ্টি)	১২ " ১৫ "
"	(বেটনীপুষ্টি বামন জাতের)	২ " ৩ "
		আলাদা ৬ ফুট লাইনে
মিষ্টি চেরি		২৫ থেকে ৩০ ফুট
কিসমিস	(ঝোপ-পুষ্টি)	১৫ " ২০ "
পীচ	(")	২০ " ২৫ "
খুবানি (কুল জাতীয় ফল)		২০ " ২৫ "
স্ট্রবেরি		চারার মধ্যে ১½ ফুট এবং
		লাইনের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি
জাপানী কিসমিস		২২ থেকে ২৫ ফুট
আঁঙুরলতা		৮ " ১০ "

চারা লাগানোর সময়

নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে-কোন সময়েই চারা লাগানো চলে, তবে শরৎকালের আগেই চারা লাগানো শেষ করতে হবে। বসন্তকালে গাছ ভাল-পালা সহ বেড়ে উঠবে। চারা গাছের শিকড় যদি বড় হয় তবে কিছুটা কেটে ফেলে বসানো চলতে

পারে। অবশ্য কোদাল দিয়ে বড় গর্ত ক'রে সম্পূর্ণ শিকড় সমেত গাছও বসানো যায়। চারা বসানোর পরই গোড়ায় ভাল ক'রে জল দিতে হবে যাতে গাছ ভাল ক'রে মাটিতে বসে যেতে পারে। খুঁটি বসিয়ে খুব আস্তে চারাগাছগুলো বেঁধে দিতে হবে যাতে ঝড়ে বা বৃষ্টিবাদলে গাছের কোন ক্ষতি না হয়।

চারা গাছের যত্ন

চারাগাছ লাগানোর পরের দু'তিন বৎসর অত্যন্ত যত্নে গাছগুলোকে রাখতে হবে। গাছগুলো যাতে

সতেজ এবং শক্তিশালী হয় এই দু'তিন বছর তারই তদারক করতে হবে। কুয়াশার এলাকায় যেসর সার দিলে পোকা জন্মায় তা' এই ক' বছর না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। গাছের বৃদ্ধির উপরই ফলের আকার নির্ভর করে। রোগ এবং পোকার হাত থেকে গাছ-গুলোকে সব সময়ই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গাছে

একবার পোকা হলে সেই পোকা ফলেও ছাড়িয়ে পড়তে পারে, সেইজন্য প্রথমেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ এবং উর্বরতা বৃদ্ধি

পাহাড়ী ফলের উৎপাদনে বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের সার। এইসমস্ত সারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেনই এই জাতীয় ফল ফলানোর জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ফসফরাস এবং পটাসিয়ম খুব সামান্য হলেও চলে।

জমির আদ্রতা, গাছের বৃদ্ধি, পাতার রঙ ও আকার, কুয়াশা, বাতাসের আদ্রতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে কতটা সার প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন যদি গাছে কম হয় তবে, পাতাগুলো ছোট এবং হলদে হয়ে যায়। আবার যদি নাইট্রোজেন বেশি হয়ে যায় তবে গাছের গঠন খারাপ হয়ে যায় এবং ফল পাকতেও দেরি হয়। ফসফরাস কম হলে পাতার মধ্যশিরা বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতাগুলি ছাই রঙ হ'তে থাকে এবং গাছের বাড়ও কমে যায়।

পটাসিয়ম কম হলে মধ্যশিরা ছোট হয়ে পাতা কুঁচকে যায় এবং পাতায় ছিটে ছিটে দাগ পড়ে। নাইট্রোজেনী সার মাটির উপর ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়। ফসফরাসী সার মাটির দ্রুত-তিন ইঞ্চি নিচে গাছের চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে হয়। শরৎকালে সার দিলে গাছের বেশি উপকার হয়।

সারের পরিমাণ গাছের বাড় এবং জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। সাধারণ অবস্থায় এক বছরের গাছে ১ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিতে হয়। চার বছরের পুরোনো গাছে দিতে হয় ১ পাউন্ড এবং ১৬ বছরের পুরোনো গাছে ১ পাউন্ড।

পাহাড়ী ফল বিশেষ করে পীচ এবং খুবানি বা কুল জাতীয় ফলের নাইট্রোজেন সারে উৎপাদন বাড়, আকার বড় হয় এবং গাছগুলিও সতেজ হয়।

ছাঁটাই

গাছ ছাঁটাইএর কাজে শিল্প এবং বিজ্ঞান দু'য়েরই সমন্বয় ঘটাতে হয়। গাছ হবে সুন্দর কিন্তু তার কোন ক্ষতি হবে না এমনভাবে গাছ ছাঁটাই করতে হবে।

প্রথম কয়েক বছর গাছ ছাঁটাই করতে হবে এমনভাবে যেন প্রতিটি ডালপালা সতেজ, সহজ ও সোজা ভাবে বাড়তে পারে। ডালপালা বৃদ্ধি পেলে ফলন যেমন বাড়বে তেমনি আবার ডালপালা ঠিকমত ছাঁটাই না করলে ফলনও কমে যায়। গাছ যদি বেশি ঝোপড়া হয়ে যায় তবে রোদবাতাস কম লাগে। তাই গাছ যেন বেশি ঘন ঝোপড়া না হ'তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব গাছ মাচার উপর তুলে দেওয়া হয়, তারও ডালপালা মাঝে মাঝে কেটে দিতে হবে।

ছাঁটাই করার সময়

শরতে পাতা ঝরার শেষে আর বসন্তে নতুন পাতা ও ফুল ফোটার আগে গাছ ছাঁটাই করতে হবে। অনেক সময় বেশি শীতে গাছ ছাঁটাই করলে নতুন পাতা ও ফুল আসতে দেরি হয়। তাই বেশি শীত যেখানে পড়ে, সেখানে কিছুদিন বাদ দিয়ে শীতের শেষে ছাঁটাই করাই বাঞ্ছনীয়।

গ্রীষ্মকালে ছাঁটাই

গাছের আকার কেমন হবে তা ঠিক করে নিয়েই গাছ ছাঁটাই করতে হবে। গাছের আকার নানারূপ হ'তে পারে, ছাড়ানো, ঝোপড়া, মোচাকৃতি প্রভৃতি। চারা লাগানোর সময় যদি বেশি ডালপালা থাকে তবে তা কেটে ফেলাই ভাল। কাশ্মীরের ডালপালা ছাঁটা ৪ থেকে ৪ই ফুট লম্বা শৃঙ্গ কান্ডও বড় করা হয়। কান্ড বড় হয়ে ডালপালা গজালে গাছ বেশ জোরালো হয় আর দেখতেও ভাল হয়।

এই জাতীয় নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী কয়েকটি ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

আপেল

যেসমস্ত নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী ফল আমাদের দেশে জন্মে থাকে তার মধ্যে আপেল অন্যতম। আমাদের দেশে প্রায় ৪০,০০০ একর জমিতে আপেলের চাষ হয়। আরও বেশি জমিতে এর চাষ করা যেতে পারে, কিন্তু আশানুযায়ী আপেলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ পাহাড়ী লোকেরা অত্যন্ত গরিব আর উৎপন্ন ফল চালান দেওয়ার মত ভাল রাস্তাও নেই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে পাহাড়ী অঞ্চলে নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তাতে ফল বাইরে চালান দেওয়ার সুবিধা হবে। আর আপেলের চাষে লাভ বেশি বলে সাধারণ লোকেও এর চাষের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

ইংলন্ড ও আমেরিকা থেকেই আমাদের দেশে আপেলের আমদানি হয়েছে। অবশ্য ‘আম্বীর কাম্বীরী’, কাম্বীরের নিজস্ব ফল। ১৮৮৭ সালে সিমলার নিকট মাহোবাতে আলেকজান্ডার কোর্টসের বাগানে প্রায় একশ’ রকম বিভিন্ন আপেল জন্মাত। পাঞ্জাবের কুলুভালা, সিমলার কোটঘর এবং উত্তর-পশ্চিমের কুমানোনে বিদেশীরা আপেল চাষের পত্তন করেছিলেন।

হিমাচল প্রদেশের ‘রেড ডেলিসাস’, ‘নিউটন ওআন্ডার’, কাম্বীরের আম্বীর কাম্বীরী, হোয়াইট ডটেড্‌রেড, পেপসডুর লেডিসডুডেলে, রোমবিউটি, কুমায়ুন পাহাড়ের ‘উইন্টার ব্যানানা’, কুলুভালীর ইয়েলো নিউটন, গোল্ডেন ডেলিসাস এবং নীল-গিরি রোমবিউটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন জাত

আম্বীর কাম্বীরী: বিশেষভাবে কাম্বীরেই এই জাতীয় আপেল জন্মে থাকে। মাঝারি ধরনের, হলদে রঙ, মসৃণ নরম এই আপেল। এই আপেলের ভেতর সাদা, মাংসল, রসাল এবং জন্মেও অনেক। প্রায় সারা বছরই এই ধরনের আপেল জন্মে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই আপেল তোলা আরম্ভ হয়, এবং এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া যায়

রোমবিউটি: এই জাতীয় আপেল বেশ বড় এবং গোল হয়। রঙ হলদে, জাত ভাল, ফলেও বেশ। সেপ্টেম্বরে পাকতে আরম্ভ করে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আপেল পাওয়া যায়।

উইন্টার ব্যানানা: এই জাতীয় আপেল বেশ বড়, রঙ একটু ফ্যাকাশে হলদে। নরম, মাংসল এবং সুন্দর একটা গন্ধও আছে। নরম জাতের বলে, চালান দেওয়ার পক্ষে এই জাতীয় আপেল বিশেষ সুবিধার নয়। সেপ্টেম্বর থেকে নবেম্বর পর্যন্ত এই আপেল পাওয়া যায়।

ইয়েলো নিউটন: এই আপেল একটু চ্যাপ্টা এবং বড়। রঙ হলদে, তার মধ্যে লাল ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। এই জাতীয় আপেল বেশ শক্ত এবং রসাল। চালান দেওয়ার পক্ষে এবং রান্নার পক্ষে এই আপেল অত্যন্ত উপযোগী।

চারা লাগানো:

এক বছরের পুরানো চারাই রোপণ করা সুবিধাজনক। কারণ এরকম গাছকে যে-কোন আকারই দেওয়া যায়। যে-কোন সময়ই চারা লাগানো যায়, তবে বেশি শীতে চারা না লাগানোই ভাল, কারণ তত্বে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

ছাঁটাই

নতুন গাছ ছাঁটাই: প্রথমবার—নতুন গাছ ছাঁটাই করার সময় সতর্ক হ’তে হবে। গাছের আকার কেমন হবে এই সময়ই স্থির করতে হবে।

ফলন্ত গাছ ছাঁটাই: ফলন্ত গাছ ছাঁটাই করার উপর ফলনের কমবেশি অনেকটা নির্ভর করে। অনেক সময় ছাঁটাই ভাল না হলে, ফল হয়তো পরিমাণে বেশি ফলে, কিন্তু আকার ছোট হয়ে যায়। লম্বায় বেশি বড় হ’তে না দিয়ে গাছকে ছড়িয়ে দিতে হবে চরদিকে। তবে বেশি ঝোপড়া হয়ে রোদ-বাতাস না আটকায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রতি বছর যদি গাছ ৯ ইঞ্চি ক’রে বাড়ে এবং ফলনও

ভাল হয় তবে বদ্বাতে হবে গাছের বৃদ্ধি সামঞ্জস্য-পূর্ণ হচ্ছে।

পুরানো গাছ ছাঁটাইঃ গাছ যদি পুরানো হয়ে, অনেক ফল জন্মে এবং ফলের আকার ছোট হয়ে যায়,—তবে প্রায়ই সেই গাছ ছেঁটে দিতে হবে। পুরানো গাছ বার বার ছাঁটলে ফলন ভাল হয় এবং ফলের আকারও বড় হয়। ছাঁটাই করতে গিয়ে গাছের গায়ে যেসব ক্ষত হয় সেসব জায়গায় যাতে পোকা বা রোগের সংক্রমণ না হয়, তার জন্য বোর্ডো-মিশ্রণ বা তিসির তেল প্রয়োগ করা দরকার।

সার দেওয়া

মাটির গুণাগণ, আবহাওয়া এবং গাছের বয়সের উপর সার কী পরিমাণে দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে। সাধারণ অবস্থায় ১ বছরের গাছের পক্ষে ৬ পাউন্ড নাইট্রোজেন প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে। সুপার ফসফেট এবং পটাশও প্রয়োজনে দেওয়া যেতে পারে।

ফলও মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়

অনেক ফলন হলে ফলের আকার এবং রঙ নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফলন বেশি হলে প্রথমেই কিছু কিছু ফল ফেলে দিতে হবে। তাতে ফলের রঙ এবং আকার দুই-ই ভাল হবে।

ফল তোলা, চালান আর বিক্রি

কোন সময় ফল তুলতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যদি একটু আগে আপেল তোলা হয়ে যায় তবে তার আর কোন গুণই থাকে না, রঙ এবং চামড়া কুঁচকে আকারও নষ্ট হয়ে যায়। যদি দূরে চালান দিতে হয় তবে সুপারিপক্ব হলেই চালান দিতে হবে। যদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে হয় তবে একেবারে পেকে গেলেই গাছ থেকে তোলা ভাল।

আপেল পেকে গেলে সহজেই বোঁটা থেকে খুলে আসে এবং রঙেরও পরিবর্তন হয়। স্বাদ যখন ভাল হয় এবং সবুজ রঙ যখন হলেই হয়ে যায় তখনই

আপেল তোলার উপযুক্ত সময়। আপেলগুদুলি এই সময় মাংসলও হয় এবং কোন টক স্বাদও থাকে না।

আপেল তোলার সময় অত্যন্ত সতর্ক হ'তে হবে। বেশি চাপ লাগলে বা তোলার সময় মাটিতে পড়ে গেলে আপেল নষ্ট হয়ে যাবে। এক হাতে ধরে অন্য হাতে বোঁটা থেকে আপেল ছাড়িয়ে নিতে হবে।

বিদেশে চালান দেবার সময় পাতলা কাগজে প্রতিটি ফল মড়ুে আপেল চালান দিতে হবে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১১ ইঞ্চি চওড়া এবং ১০ই ইঞ্চি গভীর বাক্সে ৪৮ পাউন্ডের মত আপেল চালান দেওয়া যেতে পারে।

নাসপাতি

আপেলের চাষের সঙ্গেই আমাদের দেশে নাসপাতির চাষ আরম্ভ হয়েছে। সিমলাতে মিঃ আলেকজান্ডার কোটাস্ তাঁর বাগানে প্রায় ৯০ রকম নাসপাতির চাষ করেছিলেন। 'কুলুভালীতে'ও নানা জাতীয় নাসপাতির চাষের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমেরিকাতে আমাদের দেশের মত জলহাওয়াতেই নাসপাতি এত বেশি জন্মায় যে, মাঝে মাঝে এর চাষ কমিয়ে দিতে হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফলচাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জাতের ফল

ফলন বাড়ানোর জন্য নাসপাতি-চাষীরা এ দেশে নানা ধরনের নাসপাতির চাষ করছে। পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতেই নাসপাতি জন্মে থাকে। বাগদুঘোষা, উইন্টার নেলিস, টমসন্, ক্লাভস্-ফেভারেইট প্রভৃতি নানা ধরনের নাসপাতি এদেশে জন্মে থাকে।

বাগদুঘোষা

কাশ্মীরে এই জাতীয় নাসপাতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। ফল মাঝারি ধরনের গোল মসৃণ এবং রঙটা একটু সবজে ধরনের হলে। 'বাগদুঘোষা'

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

নাসপাতি বেশ রসাল এবং মাংসল। জুলাইএর মাঝামাঝি এই ফল তুলতে হয়।

উইন্টার নেলিস

আমাদের দেশের 'উইন্টার নেলিস্' বেলজিয়ান জাতীয় নাসপাতির মত। এই ফল মাঝারি ধরনের গোল, মাংসল এবং রসাল। রঙ হলদে, ফলন খুব বেশি এবং এর চাষও সহজেই করা যায়। জুলাইএর শেষের দিকে এই জাতীয় ফল তুলতে হয়, কিন্তু ডিসেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত এই ফল রাখা চলে।

টমসন্স

এই জাতীয় ফল মাঝারি ধরনের, মাংসল এবং রসাল হয়ে থাকে। এর চাষও সহজ আর ফলনও প্রচুর। টমসন্স নাসপাতির বিশেষত্বই হল এই জাতীয় ফলে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ আছে। জুলাই-এর মাঝামাঝি এই ফল তুলতে হয়।

এইসব নানা জাতীয় নাসপাতি আমাদের দেশে জন্মে থাকে।

গাছ জন্মানো

ব্যবসায়ী ভিত্তিতে বীজ থেকে নাসপাতির চাষ করা যায়। অথবা পুরোনো গাছের গোড়া থেকে শিকড় সুস্থ ভাল কেটে নিয়েও এই গাছ জন্মানো চলে।

রোপণ

এক বছরের ছোট নাসপাতির চারা লাগানোই সব-চাইতে ভাল। শরতে এই গাছ রোপণ করতে হয়। বসন্তের আগেই গাছ পুষ্ট হয়ে ওঠে।

ছাঁটাই

আপেলের চেয়ে নাসপাতির গাছ অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ে। ছাঁটাই না করলে এই গাছ বিরাট হয়ে ওঠে। গাছ ঝোপড়া হবে, কি লম্বা ধরনের হবে কিংবা বেঁটে হবে তা ঠিক করে নিয়ে প্রথম থেকেই ছাঁটাই আরম্ভ করতে হবে। গাছ বড় হলে এবং ফল হ'তে

আরম্ভ করলে, গাছে যাতে রোদ-বাতাস লাগে তার জন্য মধ্যে মধ্যে গাছ ছেঁটে দিতে হবে। অনেক সময় ডাল ছাঁটাইএর ফলে ফলন দ্বিগুণও হয়ে যায়।

সার

নাসপাতি আর আপেল সারপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রায় একই রকম। নাসপাতির বেলা নাইট্রোজেন একটু বেশি দিতে হয়।

ফল কমিয়ে দিলেও ফলন বাড়ে

সধারণত দেখা যায়, এক বছর খুব বেশি ফলন হলে পরের বছর ফলন কমে যায়। অনেক সময় দেখা গেছে, বেশি ফলন হলে ফলের আকারও ছোট হয়ে যায়। তাই খুব বেশি ফলন হলে, ফল ছোট থাকতেই কিছু কিছু কমিয়ে দেওয়া ভাল,—এতে ফলের আকারও ভাল হয় আর প্রতি বছরই সম-পরিমাণে ফলন হয়।

ফল পাকা ও তোলা

নাসপাতি ভাল করে পাকা এবং সময়মত তোলার উপর তার ভাল-মন্দ অনেক কিছু নির্ভর করে। যেসমস্ত নাসপাতিগাছ আগে লাগানো হয়ে থাকে সেগুলোর ফলও বেশ সবুজ এবং শক্ত থাকতেই তুলতে হয়। কোন কোন জাতীয় ফলের, বিশেষ করে যেগুলো দেরিতে ফলে সেগুলোর রঙ হলদে হলেই তোলা ভাল। তাজা থাকতেই বিদেশে চালান দেওয়া উচিত।

নাসপাতি আপেল থেকে একটু বেশি গরমে পাকে। ঘরের মধ্যে ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিলে এই ফল অনেকদিন তাজা থাকে।

চেরি

চেরি ফল দুই রকমের মিষ্টি এবং টক। মিষ্টি চেরি এমনি খাওয়া হয় আর টক চেরি রান্না করে খাওয়া হয়। সিমলা পাহাড়ে, কুলুভ্যালী এবং কাশ্মীরে মিষ্টি চেরি প্রচুর পরিমাণে জন্মানোর চেষ্টা চলেছে। এই প্রচেষ্টা সার্থকই হয়েছে। আমাদের

দেশের আবহাওয়াতে এখন প্রচুর পরিমাণে চেরি জন্মাচ্ছে। আরলী রিভার্স, গভর্নর উড, এলটন প্রভৃতি নানা জাতীয় চেরি আমাদের দেশে জন্মায়।

আরলী রিভার্স

এই জাতীয় চেরি বেশ বড়, কালো, মাংসল এবং সুগন্ধ হয়ে থাকে। এই জাতীয় চেরিই সবচাইতে ভাল জাতের। বীচি ছোট, খেতেও সুস্বাদু। মে মাসের প্রথম দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

গভর্নর উড

ফল বেশ বড়, রঙ একটু লালচে হলদে, রসাল, মাংসল, সুগন্ধ আর খেতেও সুস্বাদু। মে মাসেই এই জাতীয় চেরি পাকতে আরম্ভ করে।

এলটন

এই ফলগুলো একটু লম্বা, খোসা লাল। মাংসল, রসাল, সুগন্ধ, খেতেও সুস্বাদু। মে মাসের প্রথম দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

গাছ জন্মানো

কলম ক'রে অথবা বীজ থেকেও চেরির গাছ করা যায়। জানুয়ারি মাসেই সাধারণত কলম করা হয়ে থাকে। দুই বছরের মধ্যে এই চারা তুলে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় একবারেই কলম লাগানো হয়, তুলে আর নতুন ক'রে লাগাতে হয় না।

চেরি গাছ রোপণের স্থান নির্বাচন ব্যাপারে সতর্ক হ'তে হবে। চেরি গাছ প্রায়ই কুয়াশা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সব সময় রোদ লাগে এমন জায়গাতেই চেরি গাছ লাগানো উচিত। চেরি গাছ সাধারণত বেশ বড় হয় এবং প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট দূরে দূরে চেরি গাছ লাগাতে হয়।

ছাঁটাই

চেরি গাছ নিজ থেকেই বাড়ে, বেশি ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য গাছ যদি বেশি ঝোপড়া

হয়ে ওঠে, তবে মাঝে মাঝে ডাল কেটে পাতলা ক'রে দিতে হবে। কাটা জয়াগাগুলোতে আলকাতরা দিয়ে দিতে হবে যাতে ছত্রাক না জন্মাতে পারে।

ফল তোলা

ফলগুলো পেকে গেলে তারপর তুলতে হয় এবং ভাল ক'রে শুকিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিতে হয়। বিশেষ ধরনে তৈরি বাক্সে এই ফল চালান দেওয়া হয় যাতে কোন রকমে ঠান্ডা লেগে ফল নষ্ট না হয়।

পীচ

অবিভক্ত ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সবচাইতে বেশি পীচ জন্মাত। বর্তমানেও বেশির ভাগ পীচই সেই অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হিমালয় অঞ্চলে পীচের চাষ বৃদ্ধির জন্য নানা রকম চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ফলও ভাল হয়েছে।

আরলী বিটরাইস, আলেকজেন্ডার, ট্রাম্প প্রভৃতি নানা জাতীয় পীচ এদেশে জন্মে থাকে।

আরলী বিটরাইস

এই জাতীয় ফল আকারে ছোট কিন্তু খেতে সুস্বাদু, মাংসল এবং রসাল। সহজেই এই ফল ঝেঁটে জন্মে।

আলেকজেন্ডার

এই জাতীয় ফল বেশ বড়, গোল। ভেতরের খোসাটা একটু সবজে সাদা, কিন্তু বাইরের খোসার রঙটা লাল। ভেতরের অংশ দেখতে একবারে সাদা, কিন্তু খেতে সুস্বাদু ও রসাল।

ট্রাম্প

এই জাতীয় ফল একবারে হলদে। জাতে খুব ভাল। রসাল এবং সুস্বাদু।

গাছ জন্মানো

ব্যবসায়ী চাষে বীজ থেকেই পীচের গাছ করা হয়ে থাকে। আলো-বাতাসযুক্ত স্থান এবং জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত আছে এমন জায়গাতেই পীচ ভাল জন্মায়।

রোপণ

অন্যান্য ফলের মত পীচের চারা শরৎকালে রোপণ না করে বসন্তের প্রথমে রোপণ করাই ভাল।

চারাগাছ ছাঁটাই

গাছ ছোট থাকতেই ছাঁটাই আরম্ভ করা ভাল, কারণ তাতে গাছের জোর বাড়ে। দুই-তিন ফুট হলে সেই গাছে তিন-চারটি ডাল রাখা ভাল। এই তিন-চারটি ডাল ছাড়া আর যে অন্যান্য ডাল বের হবে তা গ্রীষ্মের সময়ই কেটে ফেলতে হবে।

ফলন্ত গাছ ছাঁটাই

ফলনের শেষে প্রত্যেক পীচ গাছেরই ছাঁটাই প্রয়োজন। গাছ বেশি ঘোপড়া হয়ে গেলে, ফলের আকার ছোট হয়, রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছে ছত্রাক রোগও দেখা দেয়। তাই দুই-তিন বছরের পুরোনো ডাল কিছু কিছু কেটে ফেলতে হয়।

চাষ

ডাল ফল পেতে হলে ডাল করে চাষও করতে হবে। গাছ লাগানোর গর্ত ঠিক করে নিতে হবে। মাটি যেন চার ইঞ্চির বেশি গভীর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ মাটি বেশি গভীর হলে শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। শীতের প্রথম থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত পীচের চাষ হয়।

ফল কমানো এবং তোলা

ফলন বেশি হলে মাঝে মাঝে ফল কমিয়েও দিতে হয়, তা না হলে ফলের আকার ছোট হয়ে যায় এবং স্বাদও ভাল হয় না। মে-জুনে যখন সাধারণ ফল

পড়া শেষ হয়ে যায়, তখনই যা ফল থাকে, তা থেকে আরও কিছু কিছু কমিয়ে দিতে হবে।

পীচ পেকে গেলে খুব তাড়াতাড়ি তোলা উচিত, তা না হলে পাকা পীচ মাটিতে পড়ে অনেক লোকসান হয়। শক্ত থাকতেই পীচ তুলতে হয়, দুই একদিন ঘরে রেখে দিলেই পেকে যায়।

কিসমিস

হিমালয়ে নানা রকম কিসমিস চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসমস্ত নানা জাতীয় কিসমিস ইউরোপ এবং জাপানে উৎপন্ন কিসমিসের সঙ্গে তুলনীয়। গ্র্যান্ড ডিউক, ভিক্টোরিয়া, সান্তারোসা, বিউটি প্রভৃতি নানা জাতীয় কিসমিস জন্মে।

গ্র্যান্ড ডিউকঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড়, মসৃণ এবং উপরের দিকটা একটু ছড়ানো। সুস্বাদু এবং প্রচুর জন্মে। রান্নার পক্ষে এবং আচার করার পক্ষে এই জাতীয় কিসমিস বেশ ভাল। অগাস্টের শেষের দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

ভিক্টোরিয়াঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড় এবং গোল। ফলন ভাল, খোসা গাঢ় লাল। রান্না, আচার এবং শুকিয়ে রাখার পক্ষে এই কিসমিস খুবই ভাল।

সান্তারোসাঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড়, মাংসল, রসাল এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। জন্মেও প্রচুর এবং প্রতি বছর প্রায় সম-পরিমাণেই জন্মে থাকে। জুলাইতে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

বিউটিঃ মাঝারি ধরনের, রসাল এবং মাংসল এই জাতীয় ফল। রঙ গাঢ় লাল। প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুলাইতে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

চারাগাছ ছাঁটাই

চারা লাগানোর সময়ই, গাছের ডালপালা কমিয়ে দিতে হবে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জোরালো ডাল ছাড়া আর সব কেটে ফেলাই ভাল। প্রথম শীতে যে ডাল কাটা হল, দ্বিতীয় শীতে সেইগুলি না কেটে অন্য ডালগুলি কাটতে হবে। এইভাবে এক বছর

বাদ দিয়ে ডাল কাটলে সেই ডালগুলিতে ফল ভাল হয়।

ফলন্ত গাছ ছাঁটাই

গাছ ছাঁটাইএর উপর কিসমিসের ফলন ও আকার অনেকাংশে নির্ভর করে। যদি মাঝে মাঝে গাছ ছেঁটে না দেওয়া হয় তবে নতুন ডালও হয় না, ফলে ফলনও ভাল হয় না। ছাঁটাইএর ফলে প্রতি বছর ১২ থেকে ২০ ইঞ্চি গাছের বৃদ্ধি হয়। জাপানে ইউরোপ থেকে বেশি কিসমিস জন্মে থাকে, তাই জাপানে গাছ ছাঁটাইও হয় ঘন ঘন।

ফল কমানো ও তোলা

গাছ ছেঁটে ফেলে যেমন ফলন বাড়ানো যায় তেমনি ফল কিছু কমিয়ে দিলেও ফলের আকার এবং ফলনও বাড়ে। ইউরোপে যে কিসমিস জন্মে তার ফল বিশেষ না কমিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জাপানী কিসমিসের ফসল বাড়ানোর জন্য ফলন মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়। জাপানী কিসমিসের মধ্যে 'বিউটী' জাতীয় কিসমিসের ফল কমিয়ে দেওয়া খুবই দরকার হয়, কিন্তু 'সান্তারোসা' এর বেলায় ততটা নয়। এপ্রিল এবং মে মাসে যখন নিজের থেকেই ফল কিছু পড়ে যায়, তারপর প্রয়োজন হলে আরও কিছু ফল কমিয়ে দিতে হয়।

কিসমিস গাছেই পাকে। তবে অনেক দূরে যদি পাঠাতে হয়, তবে কদিন আগে তোলাই ভাল, তা হলে ফলের রঙ এবং আকারও নষ্ট হয় না। রঙের পরিবর্তন থেকেই ফল পেকেছে কিনা বোঝা যায়। দু-তিনবার এই ফল তুলতে হয়, কারণ এই ফল সবগুলি একবারে পাকে না।

দূরদেশে পাঠাতে হলে খুব নরম কিছু আগে বাস্কে পেতে নিতে হবে। ফলগুলি যাতে যাতায়াতের ফলে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাস্কে প্যাক করার আগে রঙ ও আকার অনুযায়ী কিসমিস-গুলি বেছে নিতে হবে। ২০ ইঞ্চি×১১ ইঞ্চি×৪

ইঞ্চি একটি বাস্কে ২৫ পাউন্ড কিসমিস চালান দেওয়া যায়।

জাপানী কিসমিস

জাপানী কিসমিস সাধারণত ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার ফুট উঁচুতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। খুব ভাল করে যদি না পাকে তবে এই ফল সাধারণত একটু কুঁকড়ে যায়। এই কোঁকড়ানো ভাব ছাড়ানোর জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়। যেমন, ১০ থেকে ১৫ দিন মদের ভাপে রেখে দিলে এবং যে আবহাওয়াতে কার্বন অক্সাইড খুব বেশি তেমন তাতে রাখলেও এই কোঁকড়ানো ভাব কমে যায়। কিন্তু এই রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করার পর যদি এই ফল প্যাক করে বিদেশে চালান দেওয়া হয় তবে ফলগুলি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্থানীয় খুচরো বিক্রেতারা এই রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। আমাদের দেশে কুলুভ্যালাতে ফদর, হাচিয়া, হাকুসি প্রভৃতি নানা জাতীয় কিসমিস জন্মে থাকে।

খুবানী (কুল জাতীয় ফল)

(এপ্রিকট্)

সিমলা পাহাড়ে 'খুবানী'র চাষ প্রচুর পরিমাণে করা হয়ে থাকে। 'খুবানী'র তেলও লোকে ব্যবহার করে। যদি ভাল জাতের না হয় তবে এই ফল শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্যও জমিয়ে রাখা হয়। সিমলে আরলি, রয়েল, নিউ ক্যাসেল প্রভৃতি নানা জাতীয় খুবানী আমাদের দেশে জন্মে থাকে।

সিমলে আরলি: মধ্যম আকার, গোল এবং রসাল। এই ফলের রঙ সাধারণত একটু সাদাটে হলদে হয়ে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।

রয়েল: এই জাতীয় ফলগুলো বেশ বড়, গোল, রঙটা একটু লালচে হসদে। এই জাতীয় ফল খেতে সুস্বাদু, আচার করা এবং শুকিয়ে রাখার পক্ষেও উপযোগী।

চাষ

বীজ থেকে অথবা কলম করেও খুবানীর চাষ করা যায়। সাধারণত একটু কাদামাটিতে খুবানীর চারা রোপণ করতে হয়।

ছাঁটাই

গাছ ছোট থাকা কালেই মূল কাণ্ডটি রেখে অন্যান্য ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে। যখন মূল কাণ্ডটি ২০ থেকে ৩০ ইঞ্চি বড় হবে তখন অন্যান্য ডাল-গুলি বড় হলে গাছের জোর বাড়ে এবং আকৃতিও ভাল হয়। প্রথম যখন গাছ বেড়ে ওঠে তখনই ছাঁটাই করতে হয় এবং এই ছাঁটাইএর উপরই গাছের আকৃতি এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে।

প্রতি বছর ফলনের শেষে পুরোনো বড় গাছও ছেঁটে দিতে হয়। গাছ ছাঁটার পর যে নতুন ডাল বের হয় তাতে ফল এবং ফলন দুই-ই ভাল হয়।

ফল তোলা

খুবানী পাকতে আরম্ভ করলেই এর রঙ অন্য রকম হয়ে যায়। ফলগুলি বেশ পেকে গেলেই শুকানোর জন্য তোলা হয়। অনেক সময় নিচে কাপড় পেতে গাছে ঝাঁকুনি দিয়ে খুবানী পাড়া হয়। কিন্তু এইভাবে ফল সংগ্রহ করলে অনেক ফল নষ্ট হয়, কাজেই এভাবে ফল না পাড়াই ভাল।

স্ট্রবেরি

বন্য স্ট্রবেরি হিমালয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কিন্তু এই জাতীয় স্ট্রবেরি জাতে তত ভাল নয়। আমাদের দেশে সমতল ভূমিতেই স্ট্রবেরি জন্মে। পাহাড়ী স্ট্রবেরি আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছে।

গাছ জন্মানো

পুরোনো চারা রোপণ না করাই ভাল। মাঝারি গাছ—যার বেশি ডালপালা হয় নি—লাগানোই ভাল। চারা রোপণ করার সময় দুটি গাছের দূরত্ব রাখতে

হবে ১ই ফুট, আর দুই লাইনের মধ্যে ফাঁক রাখতে হবে ৩০ থেকে ৪০ ইঞ্চি।

জমি তৈরি

স্ট্রবেরি লাগাতে হলে জমি খুব ভাল করে কোদাল দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। চারা বসানোর আগেই জমিতে সার দিয়ে নিতে হবে। একটু ভেজা এবং ভারি মাটিতেই স্ট্রবেরির চাষ করতে হয়।

রোপণ

পাহাড়ী অঞ্চলে মার্চ-এপ্রিল মাসেই চারা রোপণ করা হয়ে থাকে, তবে স্ট্রবেরির চারা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লাগানোই ভাল। তাতে চারাগুলো বেশি তাজা হয়, এবং গড়নও ভাল হয়।

ফল তোলা

স্ট্রবেরি যখন সম্পূর্ণ পেকে গাছেই শুকোতে আরম্ভ করে তখন এই ফল তুলতে হয়।

আঙুর

আমাদের দেশে ১৯২৮ সালে আঙুর চাষের বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত লায়ালপুরে ১১২ রকমের আঙুর জন্মেছিল। আঙুরের চাষ যে-কোন অবস্থাতেই করা যায়। আমাদের দেশে হিমাচল প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ এবং দক্ষিণের বোম্বাই রাজ্যে আঙুর প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমাদের দেশে যে আঙুরের আমদানি হয়, তার চাইতে ভারতে উৎপন্ন আঙুরের জাত নিকৃষ্ট।

উত্তরাঞ্চলে জন্মে থাকেঃ—ব্রাক প্রিন্স, বেদানা, ফস্টার সিডলিং, ডাক, মাসকাট, অফ, আলেক-জান্দ্রিয়া। শর্ক নাতিশীতোষ অঞ্চলে জন্মে, টমসন সীডলেস, সুলতানা, কিসমিস হোয়াইট। দক্ষিণাঞ্চলে জন্মে—বাংলার রু, বোকারি, পাকদী, আশ্বীসাহী।

বিভিন্ন জাত

ব্ল্যাক প্রিন্স: থোকাগদুলো বেশ বড়, লম্বা আর পিরামিডের মত হয়। ফলগদুলো মাঝারি ধরনের বড় রসাল এবং মাংসল। জাতে ভাল, খেতেও সুস্বাদু। জুন-জুলাই-এর শেষের দিকে এই আঙুর তুলতে হয়।

বেদানা: থোকাগদুলো বেশ বড় এবং বাঁধনিও ভাল। খোসা বেশ নরম, রঙ হলদে সুগন্ধ। জুন-জুলাই-এর মাঝামাঝি এই জাতীয় আঙুর পাকতে আরম্ভ করে।

বোকারী: এই জাতীয় আঙুরের থোকাগদুলো বেশ বড়, জাতও বেশ ভাল। কিন্তু মিষ্টত্ব একটু কম।

গাছ জন্মানো

কলম ক'রেই আঙুরের বংশবিস্তার করা হয়। এক বছরের পুরানো ডাল থেকেই সাধারণত কলম করা হয়ে থাকে। মাঝারি ধরনের মোটা ডাল ৯ থেকে ১২ ইঞ্চির মধ্যে কেটে নিতে হবে। ডালগুলি কেটে প্রায় ১ মাস ভিজ়ে বালিতে রেখে দিতে হবে। তারপর ২ই থেকে ৩ ফুট দূরে দূরে ডালগুলি বসিয়ে দিতে হবে। উইপোকা ও বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে এইসমস্ত চারাগাছ রক্ষা করতে হবে। এক বছরের পুরানো চরাই রোপণ করা ভাল।

রোপণ

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই আঙুরের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। দুই গাছের মধ্যে ৮ ফুট এবং দুই লাইনের মধ্যে ১০ ফুট ফাঁক রেখে আঙুরের চারা লাগাতে হবে। যখন খুব বেশি ঝোপড়া গাছ করা হয় তখন মাঝে মাঝে ২০ ফুট জায়গাও বাদ দেওয়া যেতে পারে। বোম্বাইতে ৩ থেকে ৩ই ফুট ফাঁক দিয়ে গাছ লাগানো হয়, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ ওখানে আঙুরলতাকে মাচায় তুলে দেওয়া হয়।

তদারকি

আঙুরগাছের দেখাশুনা ও তাকে বড় করার জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। হেড-সিসটেম, কেইন সিসটেম ও ইউনিলেটারেল করডন সিসটেম—এই তিনটি পদ্ধতিই আঙুরগাছের লালন-পালনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা স্থির করা হয়েছে।

হেড সিসটেম

আঙুরের চারা লাগানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক হ'তে হবে। দুই-একটি কুঁড়ি রেখে অন্যান্য সমস্ত কুঁড়ি ও ডাল কেটে ফেলতে হবে। নতুন ডালের কুঁড়ি বের হওয়া মাত্রই সেগুলি ফেলে দিতে হবে। জুলাই মাসে ৩ থেকে ৩ই ফুট রেখে আর সব কেটে ফেলতে হবে। এই ছাঁটাইএর ফলে গাছ জোরালো হয়ে উঠবে এবং ডিসেম্বরেই বেশ ডালপালা বের হবে। এইভাবে ক্রমে নিচের ডালগুলি কেটে কেটে দিলে মাথার দিকটাতে বেশি ডালপালা বের হবে এবং গাছও ঝোপড়া হয়ে উঠবে।

কেইন সিসটেম

হেড সিসটেমের মতই এই কেইন সিসটেমের গাছকে ছাঁটাই করতে হয়। কিছু দূর লতা উঠে গেলে তারপর দু'দিকে তিনটি ক'রে ডাল বাড়তে দেওয়া হবে। ছাঁটাইএর সময় পুরানো ডালগুলি কেটে ফেলতে হবে। যেসমস্ত নতুন ডালের কুঁড়ি বের হ'বে সেগুলি সব না রেখে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ফেলে দিতে হবে।

করডন সিসটেম

এই প্রথায় গাছগুলিকে সোজা বাড়তে দেওয়া হয় না। লতার মত শূন্যে চারিদিকেই ডালপালা বাড়তে দেওয়া হয়। এতে গাছের বিস্তার ঘটে অনেকদূর পর্যন্ত। ফলে হেড সিসটেম ও কেইন সিসটেম থেকে এই করডন সিসটেমে অনেক বেশি আঙুর জন্মায়।

ছাঁটাই-এর সময়

পাতা ঝরে যাওয়ার পর এবং বসন্তের আগমনের আগে আঙুরলতা ছাঁটতে হয়। যেখানে শীত কম সেখানে শীতের মধ্যেও ছাঁটাই করা যেতে পারে, কিন্তু যেখানে শীত বেশি সেখানে শীতের শেষেই আঙুরলতা ছাঁটাই করা ভাল।

সেচ ও সার

গাছ ও ফল বৃদ্ধির সময় যদি আবহাওয়া আর্দ্র না হয় তবে ফল এবং গাছ কোনটাই ভাল বাড়তে পারে না। ফল পাকার সময়ও যদি বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে তবে ফল পাকতেও বেশি সময় লাগে। তাই আঙুরলতা লাগানোর পর থেকেই সেচের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। চারা থেকে ফলন শেষ হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত জলসেচ করতে হবে। ফলনের শেষে বসন্তের আগমন পর্যন্ত সেচ একটু কম হলেও চলে।

আঙুর জন্মানোর জন্য খইল ও সবুজসারের বিশেষ প্রয়োজন। লতা ছেঁটে ফেলার পরই জমিতে সার দেওয়া হয়, এতে গাছগুলো শক্ত হয় এবং ফলনও ভাল হয়। প্রতি একরে একমণ অ্যামোনিয়ম সালফেট সার হিসাবে আঙুরক্ষেতে দেওয়া যায়। বাতাস ও ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে আঙুরলতাগুলি বেঁধে দিতে হয়। তাতে গাছের জোর বাড়ে আর ফলনও ভাল হয়।

ফল-ফুল মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়

আঙুরগাছের ফুল এবং ফল যা সাধারণভাবে ফলে তাও মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়। এই ফুল-ফল ছাঁটাইএর উদ্দেশ্য তিনটিঃ—(ক) ফলের আকার বড় করা, (খ) তাড়াতাড়ি বড় করা এবং (গ) ভাল থোকা জন্মানো।

ফুল যদি খুব বেশি রকম ফোটে তাতে ফলের আকার ছোট হয়ে যায়। তাই বেশি ফুল ফুটলে কিছু কমিয়ে দিতে হয়।

আবার যখন ফল দেখা দেয় তখনও যদি কিছু ফল কমিয়ে দেওয়া হয় তবে ফলের আকার বড় এবং স্বাদ ভাল হয়। একটি থোকায় যদি বেশি আঙুর জন্মে তবে দেখা যায় সাধারণত সেই ফল বিশেষ বড় হয় না। তাই অনেক সময় একই থোকায় বেশি ফল হলে, ছোট থাকতেই তার থেকে কিছু কিছু ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

আঙুর তোলা এবং বিক্রি করা

সব থোকায় আঙুর একই সময় পাকে না। তাই দু-তিন সপ্তাহ ধরে আঙুর তোলা হয়। খুব সতর্ক হয়ে কাঁচ দিয়ে থোকাগুলো কেটে আঙুর তুলতে হয়। খুব আস্তে আস্তে ঝড়িতে আঙুরের থোকাগুলি রাখতে হয়। তোলা আঙুরে যেন রোদ বা ঝাঁকুনি না লাগে।

বিক্রির সময়ও সতর্ক হয়ে আঙুরের থোকা নাড়াচাড়া করতে হয়। দূরে পাঠাতে হলে শুকনো ঘাসে জড়িয়ে বাস্ত্রে নরম কিছু পেতে পাঠাতে হবে, যাতে ফলগুলি ঝাঁকুনি লেগে নষ্ট না হয়।

রোগ ও পোকা

শর্শুরো পোকা

যেখানে আপেল জন্মায় সেই স্থানে এই পোকায় প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। জুলাই-অগাস্ট মাসে পাখাওয়ালা শর্শুরোপোকা দেখা যায়। এই জাতীয় পোকা প্রথমত গাছের কিছুটা অংশে এবং শিকড়ে আক্রমণ করে। বসন্তকালে শর্শুরোপোকা যখন প্রথম দেখা দেয় তখন সেই স্থানে যদি রজন ছিটিয়ে দেওয়া হয় তবে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা ছিটানো ওষুধ তৈরি করে নিতে হবেঃ

নিকোটিন—১০ থেকে ১৫ শতাংশ—৮ আউন্স

লাইম সালফার—১ গ্যালন।

উয়েটার—৬ আউন্স

জল—১৯ গ্যালন।

পোকা মারার জন্য গাছের চারিদিকে চার ইঞ্চি গভীর করে প্যারা-ডিসলোর বেনজিন ছিড়িয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

সান জস্ ফেল

কাশ্মীর এবং কুলু ভ্যালীর আপেলগাছে এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যেসব গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয় সেসব গাছ ছাই-রঙের এক রকম গন্ধুড়োতে ছেয়ে যায়। এই রোগের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করতে হলে নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ডিজেল তেল ও সের মাছের তেল ২ সের এবং ১৪ সের জল মিলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আপেল রুট ব্রোওয়ার

আলমোড়া ও উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল জেলায় এই রোগের বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়। এই পোকা যদি বড় গাছ আক্রমণ করে, তবে গাছের জোর কমে যায়, ছোট গাছ অনেক সময় মরেও যায়। বর্ষাকালেই এই পোকা ডিম পাড়তে আরম্ভ করে এবং এক মাসের মধ্যেই বেশ বড় হয়ে যায়। তিন ইঞ্চি গর্ত করে প্যারা-ডিসলোর বেনজিন ছিড়িয়ে দিলে এই পোকার হাত থেকে গাছ রক্ষা করা যায়।

হেমারী ক্যাটারপিলার

এই জাতীয় পোকা আপেল, আঙুর, খুবানী প্রভৃতি গাছেই বাসা করে। প্রথমে গাছের পাতার পিছনের দিকে এই পোকা ডিম পাড়তে আরম্ভ করে, পরে গাছের পাতা ও কচি ডগাগুলোও নষ্ট করে ফেলে। এই রোগের হাত গাছ বাঁচাতে হলে, (ক) পাতার পিছনের ডিমগুলো সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে, (খ) ছাই অথবা সোডিয়াম ছিটিয়ে দিতে হবে, (গ) লাইম মিকশচারও ছিড়িয়ে দেওয়া যায়। কেরোসিন ও জল মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলেও এই পোকা দমন করা যায়।

স্টেম ব্ল্যাক

কুমায়ুন ও উত্তরপ্রদেশে এই রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এই রোগ আপেলগাছের বিশেষ ক্ষতি করে। গাছের ডালগুলো কালো হয়ে মরে যাওয়া এবং গাছের গোড়ায় ছত্রাক দেখা দেওয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। কপার কারবনেট, সীসা, তিসির তেল প্রভৃতি রোগাক্রান্ত জায়গাগুলোতে দিয়ে দিলে এই রোগ দমন করা যায়।

পিঙ্ক রোগ

অনেক গাছই এই রোগে আক্রান্ত হয়। জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে এবং গাছ যদি খুব ঘন হয় তবে এই রোগ দেখা দেয়। স্টেম ব্ল্যাক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থার মতই এই রোগে প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে।

ব্লাউন রট

পাঞ্জাবে আপেল ও নাসপাতিতে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগে ফলের উপর খয়েরী রঙের এক ধরনের দাগ পড়ে এবং ফলগুলি মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে, যাতে গাছের সর্বত্র না রোগ ছিড়িয়ে যায়।

মিল ডিউ

গাছের ফুল, পাতা, ফল, ডালপালা, গাছের গোড়া সবই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ দমন করতে হলে শীতে লাইম সালফার অথবা বোর্দো মিশ্রণ ছিড়িয়ে দিতে হবে।

স্কাব

ফল, পাতা ও নতুন ডালে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের ফলে পাতাগুলো শূন্যকয়ে গাছ থেকে অকালে পড়ে যায়। ফলগুলি না পেকে শুক হয়ে থাকে ও ঝরে যায়। অনেক সময় ফল পাতা সুন্দর ডালও শূন্যকয়ে মরে যায়। প্রথম যখন ফুল দেখা যায় তখন একবার এবং ফুলের পাপাড়া যখন ঝরে যায়

তখন আর একবার বোর্দো-মিশ্রণ ও লাইম সালফার মিশিয়ে ছিটালে এই রোগ দমন করা যায়। আপেল এবং নাসপাতিতেই এই রোগ বেশি হয়।

পীচ লিফ কারল

এই রোগকে পাতা কোঁচকানো রোগ বলা হয়। রোগাক্রান্ত হলে গাছের পাতাগুলো কুঁচকে ভারি হয়ে যায় এবং পাতার রঙও হলদে অথবা লাল হয়ে যায়। ক্রমে গাছও হলদে হয়ে ওঠে এবং ফলও নষ্ট হয়ে যায়। লাইম সালফার, বোর্দো-মিশ্রণ অথবা কপার সালফেট দুই পাউন্ড ৫০ গ্যালন জলে মিশিয়ে ছিটাতে হবে।

পীচ কারল এপিঙ্গ

পীচ গাছের পক্ষে এই রোগ মারাত্মক। এই রোগে পাতাগুলি খুব কুঁচকে যায় এবং তার মধ্যে শূন্যোপোকার জন্ম হয়। এই শূন্যোপোকা গাছের মধ্যে ফড়িটা করে ঢুকে গাছের সমস্ত রস খেয়ে ফেলে, ফলে রসহীন ডালগুলি ভেঙে যায়। এই রোগের হাত থেকে গাছ বাঁচাতে হলে কুঁড়ি বের হবার আগে তামাকের জল ভাল করে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পীচ ফ্লট ফ্লাই

পীচ গাছেই এই পোকা জন্মায়। এই পোকা ফলের মধ্যেই বাসা করে। এই পোকা দেখা দিলে,

(ক) ফলগুলি নষ্ট করে ফেলতে হবে, (খ) নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি বদলে দিতে হবে, এবং (গ) আক্রমিত স্থানটিতে কীটনাশক দ্রব্য ছিটিয়ে দিতে হবে।

লীফ স্পট

ছত্রাক থেকে এই রোগের সূত্রপাত হয়। এই রোগের প্রকোপ বেশি হলে গাছের পাতা ঝরে যেতে আরম্ভ করে। লাইম সালফার ও বোর্দো-মিশ্রণ ছিটিয়ে দিলে এই রোগ দমন করা যায়।

স্ট্রবেরির রোগ

স্ট্রবেরি গাছে ভাইরাস রোগের প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। এই রোগের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতাগুলিও হলদেটে লাল হয়ে যায়। শূন্যোপোকার দ্বারা এই ভাইরাস রোগ ছড়ায় বলে অনেকের ধারণা। এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে রোগাক্রান্ত গাছগুলো তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

স্ট্রবেরিগাছে মিল ডিউও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, ফল ফোটার আগে সালফার ছিটিয়ে দিলে এই রোগ দমন করা যায়।



সুপারির চাষ

আয়কর ফসলের মধ্যে সুপারির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যারা এর চাষ করেন তাঁরা প্রায় সকলেই বাড়ির আনাচে কানাচে কিংবা খুব অল্প জায়গাতেই সুপারি লাগিয়ে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এর চাষের বহু রকমফের দেখা যায়। সুপারি চাষের বহু বিষয় এখনও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তবু এর চাষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে দেওয়া হ'ল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যেসমস্ত জায়গায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং যেখানে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি সেইসব জায়গাতেই সুপারি ভাল হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে এই গাছ হ'তে পারে। যদিও নানা রকম মাটিতে সুপারির গাছ হ'তে দেখা যায় তবু বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে হ'তে পারে বলেই যে-কোনও মাটিতে সুপারির চাষ চলতে পারে এ ধারণা ভুল। ভালভাবে জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত সরস মাটিতেই সুপারি ভাল হয়। দোআঁশ, কাঁকুরে ও লাল দোআঁশ জমিই এর চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

জমির প্রাথমিক তদারকি

সুপারি বাগানের জন্য নির্বাচিত জমি প্রথমে সমান করে নিতে হবে। জমি যদি ঢালু হয় তবে তাকে ধাপে ধাপে কেটে সমান করতে হবে। সুপারির চারা প্রথম অবস্থায় কড়া রোদ সহ্য করতে পারে না। কাজেই সুপারি বাগানের প্রথম পত্তনের আগে ঐ জমিতে কলাগাছ লাগিয়ে নেওয়া ভাল। কলাগাছ লেগে গেলে পরে তার কাছাকাছি সুপারির চারা বসিয়ে দেবেন। কলাগাছের ছায়ায় সুপারির চারা সহজেই বাড়তে পারবে।

বীজ ও চারা বসানো

সুপারির বীজ সরাসরি ক্ষেতে বোনা চলে। আবার বীজ থেকে হাপরে চারা তুলেও ক্ষেতে বসানো

যায়। সাধারণত এক বছর থেকে তিন বছর বয়সের চারা তুলে নেড়ে বসাবেন।

দ্বিষ বছর বয়সের গাছ থেকেই বীজের জন্য সুপারি সংগ্রহ করা ভাল। যে গাছ বেশ সবল ও সতেজ এবং যাতে প্রতি বছরই ভাল ফলন হয়, সেই গাছ থেকেই বীজের জন্য সুপারি সংগ্রহ করা উচিত। খুব পুরানো ও দুর্বল গাছ থেকে বীজের জন্য সুপারি নেবেন না। গাছপাকা সুপারির কাঁদি থেকে যখন দুই-একটা সুপারি ঝরে পড়ে তখনই বড় পাকা সুপারি বীজের জন্য সংগ্রহ করা দরকার। কাঁদির মাঝখানে থেকে সুডোল সুপারিই বীজের জন্য বেছে নেবেন।

পছন্দমত সুপারি নিয়ে হাপরের বা বীজতলার জমি গভীরভাবে কুপিয়ে, জমি চোঁরশ করে নিয়ে ৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি অন্তর বসাবেন। নিয়মিতভাবে জলসেচ করবেন ও জমি মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দেবেন।

কেবলমাত্র সবল চারাই বেছে নাড়িয়ে বাগানে বসাবেন।

চারা বসানো

সুপারি বাগিচার মাটি যদি বেশ ঝরঝরে হয় এবং জল সহজে বাঁর হয়ে যাবার যদি ব্যবস্থা থাকে তবে ২-৩ বছর বয়সের চারা তুলে ৩ ফুট গর্তে বসাবেন। এঁটেল জমিতে যেখানে মাটি থেকে সহজে জল বাঁর হয়ে যেতে পারে না সেখানে দেড় থেকে দু' বছরের চারা তুলে দেড় থেকে দু' ফুট গভীর গর্ত করে বসানো ভাল। যদিও নানা জায়গায় নানা রকম দূরত্বে সুপারির চারা বসানো হয়ে থাকে তবু ১২ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া একটি বর্গক্ষেত্রের চারা কোণে চারাটি ও ঠিক মাঝখানে একটি চারা বসানোই ভাল। যদি জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকে তা হ'লে মে-জুন মাসে চারা বসাতে হয়। যদি

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

জমিতে জল বসবার আশঙ্কা থাকে তবে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে চারা বসানোই উচিত।

সার দেওয়া

বেশি ফলন পেতে হ'লে সুপারিগাছে ঠিকমত সার দেওয়া বিশেষ দরকার। সার দেবার সবচাইতে ভাল সময় হ'ল অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। চারার গোড়ার দেড় থেকে দুই ফুট দূরে ৯ ইঞ্চি গভীর ও বেশ খানিকটা চওড়া ক'রে নালা কেটে তার মধ্যে সার দিতে হয়। সার দেবার পর সে-গুলোকে ব্দুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। ১০-১২ সের সবুজ পাতা, ১০-১২ সের পচা গোবর বা আবজনা সার, ৩ পোয়া গাছ-গাছড়া পোড়ানো ছাই ও ১ পোয়া সুপারফসফেট বছরে একবার ক'রে প্রতি গাছে দেওয়া দরকার। সুপারিচারার ছায়ার জন্য ও বিশেষ ক'রে সবুজ সার যোগান দেবার জন্য মাদার ইত্যাদি শব্দটি জাতীয় গাছ লাগানো প্রয়োজন।

পরিচর্যা

মাঝে মাঝে আগাছা ও অন্যান্য বাজে গাছপালা তুলে ফেলে বাগিচা পরিষ্কার ক'রে দেবেন। বাগিচার জমি কাটা কোদাল দিয়ে মাঝে মাঝে কুঁপিয়ে দিতে হয়। এইভাবে যত্ন নিলে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ ফলন বাড়ে। জমি আলগা করার সময় সাবধানে করতে হয় যেন চারার শিকড় না কেটে যায়। পরিচর্যার জন্য সচরাচর আর যে কাজগুলি করা হয় তা হ'লঃ

মাঝে মাঝে সেচের নালা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া, নালায় পলি তুলে ফেলা এবং কাঁচ চারাগুলোকে সূর্যের কড়া তাপ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা।

সেচ ও জলনিকাশ

যদি সারা বছর ধ'রে বেশ ভাল বৃষ্টি হবার আশা না থাকে এবং বাগিচার জমির নিচের মাটির রস আশানুরূপ না হয় তবে বাগানে গরমের সময় নিচের ব্যবস্থা করতে হবে। কতটুকু জল পাওয়া যাবে, মাটির প্রকৃতি কেমন এবং মজুতের খরচ কেমন

ইত্যাদি বুঝে ৪ থেকে ৮ দিন অন্তর গাছে সেচ দিতে হয়।

সেচের ব্যবস্থা করাও যেমন দরকার, বর্ষায় মাটিতে যেন অতিরিক্ত জল না বসে সেদিকে নজর দেওয়াও তেমনি দরকার।

সুপারিগাছের বয়স ৩০ বছর হয়ে গেলে নিয়মিতভাবে ফাঁকে ফাঁকে নতুন চারা বসাতে হয়। পুরানো মরা গাছ তুলে তার জায়গায় নতুন চারা বসিয়ে দিলে বাগিচার ফলনে ঘাটতি হবে না।

সুপারি বাগিচায় অন্য ফসল

ভালভাবে পরিচর্যা করলে ও উপযুক্ত সার ব্যবহার করলে সুপারি বাগিচায় অন্যান্য ফসলও তোলা যায়। সুপারির ফাঁকে ফাঁকে কলার চাষ সহজেই করা যায়। এ ছাড়া আনারস, পেঁপে, পান প্রভৃতির চাষও চলতে পারে। সুপারিগাছ যাতে ভাল ছায়া পায় ও ঝড়ে যাতে গাছের কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য সুপারি বাগিচার চারধারে অনেক সময় নারকেলগাছ লাগানো হয়ে থাকে।

রোগ ও পোকা

কলিরোগ বা মহালিই হ'ল সুপারিগাছের সবচাইতে মারাত্মক রোগ। যেসব জায়গায় খুব বেশি বৃষ্টি হয় সেখানেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

শতকরা ১ ভাগ বোর্দো-মিশ্রণ দু'বার গাছে ছিটিয়ে দিলে এই রোগ দমন করা যায়। মে মাসের শেষা-শেষি বা জুন মাসের গোড়ায় প্রথমবার এই ওষুধ ছিটাতে হয় এবং এর দেড় মাস পরে দ্বিতীয় বার ছিটাতে হয়।

ফল তোলা

বাজারে যে ধরনের সুপারির চাহিদা তাই বুঝে সুপারির কাঁদি নামাতে হয়। নানা জায়গায় নানা-ভাবে কাঁদি নামানো হয়ে থাকে। তবে গাছ থেকে সুপারির কাঁদি কেটে মাটিতে না ফেলে, দড়ি গুলিয়ে নামানোই ভাল। একটা লম্বা দড়ির মাথায়

লোহার একটা আঁকসি বেঁধে সেই মাথা কোমরে গুঁজে সিউলী গাছে চড়ে, দড়ির উপর কাঁদি নামিয়ে ছেড়ে দেয়। দড়ির আর এক মাথা নিচে একজন লোকের হাতে থাকে। সে কাঁদিগুলো এক এক করে ধরে দড়ি থেকে নামিয়ে নেয়।

ফলন

এক একরে ৪৫০ থেকে ৫৫০টি ফলন্ত স্দুপারি-গাছ থাকলে তা থেকে গড়ে প্রায় ১৯ মণ শ্লুকনো স্দুপারি পাওয়া যায়।

বিক্রির জন্য স্দুপারি তৈরি

যদি কাঁচা স্দুপারি তুলে বিক্রি করার ইচ্ছা থাকে তবে কাঁচা স্দুপারি পেড়ে খোসা ছাড়িয়ে চাকা চাকা করে কেটে সিদ্ধ ও রঙ করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। কোন কোন জায়গায় সিদ্ধ ও রঙ না করেই রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। যদি পাকা স্দুপারি তোলা হয়, তা হলে ৩৫ থেকে ৪০ দিন ধরে পাত পাত করে বিছিয়ে রোদে ভাল করে শুকিয়ে, তারপর খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়।



আখচাষের জারিগান

মহম্মদ গোলাম আকবর

গোড়বগের অঙ্গ রে, ভাই,
গুড়ে গুড়ময়।
সেই গুড় আর শর্করা যে
ইক্ষু থেকে হয়।
যুগে যুগে আখের মিষ্টির
মান্য আছে ভারি।
তুষ্ট মনে শোন মিষ্টি
আখচাষের জারি।
অর্থাগমের যত চাষ
মর্ত্যধামে আছে।
অনেক চাষই হার মেনে যায়
আখের চাষের কাছে।
দুই বিঘা ভুঁয়ে ভাল
আখ লাগাতে পারে।
দশ বিঘা জমির আয়,
তার কাছে, ভাই, হারে।
নতুন যুগে দেশে দেখ
বহু শ্রেণীর আখ।
'কাটা' নামে ফাটা আখ
গায়ে কাটা দাগ।
'মাদ্রাজী' 'জাপানী' 'খড়ি'
'সামনা' 'শ্যামসাড়া'।
মাদ্রাজী রুইতে হয়
ভুঁয়ে ক'রে গাড়া।
খড়ি আখ দড়ি-সম
রস অতি কম।
ছেলেপুলেয় ছোঁয় না যেন
কান্দি অনুপম।
শিয়ালে ভাঙে না, ভাই রে,
পোষায় না তার খেটে।
তবু সে আদরণীয়
বাঙলার খন্দ বটে।

কাটা ও জাপানী ইক্ষু
বসের দরিয়া।
এ দুয়েও অঙ্গ রাখে
শক্ত করিয়া।
দীর্ঘ হয় মন্দ নয়—
সাত-আট হাত।
আশেপাশে ভারি হয়
সকলের মাথ।
যত রোবে তত হবে—
জোর একাধিক।
মাদ্রাজীর একে হয়
তিন ততোধিক।
সামনা শ্যামসাড়া দুয়ে
গুণে ইক্ষুরাজ।
সুকোমল অঙ্গে করে
রসগোল্লার কাজ।
ছেলেপুলেয় নষ্ট করে
শিয়ালেতে ভাঙে।
বেড়ায় জড়ায় মানে না তাই
কম হল বগে।
রসে রয় চিনির ভাগ
অতি পরিমাণ।
চিবাইয়া খেলে হয়
তৃপ্ত মনপ্রাণ।
এহেন সুন্দর চাষ
কোরো না, ভাই, কমি।
শেবতপাথরের বেড়া দিব
সারা বগের জমি।

ধরতা

লাগ রে কাজে কোমর বেঁধে
জাগ রে তরুণদল।
রসের সাগর চেউ খেলে যায়
ছলছল কলকল।

চাষে দিও মন, ভাই রে,
 মনে কর চাষ।
 জমি তয়ের করতে লাগ
 পয়লা কার্তিক মাস।
 চাষার গুণে মাটি ভাল
 মাটির গুণে গাছ।
 গুরুদর গুণে শিষ্য ভাল
 জলের গুণে মাছ।
 মন ক'রে মাটি চাষে
 খন্দে রাখে চোখ।
 তার চাষে রয় না কভু
 রোগ শোক পোক।
 স্দুপার ফসফেট দিয়ে চষলে
 রয় না মাটির দোষ।
 আধুনিক ধারার চাষে
 পূর্ণ পরিতোষ।
 পাঁচ-সাত চাষ দিও, ভাই,
 আধ মাসের মাঝে।
 পচা পাকমাটি দাও
 জমির জোর বৃদ্ধে।
 যতদিন না আসে মাঘ
 চ'ষ মাঝে মাঝে।
 মাঘ পড়িলে লাগ এবার
 চাতর দেবার কাজে।
 তিন হাত চওড়া নিও
 দীঘে হাত-বারো।
 ওপর-সমান ঢিল গ'ড়ুও
 সার মিশাও আরো।
 মোটা তাজা টিক্‌লীগুঁলি
 বসাও সারি সারি।
 সার জঞ্জাল চাপা দিয়ে
 ছিটাও জলের ঝারি।
 এক মাসের মধ্যে আখের
 চারা হয়ে যায়।
 আড়ে দীঘে বারো ইঞ্চি
 রোয়া কর সার।

কোদালিতে খুঁপি কেটে
 চারা জোড়া রোবে।
 জল দিয়ে নাহি রু'লে
 চারা ম'রে যাবে।
 দু'-তিন সপ্তার মধ্যে যদি
 বৃষ্টি নাহি হয়।
 সেচিয়া ডুবালে ক্ষেত
 আখের চাষের জয়।
 সেচা ক্ষেতে জো হলে, ভাই,
 দিও কোপাইয়া।
 বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠেতে রোয়া
 ঘাস নিড়াইয়া।
 ঝোড়া লাগে গোড়া মরে
 মাজি শুকাইলে।
 ভাল হয় সরকারের
 যুক্তি কিছু নিলে।
 ফাপ বাহির হলে আখ
 দিও জড়াইয়া।
 ঝোড়া-লাগা পোকা-ধরা
 ফেলহ কাটিয়া।
 রোদ-বাতাস পাবে তাতে
 বাড়বে আখের মাল।
 তিন বার জড়াও হেন
 যুক্তি চিরকাল।
 শিয়ালে ভাঙার ভয়
 জড়ালে হয় কম।
 ভুতমূর্তি বসাও, নয়,
 বাজাও বম্ববম।
 হীনতেজা হলে আখ
 গোড়ায় দিবে সার।
 সালফেট-অ্যামোন খইল-গ'ড়ু
 যা খুঁশি তোমার।
 গোড়া থেকে তিন ইঞ্চি
 দূরে দিবে সার।
 সার দিয়ে অল্প খুঁড়ে
 মাটি ঢাক তার।

ভাগ্যগুণে অতিরিক্ত

আখে কর বাড়।

একসাথে বেধে দিও

পাঁচ-সাতটা ঝাড়।

আরো যদি বাড়ে, ভাই রে,

হয় ভূমিস্যাৎ।

বাঁশ কেটে ভার্য দিবে

নইলে অধঃপাত।

পড়ে আখে রস বেশি হয়,

হয় না তাতে মাল।

ভিটা-ছাড়া চিটা-গুড়

অরুচি জঞ্জাল।

আগাগোড়া একটা কথা

স্মরণ রাখা চাই।

আখের ক্ষেতে বৃষ্টিজল

নাহি বাধে ভাই।

আগে বেড়া দিবে, বন্ধু,

শেষে আখের চাষ।

শীত থাকিতে মাড়াই কোরো

পূরবে অভিলাষ।

শ্রমিক পায় না রোদের কষ্ট

গুড় বসে বেশ ভাল।

ফাইন ক'রে বাইন দেবে

ঘুচিবে জঞ্জাল।

আধুনিক মতে এক

চিমনি রাখা চাই।

রসে গুড়ে কণামাত্র

জমবে নাকো ছাই।

হাল ফাশনের কড়ায়, বন্ধু,

অল্প পোড়ে কাঠ।

উৎপাদনে পড়তা কমলে

মুনাফা বিরাট।

ধরতা

গোড়বগের অংগ রে, ভাই,

গুড়ে গুড়ময়।

পিপীলিকা তাই বাঙলার

সকল ক্ষেতে রয়।

জাগো বাঙলার তরুণ ছেলে

জাগাও চাষীভাই।

সেই গোড়বগের রূপে

বগ গড়ে যাই।

লক্ষ্মী-লাভে লক্ষ্য রেখে

কর ক্ষেতখামারি।

গোলাম আকবর বলে সাংগ

হোলো আখের জারি।

পশ্চিম বাঙলায় সিনকোনা চাষ

পশ্চিম বাঙলায় কুইনাইনের কথা সকলেই জানেন—বিশেষ করে গ্রামবাসীরা। কুইনাইন প্রায় আশী বছর ধরে ম্যালেরিয়ারোগীর রোগমুক্তির একমাত্র ভরসা ছিল। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, কুইনাইন সিনকোনা নামক একপ্রকার গুল্মের ক্ষারজাত (অ্যালক্যালাইড)—সিনকোনাগাছ থেকেই কুইনাইন তৈরি হয়। ভারতে সিনকোনাগাছের রীতিমত চাষ হয়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বিদেশ থেকে ভারতে সিনকোনাগাছ আমদানি করা হয় এবং তারপর থেকে এদেশে সরকারের তত্ত্বাবধানে সিনকোনা চাষ হয়ে আসছে এবং সরকারী কারখানায় কুইনাইন তৈরি হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলা আজ প্রায় ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু দশ বছর আগেও শহরের লোক ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামে একটা রাত কাটাতেও ভয় পেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দেশে কুইনাইন এত অল্প উৎপন্ন হ'ত যে, তার দ্বারা লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়ারোগীর চাহিদা মেটান কোন রকমেই সম্ভব হ'ত না। তাই সেই সময় থেকে পশ্চিম বাংলায় সিনকোনা-চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেয়াদকালে বাংলায় সিনকোনা চাষ বহুল পরিমাণে বাড়ানোর সংকল্প কার্যকরী করা হয়। কিন্তু কয়েক বছর পরে হঠাৎ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দু'টি কারণে সিনকোনা চাষের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়:

(১) দেশে নতুন আবিষ্কৃত নানাবিধ কীটপতঙ্গ-নাশক গুঁড়ো (ডি-ডি-টি প্রভৃতি) ছড়িয়ে ব্যাপকভাবে মশক ধ্বংস করার জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে যায়। (২) নানাবিধ কৃত্রিম রাসায়নিক ভেষজ দ্রব্য কুইনাইনের বিকল্প ঔষধ হিসাবে আবিষ্কৃত হওয়ায় কুইনাইনের চাহিদা অনেক কমে যায়।

সম্প্রতি (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির হলে সিনকোনা চাষ ও

তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বাংলার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় ঐ সভার উদ্বোধন করেন। ভেষজ উদ্ভিদ অধিকর্তা ডাঃ কে বিশ্বাস, সিনকোনা অধিকর্তা শ্রী এস মদুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানার ম্যানেজার শ্রী এস পি সেন, কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল স্কুলের রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ আর এ চক্রবর্তী, গ্লুকোনেট লিমিটেডের বায়োকেমিস্ট ডাঃ বি পি ঘোষ এবং বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় প্রধান উদ্ভিদ-বিশারদ ডাঃ জে সি সেনগুপ্ত এই আলোচনায় যোগদান করেন।

শ্রীভূপতি মজুমদার পশ্চিম বাংলায় সিনকোনা ও কুইনাইনের চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ডাঃ কে বিশ্বাস দক্ষিণ আমেরিকায় কিভাবে সিনকোনা ও তার জ্বরনাশক গুণ আবিষ্কৃত হয় তার প্রাথমিক ইতিহাস এবং ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সিনকোনা চাষের কাহিনী উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি 'ম্যাজিক লন্ঠন' সহযোগে সিনকোনা-জাতীয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক রূপ ব্যাখ্যা করেন এবং ইপিকাক, আরগট, ভিজিটালিস, রাউওলফিয়া, সপলতা, মেনথাপিপেরিটা প্রভৃতি ঔষধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেন। এইসব ঔষধি দার্জিলিঙে রংগাবাগানে চাষ করা হয়।

শ্রী এস মদুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় ভারতে সিনকোনা শিল্পে অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কুইনাইনের চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী সিনকোনা চাষ নিয়ন্ত্রণ করছেন। আর্থনীতিক দিক থেকে সিনকোনা চাষের অবস্থা যাতে খারাপ হয়ে না পড়ে এবং বাড়তি শ্রমিকেরা যাতে কাজ পায়

তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সিনকোনা বাগানে ইপিকাক, টুং, কফি, কোকো, ছোট এলাচ, লেবু-ঘাস প্রভৃতি চাষ করাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি কুইনাইনের কার্টিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাঁর মনে হয় যে, সাধারণ লোক এখনও কুইনাইন পছন্দ করেন এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিকার ছাড়া অন্যান্য কাজেও কুইনাইনের চাহিদা বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কুইনাইন সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক তথ্যচিত্র দেখান। অন্যান্য বস্তুরাও সিনকোনা চাষের প্রয়োজন ও সেই-সঙ্গে অন্যান্য ভেষজ ও অর্থকরী গাছ-গাছড়া চাষের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই আলোচনা-বৈঠকের শেষের দিকে বস্তুত-প্রসঙ্গে শ্রী মজুমদার বলেন যে, পশ্চিম বাঙলায়

এখনও সিনকোনা চাষের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন, যদিও চাষ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। নানাবিধ কৃত্রিম বিকল্প ঔষধ আবিষ্কৃত হ'লেও এখনও কয়েক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলে গণ্য হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সিনকোনা চাষ বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে বলে বিদেশের বাজারে আমাদের কুইনাইনের চাহিদা আছে। চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য সরকারী সিনকোনা বাগানগুলিতে লোকসান হচ্ছে বটে, কিন্তু এইসব বাগানে অন্যান্য ঔষধি ও অর্থকরী ফসল চাষ করার ফলে সিনকোনা চাষের খরচ ক'মে যাবে এবং লোকসানও বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন যে, বিদেশী মদ্রা অর্জনের জন্য দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করাও বিশেষ প্রয়োজন, এবং কুইনাইন রপ্তানি করতে পারলেও আমরা কিছু বিদেশী মদ্রা অর্জন করতে পারব।



টালিগঞ্জ পক্ষিপালনের সরকারী খামার

পশ্চিমবঙ্গে দুধ মাংস মাছ ডিম প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের প্রানিজ প্রোটিন-খানদার যে অত্যন্ত অভাব সে-কথা আর ব'লে দেবার দরকার নেই এবং ডিমের জন্য এ রাজ্যকে প্রধানত পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হয়। বাস্তবিক, বছরে প্রায় ১৯ কোটি ডিম এ রাজ্যে আমদানি হয় এবং এ সত্ত্বেও এখানকার প্রতিটি লোকে বছরে গড়ে ডিম খেতে পায় মাত্র ১৩টি। আর অন্যান্য উন্নত দেশের প্রতিটি লোক গড়ে দৈনিক একটি ক'রে ডিম খায়। পশ্চি-গঙ্গে ভরা ডিম খুব তাড়াতাড়ি জৈব প্রোটিনের যোগান দিয়ে মানুষের খাদ্যকে সুস্বাদু ক'রে তোলে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডিম সরবরাহের উপর কড়াকড়ি চাপানোর ফলে ডিমের দর চড়ে গেছে গরিব লোকের কেনার ক্ষমতা ছাড়িয়ে। এসব কথা ভেবে এবং পক্ষিপালন-শিল্পের উন্নয়নের কথা বিবেচনা ক'রে বাস্তুহারাাদের পুনর্বাসনের জন্য উদ্ভাস্তু গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের নিকট একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হ'লে তা অনুমোদিত হয়। সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি লাভ করে টালিগঞ্জের রাজ্য পক্ষিপালন-খামার। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি উদ্ভাস্তু-পরিবারকে ১০০টি ডিম-দেওয়া পাখি, পাখিগুলোর থাকবার সুব্যবস্থিত 'ব্যাটারি'খাঁচা এবং না-লাভ-না-লোকসানের ভিত্তিতে পাখিদের সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

মঞ্জুরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ক্ষিপ্ৰতায় সকল দিক থেকে নেমে পড়া হ'ল যাতে ডিম ফোটানোর মরসুমটাকে কাজে লাগানো যায়। ১৫ হাজার ডিম তা দিয়ে ফোটাবার উপযোগী বিরাট আকারের যন্ত্র 'ম্যামথ' ইনকিউবেটর' সহ আরও যেসব আধুনিক সরঞ্জাম ভারত-সরকার থেকে পাওয়া

গেছে, সেসব বসিয়ে নেওয়া হ'ল, জমিটার উন্নতিসাধন করা হ'ল এবং সেইসঙ্গে আবশ্যিক ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শুরুর হয়ে গেল। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে এই খামার মুরগির ডিম থেকে ১৫ হাজার বাচ্চা ফোটাতে পেরেছে এবং এখানকার মুরগিগুলো থেকে এখন দিনে গড়ে প্রায় সাড়ে সাত শ' ডিম পাওয়া যাচ্ছে। এখানকার ডিম এবং মাংসের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং উচ্চাঙ্গের এ দু'টি জিনিস কিনবার জন্য প্রতিদিনই দূরদূরান্তরের লোক এসে এখানে ভিড় করছে। উদ্ভাস্তুদের কীভাবে পক্ষিপালনের কাজে লাগানো যায় সেটা এতকাল একটা জটিল সমস্যা ছিল। এই খামারটি স্থাপন করা হয়েছে মূল্যত কতকগুলি উদ্ভাস্তু-পল্লীর কেন্দ্রস্থলে। এখানকার কাজের অগ্রগতি দেখে, এখানকার ডিম আর পাখির বৈশিষ্ট্য দেখে বাস্তুহারা লোকেরা, বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকেরা, এই খামারে কাজ করতে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁরা পক্ষিপালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পুরুষ কর্মচারী ছাড়া, ২০ জন উদ্ভাস্তু নারীও এই খামারে কাজ করছেন। তাঁরা পাখিদের খাওয়াতে, এমন কি ঘর বাঁট দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। উপরন্তু মুরগির শাবকগুলোর লালনে তাঁরা চমৎকার যত্ন নিয়ে থাকেন। যেসব উদ্ভাস্তু পুনর্বাসিত হয়েছেন কিন্তু জীবিকার সুসংস্থান করতে পারেন নি, এ থেকে তাঁদের একটা উপার্জনের উপায় তো হচ্ছেই, তা ছাড়া, যাঁরা এখনও পুনর্বাসিত হন নি তাঁদের সামনেও এই কাজ অর্থার্জনের একটা পথ প্রসারিত করেছে।

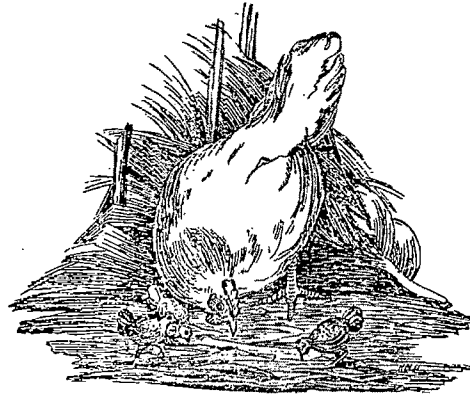
এই খামারে 'ব্যাটারি'খাঁচা, মুরগির ঘর প্রভৃতি পক্ষিপালনের আবশ্যিক সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থাও হচ্ছে বেশ বড় আকারে এবং শুরুর এসব কাজে

এখানে এখন ১২-১৩ জন উম্বাস্তুর কর্মের সংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ২০ জন নারী সহ প্রায় ৭৫ জন উম্বাস্তু কাজ করছেন। শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, আশা করা যায়, এই শিল্পও উন্নতিলাভ করবে এবং এখানে যাঁরা কাজ শিখছেন তাঁরা এসব কাজ করে নিজেদের বসতির ব্যবস্থা করতে পারবেন।

গ্রীষ্মকালেও যাতে প্রচুর ডিম পেয়ে এবং ইনকিউবেটরের সাহায্যে উন্নত শ্রেণীর পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি করে লোকের ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটানো যেতে পারে সে-বিষয়ে এখন এখানে গবেষণা চলছে। ডিম থেকে ভাল বাচ্চা ফোটানোর পক্ষে এবং পাখিগুলোকে ভালভাবে পালন করার পক্ষে আবহাওয়ার আদর্শতা আর উত্তাপ দুটোই মুখ্য অন্তরায়। ঠান্ডা জল ছিটিয়ে, তা-দেওয়ার আর

বাচ্চা ফোটানোর ঘরে বিশুদ্ধ হাওয়া চালিয়ে, এমনি নানা পদ্ধতিতে এসব অসুবিধা দূর করার চেষ্টা চলছে এবং এই খামারে এসব প্রচেষ্টার ফলও দেখা যাচ্ছে বেশ সন্তোষজনক।

বিপুল চাহিদা এবং এই শিল্পের উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করলে মনে হয়, পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বড় আকারের খামার স্থাপন করে উম্বাস্তু-পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়। এ বিষয়ে যথাযোগ্য বিবেচনাও করা হয়েছে এবং স্থির হয়েছে যে, দুর্গ-পুরে আর শিলিগুড়িতে আরও দুটি খামার স্থাপন করা হবে। তা ছাড়া, হাঁস পালনের একটি খামার করার প্রস্তাব তো ইতিপূর্বেই মঞ্জুরি লাভ করেছে।



টুকিটাকি

রবি মরসুমে বীজ-আলু বণ্টন

কৃষি-অধিকার কলিকাতার খিদিরপুরে অবস্থিত পাহাড়পুরের 'ব্লকলীন কোল্ড স্টোরেজ'এ রেগুদুন শ্রেণীর রয়াল কিডনী ধরনের বীজ-আলু গুদাম-জাত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রেজিস্ট্রী-ভুক্ত উৎপাদনকারিগণ এগুলি পরিবর্ধিত করেছেন। আলুর ফসলের জীবগত-সংক্রান্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য চাষের মরসুমে পর পর তিনবার ফসল পরিদর্শন করা হয়। সংরক্ষিত বীজ-আলু উচ্চমানসম্পন্ন ও উন্নত ধরনের।

রয়াল কিডনী ধরনের বীজ-আলু ডিম্বাকৃতি, এর খোসা সোনালী হলুদ বর্ণের এবং চোখ গভীর। এই ধরনের বীজ-আলু খুব ভালভাবে রাখা যায় এবং বাজারে অন্যান্য ধরনের বীজ-আলু অপেক্ষা এর দামও বেশি পাওয়া যায়।

এই বীজ-আলুর মূল্য স্থির করা হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেলস্টেশনে পৌঁছিয়ে দেওয়ার খরচ সমেত প্রতি মণ ২৫ টাকা। যেসকল উৎপাদন-কেন্দ্রে ভারি গাড়ি যেতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে ৪০ মাইল পরিধির মধ্যে রাস্তা দিয়ে মাল 'ডেলিভারি' নেওয়া যাবে, তবে লরী-ভর্তি মাল হওয়া চাই। এরূপ ক্ষেত্রে রাস্তা-যোগে মাল নেওয়ার খরচ বীজ-আলুর মূল্যের মধ্যে ধরা হবে।

বীজ-আলুর অর্ডারের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা চাইঃ

যে ব্যক্তির নিকট বীজ পাঠানো হবে তাঁর নাম, যে স্টেশনে মাল যাবে তার ও রেলপথের নাম, প্রয়োজনীয় পরিমাণ (মণ হিসাবে), যেখানে রেলের রসিদ পাঠাতে হবে সেখানকার ডাকের ঠিকানা, বীজ-আলু পাঠানোর সংবাদ যেখানে জানাতে হবে

সেখানকার টেলিগ্রাফের ঠিকানা, 'ইনডেন্টের' সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অগ্রিম পুরা মূল্য।

রুয়েচ্ছ ব্যক্তি রাইটার্স বিল্ডিংসম্প্রতি আলু-প্রাধিকারিকের সঙ্গে অথবা স্থানীয় কৃষি-আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যে-কোন একজনের কাছে দাম জমা দিলে বীজ পাওয়া যাবে।

ভারত-মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল কতৃক কৃষি অগ্রগতির আলোচনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কর্ম-কল্পনাসমূহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ভারতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে লভ্য সুযোগ-সুবিধাদির মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতির পর্যালোচনা করার জন্য খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রক এতৎসংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি যুক্ত ভারত-মার্কিন দল গঠন করেছেন। এই দলের মধ্যে আছেন মার্কিন ল্যান্ড গ্রান্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে আগত এবং কৃষিশিক্ষা ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ তিনজন প্রখ্যাত ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধি। এই দল ১৯৫৯ সালের ৩১এ অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। এঁরা ইতিমধ্যেই চুঁচুড়া-স্থিত রাজ্য কৃষি খামার ও প্রতিষ্ঠান, হরিণঘাটা দূষণ-গবেষণাকেন্দ্র এবং রাজ্য পশু-চিকিৎসা কলেজ পরিদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার ওরা নবেম্বর দলটি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ রাজ্য কৃষি-বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি সম্মেলনে মিলিত হন, তাতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন এবং পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ও বনবিভাগের সচিব শ্রী সি কে রায়।

শ্রী রায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তাঁদের প্রদান

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

করেন, তারপর কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং কল্যাণীতে একটি পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গঠন— এই তিনটি শাখার মধ্যে স্বেচ্ছা সমন্বয়সাধনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে যোগদান করেন আমেরিকান ল্যান্ড গ্রান্টস কলেজের প্রতিনিধিদের দলপতি ডিন ওয়েবার ও পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রকল্প-সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি শ্রীলাল সিং।

দার্জিলিঙে হাঁস-মুরগি পরিবর্ধন কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দার্জিলিঙ জেলার হাঁস-মুরগি পরিবর্ধন কেন্দ্রে পরিকল্পনার কার্য চালিয়ে যাবার জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে ১৮,৭০৬ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

খাদি ও পল্লী শিল্প পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও পল্লী শিল্প পর্ষদ বিল, ১৯৫৯, রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করেছে। এই

আইনে পশ্চিমবঙ্গে খাদি ও পল্লী শিল্পের সংগঠন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি পর্ষদ স্থাপন ও ঐ সম্পর্কীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বন্যাগ্রাণ

সম্প্রতি কয়েকটি জেলায় বিধ্বংসী বন্যার ফলে ব্যাপক বৃদ্ধিশার সৃষ্টি হওয়ায় বৃহদাকারে গ্রাণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন দুর্গত জেলায় প্রেরণ ও তথায় খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বণ্টনের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন ময়দার কল থেকে ৩০,০০০ মণ খাস আটা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কৃষিক্ষণ

নয়াটি জেলায় বন্যার ফলে ক্ষতি হওয়ায় অধিকতর কৃষিক্ষণের দাবি উঠেছে। সুতরাং সরকার ইতিমধ্যেই কৃষিক্ষণ হিসাবে বণ্টনের জন্য মঞ্জুরীকৃত এক কোটি টাকা ছাড়াও আরও ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে অনুমোদন দিয়েছেন।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক

শ্রীশ্রীভেন্দ্র মধুখোপাধ্যায় কর্তৃক মদ্রিত।

যে ইঁদুর মোহা খেয়েছিল

(পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প)

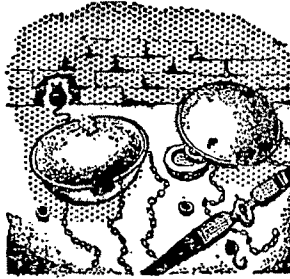
নাটুক বলে এক ব্যবসায়ী সব টাকা পরসাই ইঁদুরে বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল। যাওয়ার আগে সে তার বন্ধু লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল— “তাই লক্ষণ, আমার এই দাঁড়ী পাল্লাটা তোমার কাছে রেখে দাও যতদিন না আমি ফিরি। ওটা বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওটা আমাদের পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আছে।” তারপরে সে চলে গেল।

কিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাকা পরসাই রোজগার করে দেশে ফিরে এলো। সে লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল— “দাঁড়ীপাল্লাটা রেখে তুমি আমার খুব উপকার করেছ। এখন ওটা আমার দাও।”

“তোমার দাঁড়ীপাল্লাটা ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে।” লক্ষণ উত্তর দিল।

“ইঁদুর কি করে অত তারী দাঁড়ীপাল্লা খাবে?” নাটুক চটে মটে বলল— “ওটার ওজন ছিল ২৫০ সের।” “আমার বাড়ী বোঝাই ইঁদুর। ২৫০ সের ওদের কাছে আর এমন কি বেশি?”

নাটুক বুঝল সোজা। আজুলে ঘি উঠবেনা। “ঠিক আছে”—সে একটু হেসে বলল— “তুমি আর কি করবে বল আমারই ভাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর থেকে স্নান করে আসি? তোমার ছেলেকে আমার জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাবে?” লক্ষণ বন্ধুর এই সাধারণ অনুরোধটি এড়াতে পারলোনা।



নদীর থেকে ফেরার পথে নাটুক ছেলেকে একটি শুষ্ক প্রে এক বিরাট পাথর দিয়ে শুষ্ক মুখটি চাঁপা দিয়ে দিল। তারপর সে ফিরে এলো লক্ষণের বাড়ী। “আমার ছেলে কোথায়?” লক্ষণ জিজ্ঞাসা করল বেশ একটু অবাক হয়ে।

“এক বিরাট বাজু পাখী ছেঁ। মেরে ওকে নদীর পার থেকে নিয়ে গেল।” নাটুক বলল।

“মিথ্যাবাদী! একটা বাজুপাখী কি করে ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যাবে?”

“কেন না? যদি ইঁদুরে ২৫০ সেরের দাঁড়ীপাল্লা খেতে পারে তাহলে একটা বাজুপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষণ! ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দাঁড়ীপাল্লা ফিরিয়ে দাও।” বলাই বাহুল্য নাটুক তার দাঁড়ীপাল্লা ফিরে পেয়েছিল।

নীতি: ষাঁর দিকে সত্য আছে তিনি সব সময় মিথ্যাকে দমন করতে পারেন। বনস্পতির কথা ধরুন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষা করে এ সত্য যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিগুজ ভেনজ ভেলে থেকে। ‘ডালডা’ একটি সর্ব

উপযোগী রান্নার মাধ্যম। ‘ডালডা’ কম খরচায় আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’। ‘ডালডা’র প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। সব জায়গায় গৃহিনীরা একবাক্যে স্বীকার করেন—‘ডালডা’ শুধু রান্নার মাধ্যমই নয় একটি খাদ্যও বটে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপারগনা			২১।	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২।	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	মাধেরআট	বেহালা।	২৩।	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪।	বিক্রপুর	বিক্রপুর।
৫। বগিরহাট	বগিরহাট	বগিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫।	মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬।	বেলুদা (মেদিনীপুর)	কণ্টাই রোড।
৭। রানাঘাট	রানাঘাট	রানাঘাট।	২৭।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮।	ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড
৮। কালি	ধাগড়াঘাট	কালি।	২৯।	তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০।	কাঁচি	কণ্টাই রোড
১০। লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১।	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২।	বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ
১৩। রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩।	মালদহ	মালদহ কোর্ট
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪।	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫।	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬।	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭।	কালিম্পাং	শিলিগুড়ি
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮।	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯।	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০।	মাথাভাঙ্গা	মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেন্ডাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

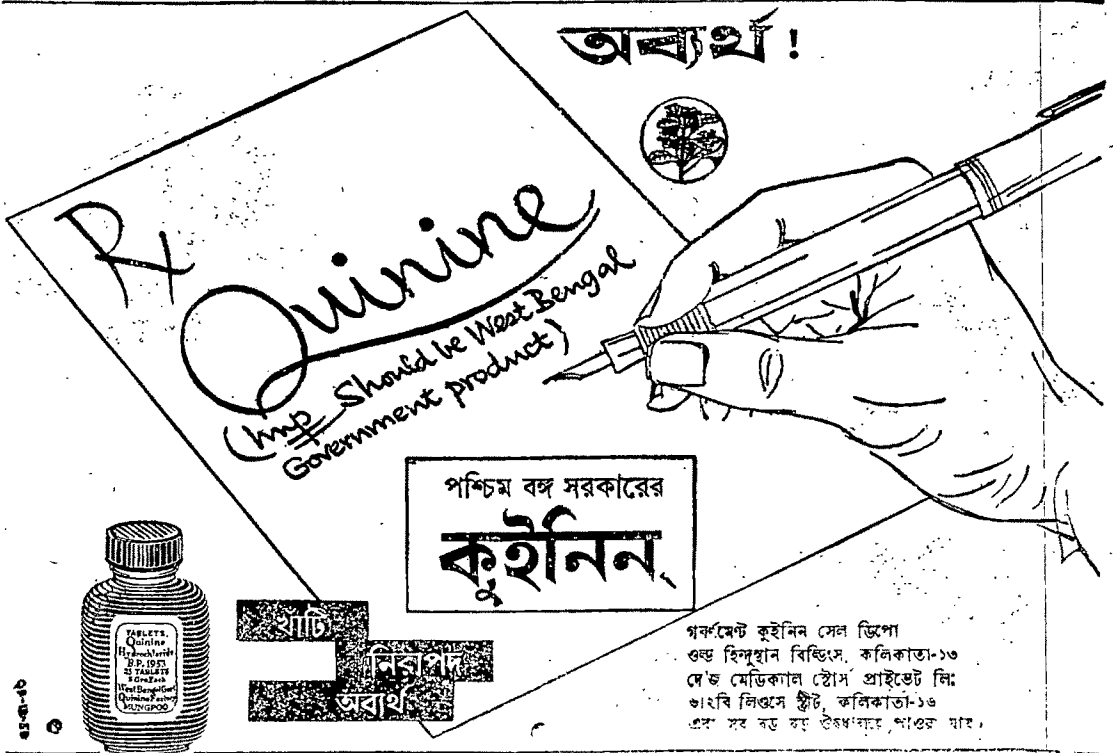
মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্ম অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের ক্ষত প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জন্ম নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বাসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বাসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বাসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

অব্যর্থ!



পশ্চিম বঙ্গ সরকারের
কুইনিন

খাটি
নিরপদ
অব্যর্থ



গবর্নমেন্ট কুইনিন সেল ডিপো
গুড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩
মেডিক্যাল স্টোপ প্রাইভেট লিঃ
৩২বি লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩
এস. সর. বড় হাট উত্তরদিক, পাণ্ডুরাং



বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৬৬

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ৰাণ্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগ্‌দা
	পোঃ নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন শিল্প	শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড,	দমদম
১৪। ঐ ..	হাবড়া	ক্যান্টনমেন্ট।	
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সদেগখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া
নতুন মহাকরণভবন, চারতলা,
১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাথমিক	স্থিতি	স্থিতি
১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক
২।	ঐ ..	২।	ঐ ..
৩।	ঐ ..	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।
		৪।	ঐ ..
		৫।	ঐ ..
		৬।	ঐ ..

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,
পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক
২।	ঐ ..	২।	ঐ ..
৩।	ঐ ..	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।
৪।	ঐ ..	৪।	ঐ ..
		৫।	ঐ ..
		৬।	ঐ ..

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,
পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক
২।	ঐ ..	২।	ঐ ..
৩।	ঐ ..	৩।	ঐ ..
৪।	ঐ ..	৪।	ঐ ..
৫।	ঐ ..	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।
৬।	ঐ ..	৬।	ঐ ..
৭।	ঐ ..	৭।	ঐ ..
		৮।	ঐ ..

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা	
১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	মালদহ	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো	২।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশ্চন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ	৩।	ঐ ..	খড়বা, পোঃ চকল
			৪।	ঐ ..	রতুয়া, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
			৫।	ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	বালুরঘাট	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ	২।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	গজারামপুর	৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর	৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	ধুম	২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ	৩।	ঐ ..	কালিম্পাঙ
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি	৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়ট, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি	৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি	৭।	ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
			৮।	ঐ ..	কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

১।	ব্রাহ্মণ পশ্চিচিকিৎসক	কোচবিহার	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ	২।	ঐ ..	তফানগঞ্জ
৩।	ঐ ..	মাথাডাঙ্গা	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
			৪।	ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা	
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	কালচিনি		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
			৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	গুস্করা	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ	..	মেমারী	২।	ঐ	..	কাটোয়া
৩।	ঐ	..	সেহারাবাজার	৩।	ঐ	..	কালনা
৪।	ঐ	..	কালনা	৪।	ঐ	..	আসানসোল
৫।	ঐ	..	কাটোয়া	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়		ভাতার
৬।	ঐ	..	নতুনহাট	৬।	সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৭।	ঐ	..	আসানসোল	৬।	ঐ	..	মঙ্গলকোট
৮।	ঐ	..	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ	..	শক্তিগড়
৯।	ঐ	..	দুর্গাপুর	৮।	ঐ	..	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	সাঁইথিয়া	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	সিউডি
২।	ঐ	..	বোলপুর	২।	ঐ	..	রামপুরহাট
৩।	ঐ	..	দুবরাজপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়		নলহাট
৪।	ঐ	..	রামপুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৫।	ঐ	..	নলহাট	৪।	ঐ	..	মহম্মদবাজার
				৫।	ঐ	..	আমেদপুর
				৬।	ঐ	..	বোলপুর,
							শ্রীনিবেশ

হুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুঁচুড়া

১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ	..	ত্রিবেণী	২।	ঐ	..	শ্রীরামপুর
৩।	ঐ	.	শ্রীরামপুর	৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়		আরামবাগ
৪।	ঐ	..	তারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।		
				৪।	ঐ	..	খানাকুল
				৫।	ঐ	..	পুরসুরা, পো: চাঁপাডাঙ্গা
				৬।	ঐ	..	পোলবা, পো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পো: মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পো: কাঁথি

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক্
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	বাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুয়া
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটেশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পো: লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পো: বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনিমুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনিমুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুয়া

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পোট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর



শীতল ও আরামদায়ক গ্রীষ্মকালীন পরিধেয়



বহু শতাব্দী ধাবৎ ঠাণ্ডা ও আরাম-
দায়ক গ্রীষ্মকালীন পরিধেয় হিসেবে
ভারতের হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী
অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করে
আসছে। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের
জুতা আপনি চান্দেবী শাড়ী, কোমল
মসলীন ডোরিয়া ও বিভিন্ন রঙ্গের
ও নক্সার নানারকম সূতীবস্ত্রের যে
কোনটা বেছে নিতে পারেন।

দামে যুক্তিসঙ্গত—উপযোগিতায় পছন্দসই

বিদেশে রপ্তানীর জুতা, হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী শিগ্গীরই গুণালুমায়ী
চিহ্নিত করা হবে। বিশদ বিবরণের জুতা অল্পগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় লিখুন।

অল ইণ্ডিয়া হাণ্ডলুম বোর্ড

শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই - ১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	২৭৭
সমবায় যুক্ত-চাষ	২৮০
মুরগি পালন	২৮৫
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার পুনর্গঠন	২৯৯
খেজুররসের রূপান্তর	৩০৩
চিনাবাদামের চাষ	৩০৫
‘সকলের তরে সকলে আমরা’	৩০৭
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়	৩০৯
সুপারির নিবিড় চাষের আদর্শ কার্যক্রম	৩১৩
ভারতের জলসেচের ব্যবস্থা	৩১৭
টুকিটাকি	৩১৯

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিধাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বসুন্ধরা

১২শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

এবার কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃষ্টি হ'ল এবং প্রায় ধারানুক্রমেই। এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গে এর আগে কোন বছর কেউ দেখেছেন ব'লে মনে করতে পারছেন না। এবারের সর্বনাশা বন্যাও হ'ল ওই অতিবৃষ্টির দরুন। অনেক জায়গায় আউশ-খরিফ ফসলের অনেকটাই জলের তলায় গেছে। অনেকের আমনের চাষ শুরুর্তেই গেছে নষ্ট হয়ে।

কিন্তু যা গেছে তার জন্য ভাবলে চলবে না। সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ, ভাবতে হবে তার কথা। লোকসানে হতাশ না হয়ে, সেই ক্ষতির মধ্যেই লাভের সন্ধান করা বিচক্ষণতা। বন্যা আমাদের সর্বনাশ করে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিছু আশার সঙ্কলন রেখে যায়—বিশেষ করে চাষের জমিতে। বন্যার জল নেমে গেলে দেখা যায়, জমিতে পলি জ'মে আছে। সেই পলি ফসলের উৎকৃষ্ট সার। তা ছাড়া ফসল যদি বন্যার জলে প'চে গিয়ে থাকে, তবে তা ভবিষ্যৎ ফসলের সার হয়ে রয়েছে জমিতে। পলি আর সেই পচা-সারের আশীর্বাদে সে জমিতে এর পরের ফসলের জন্য আর সারের দরকার নেই।

সাধারণ বছরে অগ্রহায়ণের গোড়াতেই শীতের টানে জমির রস শুরুর্তে শুরুর্ত করে। কিন্তু এবছর কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ব'লে এখনও জমি রয়েছে বেশ সরস। এ সুযোগে রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করুন অবিলম্বে। আরবী ভাষায় বসন্তকালকে বলা হয় 'রবি'। ফসলও

আরবী শব্দ। 'রবি ফসল' হচ্ছে বাসন্তী শস্য— অর্থাৎ যে ফসল বসন্তকালে ওঠে। রবিশস্যের চাষ শুরুর্ত করতে হয় এ সময়ে, তা হ'লে সেই ফসল পূর্ণতা লাভ করে বসন্তকালে।

আমনের ফসল তো অগ্রহায়ণ থেকে পৌষের মধ্যেই উঠে আসে। আউশের চাষ শুরুর্ত হয় বসন্তের শেষে কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে মাটি ভিজলে। মাঝখানে এই অগ্রহায়ণ-পৌষ থেকে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা কি জমি খালি প'ড়ে থাকবে? খাদ্যাভাবের দেশে তা থাকা কি উচিত? অথচ, দুরূহের বিষয়, আমাদের পশ্চিম বাঙলায় বাসন্তী শস্যের চাষে আমরা উদাসীন। অবশ্য, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি শুরুর্তে শুরুর্ত করে এবং এই শুরুর্তেই বসন্তকালের কালবৈশাখী পর্যন্ত। কাজেই এ সময়ে চাষ করতে হ'লে, জমিতে জলের যোগান চাই। এ রাজ্যের অনেক জমিতেই এখনও সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তা হ'লেও, দীর্ঘ-পুকুর-খাল-বিলের কাছাকাছি যেসব জমিতে সেচের জল পাওয়া যেতে পারে, সেসব জমির মালিকদেরও অনেকেই রবি ফসলের চাষে মন দেন না। এ সময়ে জমি ফেলে রাখাই যেন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তো দামোদর-ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা থেকে বড় মাঝারি আর ছোট নানা সেচ-পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে অনেক জমিতেই সেচের জল পাবার সুব্যবস্থা হয়েছে। সেসব জমির মালিকেরা অনায়াসেই রবি শস্যের চাষ দিয়ে জমি কাজে লাগাতে পারেন। তাতে

তাঁদের খাদ্যাভাব আর অর্থভাব তো কতকটা ঘুচবেই, দেশের শস্যভান্ডারেও কিছু সঞ্চার হবে।

এ বছর জমি এখনও বেশ সরস আছে বলে রাজ্যের সব অঞ্চলেই সেচের জলের দরকার হবে কম। এই সদুযোগে রবি ফসলের চাষ লাগিয়ে দিন, বন্যার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে তার অনেকটা পূরণ হবে।

রবি শস্যের মধ্যে প্রথমেই ধরতে হয় গমের কথা। আমাদের ধানের অভাব মিটিয়ে চলেছে গম। শুবু ভাতের ওপর নির্ভর করা আমাদের আর চলছে না, বহু ঘরেই এখন নিয়মিতভাবেই রুটিও চলছে। অথচ এ রাজ্যের গমের চাহিদার প্রায় সবটাই পূরণ করতে হচ্ছে বাইরের রাজ্য থেকে গম আমদানি করে। রবিখন্ডে জমি ফেলে না রেখে আমাদের চাষীভাইরা যদি ধানের মতই গমের চাষে মন দেন, তা হ'লে এই শস্যটির জন্য আমাদের আর বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে হয় না।

যব আর-একটা রবি শস্য। যব হচ্ছে 'বালি'। 'বালি' বলতে যবচূর্ণ আমাদের ঘরে ঘরে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। যবের ছাতুরও চল রয়েছে। অথচ এই যবের জন্য আমাদের চেয়ে থাকতে হয় বাইরের দিকে। একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে, এই ফসলের চাষে জলের দরকার বিশেষ হয় না। জইও রবি ফসল। ইংরেজী 'ওট' নামটা আমাদের বেশি পরিচিত। জই খাদ্য হিসাবে অতি পুষ্টিকর। বাইরে থেকে আমদানি হয়ে জই-এর খাবার আমাদের দেশের বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়, অথচ আমাদের চাষের ফসল দিয়েই আমাদের চাষীভাইরা এ রাজ্যের বাজার ভরিয়ে রাখতে পারেন। এর চাষেও সেচের দরকার বেশি নেই।

বাঙালীর প্রধান খাদ্য যে ডাল-ভাত, তার মধ্যে চালের চাহিদা আমাদের চাষ থেকে যতটা মেটে, ডালের চাহিদা মেটে তার চেয়েও ঢের কম। পুষ্টি-গুণে সমৃদ্ধ ছোলা একটা রবি শস্য। আমন ধানের জমিতে ছোলা, মটর, খেসারি, মসুরি—এ সব

ডালই বিনা সেচে জন্মানো যায়। ধানের ফসল যখন পেকে ওঠে, তার জমির জলটা যখন শুকিয়ে ওঠে অথচ মাটি একটু ভিজ়ে মত থাকে, সেইসময় বীজডাল বুনো দিতে হয়। বীজডাল আগে ভিজ়িয়ে রেখে, কল ওঠার পরে বুনো দিলে, গাছ হয় খুব তাড়াতাড়ি। ধানগাছের গোছাগুলো ধরে ডালগাছ লাতিয়ে ওঠে। ধান পেকে গেলে, গাছ-গুলোর নিচের দিকের অনেকটা অংশ রেখে কাটতে হয়। ধানগাছের লম্বা নাড়াগুলোর অবলম্বনেই ডালের ফসলে ক্ষেত ছেয়ে যায়। চাষে জলও লাগে না, সারও দিতে হয় না, উলটে সব রকম ডালের গাছের শিকড় থেকেই জমি প্রচুর নাইট্রোজেনের যোগান পায়। ডাল ফসল পাকলে, যদি শর্ট-গুলো তুলে নিয়ে গাছগুলো জমিতেই রেখে দেওয়া হয়, তা হ'লে ধানের নাড়া সমেত সেইসব গাছ চাষে মাটিতে মিশিয়ে দিলে, জমি প্রচুর জৈবসারও পায়। এ ছাড়া আলুরও চাষ করা যায় রবি ফসল হিসাবে। আমাদের ঘরে ঘরে আলুর চাহিদা ডালের পরেই।

এবার কান্তিক মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় ফুল-কপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, বেগুন, ওলকপি, গাজর, টম্যাটো, পেঁয়াজ প্রভৃতির জলদি ফসলের চাষ লাগানো যায় নি। তার ফলে অগ্রহায়ণে শীতের শুরুর্তে এবার তরকারির বাজার আগুন। এ আগুনে জল ঢালতেই হবে। ভাদ্র-আশ্বিনে এসবের চাষ লাগানো যায় নি বলেই যে এ বছর আর লাগানো যাবে না তা নয়। নারি হিসাবে চাষ করলে শীতের এসব ফসলই বাসন্তী ফসলে দাঁড়িয়ে যায়। ফলনও কম হয় না। সুতরাং অবিলম্বে মাটি সরস থাকতে থাকতে এসব ফসলের চাষ লাগিয়ে দিন।

বেগুন শীতের সবজি হিসাবে প্রশস্ত তো বটেই, তা ছাড়া বাসন্তী ফসল হিসাবেও বেগুন চাষের রেওয়াজ আছে। লঙ্কা তো রবি ফসলই। ক্ষেতি কুমড়া, লাউ, শশা—এসবও রবি ফসল। ফুটি, কাঁকড়া, তরমুজ—এসবও বসন্ত-গ্রীষ্মের ফসল, এগুলোর চাষ এসময়েই লাগানো যেতে পারে।

এত রকমের ফসল নিয়ে যদি আমরা বাসন্তী চাষের অভিযান চালাই, তা হ'লে বন্যা যেখানে দুঃখের ছায়া ফেলে গেছে, আনন্দের আলোকে সে-স্থান ঝলমল ক'রে উঠবে। রবি ফসলের চাষে যাঁরা উৎসাহ পান না, এবারের বিলম্বী বৃষ্টি আর বন্যা তাঁদের সামনে এনে দিয়েছে এ চাষে উৎসাহী হবার সুযোগ। এ সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন না। একবার যদি তাঁদের এ উৎসাহ সার্থক হয়ে ওঠে তবে বাসন্তী

খন্দে তাঁরা নিশ্চয়ই আর জমি ফেলে রাখবেন না। আজকের খাব্যভাবের দিনে চাষীভাইদের কাছে সেইটাই দেশের দাবি। দোফসলী নয়—জমিতে তেফসলী চাষ চালাতে হবে। আউশে, আমনে, রবিতে বছরে তিনটে ফসল তুলতে হবে জমি থেকে। চাষীভাইরা, নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলুন, কোমর বাঁধুন, লাঙল, কোদল, হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ুন রবি-চাষে।



সমবায় যুক্ত-চাষ

শ্রীজওহরলাল বেহর

কংগ্রেসের নাগপদুর অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্ত-চাষ। কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসর আমরা সহায়ক সমবায়ের প্রতি মনোযোগ দেব। এইসঙ্গে আরও বলা হয়েছিল যে, সমবায় স্বাভাবিকভাবে স্বেচ্ছামূলক এবং যদি যুক্ত-চাষ ব্যবস্থা চালু হয়, তা হ'লে তা সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মতি নিয়েই হবে।

যুক্ত সমবায় চাষ শেষ পর্যন্ত যৌথ খামারে পরিণত হবে—এই যুক্তি দ্বারা অনেক-কিছু বোঝায় এবং এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক্ষেত্রে অনুমান করা হচ্ছে যে, যেখানে যুক্ত-চাষ আছে সেখানে সমবায় নেই। যুক্ত-চাষ সম্পর্কে আমি অনেক সমালোচনা শুনছি কিন্তু এই ধরনের যুক্তি এই প্রথম শুনলাম। যুক্ত-চাষ অবশ্যই আপন প্রয়োজনে যৌথ-চাষে পরিণতি লাভ করবে—একথা বলা আমার কাছে বরং অশুভ মনে হয়। যৌথ-চাষে আমার বিশ্বাস নেই; এ সম্পর্কে আমি মন খুলেই কথা বলতে চাই কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করতে চায় করুক। আমি তাদের পথে বাধা হব না, আমি তাদের উৎসাহিতও করব না। কিন্তু আমি সমবায় বিশ্বাস করি এবং যুক্ত-চাষের যথার্থতা সম্পর্কে আমার দৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ সম্পর্কে আমার কোন দ্বিধা নেই এবং আমি আমার নিজের বিশ্বাসের কথা গোপন করতেও চাই না। আমি কৃষকদের এ ব্যাপারে রাজি করাবার জন্য মাঠে মাঠে প্রত্যেকের কাছে যাব। তারা রাজি না হ'লে যুক্ত-চাষ করতে পারব না। এটা একটা আলাদা জিনিস। তাদের রাজি হওয়া দরকার। একথা আমি বলছি না যে, এই ব্যাপারে বা অন্য কোন ব্যাপারে পৃথিবীর সব দেশেই সাধারণ নীতি অনুসৃত হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সকল দেশের জন্য একই সাধারণ নীতি গ্রহণ ঠিক নয়। প্রয়োগের জন্য

স্বভাবতই আমাদের কতকগুলি সাধারণ নীতি থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দেশের প্রকৃত অবস্থা ও তথ্যাদি বিচার করা দরকার এবং এক দেশের জিনিস আর-এক দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তা সে দেশের উপযোগী নাও হ'তে পারে। ভারতের কৃষকদের সম্পর্কে আমি যদি কোন প্রস্তাব করি তো তা করব এই ভেবে যে, তা ভারতের অবস্থায় বাঞ্ছনীয় ও লাভজনক। আমি ভুল করলাম না ঠিক করলাম সেটা অন্য কথা। এই পরিবর্তনশীল জগতে কয়েক বছর পরে আমি বা আর কেউ কীভাবে ভাবব তা বলতে পারি না, কারণ একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের যুগে রয়েছি আমরা।

আমি ঐতিহ্যের বিরোধী নই, কিন্তু আমি মনে করি যে, ভারতকে যতখানি সম্ভব গতানুগতিকতা ত্যাগ করতে হবে। ভারতের অনেক ঐতিহ্য আছে। আমি সমস্ত ঐতিহ্যের কথা বলছি না—সেকথা আমি বলতেও পারি না। কিন্তু আমরা কোন-না-কোন-ভাবে ঐতিহ্যপন্থী, মৌলিক নীতিবাদী ইত্যাদি হয়ে পড়েছি।

সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা যাই করি না কেন তা সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের আগ্রহজনিত হওয়া দরকার—এ সম্বন্ধে বিচার করার সময় আমাদের এর তাৎপর্য মনে রাখতে হবে। তা না হ'লে ভাল-মন্দের কথা বাদ দিলাম, সেটা সমবায়ই হবে না, সমবায়ের নামে হয়ে দাঁড়াবে অন্য কিছু।

বলা হয় যে, এই ধরনের চাষ-আবাদে পৃথিবীর কোন দেশেই ভাল ফল দেখা যায় নি। আমার মনে হয়, এই রকম একটা সাধারণ মন্তব্য করা নিরাপদ নয়। কারণ ভাল ফল যে দেখা গিয়েছে তার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। যুগোস্লাভিয়া ও পোল্যান্ডের ঘটনার উল্লেখ করে আরও বলা হয় যে ঐ দুই দেশে যৌথ-চাষপ্রথা বর্জন করা হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবিত যুক্ত-চাষকে যৌথ-চাষ ব'লে ধ'রে নিয়ে এ যুক্তি দেওয়া সত্যিই অশুভ যে, যেহেতু কোন কোন জায়গায় যৌথ-চাষ ব্যর্থ হয়েছে, অতএব যুক্ত-চাষও ব্যর্থ হবে। এখানে এ দুটোকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অবশ্য আমি জানি না এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত ভুল।

আমি যুগোস্লাভিয়া বা পোল্যান্ড কিংবা সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীনের ঘটনার বিচার করতে চাই না। অপর দেশে এমন অনেক-কিছু ঘটে যা আমি পছন্দ করি না। সব অপছন্দ—তাও করি না। কখনও কখনও লোকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন, কিন্তু আমি সর্বদাই তাতে অনিচ্ছুক, কারণ অন্য দেশকে বিচার করতে যাওয়াটা নীতির দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রসঙ্গত নয় ব'লে আমি মনে করি। সমস্ত ঘটনা, পরিস্থিতি এবং তার পটভূমি ব্যতিরেকে শুধু খবরের কাগজে প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটা দেশকে বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই-ভাবে অন্য দেশ আমার দেশকে বিচার করবে, তাও আমি চাই না। কাজেই যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীন ঠিক করছে কি করছে না, তাদের কোন লাভ হচ্ছে কি হচ্ছে না, আমি বলতে পারব না। এটা তারাই ভাল জানে।

ভারতে আমাদের এমন অবস্থায় কাজ করতে হবে যেখানে ব্যক্তিগত জমির গড় পরিমাণ অত্যন্ত কম। পরিমাণটা আমি সঠিক জানি না—এক একর, দু' একরও হ'তে পারে। তার উপর নিশ্চয়ই বহু লোকের এক একর জমিও নেই। এই অবস্থায় আপনি কী করবেন? ঐ জমির পরিমাণ যদি ২০ কি ৫০ একর হ'ত, তা হ'লে আমাদের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'ত। তা হ'লে ব্যাপারটা আমরা অন্যভাবে চিন্তা ক'রে দেখতাম। শুধু নামের জন্য যুক্ত-চাষ বা অন্য-কিছু সম্পর্কে আমার কোন মোহ নেই। আপনি না হয় কাজ করার একটা সুযোগ পেলেন, কিন্তু যে লোকটার মাথায় এক একর-মত জমি আছে সে ঐ জমি নিয়ে করবে কী? আর ভারতে এই রকম লোকের সংখ্যাই বেশি। অবশ্যই

সে জমির উন্নতি করবে। আমরা তাকে ভাল বীজ, সেচের জল, সার, আধুনিক যন্ত্র ইত্যাদি দেব। ধীরে ধীরে এসব তাদের দিতেই হবে। বেশ, দিলাম, কিন্তু তাতে কী? তাতে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান হব যদি চাষের জমির পরিমাণ বেশি হয়। এক একর জমি মালিককে কোনদিনই পেটভরে খেতে দেবে না। মরসুমটা ভালয় ভালয় কাটলে সে হয়তো একটু বেশি খেতে পেল, এইমাত্র। কিন্তু আবার তাকে সেই অধঃশনের অবস্থায় পড়তে হবে। এক একর জমিতে তার কোন ভবিষ্যৎই নেই। অবশ্য বর্তমানে জমি থেকে জীবিকানির্বাহ করার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং তাদের অন্য পেশায়, যেমন শিল্প—সে বড় বা মাঝারি শিল্প বা কুটিরশিল্প হোক—নিয়োগ করতে হবে। এটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে অন্য পেশায় নিয়োগ করে জমির উপর চাপ কমাতেই হবে। মোট কথা কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সব-কিছুই করতে হবে। তা সে নীতিগত ব্যবস্থা বা অন্য যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, ভারতের অবস্থায় যুক্ত-চাষই সঠিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তার উপায় এখানে আমি নির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করতে চাই এবং তা হচ্ছে সম্মতি-ভিত্তিক। নীতিগত দিক ছাড়াও এটা যদি বাস্তব দিক দিয়ে বিচার করা যায়, তা হ'লে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে। আমি ভালভাবেই জানি যে, আমাদের কৃষকরা রক্ষণশীল—আমরা চাইলেই তারা সহজে তাদের অভ্যাস বদলাতে পারে না। বস্তুটা না ক'রে তাদের সামনে সাফল্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। যদি তাদের বোঝানো যায় যে, তাদের প্রতিবেশীরা লাভবান হয়েছে, একমাত্র তবেই তাদের বিশ্বাস হবে, অন্যভাবে নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কৃষকদের উপরই নির্ভর করছে—আমার উপর বা অন্য কারও উপর নয়। আমাদের শুধু তাদের কোন একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় বিশ্বাস জন্মানো সম্পর্কে যথাসম্ভব কাজ করা উচিত।

পরবর্তী তিন বছর আমরা সহায়ক সমবায়ের উপর জোর দেব—আমাদের এই কথা থেকেই এটা

বোঝা যায়, যে, আমরা এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছি না। কৃষকদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে। আগে তাদের সহায়ক সমবায় হোক। সংসদে এজন্য কোন আইন পাস হবে না। তারা নিজেরাই যদি পরিবর্তন চায় কে তাদের আটকাবে? বস্তুত যদি কোন সমবায় সমিতি যুক্তভাবে চাষ করতে চায়, তা হ'লে কে তাদের আটকাবে? কেউ না। এতে বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্নই নেই। কোন নতুন আইনেরও প্রশ্ন নেই। সমিতি নিজের ইচ্ছাতেই এটা করছে। আসলে অনেকে তা করেছে। সমবায় চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এর কোন গুণ আছে কিনা? এমনও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, সমবায় গমের চাষে-যতটা উপযোগী, ধানের চাষে ততটা উপযোগী নয়। এসব প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে পারে।

চাষ-আবাদ সম্পর্কে 'অনেক জানি' বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবে বহু বছর ধরে আমার নিজের রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার রয়েছে। সেদিক দিয়ে বা যেভাবেই হোক আমার মনে হয়েছে যে, যুক্ত-চাষ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া কিছুই নেই। প্রতিক্রিয়া অন্য কিছু ব্যাপারে—সেটা হচ্ছে ভয়। এই ভয়ই বারবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের পশ্চাতে বা অতীতে কী আছে আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, পৃথিবীতে এবং ভারতে এমন-সব ঘটনা ঘটছে, যা দেশের অবস্থা দ্রুতগতিতে বদলে দিচ্ছে। জমি বা শিল্প অথবা অন্য-কিছু যাতেই হোক আমরা গতানুগতিকতার পথ ধরে চলতে পারি না।

আমাদের সামনে যে সমস্যা তা এমনিতেই বিরাট। ভারতে ৪০ কোটি নরনারীকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া এক বিরাট ব্যাপার এবং এই যাত্রাপথে আমাদের অনেক রূপান্তর ঘটবে।

যুক্ত-চাষ প্রসঙ্গে এখানে সমবায় সম্পর্কে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যুক্ত-চাষ নয়, ছোট গ্রাম সমবায় সমিতির সংখ্যা দিচ্ছি। ১৯৫০-৫১ সালের শেষে এই সংখ্যা ছিল ১,১৬,০০০। ১৯৫৬-৫৭ সালে হয় ১,৫৯,০০০। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে এই সংখ্যা আরও বাড়ে এবং হয় ১,৭৯,০০০। এগুলি ছোট সমিতি, বড় নয়। গ্রাম সমবায় সমিতির সদস্য-সংখ্যার কথাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-৫১ সালে সাড়ে ৫১ লক্ষ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯১ লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১০ লক্ষ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে আনুমানিক ১৩৮ লক্ষ।

বড় সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে : ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ১,৯১৫, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪,৫২৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬,৩১৮।

তারপর এইসব সমিতি যে-পরিমাণ ঋণ দিয়েছে তা লক্ষ্য করবার মত। এই ঋণ শতকরা ৮০টি সমিতি দিয়েছে। বড় সমিতিগুলি দিয়েছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। ১৯৫০-৫১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২২ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৯ কোটি ৬২ লক্ষ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৩ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯৬ কোটি এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের পরিমাণ হচ্ছে ১৩০ কোটি টাকা। এ থেকেই সমবায়, বিশেষ করে ছোট সমবায়, সমিতির উল্লেখ-যোগ্য—আমি বিরাট বলতে চাই না—উন্নতি সূচিত হচ্ছে।

এবার যুক্ত সমবায় চাষ সমিতির কথা ধরা যাক। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে এরূপ সমিতির সংখ্যা ছিল ২,০২০। এখানে অবশ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী সমবায় চাষ, কথাটা প্রয়োগ করা যায় না। কারণ কখনও কখনও সমিতি জমির মালিক হয়; সমিতি জমির মালিক তবু কোন কোন ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ হয় ব্যক্তিগতভাবে। এই ধরনের চাষ সমিতি অর্থাৎ যেখানে পৃথগ্ভাবে চাষ হয় তার সংখ্যা বাদ দিলে যুক্ত এবং যৌথ-চাষ সমিতি অর্থাৎ যেখানে যুক্তভাবে চাষ-আবাদ হয় তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩৫৭, তার মধ্যে ৯৬৬টি যুক্ত-চাষ এবং ৩৯১টি যৌথ-চাষ সমিতি।

একথা অবশ্য সত্য যে, এগুটির মধ্যে কতকগুলি সমিতি ভূমি-সংস্কার আইন ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল।

আমি একথা বলি না যে, এই সমিতির সবগুলিই খুব ভাল বা খুব সার্থক বা আদর্শমূলক। কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যেই সার্থক যুক্ত-চাষ সমিতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুটি গত দুই কি তিন বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে এবং তা কোন লোকের চাপে নয়, এমন কতকগুলি কারণ নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছিল, যার জন্য বাধ্য হয়ে কৃষকরা এই রকম সমিতি গঠন করেছে। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচি মূল্যায়ন-সংস্থা সমবায় চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধান বিষয়ে তাঁদের বিবরণী দিয়েছেন। আড়াই বছর আগে প্রকাশিত এই বিবরণীতে দেখা যায়, তাঁরা উক্ত সমস্ত সমিতির পৃথগভাবে মূল্যায়ন করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে আরও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করছেন।

কিছু লোক সন্দেহপরবশ হয়ে আর-একটি প্রশ্ন তুলেছেন। সেটা হচ্ছে, মাথা-পিছু জমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে। এ প্রশ্ন নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে। বাইরেও এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেসও কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং পরিকল্পনা কমিশনও এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁরা বারবার এ সম্পর্কে তাঁদের সুপারিশও পেশ করেছেন। বস্তুত কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছে।

এ সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এইসব সিদ্ধান্ত—তা সে সমবায় সম্বন্ধেই হোক আর জমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধেই হোক—হঠাৎ কারুর মাথায় আসে না। বছরের পর বছর ধরে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিচার-বিবেচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রণা গতির জন্য আমাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যা হোক এ সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়েছে। কংগ্রেসের সদস্য ছাড়াও দেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি সুপারিশ করেছেন। সে সুপারিশ

নিয়ে আবার আলোচনা হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু আলোচনা এবং গভীর বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

‘সমবায়ের কথা যখন বলা হয় তখন সেইসঙ্গে উৎপাদন-লক্ষ্যের কথা বলাটা কি আবাস্তব নয়?’—প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সমবায় থাকলে সেইসঙ্গে উৎপাদন-লক্ষ্য থাকবে না কেন? স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায় করতে গেলে উৎপাদন-লক্ষ্য থাকতে পারে না—এটা প্রমাণ করার জন্য আবার মিঃ গোমুলকার উদ্ভৃতি দেওয়া হয়েছে। মিঃ গোমুলকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বলি কি, সমালোচকরা মিঃ গোমুলকার উদ্ভৃতি না দিয়ে নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারতেন। এটা অবশ্য সত্য যে, সমবায়ের লক্ষ্য কীভাবে স্থির করব? তবে জমির উৎপাদনের নিশ্চিত একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। হয়তো সে লক্ষ্য পৌঁছানো গেল না—সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু লক্ষ্য স্থির করাটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।

সমবায়ের কথা বাদ দিন। একজনের এক খণ্ড জমি—আয়তন ১০ একর বা যাই হোক। আমরা এই জমির উৎপাদন সম্পর্কে কোন লক্ষ্য স্থির করতে পারি কি পারি না? আমি সঠিক একটা লক্ষ্য এবং তাতে পৌঁছানোর কথা বলছি না। কিন্তু হিসাব করে শতকরা ২০ ভাগ কি ৩০ ভাগ বেশি উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে। আমরা যদি এটা একজনের জমি সম্পর্কে করতে পারি, তা হলে একরে ১০ জন বা ২০ জনের জমির ব্যাপারে তা করতে এবং তাকে সমবায় বলতে পারব না কেন বুঝি না? অন্য ভাষায় বলতে হয় যে, সমবায়-নির্বিশেষে কোন জমির উৎপাদন পরিমাণ কেউ কখনও বলতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই এক অসাধারণ উক্তি—সকল রকম বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান এবং যে কোন রকম ব্যবস্থার বিরোধী।

আজ এমন কেউ নেই, তা সে ধনতান্ত্রিক, সমাজ-তান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজের লোক হোক, যে

পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে না। এটা স্বীকার্য যে, পরিকল্পনার জন্য অনুসৃত নীতির তফাত হ'তে পারে। কিন্তু যে মূহুর্তে আপনি পরিকল্পনা করছেন সেই মূহুর্তে আপনাকে একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবেই—সে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাক বা না যাক। এই লক্ষ্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, আমরা কী করতে চাইছি। এজন্য কিছুটা হিসাব করতে হয়, যেমন—ভাল বীজ ও সার ব্যবহার এবং বেশি শ্রম নিয়োগ ক'রে কতখানি কী আমরা উৎপাদন করতে পারব। এটা হিসাবের জিনিস এবং খুব সঠিক না হ'লেও হিসাব করা কঠিন নয়। এই হিসাব যদি আবার বিরাট পরিমাণের ক্ষেত্রে করা যায়, তা হ'লে হিসাবের ভুল কম হয়।

আর-একটি প্রশ্ন করা হয় যে, একীকরণ কি সমবায়ের ভবিষ্যৎ কাঠামো গঠনের আগের একটা

প্রয়োজনীয় অবস্থা? তা হ'লে এটা স্বেচ্ছামূলকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না কেন?

একীকরণ যদি গ্রামে যুক্ত-চাষের অঙ্গ হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই একীকরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবিলম্বে যুক্ত-চাষ প্রবর্তিত হচ্ছে না, তাই একীকরণের প্রয়োজন আছে। এতে লাভই হবে এবং সেজন্য একীকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। 'বাধ্যতামূলক' কথাটা ব্যবহার করা হয় তখনই, যখন এই মর্মে বিল পাস হয়ে যায়। তা বলবৎ করতে সহযোগিতার দরকার; সংশ্লিষ্ট লোককে বোঝানো দরকার যে, একীকরণ মানে তাকে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয়, তার জমি ঐ এলাকার আর সকলের জমির সঙ্গে যুক্ত ক'রে একযোগে চাষ করা।

[ইকনমিক রিভিউ' থেকে অনূদিত]



মুরগি পালন

জমি নির্বাচন

যেসব জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁকর, বালি এবং চূনের অংশ থাকে, সেইসব জমিতে সাধারণত মুরগি ভাল থাকে। যে জমিতে জল দাঁড়ায় না এবং বৃষ্টির পরেই কাদা হয় না সেইসব জমিই মুরগি পালনের পক্ষে উপযুক্ত।

পশ্চিম বাঙলার প্রায় সর্বত্র মুরগি পালন চলতে পারে। আজকাল অনেকেই মুরগি পালনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন—যাতে ক'রে মুরগি বা ডিম বিক্রি ক'রে লাভবান হওয়া যায়। অনেকেই ভবিষ্যতে বড় খামারী আকারে মুরগি পালনের জন্য সরকারী মুরগি-পালনক্ষেত্রে শিক্ষানবিস হয়ে কাজ ক'রে থাকেন। বড় আকারে মুরগির খামার করতে গেলে এই কথাই সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, খামারে যে ডিম বা মুরগি উৎপন্ন হবে, তার সবই যেন অনায়াসে ভাল দামে বিক্রি হয়ে যায় এবং বিক্রয়-কেন্দ্রে নিয়ে যাবার আনুষ্ঠানিক খরচও যাতে কম হয়। কাজেই খামারের জন্য যে জমি ঠিক করা হবে, তা শহরে, শহরতলিতে বা রেল-স্টেশনের ধারে করা দরকার।

মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

বর্তমানে মুরগির পালনপদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে। মুরগি পালন করার নানা পদ্ধতি আছে, যেমন—

- (১) স্বচ্ছন্দ বিচরণ,
- (২) নির্দিষ্ট স্থানে পালন,
- (৩) আবদ্ধ অবস্থায় পালন।

(১) স্বচ্ছন্দ বিচরণপদ্ধতি

সাধারণত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এই পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়। মুরগিদের বিচরণের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। যেখানে-সেখানে নিজেদের

খেয়ালখুশিমত তারা বিচরণ করতে পারে। সাধারণত দেখা গেছে যে, একরপ্তি ১০০ মুরগি রাখলে তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের কোন বাধা হয় না বা জমিও মুরগি রাখবার ফলে দূষিত হয় না। এই পদ্ধতিতে মুরগিরা বিচরণকালে তাদের অধিকাংশ খাদ্য সংগ্রহ করে। তার ফলে তাদের খাবার খরচ অনেক কম পড়ে। তবে এতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না, তাই অল্প খরচে তাদের জন্য সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা লাভজনক হ'লেও, এতে বিপদও কম নয়। কারণ বিচরণকালে কুকুর, শেয়াল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা মুরগি আক্রান্ত হ'তে পারে; তা ছাড়া নানাপ্রকার রোগ সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

(২) নির্দিষ্ট স্থানে পালন

এই পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট বাসস্থানে মুরগি পালন করা হয়। এই পদ্ধতি স্বল্পপস্থানে অধিক-সংখ্যক মুরগি পালনের পক্ষে সুবিধাজনক। এতে ১ একর জমিতে ৩০০ মুরগি অনায়াসে পালন করা যায়। প্রকৃতি থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, সেইসব থেকেও তারা বঞ্চিত হয় না। তারা কাঁচ কাঁচ ঘাস বা পোকামাকড় প্রভৃতি খেতে পারে।

(৩) আবদ্ধ অবস্থায় পালন

যাঁরা ডিমের ব্যবসা করতে চান বা যাঁরা শুধু ডিম খাবার জন্য মুরগি পালন করতে চান, তাঁদের পক্ষে আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন করাই ভাল। এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট আবদ্ধ স্থানে মুরগি পালন করা হয়—সেখান থেকে মুরগিদের কোন সময়ে জমিতে যেতে দেওয়া হয় না। আবদ্ধ স্থানে থাকতে হয় ব'লে মুরগিগুলো প্রকৃতির দান থেকে বঞ্চিত হয়, অর্থাৎ তারা ঘাস বা পোকামাকড় প্রভৃতি খেতে পায় না, এবং ছোটোছোটো ক'রে চ'রে বেড়াতে

পারে না বলে তাদের দৈহিক ব্যায়ামও হয় না। সেইজন্য তাদের খাবারের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে, এই পদ্ধতিতে মুরগি পালন করেও যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া গেছে।

আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন সাধারণত দুই রকমে করা হয়ঃ

(ক) ডিপ লিটার সিস্টেম

এই পদ্ধতিতে প্রতি মুরগির জন্য ৪ বর্গফুট জায়গা দেওয়া হয়। এতে মুরগির ঘরটা দক্ষিণ-মুখো হওয়া উচিত—যাতে গরমের সময়ে হাওয়া এবং শীতকালে রোদ প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে। আর এই ঘরের মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো, কুচো করে কাটা খড় স্তরে স্তরে বিছিয়ে দিতে হয়। তা হলে মুরগি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। কারণ তারা ঐ খড় বা গুঁড়োর মধ্যে খাদ্যের সন্ধানে পা দিয়ে আঁচড়ায়, ফলে তাদের ব্যায়াম হয়। তা ছাড়া মলমূত্র প্রভৃতি খড়ের বা গুঁড়োর মধ্যে পড়ার পর সেগুলো উলটে দেওয়া যায়। তার ফলে দুর্গন্ধ তো হয়ই না উপরন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন একটি আব-হাওয়ার সৃষ্টি হয় যা মুরগির স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। এই পদ্ধতিতে মুরগি পালন করে দেখা গেছে যে, এটা বেশ বিজ্ঞানসম্মত ও লাভজনক। তবে বর্তমানে আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালনের পদ্ধতি আরও উন্নততর হয়েছে। এ থেকে বর্তমানে আর এক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে যা আরও সন্তোষজনক। তার নাম “হেন্ ব্যাটারি সিস্টেম”।

(খ) হেন্ ব্যাটারি সিস্টেম

এই পদ্ধতিতে মুরগি-পালন সবচেয়ে লাভজনক। এই পদ্ধতি পাশ্চাত্যে প্রচলিত। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি দেখা যায়। যারা মুরগি পালনে ইচ্ছুক অথচ যাদের প্রচুর পরিমাণ জমি-জায়গা নেই তাঁরাও মুরগি পালন করতে পারেন এই পদ্ধতিতে।

এই ব্যবস্থায় খুব অল্প আয়সে মুরগি পালন করা সম্ভব হয়। এতে প্রতি মুরগির জন্য মাত্র ১ই থেকে ২ বর্গফুট জায়গার দরকার হয়।

একটু আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এই পদ্ধতিতে মুরগি পালনে আমাদের কত সুবিধা হয়।

(১) এতে অতি অল্পস্থানেও অধিকসংখ্যক মুরগি পালন করা যায়। অতি অল্প জমির উপর দুইতলা বা তিনতলা খাঁচা তৈরি করে নিজেদের ইচ্ছামত মুরগি রাখা চলে।

(২) এই পদ্ধতিতে খাটুনিও যথেষ্ট কম। একজন লোক এক ঝলক দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মুরগির অবস্থান অবগত হতে পারেন। প্রত্যেকটি মুরগির খাবার আছে কিনা কিংবা কোন মুরগি অসুস্থ কিনা সেটা অতি সহজেই জানা যায়। প্রত্যেকটি মুরগি ধরবার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, খারাপ আবহাওয়ায় কাজ করার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সাধারণত ঝড়বৃষ্টিতে, দেখা গেছে যে, খাবার নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এই পদ্ধতিতে খাবার নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। খারাপ আবহাওয়াতেও মুরগিরা শান্তিতে থাকে।

(৩) রোগ অথবা বাইরের জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের কোন ভয় থাকে না। কোন সংক্রামক রোগে একটা মুরগি আক্রান্ত হলে অন্য কোন মুরগির মধ্যে সেই রোগ ছড়াতে পারে না।

(৪) এই পদ্ধতিতে বেশি লোকের প্রয়োজন হয় না। মাত্র একজন লোক কয়েক হাজার মুরগি এই পদ্ধতিতে পালন করতে পারে। ফলে এতে খরচাও অনেক কম পড়ে।

(৫) অনেক সময় দেখা যায় মুরগিরা ডিম পাড়বার পর ডিম ভেঙে ফেলে বা খেয়ে ফেলে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনায় নির্মিত কোন খাঁচায় মুরগি ডিম পাড়লে তা নষ্ট হবার কোনও আশঙ্কা থাকে না।

(৬) সাধারণত মদুরগি পালন করতে হ'লে একজন লোককেও অন্তত তদারক করবার জন্য সব সময় থাকতে হয়। তার ফলে বাইরে কোথাও যাবার প্রয়োজন হ'লে অনেকেই অসুবিধায় পড়েন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সেই অসুবিধা ঘটে না। কয়েক দিনের জন্য বাইরে গেলেও, সেই কদিনের জন্য খাবার রেখে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারা যায় আর ফিরবার পরও সেই কদিনের ডিম পাওয়া যায়।

(৭) বৃন্দ বা সাধারণ কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে অক্ষম এমন লোকও এই পদ্ধতিতে মদুরগি পালন করে লাভবান হ'তে পারে। দেশের ও দশের উন্নতির জন্য এই পদ্ধতির প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মদুরগি বাছাই

এ রীতিতে মদুরগি পালন করতে হ'লে কী ধরনের মদুরগি বাছাই করা উচিত সে সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। সাধারণত সব রকমের মদুরগিই এই পদ্ধতিতে পালন করা চলে; তা হ'লেও, যেসব জাতের মদুরগির জীবনীশক্তি বেশি সেইসব জাত বাছাই করা উচিত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 'হোয়াইট লেগহর্ন' মদুরগি এই পদ্ধতিতে পালন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, অন্য কোন কোন জাতের মদুরগি পালনেও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

'রোড আইল্যান্ড রেড' জাতের মদুরগি পালন করা বেশ লাভজনক। তবে এদের পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হ'তে একটু বেশি সময় লাগে। তাই সবচেয়ে বেশি উপযোগী হিসাবে দো-আঁসলা মদুরগি নির্বাচন করা যেতে পারে। কারণ তাদের মধ্যে দু'জাতের মদুরগিরই যোগ্যতা বর্তমান। তাদের জীবনীশক্তি প্রখর ও দীর্ঘ আর তাদের ডিম পাড়বার ক্ষমতাও বেশি। অতি অল্পদিনেই তারা পূর্ণত্ব লাভ করে।

খাঁচায় আবদ্ধ করা

খাঁচায় মদুরগি আবদ্ধ করার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি থাকতে পারে। তবে সাধারণত শরৎকালের প্রথমদিকে

অর্থাৎ অগাস্ট মাসের শুরুর থেকে মদুরগিকে খাঁচায় আবদ্ধ করা যেতে পারে। অগাস্ট মাস থেকে শুরুর ক'রে জুন বা জুলাই পর্যন্ত হ'ল আটক রাখার ঠিক সময়। তবে মদুরগিকে আবদ্ধ করবার পূর্বে একটা কথা স্মরণ রাখা একান্ত দরকার। এটা আমাদের লক্ষ্য করা দরকার যে, মদুরগিকে ডিম পাড়বার অন্তত একমাস আগে আবদ্ধ করা উচিত। কারণ তাদের ঐ আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সময় দিতে হবে। কোন মদুরগিকে ডিম দেওয়া অবস্থায় খাঁচায় আবদ্ধ করলে তার ডিম দেওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাতে সকলে হতাশ হ'তে পারেন কিন্তু সেজন্য দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই। কারণ কিছুদিন বাদে ওরা নিজেদের অভ্যস্ত ক'রে নেবার পর আবার ডিম দিতে শুরুর করে।

খাবার দেওয়ার নিয়ম

একটা মদুরগিকে আমরা একটা যন্ত্রের সাথে তুলনা করতে পারি। একটা যন্ত্র যেমন তেল দিলে সেটা স্ফুটভাবে চলে, তেমনি একটা মদুরগিকে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার ও জল দিলে নিয়মানুযায়ী ডিম পাওয়া যায়। এই প্রথায় খাদ্য দেওয়ার নানা প্রকার রীতি বর্তমান।

- (১) মিশ্রিত শুষ্ক খাদ্য,
- (২) বটিকা আকারে স্ফম খাদ্য,
- (৩) শস্য খাদ্য
- (৪) ভিজ়ে খাদ্যের মিশ্রণ

(১) মিশ্রিত শুষ্ক খাদ্য

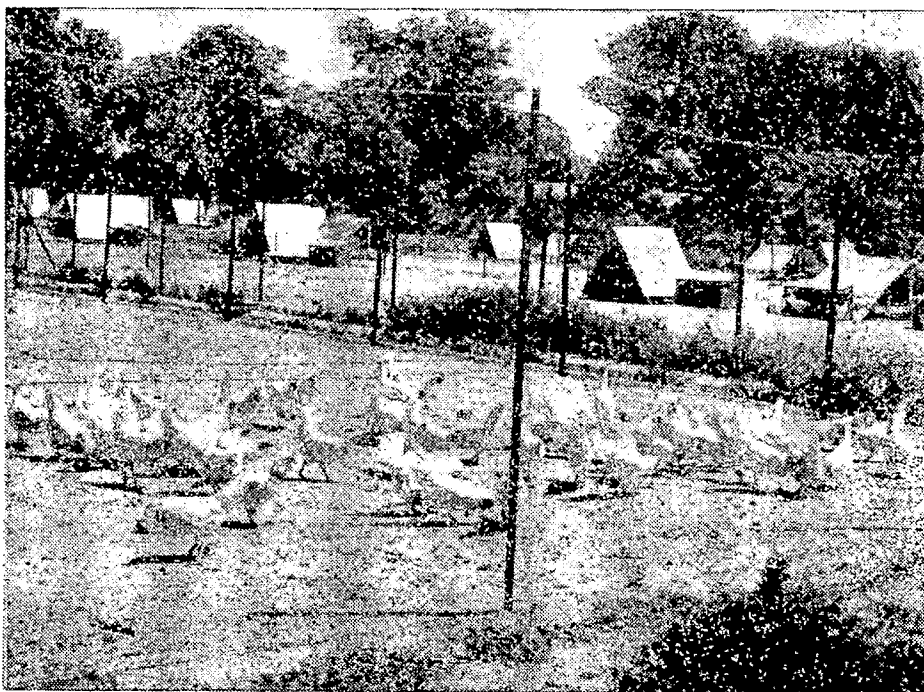
এই পদ্ধতিতে নানারকম খাদ্যকে শুষ্ক অবস্থায় চূর্ণ করার পর মিশ্রিত ক'রে মদুরগিকে খেতে দেওয়া হয়। আদর্শ খাদ্যতালিকা নিচে দেওয়া হলঃ

		শতাংশ
গসের ভূমি	...	২০
ভুট্টার গুঁড়ো	...	২০
গম, বাজরা, জোয়ার বা		
চালের খুদ	...	২০



এই ধরনের
দোচালা ঘর
মুরগি পালনের
পক্ষে বিশেষ
সুবিধাজনক

টা লি গ জে
মুরগি পালনের
সরকারী খামা-
রের একাংশ



	শতাংশ
বাদামের খইল ...	১৮
তিসির খইল ...	৩
মাছের গুঁড়ো ...	১৬
মিশ্রিত লবণ ...	২
শামুকের খোলা চূর্ণ ...	১
	১০০

(২) বটিকা আকারে স্ন্যম খাদ্য

এতে নানাপ্রকার স্ন্যম খাদ্যের সংমিশ্রণে কতকগুলি বড়ি তৈরি করা হয় এবং সেগুলি মুরগিদের সামনে দেওয়া হয়। বড়ি ধরনের খাবারের দিকে মুরগির খুব ঝোঁক; তাই এই খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে এই খাবার দিতে অসুবিধা হয়।

(৩) শস্য

নানাপ্রকার শস্যের সংমিশ্রণ মুরগিদের দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতি আজকাল বিশেষ প্রচলিত নয়। নিম্নোক্ত হারে মিশ্রণ করতে হয়ঃ

	শতাংশ
গম ...	৪০
যব (বালি) ...	২০
জই (ওট) ...	২০
ভুট্টা ...	১০
হাড়ের গুঁড়ো ...	২½
মাংস ...	২½
মাছের গুঁড়ো ...	৫

এসব শস্যকে একত্রে মিশ্রিত করে মুরগিদের খেতে দেওয়া হয়।

(৪) ভিজে খাদ্যের মিশ্রণ

ভিজে খাদ্যের মিশ্রণ মুরগিদের খেতে দেওয়া সুবিধাজনক নয়। এরকম খাদ্যের পেছনে পরিশ্রম বেশি দরকার আর এ তৈরি করা সময়সাপেক্ষ।

সাধারণ গৃহস্থদের ঘরে এরকম খাদ্য দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এর তালিকা বা প্রস্তুতপ্রণালী এখানে দেওয়া হ'ল না। অপর তিনরকম খাদ্যের মধ্যে একেবারে আদর্শ হচ্ছে মিশ্রিত শস্য খাদ্য। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এ খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ জল রাখতে হবে মুরগিদের সামনে। যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ শাকপাতাও তাদের খেতে দিতে হবে। আর, শামুকের খোলা-চূর্ণ আলাদাভাবে তাদের সামনে রাখতে পারলে ভাল হয়।

মুরগির ঘর

মুরগির জন্য ঘর তৈরি করার সময় খেয়াল রাখা দরকার যেন ঘরের ভিতর মুরগির সংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট স্থান থাকে, ঘরে হাওয়া চলাচলের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, বৃষ্টির জল প্রবেশ না করতে পারে ও ঘর মজবুত হয়। মুরগি-প্রতি কমপক্ষে দুই বর্গফুট স্থান ঘরের মধ্যে থাকা দরকার। একটি ৫'x৬'x৫' ঘরের ভিতরে ১৫টির বেশি মুরগি রাখা উচিত নয়। মুরগির ঘর একচালা কিংবা দোচালা হ'তে পারে। ঘরের মেঝে জমি থেকে এক ফুট উঁচু এবং ঘরের উচ্চতা পাঁচ ফুট হওয়া দরকার। মুরগির বসবার জন্য ঘরের ভিতর আন্দাজ দুই ইঞ্চি চওড়া দাঁড় থাকা দরকার। এই দাঁড় ঘরের মেঝে থেকে ৯ ইঞ্চির বেশি উঁচু যেন না হয়। স্থানীয় আবহাওয়া ও বৈশিষ্ট্য বুঝে মুরগির ঘর করা বাঞ্ছনীয়। শীতপ্রধান দেশে ঠান্ডা, বৃষ্টি ও বাতাস থেকে মুরগি রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আধ ইঞ্চি ফাঁকের জাল দিয়ে ঢাকা একচাল কিংবা দু'চালের ঘরই উপযোগী। এই ধরনের ঘর খুব হালকা অথচ মজবুত। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই সরানো যায়। দুই পাশে আধ ইঞ্চি ফাঁকের জাল দিয়ে এবং মেঝে তক্তা দিয়ে ঢেকে দিলে যথেষ্ট হাওয়া চলাচল করবে এবং বৃষ্টি ও বন্যজন্তুর হাত থেকে মুরগি-গুলি রক্ষা পাবে। এই ঘর তৈরির বিশদ বিবরণ

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

জেলা পশুপালন আধিকারিকের নিকট পাওয়া যায়।

মুরগির শ্রেণীবিভাগ

উপযোগিতা হিসাবে মুরগিদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ—

(১) প্রধানত ডিম পাবার উদ্দেশ্যে পালিত মুরগি;

(২) প্রধানত মাংসের উদ্দেশ্যে পালিত মুরগি; এবং

(৩) সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ডিম ও মাংস উভয়ই যথেষ্ট পাওয়া যায় এমন জাতের মুরগি।

ডিমের জন্য পালিত মুরগি

যেসব মুরগি বেশি সংখ্যায় ডিম পাড়তে পারে তাদের প্রায় সকল জাতেরই জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। এদের শারীরিক আকার অনেকটা এদেশীয় মুরগির মত এবং ওজনে এরা প্রায় দেড়সের থেকে দু'সের পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই কারণে এদের ছোট বা হালকা জাতের মুরগি বলা হয়। এরা বেশ কণ্টসহিষ্ণু এবং চঞ্চল প্রকৃতির। প্রায় সকল দেশের জলবায়ু এরা সহ্য করতে পারে।

অন্যসব মুরগির তুলনায় এরা অল্পদিনের মধ্যে পরিণত বয়স প্রাপ্ত হয়। পাঁচ-ছয় মাস বয়স হ'লে এরা ডিম দিতে আরম্ভ করে। সচারাচার এক-একটি ডিমের ওজন প্রায় এক ছটাক হয়ে থাকে। বছরে এরা দুইশ' থেকে আড়াইশ' পর্যন্ত ডিম পাড়ে। অন্যান্য মুরগির মত এরা ডিমে তা দিতে পারে না। এরা সর্বদা ছোটোছোটো করে ভালবাসে। অন্যান্য শ্রেণীর মুরগির তুলনায় এদের মাংস তেমন সুস্বাদু নয়। 'হোয়াইট লেগ-হন' এবং ব্রাউন লেগ-হন' এ জাতীয় মুরগি।

মাংসের জন্য পালিত মুরগি

আসিল, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জাতের মুরগি ডিম কম দেয় কিন্তু এদের মাংস খুব সুস্বাদু। পাশ্চাত্য

অনেক দেশেও প্রধানত মাংসের জন্য পালিত স্থূলকায় জাতের মুরগি পাওয়া যায়। এসকল মুরগি ডিম কম দেয়। আমাদের দেশে শুধু মাংসের জন্য সাধারণত মুরগি পোষা হয় না। কাজেই এসব জাতের মুরগি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা করা হ'ল না।

সাধারণ উদ্দেশ্যে পালিত মুরগি

যেসব মুরগি থেকে প্রচুর ডিম ও মাংস পাওয়া যায় সেগুলিই লোকে সাধারণত পালন করে। এজন্য এগুলিকে সাধারণত পালিত মুরগি বলা হয়। এই ধরনের মুরগি আকারে খুব বড় এবং ওজনে প্রায় তিন সের হয়ে থাকে। সাধারণত এরা ৭-৮ মাসে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। এদের স্বভাব বেশ ধীর ও শান্ত। 'রোড আইল্যান্ড রেড', 'অরিপেংটন', 'ব্যাড' প্লাইমউথ রক' প্রভৃতি এই শ্রেণীর মুরগি।

মুরগির ভালমন্দ বিচার

সাধারণত দুই উপায়ে মুরগির ভালমন্দ বিচার করা হয়। যথাঃ

(১) বাৎসরিক ডিমের হিসাব দেখে। যেসকল মুরগি প্রথম বছরে গড়পড়তা এক ছটাক ওজনের ডিম সংখ্যায় দুইশ'র বেশি দেয় তাদের সাধারণত খুব ভাল মুরগি বলে গণ্য করা হয়।

(২) যেসব মুরগি সুস্থ, সবল ও তেজী, যাদের চক্ষু উজ্জ্বল, পায়ের নখ ছোট ও ঝুঁটি লাল রঙের, যাদের বুক ও পিঠ প্রশস্ত এবং তলপেটের নিচের দিকে সামান্য ঝোলা থাকে তাদের ভাল মুরগি বলে গণ্য করা হয়। ডিম দেওয়ার সময় তলপেটের ভাসা পাতলা হাড় দু'খানি চার আঙুল পরিমাণ ফাঁক হয়ে যায়, বুকের হাড় ও তলপেটের ভাসা হাড়ের মাঝখানে ৪-৫ আঙুল ফাঁক থাকে।

প্রজনন

(১) যে-জাতীয় মুরগি পালন করা উদ্দেশ্য, প্রজননের জন্য সেই জাতীয় সুস্থ, বলিষ্ঠ ও তেজী মোরগ বেছে নেওয়া দরকার।

(২) পীড়িত বা নিকৃষ্ট মোরগ ও মুরগি একত্রে রাখা উচিত নয়; তাদের বাচ্চা দুর্বল ও খর্বাকৃতি হয়। এক বছরের কম বয়সের মোরগ ও মুরগির সংগম করাতে নেই, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়। মোরগ ও মুরগির বয়সের তারতম্য থাকা উচিত। মোরগের বয়স দুই বছর হ'লে মুরগির বয়স এক বছর হওয়া উচিত এবং তারা যাতে একই মোরগের ঔরসজাত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৩) প্রজননের জন্য নির্দিষ্ট মোরগ ও মুরগিকে পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া দরকার।

সাধারণত কমপক্ষে ১০০ থেকে ২০০ বর্গফুট জায়গা প্রত্যেক মুরগির চরবার জন্য দরকার। প্রতি তিন বছর অন্তর পালে নতুন মুরগি আমদানি করা উচিত। মোরগ যদি বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয় অথবা একটি মোরগ অনেকগুলি মুরগির সঙ্গে রাখা হয়, তা হ'লে বেশিসংখ্যক ডিম অনূর্বর হয়। একটি মোরগের সঙ্গে ১০-১২টির বেশি মুরগি রাখা উচিত নয়। মুরগির সঙ্গে মোরগ দেওয়ার সাত দিন পরে ডিমগুলি তাএর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ষার শেষদিকে সাধারণত মুরগি পালক ত্যাগ করে এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় মোরগ ও মুরগি একসঙ্গে রাখলে বাচ্চা দুর্বল হয়। এসকল বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রজননের ব্যবস্থা করলে পালের মুরগির ক্রমোন্নতি করা সম্ভব হয়। উৎকৃষ্ট জাতের মোরগের দ্বারা ৫-৬ পুরুষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রজনন করলে আমাদের সাধারণ দেশী মুরগির আশাতীত উন্নতি সম্ভবপর।

প্রজনন-মোরগ

প্রজননের জন্য বলিষ্ঠ, তেজী ও সমর্থ মোরগ নির্বাচন করা দরকার। তেজী মোরগের গলার আওয়াজ সাধারণত জোরালো হয় এবং তারা প্রায়ই ডাকতে থাকে। এদের চোখ উজ্জ্বল হয়। মোরগের বুক ও পিঠ প্রশস্ত; পা মোটা, লম্বা এবং সাদা হওয়া উচিত। এদের চোখ ভাসা এবং মাথার ফুল সোজা ও গাঢ় রক্তবর্ণের হয়। শরীরে উপযুক্ত

পরিমাণে ওজন থাকা দরকার। তা ছাড়া বংশলব্ধ গুণাবলীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

মুরগি পালনে সাধারণত ১০০ থেকে ২০০ বর্গফুট জায়গা প্রত্যেক মুরগির চরবার জন্য দরকার হয়। কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় দেখা যায় যে, এ থেকে কম জায়গা হ'লেও মুরগি পালন করা যায়। মুরগির জন্য প্রচুর জমির চেয়ে প্রচুর সদৃশ খাদ্যের ও আনুষঙ্গিক সুব্যবস্থার প্রয়োজন বেশি।

ডিম

প্রত্যেক মুরগির গর্ভে যে ডিম্বকোষ থাকে তাতে ছোট বড় আঙ্গুরের থোলোর মত গুচ্ছবদ্ধ অসংখ্য ডিম দেখতে পাওয়া যায়। মুরগির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাচ্চা-বয়সে এগুলি ক্ষুদ্র থাকে এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়।

ডিমের উপাদান

	শতকরা ভাগ
ডিস	৬৬
প্রোটিন	১৩
চর্বি	১০
ক্যালসিয়াম	১১

বাচ্চা তোলার জন্য ডিম রক্ষণ

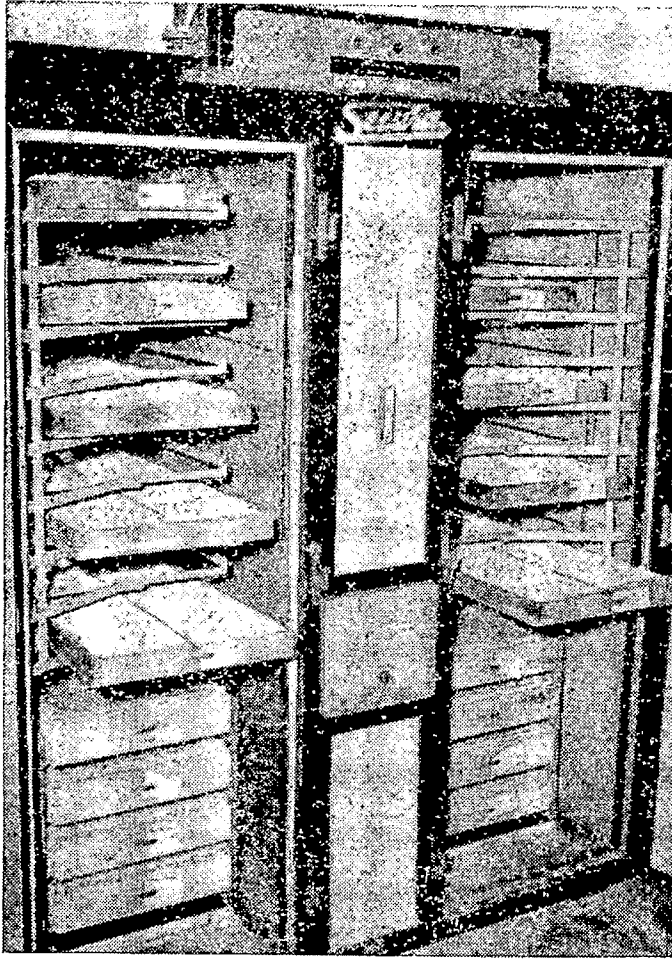
১। ডিম ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে রাখা উচিত।

২। ডিম দিনের মধ্যে ৩-৪ বার কুড়ানো দরকার, কারণ ডিমে রৌদ্র লাগলে বা বেশিক্ষণ ঠান্ডা লাগলে তা থেকে বাচ্চা হয় না।

৩। ডিম চুল-পরিমাণ ফাটলেও তা থেকে বাচ্চা হয় না।

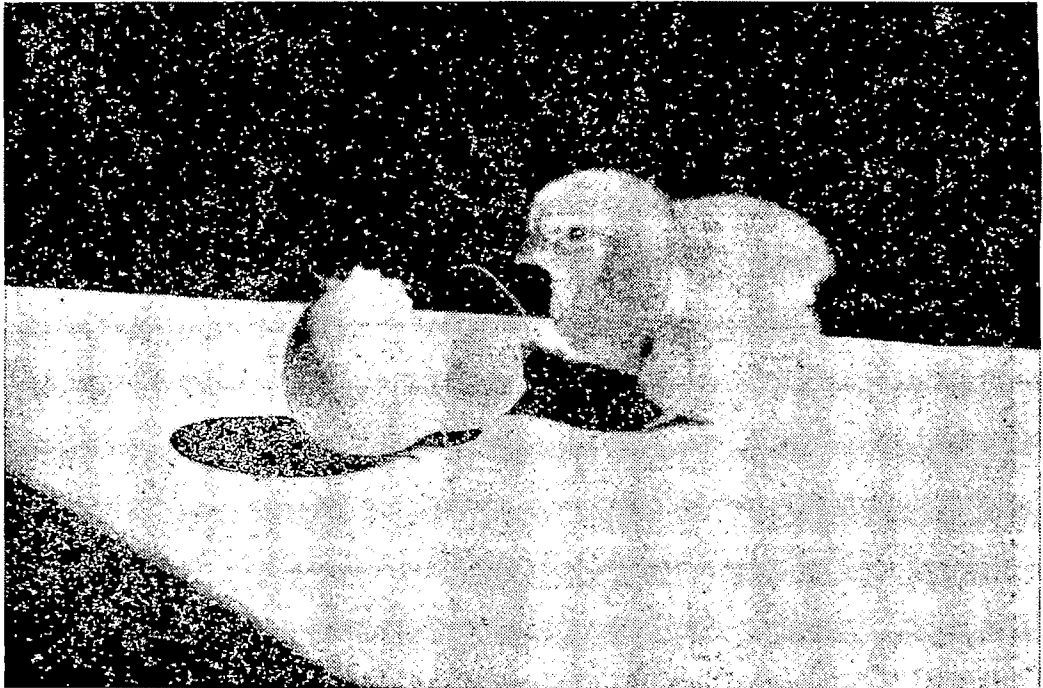
৪। ডিমের চওড়া মূখ উপরের দিকে করে রাখতে হয়।

৫। কাত করে রাখলে ডিম দিনে দুইবার ঘোরাতে হয়। ডিমে ময়লা লাগলে অ্যালকোহল বা



‘ইনকিউবেটর’ :
একসঙ্গে বহু ডিম থেকে বাচ্চা
ফোটানোর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

নিচে : ডিম থেকে সজ-ফোটা বাচ্চা



স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত, জল দিয়ে ধোয়া উচিত নয়।

৬। ডিম দেওয়ার ৬-৭ দিনের ভিতরে বাচ্চা তোলার জন্য বসানো উচিত।

খাওয়ার জন্য ডিম রক্ষণ

গরমকালে ডিমের চাহিদা কম থাকে বলে অথবা অনেক সময় ডিম রপ্তানির সুবিধা থাকে না বলে অনেক ডিম পচে যায়। এই ডিমগুলি যদি চুন-মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে রাখা যায় তা হলে সহজেই অন্তত একমাস পর্যন্ত ভাল রাখা চলে। এক ভাগ 'সিলিকেট অফ সোডা' দশ ভাগ ফুটন্ত জলে গুলে এবং পরে ঠান্ডা করে ঐ জলে ডিম মাসাবধি-কাল অনায়াসে ভাল রাখা যায়।

একটি মাটির হাঁড়ি বা কলসি কোন উচু জায়গায় মাটির নিচে কাত করে অর্ধেক আন্দাজ পুতে, ঐ পাত্রের মাটির উপরের অংশে হওয়া প্রবেশের জন্য ছোট ছোট ছিদ্র করে তার ভিতরে খড় বা তুষ বিছিয়ে ডিম রাখলে, অনেক দিন পর্যন্ত ডিম ভাল থাকে।

ডিম থেকে বাচ্চা তোলা

অনেকের ধারণা যে, ডিম হলেই তা থেকে বাচ্চা হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে ছোট-বড় নতুন-পুরানো সব রকম ডিম থেকে বাচ্চা তোলার চেষ্টা করেন। ফলে অল্পসংখ্যক দুর্বল বাচ্চা পান এবং পরিশেষে এই বাচ্চাগুলি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়। মুরগি প্রথম ডিম দিতে আরম্ভ করলে, প্রথম তিন মাসের ডিম বাচ্চা তোলার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়। যে ডিম মসৃণ, যে ডিমের খোলা শক্ত, যে ডিম মোটামুটি এক ছটাক ওজনের, উর্বর ও তাজা, সেই ডিমই বাচ্চা ফোটাবার জন্য উপযুক্ত।

বাচ্চা দু'ভাবে তোলা যায়ঃ মুরগির সাহায্যে স্বাভাবিক উপায়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে।

স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা তুলতে গেলে তার জন্য প্রকৃত কুঁচা মুরগি দরকার। মুরগি এক দফা ডিম দেওয়া বন্ধ করলে, ডিমের উপর বসে থাকতে চায়। এই অবস্থায় মুরগিকে কুঁচা মুরগি বলা হয়। মুরগি প্রকৃত কুঁচা হলে, গোল আলুর এমন কি পাথরের টুকরোর উপরও বসে থাকবে এবং খাবার জন্য উঠবে না। এরকম মুরগিকে তাএ বসাতে হয়। একটি ছোট গামলা বা কাঠের বাস্কের মধ্যে শুকনো ঘুঁটের ছাই মিশ্রিত মাটি সরার আকারে চেপে দিতে হয়—যাতে ডিম একত্রে থাকে এবং মুরগির পেটের তলা থেকে সরে না যায়। একটি মুরগি একসঙ্গে ৮-১০টি ডিমে তা দিয়ে তা থেকে বাচ্চা তুলতে পারে। অনেক সময় মুরগির গায়ে পোকা হয়, তাতে মুরগি শেষ পর্যন্ত ডিম ছেড়ে উঠে যায়। মুরগিকে তাএ বসাবার আগে কেরোসিন তেল মেশানো ঘুঁটের ছাই (এক ভাগ কেরোসিন ও সাত ভাগ ছাই), গন্ধক, গ্যামেক্সিন বা ডি-ডি-টি পাউডার গায়ে মাখিয়ে বসালে তার গায়ে পোকা হবে না এবং শেষ পর্যন্ত বসে থেকে সুস্থভাবে বাচ্চা তুলবে। মুরগির সম্মুখে সর্বদা জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত, ২১ দিনে মুরগির বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়।

কৃত্রিম উপায়ে 'ইনকিউবেটর' নামক যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফোটানো হয়। অনেক ডিম এক সঙ্গে ফোটাতে গেলে এই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন আকারের 'ইনকিউবেটর'-এর সাহায্যে ২৫ থেকে ২৫,০০০ ডিম একসঙ্গে বসানো যায় তা দেওয়ার জন্য। নানা প্রতিষ্ঠানের তৈরি 'ইনকিউবেটর' বাজারে বিক্রি হয়। এইগুলির কার্যপদ্ধতি এক রকম হলেও, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যেসব উপদেশ রয়েছে সেগুলো মেনে চলা উচিত। এই যন্ত্র ভালভাবে চালাতে পারলে স্বাভাবিক উপায়ে যে হারে সুস্থ ও সবল বাচ্চা তোলা যায়, সেই হারেই নির্দিষ্ট দিনে অনুরূপ বাচ্চা পাওয়া যায়। এই যন্ত্র কেরোসিন তেল বা বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালানো যায়।

মদুরগিকে বাচ্চা তোলার জন্য ব্যবহার করলে তা থেকে বেশি ডিম পাওয়া যায় না। অনেক সময় মদুরগি তা-দেওয়া অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়—এমন কি মারাও যায়। বাচ্চাগুলি ঐ মদুরগি থেকে রোগাক্রান্ত হ'তে পারে। 'ইনকিউবেটর' দ্বারা বাচ্চা তুললে ঐসব অসুবিধা থাকে না।

ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা বেরনোর ছ' সপ্তাহ পর পর্যন্ত বাচ্চাদের তাপ বা ওম দেবার প্রয়োজন হয় এবং সে কাজ সাধারণত মা-মদুরগিই ক'রে থাকে। মদুরগি ব্যবহার না ক'রে কৃত্রিম উপায়ে কেরোসিন-চালিত যন্ত্র 'ফস্টার মাদার'-এর সাহায্যে এ কাজ করা চলে। এতে খরচও খুব কম পড়ে।

মদুরগিকে কীভাবে খাওয়ানো উচিত

আমাদের মদুরগিকে কোন নির্দিষ্টভাবে খাওয়ানোর প্রথা নেই বললেই হয়। এরা বাড়ির আশপাশে যে খাবার কুড়িয়ে খায় তাই যথেষ্ট—এটাই সাধারণের ধারণা। আমাদের দেশের মদুরগি ক্রমে ক্রমে হীন পর্যায়ে এসে দাঁড়াবার এও একটি প্রধান কারণ। মদুরগির ডিম পাড়বার ক্ষমতা বা আকারে বড় হওয়ার কারণ প্রধানত তার বংশের উপর নির্ভর করলেও, তাকে সঠিকভাবে না খাওয়ানো হ'লে, তার স্বস্ত্র না নেওয়া হ'লে কোন উন্নতির আশা করা বৃথা। তার খাদ্যে পুষ্টিকর দ্রব্যসমৃদ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় থাকা দরকার।

মদুরগির খাদ্য

আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল মদুরগি পালনে বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। তাই দেশে-চারিদিকে মদুরগি পালনের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু মদুরগি পালনের ইচ্ছা থাকলেও তাদের যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন হয় এ ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। তাই তাদের খাদ্যের দিক থেকে আমাদের অবহেলা থাকে। মদুরগি পালন করতে হ'লে এবং তাদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে সবার আগে তাদের খাদ্য-নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার।

১। খাদ্য নির্বাচনের কালে সবার আগে তাদের শরীরগঠন-রীতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। মদুরগির দেহগঠন অতি অল্প বয়সের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। খাদ্য-পরিপাক অতি শীঘ্র হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বা রক্ত-সঞ্চালন অতি দ্রুত হয়। মদুরগি অতি অল্পদিনেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যা উৎপাদন করে, অর্থাৎ ডিম, তা সম্পূর্ণই দেয়—কখনও আধখানা ডিম পাড়ে না। এ থেকে সহজেই অনুমান করা উচিত যে, তার খাদ্যও পূর্ণমাত্রায় প্রয়োজন হয়। মদুরগি বাড়ির সময় যদি খাদ্য কম পায় তা হ'লে ঠিকমত বাড়ে না। সেইজন্য খাদ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

২। দ্বিতীয়ত, মদুরগি সাধারণত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে রেখে দেয়। সেইজন্য কেবলমাত্র এক জাতীয় গুঁড়ো খাদ্য দিলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। তাই পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে নানা প্রকারের গুঁড়ো শস্য—যেমন ভাঙা গম, ভুসি বা তিসির গুঁড়ো প্রভৃতি মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

৩। তৃতীয়ত, এ ছাড়াও খাদ্য দেবার সময় ব্যবস্থাপনার দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। প্রতিটি মদুরগিকে আলাদা আলাদা ক'রে খাদ্য না দিয়ে, একসঙ্গে তাদের এক দলকে খাদ্য দেওয়া হয়। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মদুরগি যাতে সমান-ভাবে খাদ্য পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক মদুরগি একসঙ্গে থাকে, তাদের ছোট দলে ভাগ ক'রে, প্রত্যেকটি দলকে আলাদা আলাদা ক'রে খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। তা হ'লে প্রত্যেক মদুরগির পক্ষে যথাযথ পরিমাণ খাদ্য পাওয়ার সুবিধা হ'তে পারে।

কম খরচে খাদ্যের সংস্থান

খাদ্যতালিকা নির্বাচন করার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তাতে খরচ বেশি না পড়ে। প্রত্যেক মদুরগির জন্য সমান পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। যেমন, ৩ পাউন্ড ওজনের মদুরগির যতটা খাদ্যের প্রয়োজন, ৪ পাউন্ড ওজনের মদুরগির জন্য তার চেয়ে বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ৫ পাউন্ড

ওজনের মুরগির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় আরও বেশি। আবার বিভিন্ন শ্রেণীর মুরগির জন্য বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের দরকার। যেমন, 'লেগ হর্ন' মুরগির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার, 'রোড আইল্যান্ড রেড' মুরগির জন্য তার চেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য আবশ্যিক।

বেশি ডিম পেতে হ'লে খাদ্যও বেশি দিতে হবে, এটা সহজ কথা। একটা মুরগির খাদ্যতালিকা স্থির করতে হ'লে দু'টো বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কিছ্র নির্দিষ্ট পরিমাণের খাদ্য তার শরীর বৃদ্ধি, রক্ষা বা পুষ্টের জন্য প্রয়োজন হয়। তারপর আবার ডিম উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে, খাদ্যের উপর মুরগির ডিম-উৎপাদন কতটা নির্ভর করে।

ডিম উৎপাদনে খাদ্যের প্রভাব

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন	শরীর রক্ষার জন্য	ডিমের জন্য	মোট ডিমের জন্য	প্রতি ডিমের জন্য
বাৎসরিক	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
৮০	৬৪.০০	৭.১৪	৭১.১৪	১০.৬৭
১২০	৬৪.০০	১০.৬৯	৭৪.৬৯	৭.৪৭
১৬০	৬৪.০০	১৪.২৪	৭৮.২৪	৫.৮৭
২০০	৬৪.০০	১৭.৮১	৮১.৮১	৪.৯১

এই তালিকা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে, বেশি ডিমের জন্য আনুপাতিক হিসাবে অনেক কম খাদ্যের প্রয়োজন হয়—সুতরাং তাতেই খরচ কম পড়ে। অতএব প্রত্যেকটি মুরগিকে শরীর-রক্ষণ ও ডিম উৎপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে খাদ্য দেওয়া উচিত। মোট যতটা ডিম উৎপন্ন হচ্ছে তার দাম যদি মোট খাদ্য যত লাগে তার দাম থেকে বেশি হয়, তা হ'লে খাদ্যের ব্যয় সংকুলান হয়েছে।

বলা যায়, উক্ত তালিকা থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, যেমন ওজনের মুরগি হোক না কেন, প্রত্যেকটি মুরগির জন্য ১.৪১ আউন্স খাদ্য দেওয়া দরকার।

বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই হিসাবের একটু তারতম্য হ'লেও হ'তে পারে। তবে নানা প্রকার গবেষণা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন দেশে প্রতি ৩ পাউন্ড ওজনের মুরগির শরীর-রক্ষণের জন্য ৫৬.৮ পাউন্ড এবং ৫ পাউন্ড-ওজনের মুরগির জন্য ৮০ পাউন্ড খাদ্যের দরকার। এ ছাড়া প্রতি ১০০টি ডিমের জন্য প্রত্যেকটি মুরগিকে ১৪.২ পাউন্ড খাদ্য দেওয়া উচিত। অতএব মুরগি পালন করতে হ'লে অন্যান্য সব দিকের সঙ্গে সঙ্গে ওদের খাদ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। খাদ্যের অবহেলা হ'লে তারা মোটেই ডিম দেয় না। মুরগির খাদ্য সাধারণত দু'ভাবে দেওয়া দরকার—দানা এবং মিশ্রিত গুঁড়ো।

১। কোনও এক রকমের দানা না দিয়ে, মিশ্রিত দানা, যথা—ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি, একসঙ্গে মিশিয়ে মুরগি-পিছ্র এক ছটাক দেওয়া উচিত। তার উপর নিম্নলিখিত গুঁড়ো মুরগি-পিছ্র এক ছটাক দেওয়া দরকারঃ

মিশ্রিত গুঁড়ো	ভাগ
১। গমের ভূষি	৪০
২। গমের আটা	২০
৩। ভুট্টার আটা	২০
৪। বাদামের খইল	১৬
৫। তিসির খইল	৩
৬। লবণ	১

১০০

অনেক সময় এসমস্ত খাদ্য পল্লী-অঞ্চলে পাওয়া হয়তো কষ্টসাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে গমের ভূষির পরিবর্তে উৎকৃষ্ট চালের কুঁড়ো ব্যবহার করা চলতে পারে। গম ও ভুট্টার আটার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়

হ'লে তার পরিবর্তে জোয়ার, কাউন, বাজরা, চীনা, চালের খুদ, ছোলার গুড়ো, ইত্যাদি যতগুলো সম্ভব বিভিন্ন জাতীয় জিনিস একত্রে মিশ্রিত করে উপরি-উক্ত পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে।

২। এই মিশ্রণ শুকনো বা ভিজ়ে দুই রকমেই দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া মুরগি-পিছু আধ ছটাক (পাঁটা ইত্যাদির) নাড়ীভূঁড়ি সিদ্ধ করে কিম্বা মত করে দেওয়া উচিত। নাড়ীভূঁড়ির বদলে শুকনো মাছের গুড়ো বা ছোট ছোট মাছ মুরগিপিছু সোয়া তোলা মত দিলেও চলতে পারে। এইসব আমিষ-খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে না খেতে পেলে মুরগি বেশি ডিম দেয় না এবং ভাল বাড়ে না।

খাওয়ার মোটামুটি সময়

বড় মুরগিগুলোকে সাধারণত সকাল ৬টার সময় দানা-জাতীয় খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ, বেলা ২-৩টার সময় আমিষ খাদ্যের সঙ্গে এক ছটাক মিশ্রিত খাদ্য ও সম্ভার্য পূর্বে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ দানা দেওয়া উচিত। বিকালে কিছু শাক-জাতীয় খাদ্য দেওয়া দরকার। যেসব মুরগি চরবার যথেষ্ট সুবিধা (জায়গা) পায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা পাতা ও পোকামাকড় খেতে পায়, তাদের আলাদা করে শাক-সবজি দেওয়ার দরকার হয় না এবং আমিষ খাদ্যও কম পরিমাণে দিলে চলে।

বাচ্চা-মুরগিকে প্রথম এদিন কিছু খুদ, গম, ভুট্টা ও ধান মিশ্রিত করে সকালে ও বিকালে দেওয়া দরকার। মিশ্রণের মধ্যে গমের আটা বাদ দিলে চলতে পারে। এদিন পর্যন্ত টানা দুধও দেওয়া চলে। ৭ দিনের পর থেকে বাচ্চাদের ৫ বার খাবার দেওয়া দরকার। সকাল ৬টায় ও বিকাল ৫টায় দানা এবং ৯টা, ১২টা ও ৩টায় মিশ্রণ দেওয়া উচিত। এইভাবে ১৬ সপ্তাহ অথবা ৪ মাস পর্যন্ত খাওয়ানো দরকার। এর পর থেকে বড় মুরগিদের মত খাওয়ানো উচিত।

মুরগির বয়স-অনুযায়ী খাবারের তালিকা

বয়স	দানা (আউন্স)	মিশ্রণ (আউন্স)
জন্ম থেকে ৮ সপ্তাহ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
৮ সপ্তাহ থেকে ১২ সপ্তাহ	১	১
১২ সপ্তাহ থেকে ১৬ সপ্তাহ	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{8}$
১৬ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
২০ সপ্তাহ ও তার উপরে	২	২

‘ভাইটামিন’ বা খাদ্যপ্রাণ

উপরি-উক্ত সমস্ত খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এটা সমস্ত প্রাণীর শরীরগঠন ও পুষ্টিসাধনের জন্য অপরিহার্য। কাঁচা শাক-সবজির মধ্যে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ থাকে। তাই মুরগিকে এসব দৈনিক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা দরকার। মুরগির বচ্চাকে খুব ছোট ছোট করে পুইশাক, লেটুসপাতা, পালমশাক, কপিরা পাতা ইত্যাদি কুচিয়ে খাওয়ালে ভাইটামিনের অভাব দূর করা যায়। বাচ্চাগুলি বড় হ'লে লেটুস বা কপিরা পাতাগুলি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হয় যাতে তারা লাফিয়ে বা ঠুকুরে খেতে পারে। এর ফলে তাদের যথেষ্ট ব্যায়ামও হয়। গড়পড়তা একটা মুরগির কমপক্ষে দুই অউন্স পরিমাণ কাঁচা শাক জাতীয় খাদ্য দরকার। যদি কাঁচা ঘাসের জমিতে মুরগি ছেড়ে দিয়ে চরবার ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে তাদের আলাদা শাক দেওয়ার দরকার হয় না। তা ছাড়া, মুলো, পেঁয়াজ আলু ইত্যাদি তরিতরকারির খোসা কাঁচা অবস্থায় বা সিদ্ধ করে দেওয়া চলতে পারে।

বাচ্চা মুরগির বাড়ার সময় এবং বড় মুরগির ডিম দেওয়ার সময় তাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেই অভাব পূরণ করতে না পারলে মুরগি ভাল বাড়ে না বা ডিম পাড়ে না এবং ডিমের খোসা পাতলা হয়।

আমাদের দেশে পুকুর বা ডোবায় প্রচুর শামুক ও কিন্দুক পাওয়া যায়। সেসবের খোলায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। এই খোলাগুলি ভেঙে টুকরো করে একটি পাত্রে সর্বদা মুরগির সামনে রাখলে তারা সানন্দে তা ঠুকরে খাবে। ফলে তাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হবে না।

মুরগির রোগ ও তার প্রতিকার

আমাদের দেশে অনেক মুরগি নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বাতাস, মাটি, জল, মলমূত্র বা অন্যান্য ময়লার মারফত সাধারণত রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। রোগের জীবাবদ্ধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকলে তা নিবারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। কাজেই কোন একটি মুরগি অসুস্থ হওয়া মাত্রই তাকে আলাদা করে রাখা দরকার এবং যদি প্রয়োজন হয় মেরে ফেলা উচিত। এমন অনেক রোগ আছে যার চিকিৎসা চলে না, অথচ চিকিৎসা করতে গিয়ে সময়ক্ষেপণে সুস্থ মুরগির দেহে রোগ ছড়িয়ে পড়ে; ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সাধারণ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখলে মুরগিকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়, যথা—

১। মুরগি অসুস্থ হওয়া মাত্র তাকে আলাদা করে রাখা বা মেরে ফেলা। মুরগি অসুস্থ হলে খাওয়া বন্ধ করে, তার পালকগুলি এলোমেলো দেখায় এবং সে নিস্তেজ হয়ে ঘরের মধ্যে এক কোণে আশ্রয় নেয়।

২। মুরগির ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মাঝে মাঝে ফিনাইল-জল দিয়ে ধোয়া।

৩। জলের পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সব সময় পরিষ্কার জল খেতে দেওয়া।

৪। যখন মুরগি সীমাবদ্ধ জায়গায় রাখা হয়, তখন সহজেই সেখানকার মাটি দূষিত হবার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং মাঝে মাঝে মাটি কুণ্ডিপিয়ে তার সঙ্গে চুন মিশিয়ে দেওয়া দরকার।

৫। সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া।

৬। হাটবাজার অথবা অজানা জায়গা থেকে মুরগি কিনে আনলে, সুস্থ মুরগির সঙ্গে না মিশিয়ে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আলাদা করে রাখা দরকার।

নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার রোগ আমাদের দেশের মুরগিকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। তা ছাড়া আরও অনেক রোগ আছে যার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। নিকটবর্তী পশুচিকিৎসকের কাছ থেকে এইসব রোগের প্রতিকারে সাহায্য পাওয়া যায়।

কৃমি

কৃমির আক্রমণ হলে মুরগি ভালভাবে খায়দায় অথচ দুর্বল ও রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। ক্রমে হালকা হয়ে অবশেষে মারা যায়। মাঝে মাঝে পাতলা মল নিঃসৃত হয় এবং মলের ভিতর কৃমি দেখা যায়। কৃমি অনেক প্রকারের আছে। বেশির ভাগ মুরগি 'রাউন্ড ওয়ার্ম' এবং 'টেপ ওয়ার্ম' নামক কৃমির আক্রমণে ভোগে। কৃমি অন্ত্রে বাসা বাঁধে এবং রক্ত-শোষণ করে। এই রোগের চিকিৎসা করতে গেলে মুরগিকে ২৪ ঘণ্টা উপবাসে রেখে এক পাউন্ড তামাক পাতা কুচি কুচি করে কেটে ২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে, সেই জলের অর্ধেকটা মিশ্রিত-খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে মুরগিকে খাওয়াতে হয় (এই মাত্রা ১০০টি মুরগির উপযোগী। এর ২ ঘণ্টা পরে ১ পাউন্ড ম্যাগ্‌সাল্‌ফ্‌ জলে গুলে বাকি অর্ধেক মিশিয়ে খাওয়ালে কৃমির দমন হয়।

মুরগির মলের মধ্যে 'টেপ ওয়ার্ম' দেখা দিলে, ২৪ ঘণ্টা উপবাসে রাখার পর প্রত্যেক মুরগিকে এক চামচ সুপারির গুঁড়ো খাইয়ে পরে উক্ত নিয়মে ম্যাগ্‌সাল্‌ফ্‌ খাওয়ালে এই রোগ সেরে যায়। এই রোগে 'ফিনোথিয়াজিন ফেনোভিস' নামক ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। প্রত্যেক মুরগিকে ১২ ঘণ্টা উপবাসে রাখবার পর এই ঔষধ ০.৫ গ্রাম খাওয়ালে এই রোগ সেরে যায়। মাসে একবার মাত্র এই ঔষধ খাওয়ানোর দরকার হয়। সাধারণত আমাদের

দেশে বর্ষাকালে কৃমির উপদ্রব বেশি হয় এবং প্রথম অবস্থায় এই রোগ ধরা যায় না। কাজেই বর্ষার ২-৩ মাস এই ঔষধ খাওয়ালে মূরগি কৃমিরোগে ভুগবে না।

রানীখেত

এ অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগ হ'লে মূরগি বাঁচানো অত্যন্ত কঠিন। এ রোগ বছরের যে-কোনও সময়ে হ'তে পারে। তবে আমাদের দেশে গরমকালে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এ রোগ হলে মূরগির সাদা মল নিঃসৃত হয় ও মূরগি ঝিমোতে থাকে। পরে সাধারণত তার একটি পা অবশ হয় যায়। এমনও দেখা যায় যে, সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় মূরগি ঘরে উঠেছে এবং ভোরে মৃত অবস্থায় ঘরের ভিতর পড়ে আছে। রোগের আক্রমণ হবার পূর্বে টিকা দিলে এই ব্যাধি থেকে মূরগি রক্ষা পেতে পারে। ছ' সপ্তাহ বয়স হ'লে মূরগিকে রানীখেত প্রতিষেধক টিকা দেওয়া যেতে পারে। একবার টিকা দিলে মূরগি সারা জীবনের জন্য এই রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারী পশুচিকিৎসা বিভাগ থেকে করা হয়।

মূরগির কলেরা

এও অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। সময়মত চিকিৎসা করলে কিছু মূরগি বাঁচানো যায়। ছয় মাস পর পর কলেরার প্রতিষেধক টিকা দিলে এই রোগে মূরগি মরে না। এই রোগ হ'লে মূরগির পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসৃত হয় ও শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। 'সালফাগুয়ানিডিন' নামক বটিকা বড় মূরগিকে দৈনিক দু'টি করে খাওয়ালে তিন দিনে এই রোগ সারতে দেখা গেছে।

বসন্ত

এ রোগে আক্রান্ত মূরগির মূখে, ডানার নিচে, পায়ে এবং পিঠে বসন্তের গুটি বের হয়। যত্ন নিলে

সাধারণত এই রোগে মূরগি মারা যায় না। আট সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চা-মূরগি এই রোগে বেশির ভাগ মারা যায়। ডেটল, পটাশ পারমাংগানেট, সালফানিলামাইড ইত্যাদি ব্যবহার করলে এই রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সারানো যায়। সাধারণত শীতের শেষেই এই রোগ দেখা দেয়। এ সময় প্রতিষেধক টিকা দিলেই আর এ রোগ হয় না।

সাধারণত মূরগির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে মানুষ হাতে বা বাজারে নিয়ে গিয়ে সেই মূরগি বিক্রি করে ফেলে। লোকে না জেনে সেই রোগগ্রস্ত মূরগি কিনে নিয়ে যায় এবং নিজেদের মূরগির মধ্যে মিশিয়ে রাখে। ফলে অন্যান্য মূরগির মধ্যে এই রোগ বিস্তারলাভ করে। গ্রামে এইভাবে বেশির ভাগ মূরগির মধ্যে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সময়মত যদি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া যায় তবে মূরগি এরূপ ব্যাপকভাবে মরে না।

ককসিডিওসিস্

এই রোগ হ'লে কচি বাচ্চা, যাদের বয়স ১০ দিন থেকে ৬ সপ্তাহ, বেশি মারা যায়। এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চার ডানা ঝুলে পড়ে, মাথা গুঁজে শক্তভাবে বাচ্চা দাঁড়িয়ে থাকে এবং হাঁটতে চায় না। তার রক্ত-মিশ্রিত নরম মল নিঃসৃত হয়। বড় মূরগি সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হ'লে সেরে ওঠে কিন্তু তাদের মলের সঙ্গে এই রোগের জীবাণু বের হয়। সুস্থ মূরগি ঐ জীবাণু ঠুকরে খায়, ফলে এই রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং সুস্থ মূরগির মধ্যে যাতে জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। 'সালফামেজাথিন ও এম্বাজিন' ৩-৪ দিন জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে এই রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। উক্ত ঔষধ ২ আউন্স ৫ সের পানীয় জলের মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। নিকটবর্তী পশুচিকিৎসকের নিকট বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার পুনর্গঠন

শ্রী এ কে দত্ত

আই এ এস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধক

গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ কৃষকপরিবারের কম সদ্দে দরকারমত ঋণ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন শুরুর করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সমবায় আন্দোলনের পরেও দেশের সমবায় সমিতিগুলি গ্রামবাসীদের মোট প্রয়োজনীয় টাকার মাত্র ৩-১০ শতাংশ ধার দিতে পেরেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য ন্যায্য সদ্দে টাকা ধার দেবার উপযুক্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠনের যে প্রচেষ্টা এতদিন ধরে করা হয়েছিল তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে ঋণদানের প্রচলিত পরিমাণ ও প্রথা স্বতই বড় কৃষকদের স্বার্থে নিবন্ধ ছিল। কাজেকাজেই আমাদের পরিকল্পনা রচনাকারীদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং তাঁরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণ তথ্যানুসন্ধান কমিটির স্ফুপারিশক্রমে সমস্ত সমবায় সমিতির ঋণদান ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে একটি নিখিল ভারত কর্মসূচি রচনা করেন।

এই কর্মসূচি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কী কী কাজ করা হচ্ছে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা করব।

পশ্চিমবঙ্গের ২-৬৩ কোটি বাসিন্দার ৫৯ শতাংশ গ্রামবাসী এবং গ্রামবাসীদের ৩৪-৪ শতাংশ লোক কৃষক বা তাদের পোষ্য-ষাদের অধিকাংশের বা সকলের জমি আছে। (নিখিল ভারতের ভিত্তিতে এই সংখ্যা ৪৬-৯ শতাংশ।) পশ্চিমবঙ্গে আবাদ-যোগ্য পতিত জমি সমেত মোট চাষের জমির পরিমাণ ১৪১ লক্ষ একর; তার মধ্যে দো-ফসল্য

জমির আয়তন মাত্র ২২ লক্ষ একর। সেচ-ব্যবস্থাস্বত্বে জমির আয়তন ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩০ লক্ষ একর ছিল; ১৯৬৫-৬৬ সালে সেচস্বত্বে জমির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ লক্ষ একর হবে। ১০৮ লক্ষ একর জমিতে ধানচাষ হয়, ৮ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয় এবং বাকি জমিতে আখ, আলু, তামাক, গম প্রভৃতি নানা রকম ফসল উৎপাদন করা হয়। মোট কৃষকপরিবারের ৭০-৭০ শতাংশের জমি ৫ একরেরও কম। প্রকৃত-পক্ষে, এই জোত-জমার ৬৬-৫০ শতাংশ জমি চাষ করা লাভজনক হয় না। ভাগচাষ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশি—মোট আবাদী জমির ২০ শতাংশ বর্গা বা ভাগচাষের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির ৯৬ শতাংশ কাজে লাগানো হয়ে থাকে বলে বাস্তবক্ষেত্রে চাষের জমি বাড়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ফসল চাষের বর্তমান গড়-পড়তা খরচার ভিত্তিতে অল্পমোয়াদী কৃষিক্ষণের বাৎসরিক চাহিদা ২৫ কোটি টাকার মধ্যে এবং মধ্যমোয়াদী কৃষিক্ষণের বাৎসরিক চাহিদা ৫ কোটি টাকা। নিজেদের কৃষি-আয় থেকে টাকা সঞ্চয় করে সেই টাকা আবার কৃষি-ফসল উৎপাদনের কাজে খাটাতে পারে এই রকম কৃষকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। যদিও পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমোয়াদী ও অল্প-মোয়াদী কৃষিক্ষণের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা, তবু ১৯৫৭-৫৮ সালে সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির মাধ্যমে মোট ২-১২ কোটি টাকা মাত্র অল্প-মোয়াদী ও মধ্যমোয়াদী ঋণ কৃষকদের দিতে পারা গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে পল্লীঋণ সমস্যা কত তীব্র। গ্রাম্য সমাজে জমিদারি

ও অন্যান্য মধ্যবর্তী মালিকানার উচ্ছেদ করার ফলে ক্রমে এইসব মধ্যবর্তী মালিক অন্তর্হিত হওয়ায় এবং অবিলম্বে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজন থাকায়, কৃষিক্ষণ সমস্যা জটিলতর হয়ে পড়েছে। এইসব কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতিগুলিকে উপর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সুদৃঢ় করা দরকার।

সকলেই জানেন যে, গ্রাম্য কৃষিক্ষণ সমবায়ের গঠন একটি পিরামিডের মতন, তার সর্বোচ্চ শিখরে আছে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাংক, মধ্য স্থানে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, এবং বুনিন্যাদে গ্রাম্য প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি। এই সমবায় কাঠামোটি এবং তার প্রতি স্তরের সমিতিগুলির পরিচালনা ও আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমে কাজে পরিণত করা হচ্ছে।

প্রথমে বুনিন্যাদের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৫৮ সালের ৩০এ জুন তারিখে গ্রামাঞ্চলে ১২,৫৯১টি প্রাথমিক ঋণদান সমবায় সমিতি ছিল। এগুলির মধ্যে সদস্যদের শস্যঋণ দিত এমন সক্রিয় সমিতি সংখ্যা ৮,০০০-এর বেশি নয়। অপরিপূর্ণ সংগতি, অত্যন্ত কম আমানত ও নগণ্য সংরক্ষিত তহবিলের দরুন এবং বাস্তবিকপক্ষে পরিচালনার ও তত্ত্বাবধানের কোন রকম বন্দোবস্ত না থাকাতে এইসব সমিতির অধিকাংশকেই দারুণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সমিতিগুলির বেশির ভাগের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় বলে যেসব কৃষক সদস্য থাকলে সমিতির সংগতি ও প্রতিপত্তি বাড়ে সেই ধরনের সমৃদ্ধিশালী কৃষকেরা সমিতিগুলিতে যোগ দিতে চাইত না। কম সুদে টাকা ধার পাওয়া ছাড়া ঋণগ্রহণকারী সদস্যেরা আর কোন রকম উপকার সমিতির কাছে পান না, সে ঋণও যথাসময়ে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদত্ত হয় না। এইসব অসুবিধা বৃদ্ধিতে পেরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সারা রাজ্যে ১,১০০টি বড় ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব

সমিতির প্রত্যেকটিকে ন্যায্য দায় গ্রহণের উপযুক্ত হবার মত লক্ষ্যের বৃহত্তর সুযোগ দেবার জন্য প্রত্যেক সমিতি মোটামুটি ১৫ থেকে ২০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হবে। এইসব সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হবে এবং তারা বাৎসরিক এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার কারবার করবে। প্রত্যেক সমিতিকে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মূলধন হিসাবে সরকার ১০,০০০ টাকা করে দেবেন এবং একজন করে পূর্ণসময়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিয়োগ করবার জন্য সাহায্য করবেন। কম সুদে পর্যাপ্ত পরিমাণে যথাসময়ে টাকা ধার দেওয়া ছাড়া, এই সমিতিগুলি ভাল বীজ, রাসায়নিক সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি কৃষকদের সরবরাহ করবে। তাদের বাড়তি ফসল ন্যায্য দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা তো আছেই। বেশি টাকা খাটানোর জন্য কয়েক বছরে সমিতিগুলির মূলধন বাড়লে সরকার-প্রদত্ত মূলধন ক্রমশ প্রত্যাহার করা হবে। সদস্যদের বেশ লাভজনকভাবে ফসল বেচতে সহায়তা না করে শুধু কৃষিক্ষণ ও চাষের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করাই যথেষ্ট নয়। কাজেই কতকগুলি বড় কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সহযোগিতায় দেশময় কৃষিবিপণন সমবায় সমিতি স্থাপন করার সৎকল্প করা হয়—যেগুলিতে মূলধনী অংশ, ব্যবস্থাপনা সাহায্য এবং গুদাম তৈরির জন্য ঋণ তথা সাহায্যের আকারে সরকারী সহযোগিতা থাকবে। বড় ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির পাশাপাশি একটি সর্বোচ্চ বিপণন সমবায় সমিতিতে সংযুক্ত রাজ্যসরকারের সাহায্যপুষ্ট ১০২টি বিপণন সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দূর পল্লীগ্রামের কতকগুলি বড় ঋণদান সমিতির গুদাম তৈরির উদ্দেশ্যেও অর্থসাহায্য করা হয়েছে। এইসব বিপণন সমিতি তাদের অনুমোদিত সমিতিগুলির ও সদস্যদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করে গুদামজাত করে এবং এইসব ফসলের উপর মালিকদের অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ অগ্রিম দিয়ে থাকে—যার দ্বারা মালিকেরা চড়া বাজারে ফসল বিক্রির জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এই

সমিতিগুলি আবার পাইকারি হিসাবে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি সরবরাহ করে। উক্ত গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে অখণ্ড পরিকল্পনায় আরও স্থির করা হয়েছিল যে, ফসল উৎপাদনের জন্য সদস্যদের যে ঋণ দেওয়া হবে তা বিপণন সমিতির মাধ্যমে তাদের বাড়তি ফসল বিক্রয় করে অথবা তাদের উর্বৃত্ত ফসলের জন্য অগ্রিম দিয়ে ঋণের টাকা আদায় করে নেওয়া হবে।

এই কর্মসূচি অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৫১৪টি বড় ঋণদান সমিতি স্থাপন করা হয়েছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে ৫১টি বড় ও ১২০টি ছোট গদ্যদাম সহ সরকারের অংশসম্বলিত ৫১টি বিপণন সমবায় সমিতিও স্থাপন করা হয়েছে। এইসব সমিতিতে সদস্যপ্রাপ্ত ঋণদানের পরিমাণ ও মূলধনের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে এবং সমিতিগুলির পরিচালনায়ও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যা হোক, অনেকগুলি সমিতির কর্মক্ষেত্র বহুদূরে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু সমবায় আন্দোলনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মৌলিক সংহতি ও পারস্পরিক জ্ঞানের আদানপ্রদান সমিতিগুলির মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। সেজন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ১৯৫৮ সালের নবেম্বর মাসের ও ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে পল্লী সহায়ক সমবায়রূপে পুনর্গঠিত করতে হবে, গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই সেগুলির সদস্য হ'তে পারবে, এবং এই সমবায়গুলিই সম এলাকাভুক্ত গ্রাম-পঞ্চায়তের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। এই সমবায়গুলিকে প্রথম পাঁচ বছর শিক্ষাপ্রাপ্ত ম্যানেজার রাখার জন্য অর্থসাহায্য করা হবে এবং এদের লক্ষ্য হবে গ্রাম পঞ্চায়ত এলাকার সমস্ত পরিবারকে সহায়ক সমবায়ের সদস্য করা। কেবলমাত্র ধার পাবার উপযুক্ত জমির মালিক-সদস্যদের যথাযোগ্য টাকা ধার দিলে হবে না, গ্রাম্য উৎপাদন কর্মসূচি অনুসারে ছোট ছোট কৃষকদেরও টাকা ধার দেওয়া দরকার—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

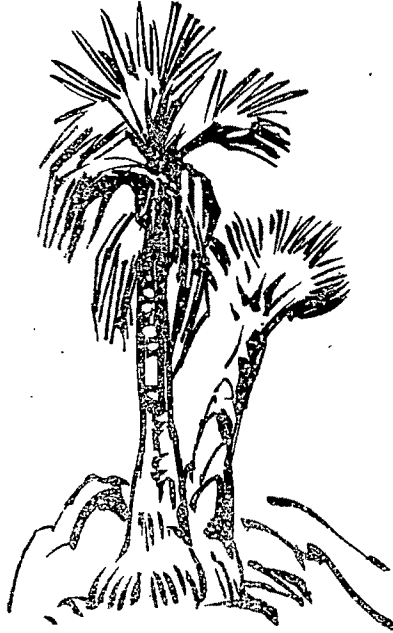
১৯৬৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৮,০০০ গ্রাম নিয়ে ১৭,৫০০ গ্রাম পঞ্চায়ত গঠন করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রায় ৮,৫০০টি গ্রাম পঞ্চায়ত ইতিমধ্যেই সমবায় সমিতির আওতায় এসেছে। এখন এগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে উপযুক্ত সহায়ক সমবায়ে পরিণত করতে হবে। অন্যথ্যা এলাকাতেও এইভাবে দ্রুত সহায়ক সমবায় স্থাপনের পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বাঁচানো যাবে না এই রকম জীবনীশক্তিহীন নিষ্ক্রিয় সমিতিগুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ করে দেবার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হচ্ছে।

বুনিয়াদি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ৪৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে প্রয়োজন হ'লে সংযুক্ত করে ১৭টি শক্তিশালী ব্যাংক পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশবিভাগের ফলে শেয়ার মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার মত কম পড়ায় এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ব্যাংকগুলির অধিকাংশের আর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, তারা আমনতকারীদের পুরো টাকা আদায় দিতে পারে না। ব্যাংকগুলির সম্পূর্ণ ঘাটতি সরাসরি সরকারী সাহায্যে পূরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ব্যাংকগুলি যাতে আমনতকারীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য বিনা সন্দেহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলির সংগতি ও ধার করবার শক্তি বাড়ানোর জন্য তাদের বেশ মোটা রকম সরকারী শেয়ার মূলধন প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার জন্য যোগ্য বিভাগীয় অফিসারকে আহ্বানক্রমে পাঠানো হবে। প্রস্তাবিত ১৭টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ব্যাংক ইতিমধ্যেই পুনর্গঠিত হয়েছে এবং বাকিগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই পুনর্গঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বহু টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে উচ্চে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকের যে ১৩৮ কোটি টাকা ঘাটতি পড়েছিল, এবং পূর্ব পাকিস্তানে ঋণ হয়ে গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থসাহায্য করে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন এবং ১৫ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধন কিনে ব্যাংকটির আর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করেছেন। এ ছাড়া রাজ্য সমবায় বিভাগের একজন উর্ধ্বতন আধিকারিককে ব্যাংকটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত করে তাঁর বেতন প্রভৃতির খরচ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহন করছেন। পুনর্গঠনের এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক কম সুদে প্রাদেশিক ব্যাংকের মাধ্যমে বার্ষিক ফসল ঋণ-দানের জন্য যে অর্থ লক্ষ্যী করবেন, রাজ্যসরকার

রিজার্ভ ব্যাংকের সেই টাকার পুরোপুরি জামিন হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে চাহিদা এবং সে সম্পর্কে এতদিনকার নগণ্য সাফল্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য আছে সমবায় ব্যাংক সেই পার্থক্য কমিয়ে ফেলবার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন।

রাজ্যের সমবায় ঋণদান ব্যবস্থাকে একটি যন্ত্র হিসাবে ধরলে সেই যন্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এইভাবে প্রয়োজনমত পুনর্গঠিত ও পরিবর্তিত এবং পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এইভাবে সহজ ও নতুন জীবনধারা লাভ করে এই যন্ত্র এখন নতুন উদ্দীপনায় খাদ্যোৎপাদন ও পল্লীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সাধনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে চলবে। [বেতার-কথিকা]



খেজুররসের রূপান্তর

শ্রীঅজিত চক্রবর্তী

আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, বর্তমান যুগটা শীতল পানীয়ের যুগ। ঠান্ডা লড়াইয়ের এই যুগে ঠান্ডা পানীয়ই আমাদের অধিক প্রিয়, তা সমগ্রটা শীতই হোক কি গ্রীষ্মই হোক। উষ্ণ চা আর উষ্ণ কফির স্থান দ্রুত দখল ক'রে নিচ্ছে শীতল চা আর কফি। লোকে বেশি পয়সা দিয়ে শীতল পানীয়কে সমর্থন জানাচ্ছে। 'লাল পানীয়' যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেও দেখবেন বিয়ারের চেয়ে আইস্‌ড্‌ বিয়ার-এর উপরেই তাঁদের বেশি লোভ। আর এই যে সাগর-পারের কোকা-কোলা গোটা দেশটাকে জয় করতে চলেছে, হিসেব ক'রে দেখেছি, তারও ঐ একই কারণ। আজকের দিনে শীতলতার জয় সর্বত্র।

আমাদের দেশে এমন একটি শীতল পানীয় আছে যা আমাদের অনাদর আর অবহেলায় অপাঙ্ক্তেয় হয়ে থাকলেও বাঙলার বাইরে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি নীরা অর্থাৎ তাল অথবা খেজুর গাছের রসের কথা বলছি।

আমরা, শহুরে বাবুদা, যদি এই লোভনীয় পানীয়কে ভুলে গিয়ে থাকি তো সেজন্য খেজুরগাছ-গুলোকে দোষী করলে চলবে না। মনে হয়, পশ্চিম দুনিয়াতে খেজুররস অর্থাৎ নীরার চল নেই ব'লেই আমাদের দেশে আজ তার এই দুরবস্থা। অবশ্য পশ্চিম জগতে নীরার চল নেই মানে এ নয় যে, কোর্নাডিনই চলবে না। আসল কথা হ'ল, আমরা কখনও সে চেষ্টা করি নি। করলে কী হ'ত বলা সম্ভব নয়, কারণ তেমন কথা এখনও কেউ ভেবেছেন ব'লে শুনিনি নি।

গাঁয়ের মানুষ কিন্তু এখনও খেজুররসের রসস্বাদন করতে পারলে আর কিছু চান না। বাঙলাদেশের যৌদিকেই গ্রামাণ্ডলে যান না কেন, দেখবেন খেজুর-

গাছে কলসি ঝুলছে। সকালে-বিকালে সিউলীরা খেজুরগাছে উঠে, সেই কলসি পেড়ে আনে, তারপর গ্রামের রসিকজনদের দেখা যায় মনের আশ মিটিয়ে রস খেতে। কেউ বাড়িতে ব'সে খান, কেউ-বা সোজা গাছের নিচে ব'সে খান। বাল্যকাল যাঁদের গায়ে কেটেছে তাঁদের জিগ্‌গেস করলেই জানতে পারবেন, তরুণ বয়সে রস চুরি ক'রে খান নি পল্লীগ্রামে এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

সম্প্রতি খবরের কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল যা অনেকেই দেখে থাকবেন। নদিয়া সীমান্তে পাকিস্তানের এক সশস্ত্র হানাদারের দল অনুপ্রবেশ করে, তারপর খেজুরগাছ থেকে যত রস পাওয়া সম্ভব সংগ্রহ ক'রে চম্পট দেয়। এ খবরে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—সীতাই খেজুররস এমনই জিনিস যা মানুষকে লোভী ক'রে তোলে।

শুদ্ধ মিষ্টি আর লোভনীয় পানীয়ই নয়, খেজুর-রসে শরীরের গঠনমূলক উপাদানও রয়েছে প্রচুর। আর খুব বেশি খেলেও এতে অনিষ্ট হয় না কিছু। মানুষের কাছে প্রকৃতির উপঢৌকনস্বরূপ এই খেজুররসে খনিজ লবণ, প্রোটিন, লবণ এবং শর্করা-জাতীয় উপাদান আছে যথেষ্ট। জাতির জনক বিনা কারণে জাতিকে বারংবার নীরার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন নি।

গান্ধীজি নীরার মধ্যে তিনটি শক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। বেকারী, দারিদ্র্য আর পান-দোষের বিরুদ্ধে নীরাকে দেখেছিলেন তিনি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে।

শিল্প হিসেবে দেখলে নীরা যে অনেক-কিছু দিতে পারে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না। যত্ন-তরু খেজুরগাছ লাগানো চলে। রেল-লাইনের দু'ধারে, পতিত, অনুর্বর জমিতে বা খাল কিংবা

পুকুরের পাড়ে—যে-কোন জায়গাতেই খেজুরগাছ সামান্য খরচে লাগানো যেতে পারে। আর জমি কিনে কিংবা লীজ নিয়ে খেজুরগাছের চাষে হাত দেবার মত সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে যে অসংখ্য খেজুরগাছ পড়ে আছে সামান্য টাকায় সে-গুলো লীজ নিতে পারেন। সাধারণত গাছ-প্রতি মরসুমে এক থেকে দু' টাকা হ'ল লীজের হার। যাঁদের এ সামর্থ্যটুকুও নেই, তাঁরা গ্রাম্য সিউলীদের কাছ থেকে সরাসরি নীরা অর্থাৎ খেজুররস কিনতে পারেন।

নীরা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করবেন, তাঁদের কোন রকমের ঝুঁকিই নিতে হবে না। নীরা বিক্রি হ'লেই লাভ হয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু বিক্রি না হ'লেও ক্ষতি নেই। অ-বিক্রিত নীরা থেকে সিরাপ, মিছরি, পাটালি, গুড় বা চিনি তৈরি হতে পারে। সেন্ট্রি-ফুগাল মেশিনের মূল্যও খুব বেশি নয়, পাঁচ শ' টাকারও কম। এই মেশিনে গুড় থেকে উৎকৃষ্ট চিনি তৈরি করা যায়।

আম্বন থেকে চৈত্র মাস অবধি খেজুরগাছে রস থাকে, তালগাছে থাকে চৈত্র থেকে আষাঢ় অবধি। খেজুররস থেকে তালের রস আরও মিষ্টি। এ রসের মিছরির চাহিদা আছে। খেজুররসে যা যা হয় তালের রসেও তাই হয়। নীরা বলতে খেজুররস আর তালের রস দুই-ই বোঝায়।

বাংলাদেশের শহর-অঞ্চলে নীরা এতদিন জনপ্রিয় না হবার কারণ নীরা-ব্যবসায়ীরাই। খেজুররসের সঙ্গে জল মিশিয়ে রস-পিপাসাদের কাছে জিনিস-টাকে খেলো করেছেন তাঁরাই। কলসি ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি ক'রে রস বিক্রি এবং মাটির ভাঁড় কিংবা অপরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে পরিবেশন শহরের

রুচিসম্পন্ন মানুষের মনঃপুত হয় নি। হবার কথাও নয়।

নীরা শীতের শীতল পানীয়। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও এই শীতল পানীয় পান করা চলে, সর্ব শরীর তাতে তেতে ওঠে। ঠান্ডা-ঘরে, রেফ্রিজারেটরে কিংবা মামদুলি বরফ-বাক্সে রাখলে নীরা আরও ঠান্ডা থাকে, আর খেতেও ভাল লাগে। ঠান্ডা ক'রে রাখলে রস থাকেও বেশি সময়—একটা দিন তো অনায়াসেই রাখা চলে। সোডা-ওয়াটারের মত বোতলে ভর্তি ক'রে রাখলে তা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত হয়, ঠিক সেই রকম মার্জিত রুচিসম্পন্নদেরও আকৃষ্ট করা চলে।

মানুষের রুচি পালটে গেছে। মাটির ভাঁড় কিংবা মামদুলি কাঁচের গ্লাসে আর কেউ সন্তুষ্ট নয়। সাজানো টেবিলে এক বোতল নীরার মধ্যে একটা 'স্ট্র' গুঁজে দিন—যে-কেউ খুঁশি হয়ে 'স্ট্র'-টা মুখে পুরে দেবেন।

গুড়ও তাই। মাটির কলসিতে আর চলছে না। সুন্দর আলকাথিন কাগজে মোড়ক ক'রে দিন, গুড়ের নামও কোনদিন শোনেন নি এমন সাহেব-সুবোরাও ভাববেন দেখাই যাক না একবার!

মানুষের রুচি যখন পালটে গেছে ব্যবসায়ীকে তখন তা মেনে নিতে হবে—অন্ততপক্ষে মেনে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। পুরাতন ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা খুব বেশি নেই—একথা জোর ক'রেই বলা চলে।

পশ্চিম বাংলার দু'টো সংস্থা—তালগুড় মহাসংঘ এবং অভয় আশ্রম—নীরা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। প্রচারের অভাবেই এঁদের এই প্রয়াসের কথা অনেকে জানতে পারে নি, নীরাও ততটা জনপ্রিয় হয় নি। এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

চীনাবাদামের চাষ

মহম্মদ মজহর আলি

অল্পকরী ফসলের নাম বলিতে হইলে প্রায় কোন চাষাই চীনাবাদামের নাম করিবেন না। কারণ ইহার চাষে কিছু লাভ হয়, তাহা তাহাদের জানা নাই। ইহার চাষ করা দূরে থাকুক, বেশির ভাগ চাষী ইহার গাছও দেখেন নাই। আমি নিজে ইহার চাষ করিয়া দেখিতেছি, ইহা অত্যন্ত লাভজনক ফসল। চীনাবাদামের চাষ আদা, আলু, বেগুন, মূলা, কপি প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার দাবি রাখে। দুরূহের বিষয়, এইরূপ একটি মূল্যবান ফসলের চাষ পশ্চিমবঙ্গে খুব কম হয়। সাধারণ চাষীরা পূর্বপুরুষের নির্দিষ্ট কতকগুলি ফসলের সাবেক ধারায় চাষ করিয়া থাকেন। লোকসানের ভয়ে নতুন কোন ফসলের চাষ করিতে তাহারা ভয় পান। তাহা ছাড়া চাষ করিবার পদ্ধতি না জানা ইহার প্রসারলাভের প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। এই অন্তরায় দূর করিয়া চাষীভাইদিগের অবগতির জন্য নিম্নে বাদামচাষের প্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

চীনাবাদাম খরিফ ঋতুর ফসল। ইহার জন্য দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি প্রশস্ত। এংটেল মাটিতে ইহার ফসল হইতে চায় না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন অল্প অল্প বৃষ্টি হয় এবং মাটি বেশ গরম থাকে, তখন ছয় সাতটি লাঙ্গল দিয়া, মাটি বেশ ঝুরঝুরে ও নরম করা দরকার। মাটি যত নরম ও আলগা হইবে ফলন তত বেশি হইবে। দৌর করিয়া চাষ করিলে বর্ষার অতি বৃষ্টিতে মাটি আঁটিয়া যায় বলিয়া গাছ ভালভাবে বাহির হইতে পারে না। পূর্বোক্ত ফসলে যদি ভালভাবে সার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সার দিবার বিশেষ দরকার হয় না। নচেৎ বিষাপ্রতি পচা গোবরসার কিংবা পচাসার (কম্পাস্ট) চারি-পাঁচ গাড়ি অথবা

কিছু সুপার ফসফেট বা হাড়ের গুঁড়া চাষের পূর্বে ব্যবহার করিলে ফলন খুব ভাল হয়। বাদামচাষে বীজ নির্বাচন একটি বড় সমস্যা। কারণ বাজারে যে বীজ পাওয়া যায়, তাহার বেশির ভাগই রোগগ্রস্ত ও দুর্বল। এইরূপ বীজ দ্বারা ভাল ফলন আশা করা যায় না। আনন্দের বিষয় জাতীয় সরকার পশ্চিম বাঙলার উপযোগী রোগ-প্রতিরোধকারী কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতের চীনাবাদামের বীজ নির্বাচিত করিয়া তাহা চাষীদিগের ব্যবহারের জন্য মজুত রাখিয়াছেন। আমি উক্ত বীজ ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছি।

বীজ রোপণ করিবার পূর্বে তাহার খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। খোসা ছাড়াইবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বীজদানাগুলিতে আঘাত না লাগে। দাগযুক্ত দুর্বল বীজগুলি বাদ দিতে হইবে। তার পর কোন সংক্রামক রোগের জীবাণু বীজের সহিত থাকিলে তাহা নষ্ট করিবার জন্য 'অ্যাগ্ৰোসেন জি এন' নামক রাসায়নিক পদার্থ দিয়া বীজগুলি শোধন করিয়া লইতে হইবে। মাটি বেশ ঝুরঝুরে ও নরম হইলে এক হাত অন্তর সারি করিয়া আট-নয় ইঞ্চি ব্যবধানে একটি একটি করিয়া বীজ বসাইতে হইবে। বীজগুলি যেন জমির সমতল হইতে এক ইঞ্চি নিচে পড়ে। পাঁচ-ছয় দিন পরে অঙ্কুর বাহির হইতে আরম্ভ করে। চারাগাছগুলি ছয়-সাত ইঞ্চি হইলেই কোদাল দ্বারা দুই সারির মাঝের অংশ ভালভাবে খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে এবং আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। তারপর সারির দুই পাশের মাটি টানিয়া আনিয়া গাছের গোড়া উঁচু করিয়া দিতে হইবে। প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই দুই-একটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে। গাছের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির সহিত ফুলের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। ফুলের পাপাড়ি ঝরিয়া পড়ার পর

ফুলের বোঁটাটি লম্বা হইয়া বদলিয়া নিচের দিকে শিকড়ের মত মাটির ভিতর চলিয়া যায় এবং উহাতেই মাটির ভিতর বাদাম ধরে। মাটি যত আলগা ও নরম হইবে ফুলের বোঁটাটি তত সহজে মাটির ভিতর যাইতে পারিবে। এই সময় মাটি নাড়াচাড়া করা চলিবে না, বা করা সম্ভবও হইবে না। কারণ এই সময় গাছে সমস্ত জমি ঢাকিয়া যাইবে এবং আগাছা জন্মাইবার সুবিধা পাইবে না। বাদামগাছ জল দাঁড়ানো সহ্য করিতে পারে না। তজ্জন্য যখন আগাছা পরিষ্কার করা হয় এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হয়, সেই সময় জমির মধ্যে মধ্যে নালা করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে বর্ষার জল পরিষ্কারভাবে বাহির হইয়া যাইতে পারে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফসল পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

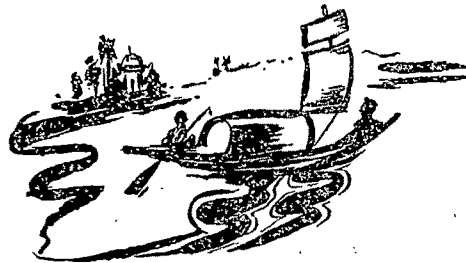
বাদাম মাটি খুঁড়িয়া তোলার জন্য কোদাল ব্যবহার করিতে হয়। বাদামগুলি মাটির উপরের স্তরেই থাকে, সেইজন্য গভীর করিয়া কোপাইলে বাদাম মাটির নিচে চাপা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোদালি তেরছা করিয়া তুলিয়া তুলিয়া কোপাইতে হইবে। দুই-তিন ইঞ্চি মাটি উল্টাইয়া দিলে সমস্ত বাদাম উপরে উঠিয়া আসে। লাঙ্গল দ্বারা অল্প গভীর করিয়া তিন-চারিবার চাষ দিয়া মাটি হইতে বাঁছিয়া বাদাম তোলা যায়। বাদাম-গুলি তুলিয়া রোঁদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া, ঝাড়িয়া, বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হয়।

বাদাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে অধিক দিন জমিতে ফেলিয়া রাখা ঠিক নহে। কারণ সেই সময় অধিক বৃষ্টি পাইলে বাদামগুলিতে গাছ গজাইয়া যায়।

চীনাবাদাম আমরা নানাভাবে খাইয়া থাকি। ইহা ভাজিয়া খাইলে খুব মৃদুস্বাদক হয়। বালক-বৃদ্ধ সকলেরই ইহা লোভনীয়। তাহা ছাড়া ঘুগনি, চানাচুর, সিংগাড়া ইত্যাদিতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। বাদাম হইতে তৈল হয়; এই তৈল সাবান তৈয়ারিতে দরকার হয়। বাদামতৈল হইতে বনস্পতিঘৃত প্রস্তুত হয়। তৈল বাহির করিয়া লওয়ার পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা গোরুর পুষ্টিকর খাদ্য। গাছের খাদ্য হিসাবে এই খইল অন্য যে-কোন খইল অপেক্ষা বেশি উপকারী। বাদামের শুকনা গাছও গোরুর পুষ্টিকর খাদ্য। তাহা ছাড়া এই গাছ পচাইলে উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার হয়।

চীনাবাদাম জন্মাইতে চাষের খরচ খুব কম। এক বিঘা জমিতে আমার বীজ সহ মোট দ্বিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। আমার জমিতে সাত মণ বাদাম জন্মিয়াছিল। সেই সময়ের বাজারদরে এক শত চল্লিশ টাকা পাইয়াছি। বাদাম তুলিয়া লওয়ার পর ঐ জমিতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দেওয়া রয়্যাল কিডনি আলুর চাষ এবং তাহার সহিত মিশ্রচাষ হিসাবে মিঠা কুমড়ার চাষ করিয়াছিলাম। আমার আলু-কুমড়ার ফলন খুব ভাল হইয়াছিল।

আমি আমার চাষীভাইদিগকে এই মূল্যবান ফসলের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতোঁছি।



‘সকলের তরে সকলে আমরা’

শ্রীমতী জয়ন্তী চক্রবর্তী

দেখতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আজ চারদিক থেকেই আহ্বান আসছে। অনগ্রসর এই দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উন্নত করে তোলার জন্য আমাদের প্রয়োজন অগণিত দক্ষ কর্মী। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভারি শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দানের সঙ্গে কৃষি-উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে বলেই মিতব্যয় পরি-কল্পনার শেষে এবং তার পরবর্তীকালে ভারতের অগ্রগতি সুনিশ্চিত। গত ১২ বৎসরে প্রধান-প্রধান শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত অনেক এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পূর্ণ করতে হলে আমাদের আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এজন্য সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির ব্যবস্থা করা। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির দ্রুত উন্নতিই ভারি ও লঘু শিল্পের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে। একমাত্র সমবায় প্রচেষ্টাই এ বিষয়ে দ্রুত সাফল্য আনয়ন করতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের মধ্যেই ৪৮ কোটি লোকের জন্য ১১ কোটি টন খাদ্যের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে আমাদের কৃষি-পরি-কল্পনার লক্ষ্য। যেমন করেই হোক আমাদের সেই লক্ষ্যেই পৌঁছতে হবে। এই বিরাট কাজ কৃষকদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। বর্তমানে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির হারও পর্যাপ্ত নয়। দেশের লোক-সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু খাদ্যোৎপাদন সেই তুলনায় বাড়ছে না। ঐ ১১ কোটি টন খাদ্য-উৎপাদন করতে পারলেও প্রায় ২৫ শতাংশ খাদ্যের ঘাটতি থেকে যাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে।

জাতীয় সরকার সব ব্যবস্থাই করছেন, কিন্তু যদি দেশের লোকের সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়া যায় তবে যত বড় পরিকল্পনাই হোক না কেন, তার সার্থকতা সন্দেহপর্যন্ত।

কবি বলেছেন—

আপনারে লয়ে বিরত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী-পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

গতিশীল ও গতিবেগশূন্য-নিশ্চল এই দুটোর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন এবং সমবায় প্রথাই কেবলমাত্র সমন্বয় সাধন করতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উলটালেই এ রকম সমন্বয় এবং সমবায় প্রচেষ্টার সার্থক হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। বিশেষ করে কৃষিতে সমবায় অসাধ্য সাধন করেছে আমেরিকা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইস্রায়েল প্রভৃতি দেশে।

দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা যে, সমবায় বা সরকারী প্রচেষ্টায় যৌথ কারবার করা মানেই সরকারী জবরদস্তি ও কৃষিকাজে জমির মালিকানা স্বত্ব লোপ। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আর এ রকম মিথ্যা অপবাদ আমাদের দেশে ছড়াচ্ছে কিছু লোক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে। তাদের ভয়, যদি লক্ষ লক্ষ কৃষক সমবায় প্রথার মাধ্যমে এবং জাতীয় সরকারী সাহায্যে নিজেদের পায়ে দাঁড়ান ও আর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেন তবে ঐ স্বার্থজীবী গোষ্ঠীকে এক বিরাট আর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে এবং তারা শতাব্দী ধরে যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষককে শোষণ করে এসেছে তা চিরকালের জন্য বন্ধ হবে। তাই তারা আজ সমবায় বা যৌথ খামারের নামে অতিকে ওঠে এবং এই কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, প্ল্যানিং কমিশন এবং জাতীয়মাত্রই সমবায় পন্থায় চাষের উপর জোর দিয়েছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, অতি ধীরে কৃষকেরা

তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী একে অন্যের সাহায্য এবং সকলের সাধারণ প্রয়োজনে-বীজ, সার, উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সুযোগসুবিধা নেবার উদ্দেশ্যে যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে মিলিত হবেন। গ্ল্যানিং কমিশন ও জাতীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে প্রচুর দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন বোধ করে ইতিমধ্যেই কর্মশিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে অত্যন্ত সতর্কভাবে কৃষকগণকে যৌথ পরিচালনা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করতে পারেন এবং যাতে তাঁদের মনে এমন অমূলক সন্দেহ না জাগে যে, তাঁদের ব্যক্তিগত মালিকানায় হাত দেওয়া হচ্ছে। দেশের কৃষিজমি নতুনভাবে পুনর্বন্টন করা হচ্ছে এবং আর যাতে জমি খণ্ডিত হতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। বর্তমানের ছোট ছোট জোতের জমির মালিকদের একত্রে মিলিয়ে চাষের ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এ না হলে একদিকে যেমন কৃষকের সর্বনাশ অন্যদিকে দেশের সমৃদ্ধি ক্ষতি। এতে শুধু যে আমাদের কৃষকদের ও আমাদের আর্থনীতিক জীবনের পুনর্বাসন হবে তাই নয়, আমাদের সামাজিক জীবনের মূলভিত্তিও স্থাপিত হবে নতুন করে এবং দৃঢ়ভাবে। গণতন্ত্র নির্ভর করে সামাজিক দৃঢ় ভিত্তির উপর।

উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আজ জাতীয় সরকার নানা রকম পস্থা অবলম্বন করছেন এবং কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধান করে চলেছেন। যেমন, কৃষকরা যাতে অধিক পরিমাণে সার, উন্নত যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট বীজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করেন তার জন্য চাষের আগেই শস্যের একটি নির্দিষ্ট দর ঠিক করা। চাষীরা এতে উৎসাহিত হবেন এবং পড়তি বাজারেও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয় তার আশ্বাস পাবেন। প্রতি এলাকার একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দরে যাতে তাঁদের শস্য বিক্রি করতে পারা যায় তার জন্য বিপণনকেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। কৃষকদের শস্য রাখার জন্য গুদাম তৈয়ারির পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। এখন অনেক

সময়ই গুদামের অভাবে অনেককেই শস্য যে-কোন দরে বিক্রি করে দিতে হয়। বেকার কৃষজীবীদের গ্রামের নলা কাটা, আল বাঁধা এবং সেচের কাজে নিযুক্ত করবার বিরাট পরিকল্পনার কথা হচ্ছে। সেচের জন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে, তা ছাড়া নলকূপ ও পাম্পের দ্বারাও সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাষীরা যাতে মহাজনদের কাছে অত্যধিক সুলভে খণ না করেন তার জন্য সমবায় কৃষিঋণ সমিতি মারফত আরও ব্যাপকভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে ও প্রতি এলাকাতে উন্নত ধরনের বীজ বিতরণ করার জন্য বীজ-পরিবর্ধন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন হয়ে গেলে এবং ছোট ছোট জোতের মালিকদের একত্র করে যৌথ প্রচেষ্টায় চাষ-আবাদ করার যে চেষ্টা চলছে তা সফল হলে কৃষকদের ঘরে ঘরে হাসি ফুটে উঠবে। আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় টুকরো টুকরো খণ্ডিত জমি। আমাদের দেশে ট্র্যাকটরের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলতেই হবে। আমাদের দেশেই এখন ট্র্যাকটর নির্মাণের সময় এসেছে, কিন্তু এই টুকরো জমি নিয়ে যদি পড়ে থাকি তবে আমাদের নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। আমাদের এই পশ্চিম বাঙলায় কৃষক-পরিবারগুলির ৭০ শতাংশের জমি ও একরেরও কম। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও জাতীয় খাদ্য দফতর তাই আজ কিসে ছোট ছোট কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা যায় সেই চিন্তা করছেন। সারা ভারতব্যাপী পঞ্জায়িত গঠন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই ১৯৬৩ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮,০০০ গ্রাম নিয়ে ১৭,৫০০ গ্রাম-পঞ্জায়িত গঠিত হবে। এর মধ্যেই প্রায় ৮,৫০০টি গ্রাম-পঞ্জায়িত সমবায় সমিতির আওতায় এসেছে। এইগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ সহায়ক সমিতি হয়ে দাঁড়াবে। তখন চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা ঠিক করে নিজেরাই তা মেটাবেন। এইভাবেই আমরা একটি সহজ নতুন জীবনধারা লাভ করতে পারি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় শ্রীযতীক্লনাথ মহলাবীশ

খাদ্যশস্যের সংগ্রহ এবং বণ্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত-সরকার কর্তৃক অদূরভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে কথা উঠেছে, সে বিষয়ে সম্প্রতি আমাদের দেশে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যশস্যের বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু না করলেও পণ্যমূল্যের অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যও যে মজুত শস্যের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দরকার এটা বেশ বোঝা যায়। কেননা, সমাজের নিম্ন-আয়জীবী লোকদের উপর পণ্যমূল্যের এমনি অবাধ উঠানামার একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং সমস্ত পরি-কল্পনাকেও বানচাল করে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

পরিকল্পিত আর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ সম্বন্ধে নীতিগতভাবে কোন বিভেদ নেই বলেই মনে হয়। পরিকল্পিত আর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যাৱশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাই শুধু রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়, নিম্নতম মূল্যে উপরি-উক্ত সামগ্রিক আয়দানি ব্যবস্থাও অবশ্যকর্তব্য।

সরকারের এই প্রস্তাবিত প্রচেষ্টার ফলে ব্যবসায়ী-মহলে স্বভাবতই কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে, কেননা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থা প্রচলিত হ'লে বর্তমানে যেভাবে এবং হারে বেসরকারী ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে ব্যবসা চালানো সম্ভব হবে না এটা তাঁরা বুঝতে পারছেন। তাঁদের আয়ের উপর একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে এবং কিছুটা বেকার-সমস্যারও উদ্ভব হবে—এ বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ। একথা অনস্বীকার্য যে, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থার প্রচলন এবং প্রসারের ফলে বেসরকারী বাণিজ্যের হার অনেকটা খর্ব হবে এবং এটাও সত্য যে অপরিমিত মুনোফা লাভের সম্ভাবনাও প্রায় দূরীভূত হবে। তবে

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের আওতার ভিতরও বেসরকারী বাণিজ্য-ব্যবস্থা কার্যকরী হ'তে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আকারগত খুঁটিনাটির বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, তবে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থিরসিদ্ধান্তে আসবার পূর্বে এই ব্যবস্থার মূলগত আর্থনৈতিক প্রতিপাদ্য বিষয়-গুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রাসংগিক। হামেশাই আমরা একটা অভিযোগ শুনেতে পাই যে, সরকারী ব্যবস্থা মূলত ব্যয়সাপেক্ষ এবং অকার্যকর। বলা হয় যে, উপরি-উক্ত ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টনের খরচ অযথা বাড়বে। অপরপক্ষে প্রচলিত বেসরকারী বাণিজ্য-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, সংগঠনশক্তি এবং কর্মকুশলতার জন্য স্বল্পব্যয়ে একই কাজ হাসিল করা সম্ভব। সুতরাং সমাজের ঘাড়ে অনাবশ্যক একটা বোঝা চাপিয়ে দেবার সার্থকতা কোথায়? সাধারণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহ এবং বণ্টন-ব্যবস্থা সম্ভব একথা অস্বীকার করা কঠিন। এবং একই রকম সীমাবদ্ধ খরচের ভেতর ব্যবসায় পরিচালনা সরকারী ব্যবস্থায় কেন সম্ভব নয় এরও যদি কোন স্পষ্ট কারণ দেখা যায় না তবে অনেক সময়ই যে এটা সম্ভব হয় না তা সত্য। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা কম খরচে সম্ভব ধরে নিলেও, এর ফলে সমাজের প্রকৃত লাভ কতটুকু? এই লাভের অংশ ভোগকারীরা কখনও পাবে না, কেননা ব্যবসায়ী তার পণ্য শুধু খরচের পড়তায় কখনও বেচবে না, বাজারের সবচেয়ে বেশি মূল্যটা পাওয়ার দিকেই তার নজর থাকবে। কাজেই কোন-একটি বিশেষ শস্য মরসুমে ১৬ টাকা মণ দরে ক্রয় করলেও কয়েক মাস বাদে সেই একই পণ্য ভোগকারীর হাতে গিয়ে পৌঁছবে মণ-করা ২৭ টাকা দরে। মুনোফার সমগ্র

অংশই গিয়ে উঠবে ব্যবসায়ীর হাতে, সমাজের হাতে নয়। মাত্র এই অল্প কয়েক মাসের জন্য গুদাম-ভাড়া, মর্দাদি এবং কারবারের ঋণিক প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে একটা মোটা খরচ ধরে নিলেও এতটা বেশি মর্দাদির আশা কেউ যুক্তিসঙ্গত বলে বিশ্বাস করবে না। তবে এ তো সত্যি যে, মর্দাদির সবটাই ব্যবসায়ীরা সব সময় পায় না। কোন কোন চাষী বিশেষ করে বড় চাষীদের কেউ কেউ নিজেদের জমির ফসল অথবা ফসল তোলার অব্যবহিত পরে বাজার থেকে কম দামে কেনা শস্য মজুত করে রাখে, তারপর বাজারে আমদানি যখন কমে আসে তখন বেশি দামে ঐ সমস্ত মজুত শস্য বেচে দেয়।

স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কিছু বলার নেই, কেননা আমরা জানি, অর্থনীতি-বিদদের মতে পণ্যের মূল্য নিরূপিত হয় চাহিদা এবং আমদানির উপর নির্ভর করে। আমদানি কমে গেলে পণ্যমূল্যও বাড়বে আপনা-আপনি, ফলে কোন কোন ভোগকারীকেও উপরি-উক্ত পণ্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্যমূল্যের একটা উচ্চ মানে এসে আমদানি এবং চাহিদার সমতা স্থাপিত হবে। গোঁড়া অর্থনীতি-বিদরাও এমন পরিস্থিতির ভেতর কোন রকম অস্বাভাবিকতা দেখতে পান নি, কেননা এটা তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পণ্যের মূল্য অনির্দিষ্টকালের জন্য উচ্চস্তরে থাকতে পারে না, অতিরিক্ত মর্দাদির সম্ভাবনায় উৎপাদনও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে এবং ফলে পণ্যের মূল্যও নেমে আসবে ধীরে ধীরে। কিন্তু এই প্রাচীনপন্থীরা মূলত অবাধ প্রতিযোগিতা এবং সুদৃষ্ট বিপণন-ব্যবস্থার কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। বাস্তবপক্ষে পণ্যমূল্যের উঠানামা কখনও উৎপাদনের উঠানামার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলে না। আমদানি-পণ্যের সবটাই সব সময় বিক্রির জন্য আসে না এবং চাহিদা ও আমদানির সমতাও সাধারণত দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে পণ্যমূল্য নির্ভর করে কারবারীদের

ফাটকাবাজি এবং অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের উপর। মূল্য নিরূপণে এমনসব কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যেগুলোর সঙ্গে প্রকৃত চাহিদা বা আমদানির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বর্তমান কালের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং অননুভূত বিপণন-ব্যবস্থায় শুল্ক চাহিদা এবং আমদানির উপর দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে এমন তথ্য একেবারেই অবাস্তব। কাজেই গোঁড়াপন্থী না হয়ে আমাদের আরও একটু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়াই উচিত। তা ছাড়া, একথাও মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে যে-কোন দেশে যে-কোন সময়ে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রচলিত মর্দানীতি বিশেষভাবে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর্থনীতিক উন্নয়নে এর প্রভাব এতটা ব্যাপক যে, শুল্ক মর্দানীতির হেরফেরেই দ্রব্যমূল্যের গতিপ্রকৃতির ভিতর একটা বিরাট বিপর্যয় এবং পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া খুবই সহজসাধ্য।

অর্থনীতির নীরস তত্ত্বালোচনা ছেড়ে দিয়ে মোটামুটি এই কথাটা ধরে নিয়ে আমরা এগোতে পারি যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বাড়বে এবং সেইসঙ্গে দ্রব্যমূল্যও পূর্ববর্তী মানে আবার নেমে আসবে। এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঘাটতি এবং চাহিদা-আমদানির অসমতা নিরোধের জন্যই দ্রব্যমূল্যের এমন ওঠানামা আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের, উৎপাদন-ব্যাপারে আমরা কী দেখছি? আমাদের দেশের উদাহরণ দিচ্ছি এইজন্য যে, এ দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-নীতির বিচার এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, দেখতে হবে এই নীতির প্রবর্তনে সরকার সত্যি একটা সামাজিক অবিচার করছেন কি না এবং সত্যি বেসরকারী বাণিজ্যের উপর একটা অহেতুক নিয়ন্ত্রণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সামাজিক এবং আর্থনীতিক অসাম্য ডেকে আনছেন কি না।

দেখা যায় যে, যদি কোন বছর উৎপাদন কমে যায় তবে দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়। উৎপাদনের

ঘাটীতির তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই এই মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ অনেক বেশি। আমি আগেই বলেছি, দ্রব্যমূল্যের নিরূপণ শুধু চাহিদা এবং আমদানির উপরই নির্ভর করে না, ব্যবসায়িক মনস্তত্ত্বও এর মূলে আছে। উৎপাদন ঘাটীতির সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়বে এটা ব্যবসায়ীরা খুব নিভুলভাবে আঁচ করতে পারে। কাজেই এ অবস্থায় যদি চাষী কিছু মাল মজুত করে রাখতে পারে তবে দর আরও বাড়বে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি হয় নি, মূল্যবৃদ্ধির কারণ সেই বিশেষ বৎসরে প্রকৃতি অকুপণ হস্তে তার স্নেহের দান ঢেলে দেন নি। হয়তো অতিবৃষ্টি নয়তো বা অনাবৃষ্টিও এর কারণ। উৎপাদনকারীদের ও বিশেষ করে ছোট চাষীদের বাজারের হাল বুঝবার ক্ষমতা বা জ্ঞান কিছুই নেই। কাজেই ফসল কেটে মরে তোলবার সঙ্গেসঙ্গেই বেচতে তারা বাধ্য, আর সে সময়ই দরও থাকে সর্বনিম্ন। ব্যবসায়ীরাও এই সুযোগে ঝটপট সবটা আহরণ করে নেয় এবং বাজারের অবস্থা কখন কেমন হবে সেটা সঠিকভাবে যাচাই করে নিয়ে বেশি দামে বেচবার আশায় মজুত করে রেখে দেয় সেই মাল। এখানেই তর্ক উঠতে পারে যে, ব্যবসায়ীরা তো স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ কাজটুকু করে যায়। কথাটা সত্যি, কিন্তু দেশের এক অংশের ব্যবসায়ীরা কী করছে বা না করছে তার প্রকৃত তথ্য আচিরেই অপর অংশে প্রচারিত হয়ে যাবে। কাজেই পরস্পরের কর্মধারার গতিটুকু বুঝতে কোন কষ্ট হয় না তাদের।

মজুত করার মনোবৃত্তি যুদ্ধোত্তরকালীন একটা বিশেষ অবদান। গত যুদ্ধের সময় বহু লোকের হাতে প্রচুর অর্থ মজুত হয়েছে। এই পুঁজি নিয়ে খুব সহজেই আমদানি-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। প্রাক-যুদ্ধ যুগে এটা চিন্তাও করা যেত না, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের কারণে। সে যুগে শুধু ব্যবসায়ের কারচুপি দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির চিন্তা মাত্রই অসম্ভব ছিল। কারণ সে সময় কিংবদন্তি মূল্যবৃদ্ধিতেই ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে না হ'লেও

দেশান্তর থেকে প্রচুর আমদানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'ত। অধিকাংশ সময়ই কলিকাতা এবং রেঙ্গুন বন্দরের মধ্যে চালের দামের তারতম্য থাকত মণকরা চার আনা মাত্র, অথচ আমরা দেখেছি, এই অল্প মূল্যফাতেও ব্রহ্মদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যসম্ভার এসে ভিড় করত আমাদের এই কলিকাতা বন্দরে।

শুধু সরকারী আওতায় ছাড়া বিদেশ থেকে শস্য আমদানি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় খাদ্যশস্যের আভ্যন্তরীণ দাম অনেক অংশে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, প্রাক-যুদ্ধ যুগে এটা সম্ভব ছিল না, কারণ বৈদেশিক আমদানির জন্যই দ্রব্যমূল্য অনেক পরিমাণে নিম্নমুখী থাকত। যুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ করে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠিয়ে দেবার পর দ্রব্যমূল্যের উঠানামার গতি অনেকাংশেই অনিশ্চিত এবং দ্রুত দেখা গিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের কিছুটা উঠানামা যুক্তিসহ এবং আবশ্যিক। কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখবার জন্য মূল্যফার প্রয়োজন, তা ছাড়া গুদাম-ভাড়া, পরিবহণ খরচ ইত্যাদি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্যের উঠানামার হার এতটা বেশি যে, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন যেখানে অপরিমিত সেখানে সামাজিক বা আর্থনীতিক যুক্তি মোটেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমাজ-কল্যাণে তাদের অবদানের তুলনায় ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ লাভের অংশ ভোগ করে তা নেহাতই অর্থোক্তিক। তা ছাড়া চাষীরা, বিশেষ করে ছোট ছোট চাষীরা, এই মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এই মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ আসে ফসল-কাটার কয়েক মাস পর, যে সময় অধিকাংশ চাষীর উদ্ভূত কিছু থাকে না। যা উৎপাদন করে তাই বেচে দিতে হয় নিজেদের সাময়িক দায়দেনার চাপে পড়ে। পরে আবার নিজেরাই কেনে বেশি দামে। কাজেই এ থেকেই বুঝা যায়, বেসরকারী বাণিজ্যব্যবস্থাকে খাদ্যশস্য ব্যবসাতে অবাধ অধিকার দেওয়ার পেছনে কোন প্রকার আর্থনীতিক বা সামাজিক যুক্তি নেই।

দেশের বিভিন্ন আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে এখন দেশের আয়ের মান বাড়ছে, সে অবস্থায়ই বিশেষ করে এই সমস্যাটা খুবই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কাজেই খাদ্যশস্যের মজুত মালের উপর পূর্ব-নিয়ন্ত্রণ রেখে খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের উপর যদি রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা না থাকে তবে স্থিতিশীল আর্থনীতিক

ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং পরিণামে আর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্ত ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দেবে।

সামাজিক এবং আর্থনীতিক কল্যাণের দাবিতেই এইসমস্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থার আশু প্রবর্তন এবং দ্রব্যমূল্যের অবাধ উঠানামা নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন।



সুপারির নিবিড় চাষের আদর্শ কার্যক্রম

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ মৃত্তিকায় ও আবহাওয়ায় সুপারিবাগান বিদ্যমান। সুপারি মূল্যবান গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফসল—যার সতেজ বৃদ্ধির জন্য আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন। গাছ জলের অভাব একেবারে সহ্য করতে পারে না বলে সাফল্যের সহিত এর চাষের জন্য সারা বৎসর জল-সেচের অত্যন্ত প্রয়োজন। যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক সেসব জায়গায় জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকলে সুপারিগাছ বেশ ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রতীর থেকে শুরুর ক'রে তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চ স্থানে সুপারির চাষ করা যায়। সুপারিগাছের, বিশেষত চারা অবস্থায়, কিছুটা ছায়ার প্রয়োজন হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সুপারিচাষের যে নানাবিধ পদ্ধতি দেখা যায় সেসবের উন্নতি করবার প্রভূত উপায় আছে। বীজ-সুপারি নির্বাচন, চারাগাছ উৎপাদন, পুরাতন বাগানের উন্নতিসাধন, নতুন বাগানের পত্তন, সার দেওয়া, সেচব্যবস্থা করা, রোগ ও কীটের দমন প্রভৃতির উন্নত পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা গেল।

উন্নত চারাবাগান গঠন

এক ফুট গভীর ক'রে চ'ষে বা কোদাল দিয়ে খুঁড়ে, মাটি ঝুরো ক'রে উপরে ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি পুরুর ক'রে বালি বিছিয়ে দিতে হবে। সেই জমিতে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত ক'রে সেগুন্ডিতে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বাছাই করা বীজ-সুপারি বপন করতে হবে। বালুকাস্তরটির উপর বীজ-সুপারিগুলির বোটার দিকটা যেন উর্ধ্বমুখে থাকে এমনভাবে বপন ক'রে সেগুন্ডিকে পাতলা-ভাবে বালি বা মাটি ঢাকা দিতে হবে। বীজ-সুপারিগুলির উপর প্রত্যহ জলসেচ করা প্রয়োজন।

বপনের তিন মাস পরে সুপারির চারাগুলি তুলে চারাবাগানের কেয়ারিতে রোপণ করতে হবে। বাগানে লাঙল দিয়ে ভালভাবে চ'ষে, ছায়া করবার জন্য তাতে ১২ ফুট অন্তর উত্তর-দক্ষিণে লম্বিত কয়েক সারি কলাগাছ রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে যেন ৯ ফুট অন্তর কলাগাছ থাকে। এই কলাগাছগুলিকে ছায়াগাছ বলা হয়। বীজ-সুপারি রোপণের অন্তত ছয় মাস পূর্বে কলাগাছের তেউড় রোপণ করতে হয়, যাতে সেগুলি এই ছয় মাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুপারির চারাগুলির উপর ছায়া বিস্তার করতে পারে। অতঃপর কলাগাছের সারি-গুলির মধ্যবর্তী স্থানে ৪ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি উঁচু উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কেয়ারি করতে হবে। দুই সারি কলাগাছের মধ্যে ৪ ফুট চওড়া দুইটি কেয়ারি তৈরি করতে হবে। সেচ ও জলনিকাশের জন্য দুই কেয়ারির মাঝখান দিয়ে ১৬ ফুট প্রশস্ত নালী করা দরকার। কলাগাছের দ্বারা যদি যথেষ্ট পরিমাণ ছায়া না হয়, তবে প্রতি কেয়ারির পশ্চিম প্রান্তে ধপে বা অপর কোন শর্দূটি ফসলের গাছ লাগিয়ে আরও ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

সুপারির চারাগুলি চারাবাগানের কেয়ারিতে ১×১ ফুট ব্যবধানে রোপণ করতে হবে। চার ফুট চওড়া প্রতি কেয়ারিতে দুই ধারের ১ ফুট ক'রে জমি ছেড়ে (এক ফুট অন্তর) তিন সারি গাছ রোপণ করতে হয়। রোপণ করবার পর কাঁচা ও শুকনো পাতা কেয়ারিতে পচতে দিলে ভাল সার হয়। গ্রীষ্মকালে কেয়ারিতে প্রচুর জলসেচের ও বর্ষার সময় জলনিকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রোপণের জন্য সতেজ চারাগুলি (এক বৎসরে যেগুলোর পাঁচটি বা তার বেশি পাতা গিজিয়েছে ও বেড় বোঁশ মোটা হয়েছে) বেছে নিতে হবে।

চারাবাগানের জমি যদি উর্বর না হয়, তবে সার দেওয়া দরকার। চারাগাছগুলি অন্যত্র বসাবার প্রয়োজন হ'লে এমন সতর্কভাবে তুলে নিতে হবে যেন শিকড়ে কোন চাড়া না লাগে বা শিকড় না ছেঁড়ে।

উদ্যান রচনা ও চারা রোপণ

যদিও বিভিন্ন এলাকায় দু'টি গাছের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দূরত্ব দেখা যায় তা হ'লেও এক একটি ১২ ফুট চতুষ্কোণের কেন্দ্রে এক-একটি সুপারি-চারা রোপণের প্রণালী সাধারণত অবলম্বন করা যেতে পারে। গর্ত কতটা গভীর করতে হবে তা নির্ভর করে মাটির ধরনের উপর। মাটি যদি আলগা হয় এবং সহজেই তাতে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে ১ই থেকে ২ই বৎসর বয়সের সুপারিচারা ৩ ঘনফুট মাপের গর্তে রোপণ করতে হয়। চারাবাগান থেকে চারাগাছগুলি মাটির 'গদল' বেঁধে তোলা হয় এবং অন্যত্র রোপণের পর গাছের চারপাশের মাটি ভালভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। সুপারির চারাগুলিকে প্রচুর ছায়াদান করবার জন্য মাঝে মাঝে কলাগাছ রোপণ করতে হয়। এঁটেল মাটিতে, যেখানে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা কঠিন, সুপারিচারা ১ই ফুট হ'তে ২ই ফুট গর্তে রোপণ করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে জলনিকাশের ব্যবস্থা সহজে করা যায়, সুপারিচারা সেসব স্থানে মে-জুন মাসে তুলে রোপণ করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বর্ষায় জল আবদ্ধ হয়ে যায়, সেসকল স্থানে বর্ষা শেষ হবার পর চারা রোপণ করা যেতে পারে।

পরিচিত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ

সাধারণে জানেন যে, বার্ষিক বা ব্যাধির জন্য সুপারিগাছ ম'রে যাবার ফলে বাগানের স্থানে স্থানে ফাঁক পড়ে যায়। তা ছাড়া, যে-কোন বাগানে ফলন্ত গাছগুলিকে অবিরত সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, বাগানে এমন বহু সুপারিগাছ থাকে যেগুলোর ফলধারণ-শক্তি গড়পড়তার নিচে। চাষে লোকসান যাবার

মত কম সুপারি যেসব গাছে ফলে সেগুলিকে চিহ্নিত ক'রে রাখা উচিত। গাছগুলিতে যদি বারংবার এরকম অল্প পরিমাণ ফল ধরে তা হ'লে সেগুলিকে সরিয়ে তার জায়গায় পরিচিত গাছের বীজসুপারি থেকে জন্মানো উন্নত ধরনের পরিচিত গাছের চারা রোপণ করা দরকার। বাগানে উপযুক্ত-সংখ্যক গাছ বজায় রাখবার জন্য সমস্ত বাগানেই গাছের তলায় নতুন চারা রোপণ করা উচিত। সেগুলি, যেসব গাছে ভাল ফল হয় না সেসব গাছের স্থান অধিকার করতে পারে। রীতিমত সেচ ও সারের ব্যবস্থা করলে কতকগুলি গাছের উন্নতি হ'তে পারে।

জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপারিচাষের যত রকমের প্রথা প্রচলিত আছে তার সবগুলোরই উন্নতি করা বিশেষ দরকার। সমুদ্রতীরে, সমতলভূমিতে ও পাহাড়ী অঞ্চলে নানাবিধ মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার মধ্যে শব্দ সুপারির বা অন্য ফসলের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে সুপারির চাষ করা হয়। সচরাচর দেখা যায় যে, সুপারিবাগানে বহু কলার ঝাড় থাকে। কোথাও কোথাও সুপারিগাছের চাইতেও কলাগাছের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। এত অধিক-সংখ্যক কলাগাছ প্রধান ফসল সুপারির গাছের সঙ্গে খাদ্য ও জলগ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব'লে সুপারিবাগানে কলার ঝাড় বেশি রাখা উচিত নয়। ঢালু জমিতে সুপারিবাগান করতে হ'লে সরু সরু ফালিতে ধাপ কেটে জমি তৈরি করতে হবে, তাতে ভূমিক্ষয় বিশেষভাবে নিবারণিত হবে। বর্ষার শেষে, অক্টোবর-নবেম্বর মাসে সুপারিগাছগুলির চতুষ্পার্শ্ব খনন ক'রে আগাছা নির্মূল ক'রে ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন মাটি ফেলে তারপরে সুপারি-বাগানে মিশ্র চাষ আরম্ভ করা উচিত।

গ্রীষ্মকালে সেচপ্রণালী ও জমির প্রকৃতি অনুযায়ী চার থেকে পনের দিন অন্তর সুপারি-গাছগুলিতে নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

অত্যধিক বর্ষার মাসগুলিতে জমিতে আবশ্যিক জল-
নিকাশের ব্যবস্থা রাখা সেচের ব্যবস্থার মতই প্রয়ো-
জনীয় এবং সেজন্য স্দুপারিগাছের সারিগুলির
মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নালী কাটা দরকার।
কালবৈশাখীর বৃষ্টি শুরু হ'লে, নানা রকম সবুজ-
সারের গাছের বীজ বুনো দেওয়া উচিত। এসব
গাছ ভূমিক্ষয় নিবারণ করবে ও আগাছা নষ্ট ক'রে
জমিতে বহু পরিমাণে সারের যোগান দেবে।

সার দেওয়া

প্রতি বৎসর অত্যধিক বৃষ্টির শেষে স্দুপারিগাছে
সার দেওয়া উচিত। গাছপ্রতি ২০ হ'তে ৩০
পাউন্ড পাতাপচা সার, ৩০ পাউন্ড গোবরসার ও
ই পাউন্ড মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করলে
সুফল পাওয়া যায়। গাছের গুঁড়ি থেকে দু'।
ফুট দূরে চারধারে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর
নালা কেটে তাতে সার দিলে ভাল হয়।

রোগব্যাদি

নানাবিধ জীবাণু স্দুপারিগাছের অত্যন্ত ক্ষতি
করে। এগুলো থেকে বৃন্দ ও তরুণ উভয় প্রকারের
গাছ আক্রান্ত হয়। উপদ্রব সামান্য রকমের হ'লে
ক্ষতিগ্রস্ত গাছের পাতায় ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।
বেশি রকমের উপদ্রব হ'লে পাতাগুলি রক্ত ও
তামাটে হয়ে যায় এবং আক্রান্ত পাতাগুলোর তলা
ধূসর বা লাল গুঁড়োয় ঢাকা পড়েছে ব'লে মনে
হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পাতাগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে
এবং শুকিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে এসব জীবাণু
ভীষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গন্ধকচূর্ণ জলের
সঙ্গে মিশিয়ে (১ আউন্স গন্ধক চূর্ণ + ৩ গ্যালন
জল) বা 'ফলিডল' (২ সি সি এক গ্যালন জলে)
পিচকারি দিয়ে প্রয়োগ করলে অথবা চুন বা গন্ধক-
চূর্ণ ছিটিয়ে দিলে এই জীবাণু প্রতিরুদ্ধ হয়।

কোলে রোগ (ফল পচা) স্দুপারিগাছের একটি
গুরুতর ব্যাদি 'ফাইটোফ্‌থেরা এরেকা' জীবাণু

থেকে এ রোগ হয়। কেরালা ও মহীশূরের অতি-
বৃষ্টির অঞ্চলগুলিতে এই ব্যাদি মহামারীরূপে
দেখা দেয়। সাধারণ বোদো মিশ্রণ পিচকারি দিয়ে
দু'বার গাছগুলিতে ছিটিয়ে দিলে এই ব্যাদির
প্রতিরোধ করা যায়। বর্ষাকাল আসার আগে মে
মাসের শেষ সপ্তাহ বা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে
একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে বর্ষা বন্ধ থাকলে
ম্বিতীয়বার ছিটানো উচিত।

গে'টে রোগ বা 'ব্যান্ড ডিসিজ' নামক আর একটি
ব্যাদি প্রায়ই দেখা যায়। পাতা কুণ্ডিত হওয়া,
ছোট হওয়া এবং গাছের দুইটি গাঁটের মধ্যে দূরত্ব
ক'মে যাওয়া এই ব্যাদির লক্ষণ। ই পাউন্ড তুতে
ও ই পাউন্ড চুন মিশ্রিত ক'রে রোগাক্রান্ত গাছের
গুঁড়িতে লাগালে উপকার হয়।

'জ্ঞানোডারমা লিসিডাম' নামক একপ্রকার ছত্রাক
থেকে এক রকম রোগ হয়। এ রোগ আনাবে
মহীশূর ময়দান অঞ্চলে বহু স্দুপারিগাছের জীবন-
নাশ করে। গাছের গোড়া ঘিরে ২ই ফুট থেকে
২ ফুট গভীর নালা খুঁড়ে তাতে গাছপ্রতি ১
পাউন্ড গন্ধকচূর্ণ প্রয়োগ করলে ও ভালভাবে
জলনিকাশের ব্যবস্থা করলে এই ব্যাদি দমন করা
যায়।

দক্ষিণ কেরালায় স্দুপারিগাছের পাতার হলদে
রোগ অত্যন্ত ক্ষতি করতে দেখা যায়।

স্দুপারিগাছ সরু হ'লে তার বৃন্দ্র সময়ে তাকে
রোদের তাপ থেকে রক্ষা করা দরকার, তা না হ'লে
গাছে গুঁড়ি ভেঙে যায়। বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম
দিকে দ্রুতবর্ধনশীল লম্বা গাছ লাগিয়ে ছায়া সৃষ্টি
করলে এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ক'মে যায়।

ফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি

বাজারে স্দুপারির কীরকম চাহিদা আছে তার
উপর নির্ভর করে কোন অবস্থায় স্দুপারি পাড়তে
হবে। বাজারে যদি কচি স্দুপারির চাহিদা থাকে
তবে কচি স্দুপারি পাড়তে হবে। শুকনো পাকা

সুপারির চাহিদা থাকলে, গাছ থেকে পাকা সুপারি পাড়া দরকার।

গাছ থেকে কাঁচ ফল সংগ্রহ করে সেগুন্ডিলর খোসা ছাড়িয়ে বিভিন্ন আকারে কেটে নেওয়া হয়। তারপর কোথাও রঙ লাগিয়ে কোথাও রঙ না লাগিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় কাঁচা সুপারি জলে সিদ্ধ করে তারপর শুকানো হয়। গাছ থেকে পাকা সুপারি পাড়া হ'লে সেগুন্ডিলকে খোলা রোদে প্রায় ৪০ দিন ছাড়িয়ে রেখে শুকানো হয়, তারপরে খোসা ছাড়িয়ে সুপারি বের করে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী সুপারি সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞের কৌশল প্রয়োজন হয়। সচরাচর গৃহস্থের চাহিদা মেটাবার জন্য পাকা সুপারি মাটির তলায় পুতে রেখে বা জলে ভিজিয়ে রেখে খোসা পিচিয়ে নেওয়া হয়, তারপরে খোসা ছাড়িয়ে সুপারির দানা বের করে নেওয়া হয়। সুপারি জলে পচালে যে দুর্গন্ধ হয়, তা নিবারণ করার উন্নত প্রণালীর জন্য বিশেষ কোন গবেষণা এখনও হয় নি।

উন্নত শ্রেণীর সুপারিঃ গুণের হ্রাসবৃদ্ধির হেতু

বাজারে উন্নত গুণসম্পন্ন সুপারির অধিক মূল্য পাওয়া যায়। সুতরাং বাজারে পাঠাবার জন্য তৈরি করার সুপারিগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত ন্যাড়া-চাড়া করতে হয়। সুপারিগাছ থেকে সংগ্রহ করা এবং সুপারিগুলি ভালভাবে রোঁদে শুকানো উচিত। ফলের চারপাশ সমানভাবে শুকানো দরকার—তাতে সুপারির দানার রঙ উজ্জ্বল হয়। শুষ্ক সমতল ভূমিতে সুপারি ফলগুলি একটিমাত্র স্তরে রোঁদে বিছিয়ে দিতে হয় এবং সমানভাবে

শুকাবার জন্য সেগুন্ডিলকে নিয়মিতভাবে ওলটপালট করে দেওয়া প্রয়োজন। খুব বেশি শুকোলে শাঁসের গুণ কমে যায় এবং সেগুন্ডিল ফেটে যায়। শুকোবার সময় সুপারিগুলি যাতে বৃষ্টিতে না ভিজে তার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে, নতুবা সুপারির রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুন্ডিল কালো হয়ে ও ছাতা ধরে যায়।

সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারোপযোগী সুপারি প্রস্তুত করতে হ'লে সেগুন্ডিল ঠিকমত পাকলে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সুপারি আগুনের তাপে শুকোলে পুড়ে কালো হয়ে যায়, সুপারির গুণ খারাপ হয়ে যায় এবং তাতে ধোঁয়ার গন্ধ হয় বলে তার দর কমে যায়।

মিশ্র ফসল লাভজনক

সযত্নে এবং মনোযোগের সহিত সার দিয়ে বাগানে সুপারিগাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে মধ্যবর্তী ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে। সাধারণত কলা মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে উৎপন্ন করা হয়। যত্ন করলে আনারস, পেঁপে, গোলমরিচ, গাছপান প্রভৃতি মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে উৎপাদন করা যায়। সুপারিবাগানের চারধারে নারকেলগাছ রোপণ করা যেতে পারে—তাতে যে শুধু আয় বাড়বে তাই নয়, নারকেলগাছগুলি সুপারিগাছগুলির উপর ছায়া বিস্তার করবে এবং ঝড়ের বেগ প্রশমিত করবে। তবে, মনে রাখতে হবে যে, মধ্যবর্তী ফসল যেন জমি থেকে অধিক খাদ্য আহরণ না করে এবং তারা প্রধান ফসল সুপারির সঙ্গে খাদ্য এবং জল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে। এইজন্য যেখানে মধ্যবর্তী ফসল উৎপাদন করা হয়, সেখানে অধিক পরিমাণে সার ও সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।*

*ভারতীয় কেন্দ্রীয় সুপারি সমিতির পুস্তিকা থেকে

ভারতের জলসেচের ব্যবস্থা

প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জলসেচের কী পরিমাণ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার কতটা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে—এ দুয়ের মধ্যে কাল্পনিক বা প্রকৃত যে ব্যবধান রয়েছে তা নিয়ে গত দুই বছর ধরে আলোচনা চলছে।

কিন্তু এরকম আলোচনা করার আগে বড় এবং মাঝারি সেচ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ব্যয়ের কতটা কম খরচ হয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সেইভাবেই সেচের জল ব্যবহারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

আবার কোন পরিকল্পনার সেচক্ষমতার পরিমাপ সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। কোন পরিকল্পনা আংশিকভাবে বা পুরোপুরি সম্পূর্ণ হলে তার জলাধার বা সেচের খাল থেকে জল নিয়ে যে পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব তাকেই এক কথায় পরিকল্পনার সেচক্ষমতা বলা যায়। তবে এই সঙ্গে জলসেচ ব্যবস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্থনীতিক এবং সামাজিক দিকও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ অধিক জল ব্যবহার করে আবাদের যে পদ্ধতি রয়েছে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেচের জল সরবরাহের পূর্বে স্থানীয় চাষীদের এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল করে নেওয়া দরকার। তা না হলে চাষীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর সেচের জলও অকারণ নষ্ট হবে।

এর আরও কতকগুলি দিক আছে। সেচ-অঞ্চলের প্রত্যেক চাষীকে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ জমির যথাযথ উন্নয়ন, উন্নত বীজ, সার ও সরঞ্জাম চাই। চাষীর আয় যেমন বাড়বে তেমনই তাকে আবাদের জন্য আরও বেশি টাকা মজুত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত এইরকম চাষে সেচের জলের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা চাষীকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। তবেই তার পক্ষে নতুন পরিকল্পনার ফলে সেচের যে জল পাওয়া যাচ্ছে তার যথার্থ ব্যবহারে অবহিত হয়ে ওঠা সম্ভব।

তৃতীয়ত বৎসরের যে সময়ে সাধারণত চাষীকে অন্য কাজের সন্ধান করতে হ'ত তখনও পরিমিত সেচের জল পাওয়া সম্ভব বলে তাকে এখন প্রায় সারা বছর ধরেই চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। তার নিশ্বাস নেবার সময় থাকবে খুবই কম। কাজেই এখন তাকে প্রয়োজনীয় লোকজনের ব্যবস্থাও নতুনভাবে করতে হবে।

আবার যেসব অঞ্চলে বসতি কম সেখানে প্রয়োজনীয় লোকজনের অভাবে সেচব্যবস্থার যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে না। তুঙ্গভদ্রা অঞ্চলে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

সেচব্যবস্থার সামাজিক আর্থনীতিক দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান ভূমিব্যবস্থায় সেচের নালা বা খালের জন্য জমি সংগ্রহ করাও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ফলে সেচ-ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণে বিলম্ব ঘটে।

এর মানবিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক সময় চাষীরাই বাধার সৃষ্টি করে থাকে—যদিও এ রকম খুব কমই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও চাষী তার জমির মধ্য দিয়ে যদি নালা নিয়ে যেতে বাধা দেয় তা হলেই কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে।

সর্বোপরি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানাবিধ সমস্যা তো আছেই। বাঁধের জলাধারের সঙ্গে সঙ্গে নালা ও ক্ষেতে জল নিয়ে যাবার খাল তৈরি না হলে সেচ-ব্যবস্থা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আবার জল যাতে আপনা থেকেই জলাধার থেকে বয়ে নালাখাল দিয়ে জমিতে গিয়ে পড়ে তাও দেখতে হবে। যে অঞ্চলে

জমি খুব উঁচু-নিচু সেখানে এ রকম ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সেখানে মাঝে মাঝে পাম্প বা অন্য প্রকারে জল তুলে নালায় প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা করতে হয়। এতে খরচা খুব বেশি পড়ে।

বড় বা মাঝারি সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্য-করী করতে পাঁচ থেকে দশ বছর লাগতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা না করে পরিকল্পনাটি পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ করা ও তদনুযায়ী ক্রমে ক্রমে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা অধিক ফলপ্রসূ।

তবে সর্বাপ্রাে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল ক্ষেত্রেই চাষীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এখানে সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হ'ল সেগদুলি নতুনও নয়, বা একমাত্র ভারতেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে এমন নয়। সেচ পরিকল্পনার জল পুরোপুরি ব্যবহার কোন দেশেই সম্ভব হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও অবস্থা অনুযায়ী জলব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগ—তাও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার ৬ থেকে ২১ বৎসর পর এটা সম্ভব হয়েছে। কলম্বিয়া অববাহিকা পরিকল্পনায় সেচকার্য আরম্ভ হবার ছয় বৎসর পরে জল-ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগ।

কালিফোর্নিয়ায় কেন্দ্রীয় উপত্যকা পরিকল্পনার দশ বৎসর পর মাত্র শতকরা ৬৭ ভাগ জল ব্যবহৃত হচ্ছে। ওরেগোন-ইডাহো পরিকল্পনায় ১২ বৎসর পর শতকরা ৯২ ভাগ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

এমনই আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নিউ মেক্সিকোর রিও গ্রান্ডে দীর্ঘ ২১ বৎসর ধরে অনেক

চেষ্টা করবার পর জল-ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৯৫ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে।

ভারতে প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে সেচ পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হবার ১০ বৎসর পর জল-ব্যবহারের পরিমাণ খুব কম ক্ষেত্রেই শতকরা ৫০ ভাগ উঠেছিল। প্রাওয়ালা নালা কাটা হয়েছিল ১৯২৬ সালে। তার লক্ষ্য ছিল ৫৭ হাজার একর জমিতে জলসেচ করা। কিন্তু ১০ বৎসরে তার অর্ধেক জমিতেও জল-সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি।

প্রায় এই একই সময়ে শর্দা খাল কাটা হয়। এতেও ১০ বৎসরে লক্ষ্যের মাত্র অর্ধেক জমিতে জল সরবরাহ করা গিয়েছিল। মেওর পরিকল্পনায় ২০ বৎসর পরে শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত জল ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। কেন' ও নীরা খালে অবশ্য আরও উৎসাহজনক ফল পাওয়া যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতের সাফল্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৫১-৫৭ সালে ভারতে যে পরিমাণ সেচ-ক্ষমতার সৃষ্টি করা হয়েছে তার শতকরা ৬৪ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে কোন কোন পরিকল্পনায় জল-ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয় নি।

প্রথম পরিকল্পনায় বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার দরদুন ব্যয় হয়েছিল ৩৪০ কোটি টাকা—অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকেরও কম। এর ফলে যেমন অনুমান করা গিয়েছিল তেমনভাবে সেচের ব্যবস্থা করা যায় নি।

এখনও অনেকগুলি বৃহৎ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি। এই অবস্থায় ভারত যে সেচ-ক্ষমতার তিন-পঞ্চমাংশ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে—এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়।

টুকটাক

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পশুচিকিৎসা অধিকার ১৯৫৯ সালের অগাস্ট মাসে রিন্ডারপেস্ট, হেমারেজিক স্টিপ্টসেমিয়া, রাণীক্ষেত রোগ প্রভৃতি নিবার্য ব্যাধির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক টিকাদান কার্য চালিয়েছেন। এই অভিযানে প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা হিসাবে রিন্ডারপেস্টের বিরুদ্ধে ১,২৫,২১৭টি পশুকে, হেমারেজিক স্টিপ্টসেমিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪৬টি পশুকে ও রাণীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে ৩০,৩৩১টি পক্ষীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে সাধারণ রোগের জন্য ২৮,০১৫টি পশু-পক্ষীর চিকিৎসা করা হয়, সেগুন্ডলির মধ্যে আধিকারিকদের সফরকালে ১৬,৬৬১টিকে ও রাজ্য পশু-হাসপাতালে ১১,৪৩৪টি পশুপক্ষীকে চিকিৎসা করা হয়।

এই মাসে গো-মহিষের ৭৮টি মড়কের ও হাঁস-মুরগির ২০টি মড়কের সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুন্ডলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনও করা হয়েছে। এই অভিযানে ৮,১৬২টি ক্ষেত্রে রিন্ডারপেস্টের, ৪,৩৬৮টি ক্ষেত্রে হেমারেজিক স্টিপ্টসেমিয়ার, ৩,০৮৭টি ক্ষেত্রে ব্র্যাক কোয়ারটারের ও ২,০৪৪টি ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসা করা হয়। পদ ও মৃগহবরের রোগের প্রাদুর্ভাব দমনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। রাণীক্ষেতের আক্রমণ থেকে ৪,৪৩৪টি পক্ষীকে রক্ষা করা হয়।

আদিবাসী এলাকায় নতুন সেচ পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আদিবাসী এলাকায় নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন—জলপাইগুড়ি চেকামারি ট্রাইব্যাল বাঁধ ও জামফই পরিকল্পনা, মালদহ-হাইতো জলাধার পরি-কল্পনা এবং পদুর্দালিয়া-মাঝি বাঁধের সংস্কার। এই-

গুন্ডলি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা চলতি আর্থিক বৎসরে কার্যকরী করবেন।

সমবায় সমিতি কর্তৃক বন্যাভ্রাণ ভান্ডার গঠিত

গত ১৬ই নবেম্বর (১৯৫৯) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের ভবনে একটি সভায় কলিকাতা ও চারিপাশের জেলাগুন্ডলির ৪০০টির অধিক সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণ সমবেত হন ও সিদ্ধান্ত করেন যে, অবিলম্বে 'পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি বন্যাভ্রাণ ভান্ডার' নামে একটি তহবিল গঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীচিন্ত-রঞ্জন রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯ হাজারের অধিক বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি আছে এবং আশা করা যায় যে, সেগুন্ডলি এক পরিবারের মত সম্মিলিত হয়ে রাজ্যের বন্যাক্রান্ত জনগণের দুঃখদর্শা দূর করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি শ্রীতারাপদ চৌধুরী, এম এল এ, রাজ্য পরিবহণ সমবায় ঋণদান সমিতির সম্পাদক শ্রীশ্যামল রায় ও অন্যান্য সমিতির বহু প্রতিনিধি অনুরূপ ভাষণ দান করেন। শ্রীচিন্ত-রঞ্জন রায়কে সভাপতি ও শ্রীতারাপদ চৌধুরীকে সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং একে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণের অধিকার প্রদত্ত হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ঐ সমিতি কর্তৃক অবিলম্বে এই ভান্ডারে দান করবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গের সকল সমবায় সমিতির নিকট একটি আবেদন প্রচার করা হবে।

ঐ কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকার নিযুক্ত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : ১২শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

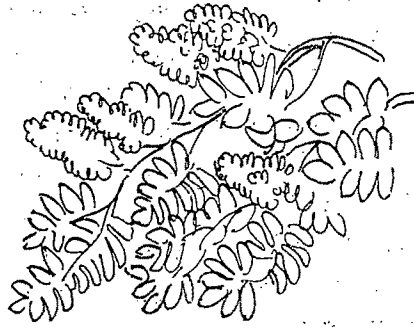
ঐ স্থলেই নিম্নলিখিত দানগুলির কথা ঘোষণা করা হয়, ঐ সকল দানের প্রথম কিস্তি তখনই প্রদত্ত হয়—

- (১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিঃ—
১,০০১ টাকা, (২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্ত
চালিত তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি
লিঃ—৫০১ টাকা, (৩) রাজ্য পরিবহন কর্মী
সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ—১০১ টাকা,
(৪) মাইকেল সমবায় উপনিবেশ সমিতি
লিঃ—১০১ টাকা, (৫) মেটালবক্স এন্ড
প্লায়জ সমবায় সমিতি লিঃ—১০১ টাকা,
(৬) রাইফেল ফ্যাক্টরী সমবায় সমিতি লিঃ
—১০১ টাকা, (৭) রাণাঘাট কেন্দ্রীয়

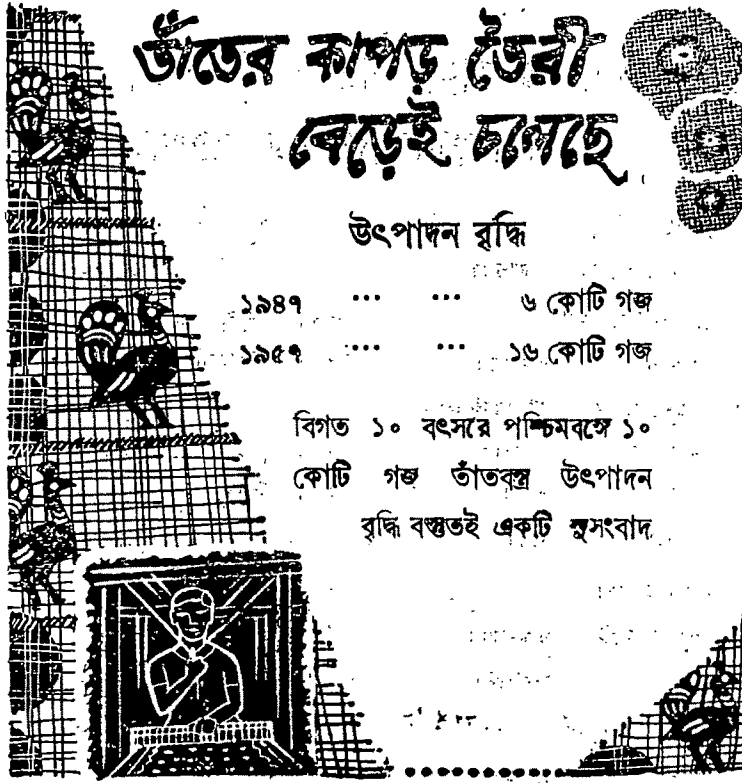
সমবায় ব্যাংক লিঃ—৫১ টাকা, (৮) নোয়া-
পাড়া গারুলিয়া কংগ্রেসকর্মী সর্বার্থসাধক
সমবায় সমিতি—২৫ টাকা।

সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, তিনি
ইতিপূর্বেই নিম্নলিখিত সমবায় তন্তুবায় সমিতি-
গুলির কাছ থেকে ধূতি, শাড়ি, গামছা প্রভৃতি দান-
স্বরূপে পেয়েছেনঃ

- (১) দেবীপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি, (২)
প্রতাপদীঘি তন্তুবায় সমবায় সমিতি, (৩)
অমর্ষি তন্তুবায় সমবায় সমিতি, (৪)
পশ্চিম কেদগুড়ি তন্তুবায় সমবায় সমিতি,
(৫) পূর্বকোলা তন্তুবায় সমবায় সমিতি।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মূদ্রণে অধীক্ষক
শ্রীশুভেন্দ্র মদখোপাধ্যায় কর্তৃক মঞ্জিত।



ডাঁডের কাপড় ডেরী বেড়েই চলেছে

উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭	...	...	৬ কোটি গজ
১৯৫৭		...	১৬ কোটি গজ

বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০
কোটি গজ তাঁতবস্ত্র উৎপাদন
বৃদ্ধি বস্তুতই একটি স্মরণীয়

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বাসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বাসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বাসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপনগনা			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রামপুরহাট	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	মাঝেরখাট	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুয়া (মেদিনীপুর)	কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড।
৭। রানাবাট	রানাবাট	রানাবাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮। খাটাল	চন্দ্রকোণা রোড	খাটাল।
৮। কালি	খাগড়াবাট	কালি।	২৯। তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)	তমলুক।
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁধি	কণ্টাই রোড	কাঁধি।
১০। লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। বালুরহাট	কালিয়গঞ্জ	বালুরহাট।
১৩। রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩। মালদহ	মালদহ কোর্ট	মালদহ।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	টোপাডাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪। জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫। আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬। দার্জিলিং	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭। কালিম্পাং	শিলিগুড়ি	কালিম্পাং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮। শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাচোয়া	কাচোয়া	কাচোয়া।	৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। মাথাভাঙ্গা	কোচবিহার	মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চবিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : পেন্ডাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : মাথাভাঙ্গা।

কালের কষ্টিপাথর

অনেক কাল আগের কথা। সম্ভবত

১৬৩৮ সাল যখন সিকোনা পাছের ছাল ওষুধ হিসাবে প্রথম ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রবাদও আছে এই নিয়ে। পেরুতে অবস্থিত স্পেনদেশীয় ভাইসরয়-এর জী কাউন্টেন্স অফ চিকন এই ওষুধ সেবনে অরম্ভ হয়েছিলেন।



সিকোনা পাছের ছাল পেরু থেকে ইউরোপে চালান আসতে

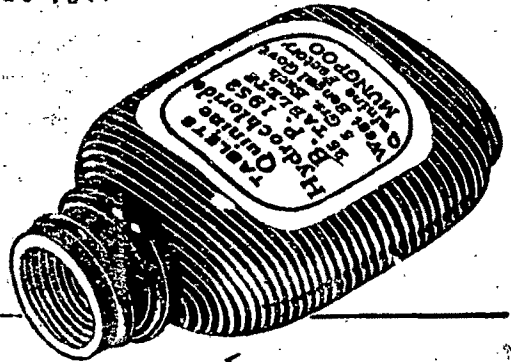
আরম্ভ করে ১৬৪৭ সালে হুইন তারও আগে।

সিকোনা থেকে হুইনি উপকারটিকে প্রথম বিক্রি করা হয় ১৮২০ সালে। ভারতবর্ষে সিকোনা চাষ ১৮৬১ সালে আরম্ভ হয় আর হুইনি ও অত্যন্ত সিকোনা উপকার প্রস্তুতের ইতিহাস তার পরবর্তী সময়ে।

আজকাল বাজারে ম্যালেরিয়ার নানাবিধ সাংস্লেষিক ওষুধ পাওয়া যায় কিন্তু এই ওষুধের প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্রম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে, সেগুলি সহজেই বাজার থেকে অস্তহিত হয়। কিন্তু হুইনি—তার কথা আলাদা—কয়েক শতাব্দী ধরে সব রকম ম্যালেরিয়ার তা হুপসীকিত প্রতিবেদক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন ধরনের ম্যালেরিয়ার হুইনি আজও অব্যর্থ।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের

কুইনি



খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ



পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহার সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,

৬১১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ্র	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগ্দা
	পোঃ নৈহাটা	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	ক্যান্টনমেন্ট।
১৪। ঐ ..	হাবড়া		
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সদেশখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নতুন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ ..	ডোমজুড়
৩।	ঐ ..	আমতা

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	হাওড়া
২।	ঐ ..	উলুবেড়িয়া
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪।	ঐ ..	বাগনান
৫।	ঐ ..	শ্যামপুর
৬।	ঐ ..	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	বেথুয়াডহরি	
৩।	ঐ ..	রানাঘাট	
৪।	ঐ ..	শান্তিপুর	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	রানাঘাট	
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনী	
৪।	ঐ ..	চাকুদা	
৫।	ঐ ..	হাঁসখালি	
৬।	ঐ ..	রানাঘাট	

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	হরিহরপাড়া	
৩।	ঐ ..	দমকল	
৪।	ঐ ..	রঘুনাথগঞ্জ	
৫।	ঐ ..	ভগবানগোলা	
৬।	ঐ ..	ধুলিয়ান	
৭।	ঐ ..	নবগ্রাম	

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	জিয়াগঞ্জ	
৩।	ঐ ..	জঙ্গীপুর	
৪।	ঐ ..	কান্দি	
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা	
৬।	ঐ ..	বারওয়ান, পোঃ পাঁচথুপী	
৭।	ঐ ..	কান্দি	
৮।	ঐ ..	ভরতপুর	

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশচন্দ্রপুর
৩। ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪। ঐ ..	রত্না, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫। ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩। ঐ ..	হেমতাবাদ
৪। ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ ..	খুম
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৭।	ঐ ..	নক্সানবাড়ি

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২। ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩। ঐ ..	কালিম্পঙ
৪। ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বংলি-বংলিয়াই, পোঃ তাকদা
৬। ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭। ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
৮। ঐ ..	কালিম্পঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ
৩।	ঐ ..	মাথাডাঙ্গা

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক,	কোচবিহার
২। ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪। ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	দোমহানি
২।	ঐ	বীরপাড়া
৩।	ঐ	কালচিনি
৪।	ঐ	আলিপুরদুয়ার

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	জলপাইগুড়ি
২।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়	জলপাইগুড়ি
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৩।	ঐ	ময়নাগুড়ি
৪।	ঐ	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, বর্ধমান

১।	স্বাক্ষর	গুস্করা
২।	ঐ	মেমারী
৩।	ঐ	সেহারাভাঙ্গার
৪।	ঐ	কালনা
৫।	ঐ	কাটোয়া
৬।	ঐ	নতুনহাট
৭।	ঐ	আসানসোল
৮।	ঐ	রানীগঞ্জ
৯।	ঐ	দুর্গাপুর

১।	স্বাক্ষর	বর্ধমান
২।	ঐ	কাটোয়া
৩।	ঐ	কালনা
৪।	ঐ	আসানসোল
৫।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়	ভাতার
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৬।	ঐ	মঙ্গলকোট
৭।	ঐ	শক্তিগড়
৮।	ঐ	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, বীরভূম

১।	স্বাক্ষর	গাইখিয়া
২।	ঐ	বোলপুর
৩।	ঐ	দুবরাজপুর
৪।	ঐ	রামপুরহাট
৫।	ঐ	নলহাটি

১।	স্বাক্ষর	সিউড়ি
২।	ঐ	রামপুরহাট
৩।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়	নলহাটি
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	ঐ	মহম্মদাবাঙ্গার
৫।	ঐ	আমেদপুর
৬।	ঐ	বোলপুর, শ্রীনিকেতন

হুগলি

জেলা পশ্চিমবঙ্গ আধিকারিক, হুগলি, চুচুড়া

১।	স্বাক্ষর	চুচুড়া
২।	ঐ	ত্রিবেণী
৩।	ঐ	শ্রীরামপুর
৪।	ঐ	ভারকেশ্বর

১।	স্বাক্ষর	চুচুড়া
২।	ঐ	শ্রীরামপুর
৩।	পশ্চিমবঙ্গ, জাতীয়	আরামবাগ
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	ঐ	খানাকুল
৫।	ঐ	পুরসুরা, পো: চাঁপাডাঙ্গা
৬।	ঐ	পোলুবা, পো: চুচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর:

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পো: মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পো: কাঁথি

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	খাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুয়া
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটাপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পো: লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পো: বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

ক্রমিক সংখ্যা	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

ক্রমিক সংখ্যা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৪০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.৩১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৪০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৮৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৪০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৪০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

যে ইঁদুর মোহা খেয়েছিল

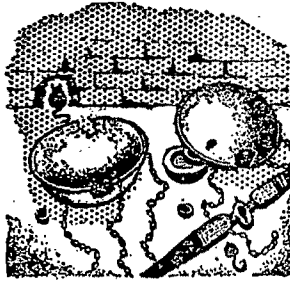
(পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প)

নাটুক বলে এক ব্যবসায়ী সব টাকা পয়সা খুঁয়ে বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল। যাওয়ার আগে সে তার বন্ধু লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল— “তাই লক্ষণ, আমার এই দাঁড়ী পাল্লাটা তোমার কাছে রেখে দাও যতদিন না আমি ফিরি। ওটা বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওটা আমাদের পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আছে।” তারপরে সে চলে গেল।

কিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাকা পয়সা রোজগার করে দেশে ফিরে এলো। সে লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল— “দাঁড়ীপাল্লাটা রেখে তুমি আমার খুব উপকার করেছ। এখন ওটা আমার দাও।”

“তোমার দাঁড়ীপাল্লাটা ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে।” লক্ষণ উত্তর দিল। “ইঁদুর কি করে অত ভারী দাঁড়ীপাল্লা খাবে?” নাটুক চটে মটে বলল— “ওটার ওজন ছিল ২৫০ সের।” “আমার বাড়ী বোঝাই ইঁদুর। ২৫০ সের ওদের কাছে আর এমন কি বেশি?”

নাটুক বুঝল সোজা। আঙুলে ঘি উঠবেনা। “ঠিক আছে”—সে একটু হেসে বলল— “তুমি আর কি করবে বল আমারই ভাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর থেকে স্নান করে আসি? তোমার ছেলেকে আমার জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাবে?” লক্ষণ বন্ধুর এই সাধারণ অল্পরোধটি এড়াতে পারলোনা।



নদীর থেকে ফেরার পথে নাটুক ছেলেকে একটা শুয়ায় পুরে এক বিরাট পাথর দিয়ে শুয়ার মুখটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর সে ফিরে এলো লক্ষণের বাড়ী। “আমার ছেলে কোথায়?” লক্ষণ জিজ্ঞাসা করল বেশ একটু অবাক হয়ে।

“এক বিরাট বাজ পাখী ছেঁ। মেরে ওকে নদীর পার থেকে নিয়ে গেল।” নাটুক বলল।

“মিথ্যাবাদী! একটা বাজপাখী কি করে ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যাবে?”

“কেন না? যদি ইঁদুরে ২৫০ সেরের দাঁড়ীপাল্লা খেতে পারে তাহলে একটা বাজপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষণ! ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দাঁড়ীপাল্লা ফিরিয়ে দাও।” বলাই বাহুল্য নাটুক তার দাঁড়ীপাল্লা ফিরে পেয়েছিল।

নীতি: খাঁর দিকে সত্য আছে তিনি সব সময় মিথ্যাকে দমন করতে পারেন। বনস্পতির কথা ধরুন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা পরিকার-ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি একটি পুষ্টির খাদ্য। পরীক্ষা করে এ সত্য যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ ভেলে থেকে। ‘ডালডা’ একটি সর্ব

উপযোগী রান্নার মাধ্যম। ‘ডালডা’ কম খরচায় আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’। ‘ডালডা’র প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। সব জায়গায় গৃহিনীরা একবারেই স্বীকার করেন—‘ডালডা’ শুধু রান্নার মাধ্যমই নয় একটি খাদ্যও বটে।

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	৩২১
বিশ্ব কৃষিমেলার উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি	৩২৫
পাণ্ডিত বাঁধের উদ্বোধন	৩২৮
হস্তশিল্প পর্ষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা	৩৩১
মালদহের আশ্র-উন্নয়ন	৩৩৩
ডিম-পোনা সংগ্রহে উড়িষ্যার সহযোগিতা	৩৩৬
পশ্চিম বাঙলার গোরু ও কৃষক	৩৩৮
সমবায় চাষ	৩৪১
আলুচাষের জারিগান	৩৪৫
সয়াবিনের বিবিধ ব্যবহার	৩৪৯
সার দিলে গমের চাষে লাভ হয় ভাঙ্গ	৩৫২
গো-বৎসের যত্ন	৩৫৩
কেলেঘাই পরিকল্পনার অগ্রগতি	৩৫৫
জমির ক্ষয় বন্ধ করণ	৩৫৬
সমবায়ের প্রশংসনীয় অগ্রগতি	৩৫৮
টুকিটাকি	৩৬০

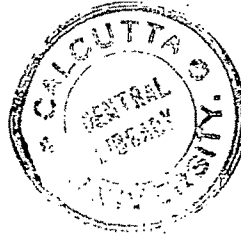
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিষাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।



বহুব্রহ্ম

১২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা : পৌষ ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

স্বাধীন ভারতে আজকাল প্রায়ই নানা রকম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কোথাও কৃষি-প্রদর্শনী, কোথাও শিল্প-প্রদর্শনী, কোথাও বা কৃষি-শিল্পের প্রদর্শনী, কোথাও হচ্ছে পালিত পশু-পক্ষীর প্রদর্শনী, কোথাও ফলের বা ফুলের প্রদর্শনী, কোথাও বা প্রদর্শনী দেশের উন্নয়নের সকল শাখার। এসব প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কী? বহু অর্থ ব্যয় করে কোন কোন গণপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকার যে মাঝে-মাঝেই বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বা প্রাণীর মেলা বসচ্ছেন, এসব কি শুদ্ধ লোকের মনোরঞ্জন জন্ম?

মনেরও আগে নয়নের রঞ্জন জন্ম। চোখে ভাল লাগলে মনে ভাল লাগে। তারপর? তারপর মনে জাগে কৌতূহল—যা দেখে ভাল লাগল, মনে ভাল লাগল, তার সম্বন্ধে ভাল করে জানার আকাঙ্ক্ষা। এই বাসনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, উদ্দীপিত করে তোলার জন্যই প্রদর্শনীর আয়োজন। তার নয়নমনোহর সজ্জাটা লোককে আকর্ষণ করার জন্য। কোন অঞ্চলে লোকচক্ষুর সমক্ষে যে মাঠটা পতিত পড়ে ছিল, হঠাৎ দেখা গেল, বাঁশ কাঠ টিন দরমা চট শালু প্রভৃতি দিয়ে সেখানটাকে সাজানোর ঘটা লেগে গেছে। চালা উঠছে, সারি সারি অস্থায়ী ঘর হচ্ছে। পথের লোক থমকে দাঁড়াল। কী ব্যাপার? চারিদিকে অর্ধদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই সংবাদ। অমূলক মাঠে কী কান্ড হচ্ছে! ব্যাপার কী?

দেখতে দেখতে মাঠটা এমন সুসজ্জিত হয়ে উঠল যে, দেখে মনে করা যায় না—ওখানে ক’দিন আগেও

ছিল একটা বিশ্রী নগ্ন পতিত জমি। নানা রঙে রূপে তার বিচিত্র শোভা, হাসিতে বাঁশিতে বাদ্যে সরগরম, রাতের বেলা কত রঙের আলোর মালায় ঝলমল। মেলা বসেছে। লোক আসে দলে দলে—আশিশু-বৃদ্ধ নরনারী—কাছ থেকে, দূর থেকে, সদূর থেকে। দিনের পর দিন—কয়েক দিন ধরে চলে মেলা। প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড় লেগে যায়। দিনে দিনে অসংখ্য অগণিত মানুষ আসে মেলা দেখতে। বাইরের সজ্জা তাদের ভেতরে টানে। ভেতরে সারি সারি দোকান—তাতে কত রকমের জিনিস—জানা-চেনা জিনিস, তার সঙ্গে আবার অজানা-অচেনা জিনিস! কোন ঘরে জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, আবার কোন কোন ঘরে নানা জিনিস রয়েছে শুদ্ধ লোকের দেখবার জন্য।

কৃষিজাত নানা জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তারই এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল গাঁয়ের মানুষ—কৃষিকাজে যাদের আজন্ম কাটছে। কী? না, একটা ধানের গোছা বুলিয়ে রাখা হয়েছে। কী মোটা গোছা হয়েছে, দেখেছ? আর দেখেছ, একটা গোছায় কত ধান ফলেছে? দেখে তাক লেগে যায়। তারপরে মনে জাগে জিজ্ঞাসাঃ কী করে অত মোটা গোছা হ’ল? অত ধান কী করে ফলানো গেল এক-একটা শীষে? এক গোছাতে অত ধান যদি ফলে, তা হলে বিধেভুষে মোট ফলে কত ধান? আহা, আমার জমিতে কি এমন ধান ফলানো যায় না? কী করে ফলানো যায়? কী উপায়ে?

আর-এক ঘরে। ওটা কী? লাঙল? তলাটা সবই যে লোহার তৈরি! কী নতুন কায়দার ফলা, দেখেছ? আমাদের লাঙলের চেয়ে এ-লাঙল যে মাটি অনেক গভীর করে খোঁড়ে মনে হয়। ফলার পেছন-দিকটা, দেখ, এমন বাকানো যে, মাটি শুধু খোঁড়ে না—উল্টেও দেয়। এ লাঙল কি বলদ দিয়ে টানা চলে? কত দাম একটার? আমাদের সেকলে লাঙলের জায়গায় এ রকম হাল কায়দার লাঙল রাখতে পারলে তো বেশ হয়!

দেখ—দেখ—কতবড় গাই, দেখ! কী স্বাস্থ্য! চক্চক করছে গা। মাছি বসলে পিছলে যাবে! ক'সের দুধ দেয় রোজ? বারো-তেরো সের! ও স্বাবা! আমাদের লালী গাইটা দুধ দেয় সকালে একপো আর বিকেলে আধপো! আচ্ছা, এই যে চমৎকার গোরুটা, এটা কী জাতের? এ গোরু পুষতে কি মেলাই খরচ লাগে? কত লাগে? দু'গুণ? তিনগুণ? কিন্তু দুধ তো দেয় কম-সে-কম তিরিশগুণ! এ গোরুর বিষয়টা তো জানতে হয়।

বাবা! অতবড় ডিম কি হাঁসের? মুরগির!! বলে কী! অতবড় যার ডিম, সেই মুরগি কতবড়? ওই মুরগি? ওরে স্বাবা! কী বিরাট! রাম-মুরগি নাকি হে? এ মুরগি চড়ে যে বেড়ানোও চলে হে! কত দাম পড়ে একটার? পাওয়া যায় কোথায়? আচ্ছা, এ-মুরগির ডিম কিনে নিলে, বাড়িতে আমাদের মুরগি বসিয়ে বাচ্চা ফোটানো যায় না?... আরে, দেখ—দেখ, হাঁসটা কী লম্বা, দেখ.....

এখানে কী? তাঁত চলছে যে। কাপড় বোনা হচ্ছে। ওমা, রেশমী কাপড় যে—সিল্কের কাপড় গো! দেখ—দেখ। রেশমী সূতো বুনিয়ে এগুনো? চরকায় কাটা হয় না? তর্কালিতেও নয়? মেশিনেও নয়? তবে কিসে? কী পোকা? গুটিপোকা? আরেঃ, সত্যি সত্যি পোকা যে! পাতা খাচ্ছে দেখ, কেমন কুটকুট করে! কী পাতা? তুঁতপাতা? তুঁতগাছ? অ!

আরে, এখানে পাটি বোনা হচ্ছে। শীতলপাটি। কী দিয়ে বোনে?

এমনি ক'রে মেলার ঘরে ঘরে, বিভাগে বিভাগে, শাখায় শাখায় লোকে নানা জিনিস দেখে, জানা জিনিসের সঙ্গে কত অজানা জিনিস। জানার মধ্য দিয়েও পায় কত অজানার সন্ধান। দেখে চমৎকৃত হয়। তার পরেই তাদের মনে জাগে জিজ্ঞাসাঃ কী ক'রে হয়? তার পরের জিজ্ঞাসা—আমরা নিজেরা কি এমনটা করতে পারি না? তাদের প্রশ্নের জবাব দেবার, কৌতূহল মেটাবার, কী ক'রে হয়, সেটা তাদের জানিয়ে দেবার লোকও জিনিস-গুলোর কাছে-কাছেই থাকেন। নবলব্ধ জ্ঞানকে হাতে-হাতিয়ারে সফল করে তুলতে যখন লোকের মনে উৎসাহ জাগে, তখন তাকে সাহায্য করার ব্যবস্থাও হয়। সেইখানেই প্রদর্শনীর সার্থকতা।

প্রদর্শনী যে শুধু আজকের ব্যাপার তা নয়। দেশে এর অনুষ্ঠান চলে আসছে বহুকাল ধরেই। তার নাম মেলা। দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ বিশেষ নামে একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বছর মেলা বসে আসছে বহুকাল ধরে। যেমন, নবাবগঞ্জের রাসের মেলা, তারাপুকুরের পীরের মেলা, ইত্যাদি। রাসের মেলা বসছে প্রতি বছর রাস-উৎসব উপলক্ষে। ওই পীরের মেলাটা বসে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলে এক-একটা মেলা। বহু বিচিত্র বিশিষ্ট জিনিস আসে, অজস্র লোকের সমাগম হয়। কিন্তু সেসব মেলা আর আজকের দিনের এসব প্রদর্শনীর মধ্যে তফাত আছে। মেলার আসল উদ্দেশ্য জিনিস বিক্রি করা, আর প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উন্নয়ন-মূলক বিভিন্ন বিষয়ে লোককে ওয়াকিফহাল করা, শিক্ষা দেওয়া, উৎসাহী ক'রে তোলা। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষি আর শিল্প।

কোনও দেশের আর্থনীতিক উন্নতি নির্ভর করে প্রধানত তার কৃষি আর শিল্পের উপর। কোন দেশ কৃষিতে যদি অত্যন্ত উন্নত হয় আর শিল্প হয়

অবনত, তা হলে তার কৃষি থেকে যে অর্থাগম হয় তার বিরাট একটা অংশ বাইরে চ'লে যায় শিল্পদ্রব্য সংগ্রহে। তেমনি, কোন দেশ শিল্পে যদি এগিয়ে যায় আর কৃষিতে থাকে পেছিয়ে, তবে তার শিল্পজ অর্থ বাইরে চ'লে যায় কৃষিজ দ্রব্যের আহরণে। কৃষিতে আর শিল্পে যে-দেশ সমান উন্নত, তার আর্থ-নীতিক উন্নতি সুসমঞ্জস, সে-দেশ স্বয়ংপূর্ণ। কৃষি আর শিল্প আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বহু শিল্পকে কাঁচামাল প্রভৃতির জন্য নির্ভর করতে হয় কৃষির উপর, আবার কৃষিকে তার কাজের উপাদান, রাসায়নিক সার প্রভৃতির জন্য হতে হয় শিল্পের মদ্যুপেক্ষী। দুগ্ধশিল্প, ডিম্বোৎপাদন, পশুপালন, রেশম ও পশম উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পকে তো কৃষির মধ্যেই ধরা হয়। পাটশিল্প ছাড়িয়ে আছে কৃষির মাঠ থেকে চট তৈরির কারখানা অবধি। মাঠের ধান থেকে চা'ল তৈরি হয় চের্ক-শিল্পে অথবা চা'লকলে।

পরাদীনতার স্দুদীর্ঘ অমরাত্বের অবসানে স্বাধীনতার অরুণালোকে চোখ মেলে ভারত দেখল, বিদেশীর শাসন তাকে কৃষি আর শিল্প দু'দিক দিয়েই এক রকম নিঃস্ব ক'রে গেছে। দেশ জুড়ে খাদ্যাভাব আর অর্থভাবে দুই করাল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি হাতধরাধারি ক'রে। দেশে কৃষি আর কৃষক স্দুদীর্ঘকাল উপেক্ষিত থাকায় বহু চাষী কৃষি ছেড়ে, পল্লী ছেড়ে, শহর-অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার ভিড় আর দারিদ্র ব্যাড়ায়েছে। যারা নিরুপায় হয়ে কৃষিকাজ আঁকড়ে পল্লীতে প'ড়ে আছে, তারাও পেছিয়ে প'ড়ে আছে। কৃষিপন্থিতর মান্ধাতার আমলে। তাদের ফসলের উৎপাদন শোচনীয় রকমের স্বল্প। অপরিদিকে বহু পল্লী-শিল্প নেমে এসেছে অবলুপ্তর পথে অথবা গেছে বিলুপ্ত হয়ে, অনেক বিশিষ্ট কুটিরশিল্প তো শূন্য স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার কালবিলম্ব না ক'রে দেশের আর্থ-নীতিক উন্নতির জন্য আর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণ ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের শিল্পের আর কৃষির

উন্নয়নে নেমে পড়লেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের নায়কেরা দেশের কোন কোন উন্নয়নকর্মের সূচনা ক'রে ফেলেছেন স্বাধীনতা-লাভের আগেই।

আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশি জোর দেওয়া হল কৃষির উপর। কেননা, আগে চাই খাদ্য। সেই পাঁচ বছরে কৃষিতে দেশ যতখানি এগিয়ে এল তা আশাতীত। এক-এক সময় তো মনে হয়েছে যে, স্বয়ংপূর্ণতা স্দুদূরে নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশি জোর দেওয়া হল শিল্পের উন্নয়নে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে আবার জোর দেওয়া হবে কৃষির উপর। তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কৃষি আর শিল্পের উন্নয়নে নানাভাবে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন সরকার। সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে জনগণের সহযোগিতায় আমাদের কৃষি এখন সেকাল ছাড়িয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে উত্তরণ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজের বিষয়ে সচেতন এবং আগ্রহী হয়ে উঠেছেন আমাদের চাষীরা। ওদিকে আমাদের গ্রামীণ শিল্পগুণ্ডলির চলছে পুনরুজ্জীবন, বৃহৎ বৃহৎ শিল্পেরও হচ্ছে প্রতিষ্ঠা।

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে দেশবাসী জনগণকে সচেতন ও উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য যতভাবে চেষ্টা চলছে, তারই বিশেষ একটি হল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান। বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সরকার থেকেই করা হচ্ছে, বেসরকারী প্রদর্শনীগুলিতেও সরকার বিশেষ অংশ গ্রহণ করছেন। প্রদর্শনীর বিভিন্ন শাখার ঘরে বিশেষ বিশেষ আদর্শ দ্রব্য দর্শকদের দৃষ্টি এবং চিন্তা আকৃষ্ট করে, মনে জিজ্ঞাসা জাগায়। তাদের প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে তাদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করার জন্য প্রদর্শনীর প্রতি শাখায় থাকেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ আদর্শ দ্রব্যও অনেক প্রদর্শনীতে স্থান পায়। সেসব জিনিসও অনেক দর্শকের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে। প্রদর্শনীগুলিতে যে সভাস্থল থাকে, সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেন বা তথ্য জ্ঞাপন করেন—তা

থেকেও লোকে জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পায়। সুতরাং দেশের উন্নয়নে প্রদর্শনীর উপযোগিতা কত বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীগুলি হয় সাধারণত ছোট আকারের, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত উৎপাদনের বহু জিনিস স্থান পায় বলে, স্থানীয় অধিবাসীরা সেসব থেকে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পায়। জেলাকে ভিত্তি করে যে প্রদর্শনী হয়, তা সাধারণত আরও বড় আকারের হয়। সেখানে কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান আহরণ করার সঙ্গে সঙ্গে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক পরস্পর জ্ঞান-বিনিময়ের সুযোগ পায়। এইভাবে রাজ্য-ভিত্তিক প্রদর্শনী হয় আরও বড় এবং দেশভিত্তিক প্রদর্শনী হয় বিরাট আকারের। রাজ্যভিত্তিক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেলার লোকের মধ্যে জ্ঞান-বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। দেশভিত্তিক প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিত্ব করে সকল রাজ্য। দেশ-বাসীর জ্ঞান-বিনিময়ের সুযোগ সেখানে আরও বেশি। ধান-উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ এবং গম-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ সেখানে অধিকতর জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়। সেখানে মর্শিদাবাদের আর কাশীর রেশমশিল্পীর জ্ঞানের ও রুচির ঘটে বিনিময়।

প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আজ প্রগতিশীল পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত। তাই সারা পৃথিবীর ভিত্তিতেও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হতে শুরু করেছে। এমন এক বিশ্ব-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে এ বছর আমাদের ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে। বিশেষ করে কৃষি-উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই এর অনুষ্ঠান। তাই বাঙলায় এর নাম হয়েছে 'বিশ্ব-কৃষিমেলা'। মিলন-ভাবাটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই প্রদর্শনীকে বলা হচ্ছে 'মেলা'। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পৃথক-পৃথকভাবে প্রদর্শনী খোলা হয়েছে, সেই সঙ্গে ভারতের রাজ্যগুলিও প্রদর্শনী খুলেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকার থেকে এখানে যে প্রদর্শনীটি খোলা হয়েছে, সম্ভ্রাম

এবং বিন্যাসে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে বলে সমাগত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

সব মিলিয়ে বিশাল এর আয়তন, বিচিত্র এর দৃশ্য, অবর্ণনীয় এর মহিমাম্বিত সামগ্রিক রূপ। এগারোই ডিসেম্বর এই মেলার উদ্‌ঘাটন করেছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি। সেই সময় আমাদের সম্মানিত অতিথি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শ্রী আইসেনহাওয়ার এসেছেন নয়াদিল্লীতে, তিনি বিশ্ব-কৃষিমেলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদর্শনী 'আমেরিকান মেলা'র উদ্‌ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ রাশিয়াও প্রদর্শনী খুলেছে এখানে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানে কত উন্নতি করেছে তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বদ্বতে পারা যায়, কেন তারা নিজেদের জন্য প্রচুর খাদ্য রেখেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য-সাহায্য পাঠাতে পারে। বদ্বতে পারা যায়, তাদের তুলনায় কৃষিতে ও খাদ্যোৎপাদনে আমরা কত নিচে পড়ে আছি, ভাববার সুযোগ পাওয়া যায় যে আরও কত উপরে ওঠার সাধনা আমাদের করতে হবে।

বিশ্বমেলা সেখানে অনুষ্ঠিত হয়, শুধু সেই অঞ্চলের লোকেই ব্যক্তিগতভাবে তা থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়। সেদিক থেকে এ বছর আমাদের দিল্লি-অঞ্চলের ভাইবোনদের সৌভাগ্য অপারিসমীম। প্রতি রাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিরা বিশ্বমেলা থেকে জ্ঞান আহরণ করে এনে ছাড়িয়ে দেবেন সকল রাজ্যের সকলস্থানে। সেই জ্ঞান আমাদের অচিরে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই আমাদের আশা।

কৃষি-বিজ্ঞানে যতই পিছিয়ে থাকি, আমাদের সুপ্রাচীন দেশের কৃষিধারার মধ্যেও হয়তো বিদেশী ভাইবোনেরা কোনও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেতে পারেন। সেটা তিলপরিমাণ হলেও তাঁরা যদি সাদরে তা আহরণ করে নিয়ে যান, তাতেই আমাদের কৃতার্থতা।

বিশ্ব কৃষিমেলা উদ্বোধন

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

এগারোই ডিসেম্বর (১৯৫৯) নয়াদিল্লীতে বিশ্ব কৃষিমেলায় উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর ভাষণে বলেনঃ

ভারতের কৃষক-সমাজ যাতে বিশ্বের কৃষি-উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে কৃষির অবস্থা জানবার এবং ভারতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান, কুটিরশিল্প এবং পল্লী-উন্নয়ন ও সমষ্টি-উন্নয়নে কতদূর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার তুলনামূলক বিচারের সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ব কৃষিমেলায় আয়োজন করা হয়েছে। এইজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষ বোধ করছি। ভারতের এক কৃষক-প্রতিষ্ঠান—ভারত কৃষক-সমাজ—এই মেলায় আয়োজন করেছে বলে এটা যথোপযুক্ত কাজ হয়েছে। মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হ'লেও দেশের প্রায় সকল রাজ্যই সমাজ-শাখা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে। মেলায় আয়োজনকারীরা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন রাজ্য এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আরও কৃতিত্বের কথা এই যে, তাঁরা বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশ ও সরকারের সমর্থন লাভ করেছেন। বিভিন্ন দেশ কৃষি-উৎপাদন ও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে কতদূর সাফল্য লাভ করেছে এই মেলায় বিভিন্ন প্যাভিলিয়নে তার নিদর্শন রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লাভ করে আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। বিশ্বের মধ্যে আমেরিকা কৃষিকার্য সহ উৎপাদনের বহু দিকে নেতৃত্ব করেছে। ভারতে এরূপ মেলায় আয়োজন যথোপযুক্ত হয়েছে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প এবং কুটিরশিল্প ব্যাপকভাবে এবং আমাদের

সাধ্যমত যত দ্রুত সম্ভব স্থাপনের চেষ্টা করছি। আমাদের অগ্রগতি লক্ষণীয় হবে বলে আশা করি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারত এখন কৃষিপ্রধান দেশ এবং ভবিষ্যতেও বহুকাল কৃষিপ্রধান দেশই থাকবে। কৃষিকার্যে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত রয়েছে—অন্যান্য যে-কোন শিল্প এমনিট সকল শিল্পের তুলনায় কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি। কৃষিকার্য থেকেই মানুষের অপরিহার্য খাদ্যদ্রব্য আসে এবং অনেক কাঁচামাল পাওয়া যায়, যার দ্বারা মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেইজন্যই প্রাচীনকালে ভারতে কৃষিকার্যকেই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলে গণ্য করা হ'ত এবং আমার বিশ্বাস সেই সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এই দেশের কৃষিকার্যের সমস্যা অনেক এবং সেগুলি জটিল। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হ'লেও বর্তমানে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারছি না। ঘাটতি-পূরণের জন্য আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কৃষির উপর নির্ভর করতে হবে।

শুধুমাত্র ভারতীয় কৃষক হিসাবে নয়, সমগ্র দেশের পক্ষেই আজ এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছে যে, ক্রম-বর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা দরকার। যে জমি ছাড়া চাষ চলে না, তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এমন কি, ভারতের সমস্ত অনাবাদী জমিও যদি আজ আবাদী করা হয় তা হ'লেও আবাদী জমির পরিমাণ খুব বেশি হবে না। তা ছাড়া, আবাদী জমির বৃদ্ধির আর একটি অসুবিধা রয়েছে। আমরা সকলেই জানতে পেরেছি যে, আবাদী জমি ও বনভূমির মধ্যে হার এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যখন বনভূমি কেটে জমি আবাদযোগ্য করা আর সমীচীন হবে না। ভারতের

বিস্তার জমি বৃষ্টিপাত ও সেচের অভাবে শুষ্ক হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া, আবাদী জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং এই জমিগুলিও আবার ভাগ হয়ে রয়েছে। অতীতে আমাদের দেশের লোক পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্যান্য দুর্গম স্থানে নানাভাবে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে আজ আবাদী জমির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হ'লেও তা উল্লেখযোগ্য হবে না। কৃষির বিস্তারের সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত পাল্লা দিয়ে চলা সম্ভব হবে না। এখনই ভারতে চল্লিশ কোটি নরনারীর বসবাস এবং বন ও পার্বত্যভূমি সহ সমগ্র ভারতে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা লাড়িয়েছে তিনশ'। বড় বড় শহর-নগরীর কথা ছেতে দিলেও দেখা যাবে যে, বহু পল্লী-অঞ্চলেই লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে বারশ'। এইসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রতি বৎসর আমাদের লোকসংখ্যা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ হারে বেড়ে চলেছে।

তাই স্বভাবতই খাদ্যসমস্যা আজ আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। একদিকে আমাদের একরপ্ৰতি খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম—সম্ভবত বহু দেশ অপেক্ষাই কম। প্রাচীনকালে আমাদের কৃষকগণ প্রগতিশীল ছিলেন এবং কৃষিকার্যে তাঁরা যথেষ্ট উন্নতি করে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের শস্যের কখন কী বপন করতে হয়, কীভাবে সেচ ও সার দিতে হয় সেসব জানতেন এবং একই জমিতে একাদিক্রমে শস্য উৎপাদনের পদ্ধতিও তাঁরা ভালভাবেই জানতেন। কৃষির যন্ত্রপাতি তাঁরা গ্রামেই উৎপাদন করে নিতেন। তাঁরা কদুপ ও পুষ্করিণী খনন করে ক্ষুদ্র সেচের এবং জলাশয় সৃষ্টি করে বৃহৎ সেচের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু বর্তমানকালে কৃষকগণ পিছিয়ে গিয়েছেন। তবে সুখের কথা এই যে, বিভিন্ন দেশের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং কৃষি-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার

মাধ্যমে কৃষিকার্যের আধুনিক ব্যবস্থাদি চালু করা হচ্ছে। এসকল দিকে আমাদের কৃষকগণ যাতে সর্বাধিক ফললাভ করতে পারেন সেজন্য চেষ্টা চলছে।

আমাদের কৃষির সংগঠন ও উন্নয়নের মধ্যেই অভাব ও দুঃখদুর্দশাহীন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে। আমি এইদিক বিচার করেই এই কৃষিমেলার উদ্দেশ্যকে সমর্থন করি। এইখানেই আমাদের কৃষকেরা স্বচক্ষে বহু নিকট ও দূর দেশের এবং নিজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিকার্যের উন্নতি দেখবার সুযোগ পাবেন। চাষ-আবাদের উন্নত পদ্ধতি, উন্নত সাজসরঞ্জাম এবং উৎকৃষ্ট বীজ ও সার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও হাতেকলমে দেখবার সুযোগ পাবেন। কীট-পতঙ্গ ফসলের কী ক্ষতি করে এবং তা কী উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাও তাঁরা জানতে পারবেন। কৃষিদ্রব্যের যে অংশ এখন ফেলে দেওয়া হয় তা ব্যবহারের কৌশল তাঁরা জানতে পারবেন। কৃষির পরিত্যক্ত দ্রব্য ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, একথা আমি বারবার বলছি। এতে শুধু যে অপচয় হয় তা নয়, এতে আবাসস্থল অপরিষ্কার হয় ও নানা প্রকার রোগের উৎপত্তিস্থল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইগুলি থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব যা স্বর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান।

আমাদের কৃষকদের প্রাচীন অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। তা মূল্যবান হ'লেও আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদামত পরিবর্তন করে কৃষির উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, অন্যান্য দেশে যা করা হচ্ছে তা দেখে আমাদের দেশবাসী অনেক কিছু শিখবেন এবং উপকৃত হবেন। আমি এও জানি যে, আমাদের বিজ্ঞানীরা, বিশেষত কৃষিবিজ্ঞানীরা, আমাদের সমস্যা কী তা জানতে পারবেন এবং তার সমাধানে আশ্বিনীয়েগের উৎসাহ লাভ করবেন। অন্যান্য দেশের

নিকট আমরা যেমন শিক্ষালাভ করব তেমনি আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন দেশের যেসকল প্রতিনিধি এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁরাও আমরা কী করছি তা সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখবেন এবং সেই জ্ঞান বিশ্বের কৃষি-উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি নিজেকে কৃষি-

কার্যে যথেষ্ট উৎসাহী বলে শুনছি। তিনি স্বয়ং আমেরিকান প্যাঁভিলিয়নের উদ্বোধন করবেন। আমি আশা করি তিনি আমাদের প্রচেষ্টা কিছুটা দেখবার সুযোগ পাবেন। এইসঙ্গে আমি একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। আমি নিজেকে কৃষক-সমাজের লোক বলে মনে করি এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারও এই সমাজের লোক।



পাণ্ডিত বাঁধের উদ্ভাধন

দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তম ও চতুর্থ বাঁধ হচ্ছে পাণ্ডিত বাঁধ। ১৯এ অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৯) রবিবার এই বাঁধের উদ্ভাধন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হ'ল, বুদ্ধানী মেবেন নামে একজন নারী-শ্রমিক বোতাম টিপে বাঁধটির উদ্ভাধন করেন। আরম্ভকাল থেকেই এই বাঁধের নির্মাণ-কার্যে নিয়োজিত ছিলেন বুদ্ধানী। বাঁধটির নির্মাণকালে যে প্রায় ২০ জন কর্মী মারা গিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে এখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছে। তার আবরণ উন্মোচন করেন রাবণ মাঝি নামে একজন শ্রমিক।

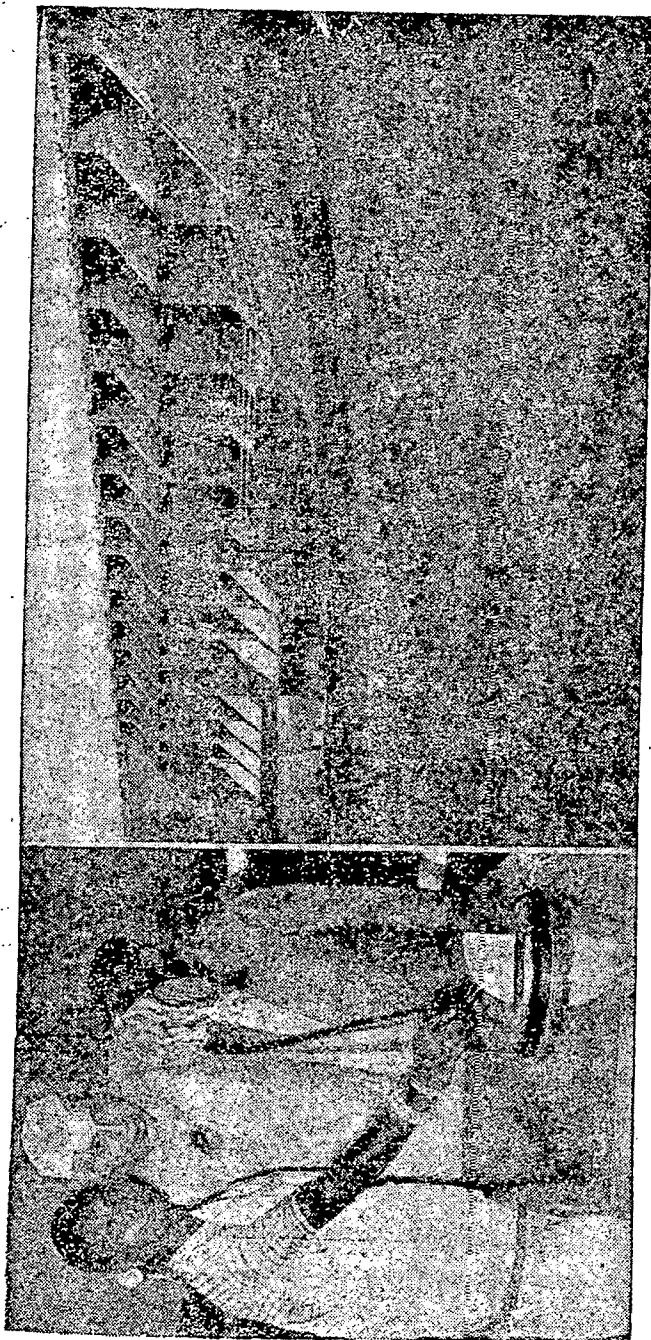
এই বাঁধের উদ্ভাধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর। তিনি যথাসময়ে যথাস্থানে এসে উপস্থিতও হয়েছেন। তারপর তিনিই খোঁজখবর নিয়ে উদ্ভাধনকার্যের জন্য নির্বাচন করেছেন শ্রীমতী বুদ্ধানী মেবেনকে এবং স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচনের জন্য শ্রীরাবণ মাঝিকে। অনুষ্ঠানকালে বুদ্ধানী জনসভায় এত লোকের সামনে এসে দাঁড়াতে স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মমতাভরে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন এবং বুদ্ধানীর জড়তা কেটে যাবার সুযোগ দেবার জন্য কিছু সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে নিজেই মাইক্রোফোনটি ঠিক রাখার কাজে ব্যস্ত হন। ইতিমধ্যে বুদ্ধানীর সংকোচ কিছুটা কেটে গেলে তিনি সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্য করে আপন সাঁওতালী ভাষায় মিনিট দুই ধরে কিছু বলেন এবং দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বাঁধটি উৎসর্গ করেন। তারপরে বুদ্ধানী নির্দিষ্ট বোতামটি টিপে দেন। এইভাবে ভারতের অগণিত দরিদ্র মানবের একজনের কল্যাণস্পর্শে বিরাট পাণ্ডিত বাঁধের খাত বয়ে বিপুল বেগে জলরাশির প্রথম প্রবাহ শূন্য হয়।

এই অনুষ্ঠান-সভায় পাণ্ডিত বাঁধের কর্মীরা এবং বহু সাঁওতাল নরনারী সহ স্থানীয় অগণিত অধি-

বাসীর সমাবেশ হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে, একজন নারী-কর্মী যে এই বাঁধ উৎসর্গ করেছেন, এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে, এটাই ঠিক হয়েছে। এরকম অনুষ্ঠানে পৌরো-হিত্য করার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মন্ত্রী অথবা সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে ডাকা হয়—এটা ভাল নয়। যাঁরা নিজেরা কাজ করেছেন, তাঁদেরই অধিকার বোতাম টিপে উদ্ভাধন করার অথবা ভিত্তিপত্রের স্থাপনের। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, ভবিষ্যতে কোন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বা মন্ত্রীর দ্বারা এ ধরনের কাজ করানো হবে না। এরকম একটি কল্যাণকর্মের উদ্ভাধন যে একজন নারী-কর্মীর দ্বারা হচ্ছে এতে তিনি আরও বেশি আনন্দিত।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি যে বন্যা হয়েছে এবং দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে সমালোচনা হয়েছে, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও বন্যা দমন করা যায় নি বলে সমালোচকরা যে দৃংখ জানাচ্ছেন সেটা কতকাংশে সংগতই; কিন্তু তিনি এ-ও মনে করেন যে, বন্যার জন্য অথবা বন্যা দমন করতে না পারার জন্য দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের উপর দোষারোপ করাও ঠিক নয়। যে বন্যা হয়ে গেল তার প্রচণ্ডতা অত্যধিক। ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন এবং শীঘ্রই তার বিবরণী পাওয়া যাবে বলে তাঁর আশা। এই বিবরণীর উপর ভিত্তি করেই স্থির করা হবে যে, অতঃপর কী করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর কোন দোষারোপ করা ঠিক নয়—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। যেসব সাহসী লোক বিরাট দায়িত্ব নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তাঁরা এ রকম দোষারোপে হতোদ্যম হয়ে পড়বেন। দায়িত্ব নিতে হবে সব সময়েই, কেননা দায়িত্ব না



প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু পাণ্ডিত্য বাঁধের উদ্বোধনের আগে শ্রীমতী বৃন্দা মেহেনকা বিষ্ণুটা বৃষ্টিয়ে বলছেন

নিলে কোন দেশেই কোন বড় কাজ হতে পারে না। নতুন ভারত গড়ে তোলা সহজসাধ্য কাজ নয়—বিরাত কাজ এবং তার জন্য ঋদ্ধি নিতে হবে অনেক। এখন সবচেয়ে বড় আর কঠিন কাজ হচ্ছে দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়ন করা। সুবিবেচিত আর সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা এই কাজ হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, “আমি চাই আপনাদের মধ্যে এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠুক যাতে কোন বড় রকমের দায়িত্ব নিতে আপনারা ভয় না পান।”

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাশ্চাত্য বাঁধ নির্মিত হবার ফলে পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের লোক উপকৃত হবে। দেশে অন্যান্য নানা অংশেও বড় বড় কাজ হচ্ছে। সব কাজেই কর্মীরা গ্রহণ করছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু দুর্য্যের বিষয়, কাজের সম্ভাব্যতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কর্মীদের ওয়াকিফ-হাল রাখা হয় না। কর্মীদের যাতে সহযোগিতারূপে গণ্য করা হয় সেজন্য তিনি ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন যে, কর্মীরা যে দেশ-গঠনের কাজে নিয়োজিত একথা তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তাতে তাঁরা দায়িত্বের ভার নেবেন এবং কাজে আরও উৎসাহ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ভারত সকলের সঙ্গে বন্ধু-ভাবে চলতে চায়—কারও সঙ্গে বন্ধু চায় না। আমাদের সংগ্রাম দারিদ্রের সঙ্গে। কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম এবং ত্যাগের দ্বারা তা সম্ভব। দেশের

লোক যত পরিশ্রম করবে ততই তাদের সুখ-সমৃদ্ধি বেড়ে যাবে।” তিনি বাঁধ ও এই ধরনের বড় বড় নির্মিতগুলিকে বলেন—দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জনগণের সংকল্পের প্রতীক।

দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের ‘চেয়ারম্যান’ শ্রী এস লাল এই অনুষ্ঠানে স্বাগতভাষণ করে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ের চারটি বাঁধ, তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং ১৫ হাজার কিলোওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। দূর্গা-পুর্নরে সেতুবাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন করা হয়েছে। খালের কাজ সামান্যমাত্র বাকি আছে। প্রথম চারটি বাঁধ ৬ কোটি ৫০ লক্ষ কিউসেক বন্যা নিরোধ করতে সক্ষম; বাস্তবিকপক্ষে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার চেয়েও বেশি পরিমাণ বন্যা নিরোধ করা হয়েছিল। এসব বাঁধ নির্মাণে যে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, তার দ্বারা এ বছর ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব।

এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও সচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখো-পাধ্যায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সচমন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হস্তশিল্প পর্ষদের আদর্শ ও কর্মপ্রাচেষ্টা

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদের সভানেত্রী

সাত বৎসর হ'ল নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদ স্থাপিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পর্ষদ দেশে হস্তশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে এবং আমাদের জীবনে হস্তশিল্পের ভূমিকা যে কী রকম গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটা চেতনা সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করেছে। অতীতে মদুষ্টিমেয় বিভবান ব্যক্তি হস্তশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজ তাঁদের স্থান জনসাধারণ গ্রহণ করছেন।

হস্তশিল্পের উন্নয়নে নকশা রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখন দেশের সর্বত্র নকশাকেন্দ্র রয়েছে। হস্তশিল্প পর্ষদের একটি সম্প্রসারণ কর্মসূচিও রয়েছে। এই কর্মসূচি অনুসারে নকশাকেন্দ্রগুলি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে শিল্পীদের নিকট নতুন নতুন নকশা পৌঁছিয়ে দেন। কারণ এটাই হস্তশিল্প পুনরুজ্জীবনের মূলে উপায়।

আদিবাসীদের শিল্প

হস্তশিল্প পর্ষদ আদিবাসীদের মধ্যেও কাজ আরম্ভ করেছেন। আদিবাসীদের নিজস্ব সমৃদ্ধ ও বিচিত্র শিল্পকলা রয়েছে। নীলগিরিতে কয়েকশ্রেণীর আদিবাসীর মধ্যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। আদিবাসীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প হ'ল টোডা রমণীদের বড়িটোলা কাজ। তাদের একটি কেন্দ্র আছে। টোডা রমণীরা সেখানে এসে শাল, কাপড় প্রভৃতির উপর বড়ি টোলে। বড়িটোলা বিবিধ দ্রব্য এই প্রথম বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

কোটা আদিবাসীদের মধ্যে বহুদিন যাবৎ কাঠের কাজ করবার রীতি প্রচলিত আছে। কাঠের উপর

খোদাই কাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাদের মধ্যে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নীলগিরির চাবাগিচায় বালিয়ার নামক আদিবাসীরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। তাদের জন্য বড়ি বোনার একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মহীশূর, দ্বিপুড়া, মণিপুড় প্রভৃতি রাজ্যের নানা স্থানে মাদুর তৈরির কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে ভারতের বেশির ভাগ হস্তশিল্পের সম্বন্ধ আছে। উৎসবের জন্য হস্তশিল্প তৈরির সময় শিল্পীদের মনে একটি উৎসাহের ভাব জাগে। হস্তশিল্প পর্ষদ উৎসবের দিনে মেলায় আয়োজন করে তাতে সকলকে যোগদানের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। গত বৎসর দিল্লীতে পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়ালি মেলার আয়োজন করা হয়। তার চারদিকে কয়েক রকম হস্তশিল্প স্থাপন করে শিল্পজ্ঞাত দ্রব্য তৈরি ও বিক্রি করা হয়। এই ব্যাপারটি জনগণের খুব পছন্দ হয়েছিল। এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পুতুলনাচ

হস্তশিল্প পর্ষদ মাত্র গত বৎসর পুতুলনাচ শিল্পের উন্নয়ন আরম্ভ করেন। এই পর্ষদের চেষ্টা ও সহায়তায় পুতুল তৈরির একটি কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। নাচ দেখাবার জন্য কতকগুলি নতুন পুতুল ব্যবহার করা হচ্ছে।

হস্তশিল্প পর্ষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল পুতুলের সাজসজ্জা, অলংকার ইত্যাদি সংগ্রহ। যদি সেগুলি সংগ্রহ করে সত্বর সংরক্ষণের ব্যবস্থা

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

করা না হয়, তবে ভারতের হস্তশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হবে। যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হবে সেগুলিকে একটি সংগ্রহশালায় রাখা হবে। এরূপ প্রচেষ্টা এদেশে ও এশিয়ায় এই প্রথম চলছে।

এইবার প্রথম হস্তশিল্প পর্ষদ আসবাবপত্রের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আসবাবের নকশা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তির উপর এই কর্মসূচি রূপায়ণের ভার দেওয়া হয়েছে। সহস্রাধিক আসবাব নির্মাণ করে নয়াদিল্লীতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখানো হয়। প্রদর্শনীটি বেশ জনপ্রিয় হয়। এই অভিজ্ঞতার ফলে হস্তশিল্প বোর্ড আধুনিক ধরনের আসবাবের নকশা রচনা সম্পর্কে দু'জন ডেনিস আসবাব-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

খেলনা ও পুতুল

হস্তশিল্প বোর্ড খেলনা ও পুতুল তৈরির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। বোম্বাইস্থিত খেলনা উন্নয়নকেন্দ্র নতুন নতুন খেলনা নির্মাণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই কেন্দ্র বাজারের খেলনাগুলির গঠন, সৌন্দর্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করেন এবং সেগুলির নির্মাতাদের নিজেদের উৎকৃষ্ট নমুনা সরবরাহ করেন। এতে পুরানো নকশা, বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রভৃতির সমন্বয় ঘটে। কারখানাগুলিকেও নতুন নতুন নমুনা সরবরাহ করা হচ্ছে।

উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ

হস্তশিল্প তৈরির সামাজিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও এর উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়েছে। হস্তশিল্প পর্ষদ উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিযান চালাচ্ছেন। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন না করলে নিপুণতা ও শিল্পচাতুর্য নিষ্ফল হবে। বোর্ড শিল্পের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যসরকারের উপর চাপ দিয়েছেন এবং উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি

রাজ্যের আধিকারিকের বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

হাতে কাপড় ছাপা

হাতে কাপড় ছাপা সম্পর্কে গবেষণা উপদেষ্টা সমিতি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় ছাপার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হ'তে থাকায় হাতে কাপড় ছাপা শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। হস্তশিল্প বোর্ড এই শিল্পকে সংরক্ষণ সুরূবিধা দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কারখানার ছাপা-শিল্পী, বয়ন-শিল্প কমিশনার এবং হস্তশিল্প সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। স্থির করা হয় যে, আপাতত দু'বছর স্থিতিাবস্থা মেনে চলা হবে এবং এই সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে ছাপাশিল্পের সম্প্রসারণ করতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে পর্ষদ হাতে ছাপা শিল্প শক্তিশালী করার জন্য অর্ধ সরবরাহ করবেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, হাতে ছাপার অনেক সুক্ষ্ম ও জটিল নকশা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা যায় না। বিশ্বের বাজারে এইসব নকশার চাহিদা আছে। হাতে ছাপার নকশার জন্য যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হয় তবে এগুলি লোপ পেতে পারে।

রপ্তানি

সম্প্রতি হস্তশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন গঠন করা হয়েছে। তাতে ভারতীয় হস্তশিল্পের রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন বিদেশের বাজারের অবস্থা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। করপোরেশন হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের ঋণদান, নির্মাতাদের কাঁচা উপকরণ সংগ্রহের সহায়তাদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করছেন। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মালদহের আম-উন্নয়ন

শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়

মরসুমী ফলের মধ্যে আমই সবচেয়ে উপাদেয় ও পুষ্টিকর। বিভিন্ন রকমের খাদ্যপ্রাণ এর মধ্যে থাকায় এই ফল যথেষ্ট উপকারী।

প্রায় চার হাজার বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম আমের চাষ করে। খ্রীস্টপূর্ব এক শতাব্দীতেও ভারতের নানা জায়গায় স্তূপের গায়ে অসংখ্য আমগাছের ছবি খোদাই করা হয়েছিল। বর্তমান ভারতের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট রকম আমের পরিচয় প্রাচীন যুগেও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেই বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে আমচাষের দিকে ভারতীয়দের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়। ডি ক্যান্ডোল-এর মতে ব্রহ্ম-ভারত অঞ্চলেই আমের প্রথম সৃষ্টি হয়।

প্রাচীনকাল হতে যে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে আমের পরিচয় দিয়েছে, সেই ভারতবর্ষের আম-চাষ-ক্ষেত্রের একটি কোণে পড়ে রয়েছে মালদহের আম। তবুও আম মালদহের এক বিশিষ্ট সম্পদ। মালদহের ইতিহাসে মালদহের আমের স্থান বিদেশীদের কাছেও তাই স্মরণীয়।

পশ্চিম বাঙলার কোন কোন জেলার সমশ্রেণীর আমের সঙ্গে মালদহের আমের তুলনামূলক আলোচনা করলে চোখে পড়ে যে, মালদহের ফজলী, গোপালভোগ, ল্যাংড়া, খিরসাপাতি, লক্ষ্মণভোগ, বৃন্দাবনী ইত্যাদি আমের স্বাদে ও গন্ধে এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হয়তো মাটির উৎকর্ষই এর একমাত্র কারণ। মালদহের একটি পাকা পুষ্টি ফজলী আম অনায়াসে একজন লোকের একবেলার পেট ভরাতে পারে—মালদহের বাইরের অনেকেই তা অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার এ বিজ্ঞপ্তিকে বাইরে মালদহের আমের কাটতি বাড়ানোর উদ্দেশ্য বলেই মনে করেন। মালদহের আম সম্পর্কে বাইরের লোকের এই ধারণা কিছুকাল আগেও ভুল বলে মনে হলেও, আজ তা

সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মালদহের আম উন্নয়নের জন্য অবশ্যকর্তব্য বিষয়গুলিতে অবহেলার ফলেই আজ এক বিষময় পরিণতি দেখা দিয়েছে।

আমগাছ তার সাধ্যমত কর্তব্য করলেও, বাগান-মালিক তার প্রতিদান যোগাতে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছেন। সারা বছর ধরে আমবাগানগুলি জঙ্গল ও আগাছায় ভরে ওঠে, ফলে ভাল ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। মাঝে মাঝে আমগাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে না দেওয়ার ফলে গাছ রোগাটে হয়ে যায় বাগান-মালিকের উদাসীনতাই আমবাগানগুলিকে এমন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার পরেই আম-বাগানগুলিতে ভালভাবে হালচাষ দিয়ে কিছু পরিমাণ সার গাছের চারদিকে ছিটিয়ে দিতে পারলে ফল পুষ্ট ও সুস্বাদু হয়। বাগান-মালিকদের সেদিকে মোটেই সযত্ন দৃষ্টি নেই।

শীতকাল শেষ হওয়ার পর থেকেই আমগাছে মৃদুকুল ফুটতে শুরুর করে। অর্থাগমের নতুন ভরসা নিয়ে এতদিনে মালিকের দৃষ্টি পড়ে তাদের বাগানগুলির দিকে। বসন্তের শেষে আম দানা বাঁধতেই, শুরুর হয়ে যায় বাগান বেচা-কেনা। বাগান-মালিক তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাগান হস্তান্তরের জন্য। অন্যদিকে ক্রেতা বাগান কেনার পর থেকেই অধিক আর্থিক লাভকেই মূখ্য উদ্দেশ্য করে বসে থাকে। মরসুমের আগেই বাজারে আম ছাড়তে পারলে তারা বেশ দু'পয়সা আনতে পারবে, এমনি ধারণা নিয়েই অপরিপক্ক আম তারা বাজারে ছাড়তে শুরুর করে। বছরের পর বছর এমনিভাবে অপরিপক্ক আম চরনের ফলে যে বিপর্যয় দেখা দেয়, তার ফলে আমগাছগুলি তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্য হারাতে থাকে। এ কারণেই পর বছর গাছগুলিতে

সম্পূর্ণ মকুল ফোটে না এবং যা ফোটে তার অনেকাংশই ঝরে পড়ে।

মরসুমের অনেক আগেই মালদহের আম বাজারে আমদানি হয়েছে জেনে ক্রেতারা সেদিকে ঝুঁকে পড়েন। বেশি দাম দিয়ে অপরিপক্ক আম কিনে নিয়ে, মালদহের আম তাঁরা অম্ল ও বিস্বাদ বলে ফেলে দেন। গত বছরে অনাবৃষ্টির ফলে মালদহের আম মোটেই পুষ্ট হতে পারে নি। উপরন্তু অপরিপক্ক আম বিদেশের বাজারে চালান দেওয়ার মরসুমের গোড়ার দিকের রপ্তানি-করা অধিকাংশ আম পঁচে নষ্ট হয়ে গেছে।

অসাধু ব্যবসায়ী অন্য এক নতুন অপকৌশলে মালদহের আমের অপপ্রচার ঘটচ্ছে। ফজলীর মরসুম শেষ হওয়ার পরই মালদহ থেকে আশ্বিনা আম রপ্তানি হতে থাকে। ঐগুলি দেখতে ঠিক ফজলী আমের মত বলেই বিদেশের ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে তা ফজলী নাম দিয়ে বাজারে চালিয়ে দেয়। অজ্ঞ ক্রেতারা আশ্বিনা আমকেই ফজলী মনে করে কিনে নিয়ে মালদহের ফজলীর দুর্নাম করেন।

মালদহের আম-সম্পদের বিভিন্ন রকম উন্নয়নের জন্য পূর্বকার “আম-উন্নয়ন কমিটি” ভেঙে নতুন করে “মালদহ আম-ব্যবসায়ী সম্বন্ধ” গঠিত হয়েছে। জেলার কিছুসংখ্যক আম-ব্যবসায়ী ও বাগান-মালিক নিয়ে এই সম্বন্ধ গঠিত হয়ে থাকলেও বাগান-মালিক রয়েছে এতে সামান্য-সংখ্যক। আরও বেশিসংখ্যক বাগান-মালিককে এই সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। একমাত্র আম-ব্যবসায়ী সম্বন্ধের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় উপরি-উক্ত মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলি সংশোধন করে মালদহের আমকে অপপ্রচারের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব এবং তা হলেই মালদহের আম ফিরে পেতে পারে তার মৌলিকতা।

প্রথমত ব্যবসায়ী-সম্বন্ধের তরফ থেকে এবার ‘বাগান-উন্নয়ন কমিটি’ গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটির সঙ্গে বাগান-মালিকদের সংযোগ থাকবে

অক্ষুণ্ণ। আমবাগানের উন্নয়নকল্পে বাগান-মালিকদের উদাসীনতা দূর করাই হবে এই কমিটির মূখ্য উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, মকুল ফোটার পরেই আম-ব্যবসায়ী যাতে বাগান কিনতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে বাগান-উন্নয়ন কমিটি। অথবা অসময়ে আমবাগান হস্তান্তরে বাগান-মালিকের কাছেও কঠোর আপত্তি জানাবে এই কমিটি।

তৃতীয়ত, মালদহের আম রপ্তানির পূর্বেই বিদেশস্থ মালদহের আমের বাজারগুলিকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখার জন্য আম-ব্যবসায়ী সম্বন্ধের মাধ্যমে ‘মালদহের আম প্রচার কমিটি’ গঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মালদহের মূল আমের বিদেশে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য এই কমিটি বিদেশস্থ প্রতিটি রাজ্যে প্রতিনিধি রাখতে পারেন। বিদেশের বাজারগুলি আকর্ষক পরিদর্শন করে মালদহের আমকে তাঁরা অপপ্রচারের হাত হতে অনায়াসে রক্ষা করতে পারেন।

চতুর্থত, প্রতিটি জিনিসেরই সুষ্ট প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যস্বীকার্য। মালদহের আমের সং-প্রচারের জন্য ব্যবসায়ী-সম্বন্ধের উৎসাহে বহুল-প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। মালদহের আম-ব্যবসায়ী সম্বন্ধের এদিকে দৃষ্টি পড়লে মালদহের আমের অপপ্রচারে সহজেই বিরতি ঘটবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্বন্ত মালদহের আমের একচেটিয়া বাজার ছিল পূর্ববঙ্গ এবং তার একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। কিন্তু পাকিস্তান-সরকারের বাণিজ্যনীতি ভারতীয় রপ্তানি-নীতির অনুকূলে না থাকায় পূর্ববঙ্গে মালদহের আম রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কলিকাতা, গোহাটি, দার্জিলিং, তিনসুকিয়া প্রভৃতি ভারতীয় অঞ্চলে মালদহের আমের বাজার নতুন করে গড়ে তুলতে

হ'ল এবং মালদহের আম রপ্তানির প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়াল রেলগাড়ি। রেলগাড়িতে ক'রে মালদহের আম অক্ষত অবস্থায় বাইরে পৌঁছানোর জন্য আম-ব্যবসায়ী সংঘের সঙ্গে রেল-বিভাগের এক বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। রেল-গাড়িতে ক'রে বর্তমানে যে অবস্থায় মালদহের আম বাইরে পৌঁছায় তাতে অধিকাংশ আমের ঝুড়ি রেল-বিভাগের অযত্ন অবহেলায় আছাড় বা ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক আম গুরুতর আঘাত খেয়ে পচে বা বিস্বাদ হয়ে যায়। এ-অসুবিধা দূর করার জন্য মালগাড়িগুলিতে তাকের ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। একমাত্র রেল-বিভাগের সমস্ত দৃষ্টি এবং রেল-কুলীর উপর কড়া নির্দেশ থাকলে হয়তো মালদহের আম তার মৌলিকতা নিয়েই বিদেশে পৌঁছতে পারে। মালদহের আম-ব্যবসায়ী সংঘ রেল-বিভাগের উপর চাপ দিয়ে যুক্তিপূর্ণ

বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করলে এ অসুবিধা সহজেই দূর হ'তে পারে।

পূর্ববঙ্গের বাজারগুলি বন্ধ হওয়ার পর ভারতের নতুন বাজারগুলি মালদহের আম রপ্তানির পক্ষে যথেষ্ট নয়। মালদহের আম-ব্যবসায়ী সংঘের প্রচেষ্টায় যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন, কলম্বো প্রভৃতি স্থানে মালদহের আমের বাজার গড়ে উঠতে পারে। বিদেশস্থ বাজারগুলিতে নির্ভরযোগ্য বিক্রয়কেন্দ্র খোলাও প্রয়োজন।

মালদহের আম-শিল্পকে আজ বিপণ্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আম-ব্যবসায়ী সংঘ ও বাগান-মালিকদের মধ্যে সহজ অথচ নিয়মিত সংযোগ স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। একমাত্র এই পন্থা অবলম্বনেই মালদহের আম-শিল্প উন্নয়নের পথ সুগম হয়ে উঠতে পারে, সন্দেহ নেই।



ডিম-পোনা সংগ্রহ উড়িষ্যার সহযোগিতা

বাঙলা এবং উড়িষ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুপ্রাচীন। উড়িষ্যা-সরকার যে সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলার 'অ্যাসোসিয়েটেড ফিশারিজ' প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও সহযোগ দানের জন্য উদারভাবে এগিয়ে এসেছেন, এরও মধ্যে রয়েছে তারই প্রমাণ। পশ্চিম-বঙ্গের কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর ভাগ্যের এবং এ রাজ্যে মাছের সরবরাহের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করেছে 'অ্যাসোসিয়েটেড ফিশারিজ'।

এতকাল এঁদের কর্মক্ষেত্র কাঁসাই, সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণ নদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু গত তিন বছর ধরে মাছের ডিম দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায় এঁদের কাজ উড়িষ্যার বিভিন্ন নদীতেও ছড়িয়ে পড়েছে। উড়িষ্যা-সরকারের মৎস্য-অধিকার নানা অসুবিধা লক্ষ্য করে স্বয়ং রক্ষাণী নদীর নিয়ন্ত্রণ-ভার হাতে নিয়ে, উক্ত নদীর অধিকাংশ মাছের ডিম সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন 'অ্যাসোসিয়েটেড



ডিম-পোনা সংগ্রহ করা হচ্ছে

এই প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১৯৪৮ সাল থেকে কাজ করে চলেছে এবং বিশেষ করে সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী এলাকার জলে মাছ শিকারে আর মাছের পোনা ও ডিম সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ফিশারিজ' কর্তৃক সংগঠিত সমবায় সমিতির উপর এবং উড়িষ্যা-সরকারের মৎস্য-বিভাগের উপ-অধিকর্তা শ্রী জি ডি মহান্তির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে উক্ত সমিতি তাঁদের কার্যে বিপুল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। উড়িষ্যা-সরকারের নীতিতে

সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব হচ্ছে, ধীবরদের বৈষয়িক শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা এই অনুমতি দানের জন্য নগদ অর্থ দাবি করেন নি, তার বিনিময়ে তাঁরা সমিতির ধীবরদের সংগ্রহ-করা মাছের ডিমের নির্দিষ্ট একটা অংশ চেয়েছেন। তা ছাড়া সরকার সর্বদাই ধীবরদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। এই প্রথম মেদিনীপুরের মৎস্যজীবীরা উড়িষ্যা মাছের ডিম সংগ্রহের একটা সংগঠিত কার্য পরিচালনা করতে পারলেন।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মৎস্যবিভাগ এবং তার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানটির সহায়তা করে প্রশংসনীয় সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তাঁরা সকল রকম সাহায্য এবং প্রায়োগিক উপদেশ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার প্রত্যন্ত পল্লী-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এবং জনগণের একাংশের সামাজিক কল্যাণে নীরবে এঁরা যে কাজ করে চলেছেন তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দেশের



রেল-কর্তৃপক্ষ রিজার্ভ বগির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন

প্রায় ১,৬০০ ধীবর এতে উপকৃত হয়েছেন এবং প্রায় ৪,০০০ হাঁড়িতে কমবেশি ১২,০০০ কুনুকা মাছের ডিম-পোনা রুম্মাণী নদী থেকে তমলুক মহকুমায় ও কলিকাতায় চালান এসেছে—যার ফলে বাজারদর বেশ পড়ে গেছে। বাস্তবিক তমলুক মহকুমায় আর খরিদদার মেলা ভার হয়ে দাঁড়াল আর কলিকাতার বাজারে মাছের ডিম-পোনার প্রতি কুনুকার দর দাঁড়াল ৩৫ টাকায়। ফলত এসব ধীবরকে মাছের ডিম সংগ্রহ করার কাজ বন্ধ রাখতে হ'ল।

এবং জাতিরই সেবা হচ্ছে। শুধুমাত্র উড়িষ্যা থেকে মাছের ডিম-পোনা নিয়ে আসার জন্য রিজার্ভ বগির ব্যবস্থা করে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কর্তৃপক্ষ এই ধীবরদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক শ্রীআদ্যনাথ ঘোষের দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্ব প্রশংসার্হ।

এই দু'টি প্রতিবেশী রাজ্যের সহযোগিতা চিরস্থায়ী হোক, এই কামনা করি।

পশ্চিম বাঙলার গোরু ও কৃষক

আশঙ্কিময় বসাক

গো-জাতি এবং কৃষকের অধঃপতন পশ্চিমবঙ্গে যত হয়েছে এত আর ভারতের অন্য কোন রাজ্যে হয় নি। গোরু, বাছুর, বলদ খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে তিলে তিলে মরছে। এ গোচরীয় অবস্থা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল ভাববার বিষয়। আমরা দাদু-ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি যে, আগেকার দিনে টাকায় দিশ সের দুধ পাওয়া যেত। এখন সে-দুধ টাকায় বড়জোর দেড় সের। ভারতের যেসমস্ত রাজ্য বিশিষ্ট গো-বংশের জন্য বিখ্যাত, দেখা যায় সেই-সমস্ত রাজ্যের কোন-না-কোন শ্রেণীর মানুষ গো-পালনকে তাদের জীবনের পেশা ক'রে নিয়েছে। পাঞ্জাবের সাহিওয়াল অথবা মন্টগোমেরি গো-বংশ, মাদ্রাজের নেলোর এই ভাবেই নিজেদের বিশিষ্টতা রক্ষা ক'রে স্বতন্ত্র গো-বংশের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনও শ্রেণীর লোকই গো-পালনকে তাদের পেশা ক'রে নেয় নি। এ রাজ্যের গোয়ালারা গো-দুগ্ধ বিক্রির দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছে, গো-জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা ক'রে পালন করার দিকে তাদের মন নেই। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে স্থানীয় বিশিষ্ট গো-বংশের বাস আছে, যেমন, পাঞ্জাবে মন্টগোমেরি, যুক্তপ্রদেশে তিরহুত, মাদ্রাজে নেলোর, মহাশূরে অমৃতমহাল প্রভৃতি; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোন বিশিষ্ট গো-বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাঙলার গোরু অন্যান্য রাজ্যের গোরুর সঙ্গে অবাধ সংমিশ্রণের ফলে নিজেদের বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে। বাঙলার গোরু আকারে ক্ষুদ্র, দৈনিক গড়ে আধ সেরের বেশি দুধ দেয় না। বলদেরা আধ বিঘের বেশি জমি চাষ করতে পারে না। বাঙলার বলদ বাঙলার কৃষকের মতই ন্যূনজদেহ, কুস্পর্শ।

ভাল বলদের অভাবে পশ্চিম বাঙলার কৃষক কৃষিকার্যের উন্নতি করতে পারছে না। দুগ্ধ

মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। দুগ্ধের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হচ্ছে। বলদের সঙ্গে কৃষির নিকট সম্বন্ধ এবং কৃষির সঙ্গে কৃষকের সম্বন্ধ আরও অতি নিকট। তাই দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতি করতে হ'লে আগে ভাল গোরুর সৃষ্টি করতে হবে।

বাঙলার কৃষক, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গো-পালন ক'রে থাকেন। কিন্তু গো-পালন করতে হ'লে যা করা প্রয়োজন, তা কেউই করেন না বা করতে পারেন না। প্রাতঃকালে দুগ্ধ দোহন করা হ'ল—সম্পর্ক এইটুকু। গোরুরও যে ভাল খাবার, ভাল-ভাবে থাকবার প্রয়োজন আছে, অধিকাংশ লোকই তা ভেবে দেখেন না। তার উপর গো-জনন বিষয়ে বাঙলার সমস্ত গৃহস্থ-কৃষকই উদাসীন। এই গো-জননের উপর নির্ভর ক'রে ইউরোপের 'হোলস্টিন ফ্রিজন', 'আয়ার শায়ার', 'জার্সি' প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গো-বংশের উৎপত্তি হয়েছে। শুনলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে, একটি ভাল 'হোলস্টিন ফ্রিজন' ষাঁড়ের দাম কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা হ'তে পারে এবং এইজাতীয় কোন কোন গাভী দিনে এক মণেরও উপর দুধ দেয়। সন্তান-জন্মের কতদিন পরে গোরু স্বাভাবিক নিয়মে ষাঁড়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠে, আমাদের চাষী গৃহস্থরা তা সঠিক জানেন না। সমস্ত গ্রামের গোরু নিয়ে যে রাখাল মাঠে যায়, এ দায়িত্ব তার উপরই চাপানো থাকে। অপদার্থ ষাঁড়ের মিলনে আরও এক অপদার্থ গো-বংশের সৃষ্টি হয়। এই-ভাবেই গো-বংশ হচ্ছে। এইজন্য বাঙলার গোরু অন্যান্য দেশের গোরুর চাইতে অনেক কম গো-বংশের জন্ম দিতে পারে। এও জাতীয় ক্ষতি।

গো-বৎসের প্রতি ব্যবহারটাও একবার ভাববার বিষয়। স্বভাবের নিয়মই এই যে, বলিষ্ঠ পিতা-মাতার সন্তান শীঘ্রই শারীরিক উন্নতি লাভ করে সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বাঙলার গো-বৎসের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে তার কৃশ রক্ত পিতামাতার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উপরন্তু গৃহস্থের কল্যাণে তার মাতার যে সামান্য দূষণ হয় তা থেকেও সে হয় বঞ্চিত। ফলে, যেখানে ইউরোপের গো-বৎস দুই অথবা আড়াই বছরের মধ্যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গো-বৎস আড়াই অথবা তিন বছরের মধ্যে সন্তান ধারণ করবার ক্ষমতা লাভ করে, বাঙলার গো-বৎসের সেখানে চার বছর লাগে। শূদ্র তাই নয়, তার জীবনীশক্তিও কম হয়ে যায়।

সরকারী প্রচেষ্টায় আদর্শ দূষণ-প্রতিষ্ঠান অবশ্য গড়ে উঠেছে কিন্তু তাতে যে দূষণ উৎপন্ন হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আজ বাজারের সর্বত্র জমাট ও গন্ডো দূধে ছেয়ে গেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দূধ দান করে গোরু, আর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক গোরু আছে ভারতে; কিন্তু দূষণশীল ভারতের স্থান একেবারেই নগণ্য। ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দূধবতী গাভীর জন্য বিখ্যাত। সেসব জায়গার জমাট দূধ পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানি হয়।

আগে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে বহু গোরু দেখা যেত। এখন তার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তারা গড়পড়তা দূধ দেয় আধ সেরটাক। তাই আজ পশ্চিম বাঙলায় দূধাভাব উঠেছে ব্যাপক হয়ে।

এর প্রতিকার কী? গোরুর সংখ্যা না বাড়িয়েও, গো-জাতির সংস্কার করে আমাদের দূষণ-সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। দেশে গোচারণভূমির অভাব। গোরুর সংখ্যা বেশি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দৈনিক আধ সের দূধ দেয় এমন কুড়িখানেক গোরুর চাইতে দশ সের দূধ দেয় এমন

একটি ভাল জাতের গোরু রাখা নিশ্চয়ই খাদ্যের এবং লালন-শ্রমের দিক থেকে লাভজনক।

গো-জাতি ও কৃষকের উন্নতি করতে হ'লে তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রথমত গো-খাদ্যের সংস্থান, দ্বিতীয়ত নির্বাচনমূলক গো-প্রজনন এবং তৃতীয়ত কৃষির উন্নতিসাধন।

পশ্চিম বাঙলার গোচারণভূমি আজ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে চলেছে। এটা যে কেউ গো-জাতির উপর শত্রুতা করে করছে তা নয়। লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের জমি কম বলেই চাষীরা গোচারণ-ভূমিকে কৃষিভূমিতে পরিণত করতে বাধ্য হচ্ছেন। গোরুর জন্য চাষের জমি ছেড়ে দিতে হ'লে মানুষকে অনশনে কাটাতে হবে।

বোম্বাইএর নাসিক জেলায় গোচারণ ভূমি আদৌ নেই, অথচ সেখানকার গোরু কত সুন্দর। সুতরাং গোচারণভূমির অভাব থাকলেই যে গোরুর উন্নতি করা যাবে না—এমন কথার মানে নেই। চাষের জমিতে পর্যায়ক্রমে একটি চাষে গো-খাদ্য ফসল উৎপন্ন করলেই গোরুর খাদ্যসমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

শূদ্র কৃষকদের পক্ষে কৃষির উন্নতি করা অসম্ভব। কৃষির উন্নতি ছাড়া গো-খাদ্য ফসলের উৎপাদনও আশা করা যায় না। কৃষকরা অর্থহীন। তাঁদের ভাল বলদ নেই। ভাল বীজ খরিদ করতে তাঁরা পারেন না, বা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও তাঁরা অপারগ। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থার দ্বারা কৃষিকার্যের আমূল পরিবর্তন করা তাঁদের সাধ্যাতীত। শতকরা সত্তর জনের বেশি বাঙালী কৃষিজীবী। অর্থসমস্যা যে কৃষিসমস্যার মূলে অনেকখানি ক্রিয়া করে তা বলাই বাহুল্য।

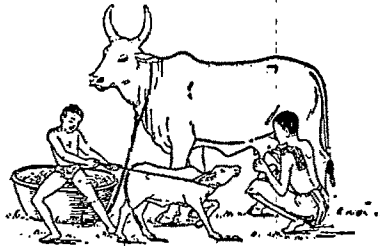
প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় ভূমি বন্দোবস্তের উপরই কৃষকের সামাজিক ও আর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলন এদিক থেকে কৃষকদের অনেকটা সহায়ক হয়েছে, কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় এই আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নি। তারপরই আসে সুদ-সমস্যা। দেশের মহাজনেরা

দরিদ্র কৃষকদের কীভাবে শোষণ করে তা বিস্তারিত-ভাবে বলার দরকার নেই। অতিরিক্ত সুদ নেওয়া বে-আইনী হ'লেও কৃষকরা মহাজনদের কবল থেকে উদ্ধার পান না। বর্তমানে সরকার থেকে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে—বলদ খরিদ, জমির উন্নতি, বীজ খরিদ, দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়, তুত চাষ ও রেশমশিল্পের উন্নতি প্রভৃতির জন্য। তা ছাড়া কৃষকদের অভাবের সময় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্তে তাঁদের প্রচুর ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাও সব সময় যথেষ্ট নয়। তার উপর অভাবের তাড়নায় অধিকাংশ কৃষকই ঋণের টাকা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য খরচ ক'রে ফেলে।

সমবায় নীতিই এদিক দিয়ে সবচেয়ে কার্যকরী। দরিদ্র কৃষককে বাঁচাতে হ'লে এই আন্দোলনকে অতি দ্রুত সার্থক ক'রে তুলতে হবে। মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর চেয়ে অমোঘ অস্ত্র আর নেই। কিন্তু সমবায় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হ'লে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার করতে হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে কৃষিশিক্ষার ও সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গ্রামে গ্রামে কৃষি সমিতি স্থাপন ক'রে স্থানীয় কৃষি-সমস্যার

সমাধানের চেষ্টা করা যায়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় সম্প্রসারণ রকের ও গ্রামসেবকের মাধ্যমে জাতীয় সরকার কৃষকের উন্নতি বিধানের সহায়তায় নেমেছেন। গো-চাঁকিংসার ব্যাপক বন্দোবস্ত না থাকায় অধিকাংশ কৃষকই তাঁদের বলদ মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর খরিদ করতে সক্ষম হন না। তখন ঋণ ক'রে বলদ কিনতে তাঁরা বাধ্য হন। অনেকে আবার তাও করতে পারেন না। প্রতি বছর গো-মড়কে পশ্চিম বাঙলায় প্রচুর বলদ ও গাভী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর স্থায়ী প্রতিকার আশু প্রয়োজন। জাতি হিসাবে বাঁচতে হ'লে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

মোট কথা, এইসমস্ত অবনতির মূলে জাতীয় দারিদ্র্য ও উদাসীনতা বর্তমান। অন্যসমস্যা আজ প্রবল আকার ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত কত যুবক অশ্রদ্ধাভাবে কত উপায়ে কত অমূল্য জীবন নষ্ট করছে। আমাদের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি চাকরির মোহ ত্যাগ ক'রে কৃষি ও গো-পালনের দিকে মন দেয়, কৃষকের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করে, এবং কৃষি-আন্দোলন জোরদার ক'রে তোলে, তবেই জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, খাদ্য-সমস্যারও সমাধান হবে।



সমবায় চাষ

এক কথায়, চাষীরা যার যার জোতে সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদাভাবে একক ও বিচ্ছিন্ন চাষ না করে, যদি একজোট বেঁধে সমবায় কৃষি সমিতি গড়ে নিয়ে তার মাধ্যমে চাষ-আবাদের কাজগুলো শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে করতে শুরু করেন তা হ'লে সেটাই হ'ল সমবায় চাষ। টাকাপয়সার লেনদেন যেমন সমবায় ব্যাংকের মারফত চলে অথবা নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের কেনাকাটা সমবায় বিপণির মাধ্যমে, তেমনি সমবায় চাষের ব্যবস্থা চাষীরা করেন সমবায় কৃষিসমিতি গড়ে নিয়ে। কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত কতকগুলো বিষয় এবং জিনিস আছে। যেমন কৃষিক্ষণ, সেচ, লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, হালের গোরু, বিপণন, আরও কত কী! চাষী যে পরিমাণে এসব জিনিস যোগাড় করতে পারবেন, চাষ-আবাদের কাজ তত ভালভাবে করতে পারবেন। এগুলো সময়মত ও পরিমাণমত যোগানো কৃষির প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা চাষীরা দল বেঁধে মিলিতভাবে করার জন্যই সমবায় চাষের দরকার। তারপরে, জোটগুলো জোড়া লাগিয়ে বড় বড় খামার বানিয়ে মিলিতভাবে চাষ ও উৎপন্ন ফসল হারাহারিমত গ্রহণ—এই কর্মপদ্ধতিও সমবায় চাষের নামান্তর। এমনিতেই আমাদের পাড়ারগাঁয়ে লাঙল দেবার সময়ে বা ফসল কাটবার সময়ে এক চাষীর জমিতে তাঁর প্রতিবেশী অন্যান্য চাষীরা দল বেঁধে কাজ করে দিয়ে আসেন। সুতরাং, চাষের কাজে এই মিলিত চেষ্টা নতুন কথা নয়। সমবায় চাষে এই মিলিত কাজটাই হয় আরও ব্যাপকভাবে আর কতকগুলো নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে, এইটুকুই যা তফাত।

সমবায় চাষের রকমফের

আমাদের দেশে চার রকমের সমবায় কৃষি সমিতি আছে। স্থানীয় অবস্থা এবং সমিতির সভ্যদের

মতিগতি ও প্রয়োজন অনুসারে এই চার রকমের মধ্যে যে-কোনও ধরনের সমিতি গঠন করা চলে।

প্রথমটি 'সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি' (কো-অপারেটিভ বোটার ফার্মিং)। এই সমবায় কৃষি-সমিতির যাঁরা সভ্য হবেন, তাঁদের কারও নিজ নিজ চাষের জমি বা হাল, গোরু, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমিতিকে হস্তান্তরিত করে দিতে হয় না। প্রত্যেক সভ্যের তার জমিতে নিজের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী চাষ করার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে। সমিতিতে যোগ দেবার উদ্দেশ্য চাষের আনুষ্ঠানিক কতকগুলো সদস্যগতবিধা পাওয়া—যা শুধু মিলিত চেষ্টাতেই সম্ভব, যেমন, কৃষিক্ষণ, সেচ, বীজ, সার, লাঙল ও যন্ত্রপাতি, হালের গোরু, বিপণন, যান-বাহন ইত্যাদি। সমিতির কাজ হ'ল এসব জিনিস সময়মত ও পরিমাণমত প্রত্যেক উৎসাহী সভ্যকে যুগিয়ে যাওয়া আর উন্নত প্রণালীর চাষ-আবাদ সম্পর্কে সভ্যদের পরামর্শ দেওয়া, যাতে তাঁরা সমবায় চাষের রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠতে পারেন। সভ্যদের ব্যক্তিগত চাষের লাভ-লোকসানের সঙ্গে সমিতির কোনও সম্বন্ধ নেই। বৎসরান্তে সমিতির হিসাবনিকাশ হ'লে যদি লাভ কিছু দাঁড়ায়, তা হ'লে সভ্যেরা তাঁর অংশ পান।

দ্বিতীয়, 'সমবায় রায়তী কৃষি সমিতি' (কো-অপারেটিভ টেন্যান্ট ফার্মিং সোসাইটি)। চাষ-আবাদের কাজে অভ্যস্ত অথবা নামতে ইচ্ছুক এরকম কিছু লোক সমিতি গড়ে নিয়ে, সরকার অথবা কোনও মালিকের কাছ থেকে কিছু জমি ইজারা নেন। তারপরে সেই জমি ভাগ করে একটা খাজনার হার ঠিক করে প্রত্যেক সভ্যকে আবার সমিতির অধীনে আলাদা-আলাদা ইজারা দেওয়া হয়। সমিতি এক্ষেত্রে হয় মধ্যবর্তী মালিক। উন্নত কৃষি সমিতির মত এখানেও নিজের ইজারা-নেওয়া জমিতে একক ও আলাদা চাষের পদ্রোপদ্রি

স্বাধীনতা প্রত্যেক সদস্যের আছে এবং এই সমিতিও উন্নত কৃষি সমিতির মত সভ্যদের চাষের সুযোগ-সুবিধাগুলো যুগিয়ে যায়। বৎসরান্তে প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে তার দেয় খাজনা তুলে সমিতির দেয় খাজনা মালিককে পরিশোধ করা হয়। পশ্চিম বাঙলায় জমিদারী গ্রহণ আইন পাস হবার পর থেকে এ জাতীয় সমিতি গঠন করার হেতু উঠে গেছে, কারণ সমিতির পক্ষে মধ্যবর্তী মালিক হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা আছে।

তৃতীয়, 'সমবায় যুক্ত কৃষি সমিতি' (কো-অপারেটিভ জয়েন্ট ফার্মিং সোসাইটি)। এ জাতীয় সমিতির সভ্যেরা প্রথমেই নিজ নিজ চাষের জমি সমিতির অধীনে সমিতির কর্মসূচি অনুযায়ী চাষের জন্য সমিতির নামে দলিল করে হস্তান্তরিত করে দেয়। এই হস্তান্তরের ফলে জমির উপরে কোনও সভ্যের স্বত্বস্বামিত্ব বা মালিকানা নষ্ট হয় না, সমিতিতে যা হস্তান্তর করে দেওয়া হয় তা হচ্ছে যৌথ চাষের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত জমিটুকুর ব্যবহারের অধিকার-মাত্র। বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হস্তান্তরিত টুকরো-জোতগুলোকে জোড়া লাগিয়ে বড় বড় খামারে পরিণত করা হয়। তারপরে সমিতির পরিচালনায় ও খরচায় সেখানে চলে সভ্যদের মিলিত চাষ। চাষের লাভ-লোকসান সমস্তই সমিতির ব্যাপার। পরিচালনাও সমিতির দায়িত্ব। ব্যক্তিগতভাবে কোন সভ্যের আলাদাভাবে নিজ জমিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই, আলাদাভাবে সার, বীজ ইত্যাদি যোগানো বা চাষের জন্য অন্যান্য খরচ করার বামেলাও তাঁর নেই। জমি তৈরি, বীজ বোনা থেকে শস্যের ফসল কেটে মেরে তোলা, বিক্রি করা পর্যন্ত সকল কাজই একমাত্র সমিতির দায়িত্ব। সভ্যেরা কাজের জন্য দৈনন্দিন মজুরি পান, ফসল ওঠার পরে হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ অনুযায়ী তার একটা অংশ পান, তারপর সাকুল্য খরচ মেটাবার পরে যা লাভ দাঁড়ায় তার অংশ পান। এই যুক্ত চাষ সভ্যদের নিজেদের ব্যাপার। তাঁরা নিজেরাই কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে সমবায়

সমিতির পরিচালনার ভার তার উপরে অর্পণ করেন। ইচ্ছা ও প্রয়োজন হলে, জমির মত, যন্ত্র-পাতি, হালের গোরু-মোষ ইত্যাদিও সভ্যেরা সমিতির নামে হস্তান্তরিত করে দিতে পারেন এবং এগুলো ভাড়া দিয়ে সমিতির কাছ থেকে তাঁরা পরস্পর পেতে পারেন। তারপরে কোন কারণে সমিতি যদি উঠে যায়, তবে হস্তান্তরিত জমি ও অন্যান্য জিনিস ফিরে পাবার অধিকার প্রত্যেক সভ্যের আছে। আর যদি সমিতির নামে তখন কোনও দেনা বেরোয় তা হলে হারাহারিভাবে সেই দেনার অংশও সভ্যদের নিতে হয়।

চতুর্থ বা শেষেরটি, 'সমবায় মিলিত কৃষি' (কো-অপারেটিভ কালেক্টিভ ফার্মিং) সমিতি। একদল জমিহীন লোক, যথা ভূমিহীন কৃষক বা যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক বা পাকিস্তান থেকে আগত উদ্ভাস্ত, মিলিত কৃষি সমিতি গঠন করে সরকারের কাছ থেকে হোক বা কোন মালিকের কাছ থেকে হোক জমি যোগাড় করেন। তারপরে সবাই যৌথভাবে ঠিক যুক্ত কৃষি সমিতির ধরনে চাষ-আবাদের কাজ করেন। লাভ-লোকসান বলুন, পরিচালন-ব্যবস্থাই বলুন, সবই সমিতির দায়িত্ব। যুক্ত কৃষি আর মিলিত কৃষির মধ্যে একমাত্র তফাত হল মালিকানা। প্রথমটিতে সভ্য জমির মালিকেরা আর অপরিষ্কারে সভ্যদের ব্যক্তিগত মালিকানার কোনও বালাই নেই। জমিই হোক আর হাল গোরু হোক, যা কিছু সম্পদ সব কিছুই মালিক হচ্ছে সমিতি। এই জমি যদি ইজারা দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেও সভ্যদের ব্যক্তিগত মালিকানার কথা ওঠে না। আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। মিলিত কৃষি সমিতির সভ্য তাঁর কাজের বিনিময়ে মজুরি পান, লাভের অংশ পান এবং আর কিছু উদ্ভূত হলে মজুরির হারাহারি একটা বোনাস পান, কিন্তু ফসল উঠার পরে যুক্ত কৃষি সমিতির সভ্যের মত ফসলের একটা অংশ পান না। তার কারণ, কোনও জমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা তাঁর নেই।

এই চার রকম সমিতি প্রয়োজন অনুসারে একটি আর-একটির রূপ ও কার্য-প্রণালী অবলম্বন করতে পারে। যেমন উন্নত কৃষিকে যুক্ত কৃষিতে দাঁড় করানো যায়, রায়তী কৃষিকে মিলিত কৃষিতে।

সমবায় চাষের স্দবিধা

সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ করলে কতকগুলি বিশেষ ধরনের আর্থ-নীতিক স্দবিধা পাওয়া যায় যা একক চাষে পাওয়া যায় না। নিচে সংক্ষেপে তার তালিকা দেওয়া হ'লঃ

(১) বিভিন্ন নতুন নতুন কাজের সংস্থান করে ও চাষের আনুষঙ্গিক শিল্প যেমন চাল তৈরি, আখ-মাড়াই ও গুড় তৈরি, তেল-পেষা ইত্যাদি, গড়ে তুলে বাড়তি ও রেকার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

(২) সমবায় কৃষি সমিতি গ্রামীণ উন্নতির নানাবিধ কাজ যেমন রাস্তাঘাট তৈরি, জনস্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি হাতে নিয়ে বছরের গোটা সময় শ্রমশক্তির পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৩) শ্রমশক্তির স্দর্ভ বণ্টন এবং কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে দক্ষ কর্মী তৈরি করা যায়।

(৪) বেশি মাত্রায় উৎপাদনে সময়সংক্ষেপের ও ব্যয়সংক্ষেপের যেসব স্দবিধা আছে সেগুলি এখানেও পুরোপুরি পাওয়া যায়।

(৫) উন্নত ধরনের লাগুল টানার প্রয়োজনে উন্নত শ্রেণীর হালের বলদের প্রজনন-ব্যবস্থা করা যায়।

(৬) যথোপযুক্ত সার, ভাল জাতের বীজ, উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও সেচের ব্যবস্থা করা যায়। ক্ষেতের ফসলে পোকাকার আক্রমণ যথাযথ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা সমবায় চাষেই সম্ভবপর।

(৭) জোতজমির চারপাশে বেড়া দেবার ব্যবস্থার ব্যয়সংক্ষেপ একমাত্র সমবায় চাষেই করা যায়।

(৮) আল নিয়ে বা সরকারী সেচের খালের জল কে আগে নেবে এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার অনর্থক খরচ বেঁচে যায়।

(৯) কৃষির বিভিন্ন সময়ের ও পর্যায়ের কাজে যথোপযুক্ত শ্রমশক্তি নিয়োগের ব্যাপারে সময়ের মিতব্যয়িতা হয়।

(১০) নিম্নম প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে একটি উন্নত পর্যায়ের পল্লীসমাজ গঠন করা যায়।

কীভাবে সমিতি গঠন করতে হয়

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় কৃষি-সমিতি রেজিস্ট্রি হয় ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইনের বিধান অনুসারে। এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনও ফি দিতে হয় না। ন্যূনতম সংখ্যায় সাতজন রায়ত বা কৃষক মিলে সমিতি রেজিস্ট্রির জন্য আবেদন করতে পারে। প্রত্যেক জেলায় সমবায় সমিতির অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের অফিস আছে। একমাত্র হুগলি ও জলপাইগুড়ি জেলার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। হুগলির অফিস হাওড়ায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার কাজ দার্জিলিংয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেখা-শোনা করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে প্রয়োজনীয় উপবিধি ('বাই-ল') এবং ফরম মজুত আছে। এই ফরম এবং উপবিধিও বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং তা পূরণ করে উক্ত অফিসে দাখিল করতে হয়। প্রয়োজনীয় সরকারী তদন্তের পরে উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে সমিতি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়। কাজের স্দবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের সংশ্লিষ্ট একজন করে সমবায় কৃষি সমিতির পরিদর্শক আছেন। তা ছাড়া স্থানীয় সমবায় সমিতির পরিদর্শকও আছেন। সমবায় কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে এঁদের সঙ্গে যোগাস্থাপন করা বিধেয়।

সাহায্য ও স্দবিধা

সমবায় কৃষি-সমিতিগুলিকে সরকারী ও আধা-সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাষের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, অথচ আমাদের চাষীদের মধ্যে এই মূলধনের অভাব

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

অত্যন্ত বেশি। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করতে না পারলে উৎপাদন বাড়বে কী করে? নিচের তালিকায় সরকারী ও আধা-সরকারী সাহায্যের তালিকা দেওয়া হ'ল:

(১) ম্যানেজারের বেতন বা চাকির যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নির্বাচিত সমিতিতে বার্ষিক সরকারী খরচায় ৫০০ টাকা।

(২) ভারি যন্ত্রপাতি বা পাম্পিং সেট কেনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ও অল্প সূদে নির্বাচিত সমিতি-পিছদ সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা সরকারী ঋণ।

(৩) সরকারী খরচে সমিতির ম্যানেজারের সমবায় ও কৃষিবিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা।

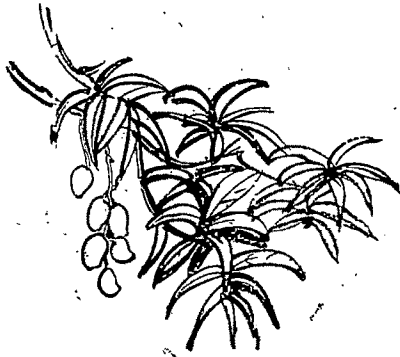
(৪) বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞের উপদেশ।

(৫) ছোটখাট সেচব্যবস্থা বিষয়ে অগ্রাধিকার।

(৬) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ।

(৭) কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী সমবায় ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

(৮) সরকারী খাতে এবং স্বকীয় গুদাম নির্মাণের জন্য খরচায় ও ঋণ মিলিয়ে নির্বাচিত সমিতি-পিছদ ১০,০০০ টাকা দান ও দানের বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং আশা করা যায় চলতি বছরেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।



আলুচাষের জারিগান

মহম্মদ গোলাম আকবর

আখালি পাখালি বন্দন,
বন্দন সাগর বন।
কুড়ালির ধারে বান্ধে
কাঠুরিয়ার মন॥
চক্ষে জাগে ব্যাঘ্র সর্প
ভল্লুরকের ভয়।
বৃক্ষ ভেঙে পৃষ্ঠে পড়ে
প্রাণের সংশয়॥
হস্তপদ উপলক্ষ
কাজ করে মন।
কার্ষগন্ধে বৃদ্ধি বাড়ে
হয় মহাজন॥
কাননেতে কাজ করে তার
শহর যোগায় বানি।
ধীবরের কর্মক্ষেত্র
সাগরের পানি॥
আরে ও
(সমবায় প্রথা আদিষুগেও ছিল)
দেব-দৈত্য করল দেখ
সমুদ্র মন্থন।
উঠাল ঐরাবত লক্ষ্মী
সুধা মহাধন॥
মহাশ্রমের মহাফল
পাইল মহাদলে।
পদ্মঃ মহালক্ষ্মী ওঠে
জনকের হলে॥
কুরূক্ষেত্র পুণ্যময়
কুরূ রাজার হালে।
পৃথিবী-পালন চোখা
লাঙলের ফালে॥
শস্যরূপে লক্ষ্মী ভবে
আজও ওঠে হালে।

খাদ্যরূপে বেঁটে যায়
আজও সবার থালে॥
স্বাধীন পতাকাতলে
জাগ ভারতবাসী।
জাগ রে নতুন তেজে
সারা দেশের চাষী॥
তরুণদলে সাবাস বলে
দাও তরুণের সারি।
মন দিয়ে শোন সবে
আলু চাষের জারি॥
দেশব্যাপী সবে এই
চাষ ক'রে যাই।
এহেন সুন্দর চাষ
বসুন্ধরায় নাই॥
খাদ্য অর্থ দুটোই এই
আলুর চাষে পাই।
নিজে খেয়ে বাঁচি
আর সবারে বাঁচাই॥
আরও রাখে জমি তেজা
দুই-তিন সন।
এহেন আলুর চাষ
শুন দিয়া মন॥
ধরতা
দে রে দে—মা গো আমায়
অন্তিম সেই আঁচলা ঝোলা।
নে রে নে—সব কেড়ে নে—
সার কারি তো গাছের তলা—
গাছের তলা॥
ধান কাট, পাট কাট, চাষা
ভান্ডারের শেষা।
দু'চারখানা চাষ দাও
থাকিতে বরষা॥

যত পার চাষ দাও
সারা আশ্বিন ধরে।
সুপারফসফেট দাও বিষায়
এক মণ করে॥
কার্তিকে ছড়াও ভুয়ে
পচা পাকমাটি।
দেওয়াল-ভাঙা মাটি দিলে
আরও হয় খাঁটি॥
অথবা আশ্বিনে ভুই
দুই কোপ উলটাইয়া।
হাল-মইয়ে নিও মাটি
সমান করিয়া॥
টিল গুঁড়ো কর হেন
যেন বালুকণা।
ধুলা ধুলা করে ফেল
ধুলা দিবে সোনা॥
জান তো গাছেরা খাদ্য
শিকড় দিয়া খায়।
যদ্যপি আলুর ক্ষেতে
টিল থেকে যায়॥
পাশাপাশি টিল থাকে,
থাকে ফাঁক চোড়া।
সরু শিকড় চলে নাকো,
গাছে হয় না জোর॥
তুলার সমান আলুর শিকড়
দুর্বল ততোধিক।
টিল গুঁড়ো কর হেন
বালুকণা ঠিক॥
শিকড় চালাতে গাছে
পাইবে প্রয়াস।
আলুর ক্ষেতে হবে তোমার
মানিকের উন্মাদস॥
বহু শ্রেণীর আলুর জাত
দেশে চালু আছে।
সর্বশ্রেণী হার মানে
দার্জিলিঙের কাছে॥

কার্তিক থাকিতে কর
আলু রোয়া যায়।
অল্পানে আলুর চাষ
নাবি বলা যায়॥
বর্ষের ভাব বদলে
চাষ করে যাই।
নাবি কি আগুতি হয়
ভাবিবার নাই॥
সরু কিংবা মোটা বীজ
তত ভাল নয়।
সরু বীজ রুদে পরে
রোগা চারা হয়॥
মোটা বীজে পচার ভয়
বোঁশ ফালি দিলে।
মাঝারি বীজ অতি ভাল
দু'ফালি করিলে॥
না পচে না পড়ে থোপ
থাকে নাকো সম্ব।
আলুর ক্ষেতে চারা দেখে
আহা কি আনন্দ॥

ধরতা

কোলে তোর নাতিপুত্র—
গলে হার গজমোতি—
মোরা তোর বাউল গাঁথ,
মা—মা গো—
মাখি তোর পায়ের ধূলা॥
বিধাপ্রতি ছয় মণ
খইল লাগে আরও।
পুঁজি ভেদে সুপারফসফেট
এক মণ দিতে পার॥
আগে মাত্র তিন মণ
খইলগুঁড়ো দিবে।
সুতো ধরে সে আন্দাজে
খইল ছড়াইবে॥

স্নাতো তুলে পদনরায়
কোদালে কোপাবে।
মাটি ও খইলের গন্ধুড়ো
দুয়ে মিশে যাবে॥
দু'-তিন ইঞ্চির বেশি
পোত নাহি দিবে।
নয় ইঞ্চি অন্তরে
এক গোটা রোবে॥
রোয়ার কালে লাইন যেন
না বাঁকে না চোরে।
বীজের তলে ফাঁক না থাকে
নাহি ছোপে জোরে॥
মরা পচা খোপ পড়ার ভয়
দূর হল ভাই।
রোয়ার সাথে হাতে মাটি
দেওয়া কিছু চাই॥
মটকার মত মাটির ছাউনি
লাইনেতে রয়।
তার নিচে রয় না মাটি
এটে যাওয়ার ভয়॥
লাইনের অন্তর ইঞ্চি
আঠারো কি ষোল।
চার মণ খইলে আলু
রোয়া সাঙ্গ হল॥
রোয়া শেষের পরদিনে খইল
তিন মণ ছড়াও।
কোদাল চালিয়ে অল্প
পিলি টেনে দাও।
অল্পমাত্রায় জল দাও
দশ-বার দিন পর।
সস্তা গেলে পূর্ণ সেচ
দিও তৎপর॥
বেশি জল সেচে যদি
পিলি ডুবে যায়।
সাড়ে সর্বনাশ চাষা
মনে তাপ পায়॥

মাটি আঁটে গাছের ক্ষতি
আলু হয় নষ্ট।
অতি সেচে হীন বৃদ্ধি
চাষা পায় কষ্ট॥
গাছ লম্বা হলে পরে
পিলি টান ফের।
জো হইলে পুনঃ সেচ
করিও না দের॥
প্রয়োজনবোধে পিলি
দুইবার বান্ধিয়া।
পিলি গতে সালফেট-অ্যামোন
দিবে ছড়াইয়া॥
বিষা ভুঁয়ে এক মণ হলে
হইল যথেষ্ট।
হুঁশিয়ার! গাছে লাগে
হইবে অনিষ্ট॥
জো হইলে পুনঃপুনঃ
সেচ দিলে যাবে।
পাঁচ সেচা হলে পূর্ণ
আলু পূর্ণ পাবে॥
উই ই'দুর দমন হয়
সেচনের কাছে।
সুয়ে লাগে পচন ধরে
আলু তোল পাছে॥
ভুঁয়ে পোকা লাগে যাবে
সরকারের ঠাই।
আজ আসরে আলুর চাষ
সাঙ্গ করে যাই॥
গাছ মরে আলু তোল
যুক্তি ভাল ঠিক।
বালু দিয়ে আলু রাখ
ভাই প্রাণাধিক॥
পচা কাটা দাগী আলু
আগে নিবে বেছে।
ঠান্ডা ঘরে ক্ষতির হাত
ঠিক যাবে বেঁচে॥

খরতা

ঘরে রইতে নারি রে

ঘরে রইতে নারি।

(কেনে) হাতের কঙ্কন দেখাইলি

চান্দে'র ঝিলিক মারি রে—

চান্দে'র ঝিলিক মারি।

খাদ্য মোদের দেশের শক্তি

খাদ্য মোদের প্রাণ।

খাদ্যে জাগায় তপ-জপ আর

ধর্ম-প্রতিষ্ঠান॥

খাদ্যে জাগায় স্কুল-কলেজ

আফিস-আদালত।

খাদ্যে দেশের বাঁধ বাঁধে

পাহাড় কেটে পথ॥

খাদ্যে চলে বিমানপোত

জাহাজ চলে জলে।

খাদ্যে বিনে সোনার হার

ভার লাগে ভাই গলে।

মাটির মায়ে'র বৃকে এত—

খাদ্য আছে ভাই।

খেতে দেশের ভাইবোনদের

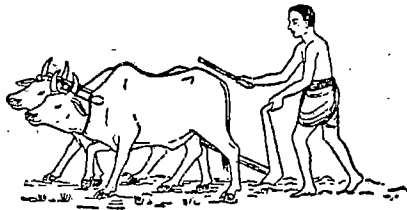
শক্তি অত নাই॥

সেই খাদ্য বাড়াতে ভাই

চেষ্টা কর ভারি।

গোলাম আকবর বলে, সাঙ্গ

আলুচাষের জারি॥



সয়াবিনের বিবিধ ব্যবহার

সয়াবিন মানুষের স্নাত্যাদ্য, ভাল পশুখাদ্য, চমৎকার সবুজসার, শিল্পোৎপাদনে বড় সহায়ক এবং রোগ-নিরাময়ক্ষম অনেক পদার্থ এতে রয়েছে। তা হ'লে, আমাদের দেশে সয়াবিনের চাষ কেন করা হয় না?

খাদ্য-বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, সয়াবিন আমাদের নিয়মিত খাদ্যের একটা অংশ হওয়া উচিত, কারণ উৎকৃষ্ট ভিটামিন, খনিজ লবণ ও প্রোটিনের একটা বড় উৎস হল সয়াবিন। এইজন্যই বোম্বাই-সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই রাজ্যের সমস্ত কৃষি-বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বড় বড় কৃষিপ্রতিষ্ঠানের শাস-ক্ষেত্রগুলিতে সয়াবিনের চাষ করতে হবে। এই আদর্শ অনুসারে অমরাবতীর বিখ্যাত রাজেন্দ্র বিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় দ্বারা উদ্ভাবিত ও বহু প্রতিষ্ঠাপন পল্লীপ্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট। এই পরীক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ হয়েছিল এবং তার ফলে চতুষ্পাশ্বস্থ অঞ্চলগুলির কৃষকদের মনে এই নতুন ফসল সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়।

নতুন বোম্বাই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রচনা করেছে সাতপুরা গিরিমালা। এই সাতপুরা গিরি-মালার দক্ষিণে বিদর্ভের অন্তর্গত পূর্ণা উপত্যকায় হাজার হাজার একর অতিশয় উর্বর জমি রয়েছে। বালুকা-মিশ্রিত মাটি থেকে শুরুর ক'রে মাঝারি ধরনের কালোমাটি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মাটি রয়েছে এখানে এবং এই মাটিতে যেসমস্ত উপকরণ রয়েছে তার গড়পড়তা হার নিম্নরূপঃ কাদা ৪০-২৫ শতাংশ, জৈব পদার্থ ২১-৫০ শতাংশ, উৎকৃষ্ট বালি ২৪-৪০ শতাংশ, মোটা মাটি ৪-১১ শতাংশ, অগার-পদার্থ ৬-৩৬ শতাংশ এবং জল ৩ শতাংশ।

এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার গড়পড়তা ৩২-৪২ ইঞ্চি এবং আবহাওয়া বেশ শুষ্ক—সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং শীতলতার পরিমাণ যথাক্রমে

৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ও ১১৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বিদর্ভে প্রধান ফসল উৎপন্ন হয় তুলা, জোয়ার, চীনা-বাদাম, গম, ছোলা এবং লঙ্কা।

উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় সয়াবিনের ফসল বেশ ভাল জন্মায়। রাজেন্দ্র উদ্যানে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, বালুকা-মিশ্রিত মাটি থেকে শুরুর ক'রে মাঝারি ধরনের কালো মাটিতে পর্যন্ত সয়াবিন ভাল জন্মায়। সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া গিয়েছিল অবশ্য দোআঁশ মাটিতে।

সয়াবিন হল চীন, কোরিয়া, জাপান এবং মাণ্ডুরিয়া থেকে আগত। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশেও সয়াবিনের ব্যাপক চাষ হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে সয়াবিন চাষের প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল গুদা, করাচি, কোয়েম্বাটুর, পুণা, বারদোলি, হোচ এবং বরোদায়। দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে সয়াবিনের কোন বাজার গড়ে ওঠে নি। তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের কৃষকেরা এবং জনসাধারণ সয়াবিনের মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

প্রকারভেদ

এ পর্যন্ত প্রায় ১,৫০০ প্রকারের সয়াবিনের কথা জানতে পারা গিয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের সয়াবিনের মধ্যে কতকগুলি দেখতে অবিকল কলাই বা মটরের মত সেগুলির রঙ হলদে, ধূসর অথবা কালো। এগুলির মধ্যে রয়েছে ২০ শতাংশ তৈলপদার্থ। এই ফসলের গাছগুলি বলিষ্ঠ, সোজা এবং ঘনপাতার আচ্ছন্ন। এগুলির ফল হয় সাদা থেকে বেগুন রঙের। পরিণত অবস্থায় গাছগুলির শব্দটি হয় দেড়-ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা, তার মধ্যে তিনটা থেকে পাঁচটা ক'রে দানা থাকে। হলদে সয়াবিনের খাদ্যমূল্য খুব বেশি এবং তার ব্যবসায়িক গুরুত্ব বেশি বলে লোকে এগুলি বেশি পছন্দ করে।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

সয়াবিনের দাম অপেক্ষাকৃত কম এবং স্বল্পতম খরচে এ থেকে সর্বাধিক পরিমাণে খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। উপরে যেসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেসব দেশের বিজ্ঞানীরা, কৃষকেরা, দুগ্ধবানসায়ীরা শিল্পপতিরা ও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা সয়াবিনের গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করেছেন।

উর্বরতার সহায়ক

নাইট্রোজেন-শোষক ফসল দীর্ঘকাল ধরে ফলাবার ফলে যে জমির উর্বরশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই জমিতে সয়াবিন বুনলে দিলে জমির উন্নতি সাধিত হ'তে দেখা গিয়েছে। কারণ, এর শিকড়ের গোছাতে যে বিশেষ জীবাণু জন্মায় তারা জমিতে নাইট্রোজেন ছাড়িয়ে দিয়ে জমিকে উর্বর করে তোলে। পশুর খাদ্য হিসাবেও সয়াবিন সমভাবে উপকারী, যদিও এর কাঁচা ফসলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম—প্রতি একর জমিতে প্রায় ১০,০০০ পাউন্ড থেকে ১২,০০০ পাউন্ড। বলদ, দুগ্ধবতী গাভী, ও মহিষের পক্ষে সয়াবিন খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। সয়াবিন থেকে তেল বের করে নেবার পরে যে খইল ও গুঁড়ো অবশিষ্ট থাকে তা গবাদি পশুর খুব চমৎকার খাদ্য। সার হিসাবে খইল খুবই মূল্যবান কারণ এব মধ্যে রয়েছে ৬:৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ১:৫ শতাংশ ফসফরাস পেন্টকসাইড এবং ২ শতাংশ পটাশ।

সয়াবিনের তেল

সয়াবিনের তেলের রঙ ফিকে হলদে, বেথতে অনেকটা ঠিক তুলোবীজের তেলের মত। এর কোন স্বাদও নেই, গন্ধও নেই। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ'ল ০:৯১। শুকরের চর্বি সংক্রান্ত শিল্প ও ঘি তৈরির কাজে সয়াবিন তৈল একটি অতিশয় মূল্যবান পদার্থ—এ ছাড়া আরও কতগুলি অত্যাবশ্যক জিনিস তৈরি করতে এর প্রয়োজন হয়, যেমন, রঙ, বার্নিশ, ঘরের মেঝেতে বিছাবার এক রকম কাপড়, কাগজের ছাতা, ছাপার কালি, সেলুলয়েড ইত্যাদি। জলপাইর তেলের এটা শ্রেষ্ঠ বিকল্প এবং যন্ত্রপাতি স্ফুট

(লব্রিকেটিং) করার কাজে এ তেল বেশ সুবিধাজনক। সয়াবিনের তেল যদি সাবান তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় তা হ'লে উপজাত দ্রব্য হিসাবে ১০ শতাংশ গ্লিসারিন পাওয়া যায়। এই গ্লিসারিন বাষ্পদ্রাঘন দ্বারা আবার বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি হয়। সয়াবিনের তেল থেকে কিছু পরিমাণে কৃত্রিম রবার পাওয়া যায়—জাপানে এই কৃত্রিম রবার দিয়ে খেলনা, টায়ার এবং জুতো তৈরি হয়।

খাদ্য হিসাবে সয়াবিন

সয়াবিনে শৈবতসার নগণ্য পরিমাণে আছে ব'লেই বহু মূত্র-রোগীদের এ জিনিস খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে বলা হয়। এর মধ্যে খুব বেশি দ্রবণীয় ফসফেট, পটাসিয়াম ও গন্ধক আছে এবং স্নায়ুরোগ, অস্থি-বিকৃতি রোগ ও রক্তশূন্যতা রোগ আরোগ্য করার কাজে এটা খুবই কার্যকর। ডাঃ রুরা ১৯১০ সালে লক্ষ্য করেন যে, তিন পোয়া জলে এক বা দুই চামচে সয়াবিনের ময়দা মিশিয়ে গ্রীষ্মকালীন পেটের অসুখ ও অন্যান্য আন্ত্রিক গোলযোগ নিরাময় করা যায়।

নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় সয়াবিনের খাদ্যমূল্য অনেক উন্নত ধরনেরও বলা যায়—

খাদ্যশস্য	প্রোটিন	শর্করা	চর্বি	লবণ	তাপ
	শতাংশ	শতাংশ	শতাংশ	শতাংশ	মূল্য
সয়াবিন	৪০.০	২৪.৬	২০.৩	৪.৮	২,১০০
মটর	২৪.০	৬০.০	১.৫	৩.০	১,৭০০
চীনাবাদাম	২৪.০	২২.০	৪৫.০	২.০	২,৪৫০
ছোলা	১৯.০	৫৪.০	৪.৩	২.৮	১,৫৩০
গম	১২.০	৭৩.৭	১.৭	১.৫	১,৭৫০
বাজরা	১০.০	৭৪.২	৫.০	২.০	১,৭৫০
জোয়ার	৮.৯	৭১.০	৩.১	২.৫	১,৭৫০
মাংস	২৪.০	...	২.৫	১.৫	৫৭৬
ডিম	১৪.৮	...	১০.৫	১.০	৭২০

প্রোটিনের ভাগটা সয়াবিনে সর্বাধিক পরিমাণে রয়েছে যার জৈব মূল্য খুব বেশি এবং মাংস ও

ডিমের মধ্যে যে প্রোটিন রয়েছে তারই মত উপকারী। মাছ, মাংস, এবং ডিমে যে প্রোটিন রয়েছে তা অম্ল-কারক, কিন্তু সয়াবিনে যে প্রোটিন আছে তাতে প্রধানত রয়েছে গ্লিসারিন ও গ্লোবিউল জাতীয় পদার্থ—এই জিনিসগুলির গুণ বিশেষভাবে ক্ষার-ধর্মী। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়েছে যে, চর্বি-দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ ‘ক’ (বর্ধিস্থতা-বর্ধক) এবং খাদ্যপ্রাণ ‘খ’ (বাল্যস্থিতিবৃদ্ধি রোগের প্রতি-ষেধক) তথা জলে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ ‘খ’ (স্নায়বিক রোগ প্রতিষেধক) স্বারাও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এইসমস্ত কারণেই সয়াবিনের তেল খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

সয়াবিনের দুগ্ধও উপাদেয় খাদ্য। ৬ থেকে ৮ ভাগ টাটকা গরম জলের সঙ্গে যদি এক ভাগ সয়া-বিনের গুঁড়ো একটু একটু করে মেশানো হয় (মেশাবার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত নাড়তে হবে) তবে যে মিশ্রিত দ্রব্যটির সৃষ্টি হবে তাকেই বলা হয় ‘সয়াবিনের দুগ্ধ’। এই দুগ্ধ থেকে জমাট-দুগ্ধও তৈরি করা যেতে পারে। ভারতে স্বাভাবিক দুগ্ধের উৎপাদন অত্যন্ত কম, সেইজন্য এরকম কৃত্রিম দুগ্ধ ব্যবহার করবার বিরাট সদ্ব্যোগ আমাদের রয়েছে।

সয়াবিনের চাষ

অমরাবতীতে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তার ফলে জানা গিয়েছে যে, যে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফরিক অ্যাসিড, ক্ষার ও চুন আছে সেই মাটিতে সয়াবিন সবচেয়ে ভাল ফলানো যেতে পারে। মে মাসের মাঝামাঝি জমি চষে পর পর তিনবার মই দিতে হবে। দ্বিতীয়বার মই দেবার আগে গোরুর গাড়ির ১০-১৫ গাড়ি বোঝাই খামারের যথেষ্ট পচা

আবজনা সার জমিতে দিতে হবে। প্রথম বৃষ্টি-পাতের সঙ্গেসঙ্গেই জমিতে আবার হালকাভাবে মই দিতে হবে এবং কাঠের তক্তা দিয়ে জমিকে এমন-ভাবে সমান করে দিতে হবে যাতে মাটির ঢেলাগুলি খুব আলগা ও গুঁড়ো হয়ে যায়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশী বীজবোনা যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করতে হবে—প্রত্যেক দুই সারির মাঝখানে ২ ফুট করে ফাঁক রাখতে হবে এবং প্রত্যেক সারিতে একটা গাছ থেকে ৩-৪ ইঞ্চি তফাতে আর-একটা গাছ করতে হবে। এক একর জমিতে বপন করার জন্য ২০ পাউন্ড বীজ দরকার হয়। ফসল যদি সবুজসার করার উদ্দেশ্যে অথবা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য হয়, তবে এক একর জমিতে ৪০ থেকে ৬০ পাউন্ড হারে বীজ বপন করা যেতে পারে। বীজ বপন করার গতের গভীরতা কোন-ক্রমেই ২ ইঞ্চির বেশি হওয়া উচিত নয়।

চারাগুলি যখন ৩-৪ ইঞ্চি বড় হবে অর্থাৎ বীজ বপন করার ১৫ দিন পরে প্রথমবার নিড়েন দেওয়া দরকার। ‘সালফেট অব অ্যামোনিয়া’ অথবা ‘ফসফেট অব অ্যামোনিয়া’ এই সময়ে প্রয়োগ করলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়াবে। দশ দিন পরে-পরে আরও দু’বার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে গাছের গোড়ার মাটি উঁচু করে দিতে হবে।

বীজ বপন করার দুই মাস পরে গাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে এবং ফুল ফুটতে শুরুর হবার ১৮-২০ দিন পরে গাছে শর্দূটি ধরতে আরম্ভ করবে। বীজ বপন করার চার মাস পরে শর্দূটিগুলি পাকতে শুরুর করে এবং শর্দূটি পাকার কাজ এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে।

সয়াবিনের স্বাভাবিক ফলন এক একর জমিতে ৮০০ থেকে ৯০০ পাউন্ড।*

*১৯৫৯, অগাস্ট সংখ্যা ‘ফার্মার’এ প্রকাশিত শ্রী এ জি ভাদেব প্রবন্ধ থেকে

সার দিলে গমের চাষ

লাভ হয় ভাল

পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের চাষীরা যদি গমের চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন, তা হলে নিশ্চয়ই ভাল ফলন পেতে পারেন। গুরুগাঁও সরকারী গবেষণাকেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রাসায়নিক সার দিলে প্রতি একর জমির গমের চাষে নীট ১৪৬ টাকা লাভ করা যায়।

এই এলাকায় প্রায় দশ লাখ একরেরও বেশি জমিতে গমের চাষ করা হয়। এখানকার মাটির বেশির ভাগই বেলে আর নীরস। এ মাটিতে রাসায়নিক সার দিলে সফল পাওয়া যায়। কৃষি জলবায়ু ও মাটির দিক দিয়ে গুরুগাঁও কেন্দ্র এই এলাকার প্রতিনিধি-স্থানীয়। এখানে 'সি-২৮১' জাতের গম নিয়ে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

অ্যামোনিয়াম সালফেট মারফত নাইট্রোজেন ১০, ২৫ এবং ৫০ পাউন্ড—এই তিন রকম মাত্রার অন্য কিছুই সঙ্গে না মিশিয়ে এবং বিভিন্ন মাত্রার ফসফরাস আর সুপারফসফেটের সঙ্গে মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

দেখা গেছে যে, একরপিছদু শব্দ ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলে অথবা সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন ফসফরাসের সঙ্গে প্রয়োগ করলে যে চমৎকার ফলন পাওয়া যায়, আর কোন উপায়েই তা পাওয়া যায় না। ২৫ পাউন্ড ফসফরাসের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিয়ে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে

(একরপিছদু প্রায় ২৮ মণ)। তারপরেই সবচেয়ে বেশি (প্রায় ২৭ মণ) ফলন পাওয়া গিয়েছে একরপিছদু জমিতে শব্দ ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিয়ে। ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেনের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড ফসফরাস দিয়ে ফলন পাওয়া গিয়েছে একরপিছদু ২৬ মণ।

শব্দ সুপারফসফেট দেওয়ায় ফলন কতকটা কমে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন কি নাইট্রোজেনী সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াতেও ফলন তেমন বাড়ে নি।

কম খরচের দিক থেকে, অ্যামোনিয়াম সালফেটের মারফত একরপিছদু জমিতে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলেই লাভ হয় সবচেয়ে বেশি—প্রায় ১৪৬ টাকা। খরচের দিক থেকে তারপরে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল ২৫ পাউন্ড সুপারফসফেটের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দেওয়া ; এতে একরপিছদু নীট লাভ থাকে প্রায় ১৪০ টাকা। ৫০ পাউন্ড ফসফরাসের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলে একরপিছদু লাভ থাকে প্রায় ১০০ টাকা। গমের দর ধরা হয়েছিল প্রতিমণ ২০ টাকা হারে।

গমের চাষে রাসায়নিক সার দিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ করতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের চাষীরা একরপিছদু ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিতে পারেন। যদি তার সঙ্গে ফসফরাস দিতে হয় তবে ২৫ পাউন্ড সুপারফসফেট দিলেই চলে। [১৯৫৯, অগাস্ট সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফার্মিংএ প্রকাশিত শ্রীগুরুচরণ সিংএর প্রবন্ধ থেকে]

গোবৎসের যত্ন মহম্মদ মজহর আলি

আমি একজন পল্লীচাষী। চিরদিন পল্লীগ্রামে বাস করিয়া চাষ-আবাদ ও গোপালন করিয়া আসিতেছি। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, প্রত্যেক চাষীর গৃহে দুগ্ধ ও দধির প্রাচুর্য ছিল এবং অতিথি-অভ্যাগত আসিলে অন্যান্য খাদ্যের সহিত দুগ্ধ ও দধি দ্বারা আপ্যায়ন করা হইত। এখন দেখিতেছি পল্লীর প্রায় গৃহেই দুগ্ধের নামগন্ধ নাই। গাভীর দুগ্ধের পরিবর্তে বিদেশ হইতে আগত গন্ধুড়া দুগ্ধের প্রচলন হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুগ্ধের অভাবে বাজে জিনিস খাইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া কতক মারা পড়িতেছে, কতক অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। কী কী কারণে এই সমস্যার উদ্ভব হইল এবং তাহার প্রতিকারের জন্য, আমাদের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে, এখানে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গোচারণ ভূমির অভাব, গোরুর খাদ্যের অভাব, গোরুর সংখ্যাবৃদ্ধি-জনিত গো-খাদ্যের দুর্মূল্যতা ইত্যাদি কারণে গোরুগুলিকে আমরা উপযুক্ত সুষম খাদ্য দিতে পারিতেছি না, তাই দিন দিন গোরুগুলি অবনতির পথে যাইতেছে। ইহা সত্য হইলেও আমার মনে হয়, আমাদের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবের দরুন গোজাতির প্রতি দারুণ অবহেলা ইহার প্রধান কারণ। গাভীর যখন গর্ভধারণের সময় হয়, আমরা তখন আদৌ তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করি না। অকেজো দুর্বল বাজে ষাঁড় দিয়া কোনও প্রকারে পাল ধরাইয়া দিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করি।

গাভীর খাওয়ার বা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আর লক্ষ্য করি না। অকেজো দুর্বল ষাঁড়ের দুর্বল বাছুর হয়। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কী এবং বাছুরের জন্য কী পরিমাণ দুগ্ধ দরকার তাহা চিন্তা না করিয়া তাহার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত আশ্রয় করি। ফলে দুর্বল বাছুর দুগ্ধাভাবে আরও দুর্বল

হইয়া মারা পড়ে। অসুখ হইলে গ্রামের ওঝা ডাকিয়া আনিয়া ঝাড়ফুক করিয়া লই। যে ঐংড়ে ও বকনা-গদলি এই অবস্থার ভিতর বাঁচিয়া থাকে তাহাদের নিকট ভবিষ্যতে কতটা কাজ এবং দুগ্ধ আমরা আশা করিতে পারি?

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যসূচিতে আমাদের জাতীয় সরকার গোজাতির উন্নতির জন্য বহুরকমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে হরিয়ানা ষাঁড় দিয়া, তাহাদের লালনপালনের ব্যবস্থা করিয়া এবং স্থানে স্থানে কৃষি গো-প্রজননকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেইগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। আমরা কিন্তু পূর্ববৎ উদাসীন রহিয়াছি।

সুষ্ঠু জ্ঞানের সাহায্যে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদের দুগ্ধাভাব দূর করিয়া সবল ও সুস্থ বলদ ও গাভী পাইয়া পল্লীর পূর্ব অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারি নিচে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমত গোজাতির উন্নতির জন্য উন্নত জাতের বলিষ্ঠ ষাঁড় দরকার। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমাদিগকে মহাসদুযোগ আনিয়া দিয়াছে। উন্নত ও বলিষ্ঠ হরিয়ানা জাতের ষাঁড় সংগ্রহ করা একদিন পল্লীচাষীর পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত জাতের ষাঁড় আমরা হাতের কাছে পাইতেছি। কাজেই গাভীকে উন্নত হরিয়ানা ষাঁড় দিয়া কিংবা নিকটস্থ কৃষি-প্রজননকেন্দ্রে লইয়া গিয়া পাল ধরাইয়া আনিতে হইবে।

তারপর গাভীকে তাহার শরীরের পদ্ধতির জন্য এবং গর্ভস্থ বাছুরের বৃদ্ধি ও পদ্ধতির জন্য প্রচুর কাঁচা ঘাস খাইতে দিতে হইবে। উক্ত কাঁচা ঘাসের জন্য চাষীকে সবজি-ফসলের ফাঁকতালে জোয়ার,

কালোকলাই, বরবটি, সয়াবিন, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ বিভিন্ন জমিতে পর্যায়ক্রমে করিয়া যাইতে হইবে। গর্ভাবস্থায় গাভী ভাল খাইতে পাইলে বাছুর বেশ মোটাসোটা ও সবল হয়।

গাভীর বাছুর হইবার এক মাস পূর্বে হইতে তাহাকে পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। বাছুর প্রসব হইলে চত্বিশ ঘণ্টায় গাভীর দুধ কী পরিমাণ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার জন্য সুন্দর ও সহজ একটি উপায় আছে। সন্ধ্যার সময় বাছুর গাভী হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং সকাল বেলায় দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে। তৎপরে তখনই আবার বাছুর গাভী হইতে পৃথক করিতে হইবে এবং সকালবেলায় দোহন করা দুগ্ধ বাছুরকে তিন-চারবার খাওয়াইতে হইবে। সন্ধ্যার সময় পুনরায় গাভী দোহন করিতে হইবে। এই দুই দফার মোট যে পরিমাণ দুধ হইবে উহাই চত্বিশ ঘণ্টার মোট দুধের পরিমাণ। চত্বিশ ঘণ্টার মোট দুধ হইতে কমপক্ষে দুই সের বাছুরের জন্য রাখিয়া প্রত্যেক দিন সকালে দোহন করিয়া লইতে হইবে। দুগ্ধের অভাবে বাছুর শিশুকালে দুর্বল হইয়া গেলে সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। তারপর বয়স বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বাছুরকে লবণ দিয়া ভাতের ফেন, কাঁচ কাঁচ ঘাস খাইতে দিতে হইবে এবং একটু একটু খইলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকাল-বিকাল একটু একটু মাঠে ছাড়িতে হইবে, তাহাতে গাভীর

এবং বাছুরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তিন-চারদিন অন্তর গাভী এবং বাছুরকে স্নান করাইয়া দিতে হইবে। গায়ে গয়লা জমিলে বাছুরের শরীরে নানা প্রকারের উকুন জন্মিয়া শরীরের রক্ত শোষণ করিয়া লয় এবং তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয়।

সবচেয়ে বড় কথা, গোবৎসের অসুস্থতার সূচনামাত্র নিকটস্থ সরকারী চিকিৎসককে খবর দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৌর করিয়া সংবাদ দিলে রোগ বাড়িয়া যায় এবং তারপর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। গ্রাম্য গো-বৈদ্যদিগের প্ররোচনায় যেন আমরা না পড়ি তাহা দেখিতে হইবে। তাহারা গোচিকিৎসার নামে গো-হত্যা করিয়া বেড়াইতেছে। পশুপালনের ব্যাপারে আমাদের গ্রামসেবক-সেবিকা ভাইবোনদিগেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইয়া ইহার উপকারিতা সাধারণ অস্ত্র চাষীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

পরিশেষে আমি আমার পঞ্জীবাসী গোপালক চাষীভাইদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন জাতীয় সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এইসকল সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। গাভী এবং গোবৎসের যত্ন করিয়া উচ্চ পর্যায়ের গাভী ও বলদ লাভ করিয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কেলেঘাই পরিকল্পনার অগ্রগতি

মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর জলাগম-ক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এক পথদেশক ভূমিরক্ষা পরিকল্পনা রূপায়িত করে চলেছেন। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে চীনাবাদাম, অড়হর, জোয়ার, সবজি ও আউশ ধানের চাষ লাগানো হয়েছে। সব ফসলেরই ফলন উৎসাহজনক রকমের ভাল হয়েছে এবং বিশেষ করে আউশ ধান ফলেছে প্রচুর।

এই পরিকল্পনা অনুসারে, কেলেঘাই নদীর উভয় তীরে যাতে আর ভূমিক্ষয় হতে না পারে সেজন্য গত তিন বছর ধরে প্রায় তিন হাজার একর জমিতে সীমাসূচক বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত বেসব জমি অনাবাদী পড়ে ছিল, তার মধ্যে সীমাসূচক বাঁধ দেওয়া প্রায় দেড় হাজার একর জমি উদ্ধার করে, ১৯৫৮-৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উম্বাস্তুদের পুনর্বাসনের এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সে অনুসারে এখানে ২০০ উম্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক পরিবারকে আউশ ধান চাষের উপযোগী তিন একর এবং শিশলের আবাদের জন্য তিন একর জমি দেওয়া হবে। কেলেঘাই পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যেই ১৩৭টি পরিবারের পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ অঞ্চলে এখনও ব্যাপক আকারে সেচের সুবিধা করা সম্ভব হয় নি বলে এখানে আউশ ধান আর শিশল চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আউশ ধান তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের ফসল এবং খরর সময়েও স্বাভাবিক খন্দে এর ক্ষতির সম্ভাবনা সামান্যই। শিশল এমন এক ফসল যা অনুর্বর জমিতেও জন্মায়। কেলেঘাই অঞ্চলে ধান-চাষের এটাই প্রথম বছর। এ বছর প্রায় ৫০০ একর জমিতে আউশ ধানের চাষ করা হয়। ধানের ফলন খুবই ভাল হয়েছে—যার মধ্যে দেখা দিয়েছে এই পরিকল্পনার সাফল্যের সূচনা।

১৯৫৮-৫৯ সালে ছোট ছোট এলাকায় অন্যান্য নানা ফসলের চাষ করার চেষ্টা হয়, তার মধ্যে চীনাবাদাম, অড়হর ও জোয়ারের ফলন বেশ ভাল হয়েছে। এ বছরও পরীক্ষামূলকভাবে চীনাবাদাম, অড়হর, জোয়ার ও ভুট্টার চাষ করা হচ্ছে।

৮০০ একর জমিতে বনগঠনের কাজ চলছে। বহু কাজুবাদামের গাছও লাগানো হয়েছে। গত বছর এখানে কাজুবাদাম ফলেছে প্রায় ৫০ মণ। পুনর্বাসিত উম্বাস্তু-পরিবারগুলির গবাদি পশুর জন্য চারণভূমিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।

এ বছর গড়বেতা থানার এলাকায় কেশিয়াতে অনুদ্রুপ একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুসারে অনুদ্রুপ সীমাসূচক বাঁধ দিয়ে পাঁচ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হবে এবং ৮০০ উম্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। প্রথম বছর প্রায় ৮০০ একর জমিতে আউশ ধানের চাষ করে বেশ ভাল ফলন পাওয়া গিয়েছে।

জমির ক্ষয় বন্ধ করুন

প্রত্যেক চাষী জানেন যে, তাঁর চাষের জমির উপর-স্তরেই তাঁর সম্পদ। জমির উপর-স্তরটাই উদ্ভিদের পুষ্টি-উৎপাদনে উর্বর হয় এবং ফসল দেয়। এই স্তরটা যদি নষ্ট হয় তবে সবই গেল।

জানা সত্ত্বেও প্রতি বছরই চাষী তাঁর জমির উপর-স্তরের খানিকটা খোয়ান। খুব ধীরে এই খোয়াই চলে, তাই তিনি তা টেরও পান না। উপরের স্তর যেমন ক্ষয় হয়, তেমনি নিচের স্তরে প্রকৃতি নতুন মাটি গঠন করে ক্ষতি পূরণে দেয়।

কিন্তু কখনও কখনও, যেমন আমদের লক্ষ লক্ষ একর জমিতে হয়ে থাকে, উপর-স্তরের মাটি এত দ্রুত ক্ষয় পেয়ে যায় যে, প্রকৃতি তার সঙ্গে, তাল রেখে সেই ক্ষয় পূরণ করতে পারে না। উপর-স্তরে এক ইঞ্চি পুরু মাটি জমাতে প্রকৃতির ১০ থেকে ১০০ বছর লাগে, কিন্তু অবহেলার দরুন এই এক ইঞ্চি মাটি ক্ষয় পেতে লাগে এক থেকে দশ বছর।

উপর-স্তরের মাটি যত ক্ষয়ে যায়, জমির উর্বরতা তত নষ্ট হয় এবং যেটুকু উর্বরতা থাকে, তাতে ভাল ফসল হতে পারে না। উপর-স্তর একেবারে ক্ষয়ে গেলে জমিতে ফসলই জন্মায় না। চাষীর কর্তব্য এই ক্ষয় বন্ধ করা। উপর-স্তরের উর্বর মাটি বেশির ভাগ সময়েই ক্ষয়ে বা বেরিয়ে যায় বাতাস বা জলের দ্বারা।

বাতাস: বাতাস যখন জোরে বয়, তখন আপনার জমির উপরকার মিহি কণাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই কণাগুলোই মাটিকে ভাল ফসল দেওয়ার উপযোগী রাখে। মোটা নীরস বালির দানাগুলো উর্বর জমির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে এসব জমির উর্বরতা কমে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে ফসল জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে।

জল: বৃষ্টির ফোঁটা সবচেয়ে মাটিতে পড়ে তার উর্বর স্তরটা ধুয়ে নিয়ে যায়। জলে যখন মাটি সমানভাবে ধুয়ে যায় এবং গোটা জমির উপর থেকেই এক পর্দা মাটি বেরিয়ে যায়, তাকে বলা যায় 'পর্দা-খোয়াই'।

এই পর্দা-খোয়াই বন্ধ করার জন্য যদি আপনি কোন ব্যবস্থা না করেন, তবে সরু সরু জলের ধারা কাদামাটি নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং সারা জমির উপর আঙুল-টানা দাগের মত দাগ পড়ে যায়। একে বলা যায় 'রেখী খোয়াই'।

এ অবস্থায়ও যদি আপনি জমি বাঁচাবার চেষ্টা না করেন তা হলে এরকম কতকগুলি আঙুল-নালী, জুড়ে গিয়ে এক-একটা নালা তৈরি করে ফেলে। নালা-খোয়াই বড়ই বিপজ্জনক। এসব নালা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নিচের দিকে নেমে তো যায়ই, তা ছাড়া জমিকে টুকরো টুকরো ভাগ করে ফেলে। তার ফলে সেই জমিতে কাজ করা কঠিন হয় এবং চাষে খরচ বেশি পড়ে যায়। এরকম জমি শীঘ্রই নীরস হয়ে পড়ে এবং তাতে ফসল হয় না।

ঘাসের জমির চেয়ে ফসলী জমিতে খোয়াই ধরে সহজে। চাষের খারাপ পদ্ধতি, সেচের অভাব, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, জমি টুকরো টুকরো ভাগ করা, প্রভৃতির দরুন চাষের জমিতে খোয়াই ধরে, এবং ঘাসের জমিতে ধরে অতিরিক্ত পশুচারণ, আগুন-লাগা, যথেষ্ট ঘাস কাটা প্রভৃতির ফলে।

ক্ষয় দমনের উপায়

শুকনো এলাকায়, যেখানে বৃষ্টি খুব কম হয়, চাষের জমির সীমানা ঘিরে বাঁধ দিন। আপনার এলাকার কৃষি-আধিকারিকের কাছ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ নিন। চার থেকে ছ' বছরে একবার লাঙল দিন। সাধারণ চারবারের পরিবর্তে দু'বার নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করুন।

সব রকম চাষেই সারি-প্রথা অনুকরণ করুন। লাঙল দেওয়ার সময় লম্বালম্বি সমান্তরাল নালা করুন। বেশি ফাঁক রেখে সারিতে বীজ বুনুন। যেসব ফসলের চাষে ভূমিক্ষয় হবার সম্ভাবনা (যেমন, জোয়ার ও বাজরা), সেগুলোর সঙ্গে একান্তর সারিতে শূঁটবিগাণীয় ফসল লাগান (এসব মাটি ক্ষয় হতে দেয় না।)

ফসলে সার দিন। খামারের আবর্জনা সার ছাড়াও খইল প্রভৃতি জৈব সার এবং ফস্ফেটী রাসায়নিক সার ইত্যাদি জমিতে দিন। কোন সময়ে এবং কী পরিমাণে কোন কোন সার দেওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে আপনার এলাকার কৃষি-আধিকারিকের পরামর্শ নিন।

উপযুক্ত শস্যপর্যায় করুন। শুটিবগণীয় ফসল এবং ধান্যবগণীয় ফসলের চাষ পর্যায়ক্রমে লাগান। বাঁধের উপর, বিশেষ করে কালো মাটির জমিতে যেখানে মাটি ফেটে যায়, একান্তর সারিতে ঘাস এবং ফসল লাগান। 'ব্লু প্যানিক', 'নেপিয়ার', 'মারভেল', এবং 'প্যারা' ভাল জাতের ঘাস, এগুলো লাগাতে পারেন বাঁধের উপর। জমি যদি ফসল-চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তবে তাতে গোচারণের জন্য ঘাস লাগিয়ে দিন অথবা গাছ লাগিয়ে বন গঠন করুন।

জমিতে উদ্ভিদের আচ্ছাদন থাকলে তার মাটি সহজে ক্ষয় পেতে পারে না। গাছ, ঘোপ এবং ঘাস মাটিকে রক্ষা করে। বনভূমির ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগিয়ে দিন। গাছগুলিকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেবার জন্য সেখানে পশুচারণ বন্ধ করুন অন্তত কিছুকালের জন্য। আপনার এলাকায় যেসব গাছ ভাল বাড়ে, সেসব গাছ নির্বাচন করুন। নানা রকম গাছের চারা সংগ্রহ করে ঠিক উপযুক্ত সময়ে লাগান। মাটির খোয়াই বন্ধ করে তাকে সরস রাখার জন্য জমির চারদিক ঘিরে নালা কেটে নিন।

ভূমিক্ষয় বন্ধ করুন

খাড়াই এবং লম্বা ঢালু জমিতে স্বাভাবিকভাবে যেসব গাছগাছড়া জন্মায়, সেগুলোকে নষ্ট করবেন না অথবা জন্মাতে বাধা দেবেন না। সেসব গাছ-গাছড়া পরিষ্কার করে যদি চাষের জমি করেন তা হলে সেই জমির মাটি ভীষণভাবে ক্ষয়ে যাবে। খাড়াই জমিতে গাছ অথবা ঘাস লাগান, তা হলে মাটি ক্ষয় পাবে না। ফসলের চাষের জন্য এসব জমি পরিষ্কার করবেন না।

ঢালু জমিতে উপর-নিচ লম্বালম্বি লাঙল চালাবেন না, ওরকম লম্বালম্বি ফসলও লাগাবেন না। পাহাড়ের ঢাল ধরে নিচের দিকে জলনিকাশের খাল কেটে নেবেন না। ঢালু জমিতে যদি চাষ করতে হয় তবে ফসলের গাছ করুন ঢালের সঙ্গে সমকোণে। চাষের জমিতে ভূমিরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা করুন, তাতে জমির মাটিতে রসও ধরা থাকবে।

বনভূমিতে

গাছ কাটবার সময় যতদূর সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটুন। তাতে অথবা কাঠ নষ্ট হবে না এবং চওড়াপাতা গাছ হলে, তার কাটাগুঁড়ির চারদিক দিয়ে শাখ গজিয়ে নতুন গাছ হতে সাহায্য করবে।

বনের গাছগাছড়াতে অথবা ঘাসে আগুন লাগাবেন না। আগুন লাগালে জমি শূন্য হয়ে যায়। যে-গাছের গুঁড়ির বেড়ি অন্তত এক গজ হয় নি, সেই গাছের ডাল কাটবেন না। যদি কাটেই হয় তবে লম্বা গাছের ডাল কাটবেন, কিন্তু মূল ডাল কাটবেন না। গাছের মাথার দিকে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে, নিচের দুই-তৃতীয়াংশ থেকে ডাল কাটবেন।

ঘাসের জমিতে ও পতিত জমিতে

আপনার ঘাসের জমিতে গবাদি পশুকে অতিরিক্ত মদ্রায় ঘাস বিনাশ করতে দেবেন না। প্রচুর ঘাস না থাকলে তার মধ্যে গবাদি পশু ছেড়ে না দেওয়াই ভাল। বরং ঘাস কেটে নিয়ে, গবাদি পশুকে বেঁধে, খেতে দিন।

পতিত নীরস জমিতে শুটিবগণীয় ফসল লাগান। এ রকম জমি যদি পতিতই ফেলে রাখেন, তা হলে তার মাটি সহজেই ক্ষয়ে যাবে।

ফসল ওঠার পর জমিতে তার যে পরিত্যক্ত অংশ থেকে যায়, তাতে আগুন লাগাবেন না। লাঙল দিয়ে চাষ দিন। তাতে ওসব জিনিস পড়ে গিয়ে মাটিতে জৈব সার যোগাবে। [১৯৫৯-এর অগাস্ট সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান' ফার্মিং থেকে]

সমবায়ের প্রশংসনীয় অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির কার্যকলাপ সংক্রান্ত সর্বশেষ বিবরণীতে দেখা যায়, এ রাজ্যের মোট অধিবাসীদের ছাষ্বশ শতাংশ সমবায় আন্দোলনের আওতায় এসেছেন। উক্ত বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে, সমিতি-সমূহের সংখ্যা, সদস্যসংখ্যা, কার্যকরী মূলধন, ঋণদানের পরিমাণ এবং কার্যাবলীর দিক থেকে বিচার করলে ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরি-লক্ষিত হয়েছে।

রাজ্যে সমিতিসমূহের মোট সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮,৩৩৭ থেকে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে ১৯,০৩০ দাঁড়ায়। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে আন্দোলনের মোট সদস্যসংখ্যা এবং সাকুল্য কার্যকরী মূলধন দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪.০২ লক্ষ এবং ৩৯.২৫ কোটি টাকা। মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে ১৩.৮৮ লক্ষ ছিলেন ব্যক্তি হিসাবে সদস্য। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে সমিতিসমূহের জমা টাকার মোট পরিমাণ ছিল ২০.৮৮ কোটি টাকা ; এর মধ্যে আন্দোলনের সর্বাধিক শক্তিশালী অঙ্গ পৌর ঋণদান সমিতিগুলির অংশ ১৬.০৬ কোটি টাকা।

ঋণদানের ক্ষেত্রে বৎসরের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব-সমূহের অন্যতম হ'ল ঋণদানের পরিমাণ ১৮.৯৪ কোটি টাকা থেকে ২৫.৪৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রদত্ত ২৫.৪৩ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে মরসুমী কৃষিকার্যের জন্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ২.২৭ কোটি টাকা দেওয়া হয় ; পূর্ববর্তী বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ১.১৭ কোটি টাকা।

৪.৬০ লক্ষ সদস্য এবং ২৮৭.০৮ লক্ষ টাকা কার্যকরী মূলধন সম্বলিত ১২,৫৯১টি প্রাথমিক

কৃষিঋণ সমিতি ১৯৫৭-৫৮ সালে ২.১২ কোটি টাকা উৎপাদনীয় মূলধন যুগিয়েছে, এবং এর মধ্যে ১৬.০৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে মধ্যম-মেরাদী ঋণ হিসাবে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে ঐ সমিতিগুলি শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামে এবং কৃষি-জীবীদের প্রায় ১৭ শতাংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১২,৫৯১টি প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতির মধ্যে ৩৯১টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা অনুসারে সংগঠিত বৃহদাকার কৃষিঋণ-দান সমিতি। একটি নতুন প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-প্রদানকারী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩.৮৯ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে একটি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হওয়ায় দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হয়েছে। পৌরক্ষেত্রে ৫.০২ লক্ষ সদস্য এবং সাকুল্য ২৩.৩০ কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন সম্বলিত ৫৬২টি পৌর-ব্যাংক এবং কর্মচারী ঋণদান সমিতি ১৮.৪৪ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করেছে।

এই রাজ্যের আদিবাসী এবং তফসিলভুক্ত সম্প্র-দায়ের পক্ষে প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ ধরনের ঋণদান সমিতি এই ৮৯টি শস্য-ব্যাংক। এগুলোর সদস্যসংখ্যা ১৭,৩৪১ এবং মোট কার্যকরী মূল-ধনের পরিমাণ ৪.৮১ লক্ষ টাকা। এগুলি আলোচ্য বৎসরে ২.১২ লক্ষ টাকার শস্যঋণ প্রদান করেছে।

আলোচ্য বৎসরে কৃষির ক্ষেত্রে, ঋণ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির আধুনিকীকরণ এবং উন্নতির জন্য সমবায় খামার কার্যসূচির তীব্রতা সাধন, পরি-বর্ধিত ও উন্নততর কৃষিদ্রব্য সরবরাহের এবং সেচ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং সর্বশেষে বিপণন এবং প্রক্রিয়ামূলক কর্মসূচির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১৬৮টি সমবায় খামারের (এগুলির অধিকাংশই 'উন্নততর' এবং 'যোথ' খামার শ্রেণীর) মোট সদস্য-সংখ্যা হ'ল ৭,১৩৯ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৬.৫৬ লক্ষ টাকা। এগুলির অধীনে প্রায় ৮,৬২০ একর পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমি ছিল। এগুলি কেবল সদস্যসংখ্যার দিক দিয়েই নয়, মাঝারি ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নততর কৃষি-বন্দ্রপাতি রক্ষা ও উন্নত শ্রেণীর কৃষিদ্রব্য সরবরাহ এবং সেচন-সুবিধা বিষয়েও সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে।

মুখ্যত কৃষিদ্রব্য নিয়ে কার্যব্যয়ে রত বিপণন-সমিতিগুলি পল্লীঞ্চণের অখণ্ড পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। পূর্ববর্তী বৎসর মোট ২৩,২২৯ জন সদস্যযুক্ত এবং মোট ১৯.৮৪ লক্ষ টাকার কার্যকরী মূলধনবিশিষ্ট ১৩৯টি সমবায় সমিতির তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে ৩৯,৩৬৫ জন সদস্যযুক্ত এবং সাকুল্যে ৫২.৯৫ লক্ষ টাকার কার্যকরী মূলধনবিশিষ্ট ২২২টি এরূপ সমবায় সমিতি ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে ঐ সকল সমিতি ৫.৪৩ লক্ষ টাকার বিপণন-খণ দেয়, ৪৯.৭৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য বাজারে বিক্রি করে এবং ২.৩৪ লক্ষ টাকার বীজ, সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এই বিপণন সমবায় সমিতিগুলির ৩৫টি বৃহদায়তন। এগুলির অংশীদারী মূলধনে রাজ্যের অংশ আছে এবং সেগুলি পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত। এসব সমিতির গুদামগুলি রাজ্যসরকারের ঋণ ও সাহায্যকের দ্বারা নির্মিত। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কার্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বৎসরে একটি মুখ্য বিপণন সমিতিও গঠিত হয়।

১৪৬টি প্রক্রিয়া সমবায় সমিতির মোট সদস্য-সংখ্যা ৪,৯১৭ জন ও কার্যকরী মূলধন ১২.৫৮ লক্ষ; এগুলি এই বৎসরে ৪.৪২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রস্তুত-দ্রব্য বিক্রয় করেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে দৃপ্ত ও দৃপ্তশিল্প সমিতির সংখ্যা

১৭৪ থেকে ১৯২তে দাঁড়িয়েছে, তদনুপাতে কার্যকরী মূলধন ও সদস্যসংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছে। খরিদদারদের ক্ষেত্রেও এই বৎসরে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। ৫৬১টি খরিদদারদের দোকান ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩২৩.৭১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করেছে, পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল ১৪৯.০৩ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ৭০,৫০৫ ও মোটামুটি কার্যকরী মূলধন ২৭.৪১ লক্ষ টাকা। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিও এই বৎসর সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখিয়েছে। এই শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫৭ ও মোটামুটি কার্যকরী মূলধন ১১.৫১ লক্ষ টাকা। মাছ বিক্রি হয়েছে গত বৎসর ৪.৭৫ লক্ষ টাকার এবং এ বৎসর ৫.৬৪ লক্ষ টাকার। ১৬৬টি গৃহনির্মাণ ও উপনিবেশ সমিতিও এই বৎসর সন্তোষজনক কাজ করেছে; এগুলির সদস্যসংখ্যা ২১,১৬৩ ও মোট কার্যকরী মূলধন ৯৭.৫২ লক্ষ টাকা।

শিল্পক্ষেত্রে নিজ নিজ শিল্প অথবা কারুকার্যের সমস্যা দূরীকরণের জন্য শ্রমিক, কারুশিল্পী ও শ্রমশিল্পীরা অধিকতর সংখ্যায় সমবায় প্রথা অবলম্বন করছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরের সমিতি সমেত ১,০৩০টি তন্তুবায় সমিতি ছিল, এগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ৭৭,৯১১ ও মোটামুটি কার্যকরী মূলধন ৭৭.৬১ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন হস্ত-চালিত তাঁতবস্ত্র বিক্রি হয়েছে ২০৫.৩৫ লক্ষ টাকার, পূর্ব বৎসরে হয়েছিল ৫৯.৬০ লক্ষ টাকার। রাজ্যের প্রায় ১.৩০ লক্ষ রোজিস্ট্রিকৃত তাঁতের মধ্যে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে সমবায়ের আওতার আনা হয়েছে প্রায় ৭৩,০০০টি। এই বৎসরে অন্যান্য পল্লীশিল্প এবং কুটিরশিল্পও প্রশংসনীয় অগ্রগতি দেখিয়েছে। এই শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে বিভিন্ন সহায়তাদানের ফলেই এ বৎসর এরূপ বিশিষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

টুকিটাকি

বর্ধমান শিক্ষণকেন্দ্র সমিটি-উন্নয়ন ও

সম্প্রসারণ-কৃত্যক মন্ত্রী

বিশ্বে নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সমিটি-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-কৃত্যক মন্ত্রী ডক্টর রফিউদ্দিন আহমেদ মেমারির ও শক্তিগড় ব্লক পরিদর্শন করেন। তিনি মেমারির ব্লক উন্নয়ন অফিস ও সমবায় হিমঘর, বরসুল পল্লীনগরে সূর্যধর ও কর্মকারের বৃত্তি-শিক্ষণকেন্দ্র, যদুনাথ পল্লীর “নিজ গৃহ নিজে নির্মাণ” পরিকল্পনা, মহিলা-সমিতি, বিজ্ঞানমন্দির, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

অপরান্ত্রে তিনি বর্ধমান সম্প্রসারণ শিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তথায় শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম-সেবিকাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। তিনি গ্রাম-সেবিকাদের হস্তশিল্প ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত এক প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন।

ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য জাপানের সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতে জাপানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি অনুকৃতি-উৎপাদন-তথ্য-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রশিল্পসমূহ কৃষক উৎপাদনযোগ্য যন্ত্রাদির অনুকৃতি নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র-শিল্প সংস্থাসমূহ থেকে নির্বাচিত কারিগরদের শিক্ষণদান।

স্মরণ থাকতে পারে যে, গত বৎসর শ্রী কে আচিবানার নেতৃত্বে এক জাপানী কারিগরি সমীক্ষা মিশন ভারতে এসেছিল। হাওড়া এলাকায় ক্ষুদ্র-শিল্পসমূহের এক দ্রুত সমীক্ষার পরে ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আধিকারিকদের সহিত পরামর্শক্রমে এরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপনের এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। জাপান-সরকার

এখন এই কেন্দ্রের পক্ষে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে দেওয়ার এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরিকল্পনায় নিয়োগযোগ্য জাপানী বিশেষজ্ঞদের সহায়তার দরদুন ব্যয়নির্বাহেরও প্রস্তাব করেছেন। এই খাতে চলতি বৎসরে জাপান-সরকারের আনুমানিক ৪০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। গৃহ, জমি, ভারতীয় কর্মচারী-সমূহ, স্টাইপেন্ড, কাঁচামাল প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যয় বহন করবেন ভারত-সরকার।

এই অনুকৃতি কেন্দ্রের জন্য ইতোমধ্যেই হাওড়া শিল্পাঞ্চল এস্টেটের সংলগ্ন স্থান নির্বাচিত হয়েছে, এর চারপাশে হাওড়ার অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প-সংস্থা আছে। আশা করা যায় যে, এই কেন্দ্রটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার সংস্থাগুলির যথাযোগ্য উন্নয়নের অসুবিধা দূরীভূত হবে।

জাপান-সরকার এই পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য আলোচনার জন্য চারজন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে জাপানে আমন্ত্রণ করেছেন। এসকল তথ্যের মধ্যে আছে কেন্দ্রের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন সেগুলির তালিকা, প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংখ্যা, পরিকল্পনাটিকে রূপায়ণের জন্য শিক্ষণ সময় ও নির্দিষ্ট সূচি। উভয় করকারের মধ্যে যেসকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, সেগুলির একটি খসড়া এই আলোচনাকালে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে।

এই আমন্ত্রণের উত্তরে ভারত-সরকার পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে জাপানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। এই দলের অন্যান্য সদস্য হলেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-অধিকর্তা শ্রী বি সি মল্লিক, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি ডাঃ পি সি আলেকজান্ডার, আই এ এস, ও নয়াদিল্লির জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজার (পরিকল্পনা) শ্রীসাগরচাঁদ।

সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব

সম্প্রতি বীরনগর স্টেশন রোডে তারকদাস শিল্প সমবায় সমিতি এবং বীরনগর তন্তুবাড়ী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শক্তিশালিত তাঁতিশিল্পের উদ্বেগ-ধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বকালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সমষ্টি-উন্নয়ন উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পন্থা সমবায়।

তিনি আরও বলেন যে, অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিক আর্থনীতিক দৃষ্টান্তের কারণে মদ্রাস্থিতি রোধের উদ্দেশ্যে কৃষির সঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য আমাদের শক্তি নিয়োগ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্পে উৎসাহ সঞ্চারের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং খাদ্য ও পল্লীশিল্প কমিশন এবং 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন' নিযুক্ত করেছেন।

তিনি সমবায় খামার বিষয়ে নাগপুর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ-বিস্তার সংঘটিত করবার জন্য কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সমবায় প্রথা গ্রহণ করবার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানান।

প্রধান অতিথি সমবায় সমিতিগুলির সহকারী নিয়ামক শ্রী ঠাকুর, ডাঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, এবং শ্রীদীনবন্ধু চক্রবর্তীও বক্তৃতা করেন। তারকদাস সমবায় সমিতির সভাপতি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনীলকণ্ঠ মল্লিকোপাধ্যায় অতিথিদের স্বাগত জানান। উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বন্যাভ্রাণ তহবিলের জন্য স্থানীয় বিভিন্ন সমবায় সমিতি ২৬৩ টাকা প্রদান করে। ঘটনাস্থলেই দুইটি কাঁচি নিলামে বিক্রি করে ১০ টাকা সংগৃহীত হয়।

বেত ও বাঁশের কাজে হরিজনদের শিক্ষণদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসিকল্যাণ বিভাগ ১৯৬৯-৭০ সালে ১,৬০০ টাকা মোট ব্যয়ে রামবাগানের হরিজনদের বেত ও বাঁশের কার্বে শিক্ষাদান করার জন্য চব্বিশপরগনা জেলার নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের যে পরিকল্পনা ছিল তাতে এই শর্তে অনুমোদন দান করেছেন যে, পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ ঐ প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

কৃষি, শিল্প ও পশু প্রদর্শনী

গত ১লা নবেম্বর ময়নাগুড়ি ব্লকের অধীন পূর্ব বড়গিমা গ্রামে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এক কৃষি, শিল্প ও পশু প্রদর্শনীর উদ্বেগধন হয়। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ও ময়নাগুড়ি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এবং জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রচার অফিসের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই প্রদর্শনীতে মুরগি, হাঁস, হাতের বিবিধ কারুকর্ম, কৃষিবিষয়ক মডেল, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিবিধ উন্নয়ন বিষয়ক আলোকচিত্র ও প্রাচীরপত্র, বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি বিবিধ স্টলে শোভা পেতে থাকে। এই উপলক্ষে গ্রামবাসীদের নিজস্ব পালাটিয়া যাত্রাগানও পরিবেশিত হয়। পর দিন ২রা নবেম্বর সহস্র সহস্র লোকের সমাগমে সমস্ত প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণটি মূখরিত হয়ে ওঠে। বৈকালে প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই ধরনের প্রদর্শনী এই অঞ্চলে এই প্রথম।

সমবায় দিবস পালন

গত ৯ই নবেম্বর মাণিকচক (মালদহ) থানা সমষ্টি-উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় জনসাধারণ এবং এনায়েতপুর ও পূরানীগ্রাম সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় এনায়েতপুর গ্রামে সপ্তাহকালব্যাপী সমবায় দিবস প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের

সম্পাদক শ্রী মোশারফ হোসেন। প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন মালদহের সমবায় সমিতি-সমূহের সহ-নিয়ামক। সভায় বহুজন-সমাগম হয়। সমিতি-উন্নয়ন সংস্থার সমবায় পরিদর্শক, কৃষি-কর্মচারী, এনায়েতপুর ইউনিয়ন পাঠাগারের সম্পাদক, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং আরও অনেকে সমবায় দিবসের তাৎপর্য এবং বর্তমান যুগে জীবনের প্রতি পদে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁদের ভাষণে জনগণকে সমবায়ের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করার উপদেশ দেন এবং সমবায়মূলক মনো-বৃত্তি গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি এনায়েতপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও পুরানীগ্রাম তন্তুবায় সমবায় সমিতির কর্ম-প্রচেষ্টায় সতোষ প্রকাশ করেন। সম্ব্যায় জেলা প্রচার দপ্তরের তরফ থেকে সমবায়সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যমূলক সবাক ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

সেচ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস

ভারত-সরকারের সমিতি-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে এক চিঠিতে সকল রাজ্যসরকারকে দেশের সকল বড় ও মাঝারি সেচ অঞ্চলকে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ রকের অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ চিঠিতে বলা হয়েছে যে, এসকল অঞ্চলে জল-সেচ শুরুর হওয়ার এক বৎসর আগে থেকেই কৃষি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশে বর্তমানে অতিরিক্ত কৃষি উৎপাদন বিশেষ আবশ্যিক হওয়ায় সমিতি-উন্নয়ন কার্যসূচি গ্রহণের

শুরুর থেকেই দেশের যেসকল অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে বা আবশ্যিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সেসকল অঞ্চলে অতিরিক্ত প্রয়াসের দ্বারা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ঐ সকল অঞ্চলকে প্রথমে সম্প্রসারণ রকের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

জগৎবল্লভপুরে সমবায় সপ্তাহ পালন

গত ১৫ই নবেম্বর জগৎবল্লভপুরে সর্বাধিসাধক সমবায় সমিতির আহবানে সমিতির অফিসে সমবায় সপ্তাহ পালন উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাওড়া মহকুমা-শাসক শ্রীসুকৃতিকুমার চন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া ও হুগলি জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিয়ামক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন সমবায় প্রচেষ্টার মধ্যে দেশের বর্তমান পরিবেশে সেবা সমবায়ের উপযোগিতার বিষয় বর্ণনা করে ঐরূপ সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমবায় ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিশেষত সমবায়ের সভ্য সাধারণের আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকল্পে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

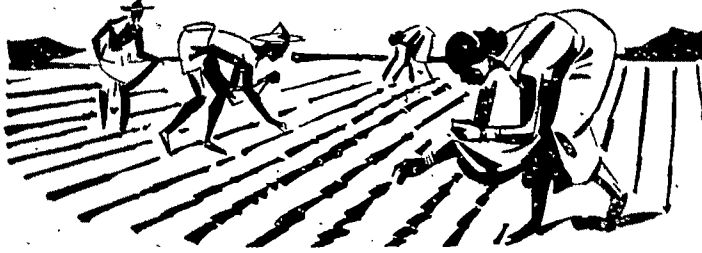
অবশেষে সভাপতি মহাশয় প্রধান অতিথি মহাশয়ের ভাষণ সমর্থন করে এই ধরনের সমিতি স্থাপনের প্রচেষ্টা সার্থক করে তোলার জন্য সকলকে আহবান জানান। সভায় বিভিন্ন বক্তা সমবায়ের উন্নতি সম্বন্ধে নানারূপ বক্তৃতা করেন।

সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক

শ্রীশ্রীভদ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মদ্রিত।

বীজ বপনের সময় হইতে ফসল কাটা পর্যন্ত আপনার শস্য রক্ষা করুন



ধান, জোয়ার, গম, পাট, তুলা ও চীনা বাদামের অধিকতর অঙ্কুরোদগম
এবং বীজ-বাহিত রোগগুলি দমন করিবার জন্য
আপনার বীজগুলির সঙ্গে

‘অ্যাগ্রোসন’ জি এন

ব্যবহার করুন।

কীট পতঙ্গের আক্রমণ হইতে আপনার ফসলকে রক্ষা করিবার জন্য

‘গ্যামেন্ডেন’

৫% ও ১০% ডাষ্ট এবং ৫০% ওয়াটার ডিসপার্সিবল পাউডার
ব্যবহার করুন।



ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ নয়াদিল্লী





খুশীর মেলা...

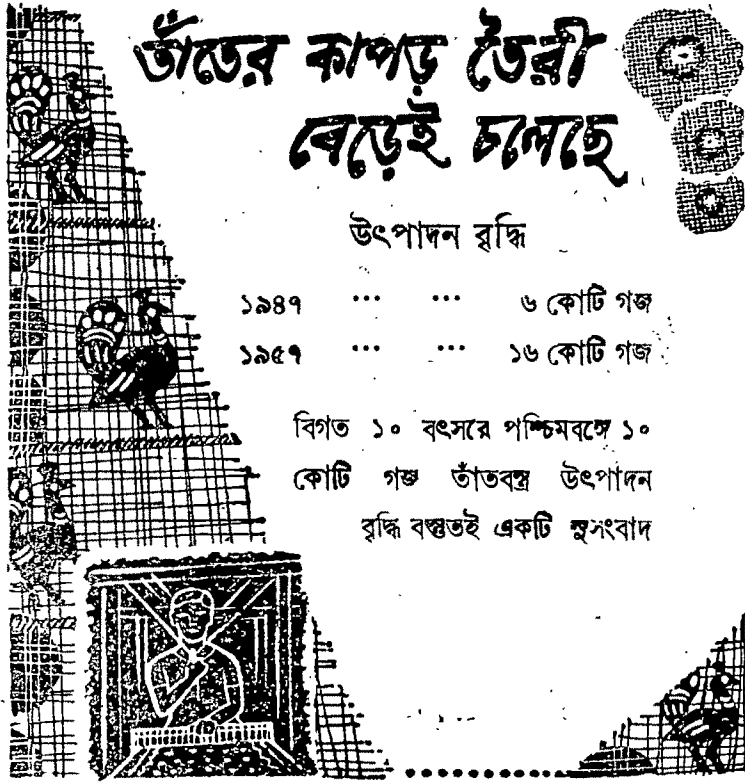
ঘরে ঘরে খুশীর মেলা। নতুন ধানে ভরবে গোলা,
নতুন ফসল আসছে ঘরে;
ঝড়র তাই নেই অবসর, সাজায় ঝু বরণ ডালা,
আলপনা দেয় উঠান-দোরে।...
সোনার রঙ্গীন স্বপ্ন মেতে, সোণার বরণ ধানের ক্ষেতে
শক্ত হাতে কান্তে চালার চাবি।...

ফুরিয়ে এলো কাজ, সাব হলো আজ
এ বছরের মতো, ফসল কাটা যতো।
এরই ঘরে কষ্ট ভরে চেষ্টা শত শত !
চেষ্টা হতেই উঠবে গড়ে,
ছুঃ অনেক লাঘব করে, স্তব্ধের সংসার কত...

আজকে শুধু নতুন নয়, অতীত দিনও সাক্ষ্য দেয়,
সমৃদ্ধির সৌরভে আর সাফল্যেরই গৌরবে,
হিন্দু লিভারের পণ্য ভরে, ভারত মাতার ঘরে ঘরে
জাগিয়েছিল নতুন করে, নতুন পরিবেশ—পরিচ্ছন্ন, উজ্জলতা,
অনেক কথা; তবু এবার
আগামীতে চেষ্টা হবে আরও নতুন পণ্য গড়ে
নতুন দিনের চাহিদাটারে, মিটিয়ে দিতে নতুন করে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দু হান লিভার

PR. 10-XS2.BG



পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্ম অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জন্ম নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বাসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বাসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বাসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চাঁদপুর			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রানপুরহাট	রানপুরহাট	রানপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	বাঁকুড়া	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুদা (বেদিংস)	কপ্টাই রোড	কপ্টাই রোড।
৭। রানাবাট	রানাবাট	রানাবাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮। খাটাল	চক্কাপাড়া রোড	খাটাল।
৮। কালি	বাগড়াবাট	কালি।	২৯। তমলুক	তমলুক (খাটাই এভেনিউ)	তমলুক।
৯। জলীপুর	জলীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁথি	কপ্টাই রোড	কাঁথি।
১০। দালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। হায়গঞ্জ	হায়গঞ্জ	হায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। খালুরবাট	কালিয়াগঞ্জ	খালুরবাট।
১৩। হানকুশপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা ঝালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩। ঝালদহ	ঝালদহ কোর্ট	ঝালদহ।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডা	আরামবাগ।	৩৪। জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫। আলিপুর-মুমার	আলিপুর-মুমার	আলিপুর-মুমার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬। দার্জিলিং	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭। কালিম্পং	শিলিগুড়ি	কালিম্পং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮। শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাগাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। বাখাডা	কোচবিহার	বাখাডা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাংগারগন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পৈদগু।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

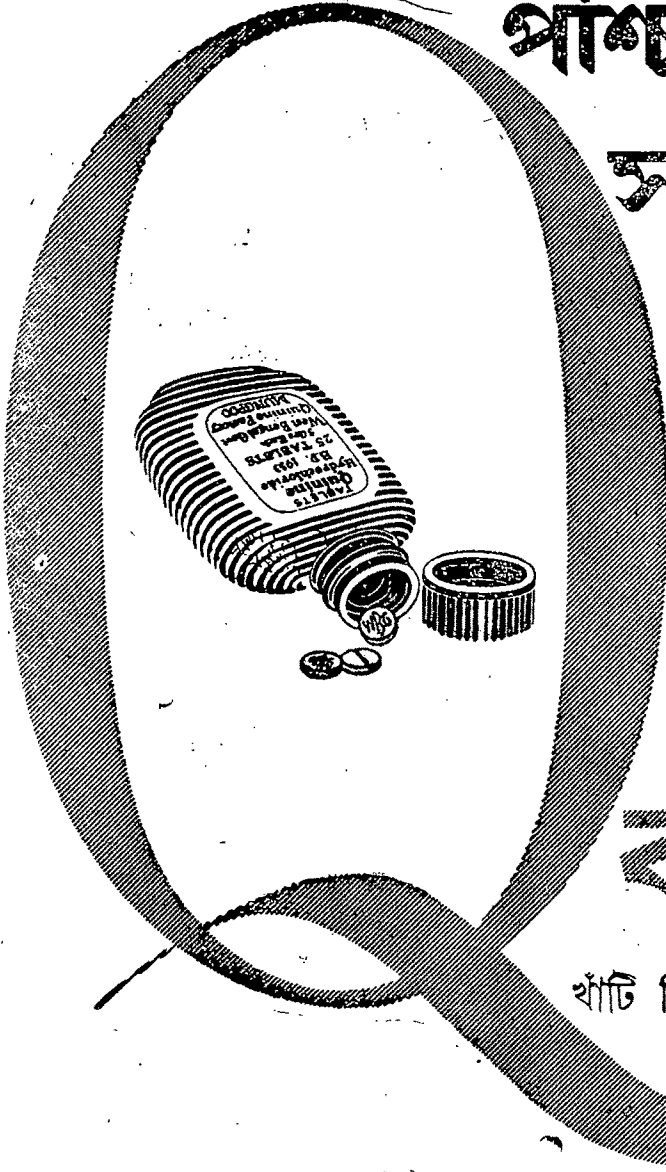
কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিম বঙ্গ

সরকারের



কুইনিন

খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ

বহুজ্ঞান যত্রে পরীক্ষিত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক

গবর্ণমেন্ট কুইনিন সেল ডিপো

ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স প্রাইভেট লি:

৬২বি লিওসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

এবং সব বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

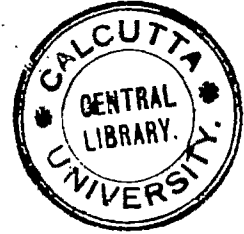
পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহার সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর



ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজবজ	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পো: তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগ্দা
	পো: নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	ক্যান্টনমেন্ট।
১৪। ঐ ..	হাবড়া		
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সদেশখালি		
১৮। ঐ ..	হাডোয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নতুন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	প্রাথমিক	ঠিকানা
১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ ..	ডোমজুড়
৩।	ঐ ..	আমতা

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	হাওড়া
২।	ঐ ..	উলুবেড়িয়া
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪।	ঐ ..	বাগনান
৫।	ঐ ..	শ্যামপুর
৬।	ঐ ..	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	বেথুয়াডহরি
৩।	ঐ ..	রানাঘাট
৪।	ঐ ..	শান্তিপুর

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ ..	রানাঘাট
৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ফুলিয়া, পোঃ ফুলিয়া কলোনী
৪।	ঐ ..	চাক্দা
৫।	ঐ ..	হাঁসখালি
৬।	ঐ ..	রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	হরিহরপাড়া
৩।	ঐ ..	দমকল
৪।	ঐ ..	রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ ..	ভগবানগোলা
৬।	ঐ ..	ধুলিয়ান
৭।	ঐ ..	নবগ্রাম

১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ ..	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ ..	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ ..	কান্দি
৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা
৬।	ঐ ..	বারওয়ান, পোঃ পাঁচধুপী
৭।	ঐ ..	কান্দি
৮।	ঐ ..	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পো: ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা	
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ	১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশ্চন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ	৩।	ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
			৪।	ঐ ..	বতুয়া, পোঃ আরিয়াভাঙ্গা
			৫।	ঐ ..	মানিকচক, পোঃ এনায়েংপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পো: বালুরঘাট

১।	ভ্রাম্যমাণ	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ	...	রায়গঞ্জ	২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয়	রায়গঞ্জ	
৩।	ঐ	...	গঙ্গারামপুর		সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৪।	ঐ	...	ইসলামপুর	৩।	ঐ	...	হেমতাবাদ
				৪।	ঐ	...	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

১।	স্বাস্থ্যসেবা	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ	..	ঘুম	২।	ঐ	..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ	..	কাসিয়াঙ	৩।	ঐ	..	কালিম্পঙ
৪।	ঐ	..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	৪।	ঐ	..	শিলিগুড়ি
৫।	ঐ	..	তিস্তাভ্যালি	৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		রংলি-রংলিয়াট, পো: তাকদা
৬।	ঐ	..	শিলিগুড়ি	৬।	ঐ	..	ফুলবাজার, পো: বিজনবাড়ি
৭।	ঐ	..	নক্সালবাড়ি	৭।	ঐ	..	সুকিয়াপকরি, পো: জোড়বাংলো
				৮।	ঐ	..	কালিম্পঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

১।	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার	১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক,	কোচবিহার
২।	ঐ		মেকলিগঞ্জ	২।	ঐ		তুফানগঞ্জ
৩।	ঐ		মাথাভাঙ্গা	৩।	পশুচিকিৎসক,	জাতীয়	দিনহাটা
					সম্প্রসারণ	সংস্থা।	
				৪।	ঐ		সিতাই

বসুন্ধরা

জনপাইগুড়ি

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, জনপাইগুড়ি

ক্রমিক	ব্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	ব্রাম্যমাণ পশ্চচিকিৎসক	দোমহানি	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক
২।	ঐ ..	বীরপাড়া	২।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়
৩।	ঐ ..	কালচিনি		সম্প্রসারণ সংস্থা।
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার	৩।	ঐ ..
			৪।	ঐ ..

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	ব্রাম্যমাণ পশ্চচিকিৎসক	গুস্করা	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..	মেমারী	২।	ঐ ..	কাটোয়া
৩।	ঐ ..	সেহারাভাঙ্গার	৩।	ঐ ..	কালনা
৪।	ঐ ..	কালনা	৪।	ঐ ..	আসানসোল
৫।	ঐ ..	কাটোয়া	৫।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	ভাতার
৬।	ঐ ..	নতুনহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৭।	ঐ ..	আসানসোল	৬।	ঐ ..	মঙ্গলকোট
৮।	ঐ ..	রানীগঞ্জ	৭।	ঐ ..	শক্তিগড়
৯।	ঐ ..	দুর্গাপুর	৮।	ঐ ..	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	ব্রাম্যমাণ পশ্চচিকিৎসক	গাইখিয়া	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..	বোলপুর	২।	ঐ ..	রামপুরহাট
৩।	ঐ ..	দুবরাজপুর	৩।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	নলহাটি
৪।	ঐ ..	রামপুরহাট		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৫।	ঐ ..	নলহাটি	৪।	ঐ ..	মহম্মদাবাজার
			৫।	ঐ ..	আমেদপুর
			৬।	ঐ ..	বোলপুর,
					শ্রীনিবেতন

জুগলি

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, জুগলি, চুঁচুড়া

১।	ব্রাম্যমাণ পশ্চচিকিৎসক	চুঁচুড়া	১।	স্থিতিবান পশ্চচিকিৎসক	চুঁচুড়া
২।	ঐ ..	ত্রিবেণী	২।	ঐ ..	শ্রীরামপুর
৩।	ঐ ..	শ্রীরামপুর	৩।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয়	আরামবাগ
৪।	ঐ ..	তারকেশ্বর		সম্প্রসারণ সংস্থা।	
			৪।	ঐ ..	ধানাকুল
			৫।	ঐ ..	পুরসুরা
					পো: চাঁপাডাঙ্গা
			৬।	ঐ ..	পোলবা,
					পো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর (উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর (দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক	ব্রাহ্মাণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুঁরা
১২।	ঐ ...	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভগবানপুর
৬।	ঐ ..	পটেশপুর
৭।	ঐ ..	খেজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

ক্রমিক	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
১।	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	..	ওলা
৩।	ঐ ..	..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	..	খাতরা

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	..	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

ক্রমিক	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
১।	ব্রাহ্মাণ	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	..	রঘুনাথপুর

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	..	হুয়া

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

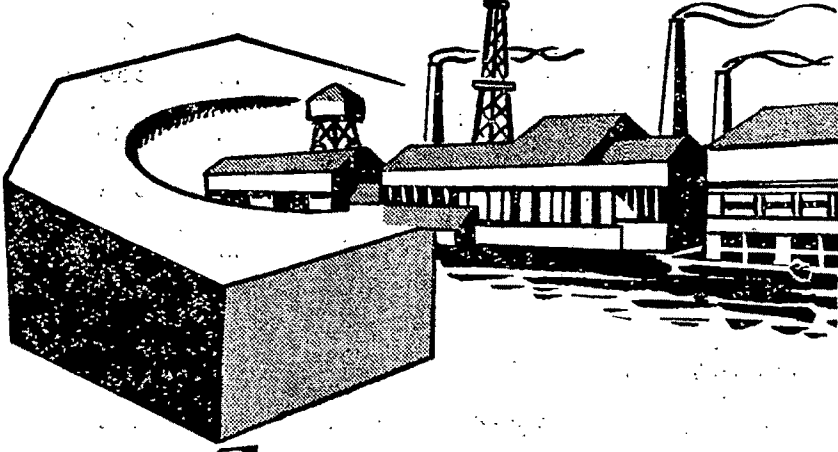
পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমল ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডাল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডাল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

আরও অনেক শিল্পের



মোটর পদ্ধতি গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মোটর পদ্ধতির প্রবর্তন শুরু হয় তখন—পাট, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, কফি, অলৌহ ধাতু, কাঁচা রবার ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মোটর ও জ্বলন ও যাপ গ্রহণ করে।

তারপর থেকে আরও অনেক শিল্পে এই পরিবর্তন শুরু হয়।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ছোবড়া শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অল্পমতি দেওয়া হয়।

১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও, মোটর ও জ্বলনে পরিবর্তন শুরু হয়।

বনস্পতি ও রং তৈরীর শিল্পে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে মোটর ও জ্বলন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন দ্রুততর হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লীটার ও মোটর যাপে বিক্রী করা হবে।



১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস থেকে যখন শুষ্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তখন সেটা হবে মোটর পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা।

মোটর পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

গ্রহণ করুন

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	৩৬৩
শস্যরক্ষা	৩৭০
বিশ্ব কৃষিমেলায় আমরা	৩৭৪
সার্থক শ্রমে গড়া কেলেঘাই	৩৭৭
মাছের চাষ	৩৮০
তিন ফসলের গান	৩৮২
শস্যের অপচয় নিবারণে গুদামঘর	৩৮৩
স্বল্প - সপ্তয় অভিযান	৩৮৬
জুগিয়ানার সংকর ভুটাবীজ	৩৮৮
সমবায় নবজীবন দিয়েছে বুলগেরিয়ার কৃষিকে	৩৯১
তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ব্যয়	৩৯৩
পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্দ্র	৩৯৯
টুকিটাকি	৪০৪

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলো সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিঘাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বসুন্ধরা

১২শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা : মাঘ ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

সভ্যতার জন্মলগ্ন হ'তেই ভারত কারুকলায় ও শিল্প-চাতুর্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। ভারতের কুশলী শিল্পিবৃন্দ অভিনব সৃজনী প্রতিভার মাধ্যমে শিল্পসাধনার ধারা যুগে যুগে বহন ক'রে চলেছে। তাদের কল্পনার নানা বৈচিত্র্য দেশজ উপাদানে এবং সাধারণ গ্রামীণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা বর্ণে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় মানস কল্পনার এই বহুবিচিত্র বহিঃপ্রকাশ সত্যি অতুলনীয়।

ভারতের শিল্পপ্রয়াস ও রূপসাধনা একাধারে মূর্ত হয়েছে বয়নশিল্পের মধ্যে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে ভারত যে তাঁতশিল্পে অগ্রণী ছিল তার পরিচয় বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। বয়ন-নৈপুণ্য ও রুচিবোধে ভারতের তাঁতবস্ত্র প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে সমান স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বয়ন-নৈপুণ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশিত হয়েছে। বারাণসীর রেশম রোকেড, হায়দরাবাদের হিম্বরু, পাঞ্জাবের খেস, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরী শাড়ি, মাদুরা কাণ্ডীপুত্রম আর ভেঙ্কট-গিরীর শাড়ি এবং বাঙলার মসলিন সর্বদেশে সর্বজনীন প্রশংসা অকুণ্ঠিতভাবে অর্জন করেছে। সর্বক্ষেত্রেই এই সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীদের তৎকালীন দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজনীতিক বিবর্তনের ফলে অতীত মসলিনের পীঠস্থান ঢাকা আজ ভারতের বহিঃভূত, তবুও ধারা-বাহিক সংস্কৃতির সূত্র সকল বাঙালীর মসলিনের

গৌরবে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ঢাকাই মসলিন ও জামদানীর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাঙলার বয়ন-গৌরবের অভিব্যক্তি হয় মর্শিদাবাদের বালুচর (বর্তমানে জিয়াগঞ্জ) বৃটিদার শাড়ির মধ্যে। শাড়ির জমির উপর বিচিত্র নকশা এবং আঁচলার কারুকর্ষ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শিল্প-সাধনার শেষ সাধক ছিলেন বয়নশিল্পী দুবরাজ দাস। তাঁর সূযোগ্য শিষ্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্প্রতি পরলোক গমন করায় এই শিল্পধারা একান্ত অবলুপ্তির আশঙ্কায় আচ্ছন্ন। অবশ্য আশার কথা যে, তাঁর জীবদ্দশায় কয়েকজন গুণী উৎসাহী শিল্পী বালুচরী কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। হয়তো ভবিষ্যতে আবার এই শিল্পধারার পুনরাবির্ভাব হবে।

অতীতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে তাঁতের কাপড়ের ছিল এক বিশিষ্ট স্থান। এ থেকে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। তেইশ শ' বছর পূর্বেও সেকেন্দার শাহের ভারত আক্রমণের সময় হ'তে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে তাঁতবস্ত্রের প্রধান্য অব্যাহত ছিল। ঐতিহ্যে সন্মহান এই শিল্পের বিশেষ দুর্দিন আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার-হেতু এবং কায়েমী বৈদেশিক শাসনের প্রতিকূলতার ফলে জাতের এবং দেশের গৌরব তাঁতশিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের তাঁতশিল্প যে টিকে থেকে সম্প্রতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে তার কারণ অন্যান্য কুটিরশিল্পের ন্যায় আমাদের

বয়নশিল্পের একান্ত নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে :

- (১) তাঁতিশিল্পে মূলধন নিয়োগ করতে হয় কম এবং এর পোষণ-খরচা কম; বংশানুক্রমে, ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁতীরা নিজ কুটিরে অনাড়ম্বর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পারিবারিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁতিশিল্পের কলাকৌশল শিক্ষা ও আয়ত্ত করেন।
- (২) রকমারি ও মনোজ্ঞ বস্ত্রাদি বয়নে তাঁত আঁম্বিতীয়, আর তন্তুবায়ীর স্বকীয় প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ বয়নশিল্পেই সমধিক।
- (৩) তাঁতে-বোনা কাপড়ের স্থায়িত্ব অধিক।
- (৪) তন্তুবায়ীদের সহজ সরল গ্রাম্য জীবন, সর্বোদয় আদর্শ এবং দেশাত্মবোধের পরিচয় হিসাবে বরণীয়।

কৃষিপ্রধান ভারতে জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁতিশিল্পের অবদান অপরিমেয়। বৃহৎ শিল্পের দ্বারা পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি হ'লেও আনুপাতিক কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের জনশক্তির প্রাচুর্য এবং মূলধনের অভাবে লোকসংখ্যার যথোচিত অংশকে কর্মে নিয়োগ করতে কৃষির পরই কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতিশিল্প প্রধান। তা ছাড়া, কৃষক ও ভূমিহীন চাষী বিকল্প কর্মহিসাবে অবসরসময়ে নিজেদের ব্যবহার্য বস্ত্রাদি এই শিল্পের সহায়তায় উৎপাদন করতে পারে। গ্রামীণ আর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় না হ'লে পল্লী তথা জাতীয় জীবনের মানবৃদ্ধি সম্ভব নয়। সুর্চিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রাচীন ঐতিহ্যময় কুটিরশিল্পকে সংগঠিত করে আমাদের লোকশক্তিকে কর্মে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বারা দেশের কল্যাণবৃদ্ধি এবং আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের শেষে সমগ্র ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত তাঁতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ ৯৫ হাজার। এই তাঁতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশি। দেখা যায় যে, ভারতের সমস্ত বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরের সংখ্যার চেয়ে অনেক অধিক-সংখ্যক লোক তাঁতিশিল্পের উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে সমগ্র জাতির ও দেশের কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভর করছে এদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর। সেজন্য কর্মসংস্থান এবং জীবিকার মান উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই কুটিরশিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর কালে ১৯৫২ সালের পর তাঁতিশিল্পের খুব সংকটময় সময় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র ভারতে, বিশেষত গ্রামে গ্রামে, শিল্পীদের দুরবস্থা চরমে উঠে। এ অবস্থায় ভারত-সরকার কলে উৎপাদিত বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত সেস্ বসিয়ে এক তহবিল সৃষ্টি করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ১৯৫৪ সালে নির্ধারিত ভারত তাঁতিশিল্প পর্ষদ গঠিত হয় এবং সেস্ তহবিলে সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যসরকারগুলির তত্ত্বাবধানে তাঁতিশিল্পের পুনর্বাসন এবং উন্নতির সুবিধাস্ত প্রচেষ্টা চলেছে। এই পর্ষদ স্থির করেন যে, তাঁতিশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন বয়নশিল্পীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং সর্বপ্রকার সাহায্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত করা। সেই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই এই শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস চলে আসছে।

তা ছাড়া কলের উৎপাদন আনুমানিক ৫০০ কোটি গজে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁতিশিল্পের প্রসারের দ্বারা জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৫৩-৫৬) ভারত-সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় তাঁতিশিল্পের বয়নকাজে ১০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা

মঞ্জুর করেন এবং রাজ্যসরকারগর্দূলি ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৫৮-৫৯ বর্ষ পর্যন্ত ভারত-সরকার ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং রাজ্যসরকারগর্দূলির মোট ব্যয় হয় ১৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

সমাজ-সংস্কারক ও অর্থনীতিবিদ ডাঃ কার্ভের নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে যে কমিটি গঠিত হয় তার সদ্ব্যপারিশ অনুযায়ী জনপ্রতি ১৮.৫ গজের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তে অতিরিক্ত বস্ত্রের প্রয়োজন দাঁড়ায় প্রায় ১৭০ কোটি গজ। ১৯৫৬ সালে ভারত-সরকার নতুন বস্ত্রনীতি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, ভারতে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের পরিমাণ হবে মোট ৮৪০ কোটি গজ। এর মধ্যে কল এবং বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতের জন্য সংরক্ষিত হয় যথাক্রমে ৫০০ কোটি গজ এবং ২০ কোটি গজ। হস্ত-চালিত তাঁতে শিল্পীদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক অর্জিত হয় না। জাতীয় মান উন্নত করতে হলে তন্তুবায়দেরও আয়বৃদ্ধি প্রয়োজন। শক্তি-চালিত তাঁত ব্যবহারে তাঁদের আয় অধিক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। শক্তিচালিত তাঁত উন্নতপদ্ধতির সুযোগ বিতরণ করবে স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র-গুটানো যন্ত্র ও অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় তাঁতের মত। ১৯৫৬-৫৭ সালে নতুন বস্ত্রনীতি ঘোষণার সঙ্গে ভারত-সরকার সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৩৫,০০০ শক্তিচালিত তাঁত বন্টনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এইসব তাঁত বসানোর সমস্ত ব্যয়ভার ভারত-সরকার বহন করবেন। প্রতি তাঁত-পিছু আনুমানিক ৪ হাজার টাকা ঋণ ও দান হিসাবে মঞ্জুর করা হয়। একটি সমবায় সমিতিতে ১৫টির বেশি তাঁত দেওয়া হয় না। এই শক্তি-চালিত তাঁতের জন্য বার্ষিক যে ২০ কোটি গজ বস্ত্র বয়ন বরাদ্দ করা হয় তা সমগ্রভাবে মোট প্রয়োজনের মাত্র ২:৪ শতাংশ। জনসাধারণের চাহিদার এক বিরাট অংশ মেটাবার প্রচুর সুযোগ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষিত আছে। এমনকি দেশবাসীর প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশই

যোগান দেবার ভার তাঁতশিল্পের উপর ন্যস্ত। কার্ভে কমিটি তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য ৮৮ কোটি টাকা সদ্ব্যপারিশ করেন (তন্মধ্যে ৮০ কোটি টাকা সদ্ব্যতী বস্ত্রের জন্য, ৫ কোটি টাকা রেশমী বস্ত্রের জন্য এবং ৩ কোটি টাকা পশমী বস্ত্রের জন্য)। কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠিত হবার পর পরিকল্পনা কমিশন দেশের আর্থিক সংস্থান পুনর্বিচার করে এই শিল্পের জন্য মোট ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেন (৩২ কোটি টাকা সদ্ব্যতী বস্ত্রের জন্য, ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রেশমী ও পশমী বস্ত্রের জন্য এবং ২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বাবত)। নিম্নে ভারতের তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন এবং রপ্তানির যে হিসাব দেওয়া হ'ল তা থেকে এই শিল্পের অগ্রগতি সহজেই অনুমেয়:

ভারতের তাঁতবস্ত্র

সাল	উৎপাদন-পরিমাণ (কোটি গজ)	রপ্তানি-পরিমাণ (কোটি গজ)
১৯৫০	৮০.৫	৪.১১
১৯৫১	৮৫.০	৪.৩৬
১৯৫২	১১০.৯	৫.৩৮
১৯৫৩	১২০.০	৬.৩২
১৯৫৪	১৩১.৮	৫.৭৩
১৯৫৫	১৪৭.৩	৬.০৪
১৯৫৬	১৫৪.১	৫.৯৯
১৯৫৭	১৬৭.৮	৩.৭৫
১৯৫৮	১৮২.০	৩.৫১
১৯৫৯ (আনুমানিক)	১৮৭.৪	৩.৮৮

১৯৫৩ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যখন তাঁত-শিল্পের সদ্ব্য বন্টনের প্রথা চালু হয় তখন দেখা যায় যে, সারা ভারতে সমবায়-ভুক্ত তাঁতের সংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ ৮২ হাজার। তাঁতশিল্প পর্যদের বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণে ১৯৫৯ সালের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লক্ষে এবং তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বেড়ে হয় ১০ হাজারেরও অধিক।

এখন আমাদের পশ্চিম বাঙলার তাঁতশিল্পের অবস্থা কী, দেখা যাক। ১৯৪০ সালে তথ্য-অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সে সময় তাঁতের সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার। ১৯৫০-৫১ সালের সরকারী লাইসেন্স দানের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল অনধিক ১ লক্ষ। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে রেজিস্ট্রি-ভুক্ত তাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার। ধরা যেতে পারে যে, বর্তমানে এ রাজ্যে মোট তাঁতের সংখ্যা হবে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। এর মধ্যে ১ লক্ষের কিছু বেশি ঠকঠকি তাঁত, প্রায় ১২ হাজার চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং বাকি হাত-তাঁত। প্রায় ৭৭ হাজার তাঁত রয়েছে বস্ত্র-সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বাঙলায় সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৯৮১। শাড়ির পাড়ে নকশা তোলার জন্য জরি এবং জ্যাকাডেমির বহুল প্রচলন এই রাজ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপুত্র, নবম্বীপ, ধনেখালি, ফরাসডাঙা, রাজবলহাট, বেগমপুর, দেবীপুর, বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম, গোপীনাথপুর, সোনামুখী, চরাবার, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, হরিদাসপুর, তমলুক, অমরিষ, শ্রীনিকেতন, বসিরহাট প্রভৃতি স্থান তাঁত-শিল্পের কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ। মর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, মালদহ এবং পুরুলিয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তসর ও গরদ প্রস্তুত হয়। পশ্চিম-শিল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ যদিও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নি, তথাপি কালিম্পাঙ, পাটুলী (বর্তমান) লোকপুর (বাঁকুড়া), শ্রীকণ্ঠবাটী (মর্শিদাবাদ) প্রভৃতি স্থানে পশ্চিমশিল্প উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাঁতে সাধারণত ধুতি, শাড়ি, চাদর, মশারির কাপড়, গামছা, লুঙ্গি, জামার কাপড়, গজ, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি বোনা হয়। ধুতির জন্য ফরাসডাঙা, কৈকালী, দেবীপুর, অমরিষ, চন্দ্রকোণা, হরিদাসপুর, শাড়ির জন্য শান্তিপুত্র, নবম্বীপ, ধনেখালি, রাজবলহাট, বেগমপুর, রামজীবনপুর, চাদর ও নিত্যব্যবহার্য বস্ত্র-সামগ্রীর জন্য রাজগ্রাম, গোপীনাথপুর এবং

গজ, ব্যান্ডেজ, মশারির থান, চাদর প্রভৃতির জন্য তমলুক, বসিরহাট প্রভৃতি স্থান যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁতবস্ত্রের বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে হাওড়া, নবম্বীপ এবং রাধামণিহাট প্রসিদ্ধ। হাওড়াহাট সমগ্র ভারতের মধ্যে তন্তুজ বস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিক্রয়কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গে তাঁতশিল্প সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয় বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সময়। সেই সময় ৯০৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১৩টি শিল্পসংস্থা গড়ে উঠে। প্রাথমিক সমিতিগুলির অধিকাংশই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সূতা বণ্টনের কাজের উপর জোর দিত। বিনিয়ন্ত্রণের পর সমিতিগুলির চরম দুর্দিন আসে এবং অধিকাংশ সমিতির কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নিখিল ভারত তাঁতশিল্প পর্যদের তহবিল থেকে যথারীতি সাহায্য দেওয়া শুরুর হয় ১৯৫৩-৫৪ সালে। পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকেই স্বভাবত প্রাথমিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টায় প্রায় ১০ হাজার সমবায়ী তাঁতীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অল্প সময়েই আরও তিনটি শিল্পসংস্থা বিভিন্ন জেলায় গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ (প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি নামে পরিচিত) ১৯৫৪-৫৫ সালে গঠিত হয়। প্রাথমিক সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্যের বিপণন-ব্যবস্থা, আমদানি-কৃত সূতা, রঙ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির সূচক, বিতরণব্যবস্থা এই সমিতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে।

বর্তমান যান্ত্রিক উন্নতির যুগে প্রত্যেক কুটির-শিল্পকে বিশেষ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সমধিক গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁত-শিল্প যাতে করে মিলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে সেজন্য ভারত-সরকার এবং রাজ্য-সরকার অবহিত এবং সদাই সচেতন। তাঁতশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ভারত-সরকারের সঙ্গে সঙ্গে

রাজ্যসরকারগুলিও নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন—(১) কাঁচামাল সরবরাহ, (২) মূলধনের ব্যবস্থা, (৩) কারিগরি, শিক্ষা, (৪) উৎপন্ন পণ্যের বিক্রি-বন্দোবস্ত, (৫) গৃহস্থান তন্তুবায়ীদের উপযুক্ত গৃহের বন্দোবস্ত এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর সুযোগদানের ব্যবস্থা।

কাঁচামালের মধ্যে সূতাই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে সূতার চাহিদা বৎসরে সাড়ে তিন কোটি পাউন্ডের বেশি। এই প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই দক্ষিণ ভারত এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। তাঁতীদের অধিকাংশই বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সূতা কিনে কাজ চালায়। কিন্তু রেল-ভাড়া, মুনফাযোগ ইত্যাদির ফলে বাজারে কেনা সূতার দাম বেশি পড়ে। রাজ্য তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ মিল থেকে যাতে করে সূতা পেয়ে সমবায়ী তাঁতীদের বণ্টন করতে পারে সেদিকে একটি পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলে বিবেচনাধীন আছে। তা ছাড়া সম্প্রতি লেবাননের আমদানি সূতা সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। উপরন্তু বিদেশ থেকে সূতা, রঙ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সরাসরি আমদানির জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিতে ‘পারমিট’ দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় আমদানি নীতি অনুসারে সমবায়ী প্রয়োজনের উপযুক্ত অংশ সংরক্ষিত আছে। রাজ্যে সূতা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক টাকু বসিয়ে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মারফত সূতা উৎপাদনের পরিকল্পনা অগ্রগতির পথে। এর মধ্যে রাজ্যসরকারের পরিচালনাধীনে কল্যাণীতে ৫০ হাজার টাকুর একটি সূতাকল স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এইসব পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হলে, মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যের সূতা সরবরাহের বিভিন্ন সমস্যার সুরাহা হবে।

মূলধনের অভাবে তাঁতশিল্প আজ দুর্দশাগ্রস্ত, মহাজনের কুপার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই

শিল্পকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে এবং শিল্পীদের আর্থিক মান উন্নয়নকল্পে সমবায়ী তাঁতী-পিছ ৩০০ টাকা হিসাবে কার্যকরী মূলধন দেওয়া হয় (রেশমী বস্ত্রের জন্য ৫০০ টাকা এবং পশমী বস্ত্রের জন্য ২০০ টাকা)। এই সাহায্য পর্যাপ্ত নয় বিধায় ভারত-সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে উপযুক্ত মূলধন বণ্টন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ব্যাংক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরে প্রায় ৮টি জেলায় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

তাঁতশিল্প-কৌশলের প্রসারকল্পে রাজ্যসরকার ১৪টি ভ্রাম্যমাণ তাঁতবয়ন বিদ্যালয়, ৮টি ব্যবহারিক শিক্ষাদল ও ৩টি তাঁত-বয়ন বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। এ ছাড়া ৩৫টি শিল্প-বিদ্যালয় নিয়মিত সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। শ্রীরামপুর ও বহরমপুরে ২টি মহাবিদ্যালয়ও আছে যেখানে বয়নশিল্পে উচ্চ-শিক্ষালাভান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উন্নত প্রণালী ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে শিল্পীদের আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। উৎপাদিত বস্ত্র যাতে ক্রেতার মনোরঞ্জন করতে পারে সেজন্য পাকা রঙ, অভিনব ডিজাইন, পাড়ের বৈচিত্র্য, নকশা উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রয়োজন। রাজ্যসরকারের শ্রীরামপুরস্থ বয়ন মহাবিদ্যালয়ে তাঁতের উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের গবেষণা চলছে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত সাজসরঞ্জাম প্রতি বৎসর সমবায়ী শিল্পীদের প্রয়োজনে বিতরণ করা হচ্ছে।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

এ বছর থেকে প্রদত্ত সরঞ্জামের মূল্যের ৭৫ শতাংশ দান এবং ২৫ শতাংশ ঋণ হিসাবে পরিগণিত হবে। কেবলমাত্র জ্যাকাডেমির জন্য দান ও ঋণের অর্থ সমপরিমাণে গণ্য হবে।

সুতরাং রঙ পাকা করার বন্দোবস্ত ও সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ২০টি রঞ্জনশালা সরকারী অর্থসাহায্যে খোলা হয়েছে। আধুনিক এবং রুচিসম্মত ডিজাইনের উদ্ভাবন, শিক্ষণ ও বিতরণের জন্য ভারত-সরকার কলিকাতায় একটি ডিজাইন-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন এবং ব্লক ছাপার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কারখানা কেন্দ্রীয় অর্থ বিনিয়োগে স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পাধিকারের অধীনে ছোট একটি ডিজাইন-শাখা কয়েক বছর ধরেই কাজ করে আসছে। তন্তুবায় ও তাঁতশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশকল্পে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কারের বন্দোবস্ত জেলা ও সমগ্র রাজ্য ভিত্তিতে করা হয়েছে।

তাঁতশিল্প-জাত পণ্যের সুদৃষ্ট বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য এই রাজ্যে ১৭৬টি বিক্রয়কেন্দ্র ও ৪টি কেন্দ্রীয় বিপণন-সংস্থা খোলা হয়েছে। তা ছাড়া কলে প্রস্তুত কাপড়ের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার কিছুটা সাম্যসাধনের জন্য সমবায় ব্যবস্থায় বিক্রীত বস্ত্রের উপর রিবেট দেওয়া হয়ে থাকে। ২টি ভ্রাম্যমাণ বিপণি প্রচার এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ও ভিন্ন রাজ্যেও বিক্রয়কেন্দ্ররূপে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ৫টি আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ এগিয়ে চলেছে। সংবাদপত্র, প্রাচীরপত্র, সিনেমা-স্লাইড, ভ্রাম্যমাণ আলোকচিত্র, পুস্তিকা, রেডিও, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করার যথাবিহিত ব্যবস্থা চলছে।

উৎপন্ন বস্ত্রের বিক্রয়-ব্যবস্থা কেবলমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বহির্বাণিজ্যের

জন্য 'অল ইন্ডিয়া ফ্যাবরিকস্ ম্যার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি' ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কলিকাতায় এই সংস্থার একটি শাখা খুলে শহরের ক্রেতাদের আধুনিক ও মনোজ্ঞ বিপণন-ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত এই বিক্রয়কেন্দ্র বহু ক্রেতার মিলনস্থল হিসাবে প্রাসিন্দ লাভ করেছে। বিদেশ হতে যেসব বিশেষজ্ঞ-দল ভারতের তাঁতবস্ত্র রপ্তানি সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসে তারা পশ্চিমবঙ্গের রেশমী এবং সুতী-বস্ত্রের বয়ন-নৈপুণ্য, নকশা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে। অতিপ্রয়োজনীয় বিদেশী মদ্রা অর্জনের উপায় হিসাবে তাঁতবস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ সুপরি-কল্পিত ব্যবস্থায় বেড়ে চলবে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আরও দুইটি জনহিতকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেনঃ (১) গৃহহীন তাঁতুবায়দের গৃহনির্মাণ এবং (২) তাঁদের জীর্ণ গৃহের সংস্কার ও সম্প্রসারণ। শান্তিপুত্রের অন্তর্গত শান্তিগড়ে নতুন কলোনিতে ১০০টি গৃহ প্রায় সমাপ্তির পর্বায়ে। বর্ধমানের পাটুলীতে আরও ১০০টি গৃহের নির্মাণ-কার্য এ বছর শীঘ্রই আরম্ভ হবে। গৃহনির্মাণের জন্য ভারত-সরকার গৃহ-প্রতি ১,২০০ টাকা সাহায্য এবং ২৫ বৎসর মেয়াদের ২,৪০০ টাকা ঋণ দেন। উপরন্তু আরও ২টি কলোনি স্থাপনের কাজ আগামী আর্থিক বছরে আরম্ভ হবে যার প্রতিটিতে থাকবে ১০০টি গৃহ এবং প্রতিটি গৃহের নির্মাণে ব্যয় হবে ২,৫০০ টাকা। জীর্ণ গৃহ সংস্কারের জন্য বর্তমান বছর থেকে ৫০০ টাকা হারে ঋণ দেওয়া হবে। গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই পরিকল্পনায় নব নির্মাণ ও সংস্কারের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য রাজসরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেগুলি বাৎসরিক ব্যয় সমেত অন্যত্র দেখানো হ'ল। পরপৃষ্ঠায় বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হ'ল! এ থেকে এ রাজ্যে তাঁত-শিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে অনুমান করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন

সাল	উৎপন্ন বস্ত্র (কোটি-গজ)
১৯৫৩	... ১০.১২
১৯৫৪	... ১১.২৫
১৯৫৫	... ১২.৫০
১৯৫৬	... ১৫.৪০
১৯৫৭	... ১৬.০৮
১৯৫৮	... ১৮.৩৭
১৯৫৯	... ১৮.৫০
	(আনুমানিক)

সর্বভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের সংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ, কিন্তু এখানে উৎপন্ন হচ্ছে সারা ভারতের উৎপাদনের ১০ শতাংশ। গড়ে প্রতি তাঁতের উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যের উৎপাদনের চেয়ে

ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের শিল্পীরা নিশ্চয়ই নিজেদের কৌশল এবং উন্নততর পদ্ধতির জন্য গর্ববোধ করতে পারেন।

কত বিস্মৃত শিল্পীর একাগ্র সাধনায় সৃষ্ট এই আড়ম্বরহীন, ঐতিহ্যময় ক্ষুদ্রমাত্র তাঁত। আমাদের জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পের প্রয়োজন অপরিসীম। গ্রামকে কেন্দ্র করে আজ জাতীয় আর্থনীতিক পুনর্গঠনের আয়োজন চলছে। সর্বোৎকৃষ্ট ও মনোরম বস্ত্রসম্ভারের উৎপাদক দেশের এই শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সকলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহানুভূতি নিতান্ত প্রয়োজন। এই শিল্পের পুনর্বিব্যাস ও উন্নতিতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর কল্যাণ হবে, গ্রামে গ্রামে পল্লীশ্রী ফিরে আসবে এবং দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সেখানে আবার প্রাণধারা উচ্ছল হয়ে উঠবে।



শস্যরক্ষা

ডাঃ কে বি লাল

ভারত-সরকারের শস্যরক্ষা-উপদেষ্টা

মানুষ চাষ-আবাদ শুরুর পর থেকে ক্ষেতে ও ভাঁড়ারে শস্য নষ্ট হয়েছে নানা প্রকার কীট আর রোগের প্রকোপে। অতীতে মানুষ নির্বিকারচিত্তে এ ক্ষতি স্বীকার করেছে, একে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বলে মেনে নিয়েছে। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া এ দুর্বিপাকের হাত থেকে বাঁচার আর কোন উপায় ছিল না সৈদিনের মানুষের কাছে। পরে নানা প্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হ'ল। যেমন, চারা গাছের উপর ছাই ছড়ানো, ভাঁড়ারে নিম ও অন্যান্য পাতা রাখা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গত শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে শস্যের কীট ও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা শুরুর হয়। বহুক্ষেত্রেই রোগের কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় এবং কীটগুলির জীবন-যাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে সমস্ত অনুসন্ধান করা হয় যাতে এগুলি দমন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে। এখন কীট ও রোগের জন্য ক্ষেতে ও গদুদামে শস্যের ক্ষতি অনেকটা রোধ করা সম্ভব।

ভারতে প্রায় ২৫০ প্রকার কীট-পতঙ্গ, প্রায় ১৫০ ধরনের রোগ, ৩০ থেকে ৪০ প্রকার আগাছা ও ৪ প্রকার পরভোজী উদ্ভিদ আছে যেগুলির কার্য-কলাপের ফলে, এমনকি শুধুমাত্র উপস্থিতির দরুন শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ক্ষেতে বা গদুদামে কৃষিজাত দ্রব্য নষ্ট হয়। কীটপতঙ্গই শস্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু হাতি, জংলী ও ছাড়া গরু-মোষ, নীলগাই, বুনো শূওর, শেয়াল, সজারু, বাঁদর, উড়োশেয়াল, কাঠবিড়ালী, ইন্দুর, চড়াইপাখি, কাক, টিয়াপাখি, ময়ূর ও অন্যান্য পাখি, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক, লাল মাকড়সা প্রভৃতি শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে।

শুধু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুর জন্যই উদ্ভিদের রোগ হয় না। জমিতে বোরণ, দস্তা ও ম্যাঙ্গানীজের পরিমাণ কম হ'লেও রোগ হয়ে থাকে। আগাছাগুলি মাটির উপরে স্থান ও সূর্যালোক আর মাটির নিচে আর্দ্রতা, পুষ্টি ও শিকড়ের বিস্তারের জন্য আবাদী শস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালায়। চারিটি পরভোজী উদ্ভিদ যেমন, স্টিগা, লোরানথাস, ওরোবাণ্ডে ও কাসকুটা জোয়ার, আখ, তামাক ও আমগাছ থেকে নিজেদের জীবন-রস আহরণ করে—সেগুলির সজীবতা শুধুই হ্রাস করে না, অনেক সময় গাছের মৃত্যু ঘটায়।

শস্যের ক্ষতি

কীট-পতঙ্গ ও রোগের জন্য ভারতে বছরে কী-পরিমাণ শস্য নষ্ট হয় তার নানা রকম হিসাব পাওয়া গিয়েছে। মোট শস্যের দশ থেকে কুড়ি শতাংশ নষ্ট হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। অর্থাৎ বছরে ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা। কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকে গদুদামে যে খাদ্যশস্য মজুত করে থাকে তার পাঁচ শতাংশ নষ্ট হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। তবে গত দশ বছরে অবিরাম চেষ্টা চালাবার ফলে সরকারী গদুদামে শস্যের ক্ষতির পরিমাণ কমে ০.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতে উদ্ভিদ রোগ ও শস্যের ক্ষতিকারক কীট সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হ'লেও এই গবেষণালব্ধ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি ব্যাপকহারে খুব বেশি কার্যকরী করা হয় নি। এর প্রধান কারণ হ'ল, প্রতিকারমূলক

অবস্থাগতালি সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার মত কোন সংস্থা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই খাদ্যের নিদারুণ ঘাটতি আর ১৯৪৩ সালে বাঙলায় দর্ভিক্ষ—যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছত্রাকরোগের জন্য ধানের ক্ষতি—হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে ভারত-সরকার ১৯৪৬ সালে শস্যরক্ষা, সংগরোধ ও গুদাম অধিকরণ গঠন করেন। তারপরেই রাজ্যসরকারগণ শস্য-রক্ষার জন্য সংস্থা গঠন করেন।

এদিকে কৃষি-উন্নয়নের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা—যেমন, চাষ-আবাদের জন্য জংগল সাফ, উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং চাষ-পদ্ধতির পরিবর্তন—অবলম্বনের ফলে শস্যের ক্ষতিকারক কীট ও রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে এবং নতুন নতুন কীট ও রোগ দেখাও দিয়েছে। কিন্তু কীট ও রোগের ভয়ে কৃষি-উন্নয়ন ব্যাহত করা যায় না। এদের দমন করাই অত্যাৱশ্যক।

কীট ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

কীট ও রোগ চারভাবে দমন করা যায়। প্রথম পদ্ধতি হ'ল, যান্ত্রিক। এই পদ্ধতিতে জালি বা ফাঁদ দিয়ে শস্যের ক্ষতিকারক কীট-পতংগ, পশু-পক্ষীকে ধরে মারা হয়, রোগগ্রস্ত গাছের ফল বা অন্যান্য ডালপালা ছেঁটে ফেলা হয় এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা উপড়ে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিটি সাধারণত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবে মাঝে মাঝে এতে যথেষ্ট সর্বাধিকার হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল, চাষ-আবাদ সংক্রান্ত। এতে কৃষিপদ্ধতির এমন পরিবর্তন ঘটানো হয় যাতে রোগ বা কীট পুষ্টি ও বিস্তার লাভ করতে পারে না। বীজ বপন ও ফসল কাটার সময়ের অদল-বদল, সারের সঠিক ব্যবহার, ঠিকমত জলসেচ এবং কীট বা রোগ প্রতিরোধক শস্যের চাষ করাই হ'ল

দ্বিতীয় পদ্ধতি। তৃতীয় পদ্ধতি হ'ল, জীববৃত্ত-সংক্রান্ত। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণে পর-ভোজী উদ্ভিদ লাগানো হয়। এগুলি কীট বিনাশ করে। আগাছা ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত গাছ নষ্ট করার জন্য এক ধরনের কীট-পতংগ ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ পদ্ধতি হ'ল, কীটবিনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য বিষের ব্যবহার। এই পদ্ধতি বহু পুরাতন হ'লেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভারত ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকহারে অবলম্বন করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। কারণ, এতে কম খরচে কীট ও রোগ খুব তাড়াতাড়ি দূর করা যায়। কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক দিনের মধ্যেই এর ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কীটবিনাশক দ্রব্য ছড়াবার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র-পাতি প্রয়োজন হয়। এই ধরনের যন্ত্রপাতির নকশা রচনার দিক থেকে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করা গিয়েছে।

প্রতিরোধমূলক বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে কীট ও রোগ দমন করা যায়—তবে নিরাময় করার চেয়ে প্রতিরোধ সব সময়েই ভাল। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হ'ল রোগ-প্রতিরোধক শস্যের চাষ, গম, বালি, জোয়ার, ধান ও তুলার বীজ বপনের আগে সেগুলি পরীক্ষা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন যাতে বীজের রোগ গাছের দেহে বিস্তারলাভ করতে না পারে আর গুদামে ক্ষতিকারক কীটপতংগের বংশবৃদ্ধি যাতে না হয়। সেজন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন। রোগ-প্রতিরোধক শস্য সৃষ্টি করা সব সময়ে সহজ নয়। তা ছাড়া এগুলি সাধারণত প্রতিরোধক ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখতে পারে না। গত কয়েক বছরে বীজের সংশোধন ব্যবস্থার বেশ চলন হয়েছে।

সংগরোধ

প্রত্যেক দেশে উপযুক্ত শস্য অনুযায়ী রোগ ও কীট দেখা দেয়। কতকগুলি রোগ ও কীট সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও বহু রোগ ও কীট সংশ্লিষ্ট

দেশ বা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। শৈষোক্ত রোগ ও কীট আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও যান চলাচলের সময় খাদ্যশস্যের সঙ্গে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারে। নতুন ধরনের কীট বা রোগ এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের শস্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে, এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এজন্যই প্রত্যেক রাষ্ট্র সরকার, নিজেদের দেশের কৃষি-অর্থনীতিকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নতুন কীট বা রোগবাহী গাছপালা দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন বা আমদানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন। একেই বলা হয় গাছপালার সংগরোধ। অন্যান্য দেশের মত ভারতও কলকাতা, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, ও বিশাখাপট্টম বন্দরে এবং দমদম, অমৃতসর, নয়াদিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিমানঘাটিতে সংগরোধ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ভারত-সরকারের ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ আইন (১৯১৪) অনুসারে এই কেন্দ্রগুলি কাজ করে এবং যেসব ধরনের গাছপালার আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই আইনবলে ভারত-সরকার দেশের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গাছ বা তার উপকরণ চলাচল নিষিদ্ধ করতে পারেন।

১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ রক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে তার অন্তর্ভুক্ত হতে বলেন। ভারত-সরকার ১৯৫২ সালে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে উদ্ভিদ রক্ষা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়। ভারত এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেয়। এই চুক্তি অনুসারে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি উদ্ভিদ রক্ষা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির তৃতীয় বৈঠক এখন নয়াদিল্লীতে চলছে। বাইরে থেকে যেসব রোগ ও কীট সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঢুকছে সেগুলি দমন করার উপায় স্থির করাই এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য।

পণ্ণপাল

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতে পণ্ণপালের আক্রমণের হিসাব রাখা হচ্ছে, যদিও এর অত্যাচার শূন্য হয়েছে আরও অনেক আগে থেকে। মরুভূমির পণ্ণপালই ভারতের শস্যের ক্ষতি করে। পূর্বে রাজস্থান থেকে শূন্য করে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূল পর্যন্ত মরু ও আধা-মরু অঞ্চলে এই পণ্ণপাল দেখা যায়। মরুভূমির পণ্ণপালের অত্যাচারে চৌষট্টিটি অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা, বিশ্বের মোট লোকসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পণ্ণপালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। ১৯৩৯ সাল থেকে ভারত-সরকারের স্থায়ী পণ্ণপাল-বিরোধী সংস্থা রাজস্থান, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের মরু অঞ্চলে কাজ করছে। এই সংস্থা পণ্ণপালের বংশবৃদ্ধি, তাদের গতিপ্রকৃতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। পণ্ণপালের অত্যাচার কমানোর জন্য ভারত অন্যান্য দেশ এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। ১৯৫৫ সাল থেকে ভারত-সরকার সৌদি আরবে পণ্ণপাল-বিরোধী দল পাঠাচ্ছেন। কারণ সেখান থেকেই পণ্ণপালের ঝাঁক ভারতে আসে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগণ কীট ও রোগবিনাশক পদ্ধতিগুলি ব্যাপক হারে চালু করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কীটবিনাশক দ্রব্য ও এগুলি ছড়ানোর যন্ত্রপাতি কৃষকদের সর্বাধিক মূল্যে দেওয়া হয়েছে এবং ইন্দর, শৈয়াল, পণ্ণপাল ও নানা ধরনের কীট ও রোগ বিনাশের জন্য ব্যাপক হারে চেষ্টা চালানো হয়েছে। রাজ্যসরকার ও অন্যান্যদের কীটবিনাশক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কারিগরি কর্মী দিয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে চৌদ্দটি কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ রক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

করা হয়েছে। কীটবিনাশের জন্য ভারতে ও অন্যান্য দেশে বিমান থেকে কীটবিনাশক দ্রব্য ছড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট এলাকার জন্য বিমান ব্যবহার করা সম্ভব নয় কিন্তু বিস্তৃত অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যে সুফল পেতে হলে বিমান

ব্যবহার করতেই হবে। ১৯৫৭ সালের মে মাস থেকে তিনটি বিমান নিয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি ইউনিট কাজ করছে। এই ইউনিট এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৫৭ হাজার একর জমিতে কীটবিনাশক দ্রব্য ছড়িয়েছে।



বিশ্ব কৃষিমেলায় আমরা

অমৃত্যুরিপ্রসাদ গুহ

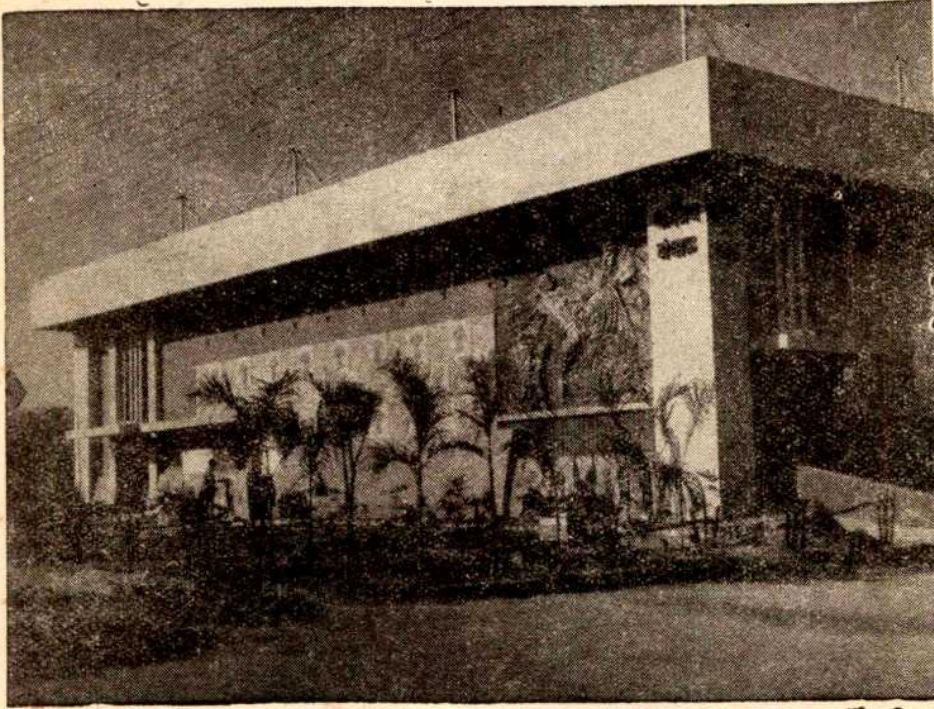
হঠাৎ ফোনে খবর এল আমরা বিশ্ব কৃষিমেলায় যোগদান করছি। আমাদের ক্ষুদ্র পশ্চিম বাঙলার পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের আশঙ্কায় এই পরিকল্পনা পূর্বে আমরা ত্যাগ করেছিলাম। এখন এ খবর পেয়ে উল্লসিত হলাম।

কিন্তু মন মাঝে মাঝে দমেও পড়তে লাগল। আমাদের সামর্থ্য সামান্য; বিশ্ববিভিন্তিক বিশাল মেলায় আমাদের ঠাই হবে কোথায়! যাক, নেমে যখন পড়েছি, এগোতে তখন হবেই। যোগাযোগ করা হ'ল সকল বিভাগের সঙ্গে এবং যাঁদের কাছে সাহায্য পেতে পারি তাঁদের সবার সঙ্গে। জোর কদমে

জরুরী কাগজের তাড়ায়। তবুও সবাই পূর্ণ সহযোগিতা করলেন, কারণ এতে সারা পশ্চিম বাঙলার সম্মানই জড়িত।

প্রচারবিভাগের কর্মচারীরা যাওয়া-আসা শুরুর করলেন, তারপর চিত্রশিল্পীর পরামর্শ অনুযায়ী প্ল্যান খাড়া করে কাজে নেমে পড়া গেল। হাতে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি, ঝড়কি কম নয়। কর্মীরা সবাই দিল্লি গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ শুরুর হয়ে গেল।

আমাদের হাতে সময় ছিল না বলে ভারত কৃষক-সমাজ, যাঁদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী, আমাদের



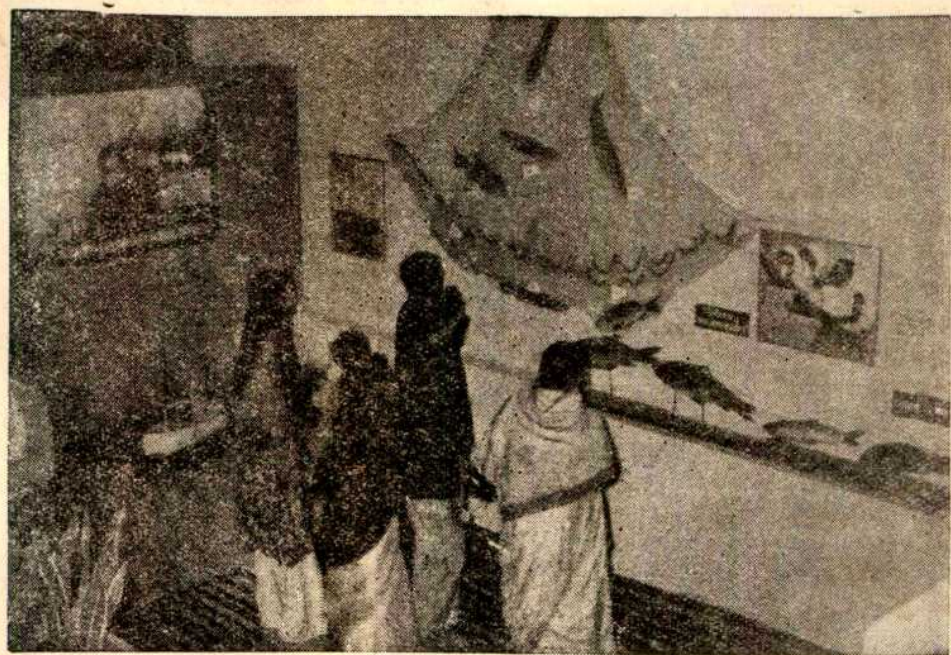
বিশ্ব কৃষিমেলার পশ্চিমবঙ্গ প্রদর্শনী মণ্ডপের বহির্দৃশ্য

পোস্টার, চার্ট, প্যানেল, মডেল ইত্যাদি সব তৈরি শুরুর হয়ে গেল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সংখ্যাতত্ত্বের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে। সংখ্যাতত্ত্ব-বিদেরা প্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন জরুরী এবং অতি

পূর্বেকার তৈরি একটি মণ্ডপ দিলেন, তার না আছে ছাদ, না আছে রঙচঙ। প্রথমেই ঠিক হ'ল অ্যালকাথিন (প্লাস্টিক) কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে কিন্তু তা হ'লে ধুলোবাণি পড়লে দেখা যাবে আর



বিশ্ব কৃষিমেলায় পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎচালিত টেকিতে ধানভানার মডেল



বিশ্ব কৃষিমেলায় পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপে মৎস্য-শাখা

তা ছাড়া ছাদ দিয়ে আলো এলে নিচেকার বিজলী-আলোর প্রভাব ভাল খুলবে না। কী করা যায়? ঠিক আছে, অ্যালকাথিনই চলুক। কালো অ্যালকাথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া শূরু হ'ল—শূরু মাঝখানের টুকরোটা সাদা থাকবে, কারণ তার নিচেই বন অর্থাৎ তাতে বাঘে কুমিরে এক ঘাটে—বনসম্পদ দেখান হবে—ধনেশ ইত্যাদি হিমালয়ের পাখিও থাকবে।

ভেতরে আস্তর চুনকাম ডিস্টেম্পার দেওয়া চলছে আর কলকাতার আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট্ কলেজের একদল ছেলে একজন শিল্পনির্দেশকের উপদেশ মত প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে তিন ডিজাইনের মোটিফ করছে তিন দেয়ালে সারি সারি সেটে দেবার জন্য। এক পাশে লাঙল-জোয়াল, সেইসঙ্গে চাষী লাঙল দিয়ে জমি চষছে—মনে হবে যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি। ডানপাশে কিশাণী ধান বুনছে জমিতে, অপূর্ব ভঙ্গিমা তার ফুটে উঠেছে রেখায়। সামনে ধানের গোছা আর সেইসঙ্গে কিশাণি নিয়ে চলেছে বাঁক-কাঁধে ধানের গোছা। কিশাণীর মাথায় ধানের আঁটি আর তাদের ছেলে চলেছে বাঁশ বাজিয়ে আনন্দে। এরই নিচে ব্যাক প্রজেকশনের পর্দায় দেখানো হবে বাঙলার কৃষি-সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্র। ঢোকবার মুখে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সুন্দর কয়েকটি কথা—মনে হয় পাথর কেটে বসানো। আর বের হবার পথে মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায়ের বাণী।

দিল্লীর শীতে ছেলেরা একেবারে কাবু, কাজ-পাগলা বাচ্চা শিল্পীদের খেলাই থাকে না ভর দুপুরেও বালাক্রান্ত তাদের মাথা থেকে খোলার কথা। এইভাবে দিবারাত্র কাজ চলেছে এগিয়ে। কলকাতা থেকে সমানে গাছপালা আর অন্যান্য মাল-পত্র আসছে, সুপারি-নারকেলের চারা এসেছে কলকাতা থেকে সামনের আঙিনায় বসিয়ে দেবার জন্য। তাদের তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দাও জল, নিয়ে এস জলসিঙনের যন্ত্র। কত রকমের গাছ-গাছড়া এল—হিমালয়ের অর্কিড, ক্রীপটোমেরিয়ার গাছ আরও কত কী! আর এল বনৌষধি। সুপারি, নারকেলের গাছ বসিয়ে দেওয়া হ'ল সামনের আঙিনার দুই কোণে সুন্দর করে। নানান অবস্থার ছাঁটা চায়ের গাছ এল জলপাইগুড়ি থেকে।

সেগুলোকে বাঁদিকের আঙিনায় কাঠের বাগ্জে সুন্দর করে পর পর সাজিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। সব-প্রথম গাছ থেকে সব 'দু'টি পাতা একটি কুড়ি' বের হ'তে শূরু করেছে।

এরই পেছনে বাওয়া পটারিজ তাঁদের গুচ্ছের আয়না-সাজানো দোকান খুলে বসেছেন। দেহ-পসারিণীর মত! দেখে আমাদেরই লজ্জা হয়। কী করা যায়? তাকে ঢাকবার জন্য কাঠের ফ্রেমে প্লাইউড লাগিয়ে একটা দুর্গপ্রাচীরমত তুলে দেওয়া হ'ল আমাদের বাঙলার লজ্জাবনতা শ্যামলী মেয়ের উপযোগী করে।

এবার বাগ্জ খোল আর সাজাও। যদিও আমরা এসেছি সবার পরে তবুও কিন্তু ১১ই ডিসেম্বর সকালে আমরা একেবারে তৈরি হয়ে গেলাম আমাদের মন্ডপ নিয়ে। অন্যান্য রাষ্ট্রের আসলে মন্ডশিকল হ'ল এই যে, তাঁদের মোয়া হাতের চেয়ে বড়। তাঁরা প্রথমে এসেই কয়েক লক্ষ টাকার বিরাট বাড়ি বানাতে শূরু করেছেন—কেউ সাঁচীর স্তূপ, কেউ মন্দিরের গোপদুরম্ ইত্যাদি। ডেয়ারির ওঁরা গোরুর বাঁট দেখাতে যেয়ে তো ভুলে গোরুর বাঁট পাচটাই বানিয়ে ফেললেন। তারপর পাশের লোকেরা বলাতে একটা কমানো হ'ল। গোরুর যে বাঁটের সঙ্গে আমাদের আশৈশবের পরিচয়, তার সঙ্গে এ বাঁটের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া ভার হ'ল।

আমাদের পশ্চিম বাঙলার মন্ডপে লোকের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল বোধ হয় ঢেঁকিটি। ঢেঁকিতে ধান ভানা এঁদিকের লোকে দেখে নি। কাজেই কৃষ্ণনগরের মডেল ঢেঁকি যখন ইলেকট্রিক মোটরে চলতে শূরু করল তখন তো সবাই তাজ্জব। তার পর মাছের চমৎকার মডেল, সুন্দরবনের রাজা-বাঘ জংগল থেকে বের হচ্ছে, সামনের দেয়াল জুড়ে আমাদের কৃষির সব নানান তত্ত্ব আর কুলোয় রাখা ধান-চালের নমনা—এসবও দর্শকদের উপভোগ্য হয়েছে খুবই।

দেশী-বিদেশী সবাই আমাদের মন্ডপের প্রশংসায় পুষুপুষু। সবচাইতে বড় আমেরিকার প্যাভেলিয়ান জৌলুশে আমাদের হয়তো হারিয়েছে কিন্তু রুচিতে আমরা প্রথম। এবং রুচিই তো প্রধান।

সার্থক শ্রাম গড়া কোলেঘাই

শ্রীমতেন্দ্রমোহন ঘোষ

কৃষি-উপদর্শক, কোলেঘাই উদ্যোগ

পুনর্বাসন পরিকল্পনা

পশ্চিম বাঙলা ভারতের একটা সমস্যাবহুল রাজ্য। আয়তন অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় এখানকার মানুষের খাওয়াপরাহার সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে কয়েক লক্ষ লোক পূর্ব বাঙলা থেকে তাদের চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এই পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নেওয়ায় দেশের উৎপন্ন খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এইসমস্ত গৃহহীন মানুষের—যাদের আমরা উদ্ভাস্তু বলি—সুষ্ঠু পুনর্বাসনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

কিন্তু জমি কোথায়? সরকার সূচিন্তিত পরিকল্পনায় দেশে জমিদারি দখল ও ‘অধিক খাদ্য ফলাও’ আন্দোলন শুরুর করলেন। জমিদারি দখলের ফলে সরকার কয়েক লক্ষ একর জমি হাতে পেলেন এবং দেশের আবাদযোগ্য পতিত জমিগুলি শস্যশ্যামল হয়ে উঠল। নগণ্যসংখ্যক উদ্ভাস্তু সরকারী ও স্বীয় চেষ্টায় পুনর্বাসিতও পেল। তাতে কিন্তু দেশের খাদ্যাভাব পুরোমাত্রায় মিটল না। সরকার এবার পরিকল্পনা করলেন দীর্ঘদিনের অনাবাদী পতিত জমি পুনরুদ্ধারের—যেগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে বন্ধ্যা বলে অবহেলিত হয়ে এসেছে, মানুষের অবহেলার দরুন যেগুলি আজও প্রকৃতির ক্রীড়ারাজ্যে পরিণত হয়ে তৃণশূন্য মরুসদৃশ রূপ ধারণ করে রয়েছে। এমন একটা জমি সরকারের কৃষি-বিশেষজ্ঞরা হাতে নিলেন পরীক্ষামূলক চাষবাসের কাজে লাগাবার জন্য। মৌদীনীপুর জেলার খজাপুর আর ঝাড়গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রায় ২,২০০ একর জমি—যার চেহারা অনেকটা বিরাট আকার কচ্ছপের

পিঠের মত। জমি তৃণশূন্য। মানুষের পুরুষ-মানুষক্রমিক অবহেলায় ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির জলে অবাধে জমির এক প্রান্ত মাটি সহ সারাংশ ধুয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। গড়ানো জলের তোড়ে বেশি মাটি ধুয়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ছোট-বড় অসংখ্য নালার সৃষ্টি হয়েছে। জমিতে ছোট-বড় পাথর মাথা চাড়া দিয়েছে। মাটি যেন দৈন্যের চরম সীমায় পৌঁছে মানুষকে ভ্রুকুটি করছে। সমুদ্রতল থেকে এর পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা হ’ল প্রায় ২৭০ ফুট। পৃষ্ঠদেশ হ’তে এর দু’পাশের গ্রামগুলির দূরত্ব ১ থেকে ২ মাইল ক্রমশ নিচের সমতলে।

‘কোলেঘাই মৃত্তিকা-সংরক্ষণ পরিকল্পনা’ নাম দিয়ে বিশেষজ্ঞরা এই ভূমিসংস্কারের কাজে নামলেন। কোলেঘাই শব্দটা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কারণ স্থানীয় ‘কালিয়াঘাই’ নদীর উৎস। এই পরিকল্পনার কাজ শুরুর দুইখুন্ডি নামক ছোট গ্রামের কাছে। ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে এখানে ভূমিরক্ষা পরিকল্পনার কাজ যখন প্রথম শুরুর হয় তখন সেচ, বন ও কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা ভাগাভাগি করে একটা নির্দিষ্ট নকশার খসড়ার উপর কাজ চালাতে থাকেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এই বিস্তীর্ণ অহল্যাকে সজীব করে মানুষের কল্যাণী রূপে গড়ে তোলা। তাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হ’ল মাটির ক্ষয়নিরোধ করা।

সেচবিভাগ তৈরি করতে থাকেন ছোট-বড় বাঁধ এই বিস্তীর্ণ উষর জমির মধ্যে প্রাকৃতিক ছোট-বড় নালার মূখে—যাতে নালাগুলি বর্ষার জলস্রোত বয়ে আকারে আরও বড় ও গভীর হ’তে না পারে, ধীরে ধীরে পলি পড়ে মজে যায়।

বনবিভাগ এই পতিত জমির মাঝামাঝি ঠিক পৃষ্ঠদেশ বরাবর তৈরি করতে থাকেন প্রায় ৭০০-৮০০ ফুট চওড়া ও ৮-৯ মাইল লম্বা হিজলী-বাদাম, শাল, সেগুন ইত্যাদির বন। বন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল মাটিকে প্রকৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করা। গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থাকায় গড়ানো জলে ও বৃষ্টির জলের ঝাপটায় বেশি মাটি ধুয়ে যেতে পারে না। মাটির জলধারণ-ক্ষমতা বাড়ে। বনাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়ে।

আর কৃষিবিভাগ বনের উন্মুক্ত গড়ানো জলকে বাধা দিয়ে তাকে চাষের কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করতে থাকেন এই ঢালু জমির উপর স্তরক্রমিক বাঁধ দিয়ে চাষের জন্য জমি ও সেই জমিতে পরীক্ষা-মূলক চাষ। এই স্তরক্রমিক বাঁধ দেওয়া জমির মধ্যে জমি-চষার নিয়ম হচ্ছে—জমির ঢালুর বিপরীতে লাঙল চালানো। এই নিয়মে চাষ করলে প্রতিবার লাঙল চলার সময় যে স্তরক্রমিক সিঁথির সৃষ্টি হয়, গড়ানো জল তাতে বাধা পেয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে প্রবেশ করে মাটিকে সরস রাখে। এইসব জমিতে ফসল লাগানোর সময়ও লাইন করে অনুদ্রুপ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। দেশের অসমতল অঞ্চলে এইভাবে স্তরক্রমিক বাঁধ দিয়ে জমি তৈরি করে, স্তরক্রমিক চাষ ও ফসল লাগানোর সার্থকতা হচ্ছে মাটির ক্ষয়নিরোধ করে, মাটিকে সরস করে, তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা।

প্রায় দু' বছর ধরে মাটির ক্ষয়নিরোধ পরিকল্পনার কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে এইভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এই 'ডাহির' (স্থানীয় ভাষায় 'ডাহি' শব্দের অর্থ অনুদ্রুপ পতিত ডাঙা জমি) বার্ষিক রূপ তো পালটালই, তা ছাড়া এই বিস্তীর্ণ এলাকার গড়ানো জল এইভাবে বাধা পাওয়ায় স্থানীয় কালিয়াঘাই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণেও কিছুটা সাহায্য করেছে।

জমির এই পরিবর্তন কৃষি-বিশেষজ্ঞরা বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে এখানকার চাষবাসের সুদীর্ঘচিন্তিত পরিকল্পনা নিলেন যেসব ফসলের চাষে

পরিমিত বৃষ্টির জলই যথেষ্ট এবং যেগুলি তাড়াতাড়ি—মাত্র ১০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে কাটবার বা তোলার উপযুক্ত হয়, যেগুলির বপনের সময়ের সামান্য তারতম্যে ফলনের বিশেষ ক্ষতি হয় না—দুলাল, ধারিয়াল প্রভৃতি জলদি আউশ ধান, জলদি চীনাবাদাম (পি নং ৪), জলদি মৃগকলাই (মৃগ টাইপ নং ১), অড়হড় এবং পাটের পরিপূরক হিসাবে সিসল ইত্যাদি ফসল এখানকার চাষের উপযোগী বলে গণ্য হয়েছে। চাষের এই পরি-কল্পনা সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর সরকার কৃষিবিভাগের মাধ্যমে এখানে উন্মুক্ত-পদনবাসন পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষিবিভাগের কর্মীরা ১৯৫৮ সালে এই ডাহিতে চাষে নেমে নিজেদের উপর একান্ত আস্থা রেখে প্রায় ৪৯০ একর জমিতে আউশ ধান ও ৬০০ একর জমিতে সিসল চাষ করেন। এই চাষের পিছনে দেশ-বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ থাকা সত্ত্বেও শুধু বর্ষার স্বল্পতার জন্য প্রথম অবস্থায় ধানের চেহারা ভাল দেখালেও ফলন কিন্তু আশা অনুযায়ী হয় নি। ৪৯০ একর মত জমিতে ধানের চাষ করে মাত্র ৪,০০০ মণের মত ধান পাওয়া যায়। এই জায়গায় ভবিষ্যৎ চাষ-বাস সম্বন্ধে নানান সমালোচনা শোনা যায়। এখানকার কর্মীরা তাতে কান না দিয়ে ধান কাটার পর বছরের বাকি সময়টা পরবর্তী বছরের কাজের সুবিধার্থে জমিগুলিতে ছোটবড় আইল বাঁধা ও বর্ষার গড়ানো জল ধরে রাখার জন্য বাঁধ বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকেন। তা ছাড়া তাঁরা সমালোচনার ভালটুকু গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালের চাষে সাফল্য-লাভের আশায় গোড়া থেকেই পূর্ব বছরের অভিজ্ঞতা সম্যক কাজে লাগাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

আগের বছর সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির মধ্যে চাষে নেমে কর্মীদের প্রতি পদে পদে নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছেঃ প্রথমত, বহুকালের অনাবাদী ক্ষয়িষ্ণু জমিতে যেখানে পাথর—কেবল পাথর ছাড়া একগাছি তৃণও চোখে পড়ত না, সেখানে পাথর ভুলে জমির ভয়াবহ ভাব দূর করে ধানচাষ

করার পর চারাগাছে ব্যাপকভাবে উই (স্থানীয় নাম 'ভুস্কা') লেগে গিয়ে অনেক বড় বড় জমিকে প্রায় ফসলশূন্য করে ফেলে। তার জন্য জমিতে নানা রকম কীটনাশক ছড়িয়েও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় নি। ১৯৫৯ সালে সেই উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচতে কম্বীরা জমিতে ধানের বীজ বোনার সাথে সাথে একর-প্রতি দশ পাউন্ড হারে কীটনাশক ওষুধ জমির মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বিশেষ উপকার পেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, এখানকার নিঃস্ব মাটিকে সরস করতে কোন কোন সার কত পরিমাণ দিলে চাষে সফল পাওয়া যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে জৈবসার হিসাবে শহরের আবর্জনা-পচা সার একরপ্রতি দুই টন, ফসফরাসী সার হিসাবে হাড়গুড়ো একর-প্রতি এক মণ ও নাইট্রোজেনী সার হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট ১৫ সের হারে ব্যবহার করা হয়। সে তুলনায় এ বছর ১৯৫৯ সালে শহরের আবর্জনা-পচা সার একর-প্রতি চার টন, হাড়গুড়ো চার মণ ও অ্যামোনিয়ম সালফেট ২০ সের হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেখা যাচ্ছে, সব সময় রাসায়নিক সার অপেক্ষা জৈবসার বেশি ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, কারণ এই বড়ভুস্কু মাটির ক্ষুধা মেটাতে প্রচুর জৈবসারেরই দরকার।

তৃতীয়ত, কৃষিবন্ধু জলের অভাব। এখানে সেচের কোন সুবিধা নেই। চাষের জলের জন্য সব সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। আগের বছর সময় সময় আকাশে প্রচুর মেঘ থাকা সত্ত্বেও একবিহীন বৃষ্টিপাত হয় নি—বিশেষ করে ধানে ফুল আসার ঠিক আগে অগাস্ট মাসে একটানা খরা হওয়ায় ফসলে ঠিকমত ফুল আসতে পারে নি। এবার অবশ্য চাষে জলের অভাব না হলেও ধান-কাটার সময় অতিবৃষ্টিতে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ৬০০ একর জমি থেকে ৯,০০০ মণেরও বেশি ধান পাওয়া গেছে। ৬০০ একর জমিতে ধানচাষের যাবতীয় খরচখরচা বাদে এবার লাভের অঙ্ক দাঁড়ায় ৪৫,৫০০ টাকার মত।

পরীক্ষামূলকভাবে সিসলের জমিতে এবার ফসলের দুই সারির মধ্যে মধ্যে লাউ, কুমড়া, ঝিঙে,

উচ্ছে, শশা ইত্যাদি সবজির চাষ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

এবারকার চাষ ও ফসল দেখে এখানকার উদ্ভাস্তুরা তাঁদের প্রাপ্য জমি পাওয়ার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, এইসমস্ত জমি তাঁদের হাতে পড়লে তাঁরা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারবেন। এখানকার বিরাট বিরাট জমি-গুলি উদ্ভাস্তুদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে যে ছোট ছোট জমি তাঁরা পাবেন, তাতে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে জৈবসার দিতে পারবেন। জমি চাষের জন্য প্রত্যেক উদ্ভাস্তু-পরিবারকে অন্তত একজোড়া বলদ পুষতে হবে, তাতে সারা বছর যে গোবর পাওয়া যাবে তা দিয়ে অনায়াসে কমপক্ষে দেড় একর জমিতে একশ' মণ হারে জৈবসারে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সবুজসারের পরিপূরক হিসাবে এখানকার জমির ধারে ধারে অসংখ্য বন-কলমী গাছ লাগানো হয়েছে। উদ্ভাস্তুরা একটু সচেতন হয়ে বর্ষাকালে সেই বনকলমীর ডগা ও পাতা সংগ্রহ করে নিজেদের জমি নিড়ানোর পর আগাছাগুলি বয়ে নিয়ে এসে গোবরের সাথে মিশিয়ে দিলে সারের গুণ ও পরিমাণ দুই-ই বাড়বে—আরও বেশি জমিতে সেই সার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে ফসল ভাল হবে, ফলনও বেশি পাওয়া যাবে। তবে যান্ত্রিক যুগে এইভাবে মামুলী প্রথায় চাষ-আবাদের জন্য এই জমি ব্যবহার না করে এখানে ষোঁথ কৃষি-পদ্ধতি চালু করলে ভবিষ্যতে এইসব ছিন্নমূল মানুষের দ্বারা সরকারের অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে সহায়তা হবে।

কেলেঘাই-এর এই অনাবাদী বন্দ্য পতিত জমির বৃকে সবুজ ফসলের হাসি সরকারের পরিকল্পনার সার্থকতার যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তাতে দেশের সমস্ত মানুষের মনের সন্দেহ দূর হয়েছে। তাই সরকার বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলেও অনুরূপ পরিকল্পনায় কাজ শুরু করেছেন এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পূর্বদিল্লীয়ায় যত পতিত জমি আছে, সেগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য পরি-কল্পনা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মাছের চাষ

শ্রীমতী অমিয়া সরকার

বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ-ভাত। কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এই দুইটি জিনিসেরই আজ একান্ত অভাব। বাঙলাদেশ, বিশেষত পূর্ববঙ্গ নদীবহুল, সেইজন্য দেশবিভাগের আগে আমাদের দেশে মাছ সরবরাহের সমস্যা এখনকার মত এত সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। বাঙালীর সাধারণ খাদ্যবস্তুতে প্রোটিনের একান্ত অভাব। আমরা সাধারণত মাছ দিয়েই সেই ঘাটতি পূরণ করে থাকি।

মাছ একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। মাছে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন এবং কিছু পরিমাণে ফসফরাস আছে। সেই কারণে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আজকের এই খাদ্যসমস্যার দিনে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মাছের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করতে হলে মাছের চাষ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য ভারত-সরকারের এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় দেশে মাছের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কিন্তু প্রয়োজনের অনুরূপে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এজন্য মোট ১২ কোটি টাকা ব্যয় করছেন। বর্তমানে সারা ভারতে বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টন মাছ ধরা হয় এবং তার মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই সামুদ্রিক মাছ।

সমুদ্রে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কীভাবে মাছ ধরা হয়, সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জায়গায় শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কলিকাতার “ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টার”, দেশের আভ্যন্তরীণ জলভাগে মাছের চাষ সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের একমাত্র

কেন্দ্র। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের জলাভূমিগুলিতে মাছের চাষ করলে তাড়াতাড়ি মাছ পাওয়া সম্ভব। বারাকপুত্রের “ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশনে”র গবেষণার ফলাফলের উপর নির্ভর করে সুবিস্তৃত অঞ্চলে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব জায়গায় প্রতি একরে বৎসরে ৮ শতাধিক পাউন্ড মাছ উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। বৃন্দ জলাশয়গুলিতে উন্নয়নের সাহায্যে মাছের উৎপাদন বাড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে যেসমস্ত ধানজমিতে জল জমে থাকে সেইসব জমিতে মাছের চাষ করে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে।

এদেশীয় রুই-কাতলা প্রভৃতি মাছ ইউরোপের ও-ধরনের মাছের চেয়ে বড় এবং এদেশের উষ্ণ আবহাওয়াতে তারা প্রায় সারা বছরই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে বলে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে গড়ে প্রতি একর পরিমিত পুকুরে অতি সহজেই ১০ মণ থেকে ১২ই মণ পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা যেতে পারে।

তাঞ্জোর জেলার ভল্লাম নমক জায়গায় একজন ইংরেজ দু’টাকায় দু’ পাউন্ড মাছের পোনা কিনে আনুমানিক ৪-৫ একর পরিমিত জলাশয়ে ছেড়েছিলেন। সেই পোনার মধ্যে কোনও রকম মৎস্যশাী মাছ ছিল না এবং বর্ষার আগে পুকুর থেকে হিংস্র মাছ নিমূল করা হয়েছিল। দেড় বৎসর পরে তিনি মাছ তুলে দেখেছিলেন যে, দু’ পাউন্ড মাছের পোনা থেকে ৪,০০০ পাউন্ড (৫০ মণ) মাছ উৎপন্ন হয়েছে। এ থেকেই অতি সহজে লাভের হিসাব ধরা যায়।

স্যর কে জি গুপ্ত (১৯০৮) বলেছিলেনঃ “যদি একটি এক একর পরিমিত পুকুরে প্রত্যেক বৎসর

নিয়মিতভাবে মাছ ছাড়া যায়, তা হ'লে অতি অল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে বৎসরে অন্তত একশ' থেকে দু' শ' টাকা পর্যন্ত লাভ হবে—যেখানে এক একর ভাঙা জমিতে ৫০ থেকে ৭৫ টাকার বেশি লাভের আশা কোনও ক্রমেই করা যায় না। তাও আবার অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার উপর অনেক নির্ভরশীল।”

রুই-কাতলা প্রভৃতি মাছ বম্বুজলে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। পুকুর থেকে শোল শাল প্রভৃতি মাছ বার করে ফেলা দরকার। রুই-কাতলা জাতীয় মাছ জলের প্রতি স্তরে খাদ্য সংগ্রহ করে। সেইজন্য পুকুরে মাছ ছাড়ার পর কিছু সার বা কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সরবরাহ করতে পারলে প্রতি একর জলাশয়ে ১২ থেকে ১৫ মণ মাছ উৎপন্ন করা সম্ভবপর হবে। মৎস্যচাষী যদি মাছের ডিম বা ছোট ছোট ‘আঙুলে’

পোনা বাজারে বিক্রি করেন, তা থেকেও প্রচুর লাভ হয়।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর ডোবা, পুকুর প্রভৃতি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। গ্রামের অধিবাসীরা যদি নিজেদের চেষ্টায় সেইগুলির সংস্কার করে নিয়ে মাছের চাষ করেন তা হলে তাঁরা স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর প্রোটিন-খাদ্য পান, আর আয়ের পথও কিছু পরিমাণে প্রশস্ত হয়। অনেক বড় বড় পুকুর-বিল ম'জে যাচ্ছে, সেইগুলিরও সংস্কার করে সমবায় পদ্ধতিতে মাছের চাষ করতে পারলে দেশের বেকার-সমস্যারও কিছু সমাধান হয়। অনেক শিক্ষিত যুবককেই বেকার-জীবন যাপন করতে হচ্ছে, তাঁরা যদি সমবায় পদ্ধতিতে মাছের চাষের ব্যবস্থা করেন, তবে লাভবানই হবেন। তাঁদের অর্থ-সাহায্য করার দায়িত্ব সরকারই বহন করবেন। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী করতে হলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আবশ্যিক।



তিন ফসলের গান

ঐশাশ্চি পাল

আমরা চাষীর দল।
লাঙল মোদের হাতের হেতের
আর হেলে জোড় সম্বল॥
ক্ষেতির কাজে সবাই জুড়ি
নামলে মাঠে জল।
ফলাই হেঁওতি ফসল—
ও ভাই হেঁওতি ফসল॥

মোরা হাওর-হাবড় দূ'পায় দলি,
খরান গায়ে সয়,
জ্বর-জাড়িতে হই নে কাবু,
কাজে কামাই নাহি হয়।
আবার খামার দিতে সবাই জুড়ি—
বাছি আগড়া-চটে-পল।
ফলাই ভাদুই ফসল—
ও ভাই ভাদুই ফসল॥

লক্ষ্মী দয়া করলে পরে
মরাই বাঁধি ঘরে ঘরে,
সোঁত বছর খাই পরান ভ'রে
গতর খাটার ফল।
ফলাই চোইতি ফসল—
ও ভাই চোইতি ফসল॥

শস্যের অপচয় নিবারণে

গুদামঘর

কৃষিপণ্যের অপচয় নিবারণ এবং পল্লী-অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে গুদামঘর স্থাপন জাতীয় কার্যসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যশস্য মজুত করা, চাষীরা যাতে সহজে ঋণ এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন, এই পরিকল্পনায় সে সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। এদেশে মজুত ব্যবস্থার অভাবে প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। এটা বিবেচনা করলেই এই গুদামঘর স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

১৯৫৬ সালে এই উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন গঠিত হয়। এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য মজুত করবার উপযোগী ১৮টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর স্থাপিত হয়েছে। গত বৎসর সকল রাজ্যেই রাজ্য গুদামঘর কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্য কর্পোরেশনগুলি ৬৫টি গুদামঘর স্থাপন করেছেন। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও ১০টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর এবং ১২০টি রাজ্য গুদামঘর স্থাপিত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৫ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য মজুতের উপযোগী ৩৫০টি গুদামঘর খোলবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য কীভাবে ঋণদান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা যায় তা পর্যালোচনার জন্য ১৯৫১ সালে পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সমগ্র দেশে খাদ্যশস্য মজুত করবার সুবিধার জন্য অনেক গুলি গুদামঘর খোলবার সুপারিশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৫৬ সালে কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাত) কর্পোরেশন আইন পাস হয়। এতে জাতীয় সমবায়

উন্নয়ন এবং ওয়ারহাউসিং বোর্ড, সেন্ট্রাল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন এবং প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্যভাবে মজুত করবার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। মজুত খাদ্যশস্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য নানাপ্রকার কীট-বিনাশক ঔষধ ছড়িয়ে এবং অন্যান্য প্রতিকার ব্যবস্থা করে শস্য রক্ষা করা হয়। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

বর্তমানে ৫০টি বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যশস্য মজুত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে খাদ্যশস্য, তৈল-বীজ, পশুখাদ্য, কাঁচা তুলা, তুলাবীজ, কাঁচা পাট, লঙ্কা, গুড়, আদা ও গোলমরিচ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও মজুতের চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেই হুগলি জেলায় লাক্ষা মজুত করবার জন্য তাপ-নিয়ন্ত্রিত গুদামঘর, হিমাচল প্রদেশের থিওগে আলু ও আপেল মজুতের জন্য ঠান্ডা গুদাম এবং মাঙ্গালোরে কফি মজুত করবার জন্য গুদামঘর স্থাপনের পরিকল্পনা রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে। কোলপুরে তালের গুড়, সাংলীতে লঙ্কা এবং কোজিকোদিতে গোলমরিচ, আদা এবং নারকেল-শাঁস মজুত করবার জন্য কেন্দ্রীয় গুদামঘরে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদেশের কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই গুদামঘরগুলি স্থাপিত হচ্ছে বলে এগুলিকে গ্রামীণ পরিবেশে স্থাপন করা হচ্ছে। গুদামঘরের রসিদ দেখিয়ে যে-কোন উৎপাদক স্বল্প সূদে ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তাকে মাল হস্তান্তর করতে হয় না। উৎপাদক ও

ব্যবসায়ীরা মজুত মালের রসিদ দেখিয়ে যে ঋণ গ্রহণ করেন তা অন্য ব্যবসা বা কৃষিকার্যের উন্নয়নে ব্যয় করতে পারেন। আবার বাজারের অবস্থা লাভজনক মনে হ'লে বিক্রয় ক'রে দিতে পারেন। এই সময়ে কেবলমাত্র মালের রসিদ হস্তান্তর করলেই হয়।

সদুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের অপচয় নিবারণ, মাল চলাচলের ব্যয় হ্রাস, চুরি, আগুন, বন্যা প্রভৃতির বীমা ক'রে পণ্যরক্ষা প্রভৃতি নানা সুবিধা এই গুদামঘর স্থাপনের ফলে উৎপাদক ও ক্রেতারা ভোগ করতে পারছেন। এই গুদামঘরে কী ধরনের দ্রব্যসামগ্রী মজুত রাখা হবে সে সম্পর্কে একটি মান নির্ধারণের চেষ্টা হচ্ছে। এই মানের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটলে ভবিষ্যতে ক্রেতারা মাল দেখে নেবার হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি পাবেন। কারণ মালের উল্লেখই দ্রব্যের উৎকর্ষ জানা হবে।

কর্পোরেশন তাদের কার্যক্ষেত্র ক্রমশই সম্প্রসারিত করছে ব'লে গুদামঘরগুলিতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় গুদামঘরগুলিতে মজুত খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৯৭,৫০০ মণ। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬,৩৬,০০০ মণ হয়েছে। এগুলির মজুত করবার ক্ষমতাও ২,৫২,৫০০ মণ হ'তে বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৫২,৫০০ মণ হয়েছে। তফসিল এবং সমবায় ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় গুদামঘরের রসিদ প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ ক'রে কৃষক ও উৎপাদকদের ১৯৫৮ সালে ১২,১০,০০০ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি টাকা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন ১৯টি গুদামঘরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪টি, বোম্বাইতে ৩টি, কেরালাতে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাদ্রাজে ১টি, মহীশূরে ২টি, উড়িষ্যাতে ১টি, পাঞ্জাবে ১টি,

রাজস্থানে ২টি, উত্তরপ্রদেশে ১টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ১টি রয়েছে।

বর্তমান বৎসরে ১৩টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্যে রাজ্য কর্পোরেশনগুলির কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই কর্পোরেশনগুলির পরিচালনাধীন গুদামঘরগুলিতে প্রথম ছয় মাসে ১৫ লক্ষ বস্তা বা ছয় লক্ষ মণ খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা হয়েছে। আসাম এবং কেরালাতে এখনও এরূপ গুদামঘর স্থাপিত হয় নি।

যতগুলি গুদামঘর চালু আছে এবং বর্তমান বৎসরে যতগুলি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নিচে দেওয়া হ'ল:

পশ্চিমবঙ্গ—৭, ২; অন্ধ্রপ্রদেশ—৪, ৪; আসাম—৪, ২; বিহার—৭, ৭; বোম্বাই—৮, ৭; কেরালা—৪, ৩; মধ্যপ্রদেশ—৯, ১১; মহীশূর—৩, ৫; মাদ্রাজ—৭, ৩; পাঞ্জাব—১, ৪; রাজস্থান—৭, ১০; উত্তরপ্রদেশ—১২, ১৮; উড়িষ্যা—৪, ৪।

আইনে দুই ধরনের কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়েছে—কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন এবং রাজ্য গুদামঘর কর্পোরেশন। বিদেশে রপ্তানি বা আন্তঃরাজ্য ব্যবসার জন্য কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন গুদামঘরের ব্যবস্থা করবেন। বিভিন্ন রাজ্যের নিজ প্রয়োজন মেটাবার জন্য রাজ্য কর্পোরেশন গুদামঘর স্থাপন করবেন।

কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন একটি ডাইরেক্টর বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই বোর্ডে (১) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর বোর্ডের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ; (২) স্টেট ব্যাংকের প্রতিনিধি, (৩) তফসিল ব্যাংক, সমবায় সমিতি, জীবনবীমা কোম্পানি, অননুমোদিত সমিতি এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসায় নিযুক্ত যৌথ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে কর্পোরেশনের অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত চারজন ডাইরেক্টর এবং জাতীয় সমবায়, উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ড কর্তৃক মনোনীত

দুইজন ডাইরেক্টর আছেন। উল্লিখিত ডাইরেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর বোর্ড একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিয়োগ করবেন।

রাজ্য পর্যায়ে কর্পোরেশনগুলিতে অনুরূপ ডাইরেক্টর বোর্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত ৫ জন ডাইরেক্টর এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন ডাইরেক্টর এই বোর্ডে আছেন।

কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। একে ১

হাজার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ শেয়ারের ভাগ করা হয়েছে। অনুমোদিত মূলধনের অর্ধেক ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ইস্যু করা হয়। ১৯৫৬ সালের কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাত) কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী রাজ্য গুদামঘর কর্পোরেশনগুলির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটির বেশি হতে পারবে না। একে একশত টাকা মূল্যের শেয়ারে ভাগ করা হবে। কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন এবং রাজ্যসরকার সমভাবে রাজ্য কর্পোরেশনগুলিকে মূলধন যুগিয়ে থাকেন।



স্বল্প-সঞ্চয় অভিযান

মেদিনীপুর জেলায় ১৯৫৯ সালের শেষ ৯ মাসে স্বল্প-সঞ্চয় ঋণপত্রের বিক্রয়লক্ষ্য নীট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪,৪৭,০৭৯ টাকা। এই জেলায় স্বল্প-সঞ্চয় পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা প্রায় ৩৬,০০০টি 'পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' এবং ২০০ জন ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের অস্তিত্ব দ্বারাই প্রমাণিত। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলার ১৭৬টি ডাকঘর থেকে জাতীয় সঞ্চয় ঋণপত্র বিক্রি করা হয়।

মেদিনীপুরে ৫ই থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত স্বল্প-সঞ্চয় সংক্রান্ত একটি বিশেষ অভিযান সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। এই সপ্তাহে উক্ত পরিকল্পনাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী, সেমিনার, আলোচনাচক্র, জনসভা ও নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করা হয় এবং মেদিনীপুর শহরের একাংশে গৃহে গৃহে ঋণপত্র বিক্রয় অভিযান চালানো হয়। ৭৪৪ টাকা মূল্যের ঋণপত্র বিক্রি করা হয়।

মেদিনীপুরের জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন মেদিনীপুরে অভিযান সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের লোকরঞ্জন শাখা স্থানীয় বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল 'এ' 'দিশারী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত তালিকা, মানচিত্র ও আলোকচিত্রের সাহায্যে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল ৫ই জানুয়ারি জনসভা দ্বারা সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জনসাধারণের নিজ স্বার্থে এবং দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে স্বল্প-সঞ্চয় ঋণপত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। খজপুর্, কাঁথি, ঘাটাল এবং অন্যান্য স্থানেও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সপ্তাহে পাঁচশটি ছোট ছোট সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। খজপুর্ মিউনিসিপ্যালিটি, মালগু যুবসংঘ ও মেদিনীপুর রবীন্দ্র-নিলয়ে তিনটি প্রদর্শনীর

অনুষ্ঠান করা হয়। ছয়টি চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রায় ৫,০০০ দর্শকের সমাগম হয়।

রবীন্দ্র-নিলয়ে অনুষ্ঠিত এক 'সেমিনারে' ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, সমাজশিক্ষা সংগঠক এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টগণ যোগ দিয়েছিলেন। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বল্প-সঞ্চয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। উক্ত স্থানে ঐ একই দিনে মহিলাদের একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সমাজশিক্ষা সংগঠক, মহিলা সমিতির প্রতিনিধিগণ, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা এবং ছাত্রীবৃন্দ যোগদান করেন। মেদিনীপুরের 'উইমেন্স কলেজের' অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুশীলা মন্ডল এবং শ্রীমতী গীতি সেন যথাক্রমে অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বল্প-সঞ্চয় পরিকল্পনায় মহিলাদের ভূমিকার উপর বিভিন্ন বক্তা জোর দেন।

জেলার সর্বত্র প্রধান প্রধান স্থানে প্রাচীরপত্র প্রদর্শিত হয় এবং পল্লী গ্রন্থাগার ও সংঘদালিতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পণ্ডায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতিতে প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

ঘাটালের বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বল্প-সঞ্চয় সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই সপ্তাহে কয়েকটি জনসভা, ৪০টি গোষ্ঠী-সম্মেলন ও কয়েকটি ম্যাজিক লণ্ঠন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পশ্চিম দিনাজপুরের দিনহাটায় ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত স্বল্প-সঞ্চয় সপ্তাহ পালন করা হয়। বহুমানঘাট, হিলি, নয়াবাজার, কান্নগর, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারূপা, রায়গঞ্জ, হেমতা-বাদ, ইটাহার, ইসলামপুর, সোনারপুর, কাননদিঘি, দেবীঝোরা ও অন্যান্য স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্বল্প-সঞ্চয় সম্পর্কে প্রাচীরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প-সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পুস্তিকাদি বিতরণ করা হয়।

চব্বিশপরগনা জেলায় ১৯৫৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ২১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাচীরচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লন্ঠন প্রদর্শনী, তরজা ও নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প-সময় সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সদর মহকুমায় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০০ সভা ও গোষ্ঠী-আলোচনার আয়োজন করা হয়।

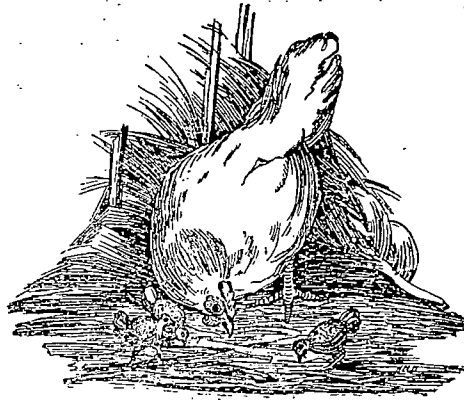
বারাসত মহকুমায় ১৫টি গোষ্ঠী-সম্মেলন ও ছয়টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আমডাঙ্গা, পৃথিবা ও বিষ্ণুপুরে তিনটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বনগাঁও ডায়মন্ডহারবারে অনুদ্রুপ কার্যসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুর এলাকায়ও সাতটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী ও কয়েকটি জনসভার অনুষ্ঠান করা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলায় ৫ই জানুয়ারি থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত স্বল্প-সময় সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। আলিপুরদুয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত

জনসভার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সপ্তাহের উদ্‌ঘোষন হয় এবং প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমূলক কার্যসূচির মধ্য দিয়ে তা উদ্‌ঘাষিত হয়। কুমারগ্রাম, আলিনগর, ফলাকাটা, জলেশ্বর ও আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্যান্য স্থানেও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান জেলায় ১৯৫৯ সালের ২২এ ডিসেম্বর থেকে ২৯এ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বল্প-সময় সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। উক্ত সপ্তাহের প্রধান প্রধান কর্মসূচির মধ্যে ছিল জনসভার অনুষ্ঠান, পল্লী-অঞ্চলে প্রদর্শনী, শ্রুতিচাক্ষুষী প্রদর্শনী ইত্যাদি। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভা ও গোষ্ঠী-আলোচনায় বিভিন্ন বক্তারা, জনগণ যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে নিজেদের পরিকল্পনা বলে উপলব্ধি করে এই উদ্দেশ্যে স্বল্প-সময়ে অর্থ লব্ধির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন।

দেবরা, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর ও কালনা মহকুমার অন্যান্য স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, ছাত্র এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।



জুগিয়ানার সংকর ভুটাবীজ

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সংগঠনে জেনারেল মোহন সিংএর কৃতিত্বের কথা সুবিদিত; কিন্তু এটা বোধ হয় খুব কম লোকেই জানেন যে, সম্প্রতি খবরের কাগজে যে জুগিয়ানার বিরাট “সংকর ভুটাবীজ পরিকল্পনা”র কথা জানা গিয়েছে, তারও পেছনে রয়েছেন এই লোকটি। পাজাবে লুধিয়ানা থেকে ছয় মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম জুগিয়ানা। এখানে সমবায় প্রচেষ্টায় ৪৬ একর জমি থেকে ১,৬০০ মণ সংকর ভুটাবীজ উৎপাদন করা হয়েছে গত বছর (১৯৫৯) ফেব্রুয়ারি মাসে। এর প্রায় সমস্ত বীজই রাজ্যসরকার কিনে নিয়েছেন চাষীদের বিতরণ করার জন্য।

জুগিয়ানা গ্রামে সমবায় কার্যক্রমের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫১ সালে। সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উম্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাজাব-সরকারের রচিত উদ্যান-পল্লী পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে ওঠে জুগিয়ানা সমবায় উদ্যান-পল্লী সমিতি। শ্রীমোহন সিংএর মত একজন সংগঠন-কৃতীকে সভাপতি নির্বাচন করে এই সমিতি নিশ্চয়ই খুব ভাল করেছিলেন, কেননা, সেই থেকে সমিতি শুধু এগিয়েই চলেছে, কখনও তাকে পিছদ ফিরে তাকাতে হয় নি।

সমিতির সদস্য হচ্ছে ৩৫টি পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের মালিকানায় জমি রয়েছে ১৭ একর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩৫টি পরিবার মিলে কাজ করে যাচ্ছে ঠিক একটি পরিবারের মত এবং তার প্রধান হচ্ছেন শ্রীমোহন সিং। তিনি বলেন, “এ জমি যখন নেওয়া হয়, তখন এখানে ছিল বালিয়াড়ির রাজত্ব আর আগাছার জংগল।” কিন্তু সেখানে এখন চমৎকার সুন্দর কমলা লেবুর গাছ আর তেজী ভুটুর ফসল দেখে সে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি বলেন, “এ জমিতে কত গাড়ি পচাসার ঢালতে হয়েছে আর কতবার যে সবুজসার করা হয়েছে তার

কোন গোনাগুনুতি নেই।” এ-কথা শুনে অবশ্য বোঝা গেল ব্যাপারটা।

জুগিয়ানা কী করে সংকর ভুটাবীজের উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে উঠল, সে এক কাহিনী। জুগিয়ানা সমিতির সচিব শ্রীরতন সিং ১৯৫৭ সালে একবার আমেরিকায় যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন এক কৃষক-দলের সদস্য হয়ে। সেখানে ভুটুর দু’তিন গুণ ফলন দেখেই সম্ভবত তিনি সংকর ভুটো সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি, বলতে গেলে তাঁর সারা সময়টাই কাটিয়েছেন দুই কি তিন জাতের ভুটুর সংমিশ্রণে সংকর জাতের ভুটুর বীজ উৎপাদনের কৌশল পর্যবেক্ষণে ও তার শিক্ষায়। বিশেষ করে ইলিনয়িস ১৬৫৬ জাতটা তাঁর পছন্দ হয়েছিল—এর দানা বড় আর গুণেও ভাল। জুগিয়ানায় কাজ চলছে সেই জাত নিয়েই।

জুগিয়ানায় ফিরে রতন সিংএর ঝোঁক চাপল কারবারী আকারে সেই জাতের ভুটুর বীজ পরিবর্ধনের। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সদস্যদের এক সভা ডাকা হল। একটা নতুন কাজে নামা হচ্ছে বলে এ বিষয়ে সদস্যদের উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী মোহন সিং এ নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। তিনি সদস্যদের বললেন যে, একাজ যদি বিফল হয়, তবে তিনি নিজের তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ করবেন। রতন সিং এ-সংক্রান্ত কাজ-কৌশলে সকলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে তাঁদের জয় হল।

বিপজ্জনক পদ্ধতি

সংকর ভুটাবীজ উৎপাদনের জটিল, এবং কখনও কখনও বিপজ্জনক, পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রতন সিং বলেন যে, ফসলের বীজ বোনা হয় বর-সাঁমের পরে (তাঁর মতে, এমন কি গমের পরে হ’লেও হ’ত)। প্রথম দফায় জমি চষা হয় এপ্রিল মাসে,

ট্রাক্টর দিয়ে পাঁচ থেকে সাত ইঞ্চি গভীর করে। তার এক সপ্তাহ পরে আর একবার চষা হয়—তাও ট্রাক্টর দিয়ে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে জমির টেলা ভেঙে দিয়ে আরও দু'বার চষে দেওয়া হয়। তার পর একরপিছ দু'২ থেকে ২০ টন হিসাবে খামারের আবজনা পচা সার দিয়ে তার ঠিক পরেই আর একবার চষে নিয়ে, মাটি তৈরি করে ফেলা হয় ২০এ জুনের মধ্যে।

দুই হন্দের অ্যামোনিয়াম সালফেট, এক হন্দের ইউরিয়া, দুই হন্দের সুপারফসফেট এবং এক হন্দের পটাশ মিশিয়ে রাসায়নিক সারের একটা মিশ্রণ তৈরি করা হয়; বীজ বোনার আগে জুলাইএর প্রথম সপ্তাহে তা জমিতে ছিড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজ বপন করা হয় ২ই ফুট অন্তর সারিতে। প্রতি ছয় সারি স্ত্রী-গাছের বীজের পিছ দুই সারি পুরুষ-গাছের বীজ লাগানো হয়।

বীজ-লাগানো যন্ত্র

কোন কোন ক্ষেত্রে বীজ-লাগানো যন্ত্রও ব্যবহার করা হয় এবং আড়াই ফুট দূরে দূরে প্রতি গতে তিনটি বীজ দিয়ে, মাদা বেঁধে দেওয়া হয়। জমির উপর থেকে অন্তত ১ই ইঞ্চি নিচে এবং ৩ ইঞ্চির উপরে যেন বীজ থাকে সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখা হয়। শ্রীরতন সিং বলেন যে, যন্ত্রের সাহায্যে লাগানো বীজ থেকে গাছ উঠেছে ভাল।

গাছগুলি যখন ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা হ'ল, তখন ফুটো-করা পোকার আক্রমণ ঠেকাবার জন্য একবার 'এন্ড্রেক্স' ছিটানো হল। রতন সিং বলেন যে, কীট দমনের ওষুধজল ছিটানো প্রভৃতি আধুনিক উপায়ে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা ও-অঞ্চলে তাঁরাই প্রথম পথপ্রদর্শক।

তারপর ফসলের পরিচর্যা চলল ভালভাবে। চার থেকে ছয় বার নিড়েন দেওয়া হ'ল। প্রথম দু'তিন বার নিড়ানী চালানো হল মাটি গভীর করে খুঁড়ে, পরের দু'তিন বার উপর-উপর দিয়ে

মাটি অগভীর করে খুঁড়ে নিড়েন দেওয়া হ'ল। সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল বৃষ্টিপাতের দিকে খেয়াল রেখে। গাছগুলি যখন হাঁটু-সমান উঁচু হয়ে উঠল তখন আর একবার অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া হল একরপিছ দু' হন্দের হারে। ফসলের বয়স যখন দেড় মাস হল, তখন থেকে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখা হল যথাসময়ে সেচ দেবার দিকে।

বিরক্তিকর অধ্যায়

চাষের কাজে সবচেয়ে বিরক্তিকর অধ্যায় দেখা দিল ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত স্ত্রী-গাছ থেকে কেশরের গোছাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হল। রতন সিং বলেন যে, যথাসময়ে এই কেশরের গোছা ছিঁড়ে ফেলার উপরই নির্ভর করে সাফল্য।

ভুট্টা যখন পেকে উঠল এবং ভুট্টার শীষটা যখন নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল (দেশী ভুট্টার বেলা বা দেখা যায় না), তখন আগে পুরুষ-গাছগুলোর ভুট্টা তুলে নিয়ে আলাদা করে রাখা হল—যাতে স্ত্রী-গাছগুলোর ভুট্টার সঙ্গে সেগুলোর মিশ্রণ ঘটতে না পারে। স্ত্রী-গাছ থেকেই পাওয়া যায় সংকর-বীজ।

স্বচ্ছ কাজ

প্রথম বারেই বিরট সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সমিতি পরের বছরও একই চাষ লাগালেন। কাজ যাতে স্বচ্ছভাবে চলতে পারে সেইজন্য চাষের কাজটা সম্পূর্ণই ছেড়ে দেওয়া হল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর। সদস্যেরা যখন তাঁদের উৎপাদিত শস্য সমিতির বাড়িতে নিয়ে আসেন, শব্দ তখনই সমিতি সেদিকে নজর দেয়। ফসল কতটা ভিজে আছে তা দেখার জন্য প্রত্যেক সদস্যের ফসল থেকে নমুনা নেয়, তার ওজন নিয়ে হিসাব করে দেখা হয় যে, শুকিয়ে ঝেড়ে নেবার পরে ওর থেকে যে শস্য পাওয়া যাবে তার নীট ওজন কত হতে পারে। সেটা লিখে রাখা হয়, কেননা, সদস্যেরা সেই অনুযায়ী দাম পেয়ে থাকেন।

তার পরে সকলের ফসল একসঙ্গে মিশিয়ে, বীজ শুকিয়ে নেওয়া হয়। একসঙ্গে ৩০০ মণ শুকানোর উপযোগী ডিজেল-চালিত শুকানো যন্ত্রে বীজগুলো এমনভাবে শুকিয়ে নেওয়া হয় যেন তাতে শতকরা ১৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। তার পরে ঝেড়ে পরিষ্কার করে শ্রেণীবিন্যাস করে, বীজ-গুলোর সঙ্গে কীটনাশক ওষুধ মেশানো হয় এবং থ'লেভর্তি করে, যথাযথভাবে লেবেল এঁটে, সেগুলো গুদামজাত করা হয়।

সংকর ভুটাবীজ উৎপাদন করা হচ্ছে সমিতির কাজের একটা দিক শুধু। 'রক্তরাঙা মাল্টা' এবং বাছাই ভাল ভাল জাতের আমের বাগান করা হচ্ছে আর-একটা দিক। আধুনিক ধরনে পক্ষিপালনের এবং দুগ্ধশিল্পের একটা খামার পরীক্ষাধীন অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতের সূচিতে আরও একটা কাজ কারবারী আকারে সবজিবীজ উৎপাদন করা। [১৯৫৯এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা ' ইন্ডিয়ান ফার্মিং থেকে]



সমবায় নবজীবন দিয়েছে বুলগেরিয়ার কৃষিকে

বুলগেরিয়া যখন কৃষিকাজে সমবায় নীতি গ্রহণ করল তখন থেকে সেদেশের কৃষিতে দেখা দিয়েছে বিপ্লব পরিবর্তন। প্রাচীন রীতির স্থলে চালু হয়েছে নতুন পদ্ধতি এবং ফসলের ফলন পাওয়া যাচ্ছে বেশি। কৃষি-উৎপাদন বেড়ে গেছে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ।

যুদ্ধের আগে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সালে সেখানে বিভিন্ন ফসলের সবচেয়ে বেশি যে ফলন পাওয়া গিয়েছে, সমবায় নীতির চাষে তার তুলনায় ফলন কত বেড়েছে, নিচে তা দেখানো হলঃ

ফসল	শতকরা বর্ধিক গড়		
	১৯৩৪-৩৯	১৯৪৯-৫২	১৯৫৩-৫৭
গম	১০০	৯৫.৫	১০৭.৭
ভুট্টা	১০০	৮৪.৩	১২৯.৩
সূর্যমুখী	১০০	১২৩.৫	১৫০.৩
তুলো	১০০	১৮১.৮	২৯০.৯
প্রাচ্যের তামাক	১০০	১৩৯.৪	১৭৮.৮
চিনিবিট	১০০	৩৭৩.৭	৬৪২.৩
টম্যাটো	১০০	৩৬১.৯	৭০০.০
লঙ্কা	১০০	১৯১.৪	১৯১.৪
আলু	১০০	২৪০.৭	২৭৪.১
আপেল	১০০	৫৫৯.৩	৫৯২.৬
ছোলা	১০০	১০৮.০	১০১.৫

শেষের দেড় বছরে ফলন পাওয়া গেছে অনেক বেশি।

বলকান উপদ্বীপে অর্থাৎ তুরস্ক, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ও রুম্যানিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বুলগেরিয়ার অধিবাসী-সংখ্যা ৭৫ লক্ষ এবং আয়তন ৪৩,০০০ বর্গমাইল। ১৯৪৬ সালে বুলগেরিয়ায় এক কৃষি-উন্নয়ন বিল পাস হয়। তার বলে, কৃষক যেক্ষেত্রে নিজেই চাষ করেন, সেক্ষেত্রে

তার মালিকানায় ৫০ একরের বেশি চাষের জমি থাকতে পারবে না। তার ফলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য ৬,২৫,০০০ একর জমি বেরিয়ে এল। এই ভূমিহীন কৃষকদের শতকরা ৯২ জনই এখন কতকগুলি সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়েছেন।

১৯৪৪ সালে ৭,০০০ খামার এবং ৬৬,০০০ একর জমি নিয়ে কৃষি-সমবায় ছিল ১১০টি। ১৯৪৬ সালে কৃষি-সমবায়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৮০, সেগুলোর অধীনে খামার হ'ল ৪১,০০০ এবং জমি এল ৪,৩১,৫০০ একর। ১৯৫০ সালে কৃষি-সমবায়ের সংখ্যা ২,৫০১-এ উঠল ৫,০২,০০০ খামার আর ৫৩,৯০,৮০০ একর জমি নিয়ে। দেশের অর্ধেকের বেশি চাষের জমি এল সমবায়ের অধীনে। এখন সেখানে কৃষি-সমবায় হয়েছে ৩,৩০৫টি এবং সেগুলোর অধীনে দেশের চাষের জমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই এসে গেছে।

উন্নত কৃষিপদ্ধতি

সমবায়ের প্রবর্তনে বুলগেরিয়ায় পৃথক পৃথক মালিকানার অধীন জমিগুলি বিভিন্ন সমিতির অধীনে একজোটে এসে গেছে। তার ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার করে, উন্নত কৃষিরীতির দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করার সুবিধা হয়েছে। এখন সেদেশে ১৫ অশ্বশক্তির ৩৮,০০০ ট্রাক্টর চলছে। ফসল কাটা এবং অন্যান্য কাজের যন্ত্রচালনা চলছে ৪৩,০০০। সেদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে এসব আধুনিক যন্ত্রের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা।

বুলগেরিয়ায় চাষের জমির মালিকানা চাষীদের, কিন্তু জমিতে যা-কিছু উৎপাদিত হবে, সেসবের

মালিক সরকার। চাষে যা আয় হয়, তা জমির মালিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়— চাষে তাঁরা যে কাজ করেছেন তার ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী। জমির খাজনা সমবায়ীদের সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হয় কিন্তু তার পরিমাণ সমবায় খামারের নীতি আয়ের শতকরা ২৫ ভাগের চেয়ে বেশি হয় না।

নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে যে-কোন সমবায়ীর ঠু থেকে ১৪ একর চাষের জমি, একটি গাভী, ৫ থেকে ৮টি ভেড়া, ১টি কি ২টি শূকরী, ২০টি পর্যন্ত কৃষ্ণিম মৌচাক এবং যতগুলি ইচ্ছা হাস-মুরগি রাখার অধিকার আছে।

গণতান্ত্রিক ভিত্তি

সমবায় খামার পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। সমবায়ীদের সাধারণ সভা, পরিচালন পরিষদ এবং নিয়ন্ত্রণ পরিষদ প্রবর্তিত নীতিনিয়ম অনুসরণে কার্য পরিচালন করে। প্রথম নীতি হচ্ছে, সমবায় খামারের সদস্যেরা তাঁদের সংক্রান্ত সকল সাধারণ সমস্যার সমাধানে অধিকারী। যে-কোন কর্মপরিচালনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সমবায়ীদের বিবেচনার উপর। বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান করে সাধারণ সভা। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, সমস্ত সমবায় খামারের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যেরা সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তৃতীয় হচ্ছে, পরিচালকমণ্ডলীগুলি যৌথ পদ্ধতিতে কাজ চালাবে। বিস্তারিত আলোচনার পরে পরিচালকমণ্ডলীসমূহের সাধারণ সভার, পরিচালন পরিষদের এবং নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর কাছে কাজের বিবরণী দাখিল করার এবং মণ্ডলীর কার্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সমবায় সমিতির সদস্যদের আছে। কৃষি-সমবায়গুলির সকল পরিচালকই সদস্যদের কাছে নিজেদের কাজের বিবরণী দাখিল করেন।

বুলগেরিয়াতে কৃষি-সমবায়গুলির উন্নয়নে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবার

প্রবৃত্তি। কৃষকেরা যদি সমবায়প্রথার সুবিধাগুলি বুঝতে পারেন, তা হলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সমবায়-কৃষিতে যোগ দেন। তা ছাড়া, যে-কোন সদস্য ইচ্ছা করলেই সমবায় সমিতি থেকে বেরিয়েও আসতে পারেন, সেরকম ক্ষেত্রে তিনি যে-ধরনের যতটা জমি এবং কৃষিকাজের যেসব জিনিস সমবায়-কৃষিতে দিয়েছেন, সবই ফেরত পাবেন।

সর্বাঙ্গীণ সরকারী সাহায্য

দেশের সরকার থেকে কৃষি-সমবায়গুলিকে সকল রকম কারিগরি সাহায্য করা হয়। কৃষি-সমবায়-গুলিকে নির্বাচিত ভাল বীজ, কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় পশু, চারা প্রভৃতি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সরকার থেকে আধুনিক ধরনের ৪৯টি বড় আকারের কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষণকেন্দ্র এবং কৃষি-সমবায়গুলির আদর্শ হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা ছিল ৭৮৪টি গ্রামে, আর এখন ৩,৩৬০টি গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ হয়। আগে গ্রামাঞ্চলে রেডিও-সেট খুব কম লোকের বাড়িতেই দেখা যেত, সেখানে রেডিও-সেটের সংখ্যা এখন ১,৯৭,৮৫৬। ১৯৪৪ সালে পাঠাগার ছিল ২,৩৪৪টি, ১৯৫৬ সালে হয়েছে ৪,২৩৩টি। দেশে ২৬৩টি হাসপাতাল আছে এবং চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে।

কৃষি-সমবায়ের সদস্যদের—পুরুষদের ৬০ বছর এবং স্ত্রীলোকদের ৫৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে—পেনশন দেবার একটি আইন জাতীয় সভা কর্তৃক ১৯৫৭ সালে গৃহীত হয়েছে।

বুলগেরিয়ায় গ্রামের অধিবাসীদের মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ তিন একরের কম। লক্ষ লক্ষ একর পতিত, পরিত্যক্ত এবং ক্ষয়িত জমি উদ্ধারের একটা আন্দোলন সম্প্রতি শুরু হয়েছে। উদ্ধার করা জমিতে চাষীরা বাগান, আঙুরক্ষেত, 'রাজবোর' ফলের বাগান—এইসব করছেন।

[১৯৫৯এর অগাস্ট সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং'এ প্রকাশিত শ্রীগুরুশরণ সিং-এর প্রবন্ধ থেকে]

তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ব্যয়

(১) জেলা-ভিত্তিতে রেজিস্ট্রিকৃত তাঁতের হিসাব
(৩১এ মার্চ ১৯৫৯)

	মোট নং	শতকরা প্রয়োজন
মেদিনীপুর	৩১,৫৩৬	
বাঁকুড়া	১১,৬০৯	১০.৪ ভাগ
চবিশপরগনা	১৫,০০৫	
হুগলি	১০,৫৪০	২৮.৪ "
মুর্শিদাবাদ	৮,৯০৭	
নদিয়া	২৫,৪৭৬	২৩.৮ "
বর্ধমান	৯,১৮৭	
বীরভূম	৫,৪০৭	১৬.২ "
মালদহ	৩,৬৬৫	
হাওড়া	২,৮৭৭	৪.৮ "
কোচবিহার	১,২১১	
পশ্চিম দিনাজপুর	২,৬৮২	৪.৫ "
জলপাইগুড়ি	৫২০	
দার্জিলিং	১৯৭	০.৭ "
পূর্বদুর্গা	৪,৮৫৮	
কলিকাতা	১,৪৭৭	১১.২ "
	১,৩৫,২৮৬	১০০.০ ভাগ

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৬৬

(৩) তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারী সাহায্য ও ঋণ

বস্তুস্বরূপ : ১৫ম অর্থ : ১০ম সংখ্যা

পরিবর্তন	১৯৫৩-৫৬					১৯৫৭-৫৮					১৯৫৮-৫৯					১৯৫৯-৬০				
	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয় (আনুমানিক)			
স্থতীবস্ত্র (সাহায্য)																				
(ক) দান্যমাণ বিপণি	..	৩৬,২২৯	৪৫,৮১৬	৮,৭৮৫	১৫,৮৪২	১২,৯১২	৩৭,০০০	২,২৬,০০০	১০,৩০,৯৯৯	২,৯৩,০০০	২,২৬,০০০	১৫,০০,০০০	২৮,০০০	৫০,০০০	২৮,০০০	২৮,০০০	..			
(খ) রপ্তানশীনা	..	১,২০,২৭০	৩৪,৯০৮	৪২,৮১৩	৪০,৬৬৭	৩৭,০০০	২,২৬,০০০	২,২৬,০০০	১০,৩০,৯৯৯	২,৯৩,০০০	২,২৬,০০০	১৫,০০,০০০	২৮,০০০	৫০,০০০	২৮,০০০	২৮,০০০	..			
(গ) বিক্রয়কেন্দ্র	..	৫,১৫,৫৬৩	৩,১১,৯৩৭	১,৯৮,৮৭৫	১,৯৮,৮৭৫	২,৯৩,০০০	২,২৬,০০০	২,২৬,০০০	১০,৩০,৯৯৯	২,৯৩,০০০	২,২৬,০০০	১৫,০০,০০০	২৮,০০০	৫০,০০০	২৮,০০০	২৮,০০০	..			
(ঘ) রিবেট	..	২,৩৮,৭৯৭	৪,২৬,১৬৭	৫,৯৯,৯৭১	৫,৯৯,৯৭১	১০,৩০,৯৯৯	২,২৬,০০০	২,২৬,০০০	১০,৩০,৯৯৯	২,৯৩,০০০	২,২৬,০০০	১৫,০০,০০০	২৮,০০০	৫০,০০০	২৮,০০০	২৮,০০০	..			
(ঙ) ঠক্করিকি তাঁতে পরিবর্তন	..	১,৯৯,৭২০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
(চ) স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র-গুটানো যন্ত্র	..	৯০,৭০০	৮০,৯২৫	৩৩,৭৯৯	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..			
(ছ) দস্তি (নরোজ সমেত)	..	৩৯,৭৮২	৪৯,০৫০	৯৫০	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	২৪,৭৯৩	..			
(জ) গান্ধী	..	৪৬,০৭৯	৭২,৭৩১	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	৪৬,৩৩৯	..			
(ঝ) ডাবি	..	..	..	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	৪৪,০০৬	..			
(ঞ) "ব"	..	১,৫১,৩২৮	৮০,১৮০	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	৬৫,৬১৮	..			
(ট) ছপ বস্ত্র	..	..	..	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	২,৭৫২	..			

পরিকল্পনা

১৯৫৩-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয় (আনুমানিক)

শ্রুতীষ্ম (সাহায্য)

(ঘ) তানা করিবার ড্রাম	..	২,৯৬৬	৭,৩৯৯	..	৩,৭৫০
(ঙ) অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় তাঁত	..	৫৯,৯৯৭	৮০,০০৮	৫৯,৬৩৩	৬০,০০০
(চ) উৎকর্ষ নির্দেশক	..	২৩,৬০২	২৩,৬১৮	২৭,২৪৯	২৮,১৪১
(ন) জ্যাকার্ড	..	..	..	..	১৫,০০০
(ত) প্রচার ও বিজ্ঞাপন	..	৬৭,৯২৩	৩৩,১৫৫	৩০,৬৮৯	৩৭,৯৪৪
(থ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ	..	১৩,২২৪	৪৫,৯৮৬	৪৪,২৯১	৪৬,২০৩
(দ) গবেষণাগার সম্প্রসারণ	..	..	৩,২৮২	৫,৬০৭	৪,৩৯১
(ধ) সংগঠন ও তত্ত্বাবধান	..	৫০,৬০০	৬৫,৩১৪	১,০৮,৬৮৫	১,০৭,৫৪৩
(ন) কেন্দ্রীয় বিপণি	..	..	১৮,০০০	..	১৩,৫০০
(প) পুরস্কার বিতরণ	..	..	৭,১৫০	৮,২৭৫	৮,০০০
(ফ) ব্লক ছাপা	..	২৮,৯৮৫	১৬,৪৫৮	৩,০২৯	১৯,৬১০
(ব) নিখিল ভারত তাঁতশিল্প সপ্তাহ উদ্বাপন	..	২৫,৭০০	..	২৫,০০০	১২,০০০
(ভ) আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কেন্দ্র	..	..	..	..	১৫,০০০

মোট

১৬,৭৬,৭৯৭	১৩,৮৬,৬১৮	১৩,৪১,১৪১	১৭,৬০,৬২৪	২২,৭৮,৯৯৪
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

বঙ্গবন্ধু : মাস : ১৩৬৬

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

পরিকল্পনা		১৯৫৩-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
স্বত্বীকৃত (ধন)		ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয় (আনুমানিক)
(ক) রঞ্জনাশালা		৫০,০০০	..	..	..	..
(খ) শেয়ার		৬৬,৭৫৫	১,৩১,৩৭০	২৯,৯১৫	..	..
(গ) লগ্নি অর্থ		২৬,০০,০০০	১৭,৮৮,০০০	৬,০০,০০০	৬,৭৮,৬০০	৬,০০,০০০
(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ তত্ত্বাবধায়ক সমবায় বিপণন সমিতিতে মূলধন বাবত		১,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	..	..
(ঙ) ভ্রাম্যমাণ বিপণি		২৫,০০০	২৫,০০০	..	..	..
(চ) তত্ত্বাবধায়কদের জীর্ণ গৃহাদি সংস্কার এবং মেরামত		..	..	..	২৪,২৬০	৮০,০০০
(ছ) তত্ত্বাবধায়কদের নতুন গৃহ নির্মাণ		..	..	..	৮০,৮০০	৩,৬১,২০০
মোট		২৮,৯১,৭৫৫	২০,৮৮,৩৭০	৭,২৯,৯১৫	৭,৮৩,২৬০	১০,৮৫,২০০

পরিকল্পনা

	১৯৫৩-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয়	ব্যয় (আনুমানিক)

ব্রেশম বস্ত্র

(ক) নকশা কেন্দ্র (সাহায্য)	..	৩৮৯	৫,৮৪১	৫,৮৩৬	৬,২২৩	৭,০২০
(খ) উন্নত সরঞ্জাম (সাহায্য)	..	..	১৬,৮৮২	১৮,৪৩৩	২,৫০০	৩,০০০
(গ) শেষার (ধন)	..	৮,৫০০	১৮,০০০	১৫,০০০	৩,৭৫০	৭,৫০০
(ঘ) লগ্নিঅর্থ (ধন)	..	৩০,০০০	১২,২০,০০০	১,০০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
(ঙ) সরঞ্জাম (ধন)	..	..	..	..	১,৫০০	৩,০০০
মোট	..	৩৮,৮৮৯	১,৬০,৩২৩	১,৩৮,৮৬৯	৬২,৯৭৩	৭০,৫২০

৬৬৭

পশম

(ক) উন্নত সরঞ্জাম (সাহায্য)	..	..	১৮,৮৩৬	১৬,৭১১	..	..
(খ) লগ্নি অর্থ (ধন)	..	৫০,০০০	..	..	..	..
মোট	..	৫০,০০০	১৮,৮৩৬	১৬,৭১১	..	..

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৬৬

(৪) ১৯৫৯-৬০ সালে উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম বিতরণ (আনুমানিক)

জেলা	অর্থ- স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিটির মূল্য ৩০০ টাকা	দক্তি (নরোজ সমেত) প্রতি জোড়ার মূল্য ৫০ টাকা	বিনামূলী 'ব' প্রতিটির মূল্য ২০ টাকা	তাঁতের 'ব' প্রতিটির মূল্য ২০ টাকা	তাঁতের 'সানা' প্রতিটির মূল্য ১০ টাকা	সরের 'সানা' প্রতিটির মূল্য ৮ টাকা	বাঁশের 'সানা' প্রতিটির মূল্য ৮ টাকা	স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র- গুটানো যন্ত্র প্রতি সেটের মূল্য ৭০ টাকা	তানা করিবার ড্রাম প্রতিটির মূল্য ৩৭৫ টাকা	মোট টাকা	
										সাহায্য	ঋণ
কলিকাতা	২০	৫০	৪০	২০	৫০	৫০	২৫	৫০	১	১১,৪৭৫	৪,০০০
২৪-পরগনা	১৫	৮০	১০০	৮০	১০০	১০০	১০০	৮০	১	১৪,৭০০	৪,৭৭৫
হাওড়া-হুগলি	২০	১২০	১২০	১০০	১০০	১০০	১০০	৫০	২	১৮,৮২৫	৬,৮২৫
বর্ধমান	১৫	১২০	৫০	৩০	১০০	১০০	১০০	২৫	১	১৩,১৬২	৪,৭৬৩
বাঁকড়া	১৫	১০০	৮০	৩০	৬০	২০০	৬০	২৫	১	১২,৫৯৩	৪,২৭২
মোদিনীপুর	২০	১২০	১১০	৩০	১০০	১০০	১০০	৬০	১	১৭,০২৫	৬,০৫০
বীরভূম	১০	৬০	৮০	৩০	৪০	৫০	৪০	১০	১	৭,৩৯৫	২,৪৬৫
পুরুনিয়া	৫	৬০	৬০	২০	৫০	৫০	১২৫	১০	১	৬,৪৫০	২,৩৫০
মুর্শিদাবাদ	১৫	১০০	১২০	৪০	১০০	১০০	১০০	৩০	১	১৫,৮২৫	৬,১৫০
নদিয়া	৪০	১০০	১৩০	১০০	১৫০	২০০	২০০	৫০	২	২৪,০০০	৮,৭৫০
মানদহ	১০	৪০	৬০	১২	৫০	৫০	৫০	১০	১	৬,৬৩০	২,৫১০
পশ্চিম দিনাজপুর	৫	২০	২০	৪	৩০	১০	১০	১০	১	২,৪৬০	৮২০
দার্জিলিং-জনপাইগুড়ি	৫	১০	১০	১০	২০	১০	১০	১০	১	১,৮০০	৬০০
কোটবিহার	৫	২০	২০	৪	৫০	১০	১০	১০	১	২,৯১০	১,১৭০
মোট	২০০	১,০০০	১,০০০	৫০০	১,০০০	১,২৫০	১,০০০	৪০০	১০	১,৫৫,২৫০	৫৫,৫০০

পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্দ্র

মুর্শিদাবাদ

- ১। জগদীশপুর বান্ধব সমবায় খরিসদার বিপণনকেন্দ্র।
- ২। মুর্শিদাবাদ নগর সমবায় সমিতি, বহরম-পুর্।
- ৩। কান্দি সমবায় শিল্প সংঘ, কান্দি।
- ৪। তালিচপুর্ ইউনিয়ন তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি লিঃ।
- ৫। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।
- ৬। ফাল্গুনী সমবায় স্টোর্স লিঃ, কান্দি।
- ৭। সোনারদুর্দি তন্তু সমবায় সমিতি।

নদিয়া

- ৮। রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, শান্তিপুর্।
- ৯। নবম্বীপ সমবায় ঋণদান ব্যাংক।
- ১০। শান্তিপুর্ কারিগরপাড়া তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি।
- ১১। শান্তিপুর্ শিল্প সমবায় সমিতি, কৃষ্ণ-নগর।
- ১২। নবম্বীপ সমবায় তন্তুবাঁয় ও শিল্প সমিতি।
- ১৩। দালালপাড়া তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি।
- ১৪। আইনতলা সমবায় তন্তুবাঁয় সমিতি।
- ১৫। রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, হাওড়া।
- ১৬। শান্তিপুর্ কুটিরপাড়া তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি।
- ১৭। শান্তিপুর্ সাহাপাড়া তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি, নবম্বীপ।

- ১৮। রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, কাঁচড়াপাড়া।
- ১৯। শান্তিপুর্ শিল্প সমবায় সমিতি।
- ২০। তাহেরপুর্ তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি।
- ২১। রানাঘাট সাব-ডিভিসনাল কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।
- ২২। চৈতলপাড়া তন্তুবাঁয় সমবায় সমিতি।

বর্ধমান

- ২৩। বর্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ, বর্ধমান।
- ২৪। বান'পুর্ নানার্থক সমবায় সমিতি, বান'পুর্।
- ২৫। আসানসোল রেলকম্পী সমবায় নানার্থক সমিতি।
- ২৬। চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন-কম্পী সমবায় সমিতি।
- ২৭। কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন সমবায় সমিতি।
- ২৮। কালনা নগর সমবায় ঋণ-ব্যাংক ও নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ২৯। বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ৩০। গুদুসকরা নানার্থক সমবায় সমিতি, গুদুস-করা।
- ৩১। পূর্ ভারতীয় রেলকম্পী সমবায় বিপণন-কেন্দ্র, অন্ডাল।
- ৩২। দুর্গাপুর্ ইস্পাতশিল্প কম্পী সমবায় সমিতি, দুর্গাপুর্।
- ৩৩। আসানসোল রেলকম্পী সমবায় নানার্থক সমিতি।
- ৩৪। আসানসোল মহাশিলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
- ৩৫। কালনা তন্তুবাঁয় কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

৩৫। (ক)। পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটিরশিল্প প্রতি-
ষ্ঠান।

হাওড়া-হুগলি

- ৩৬। শিবপুত্র সমবায় ব্যাঙ্ক, হাওড়া।
৩৭। শ্রীরামপুত্র সমবায় নানার্থক সমিতি।
৩৮। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ,
চুঁচুড়া।
৩৯। বোরাডাঙ্গাল তন্তুবায় সমবায় সমিতি
লিঃ।
৪০। সমসপুত্র ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায়
সমিতি।
৪১। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ,
চন্দননগর।
৪২। শ্রীরামপুত্র বয়নশিল্প সমবায় সমিতি।
৪৩। পাণ্ডুরা সাধারণ নানার্থক সমবায় সমিতি।
৪৪। নবগ্রাম সমবায় কলোনি, কোমগর।
৪৫। লিলুয়া রেলকর্মী বিপণন সমিতি,
লিলুয়া।
৪৬। ব্যান্ডেল রেলকর্মী সমবায় বিপণন সমিতি।
৪৭। শ্রীরামপুত্র বয়নশিল্প সমবায় সমিতি,
উত্তরপাড়া।
৪৮। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ,
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
৪৯। আকুনী ইচাপাসার ইউনিয়ন তন্তুবায়
সমবায় সমিতি, সেওড়াফুলি।
৫০। রাজবলহাট সমবায় তন্তুবায় সমিতি।
৫১। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ।

মেদিনীপুত্র

- ৫২। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ।
৫৩। তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ।
৫৪। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক।

৫৫। ঘাটাল জনসমবায় ব্যাঙ্ক।

৫৬। আমর্ষি তন্তুবায় পণ্য-বিক্রয় সমবায়
সমিতি

৫৭। ঝাড়গ্রাম জনসমবায় ব্যাঙ্ক।

৫৮। সূতাহাটা সমবায় নানার্থক সমিতি,
মহিষাদল।

৫৯। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ, খজপুত্র।

৬০। ঝাড়গ্রাম সমবায় শিল্প সংঘ।

৬১। গড়বেতা সমবায় বিপণন সমিতি।

৬২। ডিমারী সমবায় তন্তুবায় সমিতি, রাধা-
মনিহাট।

৬৩। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ, বালিচক।

৬৪। বড়কাদরা সমবায় শিল্প সমিতি।

৬৫। দাঁতন জনসমবায় ব্যাঙ্ক।

৬৬। এগরা বহুমুখী সমবায় সমিতি।

৬৭। রামজীবনপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

৬৮। চেমিয়া সমবায় শ্রমিকোন্নতি সমিতি।

৬৯। আনন্দপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

৭০। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ, মেদিনী-
পুত্র।

৭১। আনন্দপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

৭২। পশ্চিম খেজুরী তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

৭৩। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ।

বীরভূম

৭৪। বালিয়াড়া সমবায় তাঁতিশিল্প সমিতি।

৭৫। রামপুত্রহাট সমবায় শিল্প সংঘ।

৭৬। বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক।

৭৭। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক,
শান্তিনিকেতন।

৭৮। বোলপুত্র কারু ও শিল্প সমবায়, বোল-
পুত্র।

- ৭৯। জগদ্বারী সর্বাধিক সমবায় সমিতি।
৮০। কড়িয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

বাঁকুড়া

- ৮১। বাঁকুড়া জেলা শিল্প সংঘ।
৮২। বিষ্ণুপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ।
৮৩। বিষ্ণুপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ।
৮৪। রাজগ্রাম তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
৮৫। সোনামুখী সমবায় বিপণন সমিতি।
৮৬। লক্ষ্মীসাগর তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
৮৭। গোপীনাথপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
৮৮। কেন্জাকুরা তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

মালদহ

- ৮৯। বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ।
৯০। চঞ্চল সমবায় শিল্প ভান্ডার।
৯১। হরিশ্চন্দ্রপুত্র সর্বাধিক সমবায় সমিতি।
৯২। সামসী সমবায় বিপণন সমিতি।
৯৩। কালিয়াচক কুটিরশিল্প তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

পশ্চিম দিনাজপুর

- ৯৪। হিলি খরিন্দার সমবায় বিপণন সমিতি।
৯৫। রায়গঞ্জ সমবায় ব্যাংক।
৯৬। কালিয়াগঞ্জ সমবায় নানার্থক সমিতি।
৯৭। বালুরঘাট অগ্রণী মহিলা সমবায় সমিতি।

দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার

- ৯৮। কালিম্পাঙ্গ শিল্প সমবায় সমিতি।
৯৯। কালিম্পাঙ্গ শিল্প সমবায় সমিতি।
১০০। জলপাইগুড়ি সমবায় নানার্থক সমিতি।
১০১। কোচবিহার নারী শিল্প সমবায় সমিতি।
১০২। শিলিগুড়ি সমবায় ঋণদান সমিতি।

- ১০৩। ডি এইচ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি।
১০৪। মেতালি থানা সমবায় নানার্থক সমিতি।
১০৫। ধওলাঝোড়া সমবায় নানার্থক সমিতি।
১০৬। নতুননগর সমবায় নানার্থক সমিতি, কোচবিহার।

কলিকাতা ও চব্বিশপরগনা

- ১০৭। বরানগর সমবায় সমিতি।
১০৮।
১০৯। নারী সমবায় শিল্পগৃহ, শ্যামবাজার।
১১০। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ।
১১১। বারাসত সমবায় বিপণি।
১১২। গোসাবা সমবায় ভান্ডার।
১১৩। মহিষমূরী জনসমবায় বিপণন, ডায়মন্ড-হারবার।
১১৪। বেলগাছিয়া খরিন্দার সমবায় বিপণন।
১১৫। বারগুদম কৃষি ও কৃষি-বিপণন সমবায় সমিতি, হাবড়া।
১১৬। সমনয় সর্বাধিক সমবায় সমিতি।
১১৭। যাদবপুত্র মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি, বালিগঞ্জ।
১১৮। কাঁচড়াপাড়া রেলকর্মী সমবায় বিপণন সমিতি।
১১৯। বাটানগর কর্মী সমবায় সমিতি, বাটানগর।
১২০। চালক সমবায় বিপণন, বারাকপুত্র।
১২১। সত্যনারায়ণ বয়নশিল্প সমবায় সমিতি।
১২২। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, বড়বাজার, কলিকাতা।
১২৩। লক্ষ্মী সমবায় তাঁতিশিল্প সমিতি, কলিকাতা।
১২৪। অশোকনগর সমবায় বয়নশিল্প সমিতি, হাবড়া।

- ১২৫। উত্তর কলিকাতা সমবায় বিপণি, কলিকাতা।
- ১২৬। কলিকাতা বিমানবন্দর কর্মী সমবায় সমিতি লিঃ, কলিকাতা।
- ১২৭। স্ভাষণনগর সমবায় নানার্থক সমিতি, বনগ্রাম।
- ১২৮। সতীন সেন শ্রমশিল্প তন্তুবায় সমবায় সমিতি, বারুইপুত্র।
- ১২৯। নৈহাটি রেলকর্মী সমবায় বিপণন সমিতি, নৈহাটি।
- ১৩০। বটতলা সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৩১। বোলপুত্র কারু ও শিল্প সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৩২-১৫৬। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, কলিকাতা।
- ১৫৭। হাদিপুত্র ঝিক্রা ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
- ১৫৮। বসিরহাট বহিরাগত তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
- ১৫৯। শরণাথী সমবায় খরিন্দার বিপণন, বিজয়গড়।
- ১৬০। রেলকর্মী সমবায় নানার্থক সমিতি, কলিকাতা।
- ১৬১। কলিকাতা বিমানবন্দর কর্মী সমবায় বিপণন, দমদম।
- ১৬২। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ও শিল্প সমিতি, কলিকাতা।
- ১৬৩। বিবেকানন্দ শ্রমশ্রী সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৬৪। রেলকর্মী খরিন্দার সমবায় বিপণন, দমদম।
- ১৬৫। আতসেবা কল্যাণ শিল্প সমবায় সমিতি।

- ১৬৬। নেবুতলা তন্তুবায় সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৬৭। আতসেবা কল্যাণ সমবায় সমিতি।
- ১৬৮। সুলেখা নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ১৬৯। জাতীয় কারু ও শিল্প সমবায় সমিতি।
- ১৭০। বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় ভান্ডার।
- ১৭১। মহিলা সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠান।
- ১৭২। সরোজিনী মহিলা সমবায় সমিতি।
- ১৭৩। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ।
- ১৭৪। বনগাঁও তাঁত সমবায় সমিতি, লিঃ।

পুত্রলিয়া

- ১৭৫। পুত্রলিয়া জেলা সমবায় শিল্প সংঘ, পুত্রলিয়া।
- ১৭৬। রঘুনাথপুত্র তন্তুবায় সমবায় সমিতি, পুত্রলিয়া।

কেন্দ্রীয় বিক্রয় সংস্থা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ১০ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ২০৮ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৩। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ১৫বি ক্যানাল স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৪। নবম্বীপ সমবায় তন্তুবায় ও শিল্প সমিতি, ৭২এ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭।

রঞ্জনশালার তালিকা

- ১। মেদিনীপুত্র সমবায় শিল্প সংঘ।
- ২। তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ, মেদিনীপুত্র।
- ৩। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, চব্বিশ-পরগনা।

- ৪। বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, বীরভূম।
- ৫। বিষ্ণুপুর সমবায় শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া।
- ৬। রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, শান্তিপুর, নদিয়া।
- ৭। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, শ্রীরামপুর।
- ৮। নারী সমবায় শিল্প ভবন, কামারহাটি, চব্বিশপরগনা।
- ৯। টালিগঞ্জ তন্তুবাস সমবায় সমিতি, কলিকাতা-৩৩।
- ১০। নবম্বীপ সমবায় তন্তুবাস শিল্প সমিতি, নদিয়া।
- ১১। বর্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ।
- ১২। কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি, বর্ধমান।
- ১৩। নেবুতলা তন্তুবাস সমবায় সমিতি।
- ১৪। অশোকনগর সমবায় বয়নশিল্প সমিতি, লিঃ।
- ১৫। বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ।
- ১৬। সোনামুখী সমবায় রেশম শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া।
- ১৭। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, নবম্বীপ, নদিয়া।
- ১৮। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, ফুলিয়া, নদিয়া।
- ১৯। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, বাঁকুড়া।
- ২০। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, মৃগবেড়িয়া, মেদিনীপুর।



টুকিটাকি

মৎস্যচাষ পরামর্শ পর্ষদের বৈঠক

সম্প্রতি দীঘায় রাজ্য মৎস্যচাষ পরামর্শ পর্ষদের ত্রয়োদশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বন ও মৎস্য মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর তাতে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত বৈঠকে ডাঃ বি সি গুহ, ডাঃ বেণী প্রসাদ, ডাঃ জে এল ভাদুড়ী, ডাঃ বি এস ভীমাচার, ডাঃ এ এন বসু, পার্লামেন্টারী সচিব শ্রীনিশাপতি মাঝি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর, এম, এল, এ, শ্রীরাজকৃষ্ণ মন্ডল, এম এল এ, শ্রীকুবেরচন্দ্র হালদার, এম এল এ, এবং মৎস্য-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি শ্রী পি সি দাস ও শ্রী জে সি বিশ্বাস প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে পশ্চিম-বঙ্গের মৎস্য-উন্নয়নমূলক যেসকল কর্মকল্পনা মৎস্যবিভাগ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে পর্ষদ সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পন্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে একমত হন।

সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকারের উন্নতিবিধানের জন্য মৎস্যবিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত যন্ত্রচালিত নৌকায় পর্ষদের সদস্যদেরও নিয়ে যাওয়া হয়। এসব নৌকাকে এখন দীঘা উপকূলে মৎস্য শিকার ক্ষেত্র সন্ধান ও একদল ধীবরকে শিক্ষণ দানে নিযুক্ত করা হয়েছে। সদস্যবৃন্দ এ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির প্রশংসা করেন। কারণ, সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকারের মরসুম সম্প্রসারণ এবং দূর্গত ধীবরদের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে হ্রাসমূল্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত ধীবরদের সমবায় সমিতিগুলিকে ঐ ধরনের কিছুসংখ্যক যন্ত্রচালিত ইউনিট বণ্টন ঐ কর্মকল্পনার লক্ষ্য। রাজ্যসরকারের পৃষ্ঠপোষিত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ধীবর-সদস্যদের মৎস্য-শিকারমূলক কার্যাবলীও সদস্যদের দেখানো হয়।

উপকূলভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যচাষ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং হাসপাতালের রোগীদের জন্য ‘শার্ক’ লিভার অয়েল’ ও হাঁস-মুরগির জন্য মৎস্যজাত খাদ্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার জৌনপুর্নে যে প্রযুক্তিমূলক গবেষণাকেন্দ্র এবং লবণাক্ত জলে মৎস্যচাষ সংক্রান্ত গবেষণা খামার স্থাপন করেছেন, সদস্যদের তা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে নির্মিত লবণাক্ত জলের হুদী রয়েছে ১২৫ বিঘা জমি জুড়ে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মিশ্র চাষের জন্য এখানে মিস্ট ও লবণাক্ত—দুই রকম জলের মাছই রাখা হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার উপকূলীয় জলকরগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ও জনসাধারণকে অবগত করার জন্য সরকারী মৎস্য পরিশোধন প্রাঙ্গণে একটি মৎস্যচাষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য হল তালিকা, মডেল, মৎস্য ও মৎস্যজাত পদার্থ থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উপস্থাপন এবং এ যাবৎ গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ ফলের পরিচয়দান। গত ১২ই জানুয়ারি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, রাজ্য মৎস্যচাষ উপদেষ্টা পর্ষদের সভা ও জেলার সরকারী আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বন ও মৎস্যচাষ মন্ত্রী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

মৎস্যচাষ প্রদর্শনী

কোচবিহার জেলাশাসক শ্রী এস ভি কৃষ্ণাণ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে গত ৮ই ডিসেম্বর কোচবিহার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের মৎস্য বিভাগের সাহায্যপ্রাপ্ত মৎস্যচাষ প্রদর্শনী কেন্দ্রের স্টাফিং পুকুরে জাল টেনে পুকুরে উন্নত ধরনের মৎস্যচাষের এক বিশেষ

প্রদর্শনী করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে শ্রীমতী কৃষ্ণাণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জাল টেনে ধৃত মৎস্যের বাৎসরিক ক্রমবর্ধন প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর বলে প্রতিভাত হয়। মৎস্য বিভাগীয় অধীক্ষক বলেন, “এই কেন্দ্র গত ১৯৫৭-৫৮ সালে তিন বৎসর মেয়াদে স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রে পুকুরের সংখ্যা মোট দু’টি ও আয়তন খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ধরনের উন্নততরভাবে মৎস্য চাষ করার দরুন অতীব সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে। এর মূলে রয়েছে কেন্দ্রের মালিক শ্রীসরোজকান্তি ঘটক মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। মৎস্যচাষের উন্নতির জন্য তিনি মৎস্য বিভাগের নির্দেশ ও উপদেশমত বর্তমান বৎসর নিয়ে বিগত তিন বৎসরে মোট ১,০৮৬ টাকা খরচ করেছেন এবং সরকার থেকে তাঁকে এ পর্যন্ত ২৪০ টাকা ‘বোনাস’ দেওয়া হয়েছে ও বর্তমান বৎসরে আরও ৬০ টাকা দেওয়া হবে (মোট ৩০০ টাকা)। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ এখানে বড় কথা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে এই ক্ষুদ্র কেন্দ্রই আজ এই এলাকার ভেতর একটা লাভজনক আয়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাঁর নিজের হিসাবমত সমস্ত খরচা বাদে ৩,০০০ টাকা তিনি মৎস্য বিক্রি করে লাভ করেছেন।’

তিনি আরও বলেন ‘শুধু এইরকম একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান আমাদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়ে মৎস্য চাষে উৎসাহী জনগণ যদি ঐকান্তিকভাবে নিজেদের পুকুরগুলিতে উন্নত প্রথায় চাষ করেন তবেই আমাদের বিরাট প্রয়োজনের ভেতর তার উৎপাদন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে দাঁড়াবে ও দেশবাসীর মৎস্য্যাবাদ দূর করতে সাহায্য করবে।’

মালিক শ্রীসরোজকান্তি ঘটক কেন্দ্রে আশীর্ভাবিত ফললাভ ও মৎস্য বিভাগের অফিসারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানান।

পুলবাজারে প্রদর্শনী

১৪ই জানুয়ারি (১৯৬০) মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দার্জিলিং জেলার পুলবাজারে এক কৃষি, শিল্প ও গবাদি পশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিং পুলবাজার সমিতি-উন্নয়ন ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজনবাড়ির ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, শিল্প, প্রচার, পশু-চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগ তাঁদের শিক্ষামূলক তালিকা, প্রাচীরপত্র, মডেল ইত্যাদি সহ এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ‘শিশুপ্রদর্শনী’, ‘সহিত্য সম্মেলন’, তথ্যমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি ছিল উক্ত প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য।

এ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রী ডি বি প্রধান, শ্রীবেদুনিদি রামাঙ্গ, শ্রীকানাইয়ালাল ও অন্যান্য অনেকে ভাষণ দেন। তাঁরা এসকল প্রদর্শনীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন যে, এ ধরনের অনুষ্ঠান কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নততর কৌশল ও উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করবে।

ফল সংরক্ষণ শিক্ষণ-তথ্য-উৎপাদন কেন্দ্র

গত ১৫ই জানুয়ারি (১৯৬০) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শ্রম-উপমন্ত্রী শ্রী এন বি গুরুং কালিম্পাঙ ৭ম মাইলে ফল সংরক্ষণ শিক্ষণ-তথ্য-উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। কালিম্পাঙ ২-এর উন্নয়ন ব্লকের পৃষ্ঠপোষিত উক্ত কেন্দ্রটি এই মহকুমায় এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তথায় ১২ জন শিক্ষার্থী আছেন। তাঁরা প্রত্যেকে মাসিক ৩০ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপমন্ত্রী মহাশয় পার্বত্য এলাকাসমূহে ক্ষুদ্রশিল্প কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বুদ্ধি দিয়ে বলেন এবং জনগণকে এ ধরনের পরিকল্পনাসমূহের পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান।

রক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী সি এইচ সেনগুপ্ত বলেন যে, উক্ত কেন্দ্রটি পরে সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং তার জন্য শিক্ষার্থীরা ইতিপূর্বেই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন।

দিঘা উপকূলে নৌচালন প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি মকর সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে দিঘা উপকূলে একটি সামুদ্রিক নৌচালন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে এ রকম প্রতিযোগিতা এই প্রথম। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের চালিত বিভিন্ন ধরনের দেশীয় নৌকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এই প্রতিযোগিতায় দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বন ও মৎস্য মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, সমবায় উপ-মন্ত্রী শ্রীচিশুরঞ্জন রায়, রাজ্য মৎস্যচাষ উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের স্থানীয় সদস্যগণ। কাকম্বীপ থেকে আগত একদল মৎস্যজীবী প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ১৫ জন বিজয়ীকে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অপর প্রতিযোগীদেরও নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

সমবায় শস্যগোলা-তথা-ঋণদান সমিতিতে অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ মৈদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, নদিয়া, চব্বিশপরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলার পনেরটি সমবায় শস্যগোলা-তথা-ঋণদান সমিতিতে অনুদান হিসাবে প্রদানের জন্য ১,৫৩,৭৫০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রত্যেক সমিতিতে ১০,২৫০ টাকা করে দেওয়া হবে—গুদামঘর, ধান্য ক্রয় ইত্যাদি ব্যয়ের জন্য।

‘ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার’

আমরা মাত্র চৌদ্দ মাস আগে শ্রীসতীকুমার নাগের এই বইখানির সমালোচনা প্রকাশ করেছি আমাদের পত্রিকায়। ইতিমধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; এ থেকেই অনুমান করা যায়, বইখানি পাঠকমহলে কতখানি সমাদর লাভ করেছে। চাষী-ভাইদের বিশেষ উপকারী এই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণও অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে আশা করি। মূল্য আগের মত ৭৫ নয়া পয়সাই আছে। প্রকাশকঃ দি গ্লোব লাইব্রেরি, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।



সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধ্যক্ষ শ্রীশুভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

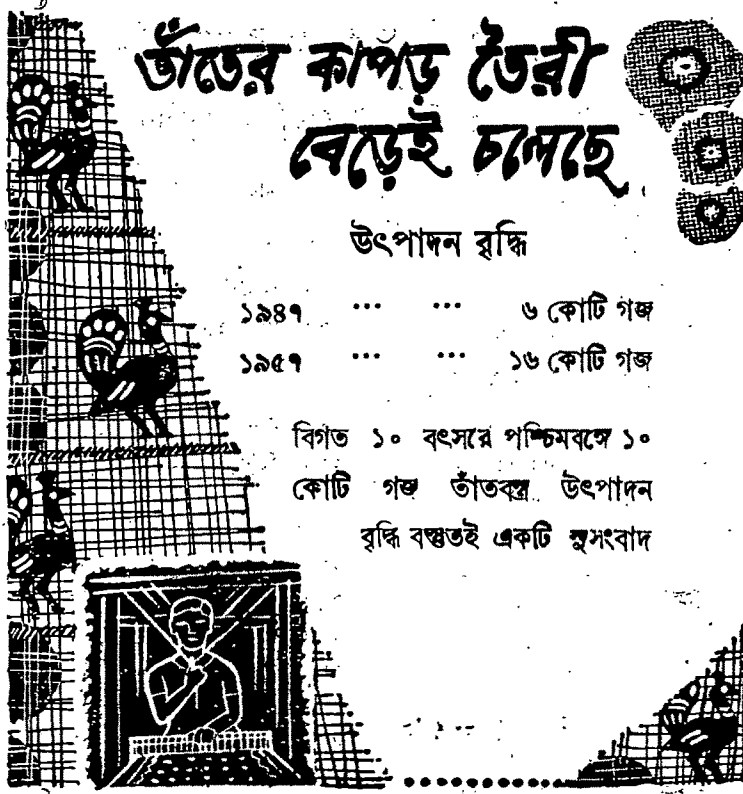
ডাঁডের কাপড় ডেরী বেড়েই চলেছে

উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭ ৬ কোটি গজ

১৯৫৭ ১৬ কোটি গজ

বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০
কোটি গজ তাঁতবস্ত্র উৎপাদন
বৃদ্ধি বস্তুতই একটি লুপ্তবাদ



পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রামপুরহাট	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	মাঝেরঘাট	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুয়া (মেদিনীপুর)	কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড।
৭। রানাঘাট	রানাঘাট	রানাঘাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মর্শিদাবাদ			২৮। বাটাল	চন্দ্রকোণা রোড	বাটাল।
৮। কালি	খাগড়াঘাট	কালি।	২৯। তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)	তমলুক।
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁধি	কণ্টাই রোড	কাঁধি।
১০। লালবাগ	মুন্সিরাবাদ	মুন্সিরাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। বালুরঘাট	কালিয়ারগঞ্জ	বালুরঘাট।
১৩। রানকুপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩। মালদহ	মালদহ কোর্ট	মালদহ।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪। জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুচুড়া	চুচুড়া	চুচুড়া।	৩৫। আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দাঙ্গলিঙ		
জেলা বর্ধমান			৩৬। দাঙ্গলিঙ	দাঙ্গলিঙ	দাঙ্গলিঙ।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭। কালিঙ	শিলিঙ	কালিঙ।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮। শিলিঙ	শিলিঙ	শিলিঙ।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। বাখাডাঙ্গা	কোচবিহার	বাখাডাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাণ্ডারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পো:—উনুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওলাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁধি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেসঙ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

ম্যালেরিয়াকে অগ্রাহ্য করবেন না



জ্বর হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখান

আর কুইনিন্ খেতে বললে কেনবার সময় অবশ্যই দেখে
নেবেন তা' যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুইনিন্ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

কুইনিন্

খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ

সব বড় বড় ঔষধালয়ে এবং সরকারী
কুইনিন্ বিক্রয়কেন্দ্র, ওল্ড হিন্দুস্থান
বিল্ডিংস, কলিকাতায় পাওয়া যায়।



ম্যালেরিয়ায় নির্ভরযোগ্য
প্রতিষেধক হিসেবে
কুইনিন্ কয়েক শ' বছর
ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
এ ওষুধ খুব দ্রুত রক্তে
মিশে যায় এবং এর বিষ-
ক্রিয়া অতি সামান্য।
কুইনিন্ ব্যবহার করলে
ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রতি-
রোধ ক্ষমতা জন্মান না
বলেই চলে।

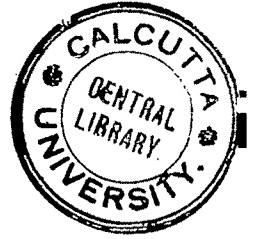
পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অগ্ৰাণ্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬।১ গোপালনগর রোড, আলিপুর



ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর	১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	জয়নগর	২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ্র	৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়	৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	ক্যানিং	৫। ঐ ..	বেহালা
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার	৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয়	বারুইপুর
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৮। ঐ ..	মথুরাপুর	৭। ঐ ..	হাবড়া,
৯। ঐ ..	কুলপী		পোঃ তববেড়িয়া
১০। ঐ ..	সাগর	৮। ঐ ..	বনগাঁ
১১। ঐ ..	বারাকপুর	৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া,	১০। ঐ ..	বাগ্‌দা
	পোঃ নৈহাটি	১১। কৃষি-গোপালন	শিল্প শিক্ষালয়ের পশু-
১৩। ঐ ..	বারাসাত	চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম	ক্যান্টনমেন্ট।
১৪। ঐ ..	হাবড়া		
১৫। ঐ ..	বসিরহাট		
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ		
১৭। ঐ ..	সন্দেশখালি		
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া		

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	প্রাথমিক	ঠিকানা
১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি
২।	ঐ	ডোমজুড়
৩।	ঐ	আমতা

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	হাওড়া
২। ঐ ..	উলুবেড়িয়া
৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	উলুবেড়িয়া
৪। ঐ ..	বাগানান
৫। ঐ ..	শ্যামপুর
৬। ঐ ..	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	বেণুগাভরি
৩।	ঐ	রানাবাট
৪।	ঐ	শান্তিপুর

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর
২।	ঐ	রানাবাট
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	কুলিয়া, পোঃ কুলিয়া কলোনী
৪।	ঐ	চাক্দা
৫।	ঐ	হাঁসখালি
৬।	ঐ	রানাবাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	প্রাথমিক পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ	হরিহরপাড়া
৩।	ঐ	দমকল
৪।	ঐ	রঘুনাথগঞ্জ
৫।	ঐ	ভগবানগোলা
৬।	ঐ	ধুলিয়ান
৭।	ঐ	নবগ্রাম

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বহরমপুর
২।	ঐ	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ	কান্দি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বেলডাঙ্গা
৬।	ঐ	বারওয়ান, পোঃ পাঁচখুপী
৭।	ঐ	কান্দি
৮।	ঐ	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পো: ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশচন্দ্রপুর
৩।	ঐ ..	খড়বা, পো: চঞ্চল
৪।	ঐ ..	রতুয়া, পো: আরিয়াভাঙ্গা
৫।	ঐ ..	মানিকচকু, পো: এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পো: বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	বালুরঘাট
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর

ক্রমিক	স্থিতিবান	বালুরঘাট
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	দার্জিলিং (সদর)
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
২।	ঐ ..	ধুম
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)
৫।	ঐ ..	তিস্তাভ্যালি
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি

ক্রমিক	স্থিতিবান	দার্জিলিং
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কালিম্পাঙ
৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়াই, পো: তাকদা
৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পো: বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	সুকিয়াপকরি, পো: জোড়বাংলো
৮।	ঐ ..	কালিম্পাঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	কোচবিহার
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ
৩।	ঐ ..	মাথাভাঙ্গা

ক্রমিক	স্থিতিবান	কোচবিহার
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪।	ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দোমহানি
২।	ঐ ..	বীরপাড়া
৩।	ঐ ..	কালচিনি
৪।	ঐ ..	আলিপুরদুয়ার

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	জলপাইগুড়ি
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	জলপাইগুড়ি
৩।	ঐ ..	ময়নাগুড়ি
৪।	ঐ ..	ধুপগুড়ি

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	স্থান
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	গুস্করা
২।	ঐ ..		মেমারী
৩।	ঐ ..		সেহারাভাঙ্গার
৪।	ঐ ..		কালনা
৫।	ঐ ..		কাটোয়া
৬।	ঐ ..		নতুনহাট
৭।	ঐ ..		আসানসোল
৮।	ঐ ..		রানীগঞ্জ
৯।	ঐ ..		দুর্গাপুর

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বর্ধমান
২।	ঐ ..		কাটোয়া
৩।	ঐ ..		কালনা
৪।	ঐ ..		আসানসোল
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		ভাভার
৬।	ঐ ..		মজলকোট
৭।	ঐ ..		শক্তিগড়
৮।	ঐ ..		গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	স্থান
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	সাঁইখিয়া
২।	ঐ ..		বোলপুর
৩।	ঐ ..		দুবরাঙ্গপুর
৪।	ঐ ..		রামপুরহাট
৫।	ঐ ..		নলহাট

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	স্থান
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	সিউড়ি
২।	ঐ ..		রামপুরহাট
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		নলহাট
৪।	ঐ ..		মহম্মদাবাঙ্গার
৫।	ঐ ..		আমেদপুর
৬।	ঐ ..		বোলপুর, শ্রীনিবেশ

হুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চুচুড়া

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	স্থান
১।	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	চুচুড়া
২।	ঐ ..		ত্রিবেণী
৩।	ঐ ..		শ্রীরামপুর
৪।	ঐ ..		ভারকেশ্বর

ক্রমিক	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	স্থান
১।	স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	চুচুড়া
২।	ঐ ..		শ্রীরামপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।		আব্রামবাগ
৪।	ঐ ..		খানাকুল
৫।	ঐ ..		পুরসুরা, পো: চাপাডাঙ্গা
৬।	ঐ ..		পোলবা, পো: চুচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর
২। জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	দাঁতন
২।	ঐ	মেদিনীপুর
৩।	ঐ	বালিচক
৪।	ঐ	গড়বেতা
৫।	ঐ	খড়গপুর
৬।	ঐ	তমলুক
৭।	ঐ	মহিষাদল
৮।	ঐ	নরঘাট
৯।	ঐ	ঘাটাল
১০।	ঐ	কাঁথি
১১।	ঐ	এগুয়া
১২।	ঐ	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	মেদিনীপুর
২।	ঐ	তমলুক
৩।	ঐ	কাঁথি
৪।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ	ভগবানপুর
৬।	ঐ	পটাপুর
৭।	ঐ	খৈজুরি
৮।	ঐ	তমলুক
৯।	ঐ	বিনপুর (১), পোঃ লালগড়
১০।	ঐ	বিনপুর (২), পোঃ বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

১।	স্বাক্ষর	বাঁকুড়া
২।	ঐ	ওন্দা
৩।	ঐ	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ	সোনিমুখী
৬।	ঐ	খাতরা

১।	স্বাক্ষর	বাঁকুড়া
২।	ঐ	বিষ্ণুপুর
৩।	পশ্চচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনিমুখী
৪।	ঐ	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশ্চচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

১।	স্বাক্ষর	পুরুলিয়া
২।	ঐ	বলরামপুর
৩।	ঐ	মানবাজার
৪।	ঐ	খালদা
৫।	ঐ	কাশীপুর
৬।	ঐ	রঘুনাথপুর

১।	স্বাক্ষর	পুরুলিয়া
২।	ঐ	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ	হুয়া

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পাঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

প্রতি একর জমিতে

১০-১৫ পাউণ্ড 'গ্যামেজেন'

ডি.০২৫ ছড়িয়ে কীটপতঙ্গের

আক্রমণ

থেকে

আপনার শস্য রক্ষা করুন।

আই, সি, আই'র

পরিবেশক

সব দোকানগুলিতেই

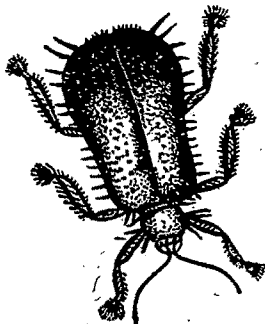
খুচরো কিনতে পাওয়া যায়। অধিক পরিমাণ প্রয়োজনের

জন্মে

এবং প্রয়োগবিধির জন্মে নিকটতম আই, সি, আই, আগিসে লিখুন।

থলির উপর অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন নিশ্চয় দেখে নেবেন ও

'গ্যামেজেন' ডি.০২৫ বিক্রেতার কাছ থেকেই কিনবেন।



IFC-110 B BEN

ইম্পিরিয়াল কেমিকেল
ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ



কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	৪০৭
ভারতের খাদ্যসমস্যার বাস্তব সমাধান	৪০৯
চাষীর সমস্যা : ন্যায্যমূল্য	৪১৩
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তামাক চাষের উন্নয়ন	৪১৬
উদ্ভিদের তিনটি প্রধান খাদ্য	৪১৮
আখের চাষে জলসেচ	৪২১
চারাবাগান	৪২৪
সমবায় প্রথায় চাষ	৪২৮
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কেন নয়	৪৩১
ভারতে মাছের চাষ বৃদ্ধির প্রয়াস	৪৩৩
পশুচিকিৎসায় পার্থক্য	৪৩৬
জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাবধান	৪৪১
গমক্ষেতের আগাছা বিনাশে '২, ৪ডি'	৪৪৪
ট্যাকটিক	৪৪৭

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সুজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রৈলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিষাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বন্ধুধ্বরা

১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৬৬

(১৮৮১ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ এখনও খাদ্য-ফসলের উৎপাদনে স্বয়ং-পূর্ণ নয়, তবু আমাদের চাষীভাইদের শ্রদ্ধা খাদ্য-ফসলের উৎপাদনে লেগে থাকলেই চলবে না, অর্থকর ফসলের চাষেও মনোযোগ দিতে হবে। অর্থকর ফসলের মধ্যে এ রাজ্যে পাটই প্রধান।

পাটের দিক দিয়ে বাঙলাদেশকে অশ্রুতভাবে ভাগ করা হয়েছে। অবিভক্ত বাঙলায় পাটচাষের অঞ্চল ছিল পূর্ববঙ্গ আর পাটশিল্পের অঞ্চল পশ্চিম-বঙ্গ। দেশবিভাগের ফলে পাটচাষের প্রায় সব জমিই চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে আর বোঁশির ভাগ পাটকলই রইল ভারতের পশ্চিম বাঙলায়। এ শিল্পকে এখানে চালু রাখার জন্য যত পাট আরশ্যক তা ভারতেই জন্মাবার দায়িত্ব এসে গেল আমাদের উপর। এ ছাড়া ভারতের বাইরেও রয়েছে আমাদের পাটের বাজার। আমাদের বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের প্রধান একটি উপাদান হ'ল পাট। ভারতে পাটচাষের মূখ্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম আর বিহারের কতক অংশ।

পাটচাষের সময় হ'ল চৈত্র-বৈশাখ মাস। যেসব নিচু জমিতে বর্ষায় বানের জল ঢোকে, তাতে চৈত্র-মাসে বীজ বোনা দরকার। সুতরাং জমি তৈরি করতে হবে ফাল্গুন মাস থেকেই। দোআঁশ মাটির জমি পাটচাষের উপযোগী। জমিতে লাঙল দিতে হবে গভীর করে। বারবার লাঙল আর মই চালিয়ে মাটি ভাল করে গুঁড়িয়ে—যাকে বলে 'ধুলো-ধুলো করে ফেলা', তাই করতে হবে। পাটের অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে অঙ্কুর জন্মায় তার শক্তি মাটি

ভেদ করবার শক্তি নেই। তাই ঢেলাগুলো সময়ে ভেঙে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির সময়ে বিঘাপিছু গ্রিশ মণ হারে গোবরসার এবং অন্তত এক মণ খইল দেওয়া দরকার। গোবরসারের অভাবে পুকুরের কাদামাটি বা আবজ'না-পচা সার অথবা কম্পোস্ট সার দেওয়া যেতে পারে।

উন্নত জাতের বীজ বুনতে হবে। সরকারি গবেষণাগারে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী কয়েক রকম উন্নত ধরনের পাট উদ্ভাবিত হয়েছে, চাষীভাইরা তাঁদের অঞ্চলের সরকারী কৃষিকর্মচারীর সাহায্যে সেসব বীজ পেতে পারেন। নিজেদের চাষ থেকে যাঁরা বীজ তুলে রেখেছেন, তাঁদের দেখতে হবে যেন বীজগুলো নীরোগ আর পুষ্ট হয়। বোনার আগে রোগনিরোধক কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজ-গুলো শোধন করে নিলে ভাল হয়।

পাটবীজ সাধারণত 'ছাড়িয়ে বুনতেই আমরা অভ্যস্ত। এ অভ্যাসটি ত্যাগ করা দরকার! বীজ সারিতে বোনাই ভাল। পাটচাষে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় নিড়েন দেওয়াতে। যথাসময় বিদে এক নিড়েন না দিলে পাটের ফসল ভাল হ'তে পারে না। পাটের ক্ষেতে নিড়েন দেবার সময়টাতে প্রায়ই মজুরের অভাব দেখা দেয় বলে ঠিকমত নিড়েন দেওয়া চলে না, তাই ফসল খারাপ হয়। আবার লোক পাওয়া গেলেও মজুরি যদি বেশি দিতে হয়, তাতে চাষে খরচ বেশি পড়ে আর লাভ হয় কম। সারিতে পাটচাষ করলে নিড়েনের খরচ অনেক কমে যায়—এমনকি অর্ধেকেরও কম পড়ে। সারিতে

বীজ বোনার যন্ত্র আজকাল আমাদের দেশেই তৈরি হয় আর তার দামও বেশি নয়। এই যন্ত্র হাতে ঠেলেই চালানো যায়।

ছিটিয়ে বুনলে বীজ বেশি লাগে। সারিতে বুনলে তার তিন ভাগের দু' ভাগ হ'লেই চলে। সারি-বোনাতে তেতো পাটের বীজ বিঘাপিছ দু' এক সের আর দেশী পাটের বীজ তিন পোয়া হ'লেই নখেট। জমিতে সোজা সারি করতে হবে না ইঞ্চি থেকে এক ফুট অন্তর। এতে নিড়েন দেওয়া, চারা পাতলা করা প্রভৃতি কাজ করারও সুবিধা হয়— দু' সারির মাঝের জায়গা থেকে। ফাঁক ফাঁক সারিতে বীজ বোনার ফলে চারা পাতলা করে দেওয়ার ঝামেলাও অনেক কমে যায়। চারা পাতলা করে দিলে উন্মুক্ত গাছগুলো অপচিত হয়, সেই অপচয়ও অনেকটা বন্ধ হয়। শুধু সারির মধ্যে গাছগুলো দরকারমত পাতলা করে দিলেই হ'ল।

নিড়েনের সঙ্গে সঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করাটাও একটা বিশেষ কাজ। গাছ একটু বড় হয়ে জমিতে ছায়া ফেললে আর আগাছা বিশেষ জন্মাতে পারে না : ততদিন পর্যন্ত আগাছা জন্মালেই তা বিনাশ করতে হয়। সুতরাং বারবার নিড়েন দেওয়ার দরকার হয়। এই নিড়েনের কাজটাও হাতে-চালানো যন্ত্রের সাহায্যে করলে চাষের খরচ বেশ কম পড়ে। এই যন্ত্রও আজকাল আমাদের দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং তার দামও বেশি নয়। সাধারণ চাষীভাইরা অস্পায়াসেই বীজ বোনার এবং নিড়েন দেওয়ার যন্ত্র কিনে নিতে পারেন। একবার কিনলে অনেকদিন তা দিয়ে কাজ চলবে এবং পাটের চাষ ছাড়া অন্যান্য চাষেও তা ব্যবহার করা চলবে।

সারিতে বীজ বুনলে গাছগুলো সমান দূরে দূরে থাকে, তাই সব গাছই সমান আলো-বাতাস পায়, খাদ্য পায় সমান ভাগে আর পরিচর্যাও পায় একই

রকম। ফলে গাছগুলো সমানভাবে বাড়তে পায় এবং একই রকম পুষ্ট আর তেজী হয়। সারির গাছ কাটতে সুবিধা, তার আঁটি বাঁধতে সুবিধা, সুতরাং তাতেও খরচ পড়ে কম।

পাটের তভাব কিছুটা পূরণ করে মেস্তাপাট। অপেক্ষাকৃত নীরস আর উঁচু জমিতেও মেস্তার চাষ চলতে পারে। খাদ্যশস্যের চাষ যেখানে ভাল হবে না এমন পতিত ডাঙা জমিতে মেস্তার চাষ লাগিয়ে দিন। এই জমিও তৈরি করতে হবে পাটের জমির মত করে। বীজ বোনার সময়ও একই। মেস্তার বীজও সারিতে বোনা দরকার।

অনেকের ধারণা যে, মেস্তার চাষে সার না হ'লেও চলে। এ ধারণা ঠিক নয়। মেস্তার চাষেও পাট-চাষেরই মত সার দিতে হয়। গোবরসারের অভাব ঘটলে, পুকুরের পাক দেওয়া যেতে পারে। এ সময়ে পুকুর-দীঘির জল তলায় নেমে যায় বলে পাকমাটি তোলা সহজ। চষা জমিতে পাকমাটি ফেলে, তা শুকিয়ে ওঠার পরে লাঙল দিয়ে জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজ বোনার পরে গাছ একটু বড় হ'লে পাট আর মেস্তা দু'টোর চাষেই কিছু অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়।

মানুষের জীবনে খাদ্য এবং অর্থ দু'টোই অপরিহার্য। সুতরাং ধান, গম, আলু, ডাল প্রভৃতির চাষে যতখানি নিষ্ঠা এবং চেষ্টা প্রয়োগ করা হয়, পাট, তুলো, তিল, তিসি প্রভৃতির চাষেও ততখানিই যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। আমাদের খাদ্যফসলের মধ্যে প্রধান যেমন ধান, অর্থকর ফসলেরও মধ্যে তেমনি পাট। সুতরাং এ সময়ে চাষীভাইরা পাটের চাষে তৎপর হয়ে উঠুন এবং মনে রাখতে হবে, বীজ ছিটিয়ে বোনা চলবে না, সারিতে বুনতে হবে। সারিতে বীজ বুনলে খরচ পড়বে কম, লাভ হবে বেশি।

ভারতের খাদ্যসমস্যার

বাস্তব সমাধান

শ্রী এস কে পাতিল

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী

আমি কৃষক নই। চাষ-আবাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন দাবিও আমি করি না। কিন্তু আমার নতুন দায়িত্বের নানা চিন্তাকর্ষক দিক যত দেখছি ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, কৃষিক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটানো যায় এবং তা করতেই হবে। এদিক দিয়ে আমাদের বিরাট সম্ভাবনা আছে—হতাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। বরং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করার মত কতকগুলি কারণ আমি দেখেছি।

বর্তমানের উৎপাদনের নিম্নহার ও পল্লী-অঞ্চলের নানা অসুবিধার কথা আমার অজানা নেই। আমি জানি, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হ'লেও, ৩৩ কোটি একর জমিতে চাষ-আবাদ হ'লেও, উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান সবার নিচে। এখানে একর-প্রতি এক-চতুর্থ টন শস্য উৎপন্ন হয়। গত বছর ২৮ কোটি একর জমিতে আগের তুলনায় অনেক বেশি শস্য উৎপন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তারও পরিমাণ মাত্র ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন।

তবু কৃষির এই দুর্বলতাই ভারতের সব চেয়ে বড় শক্তি। এ থেকেই বোঝা যায়, কতটা ফাঁক আমাদের ভরাতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি স্বরান্বিত করার কি বিরাট সুযোগই না রয়েছে। বিশ্বের যে-কোন দেশের তুলনায় ভারতেই উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের কৃষি-সমস্যার কোন সরাসরি সমাধান নেই। তবে, এজন্য দ্রুত ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কি করা উচিত তা সকলেরই জানা আছে। যেমন—

সেচ-ব্যবস্থার পুরাপুরি সুবিধা গ্রহণ, উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ প্রয়োগ, ভূমি-সংরক্ষণ, রাসায়নিক সার, সবুজ ও পচাই সার ব্যবহার, জলা, নোনা ও উষ্ণ জমির সংস্কার। তার উপর রয়েছে পল্লী-বাসীদের মিলিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার বিরাট সম্ভাবনা। এজন্য প্রয়োজন সুসংবদ্ধভাবে তাদের হাজার হাজার ছোট ছোট পরিকল্পনার দিকে আকৃষ্ট করা, তাদের শক্তিকে প্রয়োগ করা। এইসব ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

মনে রাখতে হবে, কৃষকের হাতেই রয়েছে লাভগল এবং সে ছাড়া আর কেউ শস্য উৎপন্ন করে না। সে যাতে তার ভূমিকা যথাযথ পালন করতে পারে সেজন্য তাকে উৎসাহ দিতে হবে। তা না হ'লে আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সম্প্রতি চীনের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইক্ষু-উৎপাদক ও চীনকলগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একটি কৃষি-পণ্য মূল্য উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষি-দ্রব্যের মূল্যের ঘন ঘন ওঠা-নামা দেশের আর্থনৈতিক উন্নতিকে ব্যাহত করে ব'লে এই কমিটি গঠন দরকার হয়েছে। উৎপাদক, ব্যবহারক, খাতনামা অর্থনৈতিক-বিদ্ ও কৃষি-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি কৃষি-মূল্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ দেবে।

এভাবে কাজ শুরু হয়েছে। কৃষক যাতে নিজ শক্তি পুরাপুরি প্রয়োগ করে এবং নিজের উন্নতি সাধনের জন্য তার ইচ্ছা যাতে আরও শক্তিশালী হয়

সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় উৎসাহদানের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

যেসব মৌলিক কারণে আরও বেশি খাদ্যোৎপাদন সম্ভব সেগুণের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার উপর আমি বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছি। এই কাঠামোর মূল ভিত্তি হ'ল ভূমি-সংস্কার। এতে কৃষকের স্বত্ব নিরাপদ হবে। কৃষককে এই মৌলিক নিরাপত্তা না দিলে জমির উন্নয়নে সে ব্যক্তিগত আগ্রহ নেবে না। যে জমির মালিকানার ঠিক নেই তাতে নিশ্চয়ই সে অর্থ বিনিয়োগ করবে না।

তার পর কাঠামোর চারটি স্তম্ভ হ'ল—সেচ, সার, ভাল বীজ ও উন্নত যন্ত্রপাতি।

কৃষি-উন্নয়নে সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক। বড়, মাঝারি ও ছোট সেচ পরিকল্পনার জলের সম্যক ব্যবহার যাতে হয় সেজন্য আমি প্রথমেই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সর্বাধিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করি। ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও মোটামুটি স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে কার্যকরী করা যায়। এতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এবং এর জলও অবিলম্বে ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে ১০ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়ার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। এ লক্ষ্যে শুধু যে পৌঁছানো গিয়েছে তা নয়, তা অতিক্রম করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলিতে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার গুরুত্ব বজায় থাকবে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এভাবে আরও ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে জলসেচ করার ব্যবস্থা আমরা করছি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার ফলে আরও ১ কোটি ৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনা এবং তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান আছে তা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। কি

ধরনের শস্য চাষ করলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ ও যেসব স্থানে আগে বৃষ্টির উপর নির্ভর করা হ'ত সেখানে সেচের জল ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সর্বোপরি জল সংরক্ষণ ও তার সম্যক ব্যবহারের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে হবে।

সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে ভাল বীজ সরবরাহের জন্য আমরা বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের বৃহৎ কার্যসূচি গ্রহণ করেছি। এটি দ্রুত রূপায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্র হস্তে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। খামারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেনা সম্ভব না হ'লে লীজ নেওয়া হচ্ছে এবং রাজ্য-সরকারদের জমি সংগ্রহের পদ্ধতি সরল ও জমি সংগ্রহ আইনের জরুরী ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারাটি প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে অব্যাহত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে এবং বর্তমান পরিকল্পনাকালের শেষার্শ্বে এই ধরনের চার হাজার খামার স্থাপন সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে। এই খামারগুলি স্থাপনের ফল আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হবে।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করার অন্যতম দ্রুত ও নিশ্চিত পদ্ধতি হ'ল জৈব সার ও রাসায়নিক সারের যথাযথ প্রয়োগ। তবে বৈদেশিক মুদ্রার অনটনের জন্য আমাদের পক্ষে দেশের চাহিদা এ পর্যন্ত পূরা-পূরি মেটানো সম্ভব হয় নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে নাইট্রোজেন-বিশিষ্ট সারগুলির আনুমানিক মোট চাহিদার—১৫ লক্ষ ২০ হাজার টন—মাত্র ৫৫ শতাংশ মেটানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে এই চাহিদার পরিমাণ হয়েছে ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন। বর্তমান বছরে দেশে মাত্র ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন সার তৈরি হবে বলে আশা করা যায়। বাকিটা আমদানি করেই মেটাতে হবে। সার সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য, সবুজসার সহ স্থানীয় সার-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভূমি সংরক্ষণ, জমি-সংস্কার, চারাগাছ রক্ষা এবং উন্নত কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তনের কার্যসূচির রূপায়ণ আরও ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রবি ও খারিফ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। নির্বাচিত এলাকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একে বলা হয় 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম'। যেসব কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে খাদ্যোৎপাদন সম্ভব হয় সেগুলি একটি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করাই এই কার্যসূচির উদ্দেশ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই কার্যসূচি অনুসারে কৃষকদের বিশেষ উৎসাহ ও সকল প্রকার সাহায্য দেওয়া হবে। জমির যথাযথ ব্যবহার, মাটি পরীক্ষা, চাষ-আবাদের পরিকল্পনা রচনা এবং মিশ্রচাষের পরিকল্পনাগুলিও আরও দ্রুত কার্যকরী করতে হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি উৎপাদনের মাত্রা লাভের জন্য এখন ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ ভবিষ্যতে আরও উৎপাদনের জন্য কাজের হার এতেই স্থির হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের লক্ষ্য কি হবে এবং তা কেমন করে সাধন করা হবে সে বিষয়ে বর্তমানে চিন্তা করা হচ্ছে। শূদ্ধ ১০ কোটি টন শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির না করে তারও বেশি উৎপাদনের চেষ্টা করার বিষয়ে সকলেই একমত। এতে জরুরী অবস্থার জন্য খাদ্যশস্য মজুত রাখা সম্ভব হবে। মনে হয়, ১১ কোটি টন শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য গ্রহণই বাঞ্ছনীয় হবে।

আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত বলে একই জমিতে চাষের সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সর্বাধিক ফল লাভের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়—বিশেষত যেগুলির জন্য বৈদেশিক মদ্রা ব্যয় করতে হয়, যেমন রাসায়নিক সার, ষ্ট্রাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রপাতি, চারাগাছ রক্ষার যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের কীট-বিনাশক দ্রব্য

সম্বন্ধে সুদূরদৃষ্ট ও সময়মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সেচ, সার, উন্নত বীজ, ভূমি-সংরক্ষণ, জমি-উন্নয়ন ও উন্নত কৃষি-পদ্ধতি সংক্রান্ত কার্যসূচি আরও শক্তিশালী করতে হবে। তা ছাড়া, উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি জনপ্রিয় করার জন্য দেশব্যাপী কার্যসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক স্তরে একটি যোগ্য সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের কার্যকরী কারিগরি সাহায্য দিতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির উপকরণগুলি তাদের সময়মত যোগাতে হবে এবং উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্য ঠিকমত সম্প্রসারণ-মূলক কাজ চালাতে হবে।

আমার মনে হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টার জন্য প্রতিটি গ্রামের সমর্থন লাভের জন্য দৃঢ় চেষ্টা চালানো বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য কৃষকদের উৎসাহ দিতে হবে। তাদের ন্যায্য শর্তে পূর্ণাঙ্গ ঋণ দিতে হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন্য আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে। ব্যাপক হারে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ'লে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় ও গুদামজাত করার সন্তোষজনক ব্যবস্থা এবং কৃষি-দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দিতে হবে। চাষীকে এই আশ্বাস দিতে হবে যে, বাণিজ্যের শর্তাবলী তার প্রতিকূলে যাবে না। শূদ্ধ উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য দামই যে সে পাবে তা নয়, তাকে যা কিনতে হবে তাও যাতে ন্যায্য দামে পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতি কার্যকরী করতে উদ্ভূত শস্য মজুত করার জন্য আমার প্রস্তাব সাহায্য করবে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার করতে হ'লে বর্তমান পরিকল্পনাকালের মধ্যেই সারা দেশে সেবা সমবায় গঠন বিশেষ প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিকট-ভবিষ্যতে একটি আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংপুঙ্ট অর্থনীতি সৃষ্টি করাই আমাদের লক্ষ্য। এজন্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য এবং তা আগের তুলনায় অনেক বেশি ত্বরান্বিত অবশ্যই করতে হবে। যুদ্ধের মত জাতীয় আপৎকালে জরুরী প্রয়োজনের

যে মনোভাব দেখা যায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনবদ্য মনোভাব সারা দেশে সৃষ্টি করতে হবে।

এ করা যে সম্ভব তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে সেইসব স্থানে যেখানে তা চেষ্টা করা হয়েছে। ফোর্ড ফাউন্ডেশন দল বলেছেন যে, ভারতীয় কৃষির শ্রেষ্ঠ উৎপাদনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ উৎপাদনের তুলনা করা চলে। বহু ভারতীয় কৃষক যে উচ্চ হারে উৎপাদন করেছেন, সেইভাবে উৎপাদনের গড়পড়তা

নিম্ন হারকে উঁচুতে তোলার হলে ভারতের দায়িত্ব। এজন্য কি করতে হবে তা সর্বজনবিদিত। এখন দরকার শ্রদ্ধা উদ্যম ও ক্ষিপ্ততার সঙ্গে এই কাজ-গড়লি করা এবং সারা পল্লী-অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেওয়া। আমাদের কৃষকগণ যে এই কাজকে জাতীয় দায়িত্ব বলে গ্রহণ করবেন এবং দেশের উৎপাদনের বর্তমান নিম্ন হারকে উর্ধ্বমুখী করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাবেন—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।



চাষীর সমস্যা : ন্যায্যমূল্য

অনির্মলেক্ষু সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক

আমাদের দেশে চাষের সমস্যা নানা প্রকারের। একদিকে তার উৎপাদনের সমস্যা আর অন্যদিকে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা। জনসংখ্যার অনুপাতে আবাদী জমির পরিমাণ মোটেই যথেষ্ট নয়। পশ্চিম বাঙলায় আবাদী ও আবাদীযোগ্য জমির মোট পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ একর। এর মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষই প্রধান। প্রতি বর্গমাইলে পশ্চিম বাঙলায় ৮০৬ জন লোক বাস করে এবং এই জনসংখ্যার ৪ ভাগ একমাত্র কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজের উপর নির্ভর করে। ঘনবসতির জন্য ভাল-ভাবে চাষ করার উপযুক্ত জমি খুব কমসংখ্যক চাষীদেরই আছে—অর্থাৎ বেশির ভাগ চাষী-ভাইরা খুব ছোট ছোট জমিতে চাষ করে। আবার এইসব ছোট ছোট জমিও সব এক জায়গায় নয়—চারদিকে ছড়ানো। এই তো গেল তার জমির অবস্থা—অন্যদিকে চাষের কাজের জন্য যে পরিমাণ মূলধন বা সম্বল প্রয়োজন তা অনেকেরই নেই। চাষের জন্য তার স্বল্পসম্পদের ঋণের প্রয়োজন—আর সেই ঋণও উপযুক্ত পরিমাণে ঠিকসময় পাওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই তার পক্ষে এই ঋণ উপযুক্ত সুদে ঠিকসময় পাওয়া একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—অবশ্য যারা সমবায় সমিতির সভ্য তারা সমিতি থেকে ঠিকসময়ে এবং ন্যায্য সুদে ঋণ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। তা হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে তাকে ঋণের জন্য মহাজনের কাছেই হাত পাততে হয় এবং সেই মহাজনই আবার অনেক ক্ষেত্রে তার উৎপন্ন দ্রব্য কিনে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে। অর্থাৎ যে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে তার কাছেই তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করতে হয়।

চাষের সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায় চাষের নানা রকম চেষ্টা চলছে। একথা সহজেই বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অথবা সামান্য পরিমাণ জমির মালিক কোনও চাষীর পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত ধরনের চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই চাষের কাজকে লাভজনক করতে হ'লে ফসলের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং তা করতে হ'লে সমবায় চাষ ছাড়া আমাদের দেশে আর কোনও রকম পথ নেই। শুধু যে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ানোই প্রয়োজন তা নয়—দেশে যে আজকাল নানা রকমের কলকারখানা গড়ে উঠছে তাদের কাঁচামাল যোগাতে হ'লে জমির ফসল বাড়াতে হবে এবং বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব একমাত্র সমবায় চাষের ভেতর দিয়ে।

একদিকে যেমন ফসল বাড়ানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করা দরকার—তেমনি অন্যদিকে সেই উৎপন্ন ফসল যাতে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হয় তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু আজকাল অনেকক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত চাষী-ভাইকে অনেক সময় ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে বিক্রির জন্যে নিয়ে আসতে হয়। তাই বাজারে একসময় আমদানি বেশি হয়ে যাওয়ায় দাম পড়ে যায়। ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাকে বিক্রি করতে না হয়, অর্থাৎ যদি বাজারে একসঙ্গে অনেক পরিমাণে ফসল এসে না পড়ে তা হ'লে দাম পড়ে যেতে পারে না। কিন্তু ধরে রাখবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। কারণ চাষের সময় তাকে যে ঋণ করতে হয় সেই ঋণ পরিশোধের তাগিদ আসে ঠিক ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তা ছাড়া তার নিজেরও অর্থের প্রয়োজন। তাই বাজার-দর যাই হোক না কেন তাকে সেই দামেই বিক্রি

করতে হয়। এমন অবস্থায় ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশা খুবই কম। আবার অনেক ক্ষেত্রে চাষী-ভাইকে তার ফসল মহাজনের কাছে বিক্রি করতে হয় বলে বিক্রয়ব্যবস্থা মহাজনের পক্ষেই লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া ওজনে এবং নানা রকম ফলি-ফিকিরে ফসল থেকে কেটে নেওয়ায় চাষী-ভাইদের অনেক সময়ই উচিতমূল্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেসব ক্ষেত্রে ফসল ওঠার পরে বিক্রি করার দরকার হয় না—সেখানেও তাকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই উৎপন্ন শস্য মজুত করার মত ভালভাবে তৈরি গুদামের অভাব। তাই চাষের ঠিক পরেই যাদের অর্থের প্রয়োজন নাও থাকে তাদেরও চাষের ঠিক পরেই ফসল বিক্রি করে ফেলতে হয় সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে। শস্য সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গুদাম তৈরি করা দরকার। যদি গ্রামে গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি ভাল গুদাম থাকে তবে সেইসব অঞ্চলের চাষী-ভাইরা তাদের উৎপন্ন ফসল এইসব গুদামে ধরে রাখতে পারবে এবং যখন ফসলের দাম আশানুরূপ বাড়বে তখন বিক্রি করে উচিত মূল্য পেতে পারবে।

চাষী-ভাইদের এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য—অর্থাৎ ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে যে-কোনও দামে বিক্রি করার প্রয়োজন না হয় তার জন্য ম্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানা রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে গ্রামে গ্রামে গুদাম তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার অন্যদিকে সেই গুদামে উৎপন্ন দ্রব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার ফসল বিক্রি না করেও যাতে টাকা পেতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। ঋণদান সমিতিগুলি অনেক-গুলির জন্যই একটি করে গুদাম এবং বিপণন সমিতির প্রত্যেকটির জন্য একটি অথবা বেশি গুদাম তৈরি করার জন্য ১০,০০০ টাকা ও ২০,০০০ টাকা প্রত্যেক ঋণদান ও বিপণন সমিতিতে দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামেই ঋণদান সমিতি আছে অথবা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ঋণদান সমিতি। তাই এইসব সমিতির যদি গুদাম থাকে এবং তা ছাড়া সমবায় বিপণন সমিতিগুলিরও যদি বড় বড় বাজারে গুদাম থাকে তা হলে চাষী-ভাইদের উৎপন্ন ফসল ধরে রাখবার একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু শুধু ফসল ধরে রাখলেই চাষীর উপকারে আসবে না। যাতে সে সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা পেতে পারে তাই চাষীর ফসল রেখে তার বাজার-দরের একটা অংশ তাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। এইসব গুদাম যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন গ্রামাঞ্চলে ও বড় বড় হাটবাজারে শস্য মজুত করার অসুবিধা থাকবে না বলেই মনে হয়। পশ্চিম বাঙলায় এই পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য ম্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০২টি সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠান ও তাদের গুদাম গড়ে উঠবে। এই ১০২টির ভেতরে ৫১টি বিপণন প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গুদামও তৈরি হচ্ছে। এইসব বিপণন প্রতিষ্ঠান চাষী-ভাইদের জিনিস মজুত করে যাতে তাদের জিনিসের দামের একটা অংশ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে পারে তার জন্য প্রত্যেকটি বিপণন প্রতিষ্ঠানে সরকার ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত শেয়ার নেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এ পর্যন্ত ৩৬টি বিপণন প্রতিষ্ঠান সরকারী মূলধন হিসাবে ১০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেয়েছে। তা ছাড়া State Bank of Indiaও এইসব সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে। এইসব বিপণন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়েই চাষী-ভাইরা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানকে সফল করে তুলতে হলে কেবল ব্যাঙ্কের সাহায্যের উপর নির্ভর করলেই চলবে না। কারণ একথা মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদনের চেয়ে বিপণন নানা রকম বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে তবেই সার্থক রূপ নেয়। সমবায় বিপণনকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের চাষী-ভাইদের তাদের উৎপন্ন ফসল সবটাই

সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বিক্রি করতে হবে। প্রথম প্রথম অবশ্য ভুলত্রুটি যে না হবে তা নয়, কিন্তু যদি তারা ধৈর্য ধরে তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এই সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সফল করে তোলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন তবে তাঁদের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। বর্তমান পরিস্থিতিতে চাষী-ভাইরা একমাত্র সমবায়

বিপণন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়েই ন্যায্যমূল্যের আশা করতে পারেন। তাই প্রত্যেক চাষী-ভাইকে আজ শৃঙ্খলিত সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে হবে তা নয়—সেই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নিজেদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হবে। [বেতার কথিকা]



দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তামাক চাষের উন্নয়ন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের শেষে এদেশের তামাক গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে বৎসরে উন্নত ধরনের ১৬,০০০ পাউন্ড তামাক বীজ উৎপন্ন হবে। এগুলি তামাক উৎপাদকদের মধ্যে বিলি করা হবে। এই পরিমাণ বীজে ২ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ করা যাবে। বর্তমানে যত জমিতে তামাকের আবাদ হয় এটা তার ২০ শতাংশ। বিদেশে যে শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে ভারতীয় তামাক যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং বর্তমানে বিদেশের বাজারে যে-পরিমাণ ভারতীয় তামাকের কার্টিজ হয় তা বৃদ্ধি করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই উন্নয়ন-ব্যবস্থা কার্যকরী করা হচ্ছে।

প্রতি বৎসর ভারত থেকে তামাক রপ্তানি করে ১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। তা ছাড়া বাণিজ্য শুল্ক বাবত ৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে তামাক চাষে ১৬ লক্ষ চাষী এবং ৯ লক্ষ পরিশোধক নিযুক্ত রয়েছে।

রপ্তানিযোগ্য তামাকের ৮৫ শতাংশই ভার্জিনিয়া তামাক। তা ছাড়া, হোয়াইট বার্লি, সান-কিওরড নাটু এবং বিড়ি বানাবার তামাকও রপ্তানি করা হয়। যুক্তরাজ্য ভারতের প্রধান ক্রেতা। যুদ্ধের আগে যুক্তরাজ্য ভারতের রপ্তানিযোগ্য তামাকের ৫০ ভাগ কিনতো। বাকি অংশ এডেন, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, মালয় এবং নেদারল্যান্ডে যেত। যুদ্ধের শেষের দিকে ব্রহ্মদেশ ও চীন ভারতীয় তামাক ক্রয় করা বন্ধ করে। কিন্তু মিশর ও সিংহল বেশি পরিমাণে এই তামাক কিনতে আরম্ভ করে।

যুক্তরাজ্যের তামাকের বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফেডারেশন অব রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যান্ড এবং কানাডা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যে সর্বাধিক পরিমাণ তামাক বিক্রয়

করে। তার পরে রোডেশিয়া ও ভারতের স্থান। ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে তামাক ক্রয় করত। কিন্তু ক্রমে তা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। জাপানে তামাকের চাষ অনেক হ'লেও ভার্জিনিয়া তামাকের ব্যাপারে জাপান স্বাধীন নয়। সেজন্য জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত থেকে এই শ্রেণীর তামাক আমদানি করতে হয়। ডলারের অভাব এবং ভারতীয় তামাকের কম মূল্য ও গুণগত উৎকর্ষ বিবেচনা করে এখন জাপান ভারত থেকেই বেশি পরিমাণে ভার্জিনিয়া তামাক আমদানি করতে আরম্ভ করেছে।

ভারত খুব সামান্য পরিমাণ তামাক বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সিংহল থেকে অপরিশোধিত তামাক আমদানি করা হয়। আমেরিকান তামাক রেন্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সিংহল থেকে 'জাফনা' তামাক আমদানি করা হচ্ছে।

বিশ্বের প্রধান তামাক উৎপাদক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চীন ও ভারতের স্থান।

এদেশে অল্পপ্রদেশে সর্বাধিক তামাক উৎপন্ন হয়। এর পরিমাণ ২৬ কোটি পাউন্ড। তার পরে বোম্বাই (১২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড), মহীশূর (৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড) এবং মাদ্রাজের (৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড) স্থান। তা ছাড়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামেও তামাক উৎপন্ন হয়।

ভারতে তামাক চাষের উন্নয়ন ও তার সুদৃষ্ট বিপণন ব্যবস্থা করবার জন্য ভারত-সরকার ১৯৪৫ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় তামাক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অল্পপ্রদেশের রাজামুন্দির কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা ও গুণগত গবেষণা কেন্দ্র, মাদ্রাজের

বেদসানলদর, বিহারের পুষ্ক, পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটা এবং মহীশূরের বুনসদর গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর তামাক সম্পর্কে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা চালাচ্ছেন। রাজামুন্দি গবেষণা কেন্দ্রে 'ছাতাস' নামে এক শ্রেণীর নতুন তামাক আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা খুবই সফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তামাকে উৎপাদকদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি জানাবার জন্য ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার একটি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেক বৎসর গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে কৃষক-সম্মত পালন করা হয়। এই সময়ে তামাক উৎপাদক ও চাষীকে তামাক উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় বুদ্ধি দিয়ে দেওয়া হয়। গবেষণাকেন্দ্রের কর্মীরা তামাক চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামে গিয়ে চাষীদের উন্নত পদ্ধতি হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আনন্দে উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য একটি নাশারি খোলা হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দালানও নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তামাক সম্প্রসারণ উদ্যোগের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

• তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অন্যান্য তামাক উৎপাদনকারী রাজ্যে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।

নানা প্রকার কীটপতঙ্গ সাধারণত তামাক চাষের ক্ষতি করে থাকে। সেজন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তামাকের নাশারিগুলিকে এই কীটনাশক ঔষধ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। তবে এগুলিকে কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা কেন্দ্র ও অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নত বীজ ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

তামাক মজুত করবার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে চাষীদের যেকোন মূল্যেই তামাক বিক্রয় করে দিতে হয়। তামাক কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাত) করপোরেশন আইনের আওতায় আসে না। সেজন্য কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশন বা রাজ্য গুদাম করপোরেশনের কোন সাহায্যই তামাক শিল্পকে দেওয়া হয় না। সেই কারণে তামাককে এই আইনের আওতায় আনবার চেষ্টা হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় তামাকের জন্য গুদামঘর নির্মাণে সরকারী সাহায্য দেবার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। রাজ্যসরকার মারফত তামাক বিপণন সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

এইভাবে এদেশে তামাক চাষের উন্নয়নে ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে।

উদ্ভিদের তিনটি প্রধান খাদ্য

মাটি থেকে নানা রকম খাদ্য-উপাদান আহরণ করে উদ্ভিদ বাঁচে, বাড়ে, ফলন দেয়। এসব উপাদানের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি: নাইট্রোজেন, পটাশ আর ফসফরাস। গাছের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য দরকার হয় এগুলি। মাটি থেকে গাছ বিভিন্ন পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করে।

কোন কোন উদ্ভিদের জীবনে অন্য দু'টি উপাদান অপেক্ষা 'নাইট্রোজেন'এর দরকার হয় অনেক বেশি, যেমন শাক বা পত্রবর্গীয় ফসল, বাঁধাকপি, পান, তামাক, চা, প্রভৃতি। এগুলির পাতারই আদর এবং প্রাধান্য। 'নাইট্রোজেন' প্রত্যেক ফসলেরই প্রথম দিকে কিছুটা দরকার হয়ই।

'পটাশ' বেশি দরকার হয় পাট, তুলো এবং মূল বা কন্দবর্গীয় ফসলগুলোর—যেমন মুলো, আলু, শাক-আলু, শালগম, বিট, গাজর ইত্যাদি। মাটিতে পটাশের কমতি থাকলে এসবের ফলন ভাল হয় না। শূঁট-বর্গীয়—যেমন মটর, শিম ইত্যাদি—ফসলের জমিতেও পটাশ থাকা চাই যথেষ্ট। গাছের পাতায় যে সবুজকণা থাকে তা দিয়ে গাছ আলোর সাহায্যে বাতাস থেকে 'কার্বন-ডাই-অক্সাইড' আহরণ করে তৈরি করে নেয় শর্করাজাতীয় খাদ্য। সবুজকণা না থাকলে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে না গাছ। এই সবুজকণার মধ্যে যেসব উপাদান আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পটাশ। মাটি থেকে পটাশ আহরিত হয়ে গাছে তৈরি হয় সবুজকণা।

অবশ্য মাটিতে পটাশের অভাব কখনও এত বেশি থাকে না যার ফলে উদ্ভিদ শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করতে একেবারে অসমর্থ হয়। যেসব ফসলের মধ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশি, সেগুলোর ক্ষেত্রে মাটির মধ্যে পটাশ বেশি থাকা দরকার। মূলবর্গীয় আর শূঁটগণের ফসলগুলি এই শ্রেণীর। শূঁটজাতের ফসলগুলোর শিকড়ে তাদের উপকারী কয়েক রকম জীবাণু থাকে; সেগুলোর জন্য এসব

গাছকে নিজেদের প্রয়োজনের উপরেও অতিরিক্ত শর্করা-খাদ্য উপাদান করতে হয়। ফলগাছ, শূঁট-ফসলের গাছ, মূল বা কন্দবর্গীয় ফসল প্রভৃতি থেকে ভাল ফলন পেতে হলে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফেটী সার থাকা চাই এবং এমনভাবে থাকা চাই যাতে গাছ অনায়াসে তা গ্রহণ করতে পারে। ধান, আখ প্রভৃতির জমিতে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। মূল ও কন্দবর্গীয় ফসলের আর শূঁটগণীয় ফসলের জমিতে পটাশ আর ফসফরাস থাকা দরকার যথেষ্ট।

গাছের পাতা, কাণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে নাইট্রোজেন। পটাশ গাছকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখে। ফসফরাস গাছে ফুল-ফল ধরতে সাহায্য করে। গাছকে ফসফরাস যোগাতে পারলে তার ফল সুস্বাদু হয়, ফলন বেশি হয়, শিকড় বাড়ে আর পুষ্ট হয়। ফসফেটী সার দিলে গাছে ফুল আর ফল তাড়াতাড়ি ধরতে দেখা যায়, গাছে রোগের আক্রমণও কম হয়। ফসফরাস আর পটাশ গাছের মধ্যে রোগ-নিরোধক ক্ষমতা জন্মায়। নাইট্রোজেন খুব বেশি দিলে কিন্তু ফসলের উপর রোগের আক্রমণ বেশি হবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের জমিতে সাধারণত পটাশের অভাব বড় একট' দেখা যায় না। কিন্তু যেসব ফসলের পক্ষে পটাশ বেশি দরকার সেগুলির চাষে বাড়তি কিছু পটাশ যোগানো দরকার। কাঠের ছাই আর কচুরিপানার সার দিয়ে বাড়তি পটাশের যোগান দেওয়া হয়। কচুরিপানাতে শতকরা ৪০ ভাগ এবং কাঠের ছাইতে ৬ ভাগ পটাশ থাকে। পটাশী সার হিসাবে 'মিউরিএট অব পটাশ' নামক রাসায়নিক সারও প্রয়োগ করা যেতে পারে, এতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ পটাশ থাকে।

আমাদের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাবই বেশি। কখন কখনও ফসফরাসের অভাবও দেখা যায়।

গোবরসার, 'কম্পাস্ট' বা পচাসার, আবর্জনাপচা, খইল, সবুজসার, তলানীসার প্রভৃতি থেকে নাইট্রোজেনের যোগান দেওয়া যায় জমিতে। রাসায়নিক সার, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটও নাইট্রোজেন যোগায়।

হাড়ের গুঁড়োতে ফসফরাস আছে। অ্যামোনিয়াম ফসফেট এবং সুপারফসফেট নামক রাসায়নিক সারও জমিতে ফসফরাসের যোগান দেয়। কোন-কোনও জমিতে শূঁট-ফসলের চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যায় না। শূঁট-গাছের শিকড়ে গুঁটিও কম হয়। জমিতে ফসফরাসের অভাব থাকলেই এরকম হয়। বাতাস থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন আহরণ করতে পারে না। গাছ সাধারণত মাটি থেকেই নাইট্রোজেন নেয়, কিন্তু শূঁটবর্গীয় ফসলের গাছ নাইট্রোজেন আহরণ করে বাতাস থেকে। মাটির ভিতরে এক রকম জীবাণু থাকে, তারা শূঁট-ফসলের গাছের শিকড়ে ছোট ছোট গুঁটি তৈরি করে তার মধ্যে থাকে। এই জীবাণুগুলি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে তাদের আশ্রয়দাতা শূঁট-গাছকে যোগান দেয় আর তার পরিবর্তে সেই গাছ জীবাণুগুলোকে যোগায় শর্করাজাতীয় খাদ্য। শূঁট-ফসলের গাছ করে জমিতে সবুজসার প্রয়োগ করলে এইভাবে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয়। অনেকে জমিতে নাইট্রোজেন যোগানোর উপায় হিসাবে শূঁট ফসলের সঙ্গে শস্যপরিষায় করেন। কেউ কেউ শূঁট-ফসলের সঙ্গে অন্য ফসলের মিশ্র-চাষ করেন। জমিতে ফসফরাসের অভাব থাকলে উক্ত জীবাণুগুলির গতিশক্তির অভাব ঘটে এবং তারা শূঁটগাছের শিকড়ে গিয়ে পেঁপেছোতে পারে না, সুতরাং উক্তরূপে নাইট্রোজেনের যোগানও সম্ভব হয় না।

কোন-কোনও সময়ে দেখা যায় যে, বাগানের ফল-গাছে আশানুরূপ ফল ধরে না, কিংবা হয়তো ফল সংখ্যায় কম ধরে না কিন্তু আকারে খুব ছোট হয়। বাগানের মাটিতে ফলফরাসের অভাবই এর কারণ। এক এক সময়ে দেখা যায়, কোন ক্ষেত্রে ফসলের

গাছ বেশ হুঁটপুঁট হয়েছে, গাছগুলোতে পাতাও ভাল হয়েছে, কিন্তু ফুলও ফুটেছে না, ফলও ধরছে না। এও ফসফরাসের অভাবের ফল। ওই বাগানের বা এই ক্ষেত্রে জমিতে ফসফরাস প্রয়োগ করলেই ফলও বড় হবে, ফুলও ফুটবে, ফলনও হবে বেশি। মূল বা কন্দ জাতীয় ফসলের চাষে ফসফরাসী সার দিলে ফসল ভাল বাড়বে আর তার ফলনও বেশি হবে।

ফসফেটী সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম ফসফেট এবং সুপারফসফেট খুবই ভাল। কিন্তু এ দুটি রাসায়নিক সারের যে যোগান এখন পাওয়া যায় তা দিয়ে দেশের চাষীদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটা সম্ভব নয়। ফসফেটী সারের মধ্যে হাড়ের গুঁড়োই সব চেয়ে ভাল। নাইট্রোজেনী আর পটাশী সার যেমন গোবর, কচুরিপানা প্রভৃতি থেকে তৈরি করে নেওয়া যায়, ফসফেটী সার হাড়ের গুঁড়োও তেমনি তৈরি করে নেওয়া যায়। শুব্দু কল্যাণবুন্দির বলে কুসংস্কারটা ত্যাগ করতে পরলেই হ'ল। পল্লী-অঞ্চলে ভাগাড়ে বা মাঠে অনেক হাড় পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেগুলো কুড়িয়ে এনে গুঁড়িয়ে নিলেই হ'ল। অনেকের ধারণা, কলের সাহায্য ছাড়া হাড় গুঁড়ো করা যায় না। তা ঠিক নয়। যন্ত্র ছাড়াই হাড় গুঁড়ো করা চলে, তাতে খরচও বেশি পড়ে না। ক্ষারজল, কলিচুন, বাথারিচুন অথবা কাঠের ছাইএর সাহায্যে হাড় গুঁড়িয়ে নেওয়া যায়। ছাই অবশ্য নতুন হওয়া চাই।

সদ্য-পোড়ানো কাঠের ছাই আর হাড় একটি কাঠের বাস্তের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজিয়ে কিছুকাল ভাঁজে অবস্থায় রেখে দিলে হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। লোহার বা তামার পাত্রে করে ক্ষার-মিশ্রিত জলের সঙ্গে হাড় সিদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি গুঁড়ো হয়ে যায়। ৫ ভাগ কস্টিক সোডা অথবা ৭ ভাগ কস্টিক পটাশ ১৫ ভাগ জলের সঙ্গে মেশালে যে ক্ষারজল হবে, তার সঙ্গে ১৫ ভাগ হাড় সিদ্ধ করতে হবে। ঘণ্টা-তিনেকের বেশি সিদ্ধ করতে হয় না। সিদ্ধ

না করে যদি উক্ত ক্ষারজলে হাড়গুলো ডুবিয়ে এক সপ্তাহকাল রেখে দেওয়া যায়, তা হ'লে হাড়গুলি গুঁড়ো করার উপযোগী ভঙ্গুর হয়ে যায়।

মাটি আর চূনের সাহায্যেও হাড়কে গুঁড়োবার উপযোগী করা যায়। দোআঁশ মাটির একটি স্তর করতে হবে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি পুরু করে, তার উপর হাড়ের একটা স্তর সাজাতে হবে সাত ইঞ্চি পুরু করে, তার উপর চার ইঞ্চি পুরু একটা স্তর করতে হবে বাথারিচুনের। এই ত্রিস্তরের উপর আবার মাটি, হাড় আর বাথারিচুনের স্তর করা যেতে পারে। এইভাবে

সুবিধামত উচু করে স্তরগুলো সাজালে যে স্তপটা তৈরি হবে, তার সবদিকে মাটি লেপে দিতে হবে। তারপর স্তপটির উপরে কয়েকটি গর্ত করে জল ঢেলে দিতে হবে। এইভাবে মাস-তিনেক রাখার পরে গোটা স্তপটার সব জিনিসই সার হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, যে-কোন উপাদানের জন্যই বাজারের দিকে চেয়ে না থেকে চাষী যদি নিজেই সার তৈরি করে নিতে পারেন, তবে তা পাওয়াও যাবে সহজে আর তাতে খরচও পড়বে কম।



আখের চাষ জলসেচ

আপনার আখ ফসল যদি মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত এবং অগাস্টের শেষভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যে যথেষ্ট জল না পায়, তার ফল হবে এই যে, উৎপাদন যাবে কমে। আখের চাষে তার বৃষ্টির সময়টাতে এগুনো হ'ল সংকটকাল। অঙ্কুর গজানোর সময় হ'ল মার্চ থেকে জুন মাস—যতদিন না বর্ষা নামে। এ সময়ে আখের শিকড়ও জন্মায় আর শীষ গড়ে ওঠে। অগাস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে আখে চিনি জন্মায়। এ দু'টো সময়ে কোন রকমে অবহেলা হ'লে আখের ফলন কমে যাবে। আখ ভাল হবার পক্ষে আর-একটি দরকারী বিষয় হ'ল বর্ষাকালে সমানভাবে বৃষ্টি হওয়া।

কোয়েম্বাটোর জাতের নতুন আর তেজী আখের জল দরকার হয় সাধারণ দেশী আখের চেয়ে বেশি। এই কথাটি মনে রেখে আখচাষের রাজ্যগুলিতে এই ফসলের বিভিন্ন অবস্থায় সেচ দেওয়ার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে শাহজাহানপুর, গোরখপুর আর মজফ্ফরনগরের ইক্ষুগবেষণা কেন্দ্রে।

কতবার সেচ দেওয়া দরকার এবং প্রতি সেচে কী পরিমাণ জল দেওয়া উচিত তা নির্ণয় করার জন্য শাহজাহানপুরে যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে পরিষ্কার দেখা গেছে যে, ফলন বাড়ানোর পক্ষে প্রতি সেচে জলের পরিমাণের চেয়ে বেশি উপযোগী হচ্ছে ২০ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে সেচ দেওয়া। স্বাভাবিক ফসলের পক্ষে, দেখা গেছে, বর্ষার আগে কমপক্ষে পাঁচটা সেচ দেওয়া। পরিমাণের ব্যাপারে দেখা গেছে, ২.৬ অথবা ৪.৫ একর-ইঞ্চির চেয়ে বরাবর ৩.৫ একর-ইঞ্চি মাত্রায় জল দেওয়াই ভাল। সংখ্যার দিক দিয়ে, তিনবারের জায়গায় ছয়বার সেচ দিয়ে দেখা গেছে যে, তাতে ১২.৫ শতাংশ ফলন বেড়ে যায়।

শাহজাহানপুরে দেখানো হয়েছে যে, সেচের জল পাওয়ার যেখানে অসুবিধা রয়েছে, সেখানে যদি আখ ফসলের বাড়ি ভাল করতে হয় তবে এপ্রিলে

একবার এবং মে মাসে একবার সেচ দেওয়া নিতান্তই দরকার। এসব মাসে বাতাসে আর্দ্রতা এবং মাটিতে রস খুব কম থাকে; এ সময়ে যদি সেচে অবহেলা করা হয় তা হ'লে ফসল নৈতিয়ে পড়তে পারে, শুকিয়ে যেতে পারে অথবা এমন খারাপ হয়ে পড়তে পারে যার খুব মন্দ প্রতিক্রিয়া হয় ফলনের উপর।

আখ রোয়ার সময়

আখের টুকরো বসাবার আগে এবং পরে সেচ দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, দেরি করে (এপ্রিলে) আখ বসাবার পরেই একটা সেচ দেওয়ার ফলে আখের ফলন এমন বেড়ে গেছে যাতে দেরিতে লাগানোর দরুন ক্ষতিটা পূরণ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি বা মার্চে যে বীজ-আখ লাগানো হয়েছে তাতে সেচের সময়ের হেরফেরের দরুন কোন কুফল দেখা যায় নি। এপ্রিলে লাগানো আখের ফসলে বীজ-আখ বসাবার আগে সেচ দিয়ে যে ফলন পাওয়া গেছে, পরে সেচ দিয়ে পাওয়া গেছে তার চেয়ে শতকরা ৫৫ ভাগ বেশি।

শাহজাহানপুর এলাকায় দেখা গেছে যে, আখের ভাল ফলন পেতে হ'লে এপ্রিল থেকে শুরুর কয়েক বর্ষা নামা পর্যন্ত ২০ দিন অন্তর সেচ দিয়ে যাওয়া দরকার। কাজেই বর্ষাকালে যদি ২০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তবে সেচ দেওয়া দরকার। বৃষ্টি বেশি হ'লে এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে আখের বাড়ি ভাল হয়। দেখা গেছে যে, ভাল ফসল পাওয়ার জন্য বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকা এবং আবহাওয়ায় উত্তাপও মোটামুটি বেশি থাকা দরকার, তা ছাড়া জলসরবরাহ হওয়া দরকার সমানভাবে।

দেখা গেছে যে, বৃষ্টিপাত যে বছর স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রায় ৪০ ইঞ্চি হয়, সেই বছর বর্ষার পরে সেচ দিলে ফলন সামান্য বেশি হয়, কিন্তু আখ পাকে দেরিতে, ফলে সেই আখে চিনি হয় কম।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

যে বছর বর্ষাকালে এবং বিশেষ করে ঋতুগোড়ার দিকে বৃষ্টি কম হয় শুধু সেই বছরই বর্ষার পরে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষার পরে বেশিবার সেচ দিলে আখের রসের গুণ খারাপ হয়ে যায়।

আখের বৃদ্ধিতে জল এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, সেচের সংখ্যা তিন থেকে বাড়িয়ে নয় করার ফলে আখের ফলনে বিশেষ উন্নতি হয়েছে। নাইট্রোজেনের মাত্রা বাড়ানোর দরুনও ফলন বেড়েছে, কিন্তু জল এবং নাইট্রোজেনের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সুস্পষ্ট হয় নি। ফলন সবচেয়ে—শতকরা ২৫ ভাগ—বেড়েছে ২০০ পাউন্ড নাইট্রোজেন আর নয়বার সেচ দেওয়ার ফলে।

নাইট্রোজেন ১০০ পাউন্ড মাত্রার ক্ষেত্রে সেচের সংখ্যা বাড়িয়ে বোঝা গেছে যে, স্বাভাবিক ফসলের জন্য বর্ষার আগে ছয়টি সেচ দেওয়াই যথেষ্ট। এই মাত্রার নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সেচ দেওয়া বায়বহুল হয়ে পড়ে। নাইট্রোজেনের মাত্রা যদি সামান্য কম হয় তা হলে জল একটু বেশি দিলেই তা পুষিয়ে যায়, তেমনি জল সামান্য কম পড়লে, নাইট্রোজেন কিছু বেশি দিলেই চলে।

শাহজাহানপুর ইক্ষু-গবেষণাকেন্দ্রে, বার্ষিক বৃষ্টিপাত যেখানে ৪০.৭৭ ইঞ্চি, বসন্তকালে লাগানো আখের ফসলে, দেখা যায়, ছয়টি সেচ দেওয়ার দরকার হয়েছে। প্রতিবারে দেওয়া হয়েছিল ৮০,০০০ গ্যালন (৩.৫ একর-ইঞ্চি) জল—মোট ২১.০ একর-ইঞ্চি। অর্থাৎ স্বাভাবিক ফসলের জন্য জল দরকার ৬১.৭৭ ইঞ্চি।

গোরখপুর কেন্দ্রে, যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০.১৬ ইঞ্চি, ছয়টি সেচ আর ১২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিয়ে সবচেয়ে লাভজনক ফসল পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলে স্বাভাবিক আখ ফসলের জন্য জল দরকার মোট ৭১.১৬ ইঞ্চি।

মুজফ্ফরনগর গবেষণাকেন্দ্রে বর্ষার আগে পাঁচটি আর পরে তিনটি—মোট আটটি সেচ দিয়ে সবচেয়ে সুফল পাওয়া গেছে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে প্রায় ৩২ ইঞ্চি। কাজেই, দেখা গেছে, আখের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই এলাকায় জল দরকার ৬০ ইঞ্চি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির কম, সেখানে যদি বর্ষাকালে অনেকদিন বৃষ্টি না হয়, তবে বর্ষাকালেই আখের ক্ষেতে বাড়তি সেচ দেওয়ার দরকার হয়। বৃষ্টিপাত পরিমিত মাত্রায় হলেও, বর্ষাকালে অনেকদিন অনাবৃষ্টির পরে প্রচুর বৃষ্টি হলে ফসল যতটা হয়, বৃষ্টি সমানভাবে হলে ফসল হয় তার চেয়ে বেশি। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ক্ষেতে জল দাঁড়িয়ে যায়, তাতে আখের ক্ষতি হয়।

অনাবৃষ্টির ঝুঁকি

জলের অভাবে আখের গুণাগুণে পার্থক্য ঘটে। ভাল ফসল হয় এমন কয়েক জাতের আখের চাষ করা হয় কম জলে (দু'টো সেচ দিয়ে) আর কিছু বেশি জলে (পাঁচটা সেচে)। সেচ দেওয়া হয় বর্ষার আগে। কো ৬২২ আর কো ৬১৭ আখের চেয়ে কো ৪৫৩, কো এস ৫১০ এবং কো এস ৩২১ আখ জলাভাব সহ্য করার ক্ষমতা দেখাল বেশি এবং সেচের জল পাবার সুফলও দেখাল বেশি। কম সেচ দেওয়া চাষে সব জাতেরই ফলন হয়েছে কম।

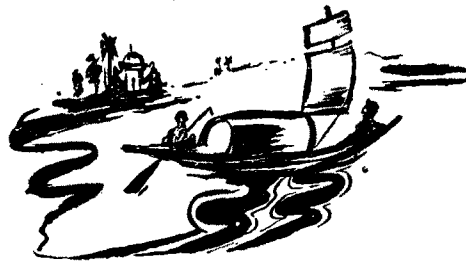
একটা সেচ দেবার পরে যদি মাটিতে রস ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে সেচের উপকারিতা বৃদ্ধি পায়। শাহজাহানপুরে জমি যাতে শুকিয়ে না ওঠে এবং যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আখের আবর্জনা আর ধানের খড় দিয়ে জমি ঢেকে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় ঢাকা জমির চেয়ে খোলা জমির রস তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। সেচ কম পাওয়া জমিতে আখের আবর্জনা ঢাকা দিয়ে রস ধরে

রেখে এমন সুস্পষ্ট সুফল পাওয়া গেছে যে, নিড়েন-না-দেওয়া খোলা জমির আখের চেয়ে শতকরা ৪৩ ভাগ আখ বেশি পাওয়া গেছে।

- সেচের সুবিধা যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানেই এভাবে পাতা-আবজনা দিয়ে ঢেকে মাটিতে রস ধরে রাখলে লাভজনক উপকার পাওয়া যাবে। এতে বর্ষার আগে দু'টো সেচ বেঁচে যাবে এবং যথেষ্ট সেচ-পাওয়া জমিতে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ফসলই পাওয়া যাবে।

ঠিকমত নিড়েন দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, জলনিকাশের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি না হ'লেই যতই সেচ দেওয়া হোক না কেন, তাতে আখের ফলন বা গুণ বৃদ্ধি পাবে না। এগুলো সার বা সেচ

দেওয়ার মতই প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঠিকমত নিড়েন দিয়ে ও পরিচর্যা করে যে পরিমাণ আখ পাওয়া গেছে, নিড়েন না দেওয়ার ও পরিচর্যা না করার ফলে যথেষ্ট সেচ পাওয়া জমিতেও আখ পাওয়া গেছে তার চেয়ে কম। অপর এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, আখ লাগাবার আগে সেচ দিয়ে যে ফলন পাওয়া গেছে, তার তুলনায়, অগভীরভাবে আখ লাগিয়েও, ঠিকমত নিড়েন দিয়ে একটা সেচ দেওয়াতে আখ পাওয়া গেছে তার চেয়ে শতকরা ১২.৫ ভাগ বেশি। বিভিন্ন স্থানে সেচ ও ফসলের পরিচর্যার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে, সেই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। [১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং' থেকে]



চারাবাগান

বৃক্ষরোপণের কাজটা চালিয়ে যেতে হ'লে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর-একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার—সেটি হচ্ছে, পল্লী-অঞ্চলে ছোট ছোট চারাবাগান বা 'নার্শারি' গড়ে তোলা। দূর-দেশ থেকে নানা রকম গাছের চারা কলম প্রভৃতি আনিয়ে পল্লী-অঞ্চলে সরবরাহ করা বায়সাপেক্ষ তো বটেই, তা ছাড়া পথে নষ্ট হবার সম্ভাবনাও খুব বেশি। সরকারী উদ্যান থেকে প্রতি বছর বৃক্ষ-রোপণের সময়ে চারা আর কলম বিতরণ করা হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কত? দূর-চারটি সরকারী উদ্যান থেকে কত চারা আর কলমই বা যোগানো সম্ভব? পল্লী-অঞ্চলে চারা-বাগান করার বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, গ্রামের লোকে হাতের কাছে চারা কলম প্রভৃতি পেলে সেই-সঙ্গে সেগুলো লাগাবার উৎসাহও জাগবে তাদের মনে।

ছোট ছোট চারাবাগান করার বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা গেল।

জমি ও মাটি

চারাবাগানের স্থান পছন্দ করতে বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে যে, জায়গাটার কাছাকাছি নানা রকম ফলের কোন ভাল বাগান আছে কিনা এবং সেই বাগানের গাছগুলোর ফল কেমন? কেননা, সেই বাগানের ফলগাছগুলি থেকে কলম তৈরি করে লাগানোই হবে বাঞ্ছনীয়। অজানা আর অজেনাজে গাছ থেকে কলম করা ঠিক নয়। যে-গাছ থেকে কলম নেওয়া হবে সেটি সেই শ্রেণীর গাছের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া দরকার। এতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলম পাওয়া যাবে, তাতে

চারাবাগানের সুনাম হবে, সেই বাগানের ওপর লোকের বিশ্বাস বাড়বে।

চারাবাগানের জমির মাটি এ'টেল বা বেলে হ'লে চলবে না। দোআঁশ মাটিই উপযোগী। বাগানে সারা বছর জলসেচনের সুবিধা থাকা চাই। একটি চারাবাগান করার পক্ষে এক একর বা তিন বিঘা জমি যথেষ্ট। প্রথমে এর চেয়ে বড় আকারের জমিতে চারাবাগান না করাই ভাল। আরও বড় জমিতে যদি বাগান করতেই হয় তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

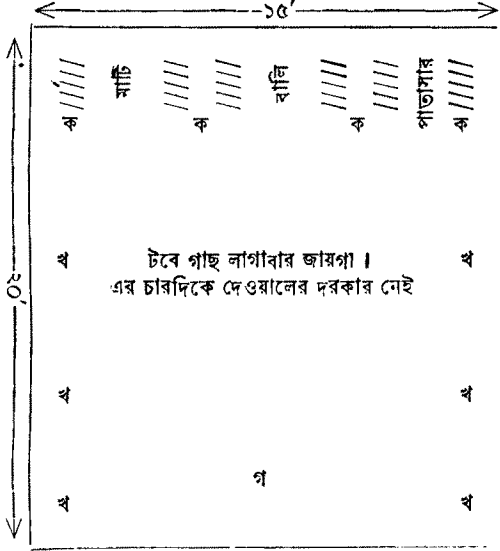
গঠন

ছাড়া গোরু, মোষ, ছাগল, ইত্যাদির উৎপাত থেকে চারা রক্ষা করবার জন্য বাগানের চারদিকে বেড়া দেওয়া বিশেষ দরকার। এক একর জমিতে বেড়া দেওয়ার জন্য যে-পরিমাণ লোহার তারের দরকার, এখনকার বাজারে তার দাম খুবই বেশি। সুতরাং বাগানের চারদিকে গাছের বেড়া দিলে খরচ কম পড়বে। তবে, বেড়া ভালভাবে দিতে হবে। ডুরানটা, মেহেদি, এগেভ অ্যামেরিকানা, প্রভৃতি গাছ দিয়ে বেড়া দিতে পারা যায়।

মালীদের থাকবার জন্য কাঁচা ঘর এবং তার উপরে খড়ের ছাউনি হলেই চলবে। বাগানের কাজ করার যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি নিরাপদে রাখবার পাকা ভিতের একটি ঘর করা বাঞ্ছনীয়; ঘরের দেওয়ালের নিচের অর্ধেকটা পাকা এবং উপরের দিকটা কাঁচা হ'লে চলবে। উপরে ঢেউটিনের চালা করা যেতে পারে।

চারার টব রাখার জন্য ঘর করা দরকার এবং তার উপরে ছাউনি থাকা চাই। টবে রক্ষিত কলমগুলিকে

রোদ-বর্ষা থেকে বাঁচাবার জন্য খড়ের ছাউনির ঘর করা নিতান্তই দরকার। এতে খরচ বেশি পড়বে না। এরকম ঘর নিচের নকশা অনুযায়ী করলে ভাল হয়।



(ক) দেওয়া ৪ ফুট উঁচু আর ৫ ইঞ্চি চওড়া।

(খ) খুঁটি।

(গ) জমি থেকে এক ফুট উঁচু ইটের মেঝে।

পাতা পচাবার গর্ত

এই গর্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। চারাবাগানে প্রচুর পরিমাণ পাতা-পচা সারের ব্যবস্থা থাকা চাই। এই সার গর্তে তৈরি করে নিতে হবে। তিনটি গর্ত করতে হবে। এক-একটি লম্বা-চওড়ায় ২০ বর্গফুট আর ৫ ফুট গভীর। একটি গর্তের সার যখন ব্যবহার করা চলবে, দ্বিতীয় গর্তে তখন পাতা পচতে থাকবে আর তৃতীয় গর্তে চলতে থাকবে পাতা জমানো।

যন্ত্রপাতি

নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতিগুলো দরকার:

(১) সাধারণ কোদালি	...	৬
(২) খুঁরপি যুক্ত কোদালি	...	৩
(৩) খুঁরপি	...	১২

(৪) নিড়ানি	...	৬
(৫) কুণ্ডি বের করার ছুরি	...	৪
(৬) কলম তৈরি করার ছুরি	...	৬
(৭) গাছের ডালপালা ছাঁটার ছুরি	...	৪
(৮) কাস্তে	...	২
(৯) কাঁচি	...	২
(১০) জল সেচনের বড় ঝাঁঝরি	...	৬
(১১) জল সেচনের ছোট ঝাঁঝরি	...	৪
(১২) পিচকারি	...	১
(১৩) জল ছিটাবার 'স্ট্রাপ পাম্প'	...	১
(১৪) বালতি	...	৬
(১৫) মাটি ফেলার জন্য বাঁশ-লাগানো বাস্ক	...	২
(১৬) কুড়ুল	...	১
(১৭) মাটির টব	...	১,০০০
(১৮) চারা চিহ্নিত করার জন্য ছোট লেবেল	...	১,০০০
(১৯) মোম ও কলাগাছের খোলা দরকারমত	...	

লোকজন

এক একরের একটি চারাবাগানের জন্য চারজন মালী যথেষ্ট। দরকারমত মজুর লাগাতে হবে। চারাবাগানে সবচেয়ে বেশি কাজ বর্ষাকালে, এ-সময়ে মজুর খরচাও লাগবে সবচেয়ে বেশি।

পরিচালনা

জোড়কলম করা উপযোগী চারাগাছ কেনা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এক হাজার আমের কলম করতে হ'লে, আমের চারা লাগবে এক হাজার—যার দাম খুব বেশি। কিন্তু দাম বেশি হ'লেও প্রথম বছর চারা কিনতেই হবে। পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি গাছের জোড়কলম না করলেও চলে। প্রথম বছর এসব গাছের গুড়িকলম করলেই হয় এবং জোড়কলম করার জন্য চারা তৈরি করে নিলেই দ্বিতীয় বছর থেকে এসব গাছেরও জোড়কলম করা চলে।

আমের কলম করার চারাগাছ তৈরি করার জন্য বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝি

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

পর্যন্ত যে-কোন জাতের পাকা আমের বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বর্ষার শুরুরতেই লম্বা লম্বা বীজ-তলায় ৯ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট অন্তর একটি করে বীজ রুয়ে দিতে হবে। বীজ থেকে চারা বেরোলে সেগুলোর বিশেষ যত্ন করা দরকার। বর্ষাকালে যাতে চারাগুলোর গোড়ায় জল না জমে, গ্রীষ্মকালে রসের অভাবে সেগুলো যাতে শুকিয়ে না যায়, আগাছা গজিয়ে যাতে চারাগুলোর ক্ষতি করতে না পারে, এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং দরকারমত যথোপযোগী ব্যবস্থা করতে হবে।

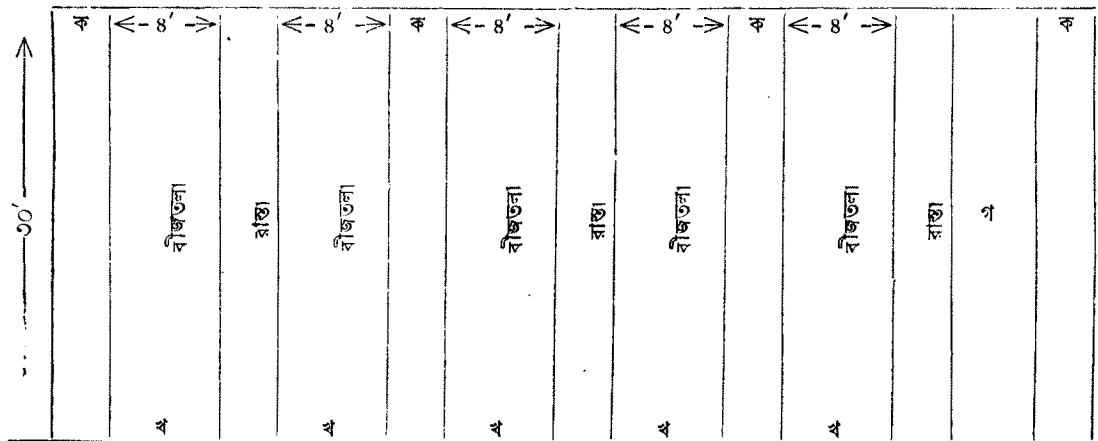
দ্বিতীয় বছর বর্ষাকালে চারাগুলি কলম করার উপযোগী হবে। এসময়ে চারার কাণ্ড আঙুলের মত মোটা হবে। এরকম মোটা চারাই জোড়কলম করার উপযোগী। বর্ষা শুরুর হবার সঙ্গে সঙ্গে চারাগুলি টবে বসিয়ে দু'-তিন সপ্তাহ এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে কিছুটা ছায়া আছে। এ সময়ের মধ্যে চারাগুলি টবে বেশ বসে যাবে। ভালভাবে বসে গেলে, যে-গাছের কলম করা হবে সেই গাছের কাছে টবগুলি নিয়ে যেতে হবে।

কলম তৈরি হয়ে গেলে, প্রতিটি কলমের টবে পরিচয়সূচক লেবেল লাগিয়ে বিক্রির জন্য রাখতে হবে।

কলমগুলো যাতে আসল জাতের হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। চারাবাগান থেকে কোন ক্রেতা হয়তো একটি বোম্বাই-আমের কলম কিনে নিয়ে নিজের বাগানে লাগাল; যথাসময়ে যদি দেখা যায় যে, সেই গাছে যে আম ফলেছে তা বোম্বাই-আম নয়, তা হ'লে উক্ত চারাবাগানের উপর আর ক্রেতার বিশ্বাস থাকবে না, চারাবাগানের সুনামের হানি হবে। সুতরাং এ রকম গোলমাল যাতে না হয় সেজন্য সতর্ক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক টবের গায়ে আলকাতরা দিয়ে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে, যেমন, বোম্বাই আমের জন্য 'ব', ল্যাঙড়া আমের জন্য 'ল' ইত্যাদি। বিক্রির জায়গাতে নিয়েও পৃথক পৃথক চিহ্ন-দেওয়া কলম পৃথকভাবে রাখতে হবে—যাতে তাড়াতাড়ি কাউকে কলম দেবার সময় একটির পরিবর্তে আর-একটি দেওয়া না হয়ে যায়।

বীজতলা

বীজ অথবা ডগা পড়ুবার জন্য চারাবাগানে যে বীজতলা করতে হয়, তার একটা নকশা এখানে দেওয়া হলঃ



(ক) বেড়া—জয়ন্তী গাছের বীজ সব চারা-বাগানেই পাওয়া যায়। এক মরসুমে এই গাছ প্রায় ৬-৭ ফুট লম্বা হয়। জয়ন্তীর বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সারিতে লাগাতে হবে। এক ফুট লম্বা হ'লে পাতলা ক'রে দিতে হবে যেন একাট থেকে অপর গাছ ৩-৪ ইঞ্চি দূরে থাকে। কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিলে গাছগুলোর ডালপালা বাড়বে আর গাছ ঝাঁকড়া হবে। এই গাছের সারি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি লাগিয়ে বেড়া দিতে হবে, তা হ'লে বীজতলায় রোদ পড়তে বাধা হবে না।

(খ) প্রতিটি বীজতলা ৪ ফুট চওড়া আর জমি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু করতে হবে। দু'টি বীজতলার মাঝখান দিয়ে থাকবে রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে মালীরা দু'দিকের বীজতলায় অনায়াসে কাজ করতে পারবে চারাগুলোর কোনও ক্ষতি না ক'রে।

(গ) টবের কলমের চারাগুলি রাখবার জায়গা। কলমের চারাগাছগুলি বাইরে এনে বীজতলায় আলাদা আলাদা রেখে ভালভাবে চিহ্ন দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে জল দেওয়ার সুবিধার জন্য টবগুলি উক্ত জায়গার মাটির মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে।

কমলালেবু

আম, লিচু, প্রভৃতির কলম কেনার উপর ক্রেতাদের সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়। অনেকে কমলালেবুর চারা বা কলমের খোঁজ করেন; কিন্তু পশ্চিম বাঙলার দার্জিলিং অঞ্চল ছাড়া অন্য জায়গার মাটি সাধারণত কমলালেবুর উপযোগী নয়। বীরভূম প্রভৃতি শুকনো উঁচু জেলায় নাগপুরী লেবু কিছুর জন্মাতে পারে—তাও বিশেষ ভাল হয় না। কিন্তু শরবতি লেবু বা মোসাম্বী পশ্চিম বাঙলার সর্বত্রই কম-বেশি জন্মাতে পারে। এই লেবুর গাছ লাগানোর দিকে সকলেই মনোযোগ দিতে পারেন। চারাবাগানগুলিতে ভাল ভাল জাতের কিছুর শরবতি লেবুর গাছ লাগিয়ে কলম করা উচিত। এর চোখ-কলমও করা যায়। ভাল জাতের আসল মোসাম্বী লেবুর চারা পুন্যার 'এম্প্রেস নাশারি'তে পাওয়া

যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং খাঁটি কলম সরবরাহ করার জন্য সুপরিচিত।

অন্যান্য ফল

প্রত্যেক চারাবাগানেই স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী নানা রকম ফলের চারা ও কলম তৈরি ক'রে মজুত রাখতে হবে। এলাহাবাদের পেয়ারা, কাশীর পেয়ারা, কাশীর কুল, নারকেলী কুল প্রভৃতির গাছ পশ্চিম বাঙলায় ভালই হয় এবং ফলও দেয় বেশ। বাজারে এসব ফলের চাহিদাও খুব। অতি সহজেই আমাদের রাজ্যে এসব গাছ সর্বত্র জন্মানো যেতে পারে। গাছগুলো উন্নত শ্রেণীর হওয়া চাই—বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ ক'রে চারাবাগানে কলম তৈরি করতে হবে।

সুপারি-নারকেল

নারকেল এবং সুপারির খুবই অভাব আমাদের রাজ্যে। পল্লী-অঞ্চলের সর্বত্র ব্যাপকভাবে এ দু'টোর চাষ ক'রে এ অভাব আমাদের মেটাতেই হবে। সরকারী উদ্যানে নিয়মিতভাবে সুপারি ও নারকেলের চারা তৈরি ক'রে কম দরে বিক্রি করা হয়; কিন্তু রাজ্যের সকল জায়গার লোক এসব চারা সহজেই পেতে পারে না। পল্লী-অঞ্চলের প্রত্যেক চারাবাগানের ভাল জাতের নারকেল ও সুপারির তেজী নীরোগ চারা তৈরি করলেই স্থানীয় লোকে তা পেতে পারে।

উপসংহার

এক একর জমি এ-কাজে লাগাতে পারেন এমন গৃহস্থ আমাদের রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে অনেকেই আছেন। এই বেকারসমস্যা ও খাদ্যাভাবের দিনে তাঁরা যদি চারাবাগান করার দিকে মনোযোগ দেন তা হ'লে কিছুর লোকের কর্মসংস্থানের ও অর্থীগমের উপায় তো হয়ই, দেশে গাছের সংখ্যা বাড়ানোর এবং ফলের অভাব মেটানোর কাজেও যথেষ্ট সহায়তা হয়। সুফলা বাঙলা আজ প্রায় অফলা হয়ে দাঁড়িয়েছে—একে ফলে ফুলে শ্যামলতায় সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলার ভার একান্তভাবে পল্লীবাসী ভাইবোনদেরই উপর।

সমবায় প্রথায় চাষ

শ্রী জে ব্যাবার্জি

সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক, মেদিনীপুর

আমাদের (আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের) পঞ্জী-মণ্ডল আসরে সমবায় প্রথায় চাষ সম্বন্ধে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। সুতরাং সমবায় প্রথায় চাষ সম্বন্ধে প্রাথমিক কোন কথার উল্লেখ না করে সমবায় প্রথায় চাষ করার চেষ্টা যেখানে যেখানে দৃ-চার জায়গায় হাঁচিল বা হচ্ছে সে রকম দৃ-তিন জায়গার কথা বলব। তা হ'লেই বন্ধুতে পারা যাবে যে, সমবায় প্রথায় যৌথ চাষ করতে গেলে বাধা কোথায় এবং আমরা কিভাবে সেই বাধা অতিক্রম করতে পারি।

বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের কয়েকজন লোক অগ্রণী হয়ে সমবায় প্রথায় চাষ করবার জন্য নেমে-ছিলেন। ৬০-৬৫ জন তাঁদের সমস্ত জমি রেজিস্ট্রি করে সমিতির হাতে তুলে দেন। সমিতি হ'তে জমির আইল তুলে দিয়ে যৌথ চাষ আরম্ভ করা হয়। ট্রাক্টর কিনে চাষ করারও ব্যবস্থা হ'ল। আগে যেখানে বিঘা-প্রতি ৯-১০ মণ ধান হ'ত সেখানে প্রথম বছরে ১২-১৩ মণ ধান ফলল। সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৬০ জন লোক, তার মধ্যে জন-কুড়ি সভ্যের ছিল ৬০-৭০ বিঘার মতো জমি—যে জমি তাঁরা নিজেরা চাষ করতেন না, ভাগে দিতেন। বাদবাকি লোকদের মধ্যে অর্ধেকের ৬-৭ বিঘার মত মাথাপিছু জমি ছিল—যেগুলিতে তাঁরা নিজেরাই চাষ করতেন; আর বাকি সভ্যদের কোন জমি-জমাই ছিল না—তাঁরা জমিতে খাটতেন আর মজদুরি পেতেন। সমিতির মাধ্যমে চাষের ফলে প্রথম বৎসরে ফলন ভাল হওয়াতে সকলেই খুব উৎসাহিত হলেন। গোড়াতেই ঠিক হয়েছিল যে, ফলনের তিন ভাগের এক ভাগ বিঘা হিসাবে জমির মালিকরা পাবেন, এক ভাগ চাষের খরচ-খরচায় লাগবে আর অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে সমিতির

রিজার্ভ ফন্ড (সংরক্ষিত তহবিল) সৃষ্টি করা হবে বা অন্যান্য দেনা প্রভৃতির পরিশোধে বা ঐভাবে খরচ করা হবে। ফলন যতদিন গড়ে ১২-১৩ মণ হ'ল ততদিন বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটা সমস্যা দেখা দিল। যাঁদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ঐ ৬০-৭০ বিঘার মতো ছিল তাঁরা ভাবতে লাগলেন যে, তাঁরা অত জমি দিয়েছেন, ঠিক ঠিক মত চাষ হচ্ছে কিনা, সমিতি ভাল কাজ করছে কিনা—এসব দেখার দায়িত্ব তাদের বিশেষ নয়। ভূমিহীন কৃষক সভ্যদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে—তারা সমিতি চালাবে। যেন মাইনে দিয়ে তাদের মাথা কিনে রাখা হয়েছে। আর এই মনোবৃত্তির জন্য ভূমিহীন কৃষক সভ্যরা বা অল্প অল্প জমির মালিক যাঁরা জমিতে নিজেরা খাটতেন তাঁরা বিরক্ত ও বিরত হয়ে পড়লেন। মনের দিক থেকে একটা ভাঙন এল। ফলে চাষের উপর প্রথম ২-১ বৎসর যে প্রখর দৃষ্টি ছিল তা স্তিমিত হয়ে এল। চাষে ফলন ক'মে গেল আর চাষে আনুষঙ্গিক খরচও গেল বেড়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, মালিকদের ফলনের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে এবং চাষের খরচ মিটিয়ে লাভ হচ্ছে না, হচ্ছে লোকসান। ধার-করা টাকায় যে ট্রাক্টর কেনা হয়েছিল সে টাকা শোধ করাও দৃ-সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। প্রায় সকলেরই মন গেল বিগড়ে। এ ছাড়া আর এক উৎপাত দেখা গেল। ভাগে যাঁরা চাষ করতেন তাঁরা অনেকে সমবায় সমিতি হবার পর থেকে ঐ সমিতিভুক্ত জমি হ'তে বাণ্ডিত হয়েছিল। সমিতির এই সঙ্কটের সময় তারা এখন জমির মালিকদের বলল যে, যদি তাদের আবার জমি ভাগে চাষ করতে দেওয়া হয় তা হ'লে বিঘাপ্রতি ৬ মণ করে ধান মালিকদের দেবে—তাদের

ভাগে যা-ই থাকুক না কেন। মনকষাকষির মাঝে এই চারটুকু বেশ কাজ করল। জমির মালিকরা গেলেন বেঁচে—যোঁথ চাষ তুলে দিয়ে সকলে আবার যে যার জমির চাষ নিজেরাই করতে লাগলেন বা ভাগচাষীকে নিয়ে করাতে লাগলেন।

এখন প্রশ্ন—কেন এ রকম হ'ল? এর কারণ অনেক দেখানো যেতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করে যারা মতামত দিয়ে থাকেন তাঁরা সমবায় নীতিদ্রষ্টতা, সমবায়ী মনোবৃত্তির অভাব ইত্যাদি বড় বড় কারণ উল্লেখ করবেন। কিন্তু গ্রামে কাজ করতে গিয়ে যা বুঝেছি তাতে এই কথাই মনে হয়েছে যে, সমশ্রেণীর বা সমগোত্রের লোক না হ'লে সমবায় প্রথায় চাষকে কৃতকার্য করা শক্ত। যারা লাঙল ধরেন না তাঁদের সঙ্গে যারা লাঙল ধরে জীবিকা অর্জন করেন তাঁদের এক সমিতিভুক্ত করলে বোধ হয় এই সমস্যাই দেখা দেবে। যদি সকলেই অল্প-অল্প জমির মালিক হন এবং নিজেরা চাষ করেন তাঁদের নিয়ে সমিতি ভাল কাজ করতে পারবে ব'লেই মনে হয়। সমিতি সৃষ্টি করার সময় এদিক দিয়ে প্রথমেই দৃষ্টি রাখা কতব্য।

এর পর বলব মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার একটি সমিতির কথা এবং তারই সঙ্গে ঐ জেলারই চন্দ্রকোণা থানার একটি সমিতির সঙ্গে তার তুলনা করে দেখাব। গড়বেতা থানার সমিতিটি সরকারের খাস জমি ইজারা নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে। সমিতিতে ১০-১১ জন সভ্য আছেন যারা কোনদিনই জমি চাষ করেন নি। তাঁরা শহরে থাকেন—কেউ করেন ডাক্তারি, কেউ করেন ব্যবসা, কেউ বা অন্য-কিছু। আর জনকুড়ি কৃষি-মজদুরকে সমিতিভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—অনুর্বর পড়ে-থাকা জমিতে চাষ করে সারা বছরের ভাতের সমস্যাটা মেটানো। ব্যক্তিগতভাবে সরকারের খাস জমির ইজারা পাওয়া শক্ত অথচ সমবায় কৃষি সমিতি করলে তার অগ্রাধিকার আইনে স্বীকৃত আছে, তাই এই প্রচেষ্টা। এইভাবে প্রায় ১০০ বিঘা জমি ইজারা পাওয়া গেছে এবং তার অর্ধেকটাতে চাষ করা হয়েছে। ধান হয়েছে ভালই।

খরচ যা কিছু লেগেছে তা ঐ ১০-১১ জন সভ্যই দিয়েছেন আর ভূমিহীন কৃষি-মজদুর সভ্যরা বাজার-চলতি মজুরি পেয়েছেন—অবশ্য তা থেকে কিছু কিছু কেটে নেওয়া হয়েছে সমিতিতে তাঁদের শেয়ারের মূল্য বাবত। চাষ এবার ভালই হয়েছে, ফলনও মন্দ হয় নি। কিন্তু খরচ-খরচার লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখা গেছে যে সমিতির লাভ না হ'লে লোকসান হবে এবং যারা অর্থ দিয়ে তদারক করে সমিতির কাজ ও চাষের কাজ চালিয়েছেন সেইসব ভদ্রলোকের পারিশ্রমিক দিতেই সমিতির সব চলে যাবে। আর যদি তেমনভাবেই ফলনের ভাগ না পাওয়া যায় তা হ'লে সমিতিতে খাটখাটানি করে কি ফল দাঁড়াল? যদি সমিতির লাভ হয় তা হ'লে সভ্যরাই তার ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং সেক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকেরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তাই ওপথে গেলে ব্যক্তিগত লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক।

এর সঙ্গে চন্দ্রকোণা থানার কৃষি সমিতিটির তুলনা করা যাক। সেখানকার সমিতিটির সভ্যসংখ্যা ২২ জন এবং তারা সকলেই ভূমিহীন কৃষক। তাঁরা প্রায় ২৫০ বিঘা সরকারী খাস জমিতে চাষ করেছেন। ডাঙা জমিতে তাঁরা দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে ৪টি কুপ খনন করেছেন। তাই থেকে জল তুলে চাষ হচ্ছে। এ বছর বেশি বৃষ্টি হওয়ার জন্য ডাঙা জমিতেও ধান হয়েছে ভাল। ফলন প্রায় বিঘায় ৫ মণের মতো। এ'রা কিন্তু গড়বেতা থানার সমিতির মতো চাষ করেন নি। যে যতটুকু পেয়েছেন জমি আইল দিয়ে ভাগ করে নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছেন। এ পর্যন্ত ৮০ বিঘা জমিতে চাষ করা হয়েছে। এ বছর ধান কাটা ও মাড়াই হবার পর প্রত্যেকে ২ মণ করে ধান সমিতিতে জমা দিয়েছেন রিজার্ভ-এর মতো একটা কিছু সৃষ্টি করার জন্য এবং প্রত্যেক ফলন হ'তে তাঁরা সমিতিতে ঐ রকম কিছু কিছু দিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন।

গড়বেতা থানায় যেখানে সমিতিতে লোকসান হ'ল, চন্দ্রকোণা থানার এই সমিতিতে সেখানে ৪৪ মণ ধান

নিম্নে একটা মূলধন সৃষ্টি হ'ল। অথচ দু'টোই সমবায় প্রথায় চাষ—প্রথমটিকে বলা হয় 'কালেকটিভ ফার্মিং' এবং দ্বিতীয়টিকে 'টেনান্ট ফার্মিং'। এক জায়গায় লোকসান আর এক জায়গায় লাভের কারণ কি? যেখানে লোকসান হয়েছে সেখানে সমশ্রেণী-ভুক্ত লোক নিয়ে সমিতি গঠিত হয় নি আর যেখানে লাভ হয়েছে সেখানে সমগোত্রীয় লোক নিয়েই চাষ করা হয়েছে—এটা হ'ল প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমিতি যদি নিজস্ব মূলধন ও অন্য টাকা দিয়ে সমস্ত চাষের খরচা চালাতে চায় সেখানে তদারক করবার জন্য এমন অভিজ্ঞ লোক থাকা দরকার যিনি সমিতির আয় আগে হ'তে অনুমান ক'রে নিয়ে তার মধ্যেই খরচ করতে পারেন। না হ'লে লোকসান হবে। নিজস্ব চাষের বেলায় খরচ কমানোর দিকে যে দৃষ্টি থাকে যৌথ চাষের সময়ও সেই দৃষ্টি বজায় রাখবার মতো মনোবৃত্তি বোধহয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখনও গড়ে ওঠে নি। যৌথ কোন প্রয়াস বা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদেরই আপন ব'লে মেনে নিতে এখনও আমরা অনেকেই শিখি নি। বারোয়ারি ক'রে—সহযোগিতা ক'রে পূজা-পার্বণ, হরিসভা আমরা ক'রে থাকি সত্য কিন্তু তা হচ্ছে দু'-চার দিনের ব্যাপার। দু'-চার-দশ বৎসর সেই মনোবৃত্তিকে আমরা যেদিন জিইয়ে রাখতে পারব সেদিন হবে সমবায়ের পূর্ণ বিকাশ। আমাদের সেই দিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং সেই রকম দিন সুগম করার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যেতে হবে। আয় অনুপাতে খরচ না করতে

পারলে কোন সমবায় সমিতিই টিকতে পারবে না—কি কৃষি, কি অন্য সমবায়। আয় অনুপাতে খরচের দিকে দৃষ্টি রাখাটা যেখানে সম্ভবপর হয় সেখানে সমবায় সমিতি কৃতকার্য হয়, আমাদের অনেকের পক্ষেই যেটা রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এর পরেই আসে সংগঠন ও তদারকের প্রশ্ন। তা করার মতো লোকের অভাব হ'লে সে সমিতি চলতে পারে না। তাই আমাদের ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জমি বজায় রেখে তারই উপর ভালভাবে চাষ করতে গেলে যে যে সাজসরঞ্জাম বা সুযোগ-সুবিধার দরকার সেগগুলির জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে মিলিত হ'তে হবে। সারের দরকার, জলসেচের জন্য কূপ বা জলসেচের পাম্পের দরকার বা ভাল বীজ দরকার—একা একা তার ব্যবস্থা করতে পারি না তাই একসঙ্গে তার ব্যবস্থা করি আসুন এবং সেইজন্য সমবায় সমিতি সৃষ্টি করি। এই রকম সমবায় কৃষি সমিতিকে 'বেটার ফার্মিং' সমিতি আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে সরকারের নীতিও তাই। যেখানে আইল তুলে দিয়ে যৌথ প্রথায় চাষ ক'রে লাভবান হওয়া গেছে সেখানে সেরূপ সমিতিকে উৎসাহ দিতে হবে এবং তার দৃষ্টান্ত জনসাধারণের কাছে তুলেও ধরতে হবে। সেই রকম সমিতিই আমাদের আদর্শ। কিন্তু আগেই বলেছি, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে সময় লাগবে। ততদিন ঐ 'বেটার ফার্মিং' বা 'টেনান্ট ফার্মিং' সমিতি ক'রে যেসব সমস্যা একা একা সমাধান করতে পারি না তা যৌথভাবে সমাধান করি আসুন। [বেতার কথিকা]

অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড কেন নয়

নাইট্রোজেনী রাসায়নিক সার হিসাবে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড কেন যে অ্যামোনিয়ম সালফেটের মতই জনপ্রিয় হবে না, তার কোন কারণ বোঝা যায় না। অ্যামোনিয়ম সালফেটে নাইট্রোজেন আছে শতকরা ২০.৬ ভাগ আর এতে আছে শতকরা ২৫ থেকে ২৬ ভাগ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ সার অ্যামোনিয়ম সালফেটের চেয়ে মোটেই খারাপ তো নয়ই, বরং ভাল। 'সোডা অ্যাশ'-এর সহ-উৎপাদন হিসাবে এই রাসায়নিক সারটি এখন কম খরচে তৈরি করা যায়। এ জিনিস আমাদের দেশে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করাও সহজ, কারণ এর কাঁচামাল—সাধারণ লবণ এবং কয়লা—আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে।

অম্ল জমি ছাড়া আর সব রকম জমির পক্ষেই অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড উপযোগী। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ইংলন্ডের রথামস্টেড এবং উবার্নে, তা ছাড়া ইউরোপ আর আমেরিকার অনেক জায়গায় সার হিসাবে প্রয়োগ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়েছে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের। বেশ ভালভাবেই জানা গেছে যে, যব গম প্রভৃতির চাষে এই সার অ্যামোনিয়াম সালফেটের চেয়ে ভাল। তবে তামাকের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, ক্লোরাইড বেশি মাত্রায় শোষণ করার ফলে নাকি দোস্তাপাতার দাহ্যগুণ কম য়ায়। চর্ব্য তামাকপাতার চাষে এই সারের উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে অল্পপ্রদেশে রাজমুন্ডির কেন্দ্রীয় তামাক-গবেষণা-কেন্দ্রে।

কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা এবং রাজ্যসরকারগুলির কৃষিবিভাগসমূহ সরকারী খামারগুলিতে এবং দেশের বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর এলাকায় নানা ধরনের মাটিতে গত তিন বছর ধরে বহু পরীক্ষা চালিয়েছেন। সব পরীক্ষাতেই ধান, গম, ভুট্টা জোয়ার, বাজরা, তুলো, আখ, এবং পাটের চাষে অ্যামোনিয়ম সালফেটের চেয়ে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড ভাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ১৯৫৫-৫৬ সালে গমের চাষে এবং ১৯৫৬-৫৭

সালে আখের চাষে এই সার দিয়ে পরীক্ষা করে যে ফল পাওয়া গেছে এখানে তা দেওয়া হ'ল:

গম

প্রাণাগ	একরপ্রতি ফলন হয়েছে			
	বারানসী	বড়বাঁকি	মীরাঁট	ফয়জাবাদ
নিয়ন্ত্রিত (কোন সার না দিয়ে)	১০.৬৭	৯.৬৭	১৮.৫৬	৬.৬৭
অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের মারফত একর-পিছু ২৪ পাউণ্ড নাইট্রোজেন দিয়ে	১৭.৭৫	১৫.২৩	২৬.৯২	১৪.৯৬
অ্যামোনিয়ম সালফেটের মারফত একর-পিছু ২৪ পাউণ্ড নাইট্রোজেন দিয়ে	১৫.৯২	১৫.২৩	২৬.৭১	১১.১২

আখ

কেন্দ্র	নিয়ন্ত্রিত	অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড মারফত একরপিছু ৬০ পাঃ নাইট্রোজেন	অ্যামোনিয়ম সালফেট মারফত একরপিছু ৬০ পাঃ নাইট্রোজেন
খাদা	৪০৮	৪৬৫	৪৯৭
রামকেলা	৪৫০	৫০৬	৪৯১
চুচালি	১৫৪	১৬০	১৪৪
ফয়জাবাদ সরকারী কৃষিক্ষেত্র	৪৫২	৪৮৫	৪৫০
মাসোখা খামার, ফয়জাবাদ	৭৫৭	৭৬৯	৭৮৬
প্রিয়োয়ান	৬৬০	৬৫৫	৬৯৭
গোলা	৯৮৬	১,০৭২	১,০২৫
নেওলি	৬০৩	৫৫৮	৬৯৮
খুদিয়া (কিছা)	৮১২	৮৫৬	৮৪২
রামনগর (কিছা)	৩২০	৩৭৩	৪০১
স্কবারা	৪৯৭	৫৮৫	৫৭১
মুজফ্ফরনগর	৫১২	৬৪৪	৫৪৯
মীরাঁট	৬১৬	৭০৪	৬৭৩
মৌয়ান কালান	৮৭২	১,০৭৭	৯৩৪
১৪টি কেন্দ্রের গড়	৫৭৮	৬৩৬	৬২৬

পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে যে, গম এবং আখের চাষে অ্যামোনিয়ম সালফেটের চেয়ে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড বরং ভালই।

উত্তরপ্রদেশে ধানের চাষেও অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড আশাপ্রদ সফল দান করেছে।

পাঞ্জাবে তুলোর চাষেও এর উপযোগিতা সুপ্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, অপর যে-কোন নাইট্রোজেনী সারের চেয়ে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডে তুলোর ফলন ভাল হয়। বিহারে চাষীদের জমিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জল-দাঁড়ানো জমির পক্ষে অন্যসব নাইট্রোজেনী সারের চেয়ে এই সার ভাল।

উৎপাদন

অ্যামোনিয়ম সালফেট এবং অন্যান্য নাইট্রোজেনী সারের তুলনায় অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড তৈরিতে খরচ বেশি পড়ে যায় বলে, সার হিসাবে এ জিনিসটার উৎপাদনে অতীতে উৎসাহ দেখা যায় নি এবং লাভজনক রাসায়নিক সারের তালিকায় একে স্থানও দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন সংশোধিত 'সল্ভে' প্রণালীতে 'সোডা অ্যাশ' এর সহ-উৎপাদন হিসাবে এই সার তৈরি করা যায়, ফলে এর উৎপাদন খরচও অনেক কম পড়ে।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হচ্ছে এই যে, প্রচলিত রীতিতে যেখানে প্রতি টন 'সোডা অ্যাশ' এর জন্য সাধারণ লবণ লাগে ২ টন, সেখানে এতে লাগে ১.২৫ টন।

প্রথম প্রচেষ্টা

এদেশে সর্বপ্রথম অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড তথা 'সোডা অ্যাশ' উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছেন 'মেসার্স সাহু জৈন'। সাহুপুত্ররীতে এই কারখানা স্থাপনে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোটি টাকার ওপর। এখানে বছরে ৪০ হাজার টন 'সোডা অ্যাশ' এবং ৪০ হাজার টন অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড উৎপন্ন হবে। ১৯৫৯ সালের শেষভাগেই কাজ শুরু করে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হন। কারখানার উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণিত করার বিষয়ও এরা বিবেচনা করেছেন।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১৯৫৯-৬০ সালে আমাদের দেশে মেট ২২.৭ লক্ষ টন রাসায়নিক সার প্রয়োজন। দেশের মধ্য থেকে মাত্র ৮.২ লক্ষ টনের সরবরাহ পবার আশা করা যায়। সারের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দেশে সস্তায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামোনিয়ম সালফেট উৎপাদন করতে হ'লে যে পরিমাণ গন্ধকের দরকার, তা আমাদের নেই।

'সোডা অ্যাশ' উৎপাদনের সমস্ত কারখানায় যদি সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে দেশে নাইট্রোজেনী সারের সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা হবে। জাপান ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। [১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং' এ প্রকাশিত শ্রী পি সি চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে]

ভারতে মাছের চাষ বৃদ্ধির প্রয়াস

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদের এক বৈঠকে দেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রে মৎস্যের চাষ বৃদ্ধি এবং বিদেশে অধিকতর পরিমাণে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে এইরূপ সুপারিশও গৃহীত হয় যে, মৎস্যজীবী সমবায় প্রতিষ্ঠান, মৎস্যশিল্প ও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

দেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ-ধরা ব্যবস্থার প্রসারের জন্য পর্ষদ প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ছাড়াও যন্ত্রচালিত নৌকা ও আবশ্যিক সরঞ্জাম আদি সরবরাহের সুপারিশ করেছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৎস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পর্ষদ কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে এসকল যন্ত্রচালিত নৌকার উপযোগী বন্দর গড়ে তুলতে অনুরোধ করেছেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ও পরবর্তী সময়ে যেসকল দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য পর্ষদ দেশের বিভিন্ন সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রের পূর্ণ সম্ভাব্য ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদের আলোচ্য বৈঠকে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, মাদ্রাজ, পঞ্জাব এবং রাজস্থানের মৎস্য বিভাগীয় মন্ত্রীগণ ছাড়াও বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যোগদান করেন।

ভারতে মৎস্য-চাষ

ভারতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টনের অধিক মাছ ধরা হয়। পৃথিবীতে যেসকল দেশে মাছ ধরা হয় ভারত তাদের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে।

এদেশে মৎস্যচাষ শিল্পের বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। বর্তমানে এই শিল্পে ৪ লক্ষ ২১ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং এ থেকে ২৮ কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া, মাছ রপ্তানি করেও যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে।

ভারতের উপকূল অঞ্চলে ৭৩,০০০ জেলে-নৌকায় দিন-রাত মাছ ধরা হচ্ছে। প্রায় ১০ লক্ষ জেলে এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

এদেশে যে-পরিমাণ মাছ ধরা হয় তার এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় নদী, খাল, বিল প্রভৃতি থেকে।

১৯৪৪ সালে অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযানের সময় মৎস্য-চাষের উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হ'লেও বস্তুত স্বাধীনতার পরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই কাজ আরম্ভ হয়।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে মান্দাপামে 'সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন', কলিকাতায় 'সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন' এবং বোম্বাইতে 'সেন্ট্রাল ডিপ-সী ফিশিং স্টেশন' স্থাপিত হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রধানত খাদ্যে ঘাটতি মেটাবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জন-প্রতি খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৎস্য-চাষ উন্নয়নের কার্য-সূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনা-শেষে মাছের উৎপাদন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিমাণ ১৯৫১ সালের ১০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তার মধ্যে ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করবার জন্য নির্দিষ্ট হয়।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযানে মৎস্য-চাষের উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং রাজ্য-সরকারসমূহকে অনুমোদিত পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এদেশে মাছের উৎপাদন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য কতসংখ্যক শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হবে এবং কীভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যায় তার পর্যালোচনার জন্য ১৯৫৮ সালে ভারত-সরকার একটি কমিটি গঠন করেন।

উক্ত কমিটি কোচিনে একটি মৎস্য-চাষ শিক্ষণ কেন্দ্র এবং উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকট কৌশল্যা-গঙ্গা অঞ্চলে একটি উপকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। তা ছাড়া কমিটি মৎস্য-দফতর পুনর্গঠনের ধারাও নির্দেশ করেছেন।



পশুচিকিৎসায় পার্থক্য

বর্তমানে পৃথিবীতে পশুচিকিৎসা-সংক্রান্ত শিক্ষার যে রীতি রয়েছে এটা সাধারণ ধরনের এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষিত যুবকদের পশুচিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আবশ্যিক শিক্ষা দান করা। মনে রাখতে হবে যে, পশুচিকিৎসকদের প্রকৃত কাজ বিভিন্ন স্থানের অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

যেসব দেশে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত, সেসকল দেশে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা, আর্থিক অবস্থা, মানসিক প্রবণতা, পশুর জাত প্রভৃতি অনুযায়ী পশুচিকিৎসকদের কর্তব্য, অন্তত কিছু পরিমাণে নিয়মিত হয়েছে। এসব দেশে, যেগুলোকে উন্নততর দেশ বলা হয়, সাধারণত অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের জায়গায় বেশিসংখ্যক পালিত পশু থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরপক্ষে যেসব দেশে পালিত পশুগুলি বিস্তৃত স্থান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পৃথক পৃথক পশুর উপর কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেসব দেশে পশুচিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। তাঁদের এবং উন্নততর দেশগুলির পশুচিকিৎসকদের কাজের মধ্যে প্রায়ই যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়

এসব অঞ্চলের প্রধান একটা পার্থক্য হ'ল, পশুচিকিৎসার ব্যক্তিগত ব্যবসায়। পশুর রোগ, বিশেষত সংক্রামক রোগ, দমনের জন্য সরকার থেকে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া পৃথিবীর সকল স্থানেই অত্যাবশ্যক এবং সকল দেশেই তার কিছু কিছু ব্যবস্থা দেখাও যায়; তা হলেও কম উন্নত দেশগুলোতে কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ও দেখা যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগত চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের কাজ পৃথক পৃথক প্রাণীদের বা ছোট ছোট দলবদ্ধ প্রাণীদের ব্যাপারেই বহুল পরিমাণে

সংশ্লিষ্ট, আর, সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যক সমগ্র দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—যেমন কোনও পশুরোগের বিস্তার দমন করা, অথবা বাইরের কোন পশুরোগ যেন দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কোন কোন দেশে সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যক এই কাজে সহায়তার জন্য নিজেদের পশুচিকিৎসকগণ ছাড়াও ব্যক্তিগত চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের আংশিক-সময়ের কর্মী হিসাবে কাজে লাগায় এবং বিশেষভাবে জগতের অল্প-উন্নত দেশগুলিতে পশুচিকিৎসার কেন কোন বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকদেরও পশুচিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

কালের গতিতে বহু দেশেরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়েরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জগতের বহু দেশে কৃষি ও পরিবহণ কাজে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় অশ্বের প্রয়োজনীয়তা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে কয়েক বছর আগেও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের যা প্রধান অবলম্বন ছিল আজ তা বদলে গিয়েছে, অন্যান্য প্রাণী এখন প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহপালিত গোরু, মহিষ, শূকর, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুর উপরে এখন সমাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং হাঁস-মুরগি পালন বলতে বোঝায় এইসব পাখির স্বাস্থ্য সম্পর্কে মালিকদের অধিকতর সচেতনতা। সারা পৃথিবীতে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তা থেকে পশুচিকিৎসকেরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন।

পালিত প্রাণী

আবার, গৃহপালিত (পোষা) জীবজন্তু, বিশেষ করে কুকুর ও বিড়াল সম্পর্কে এখন খুবই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, যার ফলে পশুচিকিৎসার চাহিদা এত

বেশি বেড়ে গিয়েছে যে, পশুচিকিৎসকেরা শুধু এদেরই চিকিৎসা তাঁদের সমগ্র সময় ব্যয় করতে পারেন। গত দু'-তিন দশকে এইসব প্রাণীর স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য অতি দ্রুত-গতিতে বেড়ে গিয়েছে। মেয়েরাও পশুচিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ক্ষুদ্র প্রাণীর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও পরিসর কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় বড় শহরের অনেকগুলিতেই, বিশেষ করে উন্নততর দেশগুলির, ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর চিকিৎসার জন্যই একান্তভাবে নিয়োজিত চিকিৎসাগার দেখতে পাওয়া যায়। এইসব জীব-জন্তুর শস্ত্রচিকিৎসা দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে এবং এইসমস্ত চিকিৎসাগারে শস্ত্রচিকিৎসার উপকরণে সুসজ্জিত যেসব কক্ষ রয়েছে সাধারণত মানুষের চিকিৎসার জন্যই এমন সব ঘর ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়।

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে গৃহপালিত বড় বড় জীবজন্তুর শস্ত্রচিকিৎসা ব্যাপারেও লক্ষণীয় অগ্র-গতি দেখা যাচ্ছে। আজকাল পশুচিকিৎসকেরা এমন-সব শস্ত্রচিকিৎসায় হাত দেন, যেগুলি এক সময় অসম্ভব ব্যাপার ব'লেই মনে হ'ত বা যেগুলি ষথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে করা হ'ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় করে নেবার অধিকতর সন্তোষ-জনক পদ্ধতির উন্নতিসাধন করে এই বিপদের আশঙ্কা অনেকটা কাটানো সম্ভব হচ্ছে।

পশুচিকিৎসক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য যে সময়টা ব্যয় করেন তার অনেকটা খামারের কাজে তাঁকে ব্যয় করতেই হবে। আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত একটা খামার থেকে অন্য খামারে ঘুরে বেড়াতেই পশুচিকিৎসকের অনেকটা সময় ব্যয় হ'ত। আজকের দিনে, মোটরগাড়ি ও বিমানপোত ব্যবহার করে দীর্ঘ দূরের পথও অতি অল্পসময়ের মধ্যে অতিক্রম করা যাচ্ছে এবং তার জন্য, অনেক এলাকায়ই পশু-চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের কাজের পরিধি ষথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে।

আগে যেখানে এক জায়গায় একজনের বেশি পশু-চিকিৎসককে সাধারণত ব্যবসা করতে দেখা যেত না, এখন সেখানে অধিকসংখ্যক পশুচিকিৎসককে হয় যৌথ-অংশীদার হিসাবে অথবা সহকারী চিকিৎসক হিসাবে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রথার অনেকগুলি সুবিধা আছে।

আংশিক সময়ের কাজ

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকদের সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের কাজে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেক দিন এই কাজে তাদের বেশ-কিছুটা সময় কেটে যেতে পারে, বিশেষ করে যেসব দেশে রোগ দূর করবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বেশ উন্নতি দেখা যাচ্ছে। আবার, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় প্রত্যেক পশু-চিকিৎসকই বাস্তবিকপক্ষে সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের নিযুক্ত এক-একজন কর্মচারী কিন্তু সরকারী কাজের কোন ব্যাঘাত না করে তিনি যদি ব্যক্তিগত ব্যবসা করেন, সরকার তা অনুমোদন করেন।

যেসব দেশ বেশ উন্নত সেইসব দেশে ব্যক্তিগত ব্যবসা ছাড়াও পশুচিকিৎসকগণ অন্যান্য কাজের জন্য সর্বসময়ের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। বেসরকারী কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ এই পর্যায়ভুক্ত। এইসব কসাইখানা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হ'লে পরে সরকারই এইসব চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পৌরসভাসমূহ কসাইখানাগুলি পরিচালনার জন্য দায়ী এবং তাঁরাই যে ক'জন দরকার পশুচিকিৎসক নিয়োগ করেন। পৃথিবীর অনেক জায়গায় জবাই করার জন্য পশু নিব্বাচন ও কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ এবং গাটবন্দী করার জনিত পরিচালনার কাজ সমগ্রভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই করে। এমন-সব প্রতিষ্ঠানই পশুচিকিৎসকদের নিযুক্ত করে এবং সাধারণত সর্বসময়ে কাজ করার জন্যই এঁদের নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত কর্তৃত্ব নিয়েও

তাঁরা কাজ করতে পারেন অথবা পরিদর্শক ও উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করতে পারেন। এ ছাড়াও সরকারী পশুচিকিৎসকেরাও এই কাজে যোগদান করতে পারেন।

সরকারী প্রয়োগশালা

উন্নততর দেশগুলিতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকেরা বিশেষত রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষিত প্রয়োগশালাগুলি থেকে সাহায্য পান। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এখন জীবজন্তুর স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণে একান্ত আবশ্যিক অনুবন্ধ বলে গণ্য করা হয়। প্রায় সব দেশেই অন্তত একটি করে এমন প্রয়োগশালা আছে; অন্যান্য দেশে রোগনির্ণয় ও গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় প্রয়োগশালা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োগশালা রয়েছে। এইসব ক্ষুদ্র প্রয়োগশালা উপকরণে এরূপ সুসজ্জিত এবং এমন-সব চিকিৎসক এখানে রয়েছে যে, রোগনির্ণয়ের কাজ ও স্থানীয় রোগ দ্বারা যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে গবেষণা করার নিশ্চিত সুযোগ এখানে পাওয়া যায়। এইসমস্ত স্থানীয় প্রয়োগশালাতে যেসকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কোন জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য যদি তার চেয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার দরকার হয়, তা হ'লে তা কেন্দ্রীয় প্রয়োগশালায় পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় প্রয়োগশালায় ব্যাপক গবেষণার বন্দোবস্ত রয়েছে।

রোগ-সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের এই যে স্থানীয় রীতি এর যথেষ্ট মূল্য আছে এটা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকগণ স্থানীয় পশুরোগের কারণ অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে সহ-যোগিতা থাকায় জীবজন্তুর স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে এমনসব সমস্যার কথা জানা যাচ্ছে যার সমাধানের উপরে দেশের আর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট নির্ভর করে। এইসব স্থানীয় পশুচিকিৎসকেরা জীবজন্তুর স্বাস্থ্য-সমস্যা সম্পর্কে প্রচুর সংবাদ পান

এবং তাঁদের কাজের ফলে অনেক সময় গোটা একটা দেশের বা এলাকা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়।

যেসব বন্যপ্রাণী ধরে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে এবং খাঁচায় বন্দী এইসব প্রাণীকে খাওয়ানো, তাদের রোগনিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য এখন পশুশালায় পশুচিকিৎসকদের নিয়োগ করবার প্রথা সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব নিয়ম মেনেই পশুগুলিকে পালন করা হয়।

জৈবিক পদার্থ

জীবজন্তুর রোগ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন প্রতিদিন যেসকল জৈবিক পদার্থ এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার চলছে সেইসকল পদার্থ উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক নিযুক্ত পশুচিকিৎসকগণ বহু দেশে যে চমৎকার কাজ করছেন তার উল্লেখ করতেই হবে। এইরকম সব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক গবেষণার কাজ চালানো হয় এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্বাস্থ্যপালন ও রোগ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পৃথিবীতে যে জ্ঞান রয়েছে তার বেশির ভাগই এখানকার পশুচিকিৎসকদের কাজ থেকে পাওয়া।

জগতের যেসব জায়গায় পশুপালনকেন্দ্র গণ্ডী-বদ্ধ অবস্থায় পশুগুলিকে রাখা হয় সেসব জায়গায় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকেরা এই পশুগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন। জেলায় যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, পশুচিকিৎসকদের কাজ হ'ল সেইসব রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা; যথোপযুক্ত সময়ে টিকা দেওয়া ও অন্যান্য জৈবিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন ঔষধ ব্যবহার করা হয় এবং কখনও কখনও এইসব পশুপালনকেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য পশুচিকিৎসকদের খুব দীর্ঘসময় অতিবাহিত করতে হয়।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে পশুরোগ-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রধানত পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের এবং কাজ যত বাড়়ে পশুচিকিৎসা-কৃত্যক ততই উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়। পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের একান্ত প্রয়োজনীয়তা এইসব দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যে কয়জন পশু-চিকিৎসক পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাঁদের সংখ্যার উপরেই অনেক সময় পশুচিকিৎসা-কৃত্যক সম্প্রসারণের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। নিজেদের দেশে বা এলাকায় শিক্ষণপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসকদেরই নিযুক্ত করার যে আকাঙ্ক্ষা এইসব দেশে দেখা যায় তা প্রাধান্যযোগ্য। এটা সব সময় সম্ভব হয় নি এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষণ-প্রাপ্ত পশুচিকিৎসকদেরও পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর কতকগুলি সুবিধা ছিল, কারণ এর অর্থ হ'ল এই যে, এই সুশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসকেরা মজবুত বুনিয়াদ তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং তেমনি সব বুনিয়াদের উপরেই পশুচিকিৎসা-কৃত্যকগুলি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে, সম্প্রসারণের পরে এইগুলির যথার্থ মূল্য দুনিয়ার আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষণব্যবস্থা

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কম-উন্নত দেশগুলিতে পশুচিকিৎসকদের স্থানীয় শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য অধিকতর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় শিক্ষণপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসকদের অবস্থার যে ক্রমোন্নতি আশা করা যাচ্ছে তা যদি হয়, তা হলে এটা আরও বহু যুবককে পশু-চিকিৎসকরূপে স্নাতক হবার জন্য উৎসাহিত করে তুলবে এবং এইসব দেশ থেকে জগতের অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণলাভের জন্য ছাত্র পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। এটা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায় যে, এইসব দেশে বিপুলসংখ্যক পালিত পশু বিরাট

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকার জন্য এবং যে অবস্থায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাতে পশুর স্বাস্থ্যপালন ও রোগনিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা করা দরকার পশুচিকিৎসকেরা সেসব করতে সমর্থ হন না। এর ফল এই হয়েছে যে, বিশেষ ধরনে সামান্য শিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ লোকদের নিযুক্ত করতে হয়েছে, পশুচিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তারা কাজ করে। এইসব লোক আজ অপরিহার্য এবং তারা যে কাজ করে তার তাৎপর্য জগতের বহু দেশে পশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যাপারে আজ যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে তাতেই প্রতিফলিত।

মিলিত কাজ

অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের কাজ প্রথমত ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধিগুলির নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কাজেই একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে। সাধারণভাবে বলতে বিশেষ একটিমাত্র পশুর গুরুত্ব সামান্যই, পশুচিকিৎসার কাজের আদর্শ হ'ল পশুর দলকে রোগমুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় রোগসৃষ্টি রোধ করা।

এমনিভাবে এককালীন বহু পশুর উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে চিকিৎসা হয়। এইসব এলাকার আসল জিনিস হ'ল মিলিত কাজ। স্বভাবতই যেসব রোগ জন্য এবং যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেইসব রোগেরই এই জাতীয় পশুচিকিৎসার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও দেওয়া হবে। এসব এলাকায় একদা যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল সেইসব রোগের দূরীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের কাজে যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় বেশ দ্রুত উন্নতি, তা খুবই উৎসাহবাজক।

সম্প্রতি যেসব রোগ দেখা দিচ্ছে বা যেসব রোগ আগে থেকেই ছিল কিন্তু নজরে পড়ে নি সেইসব রোগের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় রোগ নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে এবং

স্থানীয় ও অন্যান্য রোগ-নিরূপণ ও গবেষণার প্রয়োগশালাসমূহে কাজের যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বারা পশুচিকিৎসকেরা এই কাজে খুব সাহায্য পাচ্ছেন। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনেক সময়ে নতুন নতুন রোগ বাইরে থেকে আমদানি হয়ঃ সংক্রমণ-বাহী রোগগুলি খুব তাড়াতাড়ি চেনা দরকার যাতে স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায়।

পশুপালন

পশুপালন ও পালিত পশুর পুষ্টিসাধন ব্যাপারে পশুচিকিৎসকদের কাজ কী—এ নিয়ে সব সময়ই বহু আলোচনা হয়েছে। যদিও এমন দাবি উঠতে পারে যে, পশুরোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয় ছাড়াও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। পশুস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতির ব্যাপারে, বিশেষ করে পৃথিবীর কম উন্নত দেশগুলিতে, এ জিনিসটা সুপরিষ্ফুট এবং এইসব দেশে পশুপালন সম্পর্কে পশুচিকিৎসকদের বেশ ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

শিক্ষণ সময়ে তথ্য-অভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর এইসমস্ত দেশে পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয়গুলিতে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, পশুপালন তার বিভিন্ন দিক সহ তাদেরই অন্যতম—এইসব জায়গার পশুপালকেরা প্রধানত পশুচিকিৎসকদের সাথে আলোচনা ও তাদের পরামর্শের উপরে নির্ভর করে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, পশুচিকিৎসকেরা এইসব এলাকায় ভ্রমণ করার সময় বহু সমস্যা সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দিতে হয়—সে সমস্যোগুলি যে শুধু পশু সম্পর্কে তা নয়, মানুষ সম্পর্কেও এবং একটি মজার ব্যাপার উল্লেখযোগ্য এই যে, অন্তত একটি পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় পশুচিকিৎসা বিষয়গুলির মধ্যে মানুষের ঔষধ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ সন্নিবিষ্ট করা হয়।

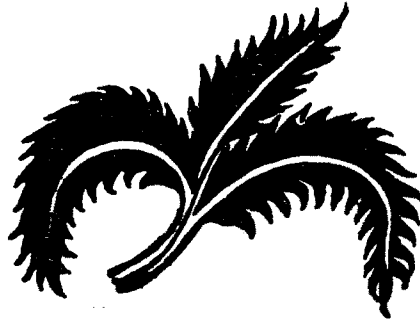
কম উন্নত দেশগুলিতে পশু-উৎপাদন ব্যবস্থা যত উন্নত হচ্ছে প্রজননের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পশুও তত আমদানি করা হচ্ছে। রপ্তানির পূর্বে যেমন এই পশুগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় যেন এদের কোন সংক্রামক ব্যাধি না থাকে, তেমনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পরেও দেখে নিতে হয় কোন বিশেষ সংক্রামক রোগ সৃষ্টির আশংকা যাতে কম থাকে। এইসমস্ত মূল্যবান পশু স্থানীয় কোন রোগের সংস্পর্শে এসে যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্য পশুচিকিৎসকদেরও সতর্ক দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যিক এবং তেমন কোন সংক্রামক রোগের লক্ষণ যদি তাদের দেহে দেখা যায়, তা হ'লে অবিলম্বে চিকিৎসা করতে হবে। এইভাবে, যদিও সাধারণক্ষেত্রে, কম উন্নত দেশগুলিতে বিশেষভাবে কোনও একটি পশু সাধারণত খুব হস্ত পাশ না, আমদানি-করা পশুগুলির ব্যাপারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

এইসমস্ত দেশে একদিকে যেমন পশুচিকিৎসার প্রধান কাজগুলি সরকারী পশুচিকিৎসা-কৃত্যকর্তৃক নির্বাহ হয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকদেরও দেখা যায়, বিশেষত বড় বড় শহরগুলিতে। দেশ যত উন্নত হ'তে থাকে এবং উন্নত ধরনের পশুর পাল যত সৃষ্ট হ'তে থাকে ততই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের রত পশুচিকিৎসকদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এইসব পশুচিকিৎসকের ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার চিকিৎসা করার ও গৃহপালিত পোষা জীবজন্তু, যথা—কুকুর ও বিড়াল প্রভৃতির স্বাস্থ্য ও রোগ পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এইসব কম উন্নত দেশে যেসমস্ত রোগ সাধারণত দেখা যায় তার চেয়ে যেসব রোগ সম্ভবত লোকচক্ষুতে কম ধরা পড়ে সেইসব রোগ আস্তে আস্তে মনোযোগ আকর্ষণ করছে এবং পশুচিকিৎসকদের সংখ্যা যত বাড়বে এইসব রোগ ততই ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

পুষ্টিবীর স্বল্প-উন্নত দেশগুলিতে পশু-উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল পালিত পশুর ও পশুজাত দ্রব্যের রপ্তানি-ব্যবসার পত্তন করা। কোন কোন দেশে এ কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে এবং বহুসংখ্যক পশু নিয়ে কারবার করে পশুচিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এমিনসব কসাইখানা সেসব দেশে দেখা যায়। আর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এইসব কাজের সফল্য পালিত পশুর স্বাস্থ্যের উপরে অনেকখানি নির্ভর করবে। যেসমস্ত রোগ ইতোমধ্যে নিরূপিত হয়েছে সেইসমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণ, এখন পর্যন্ত যেসমস্ত রোগ নিরূপিত

হয় নি সেই সমস্ত রোগের কারণ ও তার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিরত প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার কাজ এবং প্রয়োজনীয় জৈবিক পদার্থ ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্য সংস্থান করা—এ সমস্তই এই জাতীয় পরিকল্পনার একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। এটা সানন্দে উল্লেখ করা চলে যে, এইসব বিষয়ের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এখন এইসব এলাকায় এই সমস্ত কাজের উন্নতির জন্য উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। [১৯৫৯, আগস্ট সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং' পত্রিকায় প্রকাশিত স্যার টমাস ডালিঙের প্রবন্ধ থেকে]



জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাবধান

লন্ডনের 'সিমেন্স হসপিটাল'এ ১৮৪৩ সালে একজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হ'লে তার মৃত-দেহের ময়না তদন্তের পরিচালনা করেন ডাক্তার বাস্ক্। তার অস্ত্রে পাতার আকারের অনেকগুলি চ্যাপ্টা কীট পাওয়া যায়। সেই কীটগুলিই ছিল নাবিকটির মৃত্যুর জন্য দায়ী। পরে এই কীটের নাম দেওয়া হয় বাস্ক্-এর কৃমি বা মানুষের বৃহদন্তের কৃমি। আরও কিছুকাল পরে ১৮৭৬ সালে লুইস এবং ম্যাককোনেল নামে দুইজন ইংরেজ চিকিৎসক একজন অসমীয়ার অস্ত্রে আর-এক রকমের কীট (অ্যাম্ফিস্টোম) আবিষ্কার করেন। পরভোজী কীটগুলি ওই অস্ত্র শোষণ করেই খাদ্য আহরণ করছিল। এর পরে ১৯১৩ সালে ডাক্তার লেন মালয়-কৃমি নামে আরও এক জাতের কৃমি আবিষ্কার করেন একটি অসমীয়া বালিকার অস্ত্রে।

১৯৪৭ সালে হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে, পূর্ব এসিয়ায় অন্তত কোটিখানেক লোক এসব কৃমির দ্বারা আক্রান্ত। চীনের শাওসিঙ জেলায় মানুষের বৃহদন্তের কৃমির আক্রমণ স্বাস্থ্যহীনতার ও জীবন-হানির একটা প্রধান কারণরূপে গণ্য। এর আক্রমণে এক এক সময় গোটা পরিবার-কে-পরিবার নির্মূল হয়ে যায়।

পূর্ব দেশগুলিই এই তিনটি কৃমিকীটের আবাস-স্থল। এসব এলাকায়, বিশেষত ভারতের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় শূকরের অস্ত্রে এসব কৃমির অবস্থান সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকুলে তাঁর ১৯৩৯ সালের তদন্তের যে বিবরণী দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, পূর্ব ভারতে বিশেষ করে আসামের মণিপুর উপত্যকায় মানুষের অস্ত্রে এসব কৃমির আক্রমণ সাধারণ ঘটনা। কামরূপ জেলায় মোট অধিবাসীদের শতকরা ৪২ জনই, বেশির ভাগই শিশু, দেখা গেছে, দ্বিতীয় কীটটির দ্বারা আক্রান্ত। তা ছাড়া, মালয়-কৃমির

মারাত্মক আক্রমণে মাদ্রাজে দু'জন লোক মারা গেছে ব'লে খবর পাওয়া গেছে।

বৃহদন্তের কৃমি চ্যাপ্টা, কতকটা পাতার মত কিন্তু তার দেহ মাংসল। এই কীট এক থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা, প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া এবং ১/১০ ইঞ্চি পুরু হয়। দ্বিতীয় প্রকারের (অ্যাম্ফিস্টোম) কীট অনেক ছোট, ইঞ্চিটুক লম্বা এবং সিকি ইঞ্চি চওড়া, দেখতে ছোট একটি পাতার ধরনের। তিন রকমের কীটেরই রঙ জীবন্ত অবস্থায় উজ্জ্বল লালচে; এরা পেশীবহুল দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত করে ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে।

তিন রকম কৃমিরই দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রায় একই ধরনের। প্রাণীর অস্ত্রের গায়ে লেগে থাকার জন্য এদের একটা শোষক মুখ আছে—বাটির আকারের। প্রতিটি কীটের স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়-বিধ প্রজননযন্ত্র আছে এবং একটি কীট এক দিনে প্রায় ২৫ হাজার ডিম পাড়তে পারে। ডিম এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। ডিমগুলি অস্ত্রের ভিতরের জিনিসগুলোর সঙ্গে মিশে থাকে এবং আক্রান্ত লোকের বা অন্য প্রাণীর মলের সঙ্গে সর্বদাই বেরিয়ে আসে।

জীবনবৃত্ত

খোলা জায়গায় জলের সংস্পর্শে অথবা অনুকূল পরিবেশে ডিমগুলি ফোটার উপযোগী থাকতে পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা-কীট বেরোয়। পরিষ্কার জলের এক বিশেষ ধরনের শামুকের ভিতরেই শূন্য বাচ্চাগুলো বড় হতে পারে। সাধারণত পরিষ্কার জলের জলাশয়ে এ রকম শামুকের বাস। কয়েক মাস পরে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে শামুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জলাশয়ের জলে ছিড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাঙাচির মত বিচরণ করতে থাকে। জলের ভিতর তারা নিজের বাসের উপযোগী গাছগাছড়া খুঁজে নেয় এবং সেসব গাছের পাতায় বা ফলে

আস্তানা গাড়ে। ক্রমশ কীটগুলো পুষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রীতিটি কীটই হচ্ছে ক্ষুদ্রাকার ভাবী-কৃমিকীট। এই বাচ্চাদেরও মুখ থাকে আহার করার জন্য ও মানুষ বা অন্য প্রাণীর অন্ত্রের গায়ে লেগে থাকার জন্য।

পারিপার্শ্বিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাচ্চা-কীট নিজের শরীর থেকে এক রকম কড়া চটচটে জিনিস বের করে, তা দিয়ে নিজেকে ঘিরে একটা আবরণ তৈরি করে এবং সেই খাপের ভিতর লুকিয়ে থাকে। কোন প্রাণীর অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে না পারলে এরা এর বেশি আর বাড়তে পারে না। জলের ভিতর যে গাছের পাতায় বা ফলে এরা বাসা বাঁধে, সেই পাতা বা ফল যদি কোন মানুষ বা প্রাণী কাঁচা খায়, তবে সেই সূত্রেই এই কীট তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পায়।

বাকলের মতে আসামে যেসব জলজ উদ্ভিদের ফল সাধারণত কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া হয়, সেগুলো হচ্ছেঃ সিয়ান্টেপা অথবা পানিকাল ('অটেলিয়া অ্যালিস্ময়েডস্'), মোকোয়া ('নিম্-ফোই লোটাস'), সিঙ্ঘারা ('ট্র্যাপা নাটান্স্'), নিখোরু ('ইউরিয়েইল্ ফেরক্স'), বাদাম ('নেলুম্বো নিউসিফেরা') এবং হেলদুক ('নিম্ফোইজাত')।

সিঙ্ঘারা, সিঙাড়া, জলিফল বা পানিফলের শাঁস লোকে খেয়ে থাকে; দাঁত ও মুখ দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে ফেলে শাঁসটা বের করে নেয়। এভাবে ছাল ছাড়াবার সময় খাদকের অজ্ঞাতেই মোড়ক-সমেত কয়েকটি বাচ্চা-কীট তার পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। একটি পানিফলের গায়ে ২০০টি পর্যন্ত কীট থাকতে পারে এবং কয়েকটি মাত্র পানিফল খেলে শরীরের ভিতরে প্রচুর সংখ্যক পোকা ঢুকে পড়তে পারে।

পেটের ভিতর চলে যাবার পরেই কীটের উপরের আবরণটা গলে যায় এবং বাচ্চা-কৃমি অবাধে চলাচল করতে পারে। নাড়িভূঁড়ির ভিতর দিয়ে চলে চলে অবশেষে কীটগুলি অন্ত্রের মধ্যে

সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে তাদের শোষণক মুখ দিয়ে আঁকড়ে লেগে থাকে। সেই অন্ত্রদেহ থেকেই খাদ্য আহরণ করে করে কীট বড় হয়ে ওঠে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ডিম পাড়তে শুরুর করে।

মানুষের দেহে

একজন মানুষের অন্ত্রে হাজারখানেক কৃমিকীট আশ্রয় নিতে পারে। মাঝে মাঝে মলের সংগে কয়েকটি বেরিয়ে যেতে পারে,—উজ্জ্বল লালচে রঙ, আকার এবং নড়াচড়া দেখেই তাদের চেনা যায়। আসামে এসব পরভোগী কৃমিকীটকে বলা হয় 'সুদা'।

কীটগুলো অন্ত্রের ভিতরের কোমল আবরণ এমন শক্ত করে কামড়ে ধরে থাকে যে, অনেক সময় তাতে গভীর দাগ পড়ে যায়। সময় সময় এ থেকে ওই-সব জায়গায় ঘা হয়, অন্ত্রের ভিতরের আবরণ ফুলে ওঠে এবং অনেক সময় সেই ঘা থেকে রক্তও পড়ে। এর ফলে পেটের ভিতর অস্বস্তি বোধ হয়, ব্যথা হয়, উদরাময় হয় এবং রক্তহীনতা দেখা দেয়। পরবর্তী অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাত, পা, পেট ও মুখ ফুলে যায়। চিকিৎসা না হলে রোগী মারা যায়। তবে ঠিকমত ধরা পড়লে এবং সুচিকিৎসা হলে, অন্ত্র থেকে কৃমিকীট একেবারে বেরিয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

সংক্রমণের সূত্র

পুকুরের বা ঝিলের জলে অনেক সময় জলিফলের বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের চাষ করা হয় এবং সেসবের পুষ্টির জন্য সার হিসাবে মানুষের মল প্রয়োগ করা হয়। সেই মলের সংগে কৃমির ডিম থাকলে তারা সেই জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশের লোকের যতট মলত্যাগের অভ্যাসও এই কীট সংক্রমণের অন্য এক সূত্র। কৃমিবাহী শূকর বা অন্য প্রাণী এদিকে-ওদিকে

চ'রে খাবার সময়ে যেখানে-সেখানে মলত্যাগ ক'রেও সংক্রমণের কারণ ঘটিয়ে থাকে। জলের মধ্যে শামুক জলজ উদ্ভিদের পাতা খায় এবং গাছের গায়ে লেগে থাকে ; সেই গাছে যেসব ফল কন্দ প্রভৃতি জন্মায়, শামুকের ভিতর থেকে কুমির ডিম সেসবের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সেই ফল বা কন্দ খাওয়ার সময় মানুষের ও শূকর বা অন্য প্রাণীর পেটে কুমির ডিম চ'লে যায়।

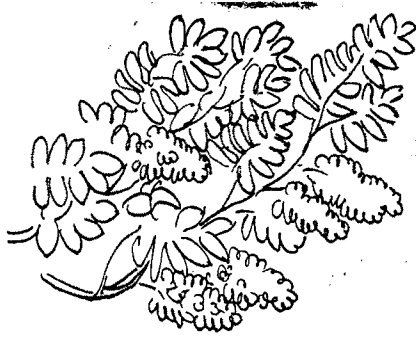
এসব কুমি শূকরের অন্ত্রে প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু এদের আক্রমণে শূকরের দেহে বিশেষ কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে না। কাজেই শূকরের পেট হচ্ছে এই কুমির নিরাপদ দুর্গ-বিশেষ। মানুষের অন্ত্রে এসব কুমির আক্রমণ মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাই মানুষকে বলা যায় এর অতিরিক্ত আশ্রয়দাতা। মানুষ আর শূকর উভয়েরই দেহে এই কুমির জীবনবৃত্ত একই পর্যায়ে চলে।

দমনের কথা

শূকরই এসব কুমির প্রধান আশ্রয়দাতা, কাজেই এই মারাত্মক কীটের দমনের ব্যাপারে শূকর সম্বন্ধেই বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। খোঁজ নিয়ে যেখানেই এই কুমির ডিম দেখা যাবে, সে

জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। মানুষের মল-পরীক্ষায় এই কুমি ধরা পড়লে চিকিৎসা করতে হবে। মল বিনষ্ট করার এমন কোন সুব্যবস্থা করা দরকার যাতে মলের সঙ্গে কুমির ডিম থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। জলজ উদ্ভিদের পৃষ্টির জন্য যদি জলে মল প্রয়োগ করতে হয়, তবে প্রয়োগ করার আগে সেই মলকে চুন প্রভৃতি বিশোধক দ্রব্য দিয়ে শোধন ক'রে নিতে হবে।

যেসব জলায় বা পুকুরে জলজ উদ্ভিদের চাষ করা হয়, তার ধারেও যেন শূকর ঝেতে না পারে তার কড়া ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের মাছ এবং উদ্ভিদের পক্ষে যেসব শামুক অপয়োজনীয়, সেগুলোকে বিনাশ করা দরকার। শূকরপালকেরা পশুচিকিৎসকের উপদেশ নিয়ে তাঁদের খামারের শূকরগুলির পেটে কুমি থাকলে তা বের ক'রে ফেলার ব্যবস্থা করবেন এবং উন্নত পদ্ধতিতে শূকরগুলির লালনপালন করবেন। কোনক্রমেই এদের জলজ উদ্ভিদ খেতে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ যখন জলিফল বা অন্যান্য জলজ ফল বা উদ্ভিদ খেতে চান, সেগুলো রান্না ক'রে খাবেন, আর কাঁচা খেতে হ'লে গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে তবে খাবেন। [১৯৫৯ অক্টোবর সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং' থেকে]



গম্যাক্ষতের আগাছা বিনাশে '২, ৪-ডি'

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় কৃষি-গবেষণ প্রতিষ্ঠানের কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে, তা ছাড়া বিদেশেও, পরীক্ষা করে নিঃসংশয়ে জানা গেছে যে, ধান্যবর্গীয় শস্যের ক্ষেতে সাধারণত বেথুয়া (চেনোপোডিয়াম আল্‌বাম), পিয়াজী (অ্যাস্‌ফোডেলাস টেনুইফোলিয়াস), হিরণ খুঁড়ি (কন্‌ভল্‌ভুলাস্‌ আর্ভোর্‌নিস্‌), পীতপাপড়া (ফিউমারিয়া পার্ভিফ্লোরা), পোহলি (কার্থামাস্‌ অক্সায়াকান্থা), কৃষ্ণনীল (অ্যানাগালিস্‌ আর্ভোর্‌নিস্‌) প্রভৃতি যেসব আগাছার উপদ্রব ঘটে, সেগুলি অতি ভালভাবে এবং কম খরচে দমন করা যায় আশ্চর্য রাসায়নিক দ্রব্য '২, ৪-ডি' (২, ৪-ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক্‌ অ্যাসিড) প্রয়োগ করে।

সকলেই জানেন যে, ফসলের উৎপাদনে আগাছা অত্যন্ত লোকসান ঘটায়। ধান্যবর্গীয় শস্যের ক্ষেত্রে আগাছার জাত, আক্রমণের ধরন, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি ভেদে এই ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৫ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত উঠতে পারে। কম করে যদি শতকরা দশ ভাগও ধরা যায় তা হ'লে এদেশে বছরে আগাছার দরুন শুল্ধ গমের চাষেই লোকসান যায় প্রায় ৮ লক্ষ টন গম—যার দাম প্রায় ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই বিপুল ক্ষতি কী করে রোধ করা যায়?

হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করার যে রীতি প্রচলিত, তার কতকগুলো অসুবিধা আছে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে আগাছা দমনে সেই অসুবিধা নেই। যেমন, খুঁড়ি বা নিড়েন-দেওয়া যন্ত্র গাছের খুব কাছে চালানো যায় না, তাতে গাছের ক্ষতি হবার ভয় থাকে। তাই পরিষ্কার করা সত্ত্বেও কিছু আগাছা ক্ষেতে থেকেই যায়; সেগুলো থেকে আবার তাদের বংশবিস্তার হয় এবং পরবর্তী চাষে উৎপাদ আবার পুরোপুরিই

দেখা দেয়। জমিতে নিড়েন দিলে অনেক সময় মাটির গভীর তলে অবস্থিত আগাছাবীজ উপর-স্তরে উঠে আসে এবং তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে নতুন আগাছা জন্মায়; সুতরাং নিড়েন দেওয়ার উদ্দেশ্যটাই কতক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়। আগাছানাশক রাসায়নিক দ্রব্য ফসলের সারিতে এবং দ্রুপ সারির মাঝের ফাঁকা জায়গাতেও প্রয়োগ করা চলে। আগাছানাশক দ্রব্যের প্রয়োগে মাটির নড়চড় হয় না, কাজেই পুরানো আগাছা মরে যাবার পরে আর নতুন আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে না।

গবেষণকর্মীরা দেখিয়েছেন যে, কাছাকাছি দুই সারিতে লাগানো ফসলের মাঝখানের মাটি খুঁচিয়ে দিলে, তাতে দ্রুপাশের সারির গাছের শিকড়ের ক্ষতি হতে পারে, তাতে ফলন কমে যাবার সম্ভাবনা। ধান্যবর্গীয় ফসল এরকম কাছাকাছি সারিতে লাগানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত রথাম-স্টেড পরীক্ষণকেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা স্যর উইলিয়াম অগ্‌-এর মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও বলেছেন যে, ক্ষেতের উপরস্তরের মাটি খুঁচিয়ে বা খুঁড়ে দেওয়া যদিও আগাছা বিনাশের পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয়, তবু তাতে গাছের শিকড়ের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, কাজেই এদিক থেকে বিবেচনায় আগাছা দমনের জন্য মাটি খোঁচানোর কাজ নিতান্ত অপরিহার্য না হলে করা উচিত নয়। সুতরাং গাছের শিকড়ের কোন রকম ক্ষতি না করে যদি সার্থকভাবে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেটাই একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

দিল্লীতে প্রদর্শন

নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষিগবেষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক কৃষি-পরিদর্শনার কাজে দিল্লী রাজ্যের

কয়েকটি গ্রামে কৃষকদের জমিতেই ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের রবি খন্দের চাষে উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ফল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই বছরই পায়ে-চালানো ছিটানো-যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে '২, ৪-ডি' এক পাউন্ড ৬০ গ্যালন জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটানো হয়েছে। ছিটানোর ছয় সপ্তাহ পরে বীজ বপন করা হয়েছে। আগাছা-গুলো যখন সম্পূর্ণ বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ ফসল কাটার প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে সেগুলো গুনে ওজন করা হয়। গমের ক্ষেতে আগাছানাশক হিসাবে '২, ৪-ডি'র কার্যকারিতা নিচের তালিকায় দেখানো হ'ল। ●

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ এই দুই বছরই নিয়ন্ত্রণের জমিতে যেখানে আগাছার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮২ আর ১৭৯, ঔষধ প্রয়োগ করা জমিতে সেখানে ২১ আর ৬। বেথুয়া আর পিয়াজি—রবি খন্দের এই দু'টো আগাছার দমনেই

এই রাসায়নিক দ্রব্যটির কার্যকারিতা খুব বেশি হ'লেও, এর প্রয়োগে পিয়াজি ঘায়েল হয় বেশি।

ঔষধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কিছু আগাছা যে মরে নি, তার মানে এ নয় যে, জিনিসটার কার্যকারিতা কিছু কম। এটা হয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যটি যে ছিটিয়েছে তার দরুন। যে আগাছাগুলো বেঁচে গেছে, ছিটাবার সময় ঔষধ তাদের গায়ে লাগে নি বা ঠিকমত লাগে নি। এমনও দেখা গেছে যে, খুব পুষ্ট আর তেজী একটি আগাছার উপর ঔষধের ক্রিয়া হয়েছে ঠিকই, তবু সেটা বিকৃত হয়ে বেঁচে আছে এবং তার বাড় গেছে বন্ধ হয়ে। এরকম আগাছা ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে কমই পারে। ঔষধ ছিটানো এবং না-ছিটানো জমির আগাছার ওজন থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, বেঁচে-যাওয়া আগাছার ওজন ঔষধ-না-ছিটানো জমির ওইরকম আগাছার ওজনের একে-বারে অর্ধেক। তারপর, বেঁচে-যাওয়া আগাছা-গুলোর মধ্যে ঘাসই থাকে বেশি—যার উপরে এই রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়া হয় না।

প্রতি চার বর্গফুটে

আগাছা	১৯৫৬-৫৭				১৯৫৭-৫৮			
	সংখ্যা		নতুন ওজন (গ্রাম্)		সংখ্যা		নতুন ওজন (গ্রাম্)	
	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রয়োগে
বেথুয়া	১৩	৪	৮২	১২	৪১	২	৯৫	৩
পিয়াজি	১৩১	১৪	৩৯৮	২২	১২১	৩	২৫৩	৩
অন্যান্য	৩৮	৩	৮১	৪	১৭	১	২৯	১
মোট	১৮২	২১	৫৬১	৩৮	১৭৯	৬	৩৭৭	৭

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

নিচের তালিকা থেকে '২, ৪-ডি'-এর ক্রিয়ায় যে উপকার হয় তা বোঝা যাবে ;

দুই বছরই শস্যের উৎপাদন গড়ে শতকরা ২০ ভাগের বেশি হয়েছে এবং চাষীর লাভ হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৩.৮ মণ এবং ২.৭ মণ।

খরচ কম

শুধু আগাছা দমন করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষেই যে '২, ৪-ডি' উপকারী তাই নয়, এ জিনিস ব্যবহারে খরচও কম পড়ে। ১৯৫৬-৫৭ সালে একরপিছু খরচ পড়েছে গড়ে ৪৫.৩৮ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৯.৯৮ টাকা। [১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং' থেকে]

সাল	প্রতি একরে গড়ে যত মণ শস্য ফলেছে	নিয়ন্ত্রণের উপর উৎপাদন বৃদ্ধি	নীট লাভ
	নিয়ন্ত্রণ ঔষধ প্রঃ	মণ শতকরা	(টাকা)
১৯৫৬-৫৭ সালে ছয়টি প্রদর্শনে গড়ে ...	১৫.৬ ১৯.৪	৩.৮ ২৪.৩	৪৫.৩৮
১৯৫৭-৫৮ সালে ২৩টি প্রদর্শনে গড়ে ...	১২.৭ ১৫.৪	২.৭ ২১.৩	২৯.৯৮



টুকিটাকি

পদ্রুলিয়ায় কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী

পদ্রুলিয়া হাটমুড়া হাইস্কুলে খাদ্যোৎপাদনের উন্নতিবিধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিত্বকালে ২রা ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্ত ঘোষ পদ্রুলিয়ায় কৃষির উন্নততর প্রথার সর্বাধা ও গুরুত্বের উপর জোর দেন।

উক্ত সভায় পদ্রুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার শ্রী এস এন রায়, আই এ এস, জেলার ব্যবস্থাপরিষদ-সদস্যগণ, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকগণ ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং তথায় বিবিধ উপায়ে সেচন এবং রাসায়নিক সার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রদ্ধা পদ্ধতিরণী-উন্নয়ন, ছোট ছোট নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক জলাধারের ব্যবস্থা করাই পদ্রুলিয়ায় সেচনকার্যের উপযোগী বিবেচিত হয়।

মন্ত্রিমহাশয় দেখিয়ে দেন যে, (১) ক্ষুদ্রসেচ, (২) নলকূপ এবং (৩) কূপ—এই যে তিন প্রকার সেচ-ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তার মধ্যে নলকূপ-পরিকল্পনাটি উক্ত জেলায় চালু করা সম্ভব নয়, কারণ তথাকার জমি প্রস্তরময়; পদ্রুলিয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য অপর দু'টি পরিকল্পনা চালু করাই ভাল।

হরিণডাংগায় কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রদর্শনী

সমিষ্ট-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ ২৪এ জানুয়ারি (১৯৬০) রবিবার হরিণডাংগায় কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ব্লক-কর্মীদের সহায়তায় স্থানীয় সমাজকর্মীরা সুদূর নিভৃত পল্লীতে এই চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। চারদিন ধরে উক্ত প্রদর্শনী চলে এবং সন্নিহিত

মন্ডপে বহুতা, সভা ও ঐ এলাকার কুটিরশিল্প-সমূহে উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে অপ্রত্যাশিত সংখ্যায় মহিলাদের সমাগম পল্লী-নারীদের জাগরণ ও দেশের সাধারণ অগ্রগতির জন্য পদ্রুতের সহিত তাঁদের সহযোগের প্রচেষ্টা সূচিত করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় দেশের বর্তমান কতকগুলি অসুবিধা ও জনগণকে সেগুলি দূরীকরণের উপায় বলেন। উক্ত অঞ্চলে এই ধরনের প্রথম এই প্রদর্শনী স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

কৃষি ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের সমিষ্ট-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ ৬ই ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার ধাপগঞ্জে একটি কৃষি ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রিমহাশয় তাঁর ভাষণে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিমহাশয় জলপাইগুড়ি জেলার ফাটাপুকুরস্থিত সমিষ্ট-উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্লকের উৎপাদন-তথ্য-শিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন।

রেশমশিল্প প্রদর্শনী

সপ্তম নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহের 'রেশম দিবস' উপলক্ষে বহরমপুর 'কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি'র প্রাঙ্গণে ৩রা ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) স্থানীয় রেশমশিল্প-বিভাগ একটি সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মূর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রী ভি এস সি বোনার্জি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জাপানী বিশেষজ্ঞ শ্রী কে তাকাহাসি। শ্রীমতী জি ব্যানার্জি প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন।

বহরমপুরের উপ-শিল্প-অধিকর্তা (রেশমশিল্প) শ্রী এস বি পাল তাঁর উদ্বেোধনীর ভাষণে রেশম-শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমবঙ্গের রেশমশিল্প-বিভাগ ও বহরমপুরের কেন্দ্রীয় রেশমশিল্প-গবেষণাকেন্দ্র এ পর্যন্ত যেসকল উন্নতি করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্ম-কল্পনাকে কার্যে পরিণত করার ফলে মর্শিদাবাদ জেলার রেশমগুটি ও কাঁচা রেশমের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রেশমশিল্প-বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষামূলক-ভাবে বিতরিত জাপানী বীজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রেশমকীট-পালকেরা উৎকৃষ্ট গুটি পেয়েছেন। এই গুটিগুলির তন্তুর দৈর্ঘ্য প্রচলিত নিস্তারী গুটির তন্তুর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণের অধিক। প্রচলিত গুটি-গুলির তন্তুর দৈর্ঘ্য ২৭৫ থেকে ৩৫০ গজের মধ্যে। এই গুটিগুলি থেকে জাত রেশমী সূতো আন্তর্জাতিক গুণসম্পন্ন হবে।

শ্রী তাকাহাসি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে রেশমশিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের বিশেষ সূযোগ আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা ও আর্থিক সহায়তা পেলে ভারতের রেশম-উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে। ভারতের রেশমশিল্প-উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কর্মে রূপায়িত করবার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-তথা-ভারতকে সকল প্রকার সাহায্য করতে তাঁর দেশ (জাপান) প্রস্তুত আছে বলে তিনি জানান।

শ্রী বেনার্জি মর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ রেশমশিল্পের অতীত ঐতিহ্য বর্ণনা করেন এবং সকলকে তুংগাছ লাগাতে ও রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবনে উন্নত শ্রেণীর রেশমকীট পালন করতে অনুরোধ জানান।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, বহরমপুরের রেশমচাষ-অধীক্ষক শ্রী জে সি মৌলিক প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণও সভায় বক্তৃতা করেন। অনুরোধনেশেষে রেশমশিল্প সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

রানীরহাটে প্রদর্শনী

সাতই ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) মেথলিগঞ্জের মহকুমা-শাসক মেথলিগঞ্জের রানীরহাটে এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বেোধন করেন। মহকুমাশাসক এবং রক-উন্নয়ন আধিকারিক তাঁদের ভাষণে কৃষি ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পের উন্নততর প্রণালী-জ্ঞাপক এই ধরনের প্রদর্শনীর গুরুত্ব জনসাধারণের নিকট বৃদ্ধি করে বলেন। প্রদর্শনীটি বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই প্রচারবিভাগের স্টলটির উচ্চ প্রশংসা করেন।

ফাঁসদেওয়ায় প্রদর্শনী

শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক শ্রী এ কে বন্দ্যো-পাধ্যায় দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসদেওয়া থানার অধীন ফাঁসদেওয়ায় ওরা ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও গবাদি পশু প্রদর্শনীর উদ্বেোধন করেন। ওখানে এইটিই এ ধরনের প্রথম প্রদর্শনী।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে পল্লী-অঞ্চলে এ রকম প্রদর্শনীর উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য বৃদ্ধি করে বলেন। তিনি খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে মন ও শক্তি নিয়োগ করার জন্য পল্লীর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

মেদিনীপুরে রেশম দিবস

মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরে সপ্তম নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ উপলক্ষে আনন্দ-পুর সমবায় তন্তুবায় সমিতি লিঃ-এর উদ্যোগে ওরা ফেব্রুয়ারি “রেশম দিবস” প্রতিপালিত হয়। মেদিনীপুরের জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন, আই এ এস, উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত রেশমজাত দ্রব্যাদির এক প্রদর্শনীর উদ্বেোধন করেন।

জেলার রেশমশিল্প-কেন্দ্র এই আনন্দপুরে তসর বাফতা, কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য রেশমবস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই এলাকায় প্রায় ৩৫০টি তাঁত চলে এবং প্রায় ১,০০০ লোক উক্ত শিল্পে নিযুক্ত

আছেন। সরকার-কর্তৃক উক্ত সমবায় সমিতিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং সরকারী সাহায্যে তথায় একটি রেশম-আড়ত স্থাপিত হয়েছে।

সভাপতির ভাষণে জেলাশাসক হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের গৌরবমুখর অতীতের কথা এবং দেশের বর্তমান অর্থনীতিতে তার ভূমিকার উল্লেখ করেন। তিনি এই শিল্পের উন্নতিতে সরকারের সাহায্য এবং প্রেরণারও উল্লেখ করেন। তিনি জনগণকে আরও বেশি করে হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানশেষে প্রচারবিভাগ কর্তৃক একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

নিখিল ভারত তাঁত সপ্তাহ

মেদিনীপুর জেলায় ৩১এ জানুয়ারি থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) পর্যন্ত সপ্তম নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। এ সম্পর্কে মেদিনীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন প্রাঙ্গণে যে উদ্‌ঘোষনী অনুষ্ঠান হয় তাতে সভানেত্রী করেন মেদিনীপুর মিলনী মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী গীতি সেন। মেদিনীপুরের জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন, আই এ এস, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে মেদিনীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ তন্তুবায়, ঘাটাল মহকুমার নিমতলা-নিবাসী শ্রী শ্রীদাম দাস উক্ত প্রদর্শনীর উদ্‌ঘোষন করেন।

মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৯১,৬৮০ জন হস্তচালিত তাঁতের কারিগর আছেন এবং লাইসেন্স-প্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা ৩০,৫৬০। তার মধ্যে ৫৯,৫২২ জন তন্তুবায় সরকারী সাহায্য নিয়ে ৩২০টি সমবায় তন্তুবায় সমিতি গঠন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-অধিকার জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে

কারিগরদের হস্তচালিত তাঁতের উন্নততর প্রণালী এবং কলাকৌশল শিক্ষাদান করছেন।

এই জেলায় হস্তচালিত তাঁতে জাত বিবিধ দ্রব্যাদির উৎপাদন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৫৩ সালে উক্ত দ্রব্যাদির পরিমাণ ছিল (আনুমানিক) ২০২ কোটি গজ এবং ১৯৫৯ সালে তা দাঁড়ায় (আনুমানিক) ৩৯৮ কোটি গজ। এইভাবে গত ছয় বৎসরে হস্তচালিত তাঁতে জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুমারগ্রামে প্রদর্শনী

কুমারগ্রাম মদন সিং উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২৩এ জানুয়ারি থেকে ২৭এ জানুয়ারি পর্যন্ত কুমারগ্রাম ১নং পর্যায় সম্প্রসারণ ব্লক কর্তৃক আয়োজিত একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন নারায়ণালি গ্রামের শ্রীশ্যামাপদ বর্মণ। উদ্‌ঘোষন-অনুষ্ঠানে মহকুমা-শাসক ও ব্লক-উন্নয়ন আধিকারিক গ্রামাণ্ডলে এরূপ প্রদর্শনীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

প্রদর্শনীটি আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তাতে প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয়। কুমারগ্রাম মহিলা সমিতি, রামপুর মহিলা সমিতি ও কানাথোগান মহিলা সমিতি প্রদর্শনীতে স্টল খুলেছিল। আলিপুরদুয়ারের শ্রুতিচাক্ষুষী সংস্থা কর্তৃক শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল। আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত কৃষি, স্বাস্থ্য ও মহকুমা প্রচার সংস্থা প্রভৃতি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে।

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী

ম্যাকউইলিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭এ জানুয়ারি থেকে ৩০এ জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্পবিভাগের একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সহস্র সহস্র দর্শক উক্ত প্রদর্শনীর উচ্চ প্রশংসা করেন। আলিপুরদুয়ারের শ্রুতিচাক্ষুষী সংস্থা কর্তৃক প্রত্যহ

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

প্রদর্শনী-স্টলের সম্মুখে শ্রুতিচাক্ষুষী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

বালিচক প্রদর্শনী

মেদিনীপুরের জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন, আই এ এস, ডেবরা উন্নয়ন ব্লক পর্যায়ে (১)-এর উদ্যোগে বালিচক ক্লাব লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তিনদিন স্থায়ী এক কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ২১এ জানুয়ারি।

শ্রী সেন তাঁর ভাষণে পল্লী-অঞ্চলে ঐরূপ প্রদর্শনীর আয়োজনের তাৎপর্য ও আবশ্যিকতা সম্পর্কে বলেন। তিনি জনগণকে প্রদর্শনী থেকে আধুনিক প্রণালী ও কলাকৌশল শিক্ষা করতে বলেন। মেদিনীপুর সদর (উত্তর)-এর মহকুমা-শাসক শ্রী সান্যাল উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী দপ্তরসমূহ ছাড়াও, সাতটি বেসরকারী সংগঠন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে আলোককেন্দ্র কর্তৃক মৌমাছি-পালনের নিদর্শন প্রদান এবং পাঁশকুড়ার মডেল নাসারির চারাগাছ ও

ফুল দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। মৎস্যচাষ, শিল্প, কৃষি, প্রচার ও স্বাস্থ্য বিভাগ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। প্রধান স্টলে প্রদর্শিত স্থানীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্পে জাত দ্রব্য, সূচিকর্ম, হস্তচালিত-তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি দর্শকসাধারণের মধ্যে প্রভূত আগ্রহের সঞ্চার করে।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে ২২এ জানুয়ারি একটি শিশু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পুরস্কারবিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন মেদিনী-পুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী এন কে বিশ্বাস, আই এ এস। কৃষি-প্রদর্শনী-দ্রব্যের জন্য ১০টি পুরস্কার ও শিল্প-প্রদর্শনী-দ্রব্যের জন্য ১৭টি পুরস্কার প্রতিযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সমাপ্তির দিনে প্রদর্শনীক্ষেত্রে নেতাজীর জন্ম-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এ আর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। নেতাজীর জনৈক স্থানীয় সহকর্মী শ্রীবিলাইচন্দ্র হাজরা ও শ্রী বিশ্বাস নেতাজীর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাস্তুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক শ্রীশ্রীভেন্দু মধোপাধ্যায় কর্তৃক মদ্রিত এবং

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।



ডাঁডের কাপড় তৈরী বেড়েই চলেছে

উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৪৭	...	...	৬ কোটি গজ
১৯৫৭	...	...	১৬ কোটি গজ

বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০
কোটি গজ তাঁতবস্ত্র উৎপাদন
বৃদ্ধি বস্তুতই একটি সুসংবাদ



পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১।	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২।	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	বাঁকুড়া	বেহালা।	২৩।	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪।	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫।	মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬।	বেলুদা (মেদিনী: দঃ)	কণ্টাই রোড।
৭। রানাঘাট	রানাঘাট	রানাঘাট।	২৭।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮।	ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড।
৮। কালি	ধাগড়াঘাট	কালি।	২৯।	তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)।
৯। অঙ্গীপুর	অঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০।	কাঁধি	কণ্টাই রোড।
১০। লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১।	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২।	বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ।
১৩। রায়কৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা ঝালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩।	ঝালদহ	ঝালদহ কোর্ট।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪।	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫।	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬।	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭।	কালিম্পাং	কালিম্পাং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮।	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯।	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০।	মাথাভাঙ্গা	মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাওয়ারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পো:—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁধি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পৈদঙ।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : নাখাডাঙ্গা।

কালের কষ্টিপাথর

অনেক কাল আগের কথা। সম্ভবত

১৬৩৮ সাল যখন সিকোনা গাছের ছাল ওষুধ হিসাবে প্রথম ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রচারও আছে এই নিয়ে। পেরুতে অবস্থিত স্পেনদেশীয় জাইসরয়-এর লী কাউন্টেন অফ চিকন এই ওষুধ সেবনে অরম্ভ হয়েছিলেন।



সিকোনা গাছের ছাল পেরু থেকে ইউরোপে চালান আসতে

আরম্ভ করে ১৬৪৭ সালে হুয়ত তারও আগে।

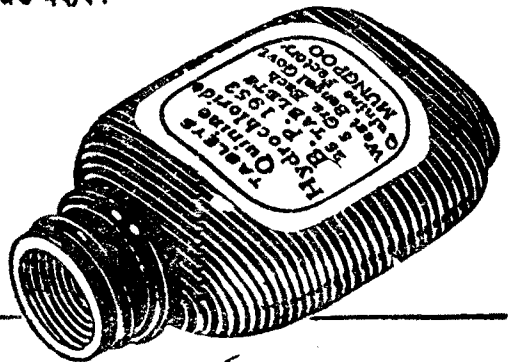
সিকোনা থেকে কুইনি-উপকারটিকে প্রথম বিপ্লিষ্ট করা হয় ১৮২০ সালে।

ভারতবর্ষে সিকোনা চাষ ১৮৬১ সালে আরম্ভ হয় আর কুইনি-ও অন্যান্য সিকোনা উপকার প্রস্তুতের ইতিহাস তার পরবর্তী সময়ে।

আজকাল বাজারে ম্যালেরিয়ার নানাবিধ সাংস্বেষিক ওষুধ পাওয়া যায় কিন্তু এই ওষুধের প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে, সেগুলি সহজেই বাজার থেকে অস্তহিত হয়। কিন্তু কুইনি-তার কথা আলাদা—বয়েক শতাব্দী ধরে সব রকম ম্যালেরিয়ার তা হুপরাইকিত প্রতিক্রিয়ক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন ধরনের ম্যালেরিয়ার কুইনি-আজও অব্যর্থ।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের

কুইনি



খাঁটি নিরাপদ ও অব্যর্থ



পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার

আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District Veterinary Officer) অথবা তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :

কলিকাতা এলাকা

চব্বিশপরগনা

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,
৬১১ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ভ্রাম্যমাণ	ঠিকানা
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক	আলিপুর
২। ঐ ..	জয়নগর
৩। ঐ ..	বজ্রবজ্র
৪। ঐ ..	ভাঙ্গড়
৫। ঐ ..	ক্যানিং
৬। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৭। ঐ ..	কাকদ্বীপ
৮। ঐ ..	মথুরাপুর
৯। ঐ ..	কুলপী
১০। ঐ ..	সাগর
১১। ঐ ..	বারাকপুর
১২। ঐ ..	দেউলপাড়া, পোঃ নৈহাটি
১৩। ঐ ..	বারাসাত
১৪। ঐ ..	হাবড়া
১৫। ঐ ..	বসিরহাট
১৬। ঐ ..	হাসনাবাদ
১৭। ঐ ..	সন্দেশখালি
১৮। ঐ ..	হাড়োয়া

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	ভাটপাড়া
২। ঐ ..	বারাকপুর
৩। ঐ ..	বসিরহাট
৪। ঐ ..	ডায়মণ্ডহারবার
৫। ঐ ..	বেহালা
৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	বারুইপুর
৭। ঐ ..	হাবড়া, পোঃ তববেড়িয়া
৮। ঐ ..	বনগাঁ
৯। ঐ ..	গাইঘাটা
১০। ঐ ..	বাগুদা
১১। কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পশু- চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট।	

বসুন্ধরা

হাওড়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া

নূতন মহাকরণভবন, চারতলা,

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা	স্থিতিবান	ঠিকানা			
১।	স্বাক্ষর	পশ্চিচিকিৎসক	সাঁতরাগাছি	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	হাওড়া	
২।	ঐ	..	ডোমজুড়	২।	ঐ	..	উলুবেড়িয়া
৩।	ঐ	..	আমতা	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয়	উলুবেড়িয়া	
					সম্প্রসারণ সংস্থা।		
				৪।	ঐ	..	বাগনান
				৫।	ঐ	..	শ্যামপুর
				৬।	ঐ	..	ডোমজুড়

কৃষ্ণনগর এলাকা

নদিয়া

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া,

পোঃ কৃষ্ণনগর

১।	স্বাক্ষর	পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	কৃষ্ণনগর	
২।	ঐ	..	বেথুয়াডহরি	২।	ঐ	..	রানাঘাট
৩।	ঐ	..	রানাঘাট	৩।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয়	ফুলিয়া,	
৪।	ঐ	..	শান্তিপুর		সম্প্রসারণ সংস্থা।	পোঃ ফুলিয়া	
						কলোনী	
				৪।	ঐ	..	চাক্দা
				৫।	ঐ	..	হাঁসখালি
				৬।	ঐ	..	রানাঘাট

মুর্শিদাবাদ

জেলা পশ্চিচিকিৎসা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ,

পোঃ বহরমপুর

১।	স্বাক্ষর	পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর	১।	স্থিতিবান পশ্চিচিকিৎসক	বহরমপুর	
২।	ঐ	..	হরিহরপাড়া	২।	ঐ	..	জিয়াগঞ্জ
৩।	ঐ	..	দমকল	৩।	ঐ	..	জঙ্গীপুর
৪।	ঐ	..	রঘুনাথগঞ্জ	৪।	ঐ	..	কান্দি
৫।	ঐ	..	ভগবানগোলা	৫।	পশ্চিচিকিৎসক, জাতীয়	বেলডাঙ্গা	
৬।	ঐ	..	ধুলিয়ান		সম্প্রসারণ সংস্থা।		
৭।	ঐ	..	নবগ্রাম	৬।	ঐ	..	বারওয়ান, পোঃ পাঁচখুপী
				৭।	ঐ	..	কান্দি
				৮।	ঐ	..	ভরতপুর

মালদহ এলাকা

মালদহ

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ,
পোঃ ইংলিশবাজার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	মালদহ
২।	ঐ ..	আইহো
৩।	ঐ ..	ওল্ড মালদহ

স্থিতিবান	ঠিকানা
১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মালদহ
২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	হরিশ্চন্দ্রপুর
৩। ঐ ..	খড়বা, পোঃ চঞ্চল
৪। ঐ ..	রত্না, পোঃ আরিয়াডাঙ্গা
৫। ঐ ..	মানিকচক্, পোঃ এনায়েৎপুর

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর,
পোঃ বালুরঘাট

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট	
২।	ঐ ..	রায়গঞ্জ	
৩।	ঐ ..	গঙ্গারামপুর	
৪।	ঐ ..	ইসলামপুর	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বালুরঘাট
২।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রায়গঞ্জ
৩।	ঐ ..	হেমতাবাদ
৪।	ঐ ..	কালিয়াগঞ্জ

শিলিগুড়ি এলাকা

দার্জিলিং

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দার্জিলিং

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং (সদর)	
২।	ঐ ..	ধুম	
৩।	ঐ ..	কাসিয়াঙ	
৪।	ঐ ..	মিরিক (কাসিয়াঙ)	
৫।	ঐ ..	ভিত্তাভ্যালি	
৬।	ঐ ..	শিলিগুড়ি	
৭।	ঐ ..	নক্সালবাড়ি	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	দার্জিলিং
২।	ঐ ..	কাসিয়াঙ
৩।	ঐ ..	কালিম্পঙ
৪।	ঐ ..	শিলিগুড়ি
৫।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	রংলি-রংলিয়াই, পোঃ তাকদা
৬।	ঐ ..	ফুলবাজার, পোঃ বিজনবাড়ি
৭।	ঐ ..	মুকিয়াপকরি, পোঃ জোড়বাংলো
৮।	ঐ ..	কালিম্পঙ

কোচবিহার

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার

ক্রমিক	ব্রাহ্মণ	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
১।	ব্রাহ্মণ পশুচিকিৎসক	কোচবিহার	
২।	ঐ ..	মেকলিগঞ্জ	
৩।	ঐ ..	মাধাভাঙ্গা	

স্থিতিবান	পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	কোচবিহার
২।	ঐ ..	তুফানগঞ্জ
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	দিনহাটা
৪।	ঐ ..	সিতাই

বসুন্ধরা

জলপাইগুড়ি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

ক্রমিক	স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
২।	এ	বীরপাড়া
৩।	এ	কালচিনি
৪।	এ	আলিপুরদুয়ার

স্বাক্ষর	ঠিকানা
১।	স্বাক্ষর
২।	স্বাক্ষর, জাতীয়
	সম্প্রসারণ সংস্থা।
৩।	এ
৪।	এ

বর্ধমান এলাকা

বর্ধমান

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান

১।	স্বাক্ষর	গুস্করা
২।	এ	মেমারী
৩।	এ	সেহারাভাঙ্গা
৪।	এ	কালনা
৫।	এ	কাটোয়া
৬।	এ	নতুনহাট
৭।	এ	আসানসোল
৮।	এ	রানীগঞ্জ
৯।	এ	দুর্গাপুর

১।	স্বাক্ষর	বর্ধমান
২।	এ	কাটোয়া
৩।	এ	কালনা
৪।	এ	আসানসোল
৫।	স্বাক্ষর, জাতীয়	ভাটার
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৬।	এ	মঙ্গলকোট
৭।	এ	শক্তিগড়
৮।	এ	গুস্করা

বীরভূম

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম

১।	স্বাক্ষর	সাঁইখিয়া
২।	এ	বোলপুর
৩।	এ	দুবরাজপুর
৪।	এ	রামপুরহাট
৫।	এ	নলহাটি

১।	স্বাক্ষর	সিউড়ি
২।	এ	রামপুরহাট
৩।	স্বাক্ষর, জাতীয়	নলহাটি
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	এ	মহম্মদাবাদ
৫।	এ	আমেদপুর
৬।	এ	বোলপুর, শ্রীনিবেশ

জুগলি

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জুগলি, চুঁচুড়া

১।	স্বাক্ষর	চুঁচুড়া
২।	এ	ত্রিবেণী
৩।	এ	শ্রীরামপুর
৪।	এ	তারকেশ্বর

১।	স্বাক্ষর	চুঁচুড়া
২।	এ	শ্রীরামপুর
৩।	স্বাক্ষর, জাতীয়	আরামবাগ
	সম্প্রসারণ সংস্থা।	
৪।	এ	খানকুল
৫।	এ	পুরস্কার, পো: চাঁপাডাঙ্গা
৬।	এ	পোলবা, পো: চুঁচুড়া

মেদিনীপুর এলাকা

মেদিনীপুর

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(উত্তর), পো: মেদিনীপুর
২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর
(দক্ষিণ), পো: কাঁথি

ক্রমিক	ব্রাহ্মাণ	ঠিকানা
১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	দাঁতন
২।	ঐ ..	মেদিনীপুর
৩।	ঐ ..	বালিচক
৪।	ঐ ..	গড়বেতা
৫।	ঐ ..	খড়গপুর
৬।	ঐ ..	তমলুক
৭।	ঐ ..	মহিষাদল
৮।	ঐ ..	নরঘাট
৯।	ঐ ..	ঘাঁটাল
১০।	ঐ ..	কাঁথি
১১।	ঐ ..	এগুঁরা
১২।	ঐ ..	ক্ষীরপাই

ক্রমিক	স্থিতিবান	ঠিকানা
১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	মেদিনীপুর
২।	ঐ ..	তমলুক
৩।	ঐ ..	কাঁথি
৪।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	ঝাড়গ্রাম
৫।	ঐ ..	ভপবানপুর
৬।	ঐ ..	পটীশপুর
৭।	ঐ ..	খৈজুরি
৮।	ঐ ..	তমলুক
৯।	ঐ ..	বিনপুর (১), পো: লালগড়
১০।	ঐ ..	বিনপুর (২), পো: বেলপাহাড়ি

বাঁকুড়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া

১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	ওন্দা
৩।	ঐ ..	বেলিয়াতোড়
৪।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৫।	ঐ ..	সোনামুখী
৬।	ঐ ..	খাতরা

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	বাঁকুড়া
২।	ঐ ..	বিষ্ণুপুর
৩।	পশুচিকিৎসক, জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা।	সোনামুখী
৪।	ঐ ..	পাত্রসায়ার
৫।	ঐ ..	রানীবাঁধ

পুরুলিয়া

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া

১।	ব্রাহ্মাণ পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	বলরামপুর
৩।	ঐ ..	মানবাজার
৪।	ঐ ..	ঝালদা
৫।	ঐ ..	কাশীপুর
৬।	ঐ ..	রঘুনাথপুর

১।	স্থিতিবান পশুচিকিৎসক	পুরুলিয়া
২।	ঐ ..	রঘুনাথপুর
৩।	ঐ ..	হুরা

কলিকাতা

- ১। পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭।
- ২। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট।
- ৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নতুন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৪। প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
- ৫। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

নদিয়া

- ১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া
- ২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া

দার্জিলিং

- ১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ

জলপাইগুড়ি

- ১। হস্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ	ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৮৮,১৬,৬০০	৬১.২৮	অন্যান্য ডা'ল	১২,৩০,৮০০	৮.৫৫
আউশ ধান	১২,৯৬,০০০	৯.০১	মোট ডা'ল	১৬,৯৮,৬০০	১১.৮১
বোরো ধান	৪১,৮০০	০.২৯	সরিষা	২,২৪,৩০০	১.৫৬
মোট ধান	১,০১,৫৪,০০০	৭০.৫৮	অন্যান্য তৈলবীজ	১,১৫,৮০০	০.৮০
ভুট্টা	১,২৫,৬০০	০.৮৭	মোট তৈলবীজ	৩,৩৯,৭০০	২.৩৬
যব	১,০৯,০০০	০.৭৬	আখ	৬০,৯০০	০.৪২
গম	১,৫৪,৭০০	১.০৭	আলু	১,১৫,৩০০	০.৮০
অন্যান্য ধান্যবর্গীয়			অন্যান্য সবজি	২,১০,৯০০	১.৪৭
শস্য	৫২,৬০০	০.৩৭	পাট	৭,৭৯,৫০০	৫.৪২
মোট ধান্যবর্গীয়			মেস্তা	১,৯২,৭০০	১.৩৪
ফসল	১,০৫,৯৫,৯০০	৭৩.৬৫	অন্যান্য	৩,৯৩,৮০০	২.৭৩
ছোলা	৪,৬৮,২০০	৩.২৬			

১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর

প্রতি একর জমিতে

২০-২৫ পাউণ্ড 'গ্যামেজেন'

ডি.০২৫ ছড়িয়ে কীটপতঙ্গের

আক্রমণ

থেকে

আপনার শস্য রক্ষা করুন।

আই, সি, আই'র

পরিবেশক

সব দোকানগুলিতেই

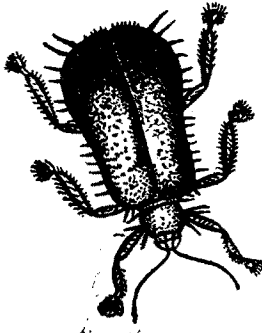
খুচরো কিনতে পাওয়া যায়। অধিক পরিমাণ প্রয়োজনের

জন্মে

এবং প্রয়োগবিধির জন্মে নিকটতম আই, সি, আই, আপিসে লিখুন।

খলির উপর অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন নিশ্চয় দেখে নেবেন ও

'গ্যামেজেন' ডি.০২৫ বিক্রেতার কাছ থেকেই কিনবেন।



IPC-400 B 32N

ইম্পিরিয়াল কেমিকেল
ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী



• সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ	৪৫১
উন্নত প্রণালীতে পাটের চাষ	৪৫৩
আমেরিকায় কৃষি-সমবায়	৪৫৮
নারীর ভূমিকা	৪৬৫
শিমুলের কথা	৪৬৭
কমলালেবু সংস্কে	৪৭০
মেস্তা ও রোসেলের দু'টি পোকা	৪৭৪
ভুট্টার চাষ	৪৭৭
কচুরিপানা	৪৭৯
মাটির কথা	৪৮১
নানা স্থানে প্রদর্শনী	৪৮৪
টুকিটাকি	৪৮৮

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (স্লাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলের সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিঘাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

দ্রষ্টব্য :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।

বন্ধুরা

১২শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা : চৈত্র ১৩৬৬

(১৮৮১-৮২ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

বছর শেষ হল। সময় এল বাৎসরিক আত্মজিজ্ঞাসার। আমাদের স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলবার জন্য গত একটি বছর কী করেছি? কতখানি এগিয়ে এসেছি এই একটি বছরে। চারিদিকে যে অগণিত সমস্যা, তার কতখানি সমাধান হয়েছে এবং আমার কর্মে—প্রতিটি ব্যক্তির চেষ্টায়, আর আমাদের কাজে—সমষ্টির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তার সাহায্য হয়েছে কতটা?

প্রধান সমস্যা আজ খাদ্যের। সারা দেশ জুড়ে সেই সমস্যা। কিন্তু তার সমাধানের ক্ষেত্র শুধু পল্লীতে। এ সমস্যার সমাধান—দেশকে খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণ করার উপায়—খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো। খাদ্য ফসলের চাষে আরও বেশি জমি লাগাবার সামর্থ্য আমাদের নেই—এ তথ্য এবং সত্য বহু আলোচিত। জমি যা আছে তাতেই ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। সার দিয়ে, সেচ দিয়ে, ভাল বীজ দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করলে, জমি থেকে সাধারণত যে পরিমাণ ফসল ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়। তা ছাড়া, জমি ফেলে রাখা চলবে না। সারা বছর ধরেই একটার পর একটা ফসলের চাষ চালাতে হবে। জলের সুযোগ থাকলে জমি থেকে বছরে চারটে ফসল তোলা যায়।

আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস হচ্ছে জমি থেকে বছরে একটি মাত্র ফসল তোলা এবং বছরের বাকি সময় জমি ফেলে রাখা। এ অভ্যাস পালটাতে হবে। এ রীতি ক্ষতিকর। চাষীভাইদের দিকে দেশ চেয়ে আছে খাদ্যের জন্য। আবার, চাষীভাইদেরও তো অর্থের অভাব। চাষে তাঁরা উৎপাদন যত বেশি

করতে পারবেন, ততই তাঁদের অর্থাত্তাব ঘুচবে। পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ভর করছে প্রধানত তাঁদেরই উপর। খাদ্য ফসলের উৎপাদন যত বাড়বে, ততই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে আর সেই-সঙ্গে পল্লীবাসীদের অর্থাত্তাব ঘুচবে, পল্লী-অর্থনীতির হবে উন্নয়ন।

ধানের চাষ বলতে সাধারণত আমরা আমন ধানের চাষই বুঝি। অথচ বছরে পরপর তিন রকম ধানের চাষ করা যায়ঃ আউশ, আমন, বোরো। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আউশ ধানের বীজ বোনা হয় আর ফসল ওঠে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আমন ধানের রোয়া লাগানো হয়, তার ফসল ওঠে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। বোরো ধানের বীজ বুনতে হয় অগ্রহায়ণ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে এবং ধান ঘরে ওঠে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। বোরো ধানকে বলা চলে রবিশস্য। একই জমিতে পরপর তিন বারই ধানের চাষ করা অবশ্য যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু ভাল জমিতে পরপর আউশ আর আমন ধানের চাষ দেওয়া চলে, এ বিষয়ে পূর্ববর্গের চাষীদের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁরা আজ পশ্চিম বাঙলার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন। এখানে এসেও যাঁরা কৃষিকাজই করছেন, তাঁদের এ বিষয়ে কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু কৃষিকাজ করার সুযোগ যাঁদের হয় নি, তাঁরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁদের আশপাশের চাষী-ভাইদের সাহায্য করতে পারেন।

এক্ষেত্রে জলের অভাব একটা প্রশ্ন বটে। চাষের কাজে সেচের জল যোগাবার ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা জাতীয় সরকার বরাবরই করে চলেছেন। তার ফলে

আজু ছোট-বড় অনেক সেচব্যবস্থা রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। যতটা ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়েছে, তার ফলে যেসব জায়গায় এখন সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে, সেসব জায়গার চাষীভাইরা তার সুযোগ গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দেই তাঁদের জমিতে অন্তত তেফসলা চাষ চালাতে পারেন। সেচ-ব্যবস্থার জন্য শুল্ক সরকারের মত্বের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। চাষীদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, সরকার সব সময়ই তাতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। অনেক জায়গাতেই চাষীভাইরা এখন সরকারী সাহায্য নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের এলাকার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সেচের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেনও।

এ বছর ইতিমধ্যেই কিছু বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং আকাশে মেঘলা প্রায় লেগেই আছে। সুতরাং জমির রস তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে না। আউশ ধানের চাষে এ সুযোগ যাঁরা গ্রহণ করছেন, তাঁদের বলব চতুর চাষী।

আউশ ধানের চাষ বোনা আর রোয়া দু'রকম প্রথায়ই করা যায়। বোনা চাষে বীজ বুনতে হয় বৈশাখ মাসে। রোয়া-চাষের জন্য বীজতলায় ধান বুনতেও হয় এই সময়ে। আমনের জমিতে যেমন গোবরসার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, প্রভৃতি সার দিতে হয়, আউশের জমিতেও তেমনি এইসব সার একই পরিমাণে দিতে হয়। বিঘাপ্রতি বীজধান বুনতে হয় ১০ সের। চারা একটু বড় হলে আঁচড়া চালাতে হয়। তাতে চারা কিছু পাতলা হয়, কিছু আগাছাও উঠে যায়। তার পরে নিড়েন দিয়ে চারা ঠিকমত পাতলা করে দিতে হয় এবং আগাছাও একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। সেই সঙ্গে জমিতে যদি কিছু ডেলামাটি থাকে, সেগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হয়। একটি থেকে আর-একটি চারার দূরত্ব ৩-৪ ইঞ্চি রাখা দরকার। এ সময়ে দুর্বল চারাগুলোও তুলে ফেলতে হবে।

ধানের কয়েক রকম মারাত্মক পোকার আক্রমণের সময় হল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। সাধারণত আউশ

ধানের ক্ষেতে এসব পোকার উপদ্রব বেশি হয়ে থাকে। কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে এসব পোকা দমন করতে হবে। কোনও রকম রোগেও যাতে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয়ে গোড়া থেকেই সাবধান থাকতে হবে। আউশ ধানেরও পরিচর্যা করতে হবে ঠিক আমন ধানেরই পরিচর্যার মত।

সময়ে বৃষ্টি না হলে ক্ষেতে জলসেচ করা দরকার। দরকার বৃষ্টি কিছুদিন পরেপরেই নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। আগাছা যদি ধানগাছের খাদ্যে ভাগ বসায় তা হলে ফসল ভাল হবে না, ফলনও হবে কম। নিড়েন দেওয়ার সময়ে গাছের গোড়ার মাটিও ঢিলে হবে, ততে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চলাবার সুবিধা পেয়ে বেড়ে ওঠে। গোড়াতে জমি তৈরি করার সময়েই গোবরসার আর দরকারমত কিছু অ্যামোনিয়াম সালফেট মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে। পরে চারা বড় হয়ে উঠলে যদি কমতেজী মন হয় তবে নিড়েন দেওয়ার সময় আরও কিছু অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া দরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সার বেশি মাত্রায় পড়লে গাছ খুব তেজী হয় কিন্তু ফলন হয় কম।

আউশ ধানের বোনা-চাষ করতে হলে, বীজতলার মাটি সার দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে বীজ বুনতে দিতে হবে। বোনা আউশের চারা রোয়া হয় আষাঢ়-শ্রাবণে এবং ধান ওঠে আশ্বিন মাসে। উভয় ক্ষেত্রেই ধান পেকে ঝরে পড়তে শুরুর করার আগেই ফসল কাটতে হবে। এ সময়ে আউশ ধানের গাছের পাতা কিন্তু অনেকটা সবুজই থেকে যায়।

খাদ্যশস্যে স্বয়ংপূর্ণ হওয়া আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং জমি যাতে খালি পড়ে না থাকে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে সচেতন হলে চাষীভাইদের বছরের অনেকটা সময় বেকার কাটাতে হবে না। আউশ ধানের চাষে আমাদের চাষীভাইদের সক্রিয় সচেতন হয়ে এমন অভ্যাস গঠন করতে হবে যাতে চৈত্র মাস এলেই আপনা থেকেই তাঁদের মনে পড়ে যায় যে, এবার আউশ ধান বোনার পালা।

উন্নত প্রণালীতে পাটের চাষ

ডক্টর হীরেন্দ্ৰকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু খাদ্য ফসলের চাষ ক'রে কোন জাতি বাঁচতে পারে না। জাতির আর্থনীতিক উন্নতির জন্য অর্থকর ফসলের চাষ করাও একান্ত আবশ্যিক। আমাদের দেশে অর্থকর ফসল হিসাবে পাট শীর্ষ-স্থানীয়।

ভারতে পাটের চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার আর উড়িষ্যায়। অন্য কোন কোন রাজ্যও এর চাষে মনোযোগ দিয়েছে কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য কোনও রকম উন্নতি দেখাতে পারে নি। পশ্চিম-বঙ্গ, আসাম এবং উড়িষ্যার জলবায়ুই বিশেষ ক'রে পাটচাষের উপযোগী। বিহারেরও বিশেষ ক'রে পূর্বাঞ্চলে এর চাষ হয়।

অবিভক্ত ভারতে পাটের চাষ হ'ত মোট প্রায় ৯৭.৫ লক্ষ বিঘা জমিতে, তার মধ্যে বাঙলাদেশেই ছিল ৮৪ লক্ষ বিঘা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের এবং আসামের গ্রীহট্ট অঞ্চলের ৭৫ লক্ষ বিঘা পাটের জমি চ'লে যায় পাকিস্তানে আর ভারতের ভাগে পড়ে মাত্র ২২.৫ লক্ষ বিঘা। কিন্তু অবিভক্ত ভারতে যত চটকল ছিল, তার প্রায় সবই রইল ভারতে। এসব কল চালু রাখার জন্য বছরে ৫০ লক্ষ গাট পাট দরকার। এ ছাড়া বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পক্ষেও ভারতে পাট অত্যাবশ্যিক ফসল। বিদেশের পাট-শিল্পের চাহিদা মেটাবার জন্য অবিভক্ত ভারত থেকে বছরে পাট রপ্তানি হ'ত ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ গাট।

সুতরাং পাটের চাষ যে আমাদের দেশে কত বেশি প্রয়োজনীয়, আমাদের চাষীভাইদের সে কথা আজ আর ব'ঝিয়ে বলার দরকার নেই। দেশের জাতীয় সরকার এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। আনন্দের বিষয়, চাষীভাইরাও ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর চাষের

ব্যাপারে তাঁরা পুরানো রীতিকেই এক রকম আঁকড়ে ধরে আছেন, এটাই দুঃখের এবং উদ্বেগের কথা। সমগ্র কৃষির ক্ষেত্রেই পুরাতন রীতিকে পরিহার ক'রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে; তা না হলে আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সন্দেহপরাহত।

পাটচাষের উন্নত প্রণালী সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে পাটের উৎপাদন বাড়বে, আঁশও ভাল হবে।

দু'রকম পাট

আমাদের দেশে দু'রকম পাটের চাষ হয়ে থাকে: তেতো পাট আর মিঠে পাট। দু'টো পাটের আকার-প্রকারে যেমন তফাত আছে তেমনি চাষের পদ্ধতিতেও পার্থক্য আছে বিস্তর। দু'রকম পাটেরই আবার বিভিন্ন শ্রেণী আছে, সেগুলোর গাছ, পাতা, শাখা-প্রশাখা, জীবনকাল, ফলন, রঙ, প্রভৃতির মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে।

পাট-উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় নিরন্তরই এবিষয়ে গবেষণা চলছে। পশ্চিম বাঙলার বারাকপুর্বে যে কেন্দ্রীয় পাট-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, এ বিষয়ে তা আমাদের গৌরবের প্রতিষ্ঠান। গবেষণার সাহায্যে সাধারণ পাটের তুলনায় অনেক বেশি ফলনদার পাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। পশ্চিম বাঙলার মাটিতে সাধারণ পাটের তুলনায় অনেক বেশি ফলন দেয় এমন যেসব পাট উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে একটা তেতো পাট হচ্ছে 'ডি-১৫৪' এবং একটা মিঠে পাট হচ্ছে 'চু'চুড়া-সবুজ' ('চিন্সুদরা গ্রীন')। আগেই বলা হয়েছে, উন্নত শ্রেণীর পাট উদ্ভাবনের জন্য দীর্ঘকাল ধরে অবিরতই গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। চাষীভাইরা নিজ নিজ এলাকার কৃষি-আধিকারিক

মহাশয়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করলেই, তাঁদের জমির উপযোগী পাট সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ পেতে পারেন।

জমি এবং আবহাওয়া

পশ্চিম বাঙলায় সাধারণত গঙ্গা এবং তার শাখা-নদীগুলির পলিমাটির অঞ্চলে পাটের চাষ হয়ে থাকে। পাটচাষের খন্দ গ্রীষ্ম আর বর্ষাকাল জুড়ে। গরম আর জোলা আবহাওয়ায় পাটগাছ ভাল বাড়ে। চাষের গোড়ার দিকে কিছুদিন অসমানভাবে অল্প অল্প বৃষ্টি হলে ভাল হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে বীজবোনা এবং তার পরের অন্যান্য কাজে ক্ষতি হয়।

প্রত্যেক বছর যে জমিতে পলি জমে, পাটচাষের পক্ষে সেই জমি খুব ভাল। এরকম জমিতে সাধারণত জলসেচ না করেই চৈত্র মাসে বীজ বোনা চলে। খুব বেলে আর খুব এংটেল মাটিতে পাটের চাষ ভাল হয় না। দোআঁশ মাটিতে পাটের গাছ ভাল বাড়ে এবং সেই গাছে আঁশও জন্মায় খুব ভাল।

মাটি তৈরি

নিচু জমিতে ধান বা জলদি রবি ফসল উঠে যাবার পর চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাটের চাষ শুরুর দরকার। মাটি গভীর করে চাষে, ভাল করে গুঁড়োতে হবে। ডেলাগুলো ভেঙে দিতে হবে। ডেলা থাকলে গাছ ভাল হয় না বলে পাট কম হয় আর আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে খুব। জমিতে ছয় থেকে আটবার আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি লাঙল চালিয়ে, যে পর্যন্ত না মাটি ভাল করে গুঁড়ো হয় এবং আগাছা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়, সেপর্যন্ত বারবার মই দেওয়া দরকার।

জমি তৈরি করার সময় বিঘাপ্রতি ২৫ থেকে ৩৫ মণ গোবরসার এবং ১ থেকে ১১ মণ খইল মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া দরকার।

বীজ বোনা

উন্নত জাতের পাটের নীরোগ ও পুষ্ট বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বাজারে ভাল বীজ পাওয়া না গেলে, সরকারী কৃষিবিভাগের স্থানীয় শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহযোগে ভাল বীজ পাওয়ার সুবিধা হবে। সময় সময় সংগৃহীত বীজগুলোর মধ্যে এমন বীজের সংখ্যা বেশি থাকে যেগুলোর অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা কম। কাজেই বোনার আগে বীজ পরীক্ষা করা দরকার। পরীক্ষা করার জন্য, সংগৃহীত বীজগুলো থেকে না বেছে একশটি বীজ তুলে নিন এবং তা ভিজে কাগজ বা রুটিং কাগজের মধ্যে দু'দিন রেখে দিন। দু'দিনের মধ্যেই বীজগুলো থেকে অঙ্কুর গজাবে। যদি সেই ১০০টির মধ্যে ৯০টির—এমনকি ৮০টির অঙ্কুর গজিয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, বীজগুলি ভাল। এরকম বীজ বিঘাপিছ দু'জমিতে লাগবে ১ সের ও ছটাক। অঙ্কুরোদগমের হার যত কম হবে, বিঘাপিছ দু'জমিতে বীজ লাগবে তত বেশি।

তেতো বা সাদা পাটের চাষ উঁচু-নিচু দু'রকম জমিতেই করা যায়। এ পাটগাছের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর গাছ ১১ থেকে দু'হাত লম্বা হবার পরে গোড়ায় জল-দাঁড়ানো সহিতে পারে। মিঠে বা দেশী পাট গোড়ায় জল-দাঁড়ানো সহিতে পারে না, কাজেই এরকম পাটের চাষ শুধু উঁচু জমিতেই করা চলে।

নিচু জমিতে বীজ বুনতে হয় চৈত্র মাসে আর উঁচু জমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বা আষাঢ়ের গোড়ার দিকে। যেসব জমিতে নদীর বানের জল আসে, সেসব জমিতে চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজবোনা শেষ করা দরকার। তা হলে জল আসার আগেই গাছ কিছুটা বড় হয়ে উঠতে পারে।

বীজ ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে। জমিতে একবার লম্বালম্বি এবং আর-একবার আড়াআড়ি বীজ ছিটাতে হয়; তা হলে বীজ সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে। বোনার পরে মই দিয়ে বীজের ওপর মাটি চাপা দেওয়া দরকার। মাটি ভালভাবে তৈরি

হয়ে থাকলে দু'তিন দিনের মধ্যেই অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে।

ছিটিয়ে না বুনে বীজ সারিতে বোনাই ভাল। তাতে বীজ কম লাগে আর ফসলের পরিচর্যা করারও সুবিধা হয়। সারিতে বীজ বোনার জন্য আজকাল আমাদের দেশেই যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, তার দামও বেশি নয়।

নিড়েন দেওয়া

বেশি পাট আর ভাল পাট পেতে হলে পাট-গাছের চারা অবস্থায় তিন রকমের পরিচর্যা করা বিশেষ প্রয়োজনঃ (১) মাটি আলগা করা, (২) আগাছা নষ্ট করা আর (৩) চারা পাতলা ক'রে দেওয়া। চারা যখন আধ হাত আন্দাজ লম্বা হয় তখন থেকে ক্ষেতে এক সপ্তাহ পরে পরে দু'বার ক'রে বিদে বা আঁচড়া চালানো দরকার। এতে চারা পাতলা হয় ও মাটি আলগা থাকে। এর পরে দশদিন অন্তর একবার ক'রে মোট দুই কি তিন-বার ক্ষেতে নিড়েন দিতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত চারাগুলি তুলে ফেলতে হবে। জমির মাটি যখন ভিজে থাকে তখন নিড়েন দেওয়া উচিত নয়। নিড়েন দেবার উপযুক্ত সময় হচ্ছে চারা যখন এক হাত লম্বা হয় তখন। চারা এমন পাতলা ক'রে দিতে হবে যাতে তেতো পাটের ক্ষেতে একটি চারা থেকে অপরটি তিন ইঞ্চি দূরে আর মিঠে পাটের ক্ষেতে চার ইঞ্চি দূরে থাকে।

রোগা চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে। রোগা গাছ থেকে সহজেই শাখাপ্রশাখা বেরোয়, কাজেই তার পাট সরল হতে পারে না ; সেই পাটের আঁশ মোটা, ছোট আর অসমান হয়। গাছ ঘন থাকলে মোটা হতে পারে না আর তার আঁশও ভাল হয় না। পাট-ক্ষেতে যাতে আগাছা না থাকে তার চেষ্টা করতে হবে সব রকমে। গাছ একটু বড় হয়ে উঠলে জমিতে ছায়া পড়ে যায়, তখন আর আগাছা বিশেষ জন্মায় না,—সামান্য যা জন্মায় তা অল্প আয়াসেই তুলে ফেলা যায়। গাছের চারা অবস্থাতেই আগাছা

পরিষ্কারে পরিশ্রম বেশি। উক্ত তিন রকমের পরিচর্যা করতে পারলে গাছগুলি বেশ মোটা ও দশ-বারো হাত লম্বা হয়, আঁশও ভাল হয়।

সার দেওয়া

পাটক্ষেতের মাটি তৈরি করার সময়েই বিঘাপ্রতি ২৫ থেকে ৩৫ মণ গোবরসার এবং ১ থেকে দেড় মণ খইল দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। নিচু জমিতে যেখানে পালি পড়ে সেখানে অ্যামোনিয়ম সালফেট বা অপর কোন রাসায়নিক সার দেওয়ার দরকার হয় না। অন্য জমিতে, গাছ যখন প্রায় এক হাত লম্বা হয় সেই সময়ে বিঘাপ্রতি আধ মণ থেকে সাতাশ সের অ্যামোনিয়ম সালফেট ছিড়িয়ে দেওয়া দরকার। এই সার বস্তার মধ্যে জমাট বেঁধে যায়, কাজেই ব্যবহারের আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে নেওয়া দরকার, তা না হলে ডেলা-পাকানো সার যেখানে যেখানে পড়বে, সেসব জায়গায় অতিমাত্রায় সার থাকার ফলে গাছগুলি ম'রে যাবে।

গাছগুলোর পাতার গায়ে জল (বৃষ্টির দরুন বা অন্যভাবে) লেগে থাকলে 'অ্যামোনিয়ম সালফেট' দেওয়া ঠিক নয় ; কারণ এই সার জলে গুলে যায় এবং পাতার গায়ে সার জলে গুলে গেলে পাতা শুকিয়ে বা প'চে যায়। কাজেই খরার দিনে গাছের গায়ে যখন জল লেগে না থাকে তখন অ্যামোনিয়ম সালফেট ছিটিয়ে দেওয়াই ঠিক। তাতে সহজেই এই গুঁড়ো-সার মাটিতে প'ড়ে যাবে। ছড়াবার সময় সার যদি পাতার উপর প'ড়ে ঝ'রে না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে গাছগুলি হাত বা পা দিয়ে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে যাতে সার মাটিতে প'ড়ে যায়। সার না দিলে যদি বিঘেপিছ দু'জমিতে ৩-৪ মণ পাট পাওয়া যায় তবে সার দিলে এবং ঠিকমত পরিচর্যা করলে পাওয়া যায় ৭-৮ মণ।

পাটগাছ কাটা

ফুল ফোটা সারা হয়ে গিয়ে যখন ফল ধরা শুরুর হয় তখনই পাটগাছ কাটার ঠিক সময়। এর আগে

কাটলে পাট সরু হয় কিন্তু ওজনে হয় কম। আবার ফল বড় হয়ে গেছে যদি এমন গাছ কাটা হয় তবে ওজনে বেশি হয় কিন্তু তার আঁশ হয় মোটা। গাছ একেবারে পেকে গেলে যদি কাটা হয় তবে আঁশ তো খুব মোটা হয়ই, তার রঙ হয়ে যায় লালচে ময়লা। ফলগুলি পূর্ণপুষ্ট হয়ে ওঠার এক সপ্তাহ আগে যদি গাছ কাটা হয় তবে আঁশ ভাল হয় আর ওজনেও বেশি হয়। পাটগাছ কাস্তে দিয়ে একেবারে গোড়ায় কেটে আঁট বাঁধতে হয়। আঁটর বেড় এক হাত থেকে দেড় হাতের বেশি হওয়া ঠিক নয়।

পাটগাছ পচানো

শুকনো জমির উপর আঁটিগুলো উপর উপর এমনভাবে সাজাতে হবে যেন গাছগুলোর ডগা বাইরের দিকে থাকে এবং এ অবস্থায় রেখে দিতে হবে দু'-তিন দিন। এর মধ্যে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যাবে। এর পরে হাতখানেক গভীর জলে গোড়া ডুবিয়ে আঁটিগুলো দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে দু'-তিন দিন। এতে গাছগুলোর গোড়ার দিকের শক্ত ছাল আগে পচতে শুরু করবে। এর পরে সব গাছের গোড়া একই দিকে রেখে আঁটিগুলো জলের মধ্যে শুইয়ে দিতে হবে। এভাবে একটা স্তর সাজানো হয়ে গেলে তার উপর আর-এক স্তর সাজাতে হবে। নিচের স্তরের গাছগুলোর গোড়া যেদিকে রয়েছে, উপর স্তরের গাছগুলোর আগা থাকবে সেইদিকে। এভাবে এই দড়টোর বেশি স্তর করা উচিত নয়। আঁটিগুলো জলের বেশি নিচে ডুবে বা উপরে ভেসে যেন না থাকে। এর পরে খড়, তালপাতা ইত্যাদি ছাড়িয়ে আঁটিগুলো ঢেকে, তার উপরে কাঠের গাঁড়ি, কলাগাছ, ইত্যাদি চাপা দিতে হবে—যেন গাছগুলি ভেসে উঠতে না পারে।

যতদিন পর্যন্ত না আঁশ সহজেই গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত পাটগাছগুলি এভাবে পচতে দিতে হবে। জলের মধ্যে পচন্ত অবস্থায়ই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—

কতটা পচেছে। গাছের অবস্থা, জলের উত্তাপ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী পাটগাছ ঠিকমত পচতে সাধারণত ১৫-২০ দিন লাগে। যে জলের মধ্যে ভিজিয়ে পাটগাছ পচানো হয় তার উপর পাটের ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। জল ঘোলা হলে আঁশ ময়লা হয়। জলে স্নোত থাকলে পাটগাছ পচতে সময় লাগে বেশি। জল অগভীর হলে আঁটিগুলো তলায় মাটিতে ঠেকে যায় এবং মাটি লেগে আঁশ ময়লা আর খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং পাট পচাবার উপযোগী হচ্ছে এমন জলা যার জল বেশি গভীর নয়, অগভীরও নয়, সেই জল হবে পরিষ্কার এবং তাতে যেন স্নোত না খেলে।

আঁশ ছাড়ানো

ঠিকমত পচলে, আঁটিগুলো তুলে নিয়ে আঁশ ছাড়াতে হবে। অভ্যস্ত লোকে একটি একটি করে গাছ থেকেই অতি দ্রুত পাট ছাড়াতে পারে। এভাবে পাট ছাড়ানো দেখবার জিনিস; পরপর প্যাঁকাটি-গুলি তীরের মত ছুটে গিয়ে একদিকে পড়ছে আর পাট থাকছে লোকাটির হাতে। কেউ কেউ একসঙ্গে কয়েকটি গাছের গোড়ার পাট ছাড়িয়ে এক হাতে কাঁঠিগুলি এবং অপর হাতে পাট ধরে এমনভাবে টান মারে যে, প্যাঁকাটিগুলি ছিটকে দূরে চলে যায় এবং পাটগুলো হাতে থাকে। এভাবে পাট ছাড়ালে প্যাঁকাটিগুলো আস্ত থাকে। কিন্তু এ উপায় বিশেষ অভ্যাস-সাপেক্ষ।

সাধারণত আঁশ ছাড়াবার যে পদ্ধতি ভাল, তা এখানে বলা হল: আঁট থেকে প্রতিটি গাছ একে একে নিতে হবে। তজনী আর মধ্যমা আঙুলের মাঝ দিয়ে চালিয়ে যতটা সম্ভব ছাল তুলে ফেলতে হবে। তারপর এক হাতে কতকগুলো গাছ নিয়ে, অপর হাতে একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে গাছগুলোর গোড়ার দিকে ঘা মেরে আঁশ আলগা করতে হবে। তারপর আঁটির সবগুলো গাছ গোড়া থেকে আন্দাজ এক ফুট উপরে ভেঙে কাঠির টুকরোগুলো ছাড়িয়ে

ফেলতে হবে। যতগুলো সম্ভব গাছের গোড়ার দিকের আঁশ একগোছা করে দু'হাতে ধরে জলার জলের উপরিভাগে আড়া মারতে হবে। সামনে ও পেছনে বারবার ঝাঁকুনি মারলে কাঠি থেকে আঁশ একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। এভাবে হাতে এক-গোছা আঁশ জমা হলে, জলের মধ্যে খুব ভাল করে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে স্রোতজলে ডাইনে বাঁয়ে বেশ করে নাড়াচাড়া করে ধুতে হবে ; এতে আঁশ থেকে সব রকম ময়লা আর ছালের টুকরো বেরিয়ে যাবে।

পাট শুকানো

ধোয়ার পরে আঁশ নিংড়ে তার জল বের করে ফেলতে হবে। তারপর রৌদ্রে আড়াআড়ি বাঁশ খাটিয়ে তাতে আঁশ বুলিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আঁশ ভাল করে শুকিয়ে যাবার পর সুবিধামত গাঁট বেঁধে বিক্রির জন্য তৈরি করে রাখতে হবে।

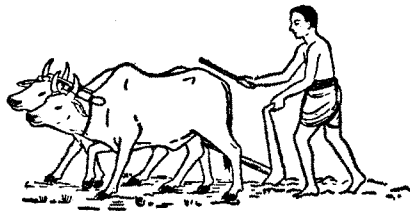
পাটের গাঁট কখনও স্যাঁতসেঁতে ঘরে বা গদুদামে রাখা উচিত নয় ; কারণ পাট সহজেই জলীয় বাষ্প শোষণ করে। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখলে পাটের ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে। পাট সম্পূর্ণ শুকোবার আগে গাঁট বাঁধলে নরম হয়ে যায়, তার রঙ খারাপ

হয়ে যায় এবং উজ্জ্বলতা কমে যায়, ফলে তার বাজারদর কম হয়। সব সময় চেষ্টা করতে হবে ভাল আঁশ জন্মাবার এবং তা বরাবর ভাল রাখার। ভাল পাট বাজারে বিক্রি হয় সহজে এবং তার দামও পাওয়া যায় বেশি।

শস্যপৰ্যায়

একই জমিতে বছর বছর একই ফসলের চাষ করা উচিত নয়। প্রতি বছর যদি জমিতে শুদ্ধ পাট বা ধানের চাষ করা হয় তবে মাটির উর্বরতা কমে যায় এবং ক্ষতিকর রোগজীবাণু ও কীট জন্মায় বেশি। তাতে ফলন কমে যাবেই।

যেখানে বর্ষা তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয় সেখানে প্রথমে পাটচাষের পরে আমনধান লাগানো যেতে পারে। এভাবে বছরে দু'টো চাষ করতে হলে প্রত্যেক বছর বিঘাপ্রতি ২৫ থেকে ৩৫ মণ গোবর-সার, ১১ মণ আন্দাজ খইল এবং আধ মণ থেকে সাতাশ সের অ্যামোনিয়ম সালফেট দেওয়া দরকার। উঁচু জমিতে বর্ষাকালে পাটচাষের পর শীতকালে ডাল আলু লঙ্কা তামাক সরষে বা গমের চাষ করা যেতে পারে। [পুনর্লিখিত]



আমেরিকায় কৃষি-সমবায়

ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা। এই কৃষিপ্রধান অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য কৃষিকার্যের উন্নয়নই প্রধান পন্থা। ভারত-সরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার বহু গবেষণা করে স্থির করেছেন যে, সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিকার্য করাতে হবে। খাদ্যসমস্যা দূরীভূত করবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন গণতন্ত্রবাদী দেশগুলিতে, বহুকাল থেকে সমবায় প্রথা কৃষির প্রচলন আছে। তাতে ফলও বেশ ভাল হয়েছে। আমেরিকায়ও কৃষি-সমবায়ের কাজ চলছে।

আমেরিকায় তিন শ্রেণীর কৃষক সমবায় সমিতি আছেঃ (১) বিক্রয় সমবায় সমিতি। এই সমিতি-গুলি কৃষক-সদস্যদের কাছে ফসল বিক্রি করে, ফসল ব্যবহারোপযোগী করে এবং বাজারে তোলে। (২) কৃষি সরবরাহ সমবায় সমিতি। এই সমিতিগুলি সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে, পাকামাল তৈরি করে এবং কৃষক-সদস্যদের আবাদে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করে। (৩) কৃষি-সহায়ক সমবায় সমিতি। এই সমিতিগুলি কৃষক-সদস্যদের গৃহদামের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, বীমার ব্যবস্থা প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজ করে।

নিজ নিজ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কাজকর্ম করে কৃষকেরা যে শুল্ক বহু টাকা বাঁচিয়েছেন তা নয়, নানাবিধ আধুনিক সুযোগসুবিধা এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেও সমর্থ হয়েছেন।

সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা কৃষকেরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণের সমতা-রক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধন এবং উৎপাদনের উন্নত পন্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হয়েছেন। এ ধরনের সহায়তামূলক কাজের দ্বারা যে কেবল কৃষক-সদস্যদের আয় বহু পরিমাণে

বেড়েছে তা নয়, উৎপন্ন জিনিসগুলির ব্যবহারকারী ক্রেতাদেরও যথেষ্ট কল্যাণ হয়েছে।

আমেরিকায় কৃষকেরা কোন আদর্শবাদের সম্মান-রক্ষার্থ সমবায় সমিতি গঠন করেন না। তাঁদের দেখতে হয় যে, সমিতিটি যেন একটি স্থায়ী কারবারে দাঁড়ায়। আমেরিকার সমিতিগুলি কৃষক-দের সহায়তা করে বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের ধরনে লাভবান হয় এবং লাভের অংশ প্রতি বছর সদস্য-কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে। কৃষকেরাও স্বেচ্ছায় সমিতিতে টাকা গচ্ছিত রাখেন এবং মূলধনের অংশ ক্রয় করেন।

কোন অঞ্চলে সমবায় সমিতি গঠন করা মনস্থ করলে সেখানে সমবায় সমিতি গঠন করা সম্ভব কিনা জানবার জন্য কয়েকজন কৃষক একটি সভা আহ্বান করেন। সমবেত কৃষকদের মধ্যে সমবায়-অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষিত হলে সেই অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন চালু করবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। এই কার্যকরী সমিতি ভবিষ্যতে আবার সভা ডেকে এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবৃতি দেন। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের অতিশয় সতর্কভাবে নির্বাচিত করতে হয়; কেননা এই সভাদের অধিকাংশকেই ভবিষ্যতে সমবায় সমিতি গঠন করবার ভার নিতে হয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেককে সমিতির কর্ম-পরিষদের সদস্য হতে হয়। পূর্বোক্ত কৃষক-সভায় সমিতি গঠনের পূর্বোই ভবিষ্যৎ সদস্যেরা সমিতির কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন।

কার্যকরী সমিতি অভ্যন্তর কী পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমবায় সমিতিতে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে অনুসন্ধান শুরুর করেন এবং রাজ্য কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের বিক্রয় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ রাজ্য বাজার পর্ষদের একজন প্রতিনিধি ও জরিপ

সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত স্থানীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধান শুরুর করেন। আমেরিকার সরকারী কৃষিবিভাগের কৃষক সমবায় সহায়ক শাখা বা সমবায় ব্যাংকের প্রতিনিধির নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ বা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

অনুসন্ধানের দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়ঃ (১) সমবায় গঠনের প্রয়োজনীয়তা, (২) সদস্যসংখ্যা কত হ'তে পারে এবং কী পরিমাণে কাজ হ'তে পারে, (৩) উপলব্ধ ফসলের বাজার কোথায়, চাহিদার পরিমাণ কত হ'তে পারে এবং কৃষকদের জন্য কী কী কাজ করতে হ'তে পারে, (৪) কী কী সুযোগ-সুবিধা কৃষকদের প্রয়োজন, (৫) মূলধনের পরিমাণ এবং কোথা থেকে তা পাওয়া যেতে পারে, (৬) অনুরূপ কারবার করতে কত খরচ হয়ে থাকে, (৭) বিশেষ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও সদস্যদের বিচারসাপেক্ষ প্রস্তাবিত কর্মপ্রণালী।

সর্বাগ্রে দেখা হয় যে, সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আর্থনৈতিক প্রয়োজন আছে কিনা। আর্থনৈতিক প্রয়োজন না থাকলে সমবায় সমিতি স্থাপনে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়।

অতি সামান্য হারে কাজ শুরুর ক'রেও অনেক সমবায় সমিতি ভবিষ্যতে সাফল্যমণ্ডিত হয় বটে কিন্তু সব সময়ে কাজের পরিমাণ এমন হওয়া চাই যাতে সমিতিগুলি নিজেদের পরিচালন-খরচা দিয়েও কিছু কিছু সঞ্চয় করতে পারে।

বিক্রয় সমবায় সমিতিগুলির গঠনকালে ভাবতে হয় যে, অন্য কোন রকম বিক্রয়-ব্যবস্থা হ'তে পারে কিনা। অনুরূপ বিক্রয় সমিতিগুলির মাধ্যমে কাজ করলে যদি ফল ভাল হবে মনে হয়, তা হ'লে সেই সমিতিগুলির সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা হয় ও বিক্রয়ের সেইসব পথগুলি আরও প্রশস্ত করা হয়। অনেক সময় বিক্রয় সমবায় সমিতিগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে নিজ নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করে।

কাজের পরিমাণ স্থির ক'রে নিয়ে বিক্রয় সমিতি-গুলি তখনকার মত প্রয়োজনীয় এবং ভবিষ্যতে

কাজ বাড়লে যা দরকার হ'তে পারে এই রকম কল-কবজা ও সরঞ্জাম ক্রয় করে। কিন্তু বোর্শী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কিনে বিক্রয় সমিতির টাকা অথবা যাতে আবদ্ধ না হয়ে যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। বেশি কলকবজা কিনতে হ'লে ইঞ্জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়। বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি না কিনে সেগুদলি লীজ বা দীর্ঘমেয়াদী ভাড়া নিলে চলতে পারে কিনা তাও চিন্তা করতে হয়।

বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করবার পর বিক্রয় সমবায় সমিতির মূলধনের কথা চিন্তা করতে হয়। সদস্যদের অবশ্য কিছু কিছু অর্থ সমিতির কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়। তাঁরা সমিতির মারফত যত বেশি টাকা খাটাবেন তাঁদের সমিতির উদ্দেশ্যে সফল করবার দায়িত্বজ্ঞান ততই বাড়বে এবং বাইরে থেকে টাকা ধার করবার প্রয়োজন সেই পরিমাণে কমে যাবে। কিন্তু সদস্যদের টাকায় সমিতির সব প্রয়োজনীয় সম্পত্তি ও সরঞ্জাম কেনা যায় না, বাইরে থেকেও টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্থানীয় সাধারণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলি থেকে এই অতিরিক্ত টাকা ধার করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত কার্যকরী সমিতি সমবায়ী কাজের পক্ষে উপযুক্ত ব্যাংকের নাম সমবায় সমিতির সদস্যদের কাছে সুপারিশ করেন। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হয় যে, সমবায় সমিতির স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৬০ টাকার বেশি ব্যাংকগুলি ধার দেয় না; বাকি টাকা সদস্যদের দিতে হয়। তা ছাড়া দৈনন্দিন কাজ চালাবার মূলধনও সদস্যদের সমবায় সমিতিতে জমা রাখতে হয়।

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যেসমস্ত দলিলপত্র তৈরি করতে হয়, সেগুলি ভাল উকিলের দ্বারা লিখিয়ে নেওয়া হয়। সমিতিটিকে মার্কিন সরকারের দফতরে 'ইনকরপোরেট' ক'রে নেওয়া উচিত; অবশ্য তা না ক'রেও সমিতি চালানো যায়। 'ইনকরপোরেট' ক'রে নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হয়। তাতে

সদস্যদের সমিতির ঋণের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে না।

‘ইনকরপোরেটেড’ সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে অথবা সার্টিফিকেট দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। শেয়ার বহু রকমের হতে পারে, যেমন—সাধারণ শেয়ার, প্রেফার্ড শেয়ার, ‘এ’ ক্লাস শেয়ার, ‘বি’ ক্লাস শেয়ার প্রভৃতি। সাধারণত কোন সমিতিতে দু’শ্রেণীর বেশি শেয়ার চালানোর প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সমিতিতে সাধারণ শেয়ার কেবল সমিতির সদস্যপদ সূচনা করে; প্রেফার্ড শেয়ার থেকে বোঝা যায় সদস্য মূলধন বাবত সমিতিকে কত টাকা দিয়েছেন। প্রেফার্ড শেয়ার আবর্তমান তহবিল হিসাবে সদস্যদের কাছে বিক্রি করা হয় এবং টাকা ফেরত দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ঐ শেয়ার ফেরত নেওয়া হয়। সমিতির অধিকর্তারা প্রতি বছরে এই শেয়ারগুলির জন্য সদস্যদের ডিভিডেন্ড বা লাভের অংশ দেন।

যে সমবায় সমিতিগুলি সার্টিফিকেট দিয়ে সদস্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে তাদেরও একটি আবর্তমান তহবিল থাকে। এই তহবিলও সমিতির মূলধনের একটি অংশ। সদস্যদের টাকা ফেরত দিয়ে সার্টিফিকেট ফেরত নেবার নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং এই আবর্তমান তহবিল থেকে টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট ফেরত নেওয়া হয়। সার্টিফিকেটগুলিকে নানা নামে অভিহিত করা হয়, যেমন—সুদের সার্টিফিকেট, ঋণের সার্টিফিকেট, টাকা খাটানোর সার্টিফিকেট ইত্যাদি। সার্টিফিকেটগুলির জন্য পূর্বনির্দিষ্ট হিসাবে সুদ দেওয়া হয় অথবা প্রতি বছরে সমিতির কর্মপরিষদ কী হারে সুদ দেওয়া হবে তা স্থির করেন। শেয়ার বা সার্টিফিকেটগুলির মূল্য যথাসম্ভব কম করা হয়। কম মূল্যের শেয়ার বা সার্টিফিকেট সহজে কেনা যায় ও হস্তান্তরিত করা যায় এবং সমিতির পক্ষেও যথাসময়ে মূল্য ফেরত দিয়ে শেয়ার ফেরত নেওয়া শক্ত হয় না।

আমেরিকাবাসীদের মতে সমবায় সমিতি গঠনকালে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পরিমিতভাবে কাজ শুরুর

করা উচিত। কেননা, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনমত খরচের মাত্রা বাড়ানো যায়। প্রথমেই খুব বড় করে সমিতি গঠন করলে এবং বেশি কাজ না থাকলে কর্মচারী ছাঁটাই করে সমিতিটিকে ছোট করা শক্ত হয়ে পড়ে। কতকগুলি বিক্রয়-সমবায় সমিতি আবর্তমান মূলধন সংগ্রহের নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে। কৃষক সদস্যরা উৎপন্ন ফসল বিক্রয়-সমবায় সমিতিতে পাঠালে সমিতি সেগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রি করার খরচ তো কেটে নেয়ই, অধিকন্তু আরও কিছু কিছু কেটে সদস্যদের নামে জমা রাখে। বছরের শেষে বিক্রয়-সমিতি সেই জমানো টাকা সদস্যদের শেয়ার অথবা সার্টিফিকেট দিয়ে শোধ করে। এইভাবে আবর্তমান মূলধন গঠিত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা হলে প্রথমে যে সদস্যদের টাকা কেটে রাখা হয়েছিল তাঁদের টাকা ফেরত দিয়ে সমিতি তাঁদের কাছ থেকে শেয়ার বা সার্টিফিকেট ফেরত নেয়। বছরের পর বছর এইভাবে কাজ চলে এবং সমিতির আবর্তমান মূলধন বজায় থাকে।

আমেরিকায় কতকগুলি কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতিও আবর্তমান মূলধন গঠন করে। সদস্যদের বাজারদরের অনেক কমে জিনিসপত্র সরবরাহ করার শক্তি বা উপায় থাকা সত্ত্বেও কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতি সেগুলি সদস্যদের ন্যায্য বাজারদরে সরবরাহ করে। এর স্বারা অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি না হয়ে পণ্যের দরের সমতা রক্ষা হয় এবং কৃষি-ফসলের আর্থনীরতিক অবস্থায় মন্দা দেখা দেয় না। প্রতি সদস্যকে বেশি দরে মাল সরবরাহ করার জন্য সরবরাহ সমবায় সমিতি তাঁর কাছ থেকে যে বেশি টাকা নেয় তা সমিতির খাতায় তাঁর নামে জমা রাখা হয় এবং বছরের শেষে তাঁকে অনুদ্রুপ মূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এইভাবে সরবরাহ সমিতির আবর্তমান মূলধন গঠিত হতে থাকে। আবর্তমান মূলধনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়লে বাজার সমবায় সমিতিগুলি যেভাবে সদস্যদের টাকা ফেরত দেয়, সরবরাহ সমিতিগুলিও সেই পন্থা অবলম্বন করে।

বছরের শেষে আমেরিকার প্রায় প্রতি সমবায় সমিতি সদস্যদের ডিভিডেন্ড বা সুদ দেবার আগে লাভের একটি অংশ একটি পৃথক তহবিলে রাখে—দুর্দিনে বা হঠাৎ প্রয়োজনে এই তহবিলে হাত দেওয়া হয়। এই তহবিলকে সংরক্ষিত (রিজার্ভড) তহবিল বলা হয়। কোন কোন সময়ে সমিতির এই পৃথক তহবিল থেকে টাকা খরচ করার প্রয়োজন হয় না এবং সংরক্ষিত তহবিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা জমে যায়। তখন কর্মপরিষদের সদস্যদের মতানুসারে অপ্রয়োজনীয় টাকা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

সংরক্ষিত তহবিল, লভ্যাংশ, সুদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করার পরও যদি লাভের টাকা বাঁচে, তা হ'লে সে টাকা সময়মত সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। লাভের তহবিল থেকে সমিতির প্রারম্ভিক মূলধন সদস্যদের ফেরত দিতে সচরাচর প্রায় পাঁচ বছর লাগে। এইভাবে ১৯৫১ সালে গঠিত একটি সমবায় সমিতি ১৯৫৬ সালে লাভ থেকে ৬ হাজার ডলার সদস্যদের দিতে সমর্থ হয়েছিল। সেই সমিতিটি ১৯৫৭ সালে ৪ হাজার ডলার ও ১৯৫৮ সালে ৫ হাজার ডলার সদস্যদের দিয়ে তাঁদের প্রদত্ত প্রারম্ভিক মূলধন সম্পূর্ণ ফেরত দিতে পেরেছিল।

কোন সমবায় সমিতির কিছুকাল লোকসান হ'তে থাকলে উপরি-উক্ত আবর্তমান মূলধন সংরক্ষিত তহবিল গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আমেরিকার বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতিগুলির কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে এক ধরনের বাঁধাবাঁধ নিয়ম থাকতে পারে না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমবায় সমিতি নিজ নিজ সুবিধা ও প্রয়োজনমত কাজ করে থাকে। তবে ভবিষ্যতে বেশি দাম পাওয়া যাবে মনে করে বিক্রয় সমবায় সমিতিগুলি মাল ধরে রাখে না—কেননা বাজার পড়ে গেলে তাতে লোকসান হ'তে পারে। কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতিগুলি দেখেশুনে ভাল মাল বেছে নিয়ে কৃষক-সদস্যদের সরবরাহ করে।

আমেরিকায় কতকগুলি বিক্রয় সমবায় সমিতির কাজ হ'ল ওখানকার ইক্ষু-সমবায়ের মত শুল্ক দর কষাকষি করা এবং জিনিসপত্রের উপযুক্ত দাম বেঁধে দেওয়া। এই সমিতিগুলি মধ্যবর্তী ক্রেতা-দের বাদ দিয়ে সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্য দোকানে বা কারখানায় বিক্রির ব্যবস্থা করে এবং সেইজন্য সদস্যরা কিছু বেশি দাম পান।

আমেরিকার অপর কতকগুলি বিক্রয় সমবায় সমিতি, যথা—গৃহপালিত পশু বিক্রয় সমবায় সমিতি, কিছু কমিশন নিয়ে সদস্যদের পণ্য বিক্রয় করে। এই সমিতিগুলিও পরে সঞ্চিত অর্থ খরচ বাদ দিয়ে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

আমেরিকার কতকগুলি বিক্রয় সমবায় সমিতি আমাদের পশ্চিম বাঙলার আড়তদারি কারবারের মত। সদস্যরা মাল বা ফসল সমিতিতে বিক্রি করতে দিলে সমিতি সেই সময়কার বাজারদরের ভিত্তিতে তাঁদের কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে দেয়। পরে মাল বিক্রি হয়ে গেলে হিসাব করে খরচ প্রভৃতি কেটে নিয়ে বাকি টাকা সদস্যদের দেওয়া হয়। এই প্রথা সমিতি ও সদস্যরা পছন্দ করেন, কেননা প্রতিদ্বন্দ্বীরা বৃদ্ধিতে পারে না যে, শেষ পর্যন্ত কী মূল্য সদস্যরা পাবেন।

আমেরিকায় সব রকমের সমবায় সমিতির কর্মপরিষদের সদস্যরা সমিতিগুলির খরচ যথাসম্ভব কম করতে চেষ্টা করেন।

আমেরিকায় কৃষকেরা একযোগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সুবিধা অনেক—এই তথ্য বৃদ্ধিতে পেরে নিজ নিজ অঞ্চলে কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠন করেছেন। এই সমিতিগুলির মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে: (১) কৃষিকার্য চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাসম্ভব কম দরে কেনা, (২) উৎকৃষ্ট মাল কেনা, (৩) অহিতকর ও ব্যয়সাধ্য পন্থা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত সাহায্য পাওয়া।

এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী হ'লে কৃষকদের খরচ কমে এবং উৎপাদনও বাড়ে।

আবাদগুদুলির প্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করবার জন্য আমেরিকায় বহুসংখ্যক কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। পুরাতন কতকগুলি সমবায় সমিতি কৃষক-সদস্যদের অনুরোধে কৃষি-সাহায্য বিভাগ খুলেছে।

আমেরিকার ১৯৫৬-৫৭ সালের কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতিগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) প্রায় ৩,৩৫০টি কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতি কৃষকদের সাহায্য করত এবং তার মধ্যে কতকগুলি সমিতি কৃষিজাত ফসল বিক্রির কাজও করত।

(২) ৪,০৫০টি বিক্রয় ও সহায়ক সমবায় সমিতি, যেমন—তুলা-পেঁজা সমবায় সমিতি, মাল-উভোলন সমবায় সমিতি প্রভৃতি সমিতিগুলি অবসরসময়ে কৃষিসরবরাহ সমিতির কাজও করেছে।

(৩) উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমবায় সমিতির মধ্যে ৬০টি মান্ডলিক কৃষি-সরবরাহ সমিতি ও ১৪৫টি মান্ডলিক বিক্রয় সমবায় সমিতি ছিল যেগুলি বিভিন্ন স্থানে মালগুদাম স্থাপন করে কৃষক-প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী-প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং নিজ নিজ সমিতির অন্তর্ভুক্ত সহায়ক সমবায় সমিতি স্থাপন করে মদ্যাত কৃষকদের অভাব মোচন করেছে।

খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে উপরি-উক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭,৪০০টি কৃষক সমবায় সমিতি ১০,০০০ সাহায্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মদ্যাতভাবে কৃষকদের সাহায্য করেছে।

(৪) স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলির মালিকানায় গঠিত ১৩০টি মান্ডলিক সমবায় সমিতি পাইকারী ব্যবসায়ী হিসাবে আবাদগুদুলিতে ফসল উৎপাদনে সহায়তা করেছে এবং পণ্য ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। এই সমিতিগুলির মধ্যে ৮৫টি ছিল কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতি এবং ৪৫টি বিক্রয় সমবায় সমিতি। এইসব মান্ডলিক সমবায় সমিতির অনেকগুলি যেসমস্ত পণ্য নিয়ে কারবার

করেছে তার অধিকাংশই নিজেরা উৎপাদন করেছে বা ব্যবহারোপযোগী করেছে। কতকগুলি মান্ডলিক সমবায় সমিতি ফসফেট, বীজ, 'ক্লুড' তেল প্রভৃতিও উৎপাদন করেছে।

(৫) ১২টি জাতীয় সমবায় সম্মেলন—যেগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল মান্ডলিক সমবায় সমিতিগুলি। এই সমবায় সম্মেলনগুলি কতকগুলি বিশেষ পণ্য ক্রয় করত বা তৈরি করত।

আমেরিকার কৃষকেরা সর্বশ্রেণীর সমিতিগুলিতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭০ কোটি ডলার খাটাতেন।

১৯৫৬-৫৭ সালে আমেরিকার আবাদগুদুলিতে যে ২০ কোটি ডলার মূল্যের জিনিসপত্র সরবরাহ হয়েছিল তার কত শতাংশ এইসব সমবায় সমিতির মাধ্যমে করা হয়েছিল তা নিম্নলিখিত সারণি থেকে বোঝা যায় :

দ্রব্য	মোট সরবরাহের কত শতাংশ	সমবায় সমিতি সরবরাহ করেছে
খাদ্য	৫৭.৫	৪,৪০২
প্রেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্য	২৪.৭	২,৭৩৯
রাসায়নিক সার	১২.৮	৪,০১১
বীজ	৪.৭	৩,৬৮৬
কৃষির যন্ত্রপাতি ও বিবিধ		
সরঞ্জাম	৩.৩	১,৮৫১
গৃহ-নির্মাণের উপাদান	৩.৮	১,৪৬৭
পিচকারি এবং গুঁড়ো	১.৯	২,১৪৮
আধার	১.৩	১,১২০
সাধারণ উপকরণ	১০.০	৪,৪৭৯

আমেরিকার কৃষি-সরবরাহ সমিতিগুলির নিম্ন-লিখিত বিশেষত্ব সাধারণত দেখা যায় :

(১) কৃষক-সদস্যরা সমিতিগুলি পরিচালনা করেন বলে প্রত্যেক সমিতি কী পরিমাণ কাজে হাত দেবে সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেন।

(২) প্রত্যেক সদস্যের সমিতির ব্যাপারে একটি-মাত্র ভোট থাকে—তা তিনি যত টাকাই সমিতি মারফত খাটান না কেন, বা যত টাকার মালপত্র কিনুন না কেন। কাজেকাজেই সমিতিটির পরিচালনায় সব সদস্যেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব থাকে।

(৩) যে-কোন কৃষি-সরবরাহ সমিতির বছরের শেষে সদস্যদের খাটানো টাকার উপর শতকরা ৮ টাকার বেশি লভ্যাংশ বা সুদ দেওয়া নিষিদ্ধ। সচরাচর সমিতিগুলি সদস্যদের শতকরা ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দিয়ে থাকে।

(৪) যারা সমিতিতে টাকা খাটান সেইসব মালিক-সদস্যরা সচরাচর সমিতির পণ্যদ্রব্যের খুব বেশি অংশ কেনেন না।

(৫) অন্যান্য কারবারের মত সমিতিগুলিকে লাইসেন্স ফী, সম্পত্তি-কর, আয়-কর প্রভৃতি দিতে হয়।

(৬) পাঁচ থেকে এগার জন পর্যন্ত কৃষক-সদস্য প্রতি সমিতির কর্ম-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হ'তে পারেন। তাঁদের কর্মকাল আবর্তনভিত্তিতে দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সুতরাং প্রতি বছর সমস্ত সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত হ'তে হয় না।

(৭) প্রতি সমবায় সমিতিতে দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য ও পরিচালক-সদস্যদের নির্দেশ কার্যকরী করবার জন্য একজন কর্মসিচিব নিযুক্ত হন। তিনি সমিতির সুপরিচালনার জন্য সদস্যদের কাছে দায়ী থাকেন।

আমেরিকার কৃষি-সরবরাহ সমবায় সমিতিগুলি সাধারণত কীভাবে কাজ করে তার উদাহরণস্বরূপ একটি সমিতির বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল। সমিতিটি একটি জনবহুল শহরের উপকণ্ঠে রাজপথের উপর অবস্থিত এবং ৭০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সমিতি ১২০ ফুট × ৭ ফুট একটি বড় গুদাম নিজ অফিসবাড়ির কাছে রেলপথ 'সাইডিং'-এর ধারে তৈরি করেছে যাতে মালপত্র রেলগাড়ি থেকে সমিতির গুদামে সহজে নামিয়ে নেওয়া যায়।

সমিতির বাড়ির সামনের দিক দু'ভাগে বিভক্ত—একটি অংশে দফতর ও অপরিষ্কৃত মালপত্রের প্রদর্শনী আছে। রাস্তার দিকে গাড়িতে মাল বোঝাই করবার জন্য একটি উচ্চ পাটাতন বাঁধানো আছে যেখান থেকে মালপত্র গাড়িতে বা লরিতে বোঝাই করা হয়।

দফতরের সাজসরঞ্জাম ছাড়া সমিতি কতকগুলি ওজন করার যন্ত্র, খাদ্য-সরবরাহকারী লরি এবং খাদ্য চূর্ণ করবার কল রেখেছে।

রেলপথের পাশে সমিতি একটি পাইকারি পেট্রোলিয়ম স্টেশন স্থাপন করেছে এবং তিনিটি লরির দ্বারা পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি কৃষকদের সরবরাহ করে। তা ছাড়া খাদ্য, বীজ, দড়ি, টোনসুতা, রঙ, আবাদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ সমিতি সদস্যদের সরবরাহ করে।

স্থানীয় ছোট সমবায় সমিতিগুলি কোন না কোন পাইকারি সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের ৯০ শতাংশ মাণ্ডলিক পাইকারি সমবায় সমিতি অথবা রাজ্য সমবায় সমিতির কাছে ক্রয় করে। ছোট সমবায় সমিতি-গুলি পাইকারি সমিতির লাভের অংশ নিজ নিজ ক্রয়ের অনুপাতে পায়।

কৃষকেরা সমবায় সমিতির গুদাম থেকে সাধারণ জিনিসপত্র নিজ নিজ লরি বা মোটরগাড়ির দ্বারা নিয়ে যায়। শুধু পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্য ও কতক ক্ষেত্রে খাদ্য ও রাসায়নিক সার কৃষকদের খামারে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। উপরি-উক্ত কৃষি-সরবরাহ সমিতি ১৯৫৬ সালে প্রায় ৪ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল বিক্রি করে এবং ১৬ শতাংশ মোট লাভ করে। খাদ্য চূর্ণ করা ও মাল পৌঁছিয়ে দেওয়া বাবত আরও এক শতাংশ লাভ হয়। খরচ-খরচা বাবত ১৪ শতাংশ বাদ দিয়ে সমিতির তিন শতাংশ পাকা লাভ হয়। যে পাইকারী সমবায় সমিতির কাছে মাল ক্রয় ক'রে থাকে তার কাছ থেকে উক্ত সমিতি বছরের শেষে ক্রয়ের ফেরতা টাকা বাবত আরও দু' শতাংশ পায়। কাজেই সমিতির খরচা বাদ দিয়ে লাভ হয় পাঁচ শতাংশ। বছরের শেষে সমিতির সদস্যরা প্রতি ১০০ ডলার মূল্যের পণ্য ক্রয় করার

জন্য ৪ ডলার থেকে ৩-৭৫ ডলার পর্যন্ত ফেরত পায়।

এই সমিতি পঁচিশ বছর যাবত কাজ করেছে এবং তার মূলধন ক্রমে বেড়ে আশি হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলি ও অন্যান্য খুচরা কারবারগুলির জন্য মাণ্ডলিক সমবায় সমিতিগুলি মাল কেনে ও তৈরি করে বটে কিন্তু কৃষকেরা সেগুলিরও মালিক।

১৯৫৭-৫৮ সালে আমেরিকায় কী রকমের এবং কতগুলি সমবায় সমিতি ছিল নিচে তার বিবরণ দেওয়া হলঃ

১৯৫৭-৫৮ সালে আমেরিকার সমবায় কৃষিগুলির মোট সংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষ।

(১) বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি

	১৯৫৭	১৯৫৮
মোট সংখ্যা	৯,৮৭৬	৯,৮৭৬
সরবরাহ সমবায় সমিতি	৩,৩৭১	৩,৩৭১
বিক্রয় সমবায় সমিতি	৬,৫০১	৬,৫০১
সদস্য সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	৭৬	৭৭
বছরে কত টাকার কাজ করেছে (কোটি হিসাবে)	১,০৩৫.৯	১,৩৫০

(২) বিদ্যুতীকরণ সমবায় সমিতি

১৯৫৭-৫৮ সালে আমেরিকার প্রতি ১০০টি, খামারের মধ্যে ৯৫টি খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে ; ১৯৩৪ সালে ১০০টি খামারের মধ্যে মাত্র ১১টিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যুতীকরণ সমবায় সমিতিগুলি ১৫ লক্ষ মাইল বিদ্যুৎবাহী তার যোজনা করেছে এবং ৪৫ লক্ষ খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। ১৯৫৭ সালে প্রতি মাসে প্রত্যেকটি খামারে প্রায় ২৯১ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি খরচ করা হয়।

(৩) সেচ, ভূমিরক্ষা, গো-মহিষাদি, ষণ্ডপালন, গবাদির চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমবায় সমিতি

মোট সমিতি-সংখ্যা	...	৯,৩৭৪
সদস্য-সংখ্যা	...	১,৪০,০০০

(৪) বাঁমা সমবায় সমিতি

মোট সমিতি-সংখ্যা	...	১,৬৫০
সদস্য-সংখ্যা	...	৩০,০০,০০০

(৫) ঋণদান সমবায় সমিতি

মোট সমিতি-সংখ্যা	...	৫৫০
সদস্য-সংখ্যা	...	১,৩০,০০০



নারীর ভূমিকা

শ্রীমতী বকুল ঘোষ

ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব কায়েম করতে গিয়ে প্রথমেই যে কাজটি করেছিল সেটি হ'ল পল্লী-অর্থনীতির ধ্বংসসাধন। তারা বুদ্ধেছিল ভারতবর্ষের পল্লী-অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারলেই এদেশে সাম্রাজ্যবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাবে। কারণ তারা অনুভব করেছিল পল্লী-অর্থনীতিই ভারতবর্ষের আসল স্নায়ুকেন্দ্র।

ইংরেজের এই কৌশল কিন্তু গান্ধীজি ধরে ফেলেছিলেন। তাই “কুইট ইন্ডিয়া” মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের রতপালনও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি জানতেন গ্রামবহুল ভারতের পূর্ণ স্বরাজ মানে একমাত্র ইংরেজ চলে-যাওয়া নয়, পূর্ণ স্বরাজের অর্থ পল্লীপ্রাণ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; পল্লী-অর্থনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটানো। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজির গ্রামে ফিরে-চলার ডাক ঐতিহাসিক আহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথও এ কথা বলেছেন। তাঁর বহু রচনায় এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে অনেক বার। নগর-সভ্যতার প্রলোভন ত্যাগ করে তাই তিনি পল্লী-পরিবেশে গিয়ে রচনা করলেন শান্তিনিকেতন—যা আজ সারা ভারতের তীর্থস্থান।

স্বাধীনতার পর নানা সমস্যা আমাদের বিরত করেছে। সরকার বিজ্ঞতার সঙ্গে অনুভব করেছেন—আর্থনীতিক পুনর্গঠন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নতি অসম্ভব। তাই স্বাধীনতার এক যুগের মধ্যেই দু'-দু'টো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ সমাপ্তপ্রায়, এবং তৃতীয় পরিকল্পনারও প্রস্তুতি চলছে।

অসংখ্য-সমস্যাাকীর্ণ এই বিশাল দেশের আর্থ-নীতিক পুনর্গঠন মূলত সাফল্যলাভ করবে পল্লী-অর্থনীতির উন্নতির মধ্যে। পল্লী উপেক্ষিত

হ'লে কিংবা অনুন্নত থাকলে তিনের উপর তিরিশটি পরিকল্পনাও দেশকে উন্নত করতে পারবে না।

তবে আনন্দের কথা, সরকার যোগ্য এবং নৈষ্ঠিক দৃষ্টি পল্লী-উন্নয়নের প্রতি রেখেছেন। একদিকে যেমন ভারি এবং বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠছে, তেমনি অন্য দিকে পল্লীর ছোট ছোট কুটিরশিল্পের প্রয়োজনও ঘটছে। একদিকে যেমন বড় বড় খামারের পরিকল্পনা চলছে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ কৃষকরা তাঁদের নিজস্ব জমিতে সরকারী বীজ, সার ও অন্যান্য নীতি-নির্দেশের সহায়তায় কৃষি-ব্যবস্থাকে উন্নত করে চলেছেন।

মহৎ চেষ্টা-মাত্রই সার্থক হয় না। তাকে রূপায়ণের যোগ্যতা থাকা চাই। নইলে সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হ'তে পারে। পল্লী-অর্থনীতি সার্থক এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখন—যখন পল্লীবাসীরা যোগ্যতার সঙ্গে সেই নীতিকে রূপায়িত করবেন—তার আগে নয়।

আপাতত এ প্রসঙ্গে পল্লী-নারীদের ভূমিকার কথাই বলছি।

শিক্ষাদীক্ষায় পল্লী-নারীরা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকে না। তাঁরা সীমিত পরিবেশে অনাড়ম্বর জীবন বহন করে চলেছেন। সুতরাং ভারতের বিরাট কর্মযজ্ঞশালায় উন্নয়নমূলক কী কী কাজ চলছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাঁদের না থাকাই স্বাভাবিক। কিংবা এই বিশাল কর্মযজ্ঞনায় যে প্রত্যেকেরই অংশ-বিস্তার অংশগ্রহণ করার অবকাশ আছে—এ-কথাটি না বুঝলেও তাঁদের দোষ দেবার কিছু নেই।

কিন্তু এটাও সত্যি, পল্লী-নারীদের যদি একবার উদাহরণস্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, তাঁদের

কর্মকুশলতাও এই পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ এবং তাঁদের সামান্য সহযোগও অসামান্য হয়ে প্রতিভাভা হবে, তা হ'লে প্রায় প্রত্যেক পল্লী-নারীই সরকারী পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগদান করবেন এবং পল্লী-অর্থনীতি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধরা যাক সপ্তয়ের কথা।

স্বল্প সপ্তয় দেশ গঠনের এক প্রধান সম্বল। দেশের সকলেই যদি ফালতু ও অপয়োজনীয় খরচ বাঁচিয়ে সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সপ্তয় করেন, তা হ'লে পরিকল্পনার জন্য বিদেশের কাছে আমাদের হাত পাততে হবে কম। পল্লী-অর্থনীতিতে স্বল্প-সপ্তয়ের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সাধারণত পরিবারের পুরুষেরাই সপ্তয়নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু সংসারের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটিয়ে নারীরাই উপযুক্তভাবে স্বল্প-সপ্তয় নীতি কার্যকরী করতে পারেন। যে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে সপ্তয়-কাজে সাহায্য করেন সেখানে সাফল্য সূচীকৃত। মেয়েরা বাড়িতে একটি মেটে ভাঁড় (লক্ষ্মীর ভাঁড়) রাখবেন। হাটবাজারের শেষে খুচরো পয়সাগুলো কিংবা সস্তাহ-শেষে সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্ভূত অর্থ তাঁরা সেই মেটে পাত্রে রাখতে পারেন। কয়েক মাস অন্তর সেই ভাঁড় ভেঙে সঞ্চিত অর্থ সরকার-ঘোষিত সপ্তয় কাজে নিয়োগ করতে পারেন। বছরে এর পরিমাণ হয়তো সামান্যই হবে, কিন্তু এই সামান্যই একদিন অসামান্য হয়ে দেখা দেবে। আগের কালে লক্ষ্মীর কাঁপ এই ভূমিকাই গ্রহণ করত।

আসল কথা সপ্তয়ের ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে পল্লীর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে মেয়েদের সূযোগের অভাব ঘটে না। আজকের ক্ষুদ্র-সপ্তয়ের যোগফল যে আগামী কালের শুব প্রভাবের উদয় এই স্পষ্ট ধারণা পল্লী-নারীদের থাকা আবশ্যিক।

এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা বহু সাহায্য করতে পারেন। গ্রামসেবক, গ্রামসেবিকা ও সহকারী কৃষি-কর্মচারী প্রভৃতির উপর পল্লীর উন্নয়নমূলক কাজের আবহাওয়া সৃষ্টির দায়-দায়িত্ব অনেকখানি নির্ভরশীল। গ্রামসেবিকারা সোজাসুজি পল্লী-নারীদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে সহজ অন্তরংগতার সূত্রে কর্মযোজনার ব্যাখ্যা করতে পারেন। গ্রামের মেয়েদের প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততার হিসাব নিলে সহজেই বোঝা যাবে যে, শক্তির কী নিদারুণ অপচয় সেখানে ঘটছে। এই অপচয় দেশের স্বার্থের ক্ষতিকর। সমাজসেবীরা একটু তৎপর হ'লেই সাফল্যের সঙ্গে এই অপচিত শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন। আজকের গ্রাম্য জীবন প্রাচীন সমাজ-পরিকল্পীদের ছকে বাঁধা। কিন্তু দিন পালটেছে। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। বিরাট আর্থনীতিক কাঠামোর রদবদল ঘটছে। এ সময় পুরানো দিনের ছকে-বাঁধা জীবন অফলপ্রসূ। নতুন পরিকল্পনা-কারীদের যুগের সঙ্গে সংগতি রাখা কর্মসূচিতে গ্রামের সমাজগঠন করতেই হবে।

এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পল্লী-নারীরা প্রস্তুত। দেশগঠনের পূর্ণ প্রতিফলন যদি তাদের পারিবারিক জীবনের উপর পড়ে তা হ'লে সকল বাধা-স্বিধা অপসারিত হবে নিশ্চয়ই। যে সমাজটি বর্তমানে আমাদের দেশকে জাতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে, সেই সমাজের উন্নতিমূলক কিঞ্চিৎ পরিবর্তন—তার মূল্য অপারিসীম। আমাদের হৃদয়, আমরা পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা পাততে পারি নে। অর সেই না পারার ফল বারবার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

আজ সময় এসেছে। সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে পল্লী-নারীদেরও চলতে হবে। তাঁদের শুব প্রচেষ্টা যদি নির্দিষ্ট পথে সমাজগঠনের কাজে নিয়োজিত হয় তা হ'লে দেশগঠন স্বাভাবিক হবে।

শিমুলের কথা

লেপ কি তোশকের ভিতরে থাকে তুলো। আর, বালিশের ভিতর? তাও থাকে তুলো। কিন্তু দুটো এক তুলো নয়। লেপ-তোশকের ভিতরে থাকে কাপাস তুলো—এ তুলো থেকেই সুতো কেটে তা দিয়ে কাপড় বোনা হয়। আর, বালিশের ভিতরে থাকে শিম্দুল তুলো।

কাপাস তুলো দিয়েও যে কেউ কেউ বালিশ তৈরি করে না তা নয়। তবে, তা করে শিম্দুল তুলো না জুটলে। মধুর অভাবে গুড় আর কি। তা, কাপাস তুলোও যাদের জোটে না, তারা ছেঁড়া ন্যাকড়া পুরেও তো বালিশ তৈরি করে। সে কথা হচ্ছে না। সাধারণত বালিশ, কুশন, গাদি এসব করা হয় শিম্দুল তুলো দিয়ে। তোশকও শিম্দুল তুলো দিয়ে করতে পারলেই ভাল হয়; কিন্তু শহর কি আধাশহরের লোকে, অনেক গ্রামের লোকেও বেশি পরিমাণ শিম্দুল তুলো জোটাতে পারে না বলে আজকাল কাপাস তুলো দিয়েই তোশকও তৈরি করে। শিম্দুল তুলো যারা জোটাতে পারে, তারা তা দিয়ে তৈরি করে তোশক।

কাপাস তুলোর আঁশ লম্বা, এ তুলো চাপ খেলে জমাট বেঁধে যায়। লম্বা আঁশ বলেই এ তুলো দিয়ে কাপড়ের সুতো কাটা হয়—চরকায়, তকলিতে, কলের টাকুতে, সর্বত্র। শিম্দুল তুলোর আঁশ খুব ছোট আর রেশমের ধরনের মসৃণ। এ তুলোর আঁশ সহজে পাক খায় না। এ তুলো দিয়ে সুতো কাটা শক্ত আর সেই সুতো টেকসইও হয় না। মসৃণ আর ছোট আঁশের বলে শিম্দুল তুলো চাপ খেলে জমাট বাঁধে না, বেশ কোমল আর স্থিতি-স্থাপক থাকে—চাপ দিয়ে কি অনেকক্ষণ চেপে রেখে ছেড়ে দেবার পরে আবার যে-কে সেই। তাই এ তুলো দিয়ে তৈরি করা হয় বালিশ, গাদি, কুশন ইত্যাদি এবং তোশকও এ তুলো দিয়েই করা উচিত। রেশমের ধরনের মসৃণ বলে শিম্দুল তুলোকে

ইংরেজীতে বলা হয় 'সিল্ক কটন'—যার বাঙলা অর্থ 'রেশমী তুলো' বা 'রেশম-তুলো'।

শিম্দুলগাছের কাঠ দিয়াশলাই তৈরির পক্ষে খুব ভাল। এই শিল্পে এ কাঠের খুব চাহিদা বলে পল্লী-অঞ্চলে লোকে যথেষ্ট শিম্দুলগাছ কেটে, তার কাঠ বিক্রি করে টাকা রোজগার করে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, নতুন গাছ করার উৎসাহ বড় একটা কারও দেখা যায় না। এর ফলে দেশে এই গাছের সংখ্যা অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এই কারণেই আজ-কাল শিম্দুল তুলো দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং শিম্দুল-গাছের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু তুলো আর কাঠ কেন, শিম্দুলগাছের সব-কিছুই আমাদের কাজে লাগে। শিম্দুল তুলো যে গুড়ির ভিতর থাকে—যাকে শিম্দুলের ফল বলা চলে, তার খোসা খুব পুরু। তুলোর মধ্যে বীজও থাকে অনেক। একটা ফলে বা গুড়িতে মোটামুটি শতকরা ৪৫ ভাগ থাকে খোসা, ২০ ভাগ তুলো আর ৩৫ ভাগ বীজ। খোসা শুকিয়ে গ্রামের লোকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। বীজ থেকে তেল পাওয়া যায় আর সেই তেল সাবান তৈরি প্রভৃতি নানা কাজে লাগে। বীজ থেকে তেল বেরোবার পরে যে খইল থাকে তা গোরু মোষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর পুষ্টিকর সুখাদ্য। লাল রঙের, পুরু পাপড়ির, বড় বড় শিম্দুল-ফুল এমন অজস্র ফোটে যে গাছের সারা মাথা ছেয়ে যায়। এ গাছ বেশ উঁচু হয়—আকাশের কোলে মাথা তুলে দেয়; গাছের মাথা যখন লাল ফুলে ছেয়ে যায়, দূর থেকে দেখে মনে হয় বৃষ্টি আকাশে আগুন ধরে গেছে। এ দৃশ্য পল্লী-অঞ্চলে সকলেরই পরিচিত। এ ফুল ফোটে যেমন অজস্র, তেমনি ঝরেও প্রচুর। ফুল ঝরে ঝরে, জমা হয়ে, পড়ে গাছতলায় কাদা হয়ে যায়। এই ফুল কিন্তু গবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য এবং পুষ্টিকরও, তাই বৃদ্ধিমান লোকে গাছতলা

থেকে রাশি-রাশি ফুল কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির গোরদু-ছাগল প্রভৃতিকে খেতে দেয়। শিমুলগাছের পাতা ঝরে যায়। বসুন্ধমান চাষী সেসব পাতা নিয়ে নিজের ক্ষেত্রে পচতে দেয়, পাতা পড়ে সার হয়। কোন কোন ওষুধ তৈরিতে শিমুলগাছের ছাল লাগে। এ গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা হয়। সেই কাঁটা তুলে নিয়ে, চন্দনের মত ঘষে গাশ্বচর্মের কলঙ্কহারক প্রলেপ তৈরি করা হয়। শিমুলকাঁটা দিয়ে যাঁরা ছেলেবেলায় রবার-স্ট্যাম্পের অনুকরণে 'সীল' তৈরি করেছেন, তাঁরা তার সেই শিম্প-মহাশ্বাটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন।

এমন একটি গাছের বিনাশই শূন্য আমরা করে চলছি, নতুন গাছ লাগাবার দিকে আমাদের খেয়ালই নেই। চাষ হিসাবে এ গাছ লাগাতে বা তার পরিচর্যা করতে তো কাউকে দেখা যায় না, বরং একটি গাছ যাঁর আছে তিনি সেটিকে কেটে তার কঠ বিক্রি করতে আগ্রহান্বিত; তার জায়গায় নতুন একটি গাছ লাগাবার কথা তাঁর মনেই আসে না।

আমাদের পল্লী-অঞ্চলে যেসব শিমুলগাছ দেখা যায় তার সবই আপনা থেকে যেখানে-সেখানে বীজ পড়ে তা থেকে জন্মেছে এবং অন্যদের বেড়ে উঠেছে। যাঁর জমিতে এই গাছ রয়েছে, তার তুলো আর কাঠ থেকে তাঁর যে আয় হয় সেটা একেবারেই অবহেলা করার মত নয়, এবং কোন মূলধন নিয়োগ না করে তিনি নিখরচায় এই আয়টা করেন।

ভারতে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, দক্ষিণ ভারত এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ শিমুল তুলোর গাছ জন্মে। সারা পৃথিবীতে যত শিমুল তুলোর দরকার হয় তার শতকরা ৪০ ভাগ যোগায় যবদ্বীপ, আর বাকিটা যোগায় ভারত, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

শিমুলগাছের চাষ করা খুবই সহজ। এ গাছের পরিচর্যাও করতে হয় না বর্ষাদিন। সবচেয়ে বড় কথা, এ গাছ লাগাবার জন্য ভাল জমি না হলেও

চলে। পতিত জমিতে এর চাষ করা যায়। ভাল উর্বর জমি না হলে যদি এ গাছ না হত, তা হলে প্রশ্ন উঠত যে, এখন খাদ্যসমস্যার দিনে ভাল জমিতে খাদ্য ফসলের চাষ না করে শিমুলগাছ লাগানো সংগত কিনা। কিন্তু সে প্রশ্নের ধার দিয়েও না গিয়ে, একেজো, পতিত জমিতে কি পোড়ো ভিটায় যেখানে খাদ্যশস্যের বা অপর কোন অর্থকর ফসলের চাষ দেওয়া যাবে না, সেখানে স্বচ্ছন্দে শিমুলগাছ লাগিয়ে দিতে পারি। সেই জমিতে ২০ ফুট দূরে দূরে গর্ত করে, তার মাটির সঙ্গে কয়েক ঝড়ি গোবরসার মিশিয়ে দিয়ে, মাদা তৈরি করে নিলেই মাটি তৈরির কাজ হয়ে গেল। বর্ষার গোড়ার দিকেই প্রত্যেক মাদায় ২-৩টি করে বীজ রোপণ করতে হয়। চারা একটু বড় হলে, প্রতি মাদায় সুস্থ তেজী একটি মাত্র চারা রেখে বাকি-গুলো তুলে ফেলতে হয়। গাছের ছোটবেলায় তার গোড়ায় আগাছা গজালে সেসব পরিষ্কার করে ফেলা দরকার।

শিমুলগাছ একটু বড় হয়ে গেলে বিশেষ পরিচর্যা না করলেও চলে। তবে সার দিলে, পরিচর্যা করলে যে ফলন বেশি পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রতি বছরই গাছের গোড়ার চারদিক খুঁড়ে কিছু গোরবসার নিলেই যথেষ্ট। এ গাছের গায়ে কান্টাগুলো তাকে গোরদু-ছাগল প্রভৃতির কবল থেকে রক্ষা করে।

গাছের বয়স চার থেকে পাঁচ বছর হলেই তাতে ফুল ফুটে শুরুর করে। এ বয়সের গাছে ৪০-৫০টি ফল টেকে। ক্রমে বছরে বছরে ফুল আর ফল বা গুড়ির সংখ্যা বাড়তে থাকে। দশ বছর বয়সের গাছে প্রায় হাজারখানেক গুড়ি হয়। অবশ্য স্থানীয় অবস্থা বা মাটির গুণাগুণ অনুসারে ফুল এবং গুড়ির কমবেশি হতে পারে। প্রথম যে-বছর ফুল ও গুড়ি ধরে, সেই বছরই একটা গাছ দেড় থেকে দুই সের কি তার চেয়েও কিছু বেশি তুলো দেয়।

তুলোর গুঁটি যেন গাছেই শুঁকিয়ে না ফেটে যায় সে-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। গুঁটি-গুঁটি সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়ে গেলে গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এসে, জালের ঢাকা দিয়ে রৌদ্রে শুকোতে হয়। গুঁটি ফেটে তুলো বেরোলে জালের ঢাকা থাকার ফলে তা উড়ে যেতে পারে না। গাছেই গুঁটি ফেটে গেলে তুলো উড়ে চারিদিকে দূরে-সুদূরে পর্যন্ত চলে গিয়ে নষ্ট হয়, সে-তুলো আর পাওয়া যায় না। জালঢাকা দিয়ে শুঁকিয়ে নেবার পরে সমস্ত গুঁটি থেকে তুলো ছাড়িয়ে নিয়ে, তুলো থেকে বীজগুলোও ছাড়িয়ে ফেলতে হবে।

প্রতি বছর বনমহোৎসবের সময় শিমুলগাছ লাগানোর কথাও যেন আমরা মনে রাখি। গ্রামাঞ্চলে

অনেকেরই অনেক পতিত জমি অকেজো হয়ে পড়ে আছে; শিমুলগাছ লাগিয়ে দিলে সেসব জমি একটা কাজের মত কাজে লাগে। এর চাষ করতে মূলধন লাগে না। সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই অর্থগমের চমৎকার একটা ব্যবস্থা করা যায়। অন্যান্য অর্থকর ফসলের চাষে যে-পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, এর চাষে তার তুলনায় অনেক কম পরিশ্রম করে সেই অনুপাতে অর্থ পাওয়া যায় চের বেশি। গাছ একটু বড় হয়ে ওঠার পরে আর কোন পরিচর্যা না করলেও একটা শিমুলগাছ সমানে অন্তত পঞ্চাশ বছর তুলো দিয়ে যায়। তুলো দেওয়া বন্ধ করলে তার কাঠের কদর তো আছেই।



কমলালেবু সম্বন্ধে

ঐতিহাসিক চক্রবর্তী

কমলালেবু সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে লেবু জাতীয় ফলগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার।

আমাদের দেশে লেবু জাতীয় ফলগুলির মধ্যে কমলালেবু, পাতিলেবু, মোসাম্বী, জাম্বীরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ও চৈনিক সাহিত্যে এই জাতীয় ফলের উল্লেখ আছে। সম্ভবত ইতিহাস হিসাবে ইহাই সর্বপ্রাচীন উদ্ভিদ। আমাদের আয়ুর্বেদের সূত্রত গ্রন্থে ইহার আলোচনা পাওয়া যায়।

অনেকে বলেন যে, কমলালেবু চীনের ফল—এবং যাহাকে আমরা সাধারণত পাতিলেবু বলি তাহা ভারতের নিজস্ব। আবার কেহ কেহ বলেন, সাইট্রন জাতীয় ফল পারস্যে সর্বপ্রথম পাওয়া যায় এবং ইংরেজিতে যাহাকে 'লেমন' বলে তাহা আরবেই পাওয়া যাইত। আরবগণ হয়তো আফ্রিকায় ইহার চাষ শুরুর করে। তারপর তাহা ক্রমশ ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খ্রীস্টাব্দের দশম শতকে আরবগণ ওমানের বাগান হইতে প্যালেস্টাইন ও ইজিপ্টে লেবু আমদানি করিয়াছে এরূপ প্রমাণ আছে।

ভারতে কমলালেবু চাষের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে হইলে কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিতের উক্তি এবং দুই-একখানা নাম-করা আত্মকাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিবরণ এরূপ পরস্পর-সম্পর্কহীন যে, এগুলিকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কমলালেবু চাষের ক্রম-প্রসার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে এইগুলি লইয়াই শুরুর করিতে

হইবে। যেমন, একথা যদি বলা হয় যে, কমলালেবু ভারত হইতে আরবে সম্ভবত নবম শতাব্দীতে আনীত হয়, তাহা হইলে খুব অসত্য বলা হয় না, কেননা ইহার কিছু কিছু সূত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপে ইহা চালান হওয়ার ইতিহাস তাহার দুই শত বৎসরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। মুররা সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কমলা আমদানি করে। তাহার পর প্রায়দশ শতাব্দীতে রোমে ইহার চাষ হইয়াছে এরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়।

মার্কোপোলো ভারতের কমলা সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু ভার্ভেমা নামে জনৈক পণ্ডিত ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে ক্যানানরে আসিয়া সেখানকার কমলা সম্বন্ধে বলেন যে, পৃথিবীর কোন স্থানে তিনি এরূপ সুস্বাদু কমলা খান নাই।

ভারতের কমলালেবু সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য জানিতে হইলে সম্পূর্ণ ভারতীয় পুস্তকের উপর নির্ভর করা উচিত। বিদেশীদের পুস্তকে ভারত সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস পাওয়া মূর্শকিল। কিন্তু এমন কোন পুস্তক পাওয়া যায় না যাহাতে ভারতের লেবুর ইতিবৃত্ত বিশদভাবে লেখা আছে। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত বাবরের আত্মকাহিনীতে নয় রকম লেবুর কথা আমরা পাই। ভারতে কমলালেবুর চাষ সম্বন্ধে ইহাই সম্ভবত সর্বপুরাতন একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক। ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত আইন-ই-আকবরীতে এসম্বন্ধে নতুন কিছু পাওয়া যায় না।

হার্বাট তাহার ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দের ভ্রমণকাহিনীতে ম্যাঙ্গালোরের লেবু জাতীয় ফল ও কমলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু রিডি নামে

আর একজন পর্যটকের এ-সম্বন্ধে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের এক মন্তব্যে মালাবারের লেবু জাতীয় এক প্রকার গাছের বর্ণনায় কমলাগাছের সহিত মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রায় একশত বৎসর পর রামফিয়াস নামে জনৈক লেখক বিভিন্ন রকমের কমলালেবুর বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার মধ্যে কতকগুলি বন্য জাতীয়। তিনি বলেন, মিষ্ট কমলার উৎপত্তিস্থল চীন। আবার অনেক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ভারতে অতীতে উন্নত ধরনের কমলা-লেবুর চাষের ও ব্যাপক সরবরাহের অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ডাক্তার হান্টার বহুদিন আগে একথা প্রতিপন্ন করতে চাহিয়াছিলেন যে, ভারতের অনেক অঞ্চলে উৎকৃষ্ট কমলাকে সান্তরা বলা হয়, ইহার কারণ, এই শব্দটি সিন্ধা শব্দের হিন্দুস্থানী অপভ্রংশ এবং ইহা হইতে বোঝা যায় যে, উহা পর্তুগাল হইতে আমদানি হইয়াছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানগণ কমলাকে বলেন ‘অরেনশিয়াম’। মনে হয় আরবী শব্দ ‘নারান্দ’ হইতে পরিবর্তিত হইয়া এই শব্দ হইয়াছে; পরে হয়তো পারস্যীতে ইহা বদলাইয়া হয় ‘নারঙ্গ’। সংস্কৃতে কমলাকে বলা হয় ‘নাগরঙ্গ’, হিন্দী ‘নারেঙ্গী’র সহিত ইহার মিল আরও বেশি। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ভারতবর্ষের নারেঙ্গী নাম ভারতেরই সংস্কৃত শব্দের অন্যরকম উচ্চারণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমলাকে ‘নারেঙ্গী’ ও ‘সান্তরা’ এই দুই নামে অভিহিত করা হয়। স্পেন দেশের ভাষায় কমলাকে বলা হয় ‘লরেঞ্জো’ এবং সম্ভবত মুররাই ইংরেজিতে ইহার নাম করে ‘অরেঞ্জ’।

কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি ইহার পূর্বে যখন কৃষি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না সেই সময়কার ভারতের কমলার চাষ সম্বন্ধে ভাল-ভাবে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সরকার কৃষি বিভাগ খুলিবার পর নানা পুস্তক এ-সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। সেগুলি হইতে ভারতের কমলালেবু

সম্বন্ধে জানা যায় যে, এর দুই জাত; এক জাতের স্বাদ একটু অম্ল এবং আর এক জাতের—খুব মিষ্ট। উদ্ভিদবিজ্ঞানগণ বলেন যে, এক জাতীয় ভারতীয় বন্য কমলার সহিত মিষ্ট জাতীয় কমলার মিল খুব বেশি। তাহাতে মনে হয়, ভারতই ইহার জন্মভূমি। আবার অনেকের মতে মিষ্ট কমলার গাছ আসামের মধ্য দিয়া চীন হইতে ভারতে আমদানি হইয়াছে এবং ক্রমে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমলার চাষ হয়, কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অল্প। ভারত বিভাগের পূর্বে শ্রীহট্ট জেলার কমলা ছিল ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে কমলার চাষ বর্তমানে প্রধানত আসাম, দার্জিলিং, নাগপুর, উত্তরপ্রদেশের গাড়া-য়ল ও কুমায়ুন অঞ্চল, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতের পুনা ও কুর্গে হয়। এইসমস্ত অঞ্চলের জন-সাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানম্বারাই ইহার উৎপাদন করিয়া থাকে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য পাইলে তাহারা আরও উন্নত ধরনের ও বেশি পরিমাণে ফল ফলাইতে পারিবে।

ডক্টর বোনাভিয়া নামে জনৈক গ্রন্থকার ভারতে চার জাতীয় কমলার নজির দিয়াছেন। বাঙলা-দেশে এই ফলকে কমলা নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু উত্তর ভারতে ইহাকে সান্তরা ও নারেঙ্গী বলা হয়। তাঁহার মতে এই চার জাতীয় কমলা হইতেছেঃ (১) সান্তরা জাতীয়। এই শব্দ তাঁহার মতে সংস্কৃত ‘সুন্তরা’ হইতে আসিয়াছে। সিন্ধা হইতে পরিবর্তন হইতে হইতে সান্তরা হইয়াছে একথা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। (২) কেওনলা—যাহাকে সাধারণত নারেঙ্গী বলা হয়; এই জাতীয় লেবুরই ভারতে চাষ হয় সবচাইতে বেশি। (৩) মালটা অথবা পর্তুগাল জাতীয়—ইহা দেখিতে রক্তের মত লাল। ১৮৫২ সালে ভারতে ইহার চাষ শুরুর করা হয়, এখন গুজরানওয়ালাতে বেশ ভালভাবে চাষ হয়; (৪) মান্দারিন জাতীয়। অনেকের মতে চীন ও কোচিন চীনেই ইহার

উৎপত্তি সর্বপ্রথম। এই জাতীয় ফল ভারতে বেশি পাওয়া যায় না। কখনও কখনও কমলার বাগানে এই জাতীয় গাছ দুই-একটা দেখা যায়। কিন্তু ইহাকে ভারতীয় কমলা বলা কোনমতেই উচিত কিনা তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

ভারতে যত রকম কমলালেবুর চাষ হয় তাহার মধ্যে সান্তরা জাতীয় কমলাই প্রধান। ইহার বাহিরের রং লালচে হলদে, উপরকার আবরণ খুব আলগা। এই কারণেই শৌখিন ফল-বিলাসীরা ইহা পছন্দ করেন। অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে বিভিন্ন জাতীয় কমলার পার্থক্য সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ থাকার কোন কারণ নাই। শুধু মিষ্টি স্বাদ ও আকার দ্বারা ই সাধারণ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা যায়। বাজারে যে কমলা যত বেশি বড় এবং যত মিষ্টি তাহার চাহিদাও তত বেশি।

দার্জিলিং, নাগপুর এবং আসামের গ্রীহট্ট অঞ্চল কমলাচাষের জন্য বিখ্যাত। শেষোক্ত অঞ্চল এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্রীহট্টের পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলেও কমলার চাষ হয়। ইহা প্রধানত খাসিয়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এ অঞ্চলেও গ্রীহট্টের মতই চারাগাছ লাগাইয়া কমলার চাষ করা হয়। যদিও প্রধানত পাহাড়ের ঢালু অংশেই চাষ বেশি, তথাপি সমতল ভূমিতেও ইহার চাষ করা হয়। চারাগুলি ২-৩ বৎসরের হইলে মে ও জুন মাসের ভিতরেই গর্ত করিয়া পোঁতা হয়। বর্ষার শেষা-শেষি ইহাদের গা হইতে কতকগুলি ডাল বাহির হইতে আরম্ভ করে। এই ডালগুলি একটু বড় হইলে একটি রাখিয়া বাকিগুলি কাটিয়া ফেলা হয় এবং উপর হইতে আসল গাছটিও কাটিয়া লওয়া হয়। আট-নয় বৎসর পর গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। এই বয়স সব সময় ঠিক থাকে না, কেননা গাছে পোকা ধরিলে ঠিকমত তাহার বৃদ্ধি হয় না, তাহাতে ফল ধরিতে দেরি হয়। এ অঞ্চলে কমলা পাকিতে আরম্ভ করে অক্টোবরের শেষাশেষি এবং প্রায় মার্চ পর্যন্ত থাকে। নাগপুরের কমলা-চাষের রীতি অন্যরকম। এখানে সান্তরা জাতীয়

কমলার ডাল ও মিষ্টি লেবুর চারার অথবা জাম্বুরার (যাহাকে আমরা সাধারণত বাতাবি লেবু বলি) চারার কলম করা হয়,—কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গাছ লাগাইবার যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন চুন-মিশ্রিত মাটিতে কমলার চাষ সবচাইতে ভাল হয়। প্রথম জাতীয় কমলার খোসা পাতলা, এবং ইহা খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু খোসা ছাড়ানো মুশকিল হয়, কেননা গায়ে লাগিয়া থাকে। দ্বিতীয় রকমের ফলের খোসা খুব আলগা হয়। এখানে গাছের দুইবার ফলন হয়। প্রথমবার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি হইতে মার্চ মাসের মধ্যে গাছে ফুল হয় আব ফল পাকে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। দ্বিতীয় বার জুন-জুলাইতে ফুল হয় এবং ফল পড়ে মার্চ-এপ্রিলে। দ্বিতীয় ফসলটির কমলা খুব মজা হয় এবং গরমের সময় অন্যান্য স্থানের কমলা পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার চাহিদা খুব বেশি। এইসমস্ত কমলা গাছ হইতে কাঁচাই পাড়া হয়—নেইজনা বাজারে এগুলি দেখিলেই বোঝা যায়।

কৃষিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ইহা ধারণা করাই স্বাভাবিক যে, জলবায়ু, চাষের পদ্ধতি ও বীজ অথবা কলমের উপরে উৎপাদনের প্রকারভেদ হয়। মোটের উপর যখন ক্রেতাদের রুচির উপরেই বাজারে ফলের আদর বেশি হইবে তখন কোন সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে চাষ করিতে হইলে প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহাদের মতমতের উপর। কিন্তু ভারতে কমলা-লেবুর ব্যাপার কৃষিবিভাগ এতখানি নজর সম্ভবত এখনও দিতে পারেন নাই। চিরাচরিত প্রথার এক-আধটু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক উপায় কিছু কিছু কাজে লাগান। এ বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, কমলাচাষের প্রসার করিতে হইলে প্রথম পর্যায়ে যে-অঞ্চলে চাষের যে রীতি তাহাকে আরও উন্নত করিয়া উৎপাদন বাড়ানো যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি দুইভাবে হইতে পারে। যেমন একই গাছে ফলন বৃদ্ধি করিয়া এবং গাছের সংখ্যা

বৃদ্ধি করিয়া। প্রথমটি উন্নত ধরনের উদ্যান-চর্যার পদ্ধতি প্রয়োগে সম্ভব। ইহার জন্য গবেষণা দরকার—তাহা সময়সাপেক্ষ। ব্যাপক চাষম্বারা উৎপাদন বাড়ানোই বর্তমান অবস্থায় সবচাইতে উপযোগী। ভারতে কমলার চাষ সাধারণত পাহাড় অঞ্চলেই বেশি। পাহাড় অঞ্চল ভারতে কম নয়। এইসকল অঞ্চলে জনসাধারণের সহযোগিতার দ্বারা চাষ বাড়ানো মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতের যে অঞ্চলে যে ভাবে চাষ হয় সেই রীতিতেই চাষ বাড়ানো উপযুক্ত পন্থা বলিয়া জনসাধারণের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হইবে।

কিছুদিন পূর্বে আমরা কমলাচাষে পশ্চিম-বাঙলার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবার কথা শুনিয়া-ছিলাম। দার্জিলিং জেলায় কমলার বাগান সম্প্রসারণ করিয়া পশ্চিম বাঙলায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কমলার চাষ দ্বিগুণ করা হইবে এরূপ সিদ্ধান্তও আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে আমরা আশা করিব যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা বেশি সংখ্যায় কমলা খাইতে পারিবে। কমলার চাষ বাড়াইলে উভয়দিকে লাভ—যেমন, জনসাধারণ বেশি কমলা খাইতে পারিবে এবং বর্তমান ফলসংরক্ষণ পদ্ধতি কাজে লাগাইয়া অতিরিক্ত ফল যদি কিছু থাকে সেগুিলির অসময়ে সম্ভাব্যহার করা হইবে এবং কিছু কিছু বিদেশে চালান করিয়া বিদেশী মদ্রার অভাবের সময় আরও কিছু সঞ্চয় বাড়িবে। ইহার

ফলে দেশে কোটায় ভরা ফলের শিল্প বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসমস্ত কারখানার চাহিদা মিটাইবার জন্য আরও ফলের চাষ করিতে হইবে।

কমলালেবুর পুষ্টিকারিতা সর্বজনবিদিত। ভারতের মৃষ্টিমেয় লোকই কমলা খাইতে পায়। এখনও বোধহয় ভারতের বেশির ভাগ বাড়িতেই রোগীর পথ্য হিসাবেই ইহা আনা হয়। তাহাও অনেকের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সাধারণ সুপুষ্টির জন্যও ইহার মূল্য অনেক। খাদ্য হিসাবে এত মূল্যবান হইবার একটা কারণ—ইহার ভিতর 'সি' ভিটামিনের আধিক্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়পড়তা একশত গ্রাম কমলার রসে প্রায় চুয়ান্ন মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' থাকে। কমলা সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান ভাল তাঁহারা গাছে সম্পূর্ণ পাকিবার পরে পাড়েন, কারণ গাছ হইতে পাড়িবার পর উহার স্বাদের আর কোন পরিবর্তন হয় না। ক্যালিফোর্নিয়ায় এরূপ আইন আছে যে, কমলার রসে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ ও অম্লের অনুপাত যতদিন না ৮:১ হয়, ততদিন কেহ উহা বাজারে বিক্রি করিতে পারিবে না। ইহার কারণ, এই দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ ভাগই চিনি, এবং কমলা হইতে যে সুগন্ধ আসে তাহা সাইট্রিক অ্যাসিড হইতে। কমলাকে বেশি পাকিতে দিতে নাই, কেননা তাহা হইলে ইহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে।



মেস্তা ও রোসেলের দু'টি পোকা

উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন কোন অঞ্চলে দু' রকম 'হিবিংস্কাস'-তন্তু জন্মানো হয়, তার একটা 'হ'ল মেস্তা ('কেনাফ' অথবা 'হিবিংস্কাস ক্যানাবিনাস') এবং অপরটা রোসেল ('হিবিংস্কাস সাবডারিফা')। আঁশের ফসল মেস্তা বা রোসেল পাটগাছের কোন বিশেষ পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না, কিন্তু তাদের 'নিজস্ব' পোকাকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এসব পোকা হ'লঃ 'অ্যাগ্রিলাস অ্যাকিউটাস' বা মেস্তাগাছে প্যাঁচানো-ফুটো-করা পোকা ('স্পাইর্যাল বোরার') এবং রোসেলের 'ফেনাককাস হার্সুলাস'। এ দু' রকম পোকা এই দু'টো ফসলের উৎপাদন খুবই কমিয়ে ফেলে।

পাটের আঁশের বিকল্প হিসাবে এ দু'টো আঁশ চাষীদের পরিচিত। তার কারণ, পাটকলে মেস্তা ও রোসেলের আঁশ পাটের স্থান কিছুটা পূরণ করে। ভারতে এ দু'টো ফসলের চাষে জমি ছিল ১৯৪৭ সালে ৩ লক্ষ একর, তার জায়গায় ১৯৪৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ একর। কারণ, পাটচাষের তনুপযোগী নীরস ধরনের জমিতেও এ দু'টো ফসল জন্মায়।

প্যাঁচানো-ফুটো-করা পোকাকার এরকম নাম হবার হেতু হচ্ছে, তারা গাছের ছালের নিচে কাঠের গায়ে প্যাঁচানো ধরনের সূড়ঙ্গ করে। ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সেখানকার 'জাভা' পাটে (মেস্তা) এ পোকাকার আক্রমণের খবর পাওয়া যায় ১৯২২ সালে, কিন্তু ভারতে এর আবির্ভাব হয়েছে হ'লে—মাত্র ১৯৫০ সালে। ইতিমধ্যে এ পোকা মেস্তার সবচেয়ে ক্ষতিকারক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কাঁচা গাছে এ পোকা বিশেষ আক্রমণ চালায় না।

পাথুরি

আক্রান্ত গাছে এ পোকা তার পরিণত জীবনে যে সূড়ঙ্গ কাটে, সে জায়গাটা দেখেই বোঝা যায়, গাছের গা সেখানটাতে একটু ফুলে ওঠে। প্যাঁচানো সূড়ঙ্গটার শেষদিকে শক্ত একটা লম্বাটে জিনিস জন্মায়—যাকে বলা যায় পাথুরি। এই পাথুরি তিন থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয় ; ন' থেকে পনেরো সেন্টিমিটার লম্বা পাথুরি প্রায়ই দেখা যায়। শূন্য পরিণত বয়সের শূককীটই পাথুরি জন্মাতে পারে। পরবর্তী বয়সে শূককীট যখন পুত্তলী বাঁধে, সে সময়ে এদের দ্বারা পাথুরি তৈরি হয় না। ছ' থেকে আট ফুট লম্বা গাছেই পাথুরি জন্মাতে বেশি দেখা যায়। বেশির ভাগ গাছেরই গোড়া থেকে দেড় ফুটের মধ্যে পাথুরি জন্মায় ; কোন কোন গাছে এর চেয়ে উঁচুতেও পাথুরি হ'তে দেখা যায়।

পাথুরি যেখান জন্মায়, তার এলেকায় সূড়ঙ্গের প্যাঁচগুলো কাটা হয় খুব ঘনঘন। গাছের সেই অংশটা এর ফলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জোর বাতাসের ধাক্কা লাগলেই সেখানটাতে গাছ ভেঙে পড়ে যায়। পরিণত অবস্থার গাছের এই ক্ষতিতে চাষীর ভীষণ লোকসান হয়। আক্রান্ত ক্ষেত্রের দৃশ্যও বড়ই করুণ হয়ে দাঁড়ায়। পাথুরির জায়গাতে পোকা অনেক সময় গাছের কাঠে সূড়ঙ্গ করতে গিয়ে ছালের ভিতর-পিঠটাও কেটে ফেলে। সেখানকার আঁশ কাঠের সঙ্গে এমন শক্তভাবে এঁটে যায় যে, এমনকি পচানোর পরেও তা ছাড়ানো যায় না। এইভাবে আঁশ নষ্ট হয়।

এই পোকাকার শূককীট মেস্তাগাছের গা বেয়ে, অনেক সময় গাছের সারা আগাগোড়া ওঠানামা করে। শূককীটের পা নেই। এদের গায়ের

তলাটা চ্যাপ্টা এবং মাটির সঙ্গে চেপ্টে লেগে থাকে। গায়ের রঙ হলদেটে সাদা। বৃক সামনের দিকে খানিকটা বেড়ে থাকে—যার মধ্যে কীড়া মাথা গুলুটিয়ে রাখতে পারে। এর শরীরের পেছনে একজোড়া কাঁটা-কাঁটা শিঙমত থাকে। পরিণত পোকা বেশ বড় আকারের—সাত-আট মিলিমিটার লম্বা এবং তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল নীলে সবুজ। সামনের ডানার উপর স্পষ্ট দু'টো বেষ্টনীয়-মত জয়গায় ছড়িয়ে রয়েছে রূপোলি রঙের শঙ্খুয়ে। একই ধরনের দু'টো শঙ্খুয়ের বেষ্টনীয় পোকাকার পেটের দু' পাশেও আছে। সামনের প্রত্যেক ডানার ভিতর-ধারটা উঁচু, আর বাইরের ধারটা সরু হয়ে একেবারে ছুঁচালো হয়ে গেছে। শঙ্খুয়ের প্রথম তিনটি গাট চোঙের মত এবং বাকিগুলি তিনকোণ।

শ্রী-কীট গাছের কান্ডের যে-কোন জায়গায় ডিম পাড়তে পারে, তবে প্রায়ই গাছের ডগার দিকে পাতার তলার পিঠে ডিম পাড়ে। ডিম লম্বাটে গোল এবং একটু চ্যাপ্টা, ১ থেকে ১.২ মিলিমিটার লম্বা আর ০.৬৮ থেকে ০.৭৬ মিলিমিটার চওড়া। ডিমগুলোর একটা করে উঁচু মৃদু-মত থাকে যাতে গাছের গায়ে আঁকড়ে থাকতে পারে। ডিমের খোলা ঝিল্লিময় এবং তাতে লোমকূপের মত গর্ত-গর্ত থাকে।

বিভিন্ন ধরনের মেষ্টাগাছেই এই পোকা আক্রমণ চালাতে দেখা যায়। রোসেলগাছ মেষ্টার চেয়ে বেশিদিন ক্ষেতে থাকে, কাজেই মেষ্টা কেটে নিয়ে যাবার পরে রোসেলে এর আক্রমণ হ'তে পারে। তবে, রোসেল এই পোকাকার দ্বারা কমই আক্রান্ত হয়। হ'লেও, লম্বাটে পাখুরি বিশেষ জন্মায় না, কাজেই গাছ কখনও ভেঙে পড়ে না।

এ পোকা রোসেলের গাছ কখনও আক্রমণ করলেও, মেষ্টাগাছের যেমন ক্ষতি করতে পারে, রোসেলগাছের তেমন পারে না। সুতরাং রোসেলের পক্ষে পোকা বিশেষ ভাবনার কারণ নয়। এদিক-ওদিক থেকে মাঝে মাঝে এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে, 'ওলিটোরিয়াস' জাতের পাটের গাছেও এই

পোকাকার আক্রমণ ঘটছে, তবে কোন জায়গা থেকেই বিশেষ ক্ষতিকর ধরনের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায় নি।

ছ' রকমের মেষ্টা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বারাকপদুর গবেষণাকেন্দ্রে উদ্ভাবিত 'এম টি ১৫' মেষ্টার গাছে এ পোকাকার আক্রমণ হয় সবচেয়ে কম। চার রকম রোসেল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উক্ত কেন্দ্রে উদ্ভাবিত 'আর টি ১' রোসেলের গাছে এর আক্রমণ সবচেয়ে কম হয়।

আরও দেখা গেছে যে, মেষ্টা এবং রোসেলের বীজ বোনার সময়ের অদলবদল করলে এ পোকাকার আক্রমণ কম হয়। এপ্রিল মাসে বীজ বুনলে যে ফসল হয়, তাতে আক্রমণ হয় সবচেয়ে বেশি। এপ্রিলের যত পরে বীজ বোনা যায়, আক্রমণের সম্ভাবনাও তত কম হয়। জলের সঙ্গে ২.৫ শতাংশ শক্তির 'মেটাসিস্টক্স' প্রয়োগ করে গাছের কান্ডের ভিতরকার পোকা মেরেও ফেলা যায়।

কণা ছারপোকা

এই অতি ক্ষুদ্রাকার পোকা ('মিলি বাগ'—'ফেনা-কক্সাস হাস'টাস') প্রায়ই রোসেলগাছের ডগায় আক্রমণ চালায়। খুব কচি গাছের ডগার পাতার ধারে এবং তার বোঁটায় একসঙ্গে বহু পোকাকার আক্রমণ হয়। কিছু পোকা বড় গাছের কচি গুলুটিও আক্রমণ করে। ১৯৪৮ সালে এই পোকা রোসেল ফসলের ভয়ানক ক্ষতি করেছিল বলে জানা যায়।

গাছের ডগার যেসব জায়গা দিয়ে পাতা বেরোয়, সেইসব গাঁটে এই পোকা আক্রমণ করে, তার ফলে গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাঁটগুলি ফুলে ওঠে এবং গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে দাঁড়ায়। গাঁট থেকে যেসব পাতার বোঁটা বেরোয়, সেগুলোর অবস্থা অনেক সময় এ রকম হয়ে পড়ে। কাছাকাছি গাঁট থেকে বেরনো পাতায় এদের আক্রমণ হ'লে সেখানটা এক রকম ঝোপড়া হয়ে যায়। আক্রমণ প্রবল হ'লে গাছ ম'রেও যেতে পারে।

ক্ষেতে এদের আক্রমণ হয় সাধারণত টুকরো টুকরো এক-একটা জায়গা জুড়ে। মরসুমের গোড়ার দিকে এই পোকাকার আক্রমণ হলে দেখা যায় যে, গাছের ডগার একটি কি দুটি কুঁড়ি হয়তো বেরিয়ে আসে এবং গাছের ডগাটা ঝাঁটার মত হয়ে দাঁড়ায়। বীজের গাছে সময় সময় এরা গুঁটি অক্রমণ করে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ করে ফেলে, তার ফলে গুঁটি কুঁকড়ে যায় এবং তার মধ্যে বীজ হয় কম।

পুতুলী এবং স্ত্রী-পোকা তাদের সন্দের মত লম্বা চোঙ-ধরনের শব্দ গাছের কাণ্ডের গায়ে গভীরভাবে ফুঁটিয়ে দিয়ে রস শোষণ করে, তাতেই গাছের ক্ষতি হয়। দেখা গেছে যে, দশ-বারটি স্ত্রী-পোকাকার আক্রমণেই গাছের ডগার বাড় বন্ধ হয়ে যাব, গাঁট ফুলে ওঠে এবং চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই গাছ সবুজ রঙ ধরে ওঠে।

পক্ষিহীন স্ত্রী-কীট

স্ত্রী-পোকাকার ডানা হয় না। পরিণত বয়সে এদের দেহে এক রকম থলে জন্মায় যার মধ্যে সারিবদ্ধভাবে ডিম থাকে। চোঙ-আকারের ডিমগুলোর

পেছনটা গোল, গোলাপী রঙ। ডিম সাধারণত লম্বায় ০.২৯ থেকে ০.৩২ মিলিমিটার এবং চওড়ায় ০.১৭ মিলিমিটার হয়। ডিম-পাড়া সাধারণত পাঁচ থেকে আট দিনের মধ্যে শেষ হয়।

পূর্ণ-পরিণত স্ত্রী-পোকাকার রঙ গোলাপী মত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মিলিমিটার। এদের দেহের পেছনে একটা শক্ত গুঁটি, দুটি কাঁটা আর কয়েকটি শব্দ থাকে। পুরুষ-পোকা পুতুলী হয়ে গুঁটি বাঁধে এবং পূর্ণাঙ্গ কীটে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। পুরুষ-পোকাকার মূখাংশ থাকে না, কিন্তু সাধারণ দুটি চোখ, সুন্দর একজোড়া ডানা, মৌলিক ডানা এবং পশ্চাদ্ভাগের উপর ভর করে একজোড়া মোম-তন্তু থাকে।

এ পোকা সময় সময় মেস্তাগাছকেও আক্রমণ করে, তবে রোসেলের তুলনায় মেস্তায় এর আক্রমণ অনেক কম হয়। এ পোকাকার দমনে ১.৫ শতাংশ শক্তির নিকোটিনিক সালফেট এবং ০.০২ শতাংশ শক্তির 'ফলিডল' প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। [১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফার্মিং-এ প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুর পাটচাষ গবেষণা সংস্থার শ্রী এন দত্তের প্রবন্ধ থেকে]



ভুট্টার চাষ

মহম্মদ মজহর আলি

বর্তমান খাদ্যসংকটের দিনে ভুট্টার চাষ একান্ত প্রয়োজনীয়। ভুট্টা অতিশয় পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। তাহা সত্ত্বেও ইহার চাষ পশ্চিম বাঙলায় খুব কম হইয়া থাকে। ভুট্টার চাষ করিবার প্রণালী না জানা এবং খাইতে অভ্যস্ত না থাকা ইহার প্রসারলাভের অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। তাই চাষীভাইদের অবগতির জন্য নিম্নে ভুট্টার চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

এংটেল মাটি ব্যতীত আর সকল রকম মাটিতে ইহার চাষ করা চলে, তবে দোআঁশ মাটিতে ইহার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। সেচ-পাওয়া জমিতে চৈত্রমাস হইতে ইহার চাষ করা চলে এবং ফলনও খুব ভাল হয়। বৎসরের সব সময়েই ইহার চাষ চলে। সেচ-না-পাওয়া জমিতে প্রধানত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করিতে হয়। বিঘাপ্রতি পাঁচ-ছয় গািড় গোবরসার কিংবা কম্পোস্ট চাষের পূর্বে দিতে হবে। পূর্ব বৎসর পুকুরের পচা পাক দিতে পারলে ইহার ফলন খুব বেশি হয়ে থাকে। বৈশাখ মাসে বৃষ্টির জল হইলে জমিতে পাঁচ-ছয়টি লাঙলচাষ দিয়া ও মই দিয়া সার বেশ ভাল করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া মাটি ঝরঝরে করিয়া তারপর হালকা লাঙলের দ্বারা বাদাম-চাষের অনুরূপ একহাত অন্তর অন্তর সারি করিতে হইবে। পূর্বে ভাল বীজ সংগ্রহ করা বড় একটা সমস্যা ছিল, বর্তমানে আমাদের সরকার উক্ত সমস্যার সমাধান করিয়া চাষীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আমি বিহারের সাঁওতাল পরগনা হইতে আউশে জাতীয় ভুট্টার বীজ আনাইয়া তাহা ব্যবহার করিতেছি। ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ফসল অল্পদিনে জমি হইতে উঠিয়া আসে। বর্তমানবর্ষে সরকারী বীজ লইবার জন্য পত্র দিয়াছি।

সুপক্ক ভুট্টার মোচা হইতে বীজদানাগুলি ছড়াইয়া, পোকাধরা, দাগযুক্ত দুর্বল বীজগুলি বাদ দিয়া, 'অ্যাগোসেন জি এন' দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হইবে। তারপর সারিতে মাটির সমতলের এক ইঞ্চি গভীরে বার-তের ইঞ্চি দূরত্বে একটি একটি করিয়া বীজ ফেলিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। গোরু জুড়িয়া মই দিয়া খুব সহজে ঢাকার কাজ হয়।

যেদিন ভুট্টা বৃদ্ধিতে হইবে সেইদিনই আট হাত অন্তর অন্তর ভুট্টার বীজ না দিয়া চার-পাঁচটি করিয়া ঝিঙার কিংবা বর্ষাতি মিঠা কুমড়ার বীজ দিয়া মাটি ঢাকা দিতে হইবে। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ভুট্টার ও ঝিঙা-কুমড়ার গাছ বাহির হইবে। ভুট্টার গাছগুলি দুই-তিন ইঞ্চি মত হইলে ছোট কোদালি দ্বারা জমির আগাছা পরিষ্কার করিয়া ও মাটি একটু নাড়াচাড়া করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে রোগ-পোকার আক্রমণ কম হইবে এবং শিকড়গুলি আলো-বাতাস পাইয়া গাছগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া তুলিবে। ঝিঙা-কুমড়ার গাছগুলিও সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বাড়িতে থাকিবে। ভুট্টার গাছগুলি নয়-দশ ইঞ্চি বড় হইলে কিছু সুপারফসফেট ও অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়া হইতে দুই ইঞ্চি দূরে দুইদিকে ছড়াইয়া দিয়া সারির দুই ধারের মাটি লইয়া গাছের গোড়ায় ধরাইয়া দিতে হইবে। ভাল-ভাবে মাটি না দিলে বৃষ্টি ও তৎসহ বেশি বাতাস হইলে গাছগুলি পড়িয়া যাইতে পারে। ভুট্টাগাছ জল দাঁড়ানো সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য মাটি দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নালা করিয়া দিতে হইবে যাহাতে বৃষ্টির জল ভালভাবে জমি হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এই সময় ঝিগা-কুমড়ার গাছগুলি লতা ছাড়িতে আরম্ভ করে। ভুট্টার গাছ তিন-চারি হাত উচ্চ হয় এবং ফল ধরিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক গাছে তিন-চারিটি করিয়া মোচা হয় এবং তাহাতে অসংখ্য নারি সারি ফল ধরে। ফল ধরিবার কয়েক দিন পর হইতেই দিনে কাক, টিয়া প্রভৃতি পাখির এবং বনে শেয়ালের অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং তজ্জন্য দিন-রাত্রি অনবরত পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বনে জমিতে থাকিবার জন্য অস্থায়ী ঘর তৈরি করিতে হইবে। রাত্রে মধ্যে মধ্যে টিন বাজাইয়া কিংবা অন্যরকম শব্দ করিয়া শেয়ালগুলিকে ভয় দেখাইতে হইবে। একসঙ্গে সমস্ত ভুট্টা পাকে না। যেমন যেমন পাকিবে, পাকা মোচাগুলিকে ভাঙিয়া লইতে হইবে। সমস্ত পাকিয়া গেলেও গাছগুলি গোড়া হইতে কাটা চলিবে না। কারণ এই সময় ঝিগা ও কুমড়ার লতাগুলি কতক মাটি দিয়া এবং কতক ভুট্টাগাছ বাহিয়া লতাইয়া উঠে এবং ফুল ও ফল ধরিতে আরম্ভ করে। যে জমিতে ঝিগা-কুমড়ার মিশ্র চাষ হয়, তাহাতে শেয়ালের অত্যাচার কম হয়। কারণ শেয়াল ভুট্টা ভাঙিয়া দৌড়িয়া পলাইবার সময় লতাগুলি পায়ে বাধিয়া যায় বলিয়া ধরা শাড়িবার ভয়ে মিশ্র চাষের জমির দিকে বড় একটা আসিতে চায় না। এদিক হইতে ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে।

ভুট্টার মোচার উপরের আবরণ খুলিয়া দিয়া পাঁচ-ছয় দিন রোদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে এবং ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা করিয়া দাড়ি ঝাঙাইয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। শুকনা দানা মোচা হইতে ছাড়াইয়া বস্তাবন্দী করিয়া রাখাও হয়। তবে মধ্যে মধ্যে রোদ্রে দিতে হইবে।

ভুট্টা নানাভাবে খাওয়া যায়। দানাগুলি যখন বাঁচা থাকে, তখন আগুনে একটু পোড়াইয়া লইয়া লবণ ও গোলমরিচের সহযোগে খাইতে অত্যন্ত লোভনীয় ও মধুরোচক হয়। দুইটি ভুট্টাতে একটি লোকের একবেলার জলখাবার হয়। কাঁচা ভুট্টা বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই লোভনীয়। বাজারে কাঁচা ভুট্টার যথেষ্ট সমাদর। এক-একটি ভুট্টা এক

আনা হইতে দুই আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। শুকনা ভুট্টা ভাঙিয়া চাউলের ভাতের মত সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহার ফেন ফেলিয়া দিতে হয় না। এই ভাত তরকারি সহযোগে কিংবা মিষ্টি-সহযোগে দুধ দিয়া খাইতে হয়। ইহার ভাত চাউলের ভাত হইতে খাইতে মধুরোচক ও পুষ্টিকর। ভুট্টার আটা হইতে সুন্দর রুটি ও লুচি তৈয়ার হয়। ভুট্টার ছাতু খাইতে খুব সুস্বাদু। উক্ত ছাতু লবণ সহযোগে কিংবা দুধ-চিনি দিয়া খাওয়া যায়। ভুট্টার খই বালকদের প্রিয় খাদ্য। খই হইতে নাড়ু, মোষা প্রভৃতি নানা রকমের মধুরোচক খাবার তৈয়ারি হয়। পূর্বে কুটুম্ববাড়ি নানারকম খাদ্য পাঠাইবার সময় ভুট্টাজাত খাবার পাঠাইবার রীতি ছিল। ভুট্টার গাছ গোরু-মহিষের প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

ভুট্টা ভাঙিয়া লইবার পর ঝিগা ও কুমড়ার লতায় জমি ঢাকিয়া যায়, তখন আর তাহাদের কোন পরিচর্যা দরকার হয় না এবং করা সম্ভবও হয় না।

আমি গত বৎসর পনের কাঠা জমিতে ভুট্টার চাষ করিয়াছিলাম এবং মিশ্র চাষ হিসাবে অর্ধেক ঝিগা এবং অর্ধেক বর্ষাতি মিঠা কুমড়ার চাষ করিয়াছিলাম। আমার ঝিগা-কুমড়ার ফলন খুব ভাল হইয়াছিল।

আমাদের অঞ্চলে গত চারি বৎসর হইতে অনাবৃষ্টি এবং বন্যার জন্য ধান্য খুব কম হইয়াছিল, আমি এবং আমার বাড়ির সকলে একবেলা ভাত, বৈকালে ভুট্টাজাত খাদ্য এবং রাত্রে গমের রুটি খাই। প্রত্যেক বেলা বিভিন্ন খাদ্য খাইতে খুব রুচিকর হয় এবং আনন্দ পাই। ভুট্টার চাষ করার জন্য আমাকে চাউলের অভাবে অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। এই বৎসর যথেষ্ট গমের চাষ করিয়াছি এবং বেশি জমিতে ভুট্টা-চাষের জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

আমি আমার চষাভাইদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ভালভাবে ভুট্টার চাষ এবং তাহার সহিত ঝিগা-কুমড়ার মিশ্র চাষ করিয়া দেশের খাদ্যসঙ্কট দূর করেন।

কচুরিপানা

শ্রীকৃষ্ণকেশ চৌধুরী

কচুরি আর কচুরিপানা নাম সৌসাদৃশ্যে আপাত-দৃষ্টিতে সমগোত্রীয় মনে হইলেও সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ কচুরির চাইতেও কচুরিপানার সহিত সমধিক পরিচিত। রসনা-রসিকের আসক্তিতে কচুরির উৎপত্তি আর কচুরিপানা বিস্তার লাভ করে তাহার প্রতি অনাসক্তের ঔদাসীন্যের যষ্টিতে নির্ভর করিয়া। কচুরিপানা সহজলভ্য অতি সাধারণ জলজ উদ্ভিদ। বীরভূম ও দার্জিলিং ব্যতীত সমগ্র পশ্চিম বাঙলায়, পূর্ব পাকিস্থানে, আসামে, উড়িষ্যায়, বিহারে, ত্রিপুরার এঁদো পুকুর, নদী-নালা, খালবিলে, এমনি ধানের জমিতে, সর্বত্রই কচুরিপানার দুর্নিবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত আছে। রক্তদেশে নদীর মোহনায়ও প্রভূত পরিমাণে ভাসমান কচুরিপানা সমুদ্রে বহু দূর অবধি দেখা যায়। যদিও লবণাক্ত জলে তাহার আয়ু ক্রমশই স্বল্পতর হইয়া আসে। জলে ভাসিয়া থাকিলেও শীতকালে যখন জল কমিয়া আসে তখন ইহাকে মাটির অভ্যন্তর প্রদেশে আপন শিকড় প্রবেশ করাইয়া স্থির হইয়া থাকিতে দেখা যায়।

আকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য কচুরিপানার পাতা জলের উপর ইতস্তত ভ্রমণ করিতে পারে সহজেই। পত্রের বৃত্তগূলি স্থূলাকৃতি ও অস্থায়ীমূল কাণ্ডের নিম্নদেশ হইতে জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহার ফলেই জলের স্রোতো-বেগে কচুরিপানা আনায়াসে ভাসিয়া বেড়ায়। তদুপরি কচুরিপানার পত্রফলক নৌকার পালের মত বাতাসের আনুকূল্য গ্রহণের শক্তি রাখে বলিয়া বায়ুপ্রবাহের আনুকূলে চলিতে থাকে। কচুরিপানার দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারলাভের মূলে আছে তাহার এইসকল বৈশিষ্ট্যের সহযোগিতা। ফুলের মরসুমে মনোহর নীলাভ ফুলে ফুলে যখন সকল দিক ভরিয়া উঠে তখন বাতাসের তালে তালে ফুল-গুলির সহিত মনও নাচিয়া উঠে। কচুরিপানার পরম রমণীয় ফুলের রূপে মৃদু মন আপন গৃহ-সজ্জায় উৎকৃষ্ট উপকরণরূপে নির্বাচন করে

ইহাকে। ফুলদানির মাথায় তাহার বিকচরূপ পূর্ণবিকাশ লাভ করে গুণগ্রাহীর আদরের মৰ্যাদায়। কিন্তু তাহার এই আপাত-রম্যতার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে কৃষিপ্রাণ বাঙলার অন্তহীন দুর্দশার ভয়ঙ্কর বীজ।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, অতীতের কোন এক অশুভক্ষণে এক মার্কিনী সুন্দরী কচুরিপানার ফুলের শোভায় মুগ্ধা হইয়া প্রথমে ভারতের বৃকে তাহার আমদানি করেন। বোধহয় ব্রাজিলে জন্ম-স্থান বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় তাহাকে “ব্রাজিলিয়ান বিউটি” নামে অভিহিত করা হয়। কচুরিপানার প্রকৃত মূল্য নাম “Eichornia Crassipais,” ইহা একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও Pontideriaceae নামক একজাতীয় উদ্ভিদের পরিবারভুক্ত। ইহার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য বিষকন্যার মত আজ সর্বনাশা হইয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামাঞ্চল ভারতের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এই অক্টোপাশের পেষণে স্পন্দনরহিত হইবার উপক্রম দেখা দিতেছে। গ্রামাঞ্চলের পুকুরগুলিই প্রধানত পানীয় জল সরবরাহ করে। কিন্তু এই কচুরিপানার আক্রমণে তাহা প্রায়শই বিষাক্ত হইয়া যায়। জলপথে যাতায়াতেরও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয় ইহার প্রাবল্যে। ধানের জমিতে কচুরিপানা একবার প্রবেশ করিলে ধান একেবারেই নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। ইহাতে প্রতি বৎসরে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হইতেছে। মৎস্যশাী বাঙালীর মাছ প্রিয় খাদ্য। কিন্তু কচুরিপানা-বহুল জলা-শয়ে মছের চাষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহাতেও বাৎসরিক ক্ষতির অংকট বড় কম দাঁড়ায় না হিসাব কষিলে। কচুরিপানা মশককুলের সরাইখানা। কচুরিপানায় পূর্ণ জলাশয় মশককুলের বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থল। এই মশককুলই ম্যালেরিয়া রোগের বাহন—অর্গণত পল্লীবাসী এই ম্যালেরিয়ার শিকাররূপে পরিণত হয়। অনেকে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে পালাজরুরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে

যেমন জমির কাজ চলে না তেমনি জাতীয় স্বাস্থ্যেরও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। অতএব, কচুরিপানারূপ শত্রুকে সমূলে বিনাশ করা আমাদের সর্ব্বা কর্তব্য।

সরকারী ও বেসরকারীভাবে অনেকবারই কচুরিপানাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সুফল যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ কচুরিপানা যেভাবে দ্রুত ও সহজে প্রসার লাভ করে, ঠিক তেমনি ধ্বংসের চেষ্টাও স্থায়ী ও প্রণালীবদ্ধভাবে করিতে হইবে। বর্তমান ভারত-সরকার কৃষি-অধিকারের মাধ্যমে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছেনঃ শুদ্ধ ধ্বংস না করিয়া তাহা পচাইয়া মূল্যবান সার প্রস্তুত করা হইলে চাষীদের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও আর একদিকে নানা রকম অসুখবিসৃথের হাত হইতে পল্লীবাসীরা রক্ষা পাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কচুরিপানা হইতে প্রস্তুত সার গোবরসার হইতে প্রায় চার গুণ শক্তিশালী ও প্রতি বিঘা ধানজমিতে যদি এক টন (২৭ মণ ২০ সের) প্রয়োগ করা যায় তবে সেই জমিতে প্রায় দুই-তিন মণ ধান বেশি ফলে।

সকল প্রাণীর জীবনে জল, বায়ু ও আহারের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই। উদ্ভিদ-জীবনেও ঠিক সেইরূপ জল-বায়ু, ছাড়াও বিবিধ মূল খাদ্য যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম প্রভৃতির দরকার। এই কচুরিপানা-পচানো সারে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকার ফলে এই সার প্রয়োগে সাধারণত পটাশপ্রিয় ফসল পাট, আলু, শাকসবজি প্রভৃতির ফলন খুব ভাল হয়।

গ্রামে সাধারণত কচুরিপানাকে পোড়াইয়া জমিতে প্রয়োগ করিতে দেখা যায় কিন্তু তাহাতে নাইট্রোজেন ও 'হিউমাস' নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব পবিত্রীকৃত হয়। উদ্ভিদ-দেহের পচনে যে মূল্যবান 'হিউমাস' উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের দেশের জমির পক্ষে অতীব মূল্যবান। সবচেয়ে বড় কথা হইল, আগুনে কচুরিপানা অনেক সময় সম্পূর্ণ ছাইএ পরিণত হয় না, কাজেই অনুকূল অবস্থায় পড়িলে

আবার সতেজভাবে জমিতে দ্রুত ক্ষতের মত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কচুরিপানার সার তৈরি করিতে কোন নালার প্রয়োজন নাই ও কোন বিশেষ পরিপ্রণ বা ব্যয় হয় না, অবসরকালে সামান্য মনোনিবেশ করিলেই চলে। কচুরিপানা-পচানো সারে শতকরা ২.০৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১.১ ভাগ ফসফরাস, ২.৫ ভাগ পটাশ ও ৩.১ ভাগ চুন পাওয়া যায় ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। কচুরিপানা পচাইয়া সার তৈরি করিবার প্রকৃষ্ট সময় হইতেছে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস।

কচুরিপানা হইতে সার তৈরি করিতে হইলে যেসকল স্থান কচুরিপানার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে সেইসকল স্থানের খাল বিল ডোবা হইতে উঁচু সমতল জমিতে গাদা করিয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে। চার-পাঁচ দিন শুকাইবার জন্য রাখিতে হইবে যাহাতে জলীয় ভাগ শতকরা ৯৮ হইতে ৬০এ নামিয়া আসে। গাদাগুলি ১০ ফুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট উঁচু করিতে পারিলে ভাল হয়। এইরকম গাদা হইতে সাধারণত ২৮ মণ সার পাওয়া যায়। প্রতি ফুটে ২-৩ আঙুল পরিমাণ গোবর ও মাটি স্তরের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। গোচনা দিলে সারের গাদা খুব তাড়াতাড়ি পচে ও উদ্ভিদের খাদ্য উপকরণরূপ সার আরও তেজস্কর হয়। দেড় মাসের মধ্যে জীবানুর দ্বারা ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সারের গাদা অনেকটা পচে ও নিচের দিকে নামিয়া আসে। তখন গাদাটি ভাঙিয়া উলটাইয়া নতুন করিয়া পুনরায় গাদা সাজাইতে হইবে। দেড় মাসের মধ্যে গাদাগুলি উত্তমরূপে পচিয়া যায় ও তখন সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়। সার তৈরির পর জমিতে প্রয়োগ করার প্রয়োজন না থাকিলে সারের গাদাগুলি কাদামাটি ও গোবর মিশাইয়া প্রলেপ দিয়া রাখা উচিত যাহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপ ও বৃষ্টির জলে সারের উপকরণগুলি নষ্ট না হয়। এইভাবে আমরা একদিকে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রী বজায় রাখিতে পারি এবং অপরদিকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ংপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে পারি।

মাটির কথা

সব-কিছু সৃষ্টির মূলে মাটি। কথায় বলে, সভ্যতার শিকড় মাটিতে নিহিত। মাটি থেকেই প্রাণশক্তি আহরণ করে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে ধাপে ধাপে।

আমাদের খাদ্য, গৃহপালিত পশুদের খাদ্য, পোশাক, জ্বালানি—সব-কিছুই মাটি যোগাচ্ছে। তাই ভাল মাটি হ'ল যে-কোন দেশের বিশিষ্ট সম্পদ। অতীতে এই মাটিকে অবহেলা করার জন্য বহু শহর, বহু সভ্যতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেজন্য মাটির সংরক্ষণ হ'ল জাতির কর্তব্য।

ভারতীয় অর্থনীতি মূলত কৃষিপ্রধান। আমাদের জাতীয় আয়ের অর্ধেক আসে মাটি থেকে। দেশের সত্তর শতাংশ লোক চাষ-আবাদ করে জীবিকা-নির্বাহ করে। দেশের আর্থনীতিক স্থায়িত্বের জন্য মাটি থেকে একটানা উচ্চহারে উৎপাদন সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন। কারণ, কৃষির সমৃদ্ধি শিল্পের ব্যাপক প্রসার, লাভজনক ব্যবসায়, আর কর্মচঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করে—সংক্ষেপে, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলে।

ভারতে কৃষি-উৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ভূমিক্ষয়। জল আর বাতাসের কার-সাজিতে মাটি ক্ষয়ে যায়, গাছপালার খাদ্যের ঘটে ঘাটতি। শুধু তাই নয়, ভূমিক্ষয়ের ফলে ভূগর্ভস্থ জলভান্ডার হ্রাস পায়, নদী-নালায় পলি-মাটি জমে জলের প্রবাহ হয় ব্যাহত, যোগাযোগ হয় বিচ্ছিন্ন, আর জমির উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের কৃষকদের জীবনধারণের নিম্ন মান আরও নিম্নগামী হয়।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, একটি অরক্ষিত ক্ষেতের উপরের সাত ইঞ্চি মাটির স্তর সাতাশ বছরে নিশ্চিহ্ন হ'তে পারে। অথচ ঐ সাত ইঞ্চি মাটি সৃষ্টি করতে পৃথিবীর হয়তো পাঁচশ' থেকে

এক হাজার বছর সময় লেগেছিল। কৃষি-উৎপাদনের মূল অবলম্বন মাটিকে একবার ক্ষয় হ'তে দিলে বেশি সার, উন্নত বীজ ও চারাগাছ রক্ষার আরও ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করেও কিছু হবে না। আমাদের জমি থেকে অব্যাহতভাবে আরও বেশি শস্য পেতে হলে মাটিকে বাঁচাতেই হবে।

ভারতে যুগ যুগ ধরে মাটিকে অবহেলা করা হচ্ছে, অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিস্তৃত অঞ্চল আজ আবাদের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আরও অনেক জমিতে উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রায় কুড়ি কোটি একর জমি সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার। এর মধ্যে ১০ কোটি একর আবাদী জমি, ৫ কোটি একর পতিত ও আবাদের অযোগ্য এবং ৫ কোটি একর মরু-অঞ্চল—প্রধানত রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত।

ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থায় জমির নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হয়। এতে শস্যোৎপাদন বেড়ে-গুণ বৃদ্ধি পায় এবং মাটির উৎপাদন-ক্ষমতা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। তা ছাড়া, নদীতে পলিমাটির পরিমাণ কম হয়, ফলে বন্যার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে খাদ্যশস্যের পুষ্টি-মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অতীতে ভারতে ভূমি-সংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। অনির্দিষ্ট মালিকানার জমি যতদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল ততদিন ভূমি-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি নি। কয়েকজন কৃষক তাদের জমির যত্ন নিত, কিন্তু বেশির ভাগই জমির ক্ষয়রোধ করার কোন ব্যবস্থাই করত না। শেষে জমি চাষের অযোগ্য হ'লে তারা আর-এক জমিতে গিয়ে চাষ শুরু করত। বস্তুত

স্বাধীনতালভের আগে ভূমি-সংরক্ষণের জাতীয় কার্যসূচি আমরা গ্রহণ করি নি।

পরিকল্পনা কমিশন ভূমিক্ষয় ও জমির অবনতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁদের সুপারিশ অনুসারে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ভূমি-সংরক্ষণ পর্ষদ গঠিত হয়। ভূমি-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা, কৃষি-সংরক্ষণের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কর্মীদের শিক্ষাদান এবং রাজ্যসরকার ও নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিকে ভূমি-সংরক্ষণের কার্যসূচি রূপায়িত করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কারিগরি এবং আর্থিক সাহায্য ও ঋণদানের অধিকার এই পর্ষদকে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ভূমি-সংরক্ষণ পর্ষদ সমীক্ষা, গবেষণা, প্রদর্শন, শিক্ষণ ও উন্নয়নের একটি সুসংবদ্ধ কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূমিক্ষয় সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দেৱাদুন (হিমালয় অঞ্চল), চন্ডীগড় (শিবালিকসের বাহির্ভাগ), চাতরা (জলাশয়ের তত্ত্বাবধান), কোটা (রাজস্থানের পর্বতমধ্যস্থ সন্ডি পথগুলি), বাসাদ (গুজরাটের কোটার জমি), আগ্রা (যমুনার শাখা-প্রশাখা), বেলারি (কাল মাটি), উতকামন্ড (পার্বত্য অঞ্চল) এবং যোধপুর্ (মরুভূমি) নীতি আঞ্চলিক গবেষণা ও প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। রাণ্ডা-মাটি অঞ্চলের ভূমি-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য পর্ষদ উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশে দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করবেন। যোধপুর্ গবেষণা কেন্দ্রে শুল্ক অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজস্থানের মরুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য পর্ষদ তৃণ-প্রান্তরের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

পর্ষদ উর্ধ্বতন ও নিম্নতন অফিসারদের হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া, সমষ্টি-উন্নয়ন রকের কর্মী ও বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি-সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত কৃষি-ইঞ্জিনীয়ারদের

সুবিধার্থে অল্পকালের জন্য শিক্ষণ-কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টদের শিক্ষার জন্যও পর্ষদ আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন।

১৯৫৮ সালের মে মাসে সর্ব-ভারতীয় ভূমি ও জমি ব্যবহার সমীক্ষা শুরুর হয়। এখন পাঁচটি বড় নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার—দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, হীরাকুদ, ভাক্রা, চম্বল ও মাচকুন্দ—জলাশয়ে সমীক্ষা চলছে। এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ একর জমি পরীক্ষা করা হয়েছে।

ভূমি-সংরক্ষণ কাজের সাফল্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে। কতকগুলি বিশেষ তথ্য উপলব্ধি করে তাদের কাজ করতে হবে।

জমি ঢাল হলেই ভূমি ক্ষয় হবে। খাড়া এবং লম্বা ঢাল জমিতে নিজে থেকে যেসব গাছপালা জন্মায় সেগুলি সবুজে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এতে ভূমিক্ষয় কম হয়। চাষ-আবাদের উদ্দেশ্যে এসব গাছপালা সাফ করলে ভূমিক্ষয় হবেই আর তাতে চাষের জমি নষ্ট হবে, পলিমাটি জমে জলধারা ও নদীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মাটিকে বাঁচাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল খাড়া ঢাল জমিতে বনসৃষ্টি ও তৃণ-ভূমির উন্নয়ন করা।

ঢাল জমিতে চাষ-আবাদ করার আগে যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জল জমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মাটি কেটে ও বাঁধ দিয়ে শস্যের প্রয়োজনীয় জল জমানো সম্ভব।

জমি আবাদযোগ্য করার জন্য মাটি খোঁড়ার সময় যেসব পাথর উঠবে সেগুলি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে না ফেলে বাঁধ তৈরির কাজে লাগাতে হবে। যেসব জমিতে ক্ষয় শুরুর হয়েছে সে সম্বন্ধে কি করতে হবে তা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে ভূমি-সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ জানিয়ে দেবেন।

ভূমি-সংরক্ষণ ও শুল্কাঞ্চলের চাষ-আবাদের সঠিক পদ্ধতি—যা অব্যাহতগতিতে কৃষি-উৎপাদন

এর জন্য প্রয়োজন—উদ্ভাবনের জন্য পৰ্যদ-
চন্ন রাজ্যে চার্লিটি প্রদর্শন পরিকল্পনা
নায়কের সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রত্যেকটিতে অব-
কা অঞ্চলের এক হাজার একর জমি অর্থাৎ
বিকাশনের জন্য একটি নালা থাকবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২০ লক্ষ একর আবাদী
জমি এবং ১০ লক্ষ একর অন্য ধরনের জমি
সংরক্ষণের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য
খরচ হবে আনুমানিক ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।
এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা
যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই
কার্যসূচি আরও শক্তিশালী করা হবে। তখন

খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য
এই কার্যসূচিতে আবাদী জমির উপরেই বিশেষ
গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তা ছাড়া, নদী-উপত্যকা
পরিকল্পনা, বন্য-নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য অঞ্চল, মরু-
অঞ্চল, গিরি-সঙ্কট, পতিত জমি ও অরণ্য-ক্ষয়ের
দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। নোনা ও ক্ষার
মাটির সংস্কারের কাজও শুরুর করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভূমি-
সংরক্ষণ কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণের উপর
বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কারণ, ক্ষেত্রে এ কাজ
শেষ পর্যন্ত কৃষককেই করতে হবে—মাটিই তার
জীবিকা যোগায়।



নানা স্থানে প্রদর্শনী

পেদঙে

গত ৩রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন, পশু-চিকিৎসা ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ দার্জিলিং জেলার পেদঙে একটি পশুপালন, পশুচিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পাম্ববতী অঞ্চলসমূহে বহু অধিবাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পশুপালন মন্ত্রী বিশেষ করে দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন সরকারী উন্নয়নকার্যের অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক এক ভাষণ দেন। তিনি কৃষি ও পশুসম্পদ উন্নয়নের এবং কুটিরশিল্পের গুরুত্বের কথাও বলেন।

শ্রী সি এইচ ওয়াংদি মন্ত্রিমহাশয়কে স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং কাজি এস জি দোরজি ও ক্যাপ্টেন এল পি শর্মা স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কালিম্পঙের মহকুমা-শাসক এবং প্রদর্শনী কর্মিটির সভাপতি শ্রী ডি সি মদুখার্জি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

৩রা মার্চ বৈকালে কাজি এস জি দোরজির সভাপতিত্বে জাতীয় সপ্তয় আন্দোলনের উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি অ্যাসিস্টেন্ট ন্যাশনাল সেভিৎস অফিসার শ্রী এন কে দত্ত পরিকল্পনাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। নমুনা-স্বরূপ ১০৫ টাকার জাতীয় সপ্তয় সার্টিফিকেট বিক্রি হয়। দার্জিলিংয়ের কৃষি-অধীক্ষক এতৎ-সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক 'প্রগতিশীল কৃষিজীবী সম্মেলন'এর উদ্বোধন করেন। লেপচা নৃত্য এবং প্রচারবিভাগের তথ্যচিত্র প্রদর্শনী বহু লোককে আকৃষ্ট করে।

৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শনী চলে এবং কর্মসূচির মধ্যে ছিল সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, একাঙ্ক নাটক

প্রতিযোগিতা, মহাবীর ইয়ুথ ক্লাব কর্তৃক নেপালী নাট্যাভিনয়, খেলাধুলা, শিশু-প্রদর্শনী, তীরখ চালনা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্য এবং বিচিত্রানুষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ এবং 'ইনফরমেশন সার্ভিস অফ ইন্ডিয়ান ইজিদের স্টলের ব্যবস্থা করে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

প্যাটেলনগরে

মহম্মদবাজার ব্লক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বীর জেলার প্যাটেলনগরে (১৯৬০) সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজনা করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলাশাসক শ্রীমেনরঞ্জন সরকারের পত্নী শ্রীম অশোকা সরকার। 'সেবা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনীকুমার মদুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বক্তৃতা এরূপ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উদ্বোধনী সভায় ভাষণ দেন। বহু গ্রামবাসী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী সভার সভাপতি জেলাশাসক এই প্রদর্শনীর সুবিধা গ্রহণের জন্য গ্রামবাসীদের আহ্বান জানান; কারণ এর ফলে অবসর-বিটে ও শিক্ষা, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। তিনি বলে যে, ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও পরিমাণ বৃদ্ধির কৃষকদের নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা প্রয়োজন। এ আরও বলেন যে, পশুপালন ও কুটিরশিল্পের প্রকৃত অগ্রগতি গ্রামবাসী ও সরকারের মধ্যে যোগিতা ও কঠোর শ্রমের উপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জেলা প্রচার-সংচালক-প্রদর্শনী ও প্রচারবিভাগের লোকশাখার নাট্যাভিনয়ের পরে অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়।

বিষ্ণুপুরে

বিষ্ণুপুর কাছারি ময়দানে ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) পর্যন্ত “বিষ্ণুপুর কুম্ভ প্রদর্শনী” নামে একটি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য পশুপালন বিষয়ক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পীর দ্বারোন্মোচন করেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক এ কে মজুমদার, আই এ এস। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং জেলার ও কলিকাতার বহু বেসরকারী ষ্টল এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রদর্শনীর অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল বাঁকুড়ার কলা প্রচার বিভাগের শ্রুতিচাক্ষুষী প্রদর্শনী এবং রবিভাগের লোকরঞ্জন শাখার ‘চাষী’ ও ‘দিশারী’ প্রাভিনয়।

গণজ্ঞান, শিল্প ও আদিবাসী-কল্যাণ দফতরের শ্রীভূপতি মজুমদার এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুবী মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

তেপারপাড়ায়

পটাশপুর ব্লকের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলার তেপারপাড়া বিদ্যালয়ে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) চারদিন-ব্যাপী এক কৃষি ও শিল্প উন্নয়নমূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি-সংস্কার) শ্রী এস সি ফার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্প ও হস্তশিল্প, কার্ফ ও তালপত্র নির্মিত শৌখিন দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় এক সংস্থা কর্তৃক অভোজ্য থেকে সাবান প্রস্তুত করার প্রণালী প্রচুর হর সম্ভার করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আয়োজিত স্টল ছাড়াও রাজ্য-সরকারের ‘মৎস্য, প্রচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক স্টলে স্টল খোলা হয়। কৃষি-স্টলে আদর্শ একটি মডেল দেখানো হয় এবং একটা ছোট জাপানী প্রথায় কৃষিকাজ প্রদর্শন করা হয়।

প্রদর্শনীকালে মহিলা ও কৃষিজীবীদের জন্য পৃথক পৃথক দিবসের ব্যবস্থা থাকে। ঐ সময় নারী-সমাজকল্যাণ ও কৃষির উন্নতিবিষয়ক আলোচনা চলে।

ব্রতচারী নৃত্য, তরঙ্গা, নাট্যানুষ্ঠান ও রাজ্য-সরকারের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে শ্রুতিচাক্ষুষী প্রদর্শনীমূলক এক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি উক্ত প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভগবানপুরে

মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে ১৯এ ফেব্রুয়ারি থেকে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি-সংক্রান্ত একটি পাঁচদিবস-ব্যাপী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী এস সি সরকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির মহকুমা-শাসক শ্রী এ কে সেন।

ভগবানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রদর্শনী-সমিতির সভাপতি শ্রী এস এন মান্না এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে কৃষি ও শিল্পের উন্নততর পদ্ধতি প্রদর্শনকারী এরূপ প্রদর্শনী গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন।

২০এ ফেব্রুয়ারি একটি ‘শিশু প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ হইতে ২ বৎসর বয়স্ক শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় দিনে কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্বল্প-সংখ্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। নয়াদিল্লির বিশ্ব কৃষিমেলা দর্শনকারী স্থানীয় কৃষক শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি উন্নততর কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষার কথা বর্ণনা করেন।

২১এ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ‘সমবায় দিবস’ উপলক্ষে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা চলে। ঐ ব্লক এলাকায় ৯১টি সমবায় সমিতি আছে, তার মধ্যে ৭১টি ঋণদান সমিতি।

বসুন্ধরা : ১২শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

বেসরকারী সংস্থাগুলি ছাড়াও শিল্প-অধিকার ও প্রচারবিভাগ কর্তৃক স্টল খোলা হয়। রক-প্রাধিকার কর্তৃক আয়োজিত স্টলগুলিতে স্থানীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়। 'স্বল্প-সংখ্য' সম্পর্কিত একটি স্টলও ছিল।

করিমপুরে

নদিয়ার উত্তর-সদরের মহকুমা-শাসক গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) করিমপুর জাতীয় সম্প্রসারণ রক কর্তৃক সংগঠিত করিমপুর থানা কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে মহকুমা-শাসক গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রদর্শনীর সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে করিমপুর থানার কৃতিত্ব প্রদর্শনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সেইসঙ্গে উন্নত কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উন্নততর জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া শিক্ষাদানও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্যল পল্লী-অর্থনীতিতে কৃষির অংশ সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক বক্তৃতা করেন। তাঁর ঐ বক্তৃতায় সমবায় কৃত্যকের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই প্রদর্শনীর এক সপ্তাহ ধরে চলে। এতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যথা, কৃষি, প্রচার, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন বিভাগের স্টল ও স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের কয়েকটি বেসরকারী স্টল ছিল। প্রচার-বিভাগের ও যুক্তরাষ্ট্র প্রচার-সংস্থার তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং বিভিন্ন আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

টোডে টাংটায়

ভারত-ভূটান সীমান্তে অবস্থিত টোডে টাংটায় ২৭এ ফেব্রুয়ারি থেকে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অর্থসাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা এই প্রদর্শনীর সংগঠিত হয়েছিল।

কালিম্পঙের মহকুমা-শাসক বহু পার্বত্য অধিবাসীর উপস্থিতিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এইরূপ প্রদর্শনীর গুরুত্ব ব্যাখ্যাপূর্বক জনসাধারণকে নিজ নিজ গ্রামের উন্নয়নে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান এবং কাজে সরকারের সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রদর্শন ক্ষেত্রের সন্নিহিতে নির্মীয়মাণ জলঢাকা জলবিদ্য প্রকল্প থেকে ভবিষ্যতে লাভ সুযোগসুবিধার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রদর্শন সমিতির সচিব শ্রীমানসিং টিংবু, ক্যাপ্টেন এল শর্মা, ফাদার ইগারম্যান, শ্রী আর বি রায় এবং কালিম্পঙের মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্রী ডি আর সেন।

প্রদর্শনীরক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। এ ছাড়া খেলাধুলা, শিশু-প্রদর্শনীর এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। ২৯এ ফেব্রুয়ারি মহকুমা কৃষি আধিকারিক কর্তৃক পুরস্কার বিতরণের পরে প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বারুইপাড়ায়

বারুইপাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতায় হুগলি জেলার সিংগুর সমষ্টি উন্নয়ন রক কর্তৃক প্রণোদিত বারুইপাড়ায় একটি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় ফেব্রুয়ারি (১৯৬০)। হুগলির জেলাশাসক শ্রী এন বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেলাশাসক গ্রামে এরূপ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। স্বার্থে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সম্মত ও উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় হবার জন্য তিনি কৃষকদের উৎসাহিত করে প্রদর্শনীর পরিদর্শন করিয়া জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন-কার্যাবলী সম্পর্কীয় তথ্য ও

গ্রহণ করার জন্য তিনি জনগণকে অনুরোধ জানান।

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত ঘোষ এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

শ্রী জেলাশাসক বারুইপাড়ায় পল্লীনেতাদের শিবিরের উদ্বেোধন করেন এবং শিক্ষণার্থী-স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে তাঁদের কর্তব্য দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন এবং সরকার জনগণের সহযোগিতায় দেশগঠনে সাহায্য করতে বলেন।

একদায়

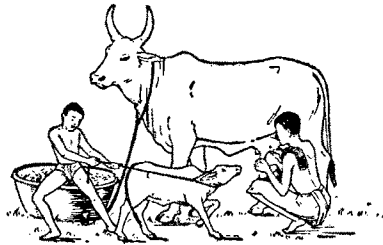
সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার তাকদায় একটি কৃষি, গৃহপালিত পশু, স্বাস্থ্য-তথ্য-শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি রাংলি-রাংলিয়ট সমিষ্টি উন্নয়ন ব্লক কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল এবং দ্বারোদ্ঘাটন করেন দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রী এন কে বিশ্বাস। প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে স্থানীয় কৃষিজ ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিক দর্শক আকর্ষণ করে। প্রদর্শনীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সিংগিটাস

মৌমাছি-পালনকেন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত স্টল। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত উক্ত কেন্দ্র বর্তমানে সাতটি গ্রাম নিয়ে কাজ করছে এবং তার অধীনে ৪৫জন মৌমাছিপালক এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মৌচাক সমন্বিত ১০৬টি উপনিবেশ আছে। ১৯৫৯ সালের শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে মোট ৩৫৩ পাউন্ড মধু উৎপাদন করা হয়।

গবাদি পশু বিভাগে কৃত্রিম প্রজনন প্রণালীতে জাত আটটি জার্সি শ্রেণীর গোরু রয়েছে। পল্লী-বাসীরা এই বিভাগটি সম্পর্কে গভীর কৌতূহল অনুভব করে। কৃত্রিম প্রজনন পরিকল্পনা চালু করার পর থেকে রাংলি-রাংলিয়ট সমিষ্টি উন্নয়ন ব্লকেই ৫০টির অধিক জার্সি শ্রেণীর গোরু রয়েছে।

আসাননগরে

সম্প্রতি নদিয়া জেলার আসাননগরেও একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাজসরকারের বিভিন্ন বিভাগ যথা কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ এবং স্থানীয় মহিলা সমিতি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। নদিয়ার জেলাশাসক শ্রী এ কে দত্ত এর উদ্বেোধন করেন।



টুকিটাকি

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যিকতা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ১৯৬০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুরে বেলদা শ্রীগোরাঙ্গ চিত্রমন্দিরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হন। ব্যবস্থা পরিষদের এবং ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় সদস্যগণও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্ত্রিমহাশয় সরকার-নির্ধারিত খাদ্যোৎপাদন-লক্ষ্য এবং রাজ্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ-সমিতির প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করেন। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে আছে সমগ্র রাজ্যে বহুসংখ্যক গভীর নলকূপ খনন, সেচনের অন্যান্য সুবিধার সম্প্রসারণ, উন্নত শ্রেণীর বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি, ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার, কম্পোস্ট, জৈবসার ইত্যাদি বণ্টন এবং পতিত জমি উদ্ধার।

মন্ত্রিমহাশয় সমবেত সকলকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করবার আবেদন জানান। যুক্ত উন্নয়ন কমিশনার শ্রী আর ঘোষ, আই এ এস এবং কৃষি-অধিকর্তা ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দীও উক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেন।

পল্লী-অর্থনীতির পুনর্গঠন

বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার বলেন যে, কুটিরিশিল্পের উন্নয়নই ভারতের পল্লী-অর্থনীতির পুনর্গঠনের একমাত্র উপায়।

গত সপ্তাহে ধাত্রীগ্রাম প্রদর্শনী-মণ্ডপে পুরস্কার-বিতরণ-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বকালে শ্রী সাত্তার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষিকার্য অবলম্বন করার জন্য কৃষিজীবীদের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, পল্লীর জনগণকে

নতুন বৃত্তি শিক্ষা এবং কুটিরিশিল্পের মধ্য দি চিরাচরিত চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীব করতে হবে। কুটিরিশিল্পের উন্নয়নের সাহ ভারতের পল্লী-অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্ধমানের কৃষি-অধীক্ষক অনুষ্ঠানে প্রধা অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং সদুলতান ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীনিমং অ বেলকুলির শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনে সভায় ভাষণ দেন।

ক্ষুদ্র সেচন-পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী-কল্যাণ বিভ এই রাজ্যের অনগ্রসর এলাকাসমূহে ২৬টি সেচন-পরিকল্পনার রূপায়ণ অনুমোদন করেছে। এইসকল পরিকল্পনা রূপায়ণে আনুমানিক মোট হবে ২,০৬,৫৯৬ টাকা। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ১৩,৭৮৫ একর জমি উপকৃত এবং ২,১০৫ টন খারিফ ও ৯৯০ টন রবি শ উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। চাঁদ্বশপরগনায় মেদিনীপুরে ৩টি, বাঁকুড়ায় ১০টি ও পুরদুর্গ ৬টি পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিগবেষণা সমিতি

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গবেষণা সমিতি পুনর্গঠন করা হয়েছেঃ—সভ —কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী শ্রী কান্তি ঘোষ; সদস্যগণ—ডঃ জে এন মদু ডি এস-সি; ডঃ এস সি গুহ, ডি এস-সি, আই; অধ্যাপক পি কে সেন; ডঃ এইচ রায়, এম এস-সি, পি-এইচ ডি, এফ এন ডঃ এ এন বোস, এম এস-সি, পি-এইচ ডি; প বঙ্গ-সরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন সচিব (পদাধিকারবলে) শ্রী আই বি চ্যাটার্জি

সি, এল এগ; ডঃ পি এন ভাদুড়ী; ডঃ
সি রায়, এম এস-সি, পি-এইচ ডি, পশ্চিম-
ভারত কৃষি-অধিকর্তা (পদাধিকারবলে); পশ্চিম-
ভারত পশুপালন ও পশুচিকিৎসা কৃত্যক অধিকর্তা
(পদাধিকারবলে); বিড়লা কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের
সুফ (পদাধিকারবলে); বংগীয় পশুচিকিৎসা
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে)।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা সমিতির সচিবরূপে
করবেন।

স্যাগণ তিন বৎসর বা পদনরাদেশ পর্যন্ত
দে থাকবেন। এই সমিতির কাজ হবে কৃষি,
পালন ও পশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে গবেষণা-
সম্মত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান,
ও খাদ্যোৎপাদন দফতর, পশুপালন ও পশু-
চিকিৎসা দফতর ও বন-দফতরের অধীন সংগঠন-
সমূহের পরিচালিত গবেষণার ফল মাঝে মাঝে
সমীক্ষা করা, এসকল সংগঠনের এবং অন্যান্য
ফল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের গবেষণার জন্য
স্বাক্ষরের কাছ থেকে অনুদান প্রার্থনা করা
এবং সেসবের গবেষণার পরিকল্পনা সম্বন্ধে
সরকারকে পরামর্শ দান, ভারতীয় কৃষিগবেষণা-
সমিতি এবং ভারত-সরকারের অধীন অনুদান-
সমিতির নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত
নাগরিক পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষা করা এবং
সরকারী গবেষণা-কর্মী ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন-
সমূহের সহিত যোগাযোগ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট দফতর-
সমূহকে সাহায্য দান।

১৯৬০ সালে জাতীয় সঙ্ঘ সপ্তাহ

১৯৬০ সালের ৩রা মার্চ কার্শিয়ঙের মহকুমা-
শ্রী এ কে গুপ্তের সভাপতিত্বে কার্শিয়ঙের
স্টাড পাবলিক লাইব্রেরিতে জাতীয় সঙ্ঘ
সপ্তাহের উদ্বেদন হয়। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ,
সমাজ ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতী-
ক, প্রাক্তন সামরিক আধিকারিক, বিভিন্ন চা-
র ম্যানেজার ও ট্রেডইউনিয়ন কর্মীবৃন্দ,

পল্লী-অঞ্চলের মণ্ডল ও জনগণ উক্ত সভায় উপস্থিত
ছিলেন।

সভায় সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং জাতীয় পরিকল্পনায়
স্বল্প-সঙ্ঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়।

শ্রী এ কে গুপ্ত সভাপতির ভাষণে বার্কো
সঙ্ঘের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন
যে, রাজ্য ও ব্যক্তি পরস্পর আব্বিত এবং উভয়ের
অগ্রগতির জন্য এককে অপরের সাহায্য করতে হবে।
সেইজন্য জনগণকে সঙ্ঘে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং
জনসাধারণের ও সমগ্রভাবে দেশের উন্নতিবিধানের
জন্য কিছু কিছু লক্ষ্য করতে হবে।

সভায় নমুনাস্বরূপ ১,০০০ টাকারও অধিক
মূল্যের জাতীয় পরিকল্পনা সঙ্ঘ সাটির্সিফিকেট
বিক্রি হয়।

১লা মার্চ থেকে ৭ই মার্চ (১৯৬০) পর্যন্ত
কার্শিয়ঙ ও মিরিক থানার অধীন চা-বাগান, বস্তী,
হাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে উক্ত সপ্তাহ প্রতিপালিত
হয়।

হাতির দাঁতের কাজের প্রতিযোগিতা

মর্শিদাবাদের জেলা শিল্প-আধিকারিকের
অফিসে সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীর জন্য হাতির
দাঁতের শিল্পের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
তাহাতে মর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ভাস্করদের শিল্পকৃতি
দেখানো হয়।

প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল মর্শিদাবাদের প্রাচীন
হাতির দাঁতের শিল্পের উন্নয়ন। এককালে এই
শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও বাজার লাভ করেছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন
যথাক্রমে 'ময়ূরপঙ্খ নৌকা' ও 'রথগাড়ি'র জন্য
শ্রীহরিপদ ভাস্কর ও শ্রীশশিভূষণ ভাস্কর। তাঁরা
উভয়ই বহরমপুরের খাগড়ার অধিবাসী।
শ্রীসুশীলকুমার ভাস্কর, শ্রীঅভিনন্দ ভাস্কর ও
শ্রীললিনাক্ষ ভাস্কর তিনটি তৃতীয় পুরস্কার লাভ
করেন।

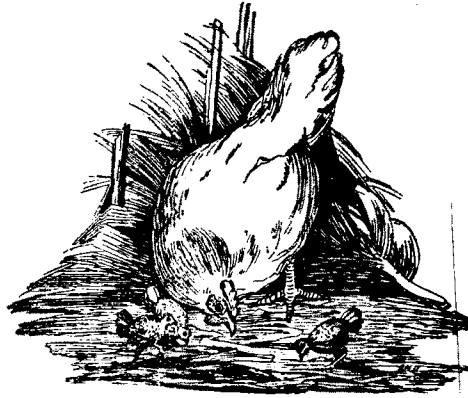
মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্প এক সময়ে খ্যাতির শিখরে উন্নীত হয়েছিল। সে সময়ে শৌখিন রাজসভা ও ধনী ব্যক্তিগণ এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজও মুর্শিদাবাদের ভাস্করদের বিশিষ্ট শিল্পকীর্তি কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও প্রভূত চাহিদা সৃষ্টি করতে সমর্থ।

গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির রোগ প্রতিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পশুচিকিৎসা-অধিকার কর্তৃক ১৯৫৯ সালের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে রিন্ডারপেস্ট, রানীক্ষেত প্রভৃতি নিবার্য ব্যাধির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রায় দুইলক্ষ পশুপক্ষীকে টিকাদান করা হয়েছে। এই সময় রাজ্যে গো-মহিষ ও হাঁসমুরগির মহামারীর বিরুদ্ধে

প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থাাদিও গৃহীত হয়। সময়ে রিন্ডারপেস্টের বিরুদ্ধে ৭,০০০টি পশু হেমোরজিক সেন্টিসেমিয়ার বিরুদ্ধে ৩০ পশুকে, রানীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে ২০,০০০ হাঁসমুরগিকে, ব্ল্যাককোয়ার্টারের বিরুদ্ধে ৩,০০০ অধিক পশুকে এবং ম্যানগ্রাক্সের বিরুদ্ধেও সমসং পশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে পশুচিকিৎসা অধিকারের বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে সাধারণ রোগে আক্রান্ত ৬৮,০০০-এর পশুপক্ষীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

বর্ধমান, পূর্বুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্মূল করার অভিযানে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে ৯৬,০০০-এর অধিক পশু প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাধুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মুনোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

রাজা হবেন রাঁধুনি



সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পেটুক রাজার দেশ। সকাল পেটুক রাজা খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। রাজসভাতে বসেও তিনি কেবল খাওয়ার কথাই ভাবেন। এমন পেটুক তিনি। সেদিন তাঁর কি খেয়াল হলো, মন্ত্রী, সাত্রী, পারিষদ আর প্রজাদের ডেকে তিনি বললেন :

দেখো চল্লিশ বছর ধরে আমি তোমাদের রাজা। তোমাদের সুখ-দুঃখ আর ভাল মন্দ নিয়েই আমার দিন কেটেছে। এমন অবিবাহিত থেকেই আমার জীবনটা হরত একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আমার এ রাজ সিংহাসনে বসবার জন্য একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী চাই। তাই আমি আজকের এই প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করছি আমার রাজ্যের যদি কেউ আমাকে মুরগীর মাংস এমন করে রোধে খাওয়াতে পারে যাতে আমি সত্যাকার মুরগী মাংসের স্বাদ পাবো, তাকেই আমি এ সিংহাসনে বসাবো। তবে সাবধান! যার রান্নাতে আমি সত্যাকার মুরগী মাংসের স্বাদ পাবো না, সে রাঁধুনির আমি জিভ কেটে নেবো।

ঘোষণা শুনে পেটুক রাজার রাজ্যের যত রাঁধুনি ছিল সবাই মুরগীর মাংস রোধে আনতে লাগলো আর এক এক করে জিভ কাটা যেতে লাগলো। কেউই রাজার মন মতো আর রোধতে পারে না। শেষকালে এক সাধারণ ঘরের মেয়ে মাংস রান্না করে এনে রাজাকে বললো, ‘মহারাজ, এ মুরগীর মাংস আমার হাতে রাঁধা একবারটি খেয়ে দেখুন।’

রাজা একটু অবাক হলেন। সত্যিই অপূর্ব রান্না! তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে রাজা বললেন, ‘চমৎকার রোধেছো। একেই বলে রান্না! আমার মৃত্যুর পর তুমিই বসবে এ রাজ সিংহাসনে। তবে বলতো দেখি, এমন রান্না শিখলে কোথায়?’

মেয়েটি বললো, ‘মাংসের এমন সুস্বাদের জন্য এক মাত্র দায়ী ভেষজ বনস্পতি যা দিয়ে আমি রোধেছি। এর ব্যবহার আমি দিদিমার কাছে শিখেছিলাম। রান্নার কাজে এটি যাহুর মতো কাজ করে। এর বিশেষ গুণ হলো, এতে খাদ্যের সত্যাকার স্বাদ ছুটিয়ে তোলে, অথচ এর নিজের কোন স্বাদই নেই।’ ‘ডাল্‌ডা’ বনস্পতি উৎকৃষ্টতায় অন্যান্য বনস্পতিকে হার মানায়। সে কোন ফ্রিনিষই আপনি রোধতে চান, সে রান্নায় ভাল ফল পেতে হলে পাকা রাঁধুনির সাথে চাই ‘ডাল্‌ডা’ মতো বনস্পতি। তখন দেখুন এর স্বাদ—অনেকেরই জোত সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

সরকারের নিৰ্দ্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ‘ডাল্‌ডা’ খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এর প্রতি অউন্সে ১০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ এবং ৫৬ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ যোগ করা হয়।

তাই আজ থেকে আপনার ঘরেও ‘ডাল্‌ডা’ রাখা প্রয়োজনীয় নয় কি? বাড়ীর সবাইকে অবাক করে দিন, ‘ডাল্‌ডা’য় রাঁধুন, তারপর দেখুন, আপনার রান্নার তারিফ! তবে কেনার সময় সবুজ হলুদ ‘ডাল্‌ডা’ টিনের গায়ে খেজুর গাছের ছাপটি দেখে নেবেন।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহে সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১।	সিউড়ি	সিউড়ি।
১।	বারাসত	বারাসত।	২২।	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২।	ডায়মণ্ডহারবার	ডায়মণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩।	বেহালা	বেহালা।	২৩।	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪।	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪।	বিক্রপুর	বিক্রপুর।
৫।	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫।	মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর।
৬।	কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি।	২৬।	বেন্দা (মেদি: দঃ)	কণ্টাই রোড
৭।	রানাবাট	রানাবাট।	২৭।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮।	ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড
৮।	কালি	খাগড়াবাট।	২৯।	তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি) তমলুক
৯।	অজীপুর	অজীপুর রোড	৩০।	কাঁধি	কণ্টাই রোড
১০।	লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	উত্তর এলাকা		
১১।	বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১।	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২।	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২।	বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ
১৩।	রায়কৃষ্ণপুর	হাওড়া	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩।	মালদহ	মালদহ কোর্ট
১৪।	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫।	আরামবাগ	চাঁপাডাঙ্গা	৩৪।	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি
১৬।	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫।	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬।	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭।	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭।	কালিম্পাং	শিলিগুড়ি
১৮।	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮।	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯।	কালনা	বাগনাপাড়া	জেলা কোচবিহার		
২০।	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯।	কোচবিহার	কোচবিহার
			৪০।	মাথাভাঙ্গা	কোচবিহার

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাওয়ারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

ন—

পালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

পালন-আধিকারিক : : ঐ

পালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

ও ছগলি—

পালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

পশুপালন-আধিকারিক, ছগলি : চুঁচুড়া।

পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

বপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

—

পালন-আধিকারিক : : মালদহ।

পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পঙ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেন্ডু।

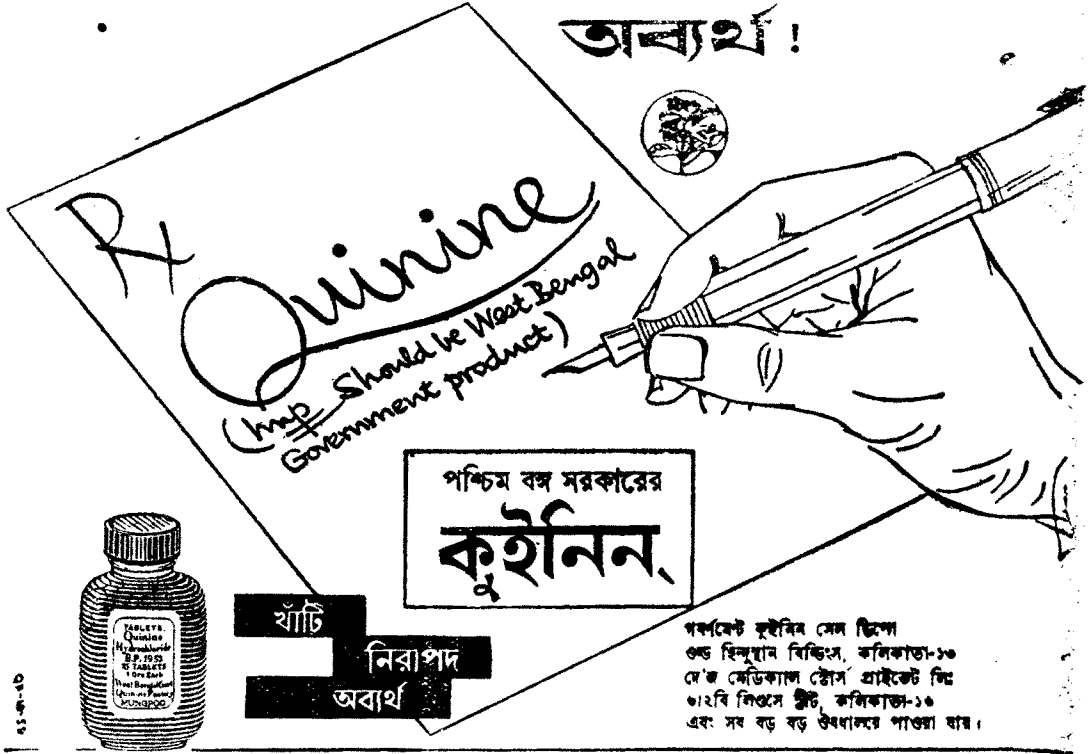
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

অব্যর্থ!



**পশ্চিম বঙ্গ সরকারের
কুইনিন**

খাঁটি
নিরাপদ
অব্যর্থ

পর্কসেট কুইনিন সেল ডিস্ট্রিক্ট
ওফিস হিন্দুস্থান বিজিএস, কলিকাতা-১৩
মে'র মেডিক্যাল স্টো'র গ্রাইডেট সিং
৩২বি লিওনে স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩
এবং সব বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বাসিত আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের পোজ করুন বা পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—

- ১। পুনর্বাসিত আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বাসিত আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।